আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রচনাবলী

৭


If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

—একশ পঞ্চাশ টাকা—

সম্পাদনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন— অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রণ— সান লিথোগ্রাফী

ASUTOSH MUKHOPADHYAY RACHANAVALI VOL VII

An anthology of Collection of Complete Works Vol VII
by Asutosh Mukherjee Published by Mitra & Ghosh
Publishers Pvt Ltd 10 Shyama Charan Dey Street
Calcutta 700 073

Price Rs 150/

ISBN 81-7293 373-8

শব্দগ্রন্থন লেজার ইম্প্রেশনস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও চয়নিকা প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড ১, রমানাথ মজুমদার
স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

কথা-প্রসঙ্গে

বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পেব আধুনিক ইতিহাসে স্বাধীনতা-উত্তব সময়কাল এমন কযেকজন কুশলী শিল্পীব নামে চিহ্নিত হযে আছে, যাঁবা পঞ্চাশ-থেকে-সত্তব এই তিন দশকেব বাঙালি জীবনেব খুঁটিনাটি তাঁদেব গল্পে ধবে বেখেছেন। এঁদেব তালিকা দীর্ঘ হলেও কযেকজনেব নাম প্রতিনিধি-স্বরূপ উল্লেখ কবা যায। গজেন্দ্রকুমাব মিত্র সুবোধ ঘোষ নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যায সুমথনাথ ঘোষ বিমল মিত্র নবেন্দ্রনাথ মিত্র আশাপূর্ণা দেবী ইত্যাদি নামেব পাশে আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব নামটিও সমগুরুত্বে স্বীকৃত। বিশেষত ছোটগল্পেব শিল্পরূপকে তিনি নিপুণ হাতে প্রযোগ কবতে জানতেন। তাব ছোটগল্পে অভিজ্ঞতাব জগৎটা নেহাৎ ছোট নয, আব ছোটগল্পে ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা-ব যুগ পেবিযে তিনি বড ব্যথাব শেকডেও টান দিযেছেন অনাযাসে। ছোটগল্পে সমাপ্তিব চমক, আকস্মিক কোনো উদভাসন বা অপ্রত্যাশিত বাক নেওযাব আর্টেও যেমন তাঁব একটি সহজপটুত্ব ছিল, তেমনি আবাব কথাসবিৎসাগব-বীতিব তৃপ্তিবিধাযক পবিণতিতেও অনাসক্তি ছিল না। সর্বোপবি নাবী-চবিত্রেব বহস্যভেদে ছিল তাঁব অপক্ষপাত আগ্রহ। নাবীব জটিল দুর্ভেদ্য মনস্তত্ত্বেব গহনে আলো ফেলাব কৌতূহলে তাব একটি নিজস্ব আখ্যান-পদ্ধতিবিদ্যা ছিল, যা তাব কথাসাহিত্যেব জনপ্রিযতাব অন্যতম বহস্যসূত্র।

আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব গল্পসংকলনেব বর্তমান খণ্ডটি তাব গল্পশিল্পেব এই ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যে পাঠককে আজও মুগ্ধ কবে বাখে। এই খণ্ডেব অন্তর্গত মন-মধুচন্দ্রিকা, প্রতিবিম্বিতা, বোশনাই, পিকপযেন্ট ও উত্তববসন্ত প্রভৃতি গ্রন্থভুক্ত গল্পেব প্রায সবগুলিতেই বিচিত্ররূপিণী নাবীব মিছিল। অভিনেত্রী মঞ্জবী দেবী (বর্ণান্তব), গ্রাম্য নাবী বঞ্জনা (মিথ্যে), ধনী ব্যবসাযীব কন্যা সাবিত্রী (ভীষ্ম), পান্থনিবাসেব কর্ত্রী মাসী (প্রতিবিম্বিতা), বিত্তশালিনী কুদর্শনা শ্রীমতী (শ্রীমতী রূপাবতী), আপাঃপবিহাসিনী বিনতা (অধবা), বোম্বাইযেব একদা-মডেল জযন্তী (মডেল), সন্তানহীনা ললিতা (মরূদ্যান), ইউপিব দেহাতি নাবী জানকী (বাবণ), শিক্ষযিত্রী বিমলা (ঠাকুমাব ঝুলি), এলোমেলোভাবে মনে-কবা এই নাবী-চবিত্রগুলি যে-কোনও ছোটগল্পকাবেব স্মবণীয সৃষ্টি বলে গণ্য হতে পাবে।

শ্রীমতী মঞ্জবী দেবীব কথাই ধবা যাক। এ গল্পেব (বর্ণান্তব) বক্তা স্বযং লেখক, তাই তাঁব এই স্বীকৃতিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ

"আমবা গল্প লিখি। হৃদয নিযে নাড়াচাড়া কবি। কিন্তু সত্যি সত্যি কটা হৃদয চিনেছি আজ পর্যন্ত, কটি হৃদযেব নিভৃতে ডুব দিতে পেবেছি? হৃদয যে এমন বিচিত্র হয তা কি কোনদিন কল্পনা কবাও সম্ভব?"

মঞ্জবী তাবই এক টুকবো উদাহবণ। খুব বড দবেব অভিনেত্রী না হতে পাবলেও মঞ্চে একদা পবিচিতি একটা ছিল। তবে তাব অতীত ছিল কলঙ্কেব ফ্রেমে বাঁধানো এক অপবিচ্ছন্ন জীবনেব ছবি, অধিকাংশ মঞ্চনটীব ক্ষেত্রে যেমন হযে থাকে। ছোটবেলা থেকে

পুতুলখেলার ভিতর থেকে উপলব্ধ একটা অতৃপ্ত মাতৃত্বের ক্ষুধার পরিণামে সে হয়েছিল প্রথম যৌবনেই এক অবৈধ সন্তানের স্নেহান্ধ মা। শেষ পর্যন্ত নিজে অপরের রক্ষিতার মতো থেকে মঞ্চে অভিনয় করে সে সেই পিতৃপরিচয়হীন সন্তানের যাবতীয় নষ্টামি ও দুশ্চরিত্রতার মূল্য জুগিয়ে এসেছে। কিন্তু মঞ্জরীর সেই অন্ধ মূঢ় অবোধ স্নেহের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় বিপর্যয় ঘটল একদিন, যখন কোনও দুর্বিনীত অপরাধে ধরা-পড়া সেই ছেলের বিচারের সময় ছেলেকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে সে অনায়াসে মাতৃত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করে বসল। কী গভীর হৃদয়বিদীর্ণ যন্ত্রণার ফলে এটা সম্ভব হল, জন্মদাত্রী মায়ের স্নেহের বর্ণান্তর ঘটল, বাইরে থেকে কতটুকু তা বোঝা যায়?

বেণুর মতো একটি আপাত-দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের ক্ষেত্রেও সেই একই অভিজ্ঞতা লেখকের (অধরা)। সম্পর্কে শ্যালিকা বিনতার মুখে শুধুই হাসি আর লঘু কৌতুক; পরিহাস দিয়েই সে তার বয়সটাকে সর্বাঙ্গ মুড়ে রেখেছে। সঞ্জয়কে বঞ্চিত করে সে বয়সে-বড় ধনীর সঙ্গে বিয়েতে সম্মত হল, আবার তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমেরিকা-ফেরত সঞ্জয়ের সঙ্গে ফের ঘর বাঁধতে রাজি হল, কিন্তু হঠাৎ বিচ্ছেদ-মামলার প্রাক্কালে সেই বয়স্ক স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে তার বিধবা স্ত্রী, এই পরিচয়েই জীবনটাকে বন্দী করে রাখতে চাইল। এ সবই নারী-চরিত্রের দুষ্প্রবেশ্য রহস্য। বিনতার হাসির তলায় কী এক চাওয়া প্রচ্ছন্ন থাকত—সেই চাওয়ার সঙ্গে বাস্তব প্রাপ্তির অসামঞ্জস্যেই বিনতার ট্র্যাজেডি, এই সত্যটিই শুধু লেখক বুঝতে পেরেছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত নারীর এই ভিতর-মহলের খবর তার আশেপাশের পুরুষরা পায় না। মধ্যবিত্ত লোকালয়ে দোতলার এক প্রান্তের একটি ঘর থেকে প্রভাতী (একটি কোণের ঘর) তার সামনের বাড়ির দোতলার কোণের ঘর থেকে একটি লোককে দিনরাত তার-দিকে-হাঁ-করে তাকিয়ে থাকতে দেখত। লোকটার উপর বিরক্ত হলেও মনে মনে প্রভাতী ভাবত, এখনও তার শরীরে রূপযৌবন তো নিঃশেষ হয়ে যায়নি, মুগ্ধভক্তের মতো ওই মানুষটা বোধহয় তাই উপভোগ করে। একদিন জানতে পারল লোকটা ঐ বারান্দায় প্রভাতীর পোষা পায়রাকে খেতে-দেওয়া ও অন্য একটি অবাঞ্ছিত পায়রা-তাড়ানোর দৃশ্যই দেখে—কারণ তাই নিয়ে গল্প লেখার উপাদান সংগ্রহই ছিল তার ওই হাঁ-করে দেখার উদ্দেশ্য। সেদিন সে ভিতরে একটা বড় ধাক্কা পেল, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম। সে অপমানবোধ যেন তার নিজের যৌবনেরই। অবশ্য সেই জটিল মনের রহস্য বোঝার ক্ষমতা তার স্বামী নিরঞ্জনের ছিল কিনা সন্দেহ।

প্রভাতীর যেমন ছিল রূপের গর্ব, অরুণার তেমনি ছিল রূপহীনতার আক্ষেপ (কান্নার স্বাদ)। সুশ্রী না হওয়ার জন্যে অরুণা বিয়ে না করে লেখাপড়া শিখে অফিসে চাকরি নিয়ে অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছিল। তবু শেষ পর্যন্ত অরুণার বিয়ে হল তার অফিসের সহকর্মী নারায়ণের সঙ্গে। অরুণার প্রতি লোকটা তার দুর্বলতা গোপন করত না, কিন্তু তার অচতুর সংলাপ, অত্যধিক ভালোমানুষি চেহারা, ধর্মপরায়ণ ভক্তি ইত্যাদি কারণে অরুণার কোনদিনই তার প্রতি আসক্তি গড়ে ওঠেনি। তবু শেষ পর্যন্ত

লোকটা মুখ ফুটে সে কথা বলতেই অরুণা যে বাজি হল, তাব কাবণ. তাব রূপহীনতাব তিক্ত গ্লানি, দীর্ঘদিনেব নানা প্রত্যাখ্যান ও প্রবঞ্চনাব অভিজ্ঞতা এবং হযতো আবও অনেক, অনেক কাবণ। তাহলে এ বিযে কি তাব ইচ্ছেপূবণ ? এ বিযে কি তাব লজ্জা-দুঃখ-ব্যর্থতা নয ? অথচ বিযেব বাতে নাবাযণেব পাশে বাসবঘবে তাব বুক ঠেলে কান্না এল। সে কান্না বোধহয সবটাই ব্যর্থতাব পবিণামে নয, সূক্ষ্ম একটা তৃপ্তিতেও। অরুণাব সেই গোপনতম তৃপ্তিটি ঠিকই বুঝেছেন লেখক। তাই এ কান্নাব স্বাদই আলাদা।

নাবাযণেব মতোই গোলগাল বোকাবোকা ভালমানুষ সুনীলমাধব (ক্ষতিপূবণ), তিনি তাঁব স্ত্রী বসনাপটীযসী ক্ষণপ্রভাব সামনে কখনই বাক্যব্যযেব ঝুঁকি নিতেন না। কিন্তু স্বামী-পুত্রকন্যা-ঝি-প্রতিবেশিনী সবাইকে তটস্থ-কবা বাগীশ্ববী ক্ষণপ্রভা হঠাৎ একদিন মৌনব্রত গ্রহণ কবায সবাই যেন ঘাবড়ে গেল। সন্ত্রস্ত স্বামী ও পুত্রকন্যা সে বহস্য ধবতেই পাবে না। এইভাবে সপ্তাহ কেটে গেল। দিনকতক পবে স্ত্রীব নীবব হুকুমে স্বামী বেচাবি একদিন সন্ধ্যায ক্ষণপ্রভাকে অনুসবণ কবে এসে ঢুকল একটি সিনেমা হল-এ। সবই ক্ষণপ্রভাব পূর্বাহ্ণে ব্যবস্থা-কবা। বিযেব এতকাল বাদে নিবামিষ নিবাবেগ নিস্পৃহ জীবনযাপনেব পব এই সিনেমা-বোমান্স-প্ল্যানেব পিছনে ক্ষণপ্রভাব কী মানসিকতা কাজ কবেছিল, সে বহস্য এ গল্পে সূক্ষ্মদর্শিতায ফুটিযে তুলেছেন লেখক।

আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব গল্পে শহব-গ্রাম দুই পটভূমিকাই পাওযা যায। এমনকি বহির্বঙ্গেব পবিবেশও অনেক গল্পে পাওযা যায। ব্যক্তিগত জীবনে সাংবাদিকতাব অভিজ্ঞতা ও চলচ্চিত্রেব কাহিনীবচনাসূত্রে চলচ্চিত্র-জগতেব অভিজ্ঞতা হযতো অনেক গল্পেব উপাদান-সংগ্রহে সহাযক হযেছে। মাবাঠিদুহিতা সাবিত্রী-ব কথা মনে পড়বে (ভীষ্ম)। বোম্বাই পত্রিকা অফিসেব ভগবান শর্মা মজাব মানুষ। আবেগ বুদ্ধি অহেতুক উত্তেজনা বেপবোযা গোঁযার্তুমি বেহিসেবি অপচয অবিবেচক ফুর্তি ও অপবকে জব্দ কবাব চাতুর্য—এইসব দিক থেকে অতুলনীয শর্মা কীভাবে-যে অগাধ-অর্থেব-মালিক চলচ্চিত্র-প্রযোজক পবিবাব থেকে সাবিত্রীকে বিযে কবে আনল, সে এক নাটকীয কাহিনী। ফলে এই অসম-বিবাহে দুজনেব সম্পর্কেব মধ্যে অসন্তোষেব বাষ্প প্রাযই ঘনীভূত হত, গলেও যেত। শর্মাও নিজেব অবস্থা বা স্বভাব-পবিবর্তনেব সংকল্প ঘোষণা কবত ভীষ্মেব মতোই, যদিও শেষ পর্যন্ত পৌবাণিক মহিমা তাব ক্ষেত্রে সত্য হত না। কিন্তু সাবিত্রী কেন শর্মাকে বিযে কবেছিল, তাব সদুত্তব অনেকেবই জানা ছিল না। টাকায মোড়া অন্তঃসাবশূন্য সংস্কৃতিবর্জিত একটা পবিবাব থেকে স্বেচ্ছায বেবিযে এসেছিল সাবিত্রী, আব ভগবান শর্মাব মধ্যে পেযেছিল একটি অকপট হৃদযকে, যা তাব সমাজে দুর্লভ ছিল। গল্পেব শেষাংশে এসে লেখক সাবিত্রীব এই গভীব প্রাপ্তিব আনন্দটুকু বুঝে ফেলেছেন।

সাবিত্রীব বিপবীত চবিত্র বোম্বাইযেব ধনীকন্যা শীলা বানে (নির্বাচন), যে তাব পাবিবাবিক আভিজাত্য আব রূপ-ঐশ্বর্য-মোহ নিযে জীবনে উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন কবতে পাবেনি। ঘড়িব নিপুণ কাবিগব নাবাযণ দীক্ষিত শুধু ঘড়ি-মেবামতিতে দক্ষ ছিলেন না,

মানব-চরিত্রের ভিতরকার কলকব্জাও বুঝতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঠিক ঘড়ির মতোই মানুষের মনের নিভৃতে অনেক সূক্ষ্ম কাণ্ডকারখানা, দেখে-শুনে ঠিক মতো বিন্যাস করলে তবেই মানুষ ঘড়ির মতো নিখুঁত হয়। নিজের বিদ্বান বুদ্ধিমান ভাইপোর জীবনে একদিন এই সত্য প্রমাণিত হল। ভাইপো মনোহর দীক্ষিত অনেক বিদ্যা যশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে এমন এক জীবনসঙ্গিনী পেতে চেয়েছিল যে হবে তার ইচ্ছে-দিয়ে-তৈরি, রূপে-গুণে চোখ-ধাঁধানো, যাকে পার্টিতে সগর্বে নিয়ে যাওয়া যাবে, যে হতে পারবে ঠিক তারই উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণাশক্তি। শেষ পর্যন্ত বোম্বাইয়ের এক অভিজাত পরিবারে শীলা রানে-র মধ্যে এইসব গুণের সূক্ষ্ম সমাহার দেখে তাকেই সহধর্মিণী করতে চেয়েছিল মনোহর। কিন্তু শীলার পছন্দ বা মন কোনটাই মনোহরেব শিকে ছিঁড়তে সাহায্য করল না। অবশেষে কাকাব ইচ্ছের পুকুরে স্নান করে কাকারই পূর্ব-মনোনীত, কাকার ব্যবসার কাবিগরের বি-এ-পাশ-মেয়ে কমলাকে বিয়ে করতে বাধ্য হল। বিয়ের পর দশ বছরেও তার ভিতরকাব অতৃপ্তির আগুন নেভেনি, যদিও তার দাম্পত্য জীবনে তার শিখার তাপ কিছু লাগেনি। এমন সময় একদিন শীলা রানের সঙ্গে দেখা। শীলা তেমনি উচ্ছল তেমনি মোহময়ী, যদিও বয়সের টান ধরেছে বিকেলের রোদের মতো। ইতিমধ্যে মনোহর জানতে পাবল শীলাব দু-বার বিয়ে ও বিচ্ছেদ ঘটে গেছে! শীলার স্বভাবে যে অস্থিরতা উচ্ছলতা গভীরতার অভাব, তা দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিকূল। সেদিনই সে তার কাকাব নির্বাচিত অতিসাধারণ বি-এ-পাশ অনুচ্ছল শান্তস্বভাব স্ত্রী কমলার দিকে তাকিয়ে গভীর তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব কবল এবং প্রয়াত কাকার নির্বাচনশক্তিতে গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ করল।

নারী অভিজাত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত পরিবেশ থেকেই আসুক আর একেবারে নিচু তলার প্রতিনিধি হোক, তার মনের তল পাওয়া দুষ্কর। অযোধ্যার কাছাকাছি কোনও এক দেহাতি অঞ্চলের মেয়ে জানকীব বিয়ে হয়েছিল ভুটাইয়েব সঙ্গে, কিন্তু সে বিয়ে সুখেব হয়নি। ভুটাইয়ের হাতে মাব খেয়ে বাপের কাছে ফিবে এসেছিল জানকী। পঞ্চায়েতে বিয়ে ভেঙে-দেওয়ার কথাও জানিয়ে দেয়। এবাব মগনলালের সঙ্গে তাব আবার বিয়ে, যে মগনলালকে বঞ্চিত করেই সে ভুটাইকে বিয়ে কবেছিল। এ কাহিনীর (বাবণ) সঙ্গে বামায়ণের কোথায় যেন একটা মিল আছে। জানকীর জীবনের দুপাশে ভুটাই আর মগনলাল যেন রামরাবণ। বছরে একবাব গাঁয়ে যে রামলীলার শোভাযাত্রা বেরোয় তাতেও ভুটাই রাবণ আর মগনলাল রাম সাজে। এবছরও ভুটাই রাবণ সেজে রামভক্ত পাবলিকের হাতে প্রহৃত হল, অন্য বছরের তুলনায় যেন একটু বেশিই। এবার এর পিছনে ছিল মগনলালের ষড়যন্ত্র, ভেবেছিল এতে জানকীও খুশি হবে। আশ্চর্য, পরদিন চুপিচুপি জানকী ভুটাইয়ের বাড়ি গিয়ে মার-খাওয়া ভুটাইয়ের সেবায় লেগে গেছে! নারী-মনস্তত্ত্বের এই নতুন আবিষ্কার একালের রামায়ণের নতুন ব্যাখ্যাও বটে।

দেশের বাইরে শহর-উপকণ্ঠের এক পান্থনিবাস চালান রুক্ষস্বভাব যে মহিলাটি তাঁর কথা না বললেই নয় (প্রতিবিম্বিতা)। সবাই তাকে মাসি বলে ডাকে। লেখকও কিছুদিন

সেখানকার অতিথি হয়ে মাসির রুক্ষ মেজাজ ও অতিথিসৎকার-গুণ, দুয়েরই পরিচয় পেলেন। ভদ্রমহিলা তাঁর দুই ভাসুরকন্যা কমলা ও রমলাকে তাদের স্বাধীন স্বামী-নির্বাচনের অপরাধে সম্পত্তিবঞ্চিতা করেছিলেন। তিনি কি সত্যিই এত গোঁড়া, এত রক্ষণশীল ? লেখকের গহনচারী বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে এই মহিলাটিকে নতুন করে চেনা গেল। আসলে তিনি নিজে একদা পিতার অমতের কারণে পছন্দের মানুষকে বিয়ে করে সুখী হতে পারেননি। তাই প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে, ভয়-ত্রাস-বাধা ও বিপদের হুমকি দিয়ে ভাসুর কন্যাদের প্রেম ও বিয়ে থেকে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করতে চান একটিই গোপন উদ্দেশ্যে। দেখতে চান, তারা সে সব উপেক্ষা করে পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার সাহস পাচ্ছে কি না। নিজের অতীত জীবনের প্রত্যাশিত স্বপ্ন তাঁর স্নেহাস্পদাদের জীবনে সত্যে বিম্বিত হোক, এই গূঢ় বাসনাই তাঁর বাইরের আপাতরুক্ষ কাঠিন্যের ছদ্মবেশে ঢাকা থাকে।

রুক্ষতার তলায় যেমন গোপন স্নেহ, তেমনি আবার স্নেহের ফুল সবালে হাতে বেঁধে ঈর্ষার সরু কাঁটা, যেমন সুরুচি চরিত্রে দেখা গেছে (স্নেহ)। কোনো কোনো পরিবারে ভাইবোনদের মধ্যে এমন এক-একজন অগ্রজ থাকেন যিনি স্নেহমমতায় শাসনে অভিভাবকের পদে আসীন হয়ে পড়েন, পিতামাতা থাকা-না-থাকার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক বা বিরোধ থাকে না। সুরুচিও তার বোন-ভগ্নীপতিদের কাছে সর্বদাই সেই রকমের অভিভাবক। কিন্তু ছোটবোন শোভনার দাম্পত্য জীবনের উপর সুরুচির যে একটি সূক্ষ্ম ঈর্ষা ছিল, সেটাই স্নেহের ছদ্মবেশে শাসনের রূপ ধরে দেখা দিয়েছে, অথচ শোভনাকে সুরুচি বশ করতে পারেনি। বোনেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অভাব দুঃখ মনোমালিন্য সাংসারিক ঝড়ঝাপটা সত্ত্বেও শোভনা ও তার অপেক্ষাকৃত কর্মভীরু স্বামীটির মধ্যে যে নিবিড় মনের মিল, সেটাকেই ঈর্ষা করে সুরুচি। কারণ স্বামী-সুখবঞ্চিত সুরুচির জীবনে তার চেয়ে জ্বালার যে আর কিছু নেই। সুরুচির জীবনের এই ভিতরকার ট্রাজেডি আর তার মনের এই বিকার-রহস্য তার বোনেদের জানার কথা নয়।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শুধু নারীচরিত্র নয়, পুরুষচরিত্র সৃষ্টিতেও সমকালীন গল্পকারদের তুলনায় কিছু স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারেন। শুধু মধ্যবিত্ত নয়, নিম্নমধ্যবিত্ত দরিদ্র গ্রাম্য শ্রমজীবী থেকে শুরু করে উঁচু তলার ধনী, নানা বৃত্তি ও পেশার মানুষ, তাদের বিচিত্র স্বভাব চারিত্র্য প্রবণতা ও আচরণ নিয়ে তাঁর গল্পের আঙিনায় ভিড় করে, যাদের একবার দেখেই ভোলা যায় না। তাঁর মনে রাখার মতো চরিত্রগুলিতে এমন কিছু অসামান্যতা থাকে, যা গড়পরতা নয়, অন্য-কিছু, গল্পের উৎকর্ষ সেখানেই। তা মহত্ত্ব নয়, কিন্তু হৃদয়ের কিছু নিভৃত সম্পদ, যার গৌরবে চরিত্রটি ধনী হয়ে ওঠে। অনেকদিন কাছে থেকেও একজনকে ঠিক জানা যায় না, অথচ কোনও এক সময়ে তাকে হঠাৎ নতুন করে চেনা যায়। মানুষকে নিয়ে বিধাতার এই এক আশ্চর্য কারিগরি। দু-একটির কথা স্মরণ না-করলেই নয়। দুটি সন্তান জন্মাবার পর কুদর্শন গোয়ানিজ পিতা টনি রানডোডকার যখন তৃতীয়বার পিতা হল (ব্যক্তিত্ব), তার সমস্ত আশঙ্কা সত্য হল। এই

সন্তানটি তারই কুরূপ নিয়ে জন্মেছে। অথচ প্রথম দুটি সন্তান বাপের চেহারা পায়নি। স্ত্রী ডরোথি আর মা হতে চায়নি। তবু দুর্ঘটনা ঘটল এবং এই তৃতীয় পিতৃপ্রতিম বিশ্রী চেহারার পুত্রটি কিশোর বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতার অপ্রসন্নতাই ভোগ করে গেল। হঠাৎ টনির মৃত্যু ঘটলে এটর্নি ডরোথিকে একটা উইল এনে দিল। দেখা গেল, টনি তার সমস্ত সম্পত্তি তৃতীয় সন্তানকেই দিয়ে গেছে, যার কুরূপ চেহারা বাপ হয়ে টনি সহ্যই করতে পারত না। আর উইলে অস্পষ্টভাবে এই ইঙ্গিতও রয়েছে, ডরোথির প্রথম দুই সন্তান যে পিতার মতো কালো কুৎসিত হয়নি, টনি তার রহস্য জানত। যেহেতু টনি তাদের আসল পিতা নয়।

এই চরম ধাক্কাটিই এ গল্পের টেকনিক।

জনকত্বের এই সংশয় নিয়ে গল্প গড়ে তোলা দুঃসাহসের কাজ। 'মিথ্যা' গল্পটির কথা মনে পড়বে। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় একবার পুলিশকে মিথ্যে বলার খেসারত হিসেবে মন্মথবাবু নকশাল-নৃশংসতায় তাঁর নিরীহ ছোটছেলেকে হারিয়ে ছিলেন। সেই থেকে তিনি ধর্মে মতি রেখেছেন, সত্যনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন। ফলে তাঁর চালু ব্যবসাপত্তরে সত্যমিথ্যায় ভারি চুলোচুলি বাধছে। ছেলে আর শালার হাতে ব্যবসা ছেড়ে নিজে নির্লিপ্ত আছেন। তবু জড়াতে হল। পাকুড়ে পাথর-ভাঙা ব্যবসার খাদে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে শ্রমিক অসন্তোষ সামাল দিতে আবার একটা মিথ্যে বলতে হল। পুত্র আর শ্যালক গোপন ষড়যন্ত্রে এক মজুর-নেতাকে খুন করতে উদ্যত এই জেনে, সেই মজুরের যুবতী কামিন বউ কাঞ্চি তাঁরই অবৈধ মেয়ে, এই ঘোষণা করে বসলেন একেবারে স্ত্রীর সামনে। কাঞ্চি সম্পর্কে এই অসামাজিক মিথ্যাটি বলে কিন্তু এবার তাঁর অনুতাপ হল না, মনে হল বউটার বিপদ কেটে গেছে। স্ত্রী-পুত্রের কাছে তাঁর চরিত্র যতই ছোট হোক, একটা জীবন তো রক্ষা পেল। তিনি যেন অনেকটাই তৃপ্তি পেলেন। তাঁর ইষ্টদেবের কাছ থেকেও যেন নিঃশব্দ এক সমর্থন পেয়ে ভারি শান্তিবোধ করলেন।

'সঙ' গল্পের পান্নালাল দামকেও পাঠক চট করে মন থেকে তাড়াতে পারবেন না। বড়বাজারের মশলার ব্যবসায়ী কোটিপতি পান্না দাম হঠাৎ একদিন বেপাত্তা হয়ে গেছিল, তার পরিবারের পক্ষ থেকে নিয়মমাফিক সন্ধানপর্ব করে শেষও হয়ে গেল। তার গদি-র কয়েকদিনের ম্যানেজার লেখক বহুকাল বাদে তাকে হরিদ্বারে এক ভজন গানের আসরে গেরুয়াধারী কর্তিতকেশে গানের দলে আবিষ্কার করলেন। তারপর একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে গঙ্গার ধারে এককালের পান্না দাম, বর্তমানের ত্যাগী মহারাজের জীবনের ঢাকনাটা খোলা হল। সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেল, প্রথম জীবনে এক সঙের ভূমিকায় চাকরি করত লোকটা, লম্বা দোতলা-সমান সঙের মূর্তির ভিতর আত্মগোপন করে নিজেকে মনে করত সেই দোতলার সমান উঁচু। তারপর অনেক ওঠানামার ভিতর দিয়ে বিত্তবান পরিবারের কর্তা হয়েও বুঝতে পারল, বিদুষী স্ত্রী ও শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিপরায়ণ পুত্রদের কাছে আজও সে সঙই। তার 'কালচার' না থাকায় নিজের ঘরে নিজের পরিবারেই সে বিচ্ছিন্ন। তারপরই তার স্বেচ্ছানিরুদ্দেশ। তবে এই প্রৌঢ় বয়সে

হবিষ্যারে সাধন-ভজনে বসেও সে ভুলতে পারে না, এও এক ধরনের সঙ-সাজা, এও একটা খোলস, ভক্তির খোলস ত্যাগের খোলস।

জীবনের সত্যকে এমন অনাবৃত করে তুলে ধরার গল্প মানিকের পর কজন এমন করে বলতে পেরেছেন? গোলক জ্যোতির্বাগীশও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এক অসাধারণ চরিত্রসৃষ্টি (যযাতি)। গোলক জ্যোতিষী তাঁর নাতির দীর্ঘায়ু সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু সেই নাতির যখন যায়-যায় অবস্থা, তখন জ্যোতির্বাগীশের বিশ্বাস ও আপন গণনার উপরে আস্থা কি টলে উঠেছিল? জপ করতে করতে নিজেই গতায়ু হলেন, অথচ নিজের গণনা অনুযায়ী তাঁর আরও দীর্ঘজীবন জীবিত থাকার কথা। তাহলে কি যাযাতির মতো নিজের আয়ু দিয়ে নাতির আসন্ন মৃত্যু রোধ করলেন? শেষ পর্যন্ত কি নিজের জীবনের মূল্যে তাঁর গণনার অভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন? অন্তত এসব ভেবে সেদিন তাঁর আশৈশব-সুহৃদ বৃদ্ধ চিন্তাহরণবাবুর সুনিদ্রা হল। আরোগ্যনিকেতনের কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও গোলক জ্যোতির্বাগীশ একটি সার্থক চরিত্রসৃষ্টি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কিছু ছোটগল্প শাণিত সমাপ্তির গুণে পাঠককে চকিত করে, যেমন জীবোৎস, মিথ্যে, ব্যক্তিত্ব, জনক, প্রতিবিম্বিতা, শিকার, শ্রীমতী রূপাবতী, অথবা, মডেল— কয়েকটি মাত্র নাম করলেই যথেষ্ট। এই সংকলনের অজস্র গল্পে পাঠক তাঁর সেই কুশলী সমাপনের আকস্মিকতার অপ্রত্যাশিত রস উপভোগ করবেন। আবার তাঁর অন্য এক ধরনের গল্প, যেন বড়গল্প, নভেলার মতো—অনেক ঘটনাবর্ত, কালব্যাপ্তি, উৎকণ্ঠার পরম্পরা পেরিয়ে নাটকীয় উত্থানপতনের পথ ধরে তাদের যাত্রা। মরুদ্যান, বর্ষা, শুভচক্র, মডেল, রক্তাম্বরী এই জাতীয় গল্পও তার যে-কোনও সংকলনে অনেকগুলিই আছে। পাঠককে দুই শ্রেণীর গল্পই আকর্ষণ করে, কারণ গল্প বলার বাকশিল্প আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের একটি দুর্লভ সম্পদ। তাঁর সমকালে এই গুণটি অনেকের মধ্যে ছিল না।

অরুণকুমার বসু



আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

সপ্তম খণ্ড

বর্ণান্তর

ঘটনাটা শুনেছিলাম আমার এক অ্যাটর্নী বন্ধুর কাছে।

অসময়ে, ছুটির দিনে তার বাড়ির দরজায় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াতে বন্ধু বিরক্ত মুখে ঘাড় ফিরিয়েছিল। কিন্তু গাড়িটা আর তার আরোহিণীকে দেখামাত্র বিরক্তির বদলে তার মুখে সম্ভ্রমের ভাব লক্ষ্য করলাম। বন্ধু বলল, মহিলা এলে পাশের ঘরে গিয়ে বোসো আর কান খাড়া রেখো—তোমার খোরাক পাবে কিছু।

অতএব আমার কৌতূহলী দৃষ্টি গেটের দিকে ফিরল। গাড়ি থেকে নামল একজন বয়স্কা মহিলা। দেখে মনে হল বছর বাহান্ন-তিপ্পান্ন হবে বয়েস। পরে শুনেছিলাম পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের বেশি নয়। গত পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে নাকি মাসে একটা করে বছর বয়েস বেড়ে যাচ্ছে মহিলার।

এগিয়ে আসার ভঙ্গিটা শান্ত, মন্থর। মুখখানা গম্ভীর, কিন্তু কমনীয়। গায়ের রং ফর্সা, বয়েসকালে সুন্দরী ছিল বোঝা যায়। পরনে সাদা-ঘেঁষা সিল্কের থান। গায়ে গয়না নেই একটিও। সিঁথির দিকটা সাদা।

দেখলেই মনে হয় বড় ঘরের বিধবা।

বন্ধু উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন জানালো তাকে। আমাকে দেখে মহিলার মুখে ঈষৎ সঙ্কোচের ছায়া পড়ল। বসে মৃদু সৌজন্য প্রকাশ করল, অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম না তো?

কিছু না, কিছু না। বন্ধু আমার দিকে ফিরল, তুমি ভিতরে গিয়ে বোসো একটু, আমি এঁর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নিই।

মহিলার সঙ্কোচ মাধুর্যটুকু ভালো লাগল। আমাকে উঠতে হল বলেই যেন বিনম্র চোখে ফিরে তাকালো একবার। আমি উঠে এলাম।

এলাম বটে, কিন্তু কাছেব থেকে দেখার পর মুখখানা কেমন চেনা-চেনা লাগল আমার।...খুব শিগগীর না হোক, কোনোদিন কোথাও যেন দেখেছি।

কান খাড়া রাখলে খোরাক মিলতে পারে বলেছিল বন্ধু। কিন্তু উৎসাহিত হবার মত তেমন কিছু পেলাম না। মহিলার কথা বেশির ভাগই শোনা গেল না। তা'ছাড়া কথা বেশি বলেওনি। বন্ধুর কথাই বেশি শোনা গেল। যেটুকু বোঝা গেল তার সারমর্ম, মহিলার বাড়ি আর টাকা-কড়ি যা আছে সব একটা শিশু হাসপাতালে দিয়ে দিতে চায়। আর, আমার অ্যাটর্নী বন্ধু তাকে বোঝাতে চেষ্টা কবছে, তাড়াহুড়ো করে কিছুই করা উচিত নয়, যা করার সময়ে করা যাবে, এখনো তো সে বিশ-পঁচিশ বছর অনায়াসে বাঁচতে পারে, ইত্যাদি।

রমণীর মৃদু হাসি কানে আসতে আমি ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম প্রায়। মহিলা বলল, আপনি আমাদের অনেক দিনের শুভার্থী, আপনার ভাবনা বুঝতে পারি। আমার এক-রকম করে চলে যাবে, আপনার ভয় নেই।

বন্ধুটি তবু বলল, কিন্তু এত তাড়ার কি আছে, আপনি আরো কিছুদিন বেশ করে ভেবে-চিন্তে নিন না।

মনে হল মহিলা চুপ করে গেল। কিন্তু না, একটু বাদে স্পষ্ট মৃদু জবাব কানে এলো। বলল, একটানা ছ'মাস ভেবেছি, সেটা কি যথেষ্ট নয়? আপনার কি এখনো মনে হয় আমি ঝোঁকের মাথায় কিছু করছি?

এই উক্তির পরে বন্ধু আর তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেনি। কি সব কাগজ-পত্র পাঠাতে বলে উঠে গেট পর্যন্ত গিয়ে তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসেছে।

সে ফিরে আসতে কেমন অন্যমনস্ক আর বিমর্ষ মনে হল মুখখানা। বললাম, মহিলা দাতা হতে চান আর তুমি বাধা দিতে চাও—এর বেশি কিছু বুঝলাম না।

বন্ধু একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল শুধু, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, চিনলে মহিলাটিকে?

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক একটু, যদিও চেনা মুখ মনে হয়েছিল। মাথা নাড়লাম, আমি চিনব কি করে?

কেন, দেখেছ নিশ্চয়, থিয়েটার করত। মঞ্জরী দেবী

এইবার চিনলাম। কোন এক মাসি না পিসির ভূমিকায় শেষ দেখেছিলাম বছর চারেক আগে। তেমন নামজাদা অভিনেত্রী না হলেও মোটামুটি একটু খ্যাতি ছিল। ইদানীং কয়েক বছরের মধ্যে তাকে আর কোথাও দেখিনি।

বললাম, দেখি না তো আজকাল, অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, ভোলা ঘোষ মানে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে আজীবন কাটালো, বছর তিনেক আগে সে মারা যেতে থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে।

শুনলাম ভোলা ঘোষ ছিল বন্ধুর বহুদিনের পরিচিত ব্যক্তি, সত্যিকারের স্নেহ করত তাকে ভদ্রলোক, গোড়ার জীবনে এই ব্যবসায়ে অনেক সাহায্যও করেছে। সেই সুবাদে অনেক দিন হল মঞ্জরী দেবীর সঙ্গে হৃদ্যতা বন্ধুর। মহিলা কম করে সতের-আঠার বছরের ছোট ভোলা ঘোষের থেকে। কিন্তু ভদ্রলোক মারা যেতে সে নাকি সত্যি বিধবা বলেই মনে করে নিজেকে।

আমার আগ্রহ কমে আসছিল। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, মহিলাটি তো তেমন নামজাদা অভিনেত্রী কিছু ছিল না, দান করার মত অত সম্পত্তি কোথায় পেল, ভদ্রলোক দিয়ে গেছে?

বন্ধু বলল, কিছু দিয়ে গেছে, কিছু নিজের রোজগার। তা'ছাড়া সম্পত্তি বলতে তেমন বড় ব্যাপার কিছু নয়, ছোট একটা বাড়ি আর লাখখানেক টাকা। সবই একটা শিশু-হাসপাতালে দিয়ে দেবে ঠিক করেছে।

এই শোনার পর খুব বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিনি আমি। নির্লিপ্ত মন্তব্য করেছি, এ-রকম দানের নজির নতুন কিছু নয়, একটা বয়সে জীবনের পিচ্ছিল দিকটায় কিছু চুন-সুরকি ফেলে পরকাল সম্বন্ধে অনেকেই একটু নিশ্চিন্ত হতে চায়।

একটু চুপ করে থেকে বন্ধু বলল, সে-রকম দান হলে তোমাকে বলতাম না। মাস ছয় আগে কোর্টে একটা কেস উঠেছিল তুমি কাগজে লক্ষ্য করোনি হয়ত। আমি আদালতে উপস্থিত ছিলাম সেদিন। ভোলা ঘোষকে যতই শ্রদ্ধা করি, তার আগে মনে মনে আমিও যে খুব ভালো চোখে দেখতাম মহিলাকে, তা নয়। কিন্তু কোর্টে

সেদিন আমি এক মা-কে তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে দিতে দেখেছিলাম যেন, আর তার পর থেকে কেবলই মনে হয়েছে, কত বিচিত্র ব্যাপারই না ঘটে দুনিয়ায়, কে যে আসলে কি, ঘটলে তখন বোঝা যায়।

বলা বাহুল্য এবারে আমার কৌতূহল নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেছিল। ধীরে সুস্থে বন্ধু ঘটনাটা ব্যক্ত করেছিল। অস্বীকার করব না, শোনার পর বুকের একটা দিক খালি লেগেছে কেমন। মুখে কথা সরেনি।...আমরা গল্প লিখি। হৃদয় নিয়ে নাড়াচাড়া করি। কিন্তু সত্যি সত্যি ক'টি হৃদয় চিনেছি আজ পর্যন্ত, কটি হৃদয়ের নিভৃতে ডুব দিতে পেরেছি? হৃদয় যে এমন বিচিত্রও হয় তা কি কোনদিন কল্পনা করাও সম্ভব?

একটি রমণীর চিত্র আঁকব, যার নাম মঞ্জরী দেবী নয়, যার নাম বীথি। বীথি মঞ্জরী দেবী হয়েছে কাহিনী সেটা নয। অভিনেত্রী মঞ্জরী দেবীব সঙ্গোপন নিভৃতে বীথি নামে যে একটা মেয়ে ছিল, সেই মেয়েটা সত্যি সত্যি মুছে যেতে পারল কিনা, লেখার ফাঁকে ফাঁকে আমি শুধু এই প্রশ্নের জবাবটাই হাতড়ে বেড়াচ্ছি।

বীথি মা হতে চেয়েছিল ন'বছর বয়সে, মা হতে পেরেছিল সতের বছর বয়সে। সেই মাতৃত্ব তার চোখে এক বিপুল বিস্ময়। আর, অন্যের চোখে এক সর্বগ্রাসী কলঙ্ক।

অসচ্ছল ঘরের মেয়ে। চার ভাই, দু' বোন। বাপ উকীল। শিকারীর মত সকাল সন্ধ্যা ওত পেতে বসে থেকে যা ঘরে আনে তাতে বহু জোড়াতাড়া দিয়েও মাস কাটে না। তার ওপর স্ত্রীর মাথার গণ্ডগোল। তার চিকিৎসার তাগিদে না হোক, চেঁচামিচি বন্ধ করার জন্যেও ওষুধের পিছনে কিছু টাকা বেরিয়ে যায়।

ভাইবোনেদের মধ্যে বীথি সকলের ছোট। ভাইয়েরা ছেলেবেলায় সকাল-সন্ধ্যা রকে বসে কাটিয়েছে। একটু বয়েস হতে কেউ কারখানায় ঢুকেছে, কেউ কোনো দোকানে। বীথির ওপরের ভাইটা আড্ডা দিয়ে বেড়ানোটা জীবনের সার সুখ মনে করে।

এরই মধ্যে ন'বছরের ফুটফুটে মেয়েটা নিজের একটা জগৎ গড়ে নিয়েছে। দিবারাত্র নিঃসঙ্গ সে। দিদির সঙ্গে তার বয়সের ফারাক বেশি না। এক ভাইয়েব ওপরে সে। কিন্তু মায়ের মাথার গোলমালের দরুন সেই দিদিটিকে কাঁচা বয়সে সংসারের কাজে লাগতে হয়েছিল। তাই অকালে বয়স বেড়েছে তার। সেই দিদির কাছে শাসন আর গঞ্জনা ভিন্ন আর কিছু বড় পাযনি বীথি।

অতএব মনগড়া এক নিজস্ব জগতে বাস করা ছাড়া আর গতি ছিল না বীথির। তার হাব-ভাব দেখে দাদারা আর বাবাও মনে মনে ধরে নিয়েছিল, বয়েসকালে তারও মায়ের মত মাথার গোলমাল দেখা দেবে। দেবে তো দেবে, কে আর কি করতে পারে!

কিন্তু বীথির সংসারটা এরা কেউ দেখেও দেখেনি। নিজস্ব জগতের ছোটখাটো একটা সংসারের কর্ত্রী হয়ে বসেছিল ন'বছরের বীথি। তার পুতুলের সংসার। পুতুল যোগাতো এই বাড়ির মালিক ওপরতলার গিন্নিমা। বীথি তাকে জেঠি ডাকত। সেই ওপরতলার গিন্নির তিনটে ছেলে, মেয়ে নেই। একটা মেয়ের সখ ছিল তার। নীচ-তলার ভাড়াটের এই মেয়েটার ওপর সত্যিই ভারি মায়া পড়ে গিয়েছিল তার।

জন্ম থেকে দেখে আসছে। ওপরতলার গিন্নি যে পাগল ভাড়াটে তুলতে চেষ্টা করেনি তা শুধু এই মেয়েটার মায়ায়।

গিন্নিটি ধর্মভীরু। বামুনের ঘবের মেয়েকে নিজের হাতের ভাত পর্যন্ত খেতে দিতে হত বলে ভিতরটা খচখচ করত। কিন্তু না দিয়েও উপায় নেই। খিদের জ্বালায় মেয়েটা যখন তখন তার কাছে এসে মুখ শুকিয়ে বসে থাকত। ছেলেদের কারো পাতে ভালো মাছ দেখলে সে-ও এগিযে গিয়ে বসত—খাবে। কাঁহাতক আর না দিয়ে পারা যায়?

এবে'র পরে এক পুতুল যোগাতো এই গিন্নিটি। কোথাও গেলেই হাতে করে কিছু নিয়ে আসত। শুধু পুতুল নয়, পুতুলেব জামা-কাপড়ও তাকেই সংগ্রহ কবে দিতে হত। আর এই পুতুলের সংসারেব খুঁটিনাটি সে বুঝতে শিখেছিল পাড়াব অন্য দু'তিনটে সমবয়সী মেযের কল্যাণে।

অতএব ন'বছর বযসে পুতুলেব সংসারেব পাকাপোক্ত মা হয়ে বসেছিল বীথি। তার এই সংসারেব অনেক সমস্যা, অনেক গোলযোগ। দিদিকে তোষামোদ কবে কোনরকমে তরকারীর খোসা সংগ্রহ করে ছেলে-মেয়েদের খাওযাতে হয়। কিন্তু তার ইচ্ছে করে ভালো-মন্দ কিছু খাওয়াতে। ডাক্তার মা-কে দেখতে এলে তার মুখে-চোখেও একান্ত ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে—তার বোগা ছেলেটাকেও ডাক্তারবাবু যদি একবার দেখে যেত! এই করে বারো বছর বয়সে বীথি মাতৃত্বের প্রায় প্রৌঢ় স্তরে উঠে গেছে।

এমন সময় তার দিদির বিয়ে হয়ে গেল। মায়ের রোগ গোপন কবে কিভাবে বাবা কি ব্যবস্থা করল বীথি জানে না। দিদির চেহারাও ভালই। ছেলে নিজে দেখতে এসে একেবারে পাকা কথা দিয়ে গেল। কিন্তু বিয়ের পরেই দিদির শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মনকষাকষি। তাদের অভিযোগ; মায়ের বোগ গোপন করে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাই হোক দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। পুতুলখেলার আরো অঢেল সময বাড়ল বীথির। নিজস্ব জগৎটা আরো একটু বিস্তীর্ণ হল। কোনো ব্যাপারে তাগিদ দেবার নেই কেউ, তাকে ডেকে খাওয়াবার লোকও নেই—এক ওপরতলার জেঠি ছাড়া।

বীথির বয়েস চৌদ্দ হল।

পুতুলের সংসাবটা এবারে কেমন ছাড়া-ছাড়া লাগতে লাগল তাব। নিষ্প্রাণ মনে হতে লাগল এক এক সময। অথচ নিজস্ব জগতে তার মাতৃত্ব যে কোন পর্যায়ে উঠে বসে আছে সে-খবর কেউ রাখে না। সকলেই বয়েস অনুযায়ী অনভিজ্ঞ, হাবা-গোবা ভাবে তাকে। কথা কম বলে, বড় বড় ডাগর চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। অভাব-বোধটা ঠিক যে কি তা নিজেও যেমন ভালো বোঝে না, অন্যেও না।

ঠিক এই সময়ে এক মাসের এক জ্যান্ত পুতুল কোলে নিয়ে দিদি এই প্রথম দীর্ঘ দিনের জন্য বাপের বাড়ি এলো। ছেলে হওয়ার পর তার শরীর ভেঙে গেছে, ফলে শ্বশুরবাড়ির লোক তার ওপর সদয় হয়ে তাকে বাপের বাড়ি পাঠালো।

অবাক বিস্ময়ে বীথি হাঁ করে সেই জ্যান্ত পুতুল দেখল। ভিতরে ভিতরে এক অননুভূত আলোড়ন অনুভব করল সে। হঠাৎ মনে হল, এই রকম—এই রকমই যেন একটা জ্যান্ত কিছু চেয়েছিল সে।

ব্যস, তার ভগ্ন-স্বাস্থ্য দিদি বেঁচে গেল যেন। সেই জ্যান্ত পুতুলের সমস্ত দায়িত্ব কেমন পরিপাটিভাবে বোন পালন করতে লাগল দেখে দিদির আস্থা ফিরে এলো। মাথা-খারাপ মা ছেলের ক্ষতি করতে পারে বোনকে এই আভাস দেবার পর থেকে সারাক্ষণ যেন বুক দিয়ে আগলে থাকল তাকে। বীথির পুতুলের গোছা ঘরের কোণে পড়ে থাকল। সেদিকে আর তার ফিরে তাকাবারও অবকাশ নেই।

শিশু বাড়তে লাগল, তার দৃষ্টি খুলল, মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ বেরুতে লাগল, হাসি ফুটতে লাগল। বীথি আনন্দে রোমাঞ্চে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। তার মনে হত এমন সম্পদ আর দুনিয়ায় নেই। ওই জ্যান্ত পুতুল নাড়া-চাড়া করে তার আশ মেটে না। রাত্রে একপাশে সে, একপাশে দিদি, মাঝখানে ওই জ্যান্ত পুতুল। দিদি মরার মত ঘুমোয়, বীথি রাতের মধ্যে পাঁচবার করে চমকে চমকে জেগে ওঠে। কাঁথা বদলায়, জল খাওয়ায়, কোলে নিয়ে বসে আবার ঘুম পাড়ায়, তারপর তার গায়ের সঙ্গে লেগে শুয়ে নিজে আবার ঘুমোয়।

ঠিক একবছর বাদে দিদি ছেলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। বীথির পনের বছর বয়েস।

বীথির চোখে রাজ্যের অন্ধকার নেমে এলো। সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। যাবে কি, গেছে। হঠাৎ হঠাৎ ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে, মেঝেতে মাথা খুঁড়ে কপাল ফুটোয়। কেউ দেখে ফেললে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ ভাবে।

কিন্তু বীথি কাকে বলবে, দিদির মত তার ওমনি জ্যান্ত পুতুল চাই একটা, তা না পেলে সে বাঁচবেই না। এমনি নিদারুণ হাহাকারের মধ্যে আরো একটা বছর কেটে গেল।

ষোল বছর বয়সে, কিছুটা প্রকৃতির ইশারায়, কিছুটা বা ঠিকা ঝিয়ের কল্যাণে জ্যান্ত পুতুল লাভের রহস্যটা সে বুঝে নিল আস্তে আস্তে।...বিয়ে হলে, স্বামীর ঘর করলে তবে ছেলে মেলে। স্বামীর ঘর করলে! কেন?

সেই কেনর জবাব সে কেমন করে পেয়েছিল কে জানে?

একটা অটুট সঙ্কল্প দিনে দিনে এঁটে বসতে লাগল তার মনে। জ্যান্ত পুতুল চাই-ই তার, ছেলে চাই—একেবারে নিজস্ব, যাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এই সিদ্ধান্তের যেন নড়চড় হবার নয়।

এই আকাঙ্ক্ষা যেন অনিবার্যভাবেই দোতলার জেঠির ভাগ্নে রঞ্জনের সঙ্গে তার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে নিয়ে এল।

প্রায় ছ'মাসে বীথি ধরা পড়ল যে প্রকৃতির অমোঘ শর তার বুকে বিদ্ধ হয়ে গেছে...। ধরা অনেক আগেই পড়ার কথা। এই বাড়ি বলেই দেরি হল।

সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। কিন্তু নির্যাতন আরম্ভ হল বীথির উপর। মানুষ মানুষের উপর এমন অকথ্য অত্যাচার করতে পারে বীথির ধারণা ছিল না। বিশেষ করে তার বাবা আর দাদারা...

সেই রাতেই বীথি পালালো বাড়ি ছেড়ে।

কিন্তু যাবে কোথায়? চেনাশুনা ক'টি মুখই বা আছে তার? প্রথমেই মনে পড়ল

ভোলা ঘোষকে। ওপর-তলার ছেলেদের খুব ঘনিষ্ঠ লোক ভোলাদা। ভারি দরাজ হাসি-খুশি মানুষ। কোন এক থিয়েটার কোম্পানীর পাণ্ডা সে। লোকটা প্রায়ই জেঠির ছেলেদের কাছে গিয়ে আড্ডা দিত, তাদের পাস দিত। তার পাসে বীথিও এ-পর্যন্ত দু'দিন থিয়েটার দেখেছে। লোকটা তাকে স্নেহ করত খুব।

কিন্তু বীথি তার বাড়ি চেনে না। সোজা থিয়েটারে এসে হাজির হল সে। ভোলা ঘোষ কাছে আসতেই বীথি ডুকরে কেঁদে উঠল।

কি বুঝল ভোলা ঘোষ সে-ই জানে। খবরটা আগেই জেঠির ছেলেদের মুখে শুনেছিল কিনা বীথি তাও জানে না। কিন্তু একটা কথাও তাকে জিজ্ঞসা করল না সে। তার হাত ধরে একটা ট্যাক্সিতে তুলে সোজা নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো।

তারপর তাকে আশ্বাস দিয়ে খাইয়ে দাইযে ঠাণ্ডা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল সব। আর পরদিন ভোরেই তাকে নিয়ে ট্রেনে চেপে বসল। এই ব্যবস্থা বীথির বাড়িব ভয়ে। কিন্তু তার দরকাব ছিল না। কারণ বাড়িতে কেউ তার খোঁজ কবেনি। সে না ফিরে এলেই বাঁচে তাবা।

ভোলা ঘোষ পশ্চিমের এক নিরাপদ আশ্রয়েই রেখে এসেছিল তাকে। নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছে। ফাঁক পেলে নিজেও এসেছে। আর, ছেলে হবার আগে থেকে তো তার কাছেই ছিল সে।

ছেলেই হল।

আর বীথির মনে হল, যতকাল বাঁচবে সে, সমস্ত সত্তা দিযে এই সন্তানকে অনুভব করাই তার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে গোপনে ব্যবস্থা করে আব দ্বিতীয় সন্তান-সম্ভাবনা যে সমূলে ছেটে দিয়েছে ভোলা ঘোষ সে-খবরও বীথি রাখে না। ভবিষ্যৎ জীবনে থিয়েটারেই যে ঢুকতে হবে মেযেটাকে, এ ভোলা ঘোষ আগেই স্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু বীথিব কোনোদিকে হুঁশ নেই আর। সে ছেলে নিয়ে আনন্দে ভরপুর।

সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে বছর দেড়েক বাদে তাকে কলকাতায় নিয়ে এলো ভোলা ঘোষ। অনেক বুঝিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা কবে অনেক ভয় দেখিয়ে তবে ছেলেটাকে কলকাতার এক অনাথ আশ্রমে রেখে মানুষ করার ব্যবস্থায় তাকে রাজী করানো গেল। সত্যিকারের মা হবার পর ছেলের যে মানুষ হওয়া দরকার সেটাও বুঝল বীথি। আর আশ্চর্য, ছেলেকে সেখানে পাঠিয়ে আগের মত অত হাহাকার করল না। যখন খুশি গিয়ে ছেলেকে দেখে আসতে পারে, তার যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য টাকা খরচ করতে কোনদিন এতটুকু কার্পণ্য করেনি ভোলা ঘোষ। লোকটার প্রতি বীথির কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এর পরে বীথির অধ্যায় শেষ। থিয়েটারে অভিনয়ে অবতীর্ণা যে মেয়ে সে মঞ্জরী দেবী।

ভোলা ঘোষের ধারণা, একদিন বড় দরের অভিনেত্রী হয়ে উঠতে পারত সে, পারেনি শুধু ছেলের জন্য। দিবারাত্র যে ছেলের ধ্যানে আর ছেলের চিন্তায় বিভোর, সে তেমন অভিনয় করবে কি করে? ছেলেকে একটু হাঁচতে কাশতে দেখলে পর্যন্ত

থিয়েটার ফেলে সে গিয়ে পড়ে থাকবে অনাথ আশ্রমে।

তবে হ্যাঁ, একটা দিনের জন্যেও অভিনেত্রী মঞ্জরী দেবী অকৃতজ্ঞ হয়নি ভোলা ঘোষের প্রতি। এক, ছেলের চিন্তা বাদ দিলে বরাবর অনুগত ছায়ার মত থেকেছে ভোলা ঘোষের সঙ্গে, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেছে।

ছেলে বড় হতে লাগল, আর বুঝতে লাগল এই রমণীর সঙ্গে তার কিছু একটা নিবিড় যোগ আছে। এই চেতনাই ক্রমশ অবুঝ দাবির আকার নিতে লাগল।

একটানা পনের বছর কেটেছে। ওই ছেলের দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে ভোলা ঘোষের। ছেলেটা যে ভালো রাস্তায় চলছে না সেটা মঞ্জরী দেবীও বুঝতে পারে। কিন্তু এই এক ব্যাপারে সে যেন অসহায়। ভোলা ঘোষ বকাবকি করলে সে ছলছল চোখে চেয়ে থাকে শুধু। আর ছেলেটাও খুব ভালো করেই জেনেছে, যে কারণেই হোক, ওই রমণীব সে একমাত্র চোখের মণি।

ছেলের নাম জয়ন্ত। কোনরকমে ইস্কুলের বেড়া টপকে সে এক আধুনিক বোর্ডিং-এ আস্তানা নিল। ততোদিনে আরো চোখ খুলেছে তার। স্কুল-কলেজের খাতায় জয়ন্ত ঘোষ লেখা হলেও তার ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, আসল সম্পর্ক তার ওই রমণীটির সঙ্গে, যে তাকে দু'দিন না দেখলে চোখে অন্ধকাব দেখে।

ভোলা ঘোষ মারা যাবার আগে আর কোনো সংশয়ই থাকল না। হাত ধরে সে তাকে অনুরোধ করে গেল, মা-কে কষ্ট দিস না—ওই তোর মা, তোর জন্যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছে।

ভোলা ঘোষ মারা যেতে ছেলে নিশ্চিন্ত এবার। পড়াশুনার পাট তার অনেক আগেই চুকে গেছে। আগেই খরচের লাগাম ছিল না। সেটা এখন বাড়তেই লাগল। দাবি অত্যাচারী হয়ে উঠতে লাগল। ওই মা তার খরচা যোগাতে বাধ্য যেন, তার সমস্ত দাবি মেটাতে বাধ্য। ছেলে এখনো মায়ের কাছে থাকে না, ভোলা ঘোষ চোখ বুজতে মা ছেলেকে নিজের কাছেই রাখতে চেষ্টা করেছিল। ছেলে রাজী হয়নি।

মা তাকে বোঝায়, কাঁদে, বকাবকি করে। টাকা দিতে চায় না। কোথাও এক একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে সুবোধ বালকের মত ছেলে দিনকতক মায়ের আশ্রয়ে থাকে। কিন্তু ছেলের কল্যাণেই তার এই নিরাপদ আস্তানার খবর জানতে বাকি নেই কারো। তারা এই বাড়িতে এসে হামলা করে, শাসায়। মা ছেলেকে তখন বুক দিয়ে আগলে রাখে, ছেলের হয়ে কাকুতিমিনতি করে, তাদের হাতে টাকা গুঁজে দেয়, কখনো বা চোখ রাঙায়, ঝগড়া করে তাদের সঙ্গে।

ছেলের প্রতিও কঠিন হতে চেষ্টা করে সে। বলে তুই অধঃপাতে গেছিস, তুই এই করেছিস, ওই করেছিস—আর তোকে এক পয়সাও দেব না। কিন্তু ছেলে নির্দ্বিধায় তার বাক্স ভাঙে, আর তারপরেও না পেলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে দিনকতক। তাতেই কাজ হয়, সেই ক'দিন মায়ের নাওয়া-খাওয়া বন্ধ। ওই ছেলের কথা অ্যাটর্নীকে সবই বলে গিয়েছিল ভোলা ঘোষ, তার মা-ও আসে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পরামর্শ করতে। কিন্তু এমন অবুঝ অন্ধ স্নেহ দেখে মায়ের ওপরেই বিরক্ত হয় অ্যাটর্নী।

একদিন একটা খবর শুনে পাথর মঞ্জরী দেবী।

এক গুরুতর অপরাধের জন্য ছেলেকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে।

ধরা পড়ার আগে দিশেহারার মত জয়ন্ত মায়ের কাছে এসেছিল। শুধু বলেছিল, কেউ এসে খোঁজ করলে তুমি বলবে ওমুক দিনটা সমস্ত দিন সমস্ত রাত আমি তোমার কাছে ছিলাম—।

জয়ন্ত সেই দিনই ধরা পড়েছে।

কোর্টে কেস উঠেছে। পরিচিত অ্যাটর্নী জয়ন্তর সপক্ষে যে উকীল ঠিক করেছে, সে যে কি বলে গেছে, কি শিখিয়ে পড়িয়ে গেছে, মঞ্জরী দেবীর হুঁশ নেই। সে নির্বাক স্তব্ধ।

আসামীকে দেখিয়ে তাকে জেরা করা হয়েছে, এ আপনার ছেলে?

সেদিকে তাকায়নি মঞ্জরী দেবী, বিচারকের দিকেই চেয়েছিল। মাথা নেড়েছে। তারপর স্পষ্ট করে বলেছে, না।

কানে যেন একটা বোমা ফেটেছিল জয়ন্তর। সে বিশ্বাস করতে পারেনি কি শুনছে।

এবারে বিস্মিত বিচারক স্বয়ং জিজ্ঞাসা করেছেন, এ আপনার ছেলে নয়?

না।

আপনার ছেলে আছে?

না।

ওই ছেলেটিকে আপনি চেনেন?

চিনি। মাঝে মধ্যে সাহায্য করতুম।

ওমুক দিন সমস্তক্ষণ সে আপনার বাড়িতে আপনার কাছে ছিল?

ছিল না।

বিচারে সাত বছরের জেল হয়েছে জয়ন্তর। বিচারকের রায় তার কানে গেছে কিনা সন্দেহ—নির্বাক বিস্ময়ে সে শুধু তাব মাকে দেখছিল।

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে মঞ্জরী দেবী বিশ্বাস করতে চাইছে, কোথাও খুব বড রকমের ভুল হয়ে গেছে একটা। আসলে তার ছেলে নেই।

ষোল বছরেব বীথি নামে এক মেয়ে সমস্ত সত্তা দিয়ে শুধু মা হতে চেয়েছিল।

ছেচল্লিশ বছরের এক মঞ্জরী দেবী সমস্ত সত্তা ক্ষয় করে শুধু মাতৃত্ব ভুলতে চেষ্টা করবে।

স্নেহ

বড়দিকে সর্বরকমে বড় মেনে নিয়েছে বোনেরা। আরো বড় মনে হয় তাকে, কারণ অত বড় হয়েও ছোট বোনেদের প্রতি তার অকৃপণ স্নেহদৃষ্টির রকমফের কখনো হয়নি। কারো কোনো পরামর্শ চাই, উপদেশ চাই—বড়দি আছে ভাবনা কি, ফোন করো বড়দিকে, বা শ্যামবাজার থেকে হোক বাগবাজার থেকে হোক অথবা টালিগঞ্জ থেকে হোক, চলে এসো বড়দির কাছে। বড়দি পরামর্শ দিলে নিশ্চিন্ত।

কোন বোনের বাড়িতে অপ্রীতিকর বা অভাবিত কিছু ঘটেছে শুনলে আর এক বোন এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে, বড়দিকে জানিয়েছিলি? বা বড়দিকে বলিসনি কেন? ভগ্নিপতিরাও এই ভক্তিশ্রদ্ধার বিপথে যায়নি। অফিসের ব্যাপারে তারা ওপরওয়ালাকে যে চোখে দেখে, পারিবারিক ব্যাপারে তারা বড়দিকেও সেই চোখেই দেখে।

মাসের মধ্যে দুই-একবার অন্তত সব বোনেরা এসে বড়দির বাড়িতে মেলে। জমজমাট আসর বসে তখন। পাছে বড়দি বিরূপ হয় সেই আশঙ্কায় ভগ্নিপতিদের একটু সজাগ থাকতে হয় তখন। কারণ বোনেরা তখন অনেক সময় আড়ি করেই যায় যার কর্তার বিরুদ্ধে কল্পিত বা অপ্রত্যাশিত অভিযোগ আবিষ্কার করে বড়দিটিকে বিচারের আসনে টেনে আনে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের অভিযোগ নিছক মানকলির ব্যাপার। বড়দি খুশি হতে পারে ভেবেও এই প্রহসনের অবতারণা হয়।

বড়দি কোন ভগ্নিপতিকে বলে, এ কিন্তু অন্যায় তোমার, কাউকে বা বলে, সংসারের শান্তি গেলে তো সব গেল, একটু বুঝে চলতে হয়। ভগ্নিপতিরাও কিছুটা চালাক হয়েছে আজকাল, আবেদনের সুরে প্রতিবাদ জানায় অনেক সময়, বলে, বোনের হয়ে আপনি বলছেন বড়দি বলুন, কিন্তু আপনার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দেখলে আমাদের সব থেকে বেশি কষ্ট হবে।

ওতেই কাজ হয়। আর একফাঁকে বড়দি সেই বোনকেই একটু বকে-ঝকে ভগ্নিপতিকে বুঝিয়ে দেয় যে সে পক্ষপাতিত্ব করার লোক নয়।

বোনেদের মধ্যে সব থেকে ছোট শোভনা। তাকে কিছুটা তরলমতি বলেই জানে সকলে। তার মতির যে ঠিক নেই সেই জলজ্যান্ত প্রমাণ তার ঘরেই। এই গোছের আত্মীয় সমাবেশে অনেক সময় হেসে ওঠে সে, আর তক্ষুনি সকলে বুঝে নেয় এবারে কিছু ফোড়ন কাটবে ও। কিন্তু তার সাহসও, এক-একসময় ওই বড়দিকে নিয়েই পড়ে ও। বলে, বড়দিকে মিনিস্টার হলে মানাত, পারিবারিক মন্ত্রী, নিদেনপক্ষে ডাইরেক্টর—ডাইরেক্টর অফ হোম অ্যাফেয়ারস!

মেজাজ প্রসন্ন থাকলে সকলের সঙ্গে সুরুচি অর্থাৎ বড়দিও হাসে। ছদ্মকোপে চোখ রাঙায়, মারব এক থাপ্পড়, আমি মিনিস্টার বা ডাইরেক্টর হলে তোর সব থেকে বেশি দুর্গতি হত—তোর ওই অকর্মণ্য ছোঁড়াকে আন্দামানে লাঙল চাষ করতে পাঠাতাম। একদিন এর থেকেও কঠিন ঠাট্টা করেছিল, বলেছিল, তোদের ডাইরেক্টর তো হয়েই আছি, মণিকে একবার পাঠাস আমার কাছে, কানটা মুলে দেব, একটা ছেলে আছে একটা মেয়ে আছে, তাদের সামলাবার নাম নেই—আবার তার উপর আর এক মেয়ে! জ্ঞান-গম্যি আর হবে কবে!

মাস ছয় আগে শোভনার তৃতীয় সন্তান হয়েছে, তাও আবার মেয়ে। বড়দি তার অসাক্ষাতে অন্য বোনেদের কাছে এই প্রসঙ্গে অনেক আক্ষেপ করেছে, বলেছে, ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে, ওর জন্য এক-একদিন রাতে আমার ঘুম পর্যন্ত হয় না। যেমন বুদ্ধি তেমন তো কপালে হবে, কত বারণ করলাম, গোঁয়ারতুমির ফল বোঝ এবার।

অন্য বোনেরা চিন্তিত মুখে সায় দিয়েছে। ছেলেপুলে হবার ব্যাপারেও আগে বড়দির সঙ্গে পরামর্শ না করে নেওয়াটা যে অন্যায় হয়েছে এটাই যা মুখ ফুটে বলতে পারেনি।

বড়দি আরো বলেছে, আসুক মণি একবার, আচ্ছা করে ধুইয়ে না দিয়েছি তো —একি ছেলেখেলা নাকি!

কিন্তু সরাসরি শোভনাকে ঠেস দেওয়া সেই প্রথম। কান মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল শোভনার। ভগ্নিপতিরা আড়ে আড়ে তাকে দেখেছে আর মুখ টিপে হেসেছে। তিন ছেলেমেয়ের মা হলেও এই মুখখানা লোভনীয় লেগেছে তাদের।

কিন্তু এ-রকম কথা বড়দিই শুধু বলতে পারে। মেজাজ চড়লে এর থেকে অনেক বেশিও বলতে পারে। তখন আর বোন ভগ্নিপতি বলে খাতির নেই। ফিরে একটি কথাও বললে ওই মেজাজ আরো রুক্ষ হবে। সেটাই বরং শঙ্কার কারণ। বড়দি ব্লাড প্রেসারের রোগী। মেজাজের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও চড়ে, আর চোখ থেকে রাতের ঘুম উবে যায়। একটু ঘুমের জন্য অনেক সময় অনেক পয়সা খরচ করতে হয় বড়দিকে।

তাছাড়া বড়দির মেজাজও যে তাদের ভালোর জন্যেই চড়ে সেটা বোনেরা অন্তত নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে। সেজ বোন আর ন'বোন তো এই রাশভাবী বড়দির কল্যাণেই আজ সুখে ঘরসংসার করছে। সেজ বোন সুকৃতির স্বামী ওকালতি করে মাসে দু'শ টাকাও ঘরে আনতে পারত না। ওদের বড় সংসারে তাই খটাখটি লেগেই ছিল।

মুখ বুজে থেকে সুরুচি কিছুকাল বোনের কষ্ট দেখল। তারপর ব্যবস্থা করল। নিজের স্বামীকে বলে কয়ে বড় একটা কোম্পানীর ল' অফিসার করে দিল তাকে। কিন্তু বিনা শর্তে নয়। বোনকে নিয়ে ভগ্নিপতিকে আলাদা বাড়িতে থাকতে হবে এবং বোনকে সুখে রাখতে হবে।

সুকৃতির স্বামী সানন্দে এই শর্তে রাজি হয়েছিল।

ন'বোন সুমতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ বড়দির কাছে। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর ঘরে বিয়ে হয়েছিল তার। কিন্তু শ্বশুর চোখ বুজতে অন্য ভাইদের সঙ্গে খাওয়া-খাওয়ি লেগে গেল। তার কারণ বোধ হয় বাপের বর্তমানে নিজের স্বার্থটা সে একটু বেশি দেখত। তখন সুমতি বাধা দিত বলে সুমতির সঙ্গেও তার তেমন বনিবনা হত না। কোর্টে কেস উঠল, এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ওদিকে কেস চলে না, এদিকে সংসার চলে না।

বড়দির কাছে এসে ভেঙ্গে পড়ল সুমতি। সুরুচির স্বামী তখন দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যবসায়গত সফরে য়ুরোপে ঘুরছে। তবু বোনকে নিরাশ করেনি সে। নিজের গয়না ভেঙ্গে ক্রমে ক্রমে এগারো হাজার টাকা সে বোনের হাতে তুলে দিয়েছে। বলেছে, তোর জামাইবাবু কখনো না জানে, সে এসব পছন্দ করে না। সেই টাকায় একদিকে কেস চলেছে, অন্যদিকে খুব ছোট করে নতুন ব্যবসার পত্তন করেছে সুমতির স্বামী। আজ তার মোটামুটি সচ্ছল সংসার। আর সেই থেকে সুমতি যেন স্বামীর নাকে অনুশাসনের দড়ি পরিয়ে রেখেছে একটা।

দরকারে সব বোনকেই দরাজ হাতে সাহায্য করে থাকে সুরুচি। কোনো বোনের বাড়িতে অসুখ-বিসুখ শুনলে বড় ডাক্তার নিয়ে বড়দি এসে হাজির হবে, এবং বড়

ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে অব্যবস্থার জন্য বকাবকি করতেও ছাড়বে না। আবার কারো বাড়িতে অন্নপ্রাশন অথবা অন্য কিছু উৎসব উপস্থিত হলে সব থেকে দামী উপহার যে বড়দিই নিয়ে আসবে সেটা সকলেই জানে।

আত্মীয় পরিজনের বড় ভাগ্য অনেক সময় ঈর্ষার কারণ হয়, কিন্তু বড়দির এই বড় ভাগ্যকে কেউ ঈর্ষাও করে না।

বোনেদের মধ্যে বয়েসকালে বড়দিই সুন্দরী ছিল সব থেকে বেশি। বড় এঞ্জিনিয়ার চাকুরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। সেই জামাইবাবু আকাশছোঁয়া বড় হয়েছে এখন। বিয়ের আগেই কয়েকবার বিদেশে গিয়েছিল, এখন তো তার দিল্লী বোম্বাই ইংল্যাণ্ড আমেরিকা জার্মানী করে বেড়ানোটা শ্যামবাজার বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ করে বেড়ানোর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরেব মধ্যে ক'টা মাস কলকাতায় থাকে বা কোথায় কখন থাকে, বোনেরা ভালো করে খবরও রাখে না। এই জামাইবাবুটি পুরোদস্তুর সাহেব মানুষ, স্বল্পভাষী—বোনেরা বা ভগ্নিপতিরা রীতিমত সমীহ কবে তাকে। কখনো-সখনো দেখা হয়ে গেলে তটস্থ হয়। বাড়িতে থাকলেও তার সঙ্গে দেখা কমই হয়, বিশাল বাড়ির আর এক মহলে সে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এক মস্ত ম্যানেজিং এজেন্ট ফার্মের কর্ণধাব এই ভগ্নিপতি, তার অধীনে অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানী। এমন সফল মানুষের কি-বা দিন কি-বা রাত্রি—সর্বদাই কাজ তাব।

দাসদাসী চাকরবাকর নিয়ে নিজস্ব এই বড়দির রাজত্ব। ছেলেপুলে নেই। তাই বোনেদের সংসারেব খবরদারী করার সময়ের অভাব তার হয় না। নিজের খরচে সব বোনেদের বাড়িতে টেলিফোনের ব্যবস্থাও সে-ই করে দিয়েছে। একটু দরকার হলেই বা একটু পরামর্শের প্রয়োজন হলেই বোনেদেব ছুটে ছুটে আসতে কষ্ট হয়, সেই কষ্টের লাঘব হয়েছে।

কিন্তু এই বড়দির এবং ফলে অন্য বোনেদেরও সব থেকে বেশি মুশকিল হয়েছে ছোট বোন শোভনাকে নিয়ে। সুরুচির ধারণা, গোঁয়াবতুমি করে ও নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল দিয়েছে। সকলের ছোট এই বোনকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসত সুরুচি। ওর দশ বছর বয়সে মা মারা যায়। সুরুচি ওর থেকে পনের বছরের বড়। তাই স্নেহটা স্বভাবতই তার ওপর বেশি ছিল।

তাদের সকলের বিয়েই বাবা নিজে দেখেশুনে দিযে গেছেন। শুধু শোভনার ছাড়া। বলতে গেলে সকলের অমতেই সে ওই অযোগ্য ছেলেটাকে বিযে করেছে। রকে বসে থাকা বাউণ্ডুলে ছোঁড়া একটা, কেউ সুনজরে দেখেনি কখনো। বি-এটা কোন রকমে পাশ করেছিল অবশ্য, আর ভালো গানও করত একটু-আধটু।

বি-এ পাস করে দিগগজ হয়ে শোভনার পিছু নেওযা ধরেছিল। শোভনা তখন সবে ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে। বেণী দুলিয়ে কলেজে যেত আসত। চোখ মুখ লাল করে ওই ছোকরা অর্থাৎ মণীশের নামে বাড়িতে নালিশ করেছিল সে। বড়দি তখন রোজই বাপের বাড়িতে আসত। সব শুনে সে-ই একদিন মণীশকে রাস্তায় ধরেছিল এবং নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছেড়েছিল।

কিন্তু এর পর দু'বছরের মধ্যে সরুচিব কানে এসেছে শোভনা ওই ছেলেটার

সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করে। অন্য বোনেরা অনেকবার হাতেনাতে ধরেছে ওদের। কোনদিন সিনেমায় দেখেছে, কোনদিন বা লেকে। শুনে বড়দি যাচ্ছেতাই করে বকেছে শোভনাকে, তার বাবাও মেয়ের জন্য চিন্তিত হয়েছেন।

বি-এ পরীক্ষা দিয়েই শোভনা ঘোষণা করেছে মণীশকে বিয়ে করবে। মণীশ তখন একটা বিলিতি ফার্ম-এ দু'শ টাকা মাইনেব চাকুরে—গানবাজনা চুলোয় গেছে। ভবিষ্যৎ বলতে গেলে অন্ধকার।

বাবাও তখন সুরুচির কথায় ওঠেন বসেন। তাঁর চিন্তার ভার লাঘব করার জন্য সুরুচি শক্ত হাতে হাল ধরতে চেষ্টা করেছিল। শোভনাকে বকাবকি করেছে, আবার বোঝাতেও চেষ্টা করেছে, ওসব ভালবাসা-টাসা কিছু নয়, মাঝখান থেকে হাড় কালি হবে শুধু, তোর খুব ভালো বিয়ে দেব আমি, দেখিস।

শোভনা বড়দির পা জড়িয়ে ধরেছিল একদিন, কেঁদেছিল—বলেছিল, আমি অন্য জায়গায় বিয়ে কবলে একটা লোক আত্মঘাতী হবে বড়দি, যা অদৃষ্টে আছে হবে, তোমরা ওখানেই বিয়ে দাও। শুনে মন ভেজার বদলে বড়দিব আরো দ্বিগুণ রাগ হয়েছিল। কিন্তু শেষে অনুনয় অনুরোধ ছেড়ে বেঁকে বসল শোভনা এবং একদিন সকলে জানল রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে তাবা।

সেই থেকে বড়দি মনে মনে অসন্তুষ্ট শোভনাব ওপব, তার থেকে বেশি অসন্তুষ্ট মণীশেব ওপর। কিন্তু এত আদরের ছোট বোন, তাকে আর ফেলে কি করে। নিজে দাঁড়িয়ে যাগযজ্ঞ কবে আবার বিয়ে দিয়েছে ওদেব। কিন্তু আজও খেদ যায়নি তার, যাবেই বা কি কবে, এতদিনেও মণীশ সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিন শ' টাকা মাইনে পায কি না সন্দেহ—দুরবস্থার কথা ভাবলেও সুরুচির গায়ে কাঁটা দেয।

তাব রাগের যথার্থ কারণও আছে। বিয়ের কিছুকাল পরে অনটন দেখে সুরুচি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা ভেবেছিল। আরো করা দবকাব কাবণ শোভনার প্রথম ছেলে হয়েছে তখন। ব্যবস্থা করেওছিল। চাকবি ছাড়িয়ে দু'দুবাব মণীশকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব রাস্তা দেখিয়েছিল। বছব দেড় বছরের জন্য একবার কানপুরে আব একবার বোম্বাইযে ট্রেনিং-এ পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেযানা ছোঁড়া আসলে একবারও চাকরি ছাড়েনি, ছুটি নিযে দেখতে গিয়েছিল টিকে থাকতে পারবে কিনা। পাবেনি। ফিরে এসে আবার পুরনো কাজে লেগেছে। ক'দিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছে তারপব। সুরুচির তার থেকেও বেশি রাগ হয়েছে বোনেব ওপর। ও-ই মাথাটা খেয়েছে। মণি দু'বারই তবু একটা কৈফিযত দিতে চেষ্টা করেছে, বলেছে, বনিবনা হল না বলে চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু ছদ্মরাগে শেষেব বারে শোভনা বলেছে অন্য কথা, বলেছে, বিদেশে থাকবে কি, নিজের হাতে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে জানে যে একলা থাকবে!

অন্য বোনেরা পরে এই নিয়ে হাসাহাসি করেছে। আর রাগের আড়ালে শোভনার চাপা আনন্দ আর গর্বটুকু ঠিকই লক্ষ্য করেছে সুরুচি। তাব গা জ্বলেছে, এত রাগ হয়েছে যে, এক-একসময় নিষ্ঠুর মনে হয়েছে তাকে। এই রাগের সময় কিছুদিন শোভনা বা মণীশ তার ধারেকাছেও ঘেঁষেনি।

এখন সুরুচির বদ্ধ ধারণা, তার বিরূপতার ভয়ে শোভনাই ওকে আগলে আগলে

রাখে সর্বদা। অন্য বোনেরা বা ভগ্নিপতিরাও স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়াঝাঁটি করে কত সময় কত নালিশ করে তার কাছে এসে। সুবিচার চায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত শোভনা কোনদিন একটি অভিযোগও তোলেনি, অথচ অভাব-অনটনের ফলে ওদের মধ্যেও যে খটাখটি লাগে, শোভনা এক-একসময় যে তুলোধুনো করে দেয় মণীশকে, তার দুই-একটা নমুনা হঠাৎ গিয়ে পড়ে সুরুচি নিজের চোখেও দেখেছে। তা ছাড়া অন্য বোনেরাও বলেছে। অথচ এ বাড়িতে এলে ও সন্তর্পণে এ-সব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে ওই অযোগ্য ছোঁড়াটাকেই রক্ষা করতে চেষ্টা করে যেন। তেমন বিপাকে পড়লে বড়দি ছাড়া গতি নেই, কিন্তু বিপাকের সংবাদ তাকে শুনতে হয় অন্য বোনের মারফৎ। পাছে এই নিয়ে আবার মণীশকে কথা শোনায় বড়দি এই ভয়েই নিজে বলে না নিশ্চয়। ফলে সুরুচির দ্বিগুণ রাগ হয়, সে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে বটে, কিন্তু বকাবকি বা কটূক্তি করতেও ছাড়ে না।

এই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সামান্য একটু পরিবর্তনেব সূচনা দেখা গেল একদিন। পবিবর্তনটা সুরুচির কাছে সামান্য কিন্তু শোভনার কাছে অসামান্য।

মণীশ যে ফার্মে কাজ করত তার মালিকানা বদল হল একদিন। যে ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনে এলো তার সর্বাধিনায়ক মিস্টার অবনী চৌধুরী, অর্থাৎ বড়দির স্বামী। শুনে শোভনা পুলকে রোমাঞ্চিত, মণীশ আশান্বিত। অন্য বোনেদেরও ধারণা, এই মুরুব্বির জোরে এবারে মণীশের ভাগ্য ফিরে যাবে।

কিন্তু বড়দিকে একেবারে নীরব দেখে শেষে অন্য বোনেরাই একদিন তার কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করল, মণির একটা কিছু করে দাও বড়দি, শোভাটার সত্যি বড় কষ্ট।

সুরুচি রেগে গেল, ওর কষ্ট দেখলে আমার থেকে বেশি লাগে তোদের? কিন্তু করব কার জন্যে, অমন বি-এ পাস তো আজকাল রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাও যদি একটু চালাকচতুর হত।

বোনেরা চুপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোভনা নিজেই পারল না চুপ করে থাকতে। মণীশকে নিয়েই একদিন বড়দির কাছে ধরণা দিল। অভিমান করে বলল, তোমাকে যে আবার মুখ ফুটে বলতে হবে বড়দি ভাবিনি।

সুরুচি মণিকে দেখেই হয়তো আরো চটেছে। আগুন হয়ে বলল, বড়দি কি গাছ যে ধরে নাড়া দিলেই পড়বে কিছু?

শোভনা অপ্রস্তুত। তবু আব্দারের সুরে বলল, এতদিন তো পড়ছিল। ও-সব জানি না বড়দি, জামাইবাবুকে বলে যা-হোক কিছু সুরাহা করো, আর না করো তো জামাইবাবু কবে আসবে বলো, আমিই বলব।

চুপচাপ দু'জনকেই সুরুচি দেখল একটু, তারপর জবাব দিল, তাহলে আর আমার কাছে এসেছিস কেন, বলগে যা না—এখানেই আছেন।

শোভনা আঁতকে উঠল।—ও বাবা, যে গম্ভীর, সামনে এলেই বুক কাঁপে। শালীর সঙ্গে লোকে কত আনন্দ করে, আমাদের অদৃষ্ট কিছুই জুটল না। আমার দ্বারা হবে না, তুমিই বলো বড়দি, আত্মীয়ের জন্য করবে না কেন?

সুরুচি মণীশকে শুনিয়েই ঠেস দিল, যোগ্যতা থাকলে করত, এসে বলতেও হত না। আত্মীয় বলে তাঁর প্রেস্টিজটা তো ধুলোয় গড়াগড়ি যাবার জিনিস হয়।

শোভনা চুপ। মণীশের মুখ শুকনো।

সুরুচি আড়ে আড়ে খানিক দেখল দু'জনকেই। ভুরুর মাঝে কুঞ্চনরেখা পড়েছে, ভাবছে কিছু একটা। ঈষৎ রুক্ষ চোখে হঠাৎ মণীশের দিকে ফিরল সে, ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, সুযোগ যদি পাও যোগ্যতা নিয়ে এসে দাঁড়াতে পারবে?

শোভনা বা মণীশ কিছুই বুঝল না, সশঙ্কে চেয়ে রইল শুধু।

শুরুচি বলল, কোম্পানীর খরচায় তোমাকে বিলেত পাঠানো যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে পারি। দু'তিন বছর সেখানে থেকে কিছু একটা ভালো ট্রেনিং নিয়ে আসতে পারলে তখন আব কিছুতে আটকাবে না। এদিকের সংসারখরচের ভাবনাও তোমাকে ভাবতে হবে না। যাবে?

মণীশ লাফিয়ে উঠল একেবারে। বিলেত! সে-যে স্বপ্নের ব্যাপার। উদ্দীপিত, উত্তেজিত। শোভনাও তাই। মণীশ একেবারে পায়ের ধুলো নিল সুরুচির। শোভনা বলে উঠল, পাববে না কেন, দু'তিন বছর আর ক'টা দিন।

আনন্দে আটখানা দু'জনে খানিকক্ষণ। কিন্তু সুরুচি গম্ভীর। চেয়ে চেয়ে দেখছে দু'জনকেই। বলল, উনি এখন ব্যস্ত খুব, তিন চার দিনেব মধ্যেই বলে যা-হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। মণীশের দিকে ফিরল, তুমি প্রস্তুত থেকো, ওঁকে বলা হলে ফোন করে জানাব।

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কমতে সুরুচিব কোমন মনে হল, বোনের মুখখানা এরই মধ্যে কেমন একটু চিন্তাচ্ছন্ন লাগছে। তারা চলে যাবার পরেও সে চুপচাপ বসে রইল খানিক। কি এক চাপা রোষে দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক।

সুযোগের প্রতীক্ষায় দুটো দিনই কেটে গেল বটে। তৃতীয় দিনে মিস্টার চৌধুরী হঠাৎ বিকেলেই বাড়ি ফিরল। ভারী জুতো মশমশ করে সুরুচিব ঘরে ঢুকল। আলমাবী খুলে সুরুচি কি একটা করছিল, তাড়াতাড়ি ফিবে দাড়াল।

বলতে ভুলে গেছি, একটা পার্টিতে যেতে হবে, এক ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নাও।

অস্ফুট স্বরে সুরুচি বলতে চেষ্টা কবল, আমার শরীবটা তেমন...

ড্যাম ইট! বিরক্তিতে ঝাঁঝিয়ে উঠল অবনী চৌধুরী, এই শরীর তোমার আছে কেন? ইয়েস অর নো—যাবে কি যাবে না?

পাংশু মুখে সুরুচি বলল, যাচ্ছি...।

গট গট করে চলে গেল মিস্টার চৌধুরী। সেদিকে চেয়ে সুরুচির দুই চোখ খরখরে হয়ে উঠল। সাজসজ্জা কবে চিরাচরিত হাসিখুশি মুখেই বাইরের আভিজাত্য রক্ষা করে এল সে। একা ফিবল। মিস্টাব চৌধুরী সেখান থেকে অন্য কি কাজে গেছে।

সে ফিরল রাত ন'টায়। এত তাড়াতাড়ি ফেবে না সাধারণত। সোজা নিজের মহলের দিকে চলে গেল সে। সুরুচি প্রস্তুত হচ্ছে।

আধ ঘণ্টা বাদে পায়ে পায়ে এগলো সেদিকে। আর দেরি করলে সুযোগ হারাবে। ওদিকের বারান্দার টুলে বেয়ারা বসে। সে উঠে দাঁড়াল।

খুব মৃদু গলায় সুরুচি জিজ্ঞাসা করল, সাহেব একা আছেন?

আগে এ প্রশ্ন করতে মাথা কাটা যেত। আর কার থাকা সম্ভব বেয়ারাও জানে। এই বাড়িরই ওপাশের ফ্লাটে থাকে মিসেস উইলসন—প্রাইভেট সেক্রেটারী। মাঝের দরজা খুলে দিলে এক বাড়ি। মিস্টার চৌধুরী কলকাতায় বা বাড়িতে থাকলে ওই দরজা প্রতি রাত্রিতেই খোলে। দীর্ঘ অবকাশ বিনোদনে কোনরকম ব্যাঘাত ঘটে না।

কিন্তু ব্যাঘাত মাঝেসাজে সুরুচিই ঘটায়। কিছু আদায় করতে হলে এই একমাত্র সময়, মিসেস উইলসন আসার আগে। সুরুচির উপস্থিতি তখনই সব থেকে বেশি অবাঞ্ছিত।

বেয়ারা মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ একাই আছেন। বল সংগ্রহ করে ভারী পরদা ঠেলে সুরুচি ঘরে ঢুকল। হুইস্কির বোতল গেলাস নিয়ে বসেছে মিস্টার চৌধুরী—এটা নিয়মিত অভ্যাস। তাকে দেখে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, হোয়াই নাউ?

একটু দরকার ছিল...

কুইক! অ্যাণ্ড লিভ মি অ্যালোন—

মণিকে বিলেতে পাঠিয়ে ভালো একটা ট্রেনিং—ট্রেনিং কিছু—

হ্যাঙ ইট অল! বিরক্তিতে সমস্ত মুখ বিকৃত, যত সব বাজে ব্যাপার নিয়ে কেন আস এই সময়? যাও এখন—

সুরুচির পা দুটো কাঁপছে একটু একটু, কিন্তু গোঁ ধরে দাঁড়িয়েই রইল। তাই করে থাকে। বলল, আর বলার সময় কখন পাব, আমি কথা দিয়ে ফেলেছি তুমি পাঠাবে, তোমার প্রেস্টিজ রাখার জন্যেই বলতে হয়...

অল রাইট! নাউ গেট আউট—

সাহেব মানুষ, কথা দিলে কথা রাখে। সুরুচির এবার পালাবার কথা। পা নড়তে চাইল না তবু। পাংশু মুখে বলল, আমি এলেই এভাবে তাড়াও কেন?

হাতের গেলাসটা টেবিলে ঠুকে মিস্টার চৌধুরী গর্জন করে উঠল, উইল ইউ গো নাও?

বিবর্ণ মুখে সুরুচি দ্রুত প্রস্থান করল। আগে দুই একদিন এই আদেশও অমান্য করে দেখেছে। গ্লাসের মদের ঝাপটা সজোরে মুখে চোখে এসে লেগেছে। ওপাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে কেউ তাকে দেখুক চায় না বলেই এই রাগ আর এই অসহিষ্ণুতা। এ-সময়ের প্রার্থনাও মঞ্জুর হয় শুধু এই কারণেই।

নিজের ঘরে ফিরে সুরুচি হাঁপাতে লাগল। দু'চোখ জ্বলছে ধকধক করে। টেলিফোনের কাছে গিয়েও অস্থির পায়ে এ-ধার ও-ধার করল বার-দুই। এই অজ্ঞাত আক্রোশ যেন আরো বাড়তে লাগল। এক্ষুনি জানাবে শোভনাকে, এক্ষুনি খবরটা দেবে।

রিসিভার তুলে ডায়েল করল, হাত কাঁপছে। নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়েছে।

আঃ! বিরক্তির একশেষ সুরুচির। রং নাম্বার ডায়েল করছে। রিসিভার রাখলো।

আবার তুললো। আবার ডায়েল করলো। এবারে দ্বিগুণ বিরক্তিতে রিসিভারটা আছড়ে ফেলল ফোনের ওপর। লাইন এনগেজড।

কিন্তু সুরুচি দাঁড়াতে পারছে না। কি যেন একটা হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। অজস্র বৃশ্চিক দাহনে জ্বলে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। আজ আর হল না ফোন করা। জ্বালাপোড়া বাড়ছে আরো। দ্রুত পায়ে সুরুচি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ওধারের একটা খুপরি ঘরে গিয়ে ঢুকল। এ-ঘরটার খবর বাড়ির কর্তা রাখে না। এটা সুরুচির ঠাকুরঘর—মাস ছয় হল সংগোপনে এই ঠাকুরঘর করেছে সে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে পটের সামনে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। তারপর পাগলের মত মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগল।—রক্ষা করো, রক্ষা করো ঠাকুর, এই ঈর্ষার আগুন থেকে আমাকে রক্ষা করো—আমি ওদের বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছি, ওদেব তফাত করে দিতে চেয়েছি—ওদের মঙ্গল হোক, ওদের ভলো হোক।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঠাণ্ডা হল সুরুচি। ঠাকুরের পায়ে অপরাধ নিবেদন করে হাল্কা বোধ করল একটু।...কাল ফোন করবে ওদের, কাল ফোন করে শোভনাকে বলে দেবে, বিলেত যাওয়া হল না মণির, ব্যবস্থা করা গেল না।

পরদিন।

সকালেই মণি আর শোভনা এসে হাজির। সুরুচি অবাক একটু। শোভনার মুখ শুকনো, মণির মুখের অবস্থাও কেমন দ্বিধা-বিড়ম্বিত, ফ্যাকাশে।

এ সময়ে এলি?

শোভনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি জামাইবাবুকে কথাটা বলেছ নাকি বড়দি?

কি কথা?

ঢোক গিলে শোভনা বলল, ওর বিলেত যাওয়ার কথা?

কেন? নিজের অগোচরে দু'চোখ খরখরে হয়ে উঠল সুরুচির।

যাওয়া হবে না বড়দি, তুমি বোলো না, আমাদের অদৃষ্টে সুখ নেই...

রুক্ষ কণ্ঠে সুরুচি বলল, এ কি ছেলেখেলা পেয়েছিস নাকি?

শোভনা তাড়াতাড়ি তার পায়ে হাত দিয়ে বলল, রাগ কোরো না বড়দি, এবারের মত ক্ষমা করো, ওই মুখের দিকে চেয়ে দেখ, পর পর তিন রাত ঘুমোয়নি, এক-একজনেব এই বকম রোগ আছে, কি করব বলো—

গত রাতের প্রার্থনার কথা এই কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ভুলে গেছে সুরুচি। তার দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে আবার। শুধু মণীশের নয়, দু'জনের মুখের দিকে চেয়েই সে রোগ দেখলে কয়েক মুহূর্ত। তারপর চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করল যেন। অস্ফুট স্বরে বলল, আচ্ছা যা—

নিজেই দ্রুত ঘর ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে। বড়দির এই মূর্তি দেখে ওরা দুজন বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিক।

ওরা জানে না বড়দি কোথায় গেল। ওরা জানে না বড়দি গত রাত্রির মতই ঠাকুরঘরে মাথা খুঁড়তে গেল।

ভীষ্ম

ভগবানের সঙ্গে সাবিত্রীর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক পুরাণে না লিখলেও কলিযুগের বোম্বাই শহরের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে লেখা আছে। মাঝে মাঝে সেটা ছিড়ি-ছিড়ি হয়, আমাদের ম্যানেজিং বিশারদ ভগবান শর্মাই তখন পরিস্থিতি ম্যানেজ করে। মাঝে মাঝে আমরাই ওর জন্যে উতলা হই, সাবধানও করি, একটু বুঝেশুনে চলতে পার না, করে দেখবে অফিসেই ডাইভোর্স নোটিস এসে হাজির হয়েছে।

ভগবান শর্মা হাসে। সেই হাসি দেখলে কারো মনে হবে না দুনিয়ার কেউ এই শর্মাকে বিপাকে ফেলতে পারে। সাবিত্রী শর্মা বড়লোকের মেয়ে হলেও মেয়ে তো বটে। নইলে ভগবান তাকে একেবারে স্বামী স্ত্রীর বাস্তবে টেনে এনে সঙ্কল্প পালন করল কি করে? বিয়ের পরে অবশ্য সাবিত্রীর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। হয়েছে যে সেটা তার স্বামী-সম্বোধন থেকেই বোঝা যায়। সে তাকে অকর্মণ্য বলে, অপদার্থ বলে, শ্যালো অর্থাৎ অগভীর সারশূন্য বলে। আমাদের সামনে বলে না অবশ্য, এসব মুখরোচক সংবাদ স্বয়ং শর্মাই আমাকে দিয়েছে। হেসে আটখানা হয়ে বলেছে, ও এখন ভাবে আমি ওকে ভাঁওতাবাজী করে বিয়ে করেছি। আসলে মেয়েরাই যে মাইনাস গ্রে ম্যাটার, সে আর মুখের ওপর বলি কি করে বল?

শুধু মেয়েরা নয়, একমাত্র নিজেকে ছাড়া দুনিয়ার সকলকেই মনে মনে মাইনাস গ্রে ম্যাটার ভাবে ভগবান শর্মা। সেটা বুঝেও আমরা পারতে ঘাটাই না ওকে। কাউকে বিপাকে ফেলা বা জব্দ করার ব্যাপারে শর্মার জুড়ি নেই। সংকটমোচনেও না। খবরের কাগজের অফিসের অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে তার দুটো নাম। এক, দি গ্রেট ফিক্সার, দুই, গ্রেট ম্যানেজার। সর্বদাই সে কাউকে বা কারো জন্যে কিছু একটা ফিক্স করছে অথবা ম্যানেজ করছে। অর্থাৎ কাউকে টিট করছে বা কিছু সামাল দিচ্ছে। আর সেটা যে সে অনায়াসে করতে পারে, সেই প্রমাণ সহকর্মীরা বহুবার পেয়েছে। শর্মাকে জব্দ করতে পারলে বা উল্টে কেউ তাকে টিট করতে পারলে মনে মনে প্রচণ্ড খুশি হয়, তার অন্তরঙ্গজনদের মধ্যেও এই সংখ্যা খুব কম নয় বোধহয়। কিন্তু এই খুশির আশা কেউ প্রকাশ করে না। করলে শর্মার কৌতুক কখন যে কোন রাস্তা ধরে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত মাথায় এসে ভাঙবে, ঠিক নেই।

এই সেদিনও খিটখিটে যোশীকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। যোশীর সঙ্গে প্রায়ই খটাখটি লাগত তার। নিজে কাজ ভাল করে বলে বুক টান করে চলত, আর শর্মার কোন গলদ বেরুলে কাঠ-খোট্টা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

দিনকতক আগে শর্মা আমাকে বলেছিল, হি নিডস সাম ফিক্সিং।

বলল বটে, কিন্তু উল্টে এরপর যোশীকে একটু তোষামোদ করেই চলতে দেখা গেল তাকে। সে কাজ ভাল করে মেনে নিয়েই যেন তার কাছে দুই-একটা ভাল রিপোর্ট পরিবেশনের পরামর্শ নেয়। যোশীর হাতের দুই-একটা বাড়তি কাজও নিজেই করে দেয়। আমরা টিপ্পনী কাটলে যোশীকে শুনিয়েই বলে, কাজ যে ভাল জানে তাকে সেলাম ঠুকতে আপত্তি নেই বাবা।

এরপর একদিন শহরের ব্যবসার অঞ্চলে যোশীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা তার। যোশীর মুখ শুকনো, চুল উসকো-খুসকো। কি এক ব্যবসা-সংক্রান্ত চুক্তির ব্যাপার বুঝতে সেই সাত-সকালে বেরিয়েছিল, এতক্ষণে ছাড়া পেল। তিরিক্ষি মেজাজে বলল, সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি, গা-হাত-পা টলছে এখন। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুমি এ সময়ে এখানে যে, অফিসে যাওনি?

শর্মা বিরস মুখে জানাল, অফিসেই ছিল, বউয়ের টেলিফোন পেয়ে বেরুতে হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে তিন হাজার টাকা তুলে এক্ষুনি তাকে না দিয়ে এলেই নয়।

উড়নচণ্ডী শর্মার বড়লোক বউয়ের খবর যোশীও রাখে।

বউয়ের অবুঝপনার প্রসঙ্গ ছেড়ে বন্ধুর প্রতি সচেতন হল শর্মা, তোমার অবস্থা তো কাহিল দেখছি, না খেয়ে-দেয়ে এভাবে শরীর মাটি করলে অফিস তোমাকে স্বর্গে তুলবে?

আশান্বিত হয়ে যোশী বলল, কোথাও থেকে কিছু খেয়ে নেব ভাবছি, এখন বাড়ি গেলে আর অফিস করা হবে না।

শর্মা তৎক্ষণাৎ সায় দিল, এস, ঢুকে পড়া যাক কোথাও, আমাবও বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে।

এ ব্যাপারে শর্মার দবাজ হাত জানে যোশী। সানন্দে সঙ্গ নিল। বাজে জায়গায় যাবার পাত্র নয় শর্মা, একটা নামজাদা হোটেলেব দরজা ঠেলে ঢুকল তারা।

চর্ব-চোষ্য ভোজন হল। অল্প-স্বল্প রঙিন পানীয়ও উদরস্থ হল। বেশি চলবে না, কারণ অফিস আছে।

বিল এল। ছত্তিরিশ টাকা।

বিলটা গম্ভীর মুখে হাতে নিয়ে যাচাই করে সেটা যোশীর দিকে এগিয়ে দিল শর্মা।

যোশী যেন ভূত দেখল হঠাৎ। যা খেয়েছে পেটে থাকে কিনা সন্দেহ।

বলল, আমার কাছে তো অত নেই...

সে কি! আকাশ থেকে পড়ল শর্মা। হোটেলে খেতে যাচ্ছিলে বললে যে? তাড়াতাড়ি নিজের পার্স বার কবতে কবতে বলল, কি আছে দেখ, সর্বনাশ করেছে, এখানকার ম্যানেজারটা আবার আচ্ছা পাজী।

শর্মা নিজের ব্যাগ খুলে দেখে দু টাকা সাত আনা আছে। আর যোশীর ব্যাগে আছে তিন টাকা এগারো আনা।

যোশীব মুখ শুকিয়ে আমসি।—তুমি যে বললে বউয়ের তিন হাজার টাকা পৌছে দেবে—

কথা ছিল তো, কিন্তু দুটো বেজে গেল যে, এসে দেখি কাউণ্টার ক্লোজড। আচ্ছা ডোণ্ট ওয়ারি, আমি ম্যানেজ করছি, তুমি আর এক কাপ কফি নিয়ে বসো, আমি ট্যাক্সি করে অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসছি, আধঘণ্টায় এসে যাব।

বেয়ারার ঠিক বোধগম্য না হলেও বেশ খটকা লেগেছে। হন্তদন্ত হয়ে শর্মা ক্যাবিনের দরজা ঠেলে বেরুল। কিন্তু বাবুকে সটান ম্যানেজারের ঘরে ঢুকতে দেখে বেয়ারা নিশ্চিন্ত হল।

ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে শর্মা নিজের পরিচয় দিল। তারও দরকার ছিল না, ম্যানেজার তার মুখ ভালই চেনে। তারপর বলল, অত নম্বর ক্যাবিনে দুজন লোক এন্তার খাচ্ছে সে লক্ষ্য করেছে। তাদের মধ্যে একজনকে সে চেনে, লোকটা নিজেকে হোমরা-চোমরা ব্যক্তি বলে পরিচয় দেয় অনেক জায়গায় এবং অনেক নামের কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘোরে এমন খবরও তারা পেয়েছে। যে দুজন খাচ্ছিল তাদের একজন উঠে চলে গেছে, আর যে আছে সে-ও চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার মতলবে আছে বলে তার বিশ্বাস। তার সন্দেহ হয়েছে বলেই ম্যানেজারকে সে খবরটা জানিয়ে গেল।

ম্যানেজার তৎক্ষাণ উঠে পড়ল। আর শর্মা রাস্তায় নেমে সটান অফিসের দিকে ট্যাক্সি ছোটাল।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। থানা থেকে টেলিফোন পেয়ে আমি আর শর্মাই আবার ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যোশীকে উদ্ধার করে এনেছি। যাবার সময় শর্মা ঘটনাটা আমাকে বলেছে। আর ফেরাব সময় সমস্ত পথ সে হোটেলের ওই ম্যানেজারকে টিট করবে বলে শাসিয়েছে, কারণ অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসার সময়টুকু পর্যন্ত তার সবুর সইল না—এত অবিশ্বাসের সাজা তাকে না দিলেই নয়।

কিন্তু যোশী যেটুকু বোঝার বুঝে নিয়েছে। এখনো দুনিয়ায় এই একজনের মুখ দেখতেই তার সব থেকে বেশি আপত্তি।

এ রকম আরো অনেক কাণ্ড করেছে শর্মা। সঙ্কল্প করলে ভীষ্মের সঙ্গে আমাদের ভগবান শর্মার তফাত নেই খুব। তবে দুজনের প্রতিজ্ঞার ধরন আলাদা। যোশী তো চুনোপুঁটি, এর আগে আমাদের প্রাক্তন ডিপার্টমেণ্টাল এডিটর রাশভারী মিশ্রকে টিট করবে বলেছিল, তাও করেছে। কাজের গাফিলতি দেখে মিশ্র তাকে বারকয়েক ওয়ার্নিং দিয়েছিল।

এর পর মিশ্রকে গণ্যমান্য জনের বড় একটা পার্টিতে সসম্মানে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিল শর্মা। নামজাদা খবরের কাগজের দৌলতে পার্টির আমন্ত্রণ ইচ্ছে করলেই সংগ্রহ করতে পারে সে। রাতের ডিনার-পার্টি, পানাহারের ব্যবস্থা ছিল। শর্মার সুপটু হাতসাফাইয়ে পানের মাত্রা কতটা ছাড়িয়েছে ভদ্রলোক ঠাওর করতে পারেনি। তার গেলাস আর সহজে খালি হতে চায় না। দু পায়ের ওপর ভর করে যখন আর দাঁড়াতেও পারছে না, সেই সময় দুটি শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল শর্মা। বিভাগীয় কর্ণধারের সঙ্গে আলাপ করে তারা প্রীত হতে এল। কিন্তু একজন অচিরেই সরে গেল, মিশ্রর অসংলগ্ন অনুরোধে অপরাকে খানিকক্ষণ থাকতে হল। শেষে শেকহ্যাণ্ড করে সে-ও এক ফাঁকে বিদায় নিল। তারপর এক রকম বেহুঁশ অবস্থায় ট্যাক্সি করে মিশ্রকে বাড়ি শর্মা পৌঁছে দিল।

ঠিক দুদিন বাদে মিশ্রর নামে খামে ব্যক্তিগত চিঠি একটা। দামী কাগজে টাইপ করা চিঠি, নীচে সেই দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার নাম-স্বাক্ষর। চিঠির মর্ম, মদ খেয়ে মিশ্র যে ভাবে সকলের সামনে একজন ভদ্রমহিলাকে অসম্মান করেছে, আর যে-সব মানহানিকর কথা তাকে বলেছে, তার সমুচিত ব্যবস্থা মহিলা না করে ছাড়বে

না। পত্রপাঠ লিখিতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে সে তাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে কৈফিয়ত তলব করবে।

মিশ্রর মাথায় বজ্রাঘাত। তক্ষুনি শর্মার শরণাপন্ন হল সে। তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল পার্টিতে আমি কি করেছি বল তো? মানে, কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি?

আমতা আমতা করে শর্মা জবাব দিল, না তেমন আর কি কেন বল তো?

মিশ্র আরো নরম, কি করেছি বল না, আমার সত্যি কিছু মনে নেই। আমার কাছে কিছুক্ষণ যে মেয়েটি বসেছিল, সে অসন্তুষ্ট হতে পারে এমন কিছু করেছি? প্লীজ, তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই জিজ্ঞাসা করছি।

ইয়ে, যে যতবার ওঠার চেষ্টা করছিল তুমি ততবার তার পায়ে কাবে হাত দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছিলে আর কি আর

আর কি?

আর শেষে শেকহ্যাণ্ড করার সময় তুমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার হাতটা ছাড়নি আর তখন অন্য হাতে তার কাঁধও ধরেছিলে। যাকগে, তাতে কি হয়েছে, ওরকম হয়—

অতঃপর ঘাবড়ে গিয়ে মিশ্র পাংশু মুখে চিঠিখানাই বার করে দেখাল তাকে

পড়ে শর্মাও আতকে উঠল।—কি সাংঘাতিক মেয়ে। এই জন্যেই কাল আমার সঙ্গে দেখা হতে মুখ মচকে চলে গেল।

মিশ্র কাঁদ-কাঁদ।—এখন কি করা যায় বল?

শর্মাও চিন্তিত। তারপর চিঠি নিজের পকেটে পুরে আশ্বাস দিল, আচ্ছা আমি ম্যানেজ করছি, তুমি ভেবো না।

সেইদিনই বেরিয়ে গিয়ে শর্মা ম্যানেজ করে এল। হাসিমুখে মিশ্রকে বলল, সব ঠিক আছে, আর গণ্ডগোল হবে না। আসলে মহিলার ভাবী স্বামীও সেখানে ছিল তো, তাই ব্যাপারটা একটু গোলমেলে হয়ে গেছল।

আশ্বস্ত হয়ে মিশ্র জিজ্ঞাসা করল, আর সেই চিঠিখানা

শর্মা চটপট জবাব দিয়েছে, চিঠিটা তার সামনেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

কিন্তু এরপর শর্মার টান টান কথা শুনে মিশ্রর কি রকম সন্দেহ হয়েছে সেই চিঠি ছেঁড়া হয়নি, সেটা শর্মার কাছেই আছে। এরপর যতদিন মিশ্র ছিল এই অফিসে, ভগবান শর্মাকে আর কোনদিনও ঘটায়নি সে।

পরে জেনেছি, সেই শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার নাম মেয়েলি অক্ষরে ব্লক করতে হবে বলে সাদা কাগজে স্বাক্ষরটা নিজের স্ত্রীকে দিয়েই করিয়ে নিয়েছিল ভগবান শর্মা।

এ তো গেল কাগজের অফিসের লোকদের ফিক্স করা বা ম্যানেজ করার কথা, বাইরের লোককে জব্দ করার প্রসঙ্গ লিখতে হলে ছোটখাট একটা বই লিখতে হয়। সে-সব ছেড়ে ওর বিবাহ-প্রসঙ্গটাই আগে ব্যক্ত করা দরকার।

শর্মা আমাদের কাছে বুক ঠুকে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সাবিত্রী লাখোটিয়াকে বিয়ে করবে সে, সাবিত্রী লাখোটিয়া সাবিত্রী শর্মা হবেই হবে।

লাখোটিয়াদের বিরাট প্রাসাদে শর্মার যাতায়াত ছিল। চিত্র-প্রযোজনার দৌলতে অঢেল টাকা তাদের। বাড়িতে সর্বদা পাঁচ-সাতখানা গাড়ি মজুত। বাড়ির মালিক এবং তার দুই ছেলে ব্যবসা দিন-কে-দিন ফাঁপিয়ে তুলছে। বড় কাগজের লোক হিসেবে শর্মাকে খাতির-যত্ন করত তারা। কিন্তু কিছুদিন যাতায়াতের ফলে শর্মার বিশেষ দৃষ্টিটা ভদ্রলোকের কন্যাটির ওপর পড়েছে। তার সঙ্গেও খাতির করতে বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু শর্মা দেখে, কন্যাটিকে খাতির করার লোক আরো এক ডজন আছে। আর তারা প্রায় সকলেই শর্মার মত লোককে মাইনে দিয়ে পুষতে পারে।

বিয়ের আগেও সাবিত্রীকে আমরা দেখেছি। বাপের ছবি উদ্বোধনের দিনে বা ছবি-সংক্রান্ত বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের দিনে সেও আসত। শর্মা এমনি এক উৎসবে ঘটা করে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তার কাছে নিজের পরিচয় শুনে আমার দুই চক্ষু কপালে। শর্মা আমাকে বাংলাদেশের বর্তমানে সব থেকে সেরা লেখক বানিয়ে দিয়েছে। আর আশ্চর্য, এই পরিচয় পেয়েই সাবিত্রীকে একটু উৎসুক হতে দেখা গেছে। সাবিত্রী বাংলা জানে, বাংলা পড়ার আগ্রহেই সে নাকি স্কুল-কলেজে আগাগোড়া বাংলা নিয়ে পড়েছে। সাবিত্রী ভগবান শর্মাকে বারকয়েক অনুরোধ করেছে যেন তাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়।

শর্মার সঙ্গে গেছিও বারকয়েক। আমার ভাল লেগেছে। বেশ মিষ্টি মেয়ে। অত বড়লোক যে একটুও বোঝা যায় না।

রেস্তরাঁয় বসে মদ খেতে খেতে শর্মা একদিন আমাদের কাছে সাবিত্রীর পঞ্চমুখে প্রশংসা করছিল। তখন বলেছিলাম, কেন মিছিমিছি ওই মেয়ের পিছনে ঘুরে মরছ, জামাই করা তো দূরের কথা, ওরা তোমাকে ওদের মোটর সাফ করার কাজেও অযোগ্য ভাবে।

সুরার ক্রিয়ায় হোক বা যে কারণেই হোক, শর্মা চোখ পাকিয়ে উঠেছিল, হোয়াট! তারপরেই বুক ঠুকে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সাবিত্রী লাখোটিয়া সাবিত্রী শর্মা হবে—হবেই হবে—স্বয়ং ভগবান এসেও ভগবান শর্মাকে রুখতে পারবে না।

দিনের পর দিন গেছে এরপর, ঠাট্টা-ঠিসারায় শর্মাকে সকলে অস্থির করে তুলেছে। দু'কথার পরেই সকলে জিজ্ঞাসা করে, বিয়ের কদ্দূর? সাবিত্রী লাখোটিয়া কতখানি সাবিত্রী শর্মা হল?

শর্মার মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে, এতদিনে সত্যিই বিপাকে পড়েছে ও। কিন্তু বছর না ঘুরতে প্রচণ্ড বিস্ময় আমাদের। শর্মা বিবাহোত্তর টী-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছে আমাদের—আমন্ত্রণ-পত্রে ভগবান শর্মা এবং সাবিত্রী শর্মা দুজনেরই সোনার অক্ষরে নাম ছাপা।

অর্থাৎ বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা হতভম্ব।

বিয়ের ইতিবৃত্ত পরে শুনেছি। শোনার পর নিজের দু'কান অবিশ্বাসী হতে চেয়েছে। কিন্তু সাবিত্রী যে ওর ঘরে সত্যি এসেছে সেটা অবিশ্বাস করি কি করে?

শর্মার কেরামতি বিস্তার করলে এইরকম দাঁড়ায়:

দিনকে দিন ও নিজেও যথার্থই হতাশ হয়ে পড়ছিল। ঝোঁকের মাথায় প্রতিজ্ঞা

করে ফেলে শেষে আফসোসের অন্ত নেই। কারণ, উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টায় এগোতে গিয়ে দেখে কোন আশাই নেই। যারা সাবিত্রীকে আগলে আছে, তাদের তুলনায় ওর অস্তিত্বই নেই। সত্যিই, চাইলে ওদের মোটর সাফ করার কাজেও ওকে ডাকবে কিনা সন্দেহ।

তাই ভয়ানক বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল শর্মা। এমন দিনে হঠাৎ জানতে পারল, সাবিত্রী কবিতা লেখে, কবিতার সাধনা করে।

জানা মাত্র আশা আবার হাতছানি দিয়েছে তাকে। মন বলেছে, হলেও হতে পারে।

প্ল্যান মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে সাবিত্রীকে টেলিফোন করেছে সে। সমস্ত আকুতি ঢেলে জানিয়েছে, তাব সঙ্গে একবার নিরিবিলিতে দেখা হওয়া দরকার। এইটুকুর ওপরেই তার মান-সম্ভ্রম, এমন কি এই দেশে থাকা-না-থাকাও নির্ভর করছে।

সাবিত্রী লাখোটিয়া নির্লিপ্তভাবেই আর্জি মঞ্জুর করেছে। আর শর্মা আসতে নিজেই প্রথমে প্রশ্ন করেছে, কোন সৎকর্মে টাকা উড়িয়েছে—রেসে না, মদে?

শর্মা অবাক। টাকা! টাকা ওড়াব কেন?

তাহলে কি?

শর্মা বলেছে, ভিক্ষে চাই বটে, কিন্তু সেটা টাকা নয়।

ফিল্ম-এ চান্স?

কি মুশকিল, ইচ্ছে থাকলে ও-চান্স নিজের যোগ্যতায়ই পেতে পারতুম, সেজন্য তোমার কাছে ভিক্ষে চাইব কেন!

অতঃপর সাবিত্রী শোনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। শর্মা উঠে এসে তার পায়ের কাছে বসে পড়েছে। তারপর বলেছে, বন্ধু-বান্ধবেরা তাব নাম দিযেছে ভীষ্ম, কাবণ কিছু প্রতিজ্ঞা করে বসলে প্রাণপণ করে সে তা রক্ষা করে থাকে। ঝোঁকের মাথায় তাব বুকের তলার সংগোপন বাসনাটা হঠাৎ একদিন তাদের কাছে প্রতিজ্ঞার আকারে বেরিয়ে গেল—এক বছরের মধ্যে সাবিত্রীকে বিয়ে করবে! অত সাত-পাঁচ ভেবে প্রতিজ্ঞা করেনি। বন্ধুরা হাসাহাসি করেছে, টিটকেরি দিয়েছে। এদিকে প্রায় বছরখানেক ধবে এগোতে চেষ্টা করে শর্মা বুঝেছে, সাবিত্রীদের বাড়ির মোটর-ড্রাইভার হওয়ার যোগ্যতাও তার নেই। ওদিকে এক বছরের মধ্যে ন'-দশ মাস হয়ে গেল, বন্ধুদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে জর্জরিত দশা তার। জীবনে এই প্রথম প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হতে চলেছে, তাদের ফূর্তি। এমন দাঁড়িয়েছে যে, শর্মা বিবাগী হওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা দেখছে না। কাপুরুষের মত চলে না গিয়ে সে পুরুষের মতই সাবিত্রীর কাছে জানতে এসেছে, এ অবস্থায় সে কি করবে।

ঠিক এই সময় সাবিত্রীর পোষা অ্যালসেসিয়ানটা গোঁ গোঁ করতে করতে এগিয়ে এসেছে। অতএব শর্মা সংগোপনে সরে বসেছে। সাবিত্রী কুকুরটাকে কোলের কাছে টেনে নিতে নিতে দু' চোখ বড় বড় করে শর্মাকেই দেখছিল। জবাব দিল, প্রতিজ্ঞা করার আগে তার কাছে এলে কিছু করতেও হত না, ভাবতেও হত না।

বিমর্ষ মুখে শর্মা সেটা স্বীকার করেছে, বলেছে, বাসনা এইভাবেই মানুষকে

ঘোরায়। কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন তাকে ইন্ধন যুগিয়েছে, কেবলই মনে হয়েছে, সাবিত্রী হৃদয়বতী, হৃদয়ের সম্পদই তার আসল সম্পদ—আর শর্মা এই সম্পদেরই কাঙাল শুধু। আর যারা সাবিত্রীকে চায় তাদের অনেক আছে, কিন্তু তবু সাবিত্রীর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঐশ্বর্যও আশা করে, এই ঢালা সম্পদের মধ্যেই সাবিত্রীর পরিপূর্ণ রূপ দেখে। কিন্তু শর্মা এ-সব কিছু চায় না, সে শুধু সাবিত্রীকেই চায়, সাবিত্রীর হৃদয়ের সম্পদটুকুই চায়।

সাবিত্রী আবার বড় বড় চোখ করে তাকে দেখল খানিকক্ষণ, তারপর কুকুরকে আদর করতে লাগল।

শর্মা আশান্বিত হয়েছে, বলেছে, আমাকে প্রতীক্ষায় রেখো না, আমি কি করব এখন? ʼ

সাবিত্রী বলেছে, কুকুর লেলিয়ে দেবার আগে আপাতত পালাও।

শর্মা উঠে এসেছে, কারণ আরো কারা সব সাবিত্রীর কাছে এসে গেছে তখন।

হতাশার মধ্যে কোথায় যেন একটু আশার গুঞ্জন উঠেছে শর্মার মনে। সাবিত্রীর সেই চোখ বড় বড় করে তাকে দেখাটা যেন গোটাগুটি প্রত্যাখ্যানের মত নয়। সাবিত্রী বলেছে, আপাতত পালাও। আপাতত...। আপাতত মানে তো একেবারে নয়।

ঠিক তিন দিনের দিন সাবিত্রীর টেলিফোন পেয়ে ভগবান শর্মা লাফিয়ে উঠল। সাবিত্রী ডেকেছে তাকে। শর্মা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে।

তেমনি নির্লিপ্তমুখে সাবিত্রী প্রথমেই জিজ্ঞাসা কবেছে, তুমি টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি কিছুই আশা করো না তার প্রমাণ কি?

কি প্রমাণ দিতে হবে বল? আশায় দুরুদুরু বক্ষ শর্মার।

রেজেস্ট্রি বিয়ে করবে? কেউ আপাতত জানবে না।

জবাবে সোল্লাসে দু' হাত বাড়িয়ে শর্মা তক্ষুনি তাকে রেজেস্ট্রি-অফিসে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করতে গেছে। কিন্তু কোথা থেকে যমদূতের মত কুকুরটা তেড়ে আসতে সাবিত্রীকে ছেড়ে বড়গোছের একটা লং-জাম্প দিয়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছে তাকে।

সাবিত্রী হেসে সারা। হাসিতে অত মাধুর্য শর্মা নাকি আর কখনো দেখেনি।

বিয়ে হয়ে গেল। তার কয়েকদিনের মধ্যে সাবিত্রীর বাপ-দাদারা কি করে যেন জেনে ফেলল। তারপর আমরাও জানলুম। সাবিত্রীর বাপ-দাদারা কেউ খুশি হল না। কিন্তু খুশির চোটে আমরা শর্মার ভীষ্ম নামের অভিষেক-উৎসব পালন করলাম। একজন বিয়ে না করে ভীষ্ম হয়েছিল, আর একজন বিয়ে করে—কৃতিত্ব কার বেশি?

কিন্তু ক্রমশ শর্মার অত উত্তাপে একটু একটু করে যেন টান ধরতে লাগল। সাবিত্রীর বাবা বাড়ি-গাড়ি দিতে চেয়েছিল—সাবিত্রী নিতে দেয়নি। লাখকয়েক টাকা অনায়াসে ওদের নামে চালান হতে পারত, সাবিত্রী নিতে দেয়নি। মাত্র ন'শো টাকায় খবরের কাগজের চাকরি ছাড়িয়ে জামাইকে ফিল্ম-এর ব্যবসায় ঢোকাতে চেয়েছিল শ্বশুর—সাবিত্রী তাও নিতে দেয়নি। তার এক কথা, যোগ্যতা নেই, অথচ বড়লোক হবার সাধ সে বরদাস্ত করবে না।

এই যোগ্যতার খোঁটা সাবিত্রী হামেশাই দেয় তাকে। কিন্তু খোঁটা দিয়ে শর্মার মত মানুষকে জব্দ করা সম্ভব নয় বলেই খটাখটি লাগে। শর্মার সবেতেই বেপরোয়া স্বভাব। মদ খেতে বসলে এন্তার খাবে, রেসে ঢুকলে পকেটে যা আছে সব খুইয়ে আসবে। কিন্তু সাবিত্রী এ নিয়ে খুব কড়া শাসন করতে পারে না। করতে গেলে তার পিতৃগর্ব খর্ব করা হয়। কারণ, বাপের বাড়িতে অঢেল মদ চলে, রেসে হাজার হাজার টাকা ওড়ে। এ-সবে শর্মার চওড়া দিল আছে বলেই সাবিত্রীর দাদাবা আজকাল পছন্দ করে তাকে।

কিন্তু সাবিত্রী যে রাস্তা ধরে শর্মাকে শাসন করে সেটা আরো অপমানকর। সে বলে, তাদের যোগ্যতা আছে, তারা ফূর্তি করে, তুমি তাদের সঙ্গে সমান তালে নাচতে চাও কি বলে? এই যোগ্যতা নিয়ে তুমি তাদের সমান হতে চাও, তোমার লজ্জা করে না? তাদের মত ফূর্তি করার যোগ্যতা অর্জন কব, তারপব ফূর্তি কর।

শর্মার কানে তুলো, পিঠে কুলো। অর্জনের যোগ্যতা না থাক, টাকা ওড়াবাব যোগ্যতা যে বিধাতা ওকে অকৃপণ হাতে দান করেছে। অতএব ঘরেব গণ্ডগোল বাড়তেই থাকে, ফলে মাসকাবারে ন'সো টাকা মাইনে সবই শর্মাকে সাবিত্রীর হাতে তুলে দিতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গঞ্জনার শেষ নেই। কাগজের বিয়ে অনেক সময়েই ছিঁড়ি-ছিঁড়ি হয়। শর্মা শেষ পর্যন্ত অবশ্য ম্যানেজ করে।

শর্মার কথা শুনে একদিন একটু চমকে উঠলাম। সে বলল, বউটাকে একটু টিট করা দরকার, বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

আমার শঙ্কা শর্মা আবার কিছু না প্রতিজ্ঞা করে বসে। কিন্তু পরে দেখা গেল এ ব্যাপারে শর্মার ঠাণ্ডা মাথা। অর্থাৎ খুব বড় একটা চাকরি বাগিয়ে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে বউ টিট করতে চায় সে। প্রায়ই বলে, শালার মোটা মাইনের পছন্দসই চাকরি পেতাম, তাহলে দেখিয়ে দিতাম ফূর্তি করার যোগ্যতা আছে কি নেই।

যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি। ধরা-পড়া করে বড় চাকরির একটা আশা সত্যিই পেল সে। নামজাদা এক বিলিতি ফার্মের পাবলিক রিলেশানস অফিসাব—মোটা মাইনে, ফূর্তিব উপকবণ যোগানোর দায় কোম্পানির। আগামী বছবেব শুরুতে চাকরিটা হওয়ার সম্ভাবনা।

কিন্তু যাচ্ছেতাই কি এক অসুখ বাধিয়ে বাধ সাধলে সাবিত্রী। অথচ সে-কথা বলতে গেলে উল্টে ফুঁসে ওঠে নাকি। বছর কাবারের মাসখানেক আগে থেকেই সাবিত্রীর কি এক রোগ হল। প্রায়ই শুয়ে থাকে, বুকের কোথায় ব্যথা ওঠে, মুখ ফ্যাকাশে, খাওয়া-দাওয়া নেই। শরীর কি রকম অস্থির করে। সাবিত্রীর বাবা ডাক্তাবের হাট বসিয়ে দিলে, কিন্তু ফল তেমন কিছু হল না। শর্মার বড় চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে যেতে হবে ষাট মাইল দূরের এক জায়গায়। কিন্তু সাবিত্রীর রোগটা তখন এমনই বাড়াবাড়ি আকার নিল যে, বড় বড় ডাক্তাররাও তালকানা। সাবিত্রী প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই শয়নে, মুখে একটি শব্দ নেই, চোখ বোজা, অনাহারে মুখ একেবারে সাদা। ফিরে এসে আর দেখবে কি দেখবে না ভয় ঢুকতে শর্মা আর ইণ্টারভিউই দিতে যেতে পারল না। তার যোগ্যতা দেখানোর আশায় জলাঞ্জলি।

সাবিত্রীর রোগ অবশ্য ক্রমশ সেরেছে। কিন্তু যে ত্যাগ পত্নীপ্রেমের নিদর্শন হয়ে থাকতে পারত, সেটাই যেন শর্মার অযোগ্যতার আরো বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল। ইন্টারভিউ দিতে যায়নি শুনে সাবিত্রী উল্টে গালাগাল করেছে তাকে। এমন কি ওর সামনেই আমাকে বলেছে, চাকরি হবে না জানত, আমার অসুখের নাম করে ফাঁক তালে ও বেঁচেছে, বুঝলে?

অতএব আবারও বড় চাকরির সন্ধানে আছে শর্মা। কিন্তু সেটা হামেশা জোটার জিনিস নয়। ফলে সাবিত্রীও ওদিকে তার ফূর্তির রাশ টেনে ধরেই আছে। তার রোজগারের টাকা তো সব হস্তগত করবেই, আবার অন্যের পয়সায় ফূর্তি করলেও অযোগ্য বলে তুমুল কাণ্ড করবে, বলবে গরীব হয়ে বড়লোকের পা চাটতে ঘেন্নাও করে না, কি ভুলই করেছি।

শর্মা প্রকাশ করতে চায় না বটে, কিন্তু দিন দিন যে ক্রমশ নীরস লাগছে ওর, সেটা আমি অন্তত টের পাই। আবার সেই এক কথাই বলতে শুনি ওকে, শালার ভাল একটা চাকরি.

এবারে সত্যিই বিধি বোধহয় অনুকূল ওর। আমাদের বোম্বাইয়ের ওই মস্ত কাগজের সংস্থা কলকাতায় একটা বিশাল শাখা বিস্তার করে বসল। আমি কলকাতায় বদলি হয়ে এলাম, এর মাস ছয় বাদে অফিসে একটা গুজব শুনে বিস্ময়ে আনন্দে আটখানা আমি। বোম্বাই এবং কলকাতার বাণিজ্যিক ব্যবস্থা যুক্ত করার জন্য কাগজে মস্ত একটা পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।—কমার্স লিয়াজো অফিসার। আর সেটি পাবার সম্ভাবনা আমাদের ভগবান শর্মার। মাইনে প্রায় দ্বিগুণ, সতেরশো টাকা—এ ছাড়াও অনেক কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে এই চাকরিতে।

শর্মাকে তক্ষুনি চিঠি লিখে খবরাখবর জানতে চাইলাম। শর্মা জবাব দিলে অনেক খড়কুটো পুড়িয়ে ব্যবস্থা পাকা করতে হয়েছে, কিন্তু এখনো ডিরেক্টরদের ফাইন্যাল ইন্টারভিউ বাকি, সেটা হবে কলকাতায়—অতএব কোম্পানির খরচায় সে শীগগীরই কলকাতায় আসছে। চাকরিটা তারই হবে আশা করা যায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার ওপর একটু বিরূপ বটে, কারণ শর্মার নামে তার কাছে কয়েকটা বাজে রিপোর্ট গিয়েছিল। কিন্তু সেদিকটাও মোটামুটি ম্যানেজ করা হয়েছে, এখন গতানুগতিক ইন্টারভিউ অনুষ্ঠানটুকু হয়ে গেলেই সে নতুন পোস্টে জয়েন করতে পারে।

সত্যিই আনন্দ হল। এতদিনে বেচারার সাবিত্রীর কাছে একটু ফূর্তি করার যোগ্যতা প্রমাণ হল।

সকালে কলকাতায় পা দিয়েই শর্মা আমাকে ইঁদুর পাকড়াও করার মত করে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেল। ফূর্তিতে মাটিতে পা পড়ে না তার।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাবিত্রী কি বলে?

শর্মা বলল, এখনো বিশ্বাস করে না আমার হবে, আর বলে, হুঁঃ, ভারী চাকরি—সতেরশো তো মাত্র মাইনে। সাবিত্রীও তো এসেছে আমার সঙ্গে, ওর বড়লোক দিদির বাড়িতে উঠেছে।

আর তুমি?

ক্ষেপেছ! এতদিনে কোম্পানির খরচে একটু ফূর্তি করার সুযোগ পেয়েছি, একটানা কতদিন নিরেমিশ যাচ্ছে খবর রাখ? আমি বাবা তোমাদের ওই সেরা হোটেলে উঠেছি, সাবিত্রীকে বলেছি, অনেকে দেখাশুনা করতে আসতে পারে, হোটেলেই সুবিধে।

সেদিনের মত আমাকে অফিস কামাই করিয়ে ছাড়ল শর্মা। পরদিন সকাল দশটায় ওর ইন্টাবভিউ, অতএব আজ সকাল থেকে কাল সকাল পর্যন্ত ঢালা ফূর্তির প্রোগ্রাম।

প্রোগ্রাম শুরু করাব আগে শর্মাকে নিয়ে একবার সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলাম। তাকে ভিতরে ভিতরে একটু খুশি দেখব ভাবলাম। কিন্তু তার ভাবখানা একেবারে নির্লিপ্ত। শর্মা একসময় ভিতরে উঠে যেতে ঠাণ্ডাগলায় সাবিত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এই চাকরিটা ওর তাহলে সত্যিই হবে বলছ?

হ্যাঁ, মোটামুটি তো ঠিকই হযে আছে দেখছি।

শর্মা তক্ষুনি ফিরে এসেছে। জিজ্ঞাসা কবল, কি ঠিক হযে আছে বলছ?

না, সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করছিল, চাকবিটা সত্যি হবে কিনা।

শর্মা হা-হা করে হেসে উঠল।

আর তাইতেই সাবিত্রী খোঁচা দিয়ে বলে উঠল, সতেরশো টাকাব চাকরিব নামেই এত ফূর্তি! আগে বললে না কেন, বাবাকে বলে না হয হাজার তিনেক মাইনেবই একটা কিছু জুটিয়ে দিতুম।

হাসিমুখে এবাবে পাল্টা ঠেস দিল শর্মা, বলল, নিজেব যোগ্যতায় যেটুকু হয সেটুকুই ভাল।

ভগবান শর্মা সত্যিই একটা মানুষের মত তাজা হয়ে উঠেছে। তার পাল্লায় পড়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আব বাড়িমুখো হওয়া গেল না। দুপুরে সিনেমা, বিকেলে থিয়েটার, আর রাতে বিলিতি নাচের আসর। ফাঁকে ফাঁকে হোটেলে বা রেস্তরাঁয় এন্তার খাওযা।

রাত একটায় নাচের শেষে হোটেলে নিজের ঘরে দ্বিতীয় দফা মদের বোতল খুলে বসল সে। আমারও তার সঙ্গেই রাত্রি-যাপন। আবার মদেব বোতল দেখে আপত্তি কবতে গিয়েছিলাম, তার আগেই সে চোখ পাকালো। বলল, বউয়েব পাল্লায় পড়ে ভিতবটা একেবারে মরুভূমি হয়ে আছে, জান? এই দিনটা সেলিব্রেট কবব না তো কি? এরপর আর কোন শালা পরোয়া করে—

অর্থাৎ ফূর্তি করার যোগ্যতা অর্জন করার পরেই স্বমূর্তি ধরবে সে।

রাত চারটে পর্যন্ত চলল সেই পান-পর্ব। আর গল্পে গল্পে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ওই দরজা দিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। রাত চারটেব পর শর্মা প্রস্তাব করল, আর ঘুম নয়, একটু বাদেই ফর্সা হবে, সেই আধো-আলোয় ময়দানে হেঁটে বেড়াতে ওয়াণ্ডারফুল লাগবে, চলো—

আমার ঝিমুনি আসছে দেখে দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, মেয়েছেলের হদ্দ তুমি, গেট আপ, বি এ ম্যান!

অতএব তিন কোয়ার্টারের মধ্যে জামা-কাপড় বদলে আবার ভ্রমণ-পর্ব। শর্মা অত্যুক্তি করেনি, সত্যিই ভালো লাগল। শর্মা বলল, জীবনটাকে নানা ছাঁচে নানা ধকলের

মধ্যে ফেলে চেখে চেখে দেখতে হয় হে, বিছানায় পড়ে ঘুমুতে তো সবাই পারে।

বেড়ানো হল, একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে তার সঙ্গে আধঘন্টা গল্প হল। হোটেলে ফিরতে সাড়ে সাতটা। সেখানে আবার একপ্রস্থ চা। ওপরে উঠতে আটটা। শর্মা আমাকে চানে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে একটা জরুরি চিঠি লিখতে বলল। চানে যাবার আগে আমি বললাম, বুড়ো ম্যানেজিং ডিরেক্টর কি জিজ্ঞাসা করতে পারে না পারে একটু ভেবে রাখলে না?

ডোণ্ট্ ওয়ারি, আ'উইল ফিক্স দি ওলড ম্যান, নাউ বি কুইক!

আমি চান সেরে বেরুলাম আটটা পনেরো। ততক্ষণে শর্মার চিঠি লেখা শেষ। সে চানে ঢুকল এবং পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে চান করল। বেরিয়ে এসে বলল, নাউ এভরিথিং ইজ ওয়াণ্ডারফুল। ওর সাজগোজ শেষ হতে সাড়ে ন'টা। সত্যিই ভারী তাজা দেখাচ্ছে ওকে।

অফিসের দোতলায় এসে উঠলাম দশটা বাজার সাত মিনিট আগে। আরো ঠিক পাঁচ মিনিট কাটিয়ে শর্মা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে কার্ড পাঠালে। অন্যান্য ডিরেক্টররাও এসে গেছে আমি আগেই খবর নিয়েছিলাম।

একটু বাদে বড় সাহেবের পি. এ. বেরিয়ে এল। শর্মার সঙ্গে করমর্দন করে জানালো, ডিরেক্টরদের ঘরে দু'জন বিদেশী ভদ্রলোক এসে পড়েছে, এবং তাদের সঙ্গে একটা দরকারী আলোচনা চলছে। অতএব মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে হবে।

ও. কে.। হাল্কা শিস দিতে দিতে শর্মা অদূরের একটা সোফায় গিয়ে বসল। একটা বিলিতি ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে আমাকে বলল, তোমার তো সময় হয়ে গেল, তুমি কাজে বোসো গে যাও।

তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি চলে গেলাম। ইন্টারভিউয়ের পর ওকে সোজা চলে আসতে বললাম।

প্রায় আধঘন্টা বাদে অফিস-ঘরের ও-দিকটায় চেয়ে কি-রকম যেন একটু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। বড়সাহেবের পি. এ. বাইরের দিকে ছুটে বেরিযে গেল। তার পিছনে দেখি বড়সাহেবও চলেছে। কি এক অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়ায় উঠে এলাম। বাইরে এসে যে দৃশ্য দেখলাম, আমার দুই চক্ষু স্থির। স্থির কেন, একেবারে কাঠ আমি। পিওন দাঁড়িয়ে, পি. এ. দাঁড়িয়ে, বড়সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাদেব পিছনে আমি দাঁড়িয়ে।

সোফায় মাথা রেখে আর দুটো পা-ই লম্বা করে সোফায় তুলে দিয়ে বিলিতি ম্যাগাজিন বুকে করে ভগবান শর্মা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। এমন ঘুম যে তার নাসিকা-গর্জন কানে ঠাস ঠাস করে লাগছে।

রাগে বড়সাহেবের চোখমুখ লাল। পি. এ. আর একবার তাকে ঠেলতে সে বিড়বিড় করে বলল, আ'উইল ফিক্স আপ উইথ দি ওল্ড ম্যান—ডোণ্ট ওয়ারি। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পরিপুষ্ট নাকের ডাক।

বড়সাহেব ইশারায় পি. এ.-কে কি বলল। পি. এ. ছুটল। একটু বাদেই

প্রেস-ফোটোগ্রাফার নিয়ে হাজির সে। বড়সাহেবের ইঙ্গিতে ফোটোগ্রাফার ছবি তুলল। বড়সাহেব গটগট করে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

পি. এ. অতঃপর আমাকে জানালো, বড়সাহেবের আদেশে বেয়ারা শর্মাকে ডাকতে এসে ফিরে গিয়ে খবর দিলে, সাহেব কিছুতে উঠছে না, ঘুমুচ্ছে। শুনে ডিরেক্টররা হতভম্ব, পি এ-র সঙ্গে সঙ্গে বড়সাহেবও ছুটল—কারণ প্রথমে সবাই ভেবেছিল হঠাৎ কোন কারণে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেছে হয়তো। এসে দেখা গেল এই ব্যাপার।

এতক্ষণে আরো অনেকে কাজ ফেলে মজা দেখতে এসেছে। হাসাহাসি পড়ে গেছে। রাগে-দুঃখে দু'চারটে বড় রকমের ঝাকুনি দিয়ে শর্মাকে টেনে তুললাম আমি সে চোখ কচলে উঠে বসল।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। শর্মার নতুন চাকরি সেখানেই খতম। পুরনো চাকরিও যে যায়নি সেটুকুই বড়সাহেবের দয়া। কিন্তু মরার ওপর খাড়ার ঘা নেমে এল অন্য দিক দিয়ে। পরদিন কাগজে একটা কার্টুন ছবি ছাপা হল। ছবির নীচে লেখা, 'ইন্টারভিউ'। অর্থাৎ কর্মপ্রার্থী ইন্টারভিউ দিতে এসে পরম আনন্দে কেমন ঘুমুচ্ছে বলা বাহুল্য, ফোটো শর্মার।

ভগবান শর্মার মাথায় আকাশ ভেঙেছে। ও জব্দ হোক, এ হয়তো অনেক সময় চেয়েছি। কিন্তু এমন প্রাণান্তকর জব্দ হোক, এ ওর শত্রুও চায়নি। চাকরি তো যাবার হয়েছে, এবারে ঘরও ভাঙতে চলল বুঝি পরদিন বিকেলে পাংশু বিবর্ণ মুখে শর্মা এই ইঙ্গিতই করল। বলল, এবারে আর সামলানো গেলই না বোধহয়।

আমি বিচলিত।—কি বলছে?

বললে তো তবু আশা হত। কথাই বন্ধ। মুখের দিকে তাকাতে ভয় করে। বাড়িতে আবার ওর দিদির উকিল এসেছে দেখলাম, তার সঙ্গে কি কথা বলছিল ।

পরদিন। মনটা সারাক্ষণই ভয়ানক বিষণ্ণ হয়ে আছে। অফিসে শর্মার টেলিফোন পেলাম, বলল, বিকেলের গাড়িতে আপাতত লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে, সেখান থেকে দিল্লী হয়ে বোম্বাই যাবে।

আর সাবিত্রী?

সে-ও যাচ্ছে। আমতা আমতা করে বলল, যা হোক করে ম্যানেজ করা গেছে হে।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। বিকেলে স্টেশনে থাকব কথা দিলাম। কিন্তু স্টেশনে এই সাবিত্রীকে দেখব আমি কল্পনা করিনি। হাসছে মিটিমিটি, সমস্ত মুখে যেন কাঁচা রং লেগেছে একপ্রস্থ। ফার্স্টক্লাস একটা কূপে রিজার্ভ করা ছিল ওদের জন্য। অফিস থেকে এসেছি বলে টিফিন ক্যারিয়ার থেকে খাবার বার করে সাবিত্রী আমাকে খাওয়াল, এতদিনের মধ্যে একবারও বম্বে যাইনি বলে অভিযোগ করল, কলকাতায় এবারে কি দেখা হল না হল সেই ফিরিস্তি দিল। সেই সঙ্গে হাসি চেপে বারকয়েক আর-একখানা মুখও লক্ষ্য করল। শর্মা নিবিষ্ট মনে স্টেশনের ভিড় দেখছে।

হঠাৎ তার দিকে ফিরল সাবিত্রী। তারপর ভালো মুখ করে বলল, কি গো, বন্ধুকে তোমার এবারের প্রতিজ্ঞাদুটোর কথা বললে না?

শর্মার বিড়ম্বিত মুখখানা দেখার মত। হাসতেও চেষ্টা করছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি প্রতিজ্ঞা?

সাবিত্রী গম্ভীর মুখে বলল, ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করেছে এবার, আমি বলব কেন, ওই বলুক।

শর্মা বলল, দু'দুটো প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছে, বুঝলে? এক, মদ আর ছোঁব না, দুই, রেস বা জুয়াটুয়া খেলে আর ফুর্তি করব না। প্রতিজ্ঞা ইজ্ প্রতিজ্ঞা—করেছি যখন রাখব।

চাপা হাসিতে সাবিত্রীর সমস্ত মুখ টস-টস করছে। দু'চোখ টান করে শর্মাকে দেখল একটু, তারপর বলল, দুটো প্রতিজ্ঞার জন্য এবারে তোমাকে আমি ডবল ভীষ্ম উপাধি দিলাম।

আমার চোখে পলক পড়ে না।

গাড়ি ছাড়ল একসময়। ওরা হাসিমুখে রুমাল নাড়ছে। আমিও।

ওদের মুখ আড়াল হয়ে গেল। আমি পায়ে পায়ে ফিরে চলেছি।

সেই মুহূর্তে ভারী সহজে যেন কতগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি আমি।

আমার ধারণা, সাবিত্রী তার বাপের বাড়ির আবহাওয়া কখনো পছন্দ করত না বলেই শর্মাকে বিয়ে করেছিল।

আমার ধারণা, শর্মার প্রথম বড় চাকরি অর্থাৎ পাবলিক রিলেশনস অফিসারের চাকরি পাবার সম্ভাবনার সময় সাবিত্রীর সেই অসুখ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ছল। ওই চাকরি পেলে বেপরোয়া শর্মা আরো অনেকগুণ বেপরোয়া হয়ে উঠবে জেনেই সে ও-ভাবে বাধা দিয়েছিল।

আমার ধারণা, শর্মার এবারের বড় চাকরির সম্ভাবনাতেও সাবিত্রীর এই নির্লিপ্ততা একই কারণে। আসলে মনে মনে সে অশান্তি ভোগ করছিল।

আর, আমার ধারণা, বিয়ের আগে শর্মা শুধু ওর হৃদয় চেয়েছিল, সেই হৃদয়টিই সাবিত্রী তাকে গোটাগুটি দিয়েছে।

নিজের মনে হাসছি দেখে কেউ কেউ অবাক হচ্ছে খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম।

জীবোৎস

ওরা বলে জীবৎস—জীবৎস কুণ্ড। মনে হয় ওটা উচ্চারণের অপভ্রংশ। যে নামই হোক, জীব বা জীবনের উৎসের সঙ্গে ওই কুণ্ডের যোগ—এই সংস্কার বা বিশ্বাসই আসল ব্যাপার।

বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে জায়গাটাতে। পার্বণে মেলা বসে। সেই মেলায় এখনো গ্রাম-বাংলার সুদূরকালের চেহারাটা উঁকিঝুঁকি দেয়। তখন শহুরের অতিআধুনিক নব্যশিক্ষিতদের পদার্পণ ঘটলে তাদের মনে হতে পারে এই চাঁদের

নাগাল-পাওয়া সভ্যতার যুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বুঝি কোনো সুদূরকালের অধ্যায়ে বিচরণ করছে।

সব থেকে জোরালো মেলা বসে শিব-চতুর্দশীতে। শিব-চতুর্দশীর সেই মেলা দেখতে বহু দূর থেকে লোক আসে। আশপাশের সমস্ত গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা জোয়ারের স্রোতের মত এই দিকে ভেসে পড়ে। দূর-দূরান্ত থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই করে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসে বেসাতীরা। গ্রাম্য ভোজবাজীওয়ালারা আসে, সং-এর দল আসে, নাগরদোলা আসে, আবার আনাচ-কানাচ লক্ষ্য করলে অপটু প্রসাধনে বিবর্ণ পুণ্যার্থিনী দুই একটি বারবনিতার ভীরু মুখও চোখে পড়তে পারে।

সারি বেঁধে যাত্রী আসে পায়ে হেঁটে, খোড়োচালের গরুর গাড়িতে, বাসে, মোটরে, ট্রেনে।

বলা বাহুল্য, মেলার আনন্দ বা কেনা-বেচাটাই বড় আকর্ষণ নয় এখানকার। স্থান-মাহাত্ম্যের টানটাই আসল। এখানকার ধুলোয় পুণ্যি, বাতাসে পুণ্যি। মন্দির বক্রেশ্বর—মহাতপা অষ্টাবক্রের সাধনক্ষেত্র। একান্ন পীঠ-এর এক পীঠ, শিব ও শক্তিব মহা-সমন্বয়ের স্থান। দেবীর ভুরু পড়েছিল এখানে। ভুরুর সঙ্গে দিব্যদৃষ্টির যোগ। দিব্যদৃষ্টি চাও তো ভুরু-সন্ধান করো, নিমিলিত নেত্র দুই ভুরুর মাঝে সকল দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করো। অষ্টাবক্র তাই করেছিলেন। সেই দৃষ্টিতে মহাদেব ধরা দিয়েছিলেন।

স্থানমাহাত্ম্যের আরো নিদর্শন আছে এখানে। মন্দির থেকে বেশ খানিকটা দূরে বক্রেশ্বর নদী। শোনা যায় আগে অতদূরে ছিল না। বিশাল ভর-ভরতি নদী ছিল নাকি। এখন হেজে-মজে দূরে সরে গেছে। নদীর এই শুকনো দিকটা ধরে মহাশ্মশান। সেই শ্মশানে বসে তন্ত্রসাধনা করতেন অঘোরীবাবা। ওখানে তাঁর সমাধিক্ষেত্র রয়েছে।

কিন্তু এখানে শুধু পুণ্যি করতে বা মেলা দেখতে বা আনন্দ করতেই আসে না যাত্রীরা। আরো এক নিগূঢ় কামনা নিয়ে আসে অনেকে। সৃষ্টির কামনা। সন্তান-কামনা। শিক্ষাবিশেষে এই কামনা বিশ্বাস আর অবিশ্বাসেব আলো-ছায়ায় দোলে অনেক সময়। কিন্তু কে জানে সত্যি-মিথ্যা, দোষ তো কিছু নেই—চুপিসাড়ে তাই ওই জীবোৎস কুণ্ডে ডুব দিয়ে ওঠে অনেক মিত-বিশ্বাসপোষণা নিঃসন্তান রমণীরাও।

সাতটি কুণ্ড আছে এখানে। কুণ্ডের জল তপ্ত। এই তপ্ত জল আসে কোথা থেকে সেটা বর্তমানে ভূ-বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বস্তু। বক্রেশ্বর মন্দিরের পশ্চিম দিকে মন্দিরেব গা-ঘেঁষা বাঁধানো সিঁড়ি যে কুণ্ডের দিকে নেমে গেছে সেটাই জীবোৎস কুণ্ড। সাতটির মধ্যে এই কুণ্ডের জল অপেক্ষাকৃত শীতল এবং স্নানযোগ্য। সেই জন্যও একে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী পল্লবিত হওয়া অসম্ভব নয়।

মন্দির চাতালের কিছু দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় কতকগুলো ভাঙাচোরা খুঁটি চোখে পড়তে পারে। আবার নাও পড়তে পারে—কালের জরায় ওগুলোও নিশ্চিহ্ন হওয়া সম্ভব। ওখানে চালাঘর ছিল একটা। সেখানে থাকত এক বুড়ী। বুড়ী সধবা, কিন্তু একা থাকত ওখানে। কপালে মস্ত একটা জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ পরত। বয়েস যত বাড়ছিল টিপটা ততো বড় হচ্ছিল। শেষ যারা দেখেছে তাকে, তারা গল্প করে, টাকার থেকেও বড় সেই সিঁদুরের টিপ দেখে আর তার দন্তহীন মুখের সেই হাসি

দেখে কত পুণ্যার্থিণী রমণী দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাত ঠিক নেই।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করত সে এখানে থাকে কেন। শুনে বুড়ী হাসত। সেই হাসি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত নাকি। সেই হাসি যেন গোটা মুখের বলীরেখার ভাঁজে ভাঁজে লুকোচুরি খেলত। তারপর বুড়ী জবাব দিত, এখানে তার ছেলেরা আসে তাই থাকে। ছেলে তো আর একটা দুটো নয়, এক দঙ্গল। সে না থাকলে কোনটা মুখ শুকিয়ে ফিরে যাবে ঠিক আছে! বলত, এই বুড়োবয়সেও ওদের জ্বালায় হাড় কালি হয়ে গেল তার, খাবার সাজিয়ে বসে থাকো তাদের জন্য—তামাম বছরে এই ক'টা মেলা ভিন্ন মায়ের কথা আর তাদের মনে পড়ে না। সুড়সুড় করে তখন একে-একে আসতে থাকে। বুড়োটা নিতান্ত ভালোলোক তাই তার জন্য ঘর তুলে দিয়েছে এখানে—নিজে একলা ওই বক্রেশ্বর গাঁয়ের ঘরে পড়ে থাকে—দরকারে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই। বুড়ী বলত, মবলে তাব নরকেও স্থান হবে না, ছেলেগুলোর জ্বালায় এই বয়সেও একটু স্বামীসেবায় মন দিতে পারল না। ছেলেদের ওপর রাগ করে অনেকবার শোধ নিতে চেষ্টা করেছে বুড়ী, গাঁয়ের ঘবে থাকতে গেছে। কিন্তু হারামজাদারা জানে মা থাকতে পারবে না, আসবেই আবার। পাজীগুলোর জ্বালায় বুড়ীর মনে আর একটুও শান্তি নেই।

কিন্তু যারা আসত এখানে আর বুড়ীর কথা শুনত—এই শান্তিপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে তারা চোখ ফেরাতে পারত না। মনে হত বুড়ীর নিভৃতে কোথায় যেন এক প্রসন্ন শান্তির উৎস আছে। অন্তরীক্ষের কোন সদা প্রসন্নময়ী বুঝি তার হাসিটুকু এই বুড়ীর মুখে রেখে গেছে।

শেষের দিকে এখানকার পাণ্ডাদের বেশ সুবিধে হয়েছিল। যাত্রী পেলে জীবিকার তাড়নায় মুখে মুখে তাদের অনেক গল্পকথা শোনাতে হয়। অলৌকিক কাহিনী শুনিয়ে তাদের মুগ্ধ করতে হয়, অন্ধবিশ্বাস করতলগত করতে হয়—তবে পয়সা মেলে। নইলে ট্যাক খুলে বা আঁচল খুলে কে আর আগবাড়িয়ে পয়সা দিতে আসে? পাণ্ডারা সাধারণত ভালো মনস্তত্ত্ববিদ, যাত্রীদের মনে বিশ্বাসের বিভ্রম ঘটাতে ওস্তাদ তারা। তবু শক্ত পাল্লায় পড়তে হয় অনেক সময়। অনেক সময় তখন তারা এইখানে নিয়ে আসত তাদের, বলত, এইখানে 'মায়ের চালা' দেখে যাও মায়ীরা, পুণ্যবতী বুড়ী-মাকে দেখে যাও—ওই বুড়ীমাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো কুণ্ডে চান করলে সন্তান মেলে কি মেলে না—এই বুড়ীমা দ্বাপরের দ্রৌপদী ছেলেন যে গো, সাক্ষাৎ পঞ্চসতীর এক সতী!

পাণ্ডার সামনে বা আরো পাঁচজনের সামনে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা সম্ভব হোক না হোক—এই শোনার পর বুড়ীমাকে দেখতে মায়ের চালায় আসত অনেকেই। এলে ভালোও লাগত। বুড়ীমা সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখত তাদের, নিঃশব্দ হাসিতে সমস্ত মুখ ভরে যেত, মনে হত সেই হাসির মধ্য দিয়ে এক প্রসন্ন আশীর্বাদের ধারা বুঝি অন্তস্তল পর্যন্ত ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

কুণ্ডে স্নান সেরে অনেক মহিলা আবার ছেলের বউ বা মেয়ে নিয়ে চুপিচুপি মায়ের চালায় আসত। ডালি সাজিয়ে সিধে রাখত, খাটোগলায় জিজ্ঞাসা করত, চান

তো হল, কিন্তু সত্যি ভাগ্যি হবে নাকি গো মা, সন্তান মেলে নাকি ওই কুণ্ডে চান করলে?

জবাব দেবার আগে আবার একপ্রস্থ নিঃশব্দ হাসির বন্যায় সর্বাঙ্গ যেন ভরপুর হয়ে যেত বুড়ীর—যার জন্য সন্তান কামনা তাকে দেখত চেয়ে চেয়ে। বউ বা মেয়ে লজ্জা পেত তখন, বুড়ী তার মাথায় হাত রাখত, পিঠে হাত বুলোতো, বলত, মেলে গো মেলে, চোখ থাকলে মেলে, মন থাকলে মেলে। আমার প্রথম ছেলে মিলল তেতাল্লিশ বছর বয়সে, তারপর ফী বছর একটা করে ছেলে—চেহারাখানা তো মন্দ ছিল না, কত ঠাট্টাঠিসারা করেছে লোকে, লজ্জায় আনন্দে আর বাঁচিনে আমি—কোল আলো করা সব গোপালেরা আমার।

মা বা শাশুড়ী তখন লজ্জা পেতেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুশীতে আশাতে ভরপুর হয়ে উঠতেন। এই মুখের দিকে চেয়ে অবিশ্বাস করতেও শঙ্কা হত তাদের।

তিরিশ বছর আগে ওখানে কোনো চালাঘরও ছিল না, কেউ থাকতও না।

কিন্তু যাত্রী-যাত্রিনীরা আসত আজকের মতই, পাণ্ডাদের মুখে স্থানমাহাত্ম্যের কথা শুনত, কুণ্ডের অলৌকিক কাহিনী শুনত। এই কাহিনী-বিস্তারে পাণ্ডাদের মধ্যে তখন সব থেকে চৌকস ছিল শ্যামলাল পাণ্ডা। এখানকার সকল পাণ্ডাদের মাথা সে তখন। অন্য পাণ্ডারা সামনাসামনি অন্তত তাকে ভয় করে সমীহ করে। বাইরে মানুষটা যত মিষ্টি যত মোলায়েম, ভিতরে ভিতরে তেমনি নির্মম, ক্রূর।

চেহারাখানা ছিল সমীহ কবার মতই। পঞ্চাশের উপর বয়সেও গায়ে অসুরের শক্তি। পবিষ্কার গরদের ধুতি পরে মন্দিরে আসত, ধপধপে পরিষ্কাব পৈতে ঝোলাতো, কপালে আব পুষ্ট বাহুতে ফোঁটাতিলক কাটত। মুখখানা সদা বিনীত হাসি-হাসি, প্রয়োজনমত কিছু ইংরেজি কথাও রপ্ত করেছে। বেশ দেখেশুনে যাত্রী ধরত, আর শেষে দেখা যেত তারা স্বেচ্ছাতেই মোটা কিছু দিয়ে যাচ্ছে। অন্য পাণ্ডারা ঈর্ষা করত তাকে, তার বিরুদ্ধে জটলা কবত, তার দাপট ভাঙার জন্য চুপিসাড়ে শলাপরামর্শও করত—কিন্তু ভরসা করে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কেউ এগতো না।

দুঃসাহস করে দুই-একজন ছোকরা পাণ্ডা তাকে জব্দ কবতে চেষ্টা করেছিল। শ্যামলাল মিটিমিটি চেয়ে দেখেছে তাদের, রাগলেও তার গলা চড়ে না, মুখ বিকৃত হয় না। তেমনি ঠাণ্ডা কৌতুকেই আঙুল দিয়ে অদূরের শ্মশানটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, ওটা এখান থেকে ক'গজ দূরে মেপে এসো।

বাত-বিরেতেও এখানকার জংলাপথে নিঃশঙ্ক চিত্তে একা ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় তাকে। তখন তার হাতে থাকে রুপোয় বাঁধানো পাকা-বাশের লাঠি একটা। লাঠিটার ওজনও তেমনি। শ্যামলাল হেসে হেসে বলে, এর এক ঘায়ে বাঘের মাথার খুলিও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, ভয় করব কাকে?

কিন্তু এই শ্যামলালের প্রতাপের ওপর যেন রাহুর দৃষ্টি পড়ল একবার।

শিবচতুর্দশীব মেলা সেটাও। লোকে লোকারণ্য। রিজার্ভ-করা বাস থেকে একদল যাত্রী নামল। এক নজর তাকিয়েই শ্যামলাল বুঝে নিল শাসালো মক্কেল। জনাতিনেক পুরুষ, জনা দুই বর্ষিয়সী মহিলা, ছেলেপলেসহ কয়েকটি আধ-বয়সী মেয়ে. আর

একটি বউ। একবার তাকিয়েই শ্যামলাল বলে দিতে পারে কার কোথায় ঘা। সে নিঃসন্দেহ প্রায়, ওই বউটি নিঃসন্তান।

মুখে হাসি ফুটিয়ে শ্যামলাল এগলো। তার তাড়া নেই, সে এগোলে আর কোনো পাণ্ডা এগোবে না।

নমস্কার, বাস একেবারে সিউড়ি থেকে রিজার্ভ করে এলেন নাকি? পথে কষ্ট হয়নি তো?

এইরকমই কথাবার্তা তার। দলের কর্তা তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কার করলেন। অমায়িক অভ্যর্থনায় তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, এখানকার সাত্ত্বিক হোমরাচোমরা কেউ হবে। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি?

আমি আপনাদের সেবক। বাবা এখানে মোতায়েন করেছেন তাই আছি। আসুন—

ফলে পাণ্ডা বোঝার পরেও দরদস্তুর করাব কথা কারো মনে হয়নি। শ্যামলালের বেলায় এইরকমই হয়। সবথেকে বয়স্কা রমণীটি তো এমন ভদ্র পাণ্ডা পেয়ে ভাবী খুশী। শ্যামলাল তাদের ঘুরিয়ে সব দেখাতে লাগল, পূজো-আর্চা দেওয়াতে লাগল, স্থানমাহাত্ম্যের গল্প করতে লাগল।

কিন্তু এরই মধ্যে এই দলটির দৃষ্টি এক অপরিচিতার দিকে আকৃষ্ট হল। একটু তফাতে সে-ও তাদের সঙ্গে ঘুরছে সেই থেকে। পাণ্ডার কথা শুনছে, ভুরু কুঁচকে এক-একবার তাকাচ্ছে তাদের দিকে—সেই চাউনিতে এক ধরনের নির্বাক অসহিষ্ণুতা। লোকের ভিড়ে কখনো যদি পিছনে পড়ে আছে, খানিক বাদেই দেখা গেছে কোথা থেকে এসে সে আবার সঙ্গ নিয়েছে। তার পরনে লালপেড়ে আটপৌড়ে শাড়ি, গায়ে মোটা সেমিজ, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর। কিন্তু রূপসী বটে মেয়েটি, এই সাদামাটা বেশেও রূপলাবণ্য যেন ধরে না। মুখে ভারী একটা সুষমা, বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি মনে হয় না। কিন্তু রমণীটির ওই চাউনিটুকুই কেমন অস্বাভাবিক, রোষ-ভরা। অনেকেরই চোখ পড়ছে তার দিকে, অনেকেই লক্ষ্য করছে তাকে, কেবল এই পাণ্ডা শ্যামলাল ছাড়া।

দলের এরা ভাবল, কারো ঘরের বউ, পুণ্য করতে এসেছে—পয়সার অভাবে পাণ্ডা জোটাতে পারেনি, তাই ভালো দল দেখে সঙ্গ নিয়েছে। তবু বার বার তার ওই চাউনিটাই কেমন অস্বাভাবিক লেগেছে।

যাত্রীদের দৃষ্টি লক্ষ্য করার ফলেই শেষ পর্যন্ত রমণীটির প্রতি সচেতন হতে হয়েছে শ্যামলালকেও। সকলের অগোচরে মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছে রমণীটির দিকে। মুখে কঠিন রেখা পড়েছে দুই-একটা। পরক্ষণেই আবার হাসিমুখে যাত্রীতোষণে মন দিয়েছে সে।

এক ফাঁকে দলের বউটিকে দেখিয়ে কর্ত্রী মহিলাটিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল শ্যামলাল, মা, ওই বউমায়ের ছেলেপুলে নেই?

এই প্রসঙ্গে আলোচনার ফাঁকই খুঁজছিলেন প্রৌঢ়া। মাথা নাড়ালেন, নেই। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে এক কুণ্ড আছে বাবা, সেখানে স্নান করলে—

শ্যামলাল তক্ষুনি হাত তুলে নিরস্ত করেছে তাঁকে, বলেছে, আর কিছু ভাববেন না, বাবা বক্রেশ্বরই আপনাদের এনেছেন এখানে, এনেছেন যখন উনি পুত্রবতী হবেন।

মন্দিরের চাতাল ধরে তাঁদের নিয়ে কুণ্ডের সিঁড়ির দিকে এগলো শ্যামলাল।

পিছনে সেই লাবণ্যময়ী অজ্ঞাত রমণীটিও আছে। এইখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার রুষ্ট মুখখানি আরো ধারালো কঠিন হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার দিকে চোখ নেই কারো, দলের সকলে একাগ্রচিত্তে এই কুণ্ডের গল্প শুনছে।

দুই-একটা বাস্তব কথা বলে শ্যামলাল আগে পুরুষদের অবিশ্বাসের খুঁটি নাড়াতে চেষ্টা করেছে—কোথা থেকে এলো এই সব কুণ্ডের তপ্ত জল, এই জলের গুণাগুণ কি তা নিয়ে আজকের লেখাপড়া জানা লোকেরা খুব মাথা ঘামাচ্ছে—যেন এইসব বার করতে পারলেই স্থানের মাহাত্ম্য কমে যাবে। কিন্তু তাতে তো মাহাত্ম্য আবো বাড়বে বাবুমশায়রা, এখন যা পাচ্ছি অন্ধের মত পাচ্ছি, তখন চোখ খুলে পাব, তাঁর করুণা আরো বেশি করে বুঝব। অন্য কুণ্ডের জল তপ্ত গরম, এই কুণ্ডের জলের তাপ বত্রিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট—স্নানেব উপযোগী—তাঁব ইচ্ছা ভিন্ন এ-বকম তফাৎ হবে কেন!

তারপর ভাবাবেগে এক অলৌকিক কাহিনী বিস্তারে মন দিল শ্যামলাল। কোন অতীতকালে গৌড় থেকে বক্রেশ্বরধামেব পথে যাত্রা করেছিল এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ দম্পতি। কে তাদের বলে দিযেছিল, সন্তান চাও তো যাও বক্রেশ্বরধামে। গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে সেই দুর্গম পথ। সেই গহন অরণ্যে বাঘেব মুখে পড়ল দম্পতি। ব্রাহ্মণ নিহত হল। মৃত স্বামীব অবশিষ্ট অস্থি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ব্রাহ্মণী একাই এই দেবাদিদেবের মন্দিরে এসে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। কিন্তু করুণাময়ের কৃপা লাভ কববে বলেই যে তার এখানে আসা। রাতে স্বপ্নাদেশ হল, সব ঠিক আছে বে, সব ঠিক আছে—স্বামীকে নিয়ে ওই পশ্চিমের কুণ্ডে চান করগে যা। ধড়মড় করে উঠে বসল ব্রাহ্মণী, স্বামীর অস্থি নিয়ে কুণ্ডে নামল। ব্রাহ্মণ জীবন ফিরে পেল। তারপব সন্তান কামনা করে কুণ্ডে অবাগহন কবল তারা। তাদেব মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল। সন্তানবতী হয়েছিল ব্রাহ্মণী।

উদাত্ত গম্ভীর গলায় শ্যামলাল বলে গেল, সেই থেকে এর নাম জীবৎস কুণ্ড। ওই কামনা নিযে আজ পর্যন্ত কত লক্ষ মায়েরা এই কুণ্ডে অবগাহন করেছেন ঠিক নেই—

মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে! সব মিথ্যে সব মিথ্যে সব মিথ্যে। সব জোচ্চুবি সব ভণ্ডামি সব ঠকবাজি!

তীব্র তীক্ষ্ণ আকস্মিক এই রোষদীপ্ত চিৎকারে বিষম চমকে উঠল সকলে। এমনকি শ্যামলালও বিমূঢ় হঠাৎ। আশপাশেব সব পুণ্যার্থীরাও দাঁড়িয়ে গেছে।

আটপৌরে বেশবাসেব সেই সুন্দরী রমণীটির দুই চোখে যেন আগুন ঠিকরোচ্ছে। শ্যামলালকেই যেন ভস্ম করবে সে। উত্তেজনায় বুকের কাছটা ফুলে ফুলে উঠছে তার।

হকচকিয়ে গিয়েছিল সকলেই। এদিক-ওদিক লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। শ্যামলালই

আগে সামলে নিল। অস্ফুট ইশারায় দলের লোককে বলল, মাথা খারাপ আছে, এদিকে চলে আসুন—

তেমনি দৃপ্তরোষে সেই বিচিত্র রমণী বাধা দিল আবার, সদর্পে এগিয়ে এসে সন্তানলাভেচ্ছু বউটির হাত ধরে টানল—যেও না, কেন যাবে? সব মিথ্যে, আমার তেতাল্লিশ বছব বয়েস হয়েছে, কম করে তেতাল্লিশ হাজারবার এই কুণ্ডে ডুব দিয়েছি—কিছু হয়নি—কিচ্ছু না—

সকলে হতভম্ব। অবাক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তেতাল্লিশ বছর বয়েস বলল, কিন্তু তিরিশ-বত্রিশের বেশি কারো মনে হয়নি। উদ্ধত আক্রোশে সে বউটির হাত ধরে টানছে আর বলছে, কখখনো যেও না, ওই পাণ্ডার কথায় তোমরা ভুলো না, ও সককলকে এই করে ভাওতা দেয়, দেবতার নামে মিথ্যে বলে পয়সা খায়—

এত লোকের মধ্যে পসার যেতে বসেছে বলেই কিনা কে জানে, শ্যামলালের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল হঠাৎ। এগিয়ে এসে সে বিষম এক চড় বসিয়ে দিল রমণীটির গালে—তিন হাত দূরে পড়ে গেল সে।

নিমেষে পট পরিবর্তন। এ হেন সুশ্রী রমণীকে এভাবে কেউ আঘাত করতে পারে এও অভাবনীয়। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে থেকে বছর বাইশ-তেইশের একটা ছেলে হঠাৎ লাফিয়ে এগিয়ে এসে শ্যামলালের দুটো হাত ধরল।—আপনি এই মহিলার গায়ে হাত তুললেন যে?

শ্যামলাল চাপা উত্তেজনায় বড় একটা নিঃশ্বাস টেনে তাকে দেখল। রোগা পটকা ছেলে, তুলে আছাড় দিতে পারে সে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, হাত ছাড়ো—

ছেলেটা রোগা কালো, কিন্তু মুখখানা ভারী কমনীয়। হাত ছাড়ার বদলে উল্টে সেই হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল একটা, আপনি কেন হাত তুললেন ওঁর গায়ে?

সঙ্গে সঙ্গে আরো বিশ-তিরিশজন তার হয়ে সগর্জনে কৈফিয়ৎ তলব করল, চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল শ্যামলালকে। সকলেই মারমুখী।

কিন্তু যার জন্য এই পরিস্থিতি, সেই রমণীটি আঘাত ভুলে ফ্যাল-ফ্যাল করে ওই ছেলেটিকেই ঘাড় কাত করে দেখতে চেষ্টা করছে—যে শ্যামলালের হাত ধরে আছে।

শ্যামলাল বিচক্ষণ ব্যক্তি, রাগের মাথায় এই কাণ্ড করে বসে এখন কি করে সামলাবে ভাবছে। পরে না হয় এই ছোকরাকে দেখে নেবে। অস্ফুটস্বরে বলল, অন্যায় হয়েছে বাবু—

কিন্তু তার আগেই হাটে হাঁড়ি ভাঙল অন্য পাণ্ডারা। শ্যামলালের ওপর অনেক দিনের রাগ তাদের, এই মওকা ছাড়তে রাজি নয়। শ্যামলালের হয়ে সুপারিশ করার ফাঁকে তারা জানিয়ে দিল, ওই রমণীটি শ্যামলালেরই স্ত্রী, নাম লক্ষ্মীমতী—ছেলেপুলে নেই বলে মাথায় ছিট হয়েছে—অতএব বাবুরা শ্যামলালকে ছেড়ে দিলেই ভালো হয়।

রোষের পরিস্থিতিটা হঠাৎ হাসি বিদ্রূপ টিটকিরির দিকে ঘুরে গেল। যার নিজের ছেলে হয় না সে কিনা অন্যলোকের ছেলেপুলে হওয়ার রাস্তা বাতলে দিচ্ছে!

ছাড়া পেয়ে শ্যামলাল তার সব প্রত্যাশা জলাঞ্জলি দিয়েই সেখানে থেকে পালিয়ে বাঁচল তখনকার মত।

দু'দিন পর্যন্ত প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে শ্যামলালের মাথায়। কিন্তু লক্ষ্মীমতীর দেখা নেই। শ্যামলালের ধারণা, পালিয়ে আছে কোথাও। সেই ছোকরারও সন্ধান করেছে, যে তার হাত ধরেছিল। পায়নি।

প্রথমে স্থির করেছিল, ঘরের কাঁটা একেবারেই শেষ করে দেবে। কিন্তু দু'দিন যেতে অতটা রাগ আর থাকল না। স্ত্রীকে দিয়ে অনেক উপকার হয়। ছেলের জন্যই মাথার গণ্ডগোল, নইলে অন্য সব দিকে ঠিক আছে। তীর্থ করতে এসে অনেক পয়সাঅলা যজমান তার অতিথি হয়। অতিথি নারায়ণ জ্ঞানে লক্ষ্মীমতী তাদের সেবা-যত্ন করে, নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ায়। কিন্তু চতুর শ্যামলাল জানে, তার অপরূপা স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়েই যারা যা দেবার তার দ্বিগুণ চারগুণ দিয়ে যায়। তাব এই ভাগ্যকেও আর সব পাণ্ডারা ঈর্ষা করে।

অতএব এবারের মত ক্ষমা কবা যেতে পারে লক্ষ্মীমতীকে। দুই-একদিন তাব পসারে একটু লোকসান গেল বটে, কিন্তু সে জানে সংস্কার এত ঠুনকো জিনিস নয় যা ভাঙিয়ে সে আবার স্বচ্ছন্দে দিনযাপন করতে পাববে না—পুণ্যার্থীরা কোনদিনই যুক্তির পথে চলে না।

তৃতীয় সন্ধ্যায় ঘরেই দেখল লক্ষ্মীমতীকে। হাসিখুশী ঢলঢলে মূর্তি, ভযের লেশমাত্র নেই মুখে।

শ্যামলাল গম্ভীর।—এ দুদিন কোথায় ছিলে?

লক্ষ্মীমতীর চোখে-মুখে খুশী উপচে উঠছে যেন। ছড়া কেটে গুনগুনিযে উঠল, ছিলাম গো ছিলাম, হারানিধি পেলাম, বলব না বলব না—

মাথা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেল কিনা শ্যামলাল বুঝল না।

কিন্তু ক'দিন না যেতে একটা কথা তার কানে এলো, আর তক্ষুনি মাথার মধ্যে দাউ-দাউ আগুন জ্বলে উঠল। শত্রুর অভাব নেই তার, তারা কানাকানি কবছে, শ্যামলালের এবাবে ছেলে হতেও পারে—গাঁজা ভাঙ খেযে সাবাবাত বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে সে, তার স্ত্রী রাতে ওদিকে মন্দিরের এলাকায় অভিসাবে বেরোয়—পরমানুষের সঙ্গে রাতে একাধিক দিন দেখা গেছে তাকে। শুভার্থীব মত সমবয়স্ক পাণ্ডারাই শত্রুর এই কানাকানি জানিয়ে দিয়েছে তাকে।

শ্যামলালের হঠাৎ মনে হল, সকলেই তাকে দেখে ইদানীং মুখটিপে হাসে বটে, বাঁকা চোখে লক্ষ্য করে থাকে। আবো, আরো নির্মম কিছু স্মরণ হল তার। ক'দিন ধরে লক্ষ্মীমতীর সমস্ত মুখে খুশী ধরে না বটে, কি এক খুশীর বন্যায় ভাসছে যেন সে সর্বদা। সর্বাঙ্গে যেন কাঁচাযৌবনের বন্যা নেমেছে নতুন করে, তাজা পেলবতা এসেছে। মাথার গণ্ডগোলও একেবারে সেরে গেছে।

সেই সন্ধ্যায় শ্যামলাল লক্ষ্মীমতীকে জানালো, যজমানের বাড়ি যাচ্ছে, সেই রাতে আর ফিরবে না।

লক্ষ্মীমতী নাড়ু আর মোয়া তৈরি করছিল আর নিজের মনেই হাসছিল। শ্যামলালের মনে হল, কানে গেলই না।

রূপোবাঁধানো লাঠিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। যদি সত্যি হয়, এই এক লাঠিতেই

কাজ হবে। তারপর রাত ভোর না হতে দুটো দেহ ওই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুঁতে আসতে পারবে সে।

রাত্রি। জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে।

পা-টিপে কুণ্ডের সিঁড়ির চত্বরে দিকে এগলো শ্যামলাল। ওদের গলা শোনা যাচ্ছে. হাসি শোনা যাচ্ছে। কেউ আস্তে কথা কইছে না, আস্তে হাসছে না। এই জ্যোৎস্নায় আবছা দেখতেও পাচ্ছে তাদের।

লক্ষ্মীমতী চত্বের পা ছড়িয়ে বসে আছে, আর তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে কে একজন। শ্যামলাল পায়ে পায়ে এগোচ্ছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্মীমতীর খুশীভরা তরল উক্তি কানে এলো। প্রত্যুক্তিও।

তুই তো আমার গোপাল, সেই গোপাল রে! আমি কিনা চিনতেই পারিনি!

তুমি তো সেই মা যশোদা, নিজেকেই ভুলে বসেছিলে, আমাকে চিনবে কি!

আর ভুলি! নে নাড়ু কটা সব খা বলছি, নইলে রাগ করব। মুখে নাড়ু গুঁজে দিল লক্ষ্মীমতী।

গোপালের অনুযোগ কানে এলো, ফি বারই তো আমি আসি, আর তুমি চিনতেই পারো না, গোপাল কি তোমার একজন নাকি! কেউ খেতেও দেয় না কিছুই না, শুকনো মুখে ফিরে যেতে হয়, মা ছেলে চিনতে না পারলে রাগ হবে না!

বুক-ভাঙা করুণ স্বর লক্ষ্মীমতীর, আ-হা বাছারে—মা যে তোদের চোখের মাথা খেয়েছিল—আর ভুল হবে না, আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না, এবারে দেখলেই চিনে নেব, সকলকে চিনে নেব।

আত্মবিস্মৃত শ্যামলাল একেবারে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছায়া পড়তে লক্ষ্মীমতী চমকে উঠল।—কে!

ছেলেটাও আস্তে আস্তে উঠে বসল। শ্যামলাল দেখলে, সেই রোগা ছেলেটা, লক্ষ্মীমতীকে মারার দরুণ সেদিন যে তার হাত ধরে কৈফিয়ত চেয়েছিল।

ওমা, তুমি! লক্ষ্মীমতী খিলখিল করে হেসে উঠল, হাঁ করে দেখছ কি, ছেলেকে চিনতে পারছ না! দেখো মজা, তোমার আর দোষ কি, আমি পর্যন্ত গোড়ায় চিনতে পারিনি—সেদিন মা বলে ডাকতে তবে চিনেছি গো!

লাঠি হাতে শ্যামলাল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে। এক সময় চমক ভাঙতে দেখে, ছেলেটা চলে গেছে কখন। আর লক্ষ্মীমতী কুণ্ডে ডুব দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে। স্তব্ধ রাত। জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। লক্ষ্মীমতীর সিক্ত বসন, সর্বাঙ্গ সিক্ত, পিঠের ওপরে একবোঝা খোলা ভিজা চুল। সে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসছে, আর শ্যামলালের দিকে চেয়ে হাসছে মিটিমিটি।

মিথ্যে

'মিথ্যে বলব না, মিথ্যে ভাবব না, মিথ্যের রাস্তায় চলব না, মিথ্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না। মিথ্যেকে এ জীবন থেকে বাদ দিলুম, বাদ দিলুম—চিরজীবনের তরে বাদ দিলুম।'

কোনো মস্ত জনের উক্তি নয়। একজনের অনেক দিনের সঙ্কল্পের বয়ান। বুকের ভিতরটা যখন লক্ষ্মীকান্তর ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল, তখন এই কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল। তারপর বলতে বলতে মুখস্থ হয়ে গেছে। সেই বিপর্যয় ঘটে যাবার পর প্রথম তিন মাস তো সকালে উঠে বাসি বিছানায় বসে দু'হাত জোড় করে এই মন্ত্র আওড়াতো। যা বলত তা অনুভব করতে চেষ্টা করত। অনুভব করতও। এখন আর রোজ বলে না। যেদিন মেজাজ বিগড়োয়, অর্থাৎ অনবধানে বা স্বভাবে দুই-একটা মিথ্যে বলে ফেলে—সে-দিন বা তার পরের আরো কয়েকদিন ঐ সঙ্কল্প আওড়ে আত্মশুদ্ধি করে নেয়।

মিথ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় না। নতুন ছোট ফ্যাক্টরী, দশরকম লোকের সঙ্গে যোগ। নরম হলে হেড টার্নার ভুরু কোচকায়, ইউনিটের সহকর্মীরা নিজেদের কাজ চাপাতে চেষ্টা করে, ফোরম্যান অকারণে কৈফিয়ত তলব করার তাল খোঁজে। চাকরি বাচানো, জান বাঁচানো আর মান বাঁচানোর দায়ে তখন যা মুখে আসে বলে দিতে হয়। সত্যি-মিথ্যে পরের বিচাব। তাছাড়া অভ্যেসেও মুখ দিয়ে কত যে মিথ্যে বেরোয় ঠিক নেই। লক্ষ্মীকান্ত নিজেব কথাব ওপর চোখ রেখে দেখেছে মিথ্যে বলা বন্ধ করতে হলে কথা বলাই কমে যায়।

গত দু'বছরে তার মিথ্যে বলা যেমন অনেক কমেছে, কথা বলাও তেমনি কমেছে। যা দু'চারটে এখনো বলে ফেলে—মনে মনে জিব কাটে, অদৃশ্য দেবতাব কাছে ক্ষমা চায়, আড়ালে এসে নিজের নাক-কান মলে। আর একটু বড়দবের কিছু মিথ্যে বলে ফেললে সকালে উঠে প্রতিজ্ঞার সুরে সঙ্কল্প ঝালিয়ে নেয, 'মিথ্যে বলব না, মিথ্যেকে চিরজীবনের তরে বাদ দিলুম.....'

লক্ষ্মীকান্তকে সকলে এক নম্বরের গোঁয়ার বলে জানে। আর সুদামের খ্যাতি বুদ্ধিব জন্যে। লক্ষ্মীকান্তর রেগে উঠতে যেমন সময় লাগে না, সুদামের বুদ্ধির খেলা দেখাতেও তেমনি সময় লাগে না। শরীরের রক্ত ছলাৎ কবে একবার মাথায় উঠেছিল বলেই মহাদেবের মেয়ে রঞ্জনাকে সে চিরকালের জন্য হারিয়েছে। আর, সেই মাথাই খুব ঠাণ্ডা ছিল বলে রঞ্জনা সুদামের ঘরে গেছে। পরিতাপে বুকের ভিতরটা এখনো শূন্য ঠেকে। আবার রাগও হয়। ভালো হযেছে, খুব ভালো হয়েছে—ঐ মেয়ে তাব ঘরে এলে কোনদিন হয়ত বা খুনই হত তাব হাতে। সুদামের বউ রঞ্জনার ঢং-ঢাং এখনো এক-একসময় চোখে বেঁধে তার।

জামাই লক্ষ্মীকান্তকেই করবে ঠিক কবেছিল মহাদেব। কাবণ তার চোখে সে মরদের মত মরদ। বিয়ে হয়েই যেত, কিন্তু অকালে মরে গেল লোকটা। সাপে কাটল। বিয়ে পিছিয়ে গেল। রঞ্জনার মায়ের কানে কে মন্ত্র দিল, অঘটনে মৃত্যু, এক বছরের আগে আর ঘর খালি কোরো না। বছর ঘুরুক তাবপর মেয়ের বিয়ে দিও।

বছরও ঘুরল, মেয়ের বিয়েও হল। কিন্তু তার বদলে জামাই হল গিয়ে ঐ সুদাম।

বাপ মরতে মেয়ের ধিঙ্গিপনা বেড়েছিল। কেবল লক্ষ্মীকান্তকেই যা একটু সমীহ করত। মেলাতে গেছল দু'জনে। ফেরার সময় মুষলধারে বৃষ্টি। ভিজে সারা। জঙ্গলের নিরিবিলি রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরেছে। লক্ষ্মীকান্তর দু'চোখ বার বার অবাধ্য হয়েছে। রঞ্জনার

শাড়ি-জামা গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে, সুঠাম যৌবনের ভাঁজগুলো বড় বেশি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, ওর চলার ছাঁদে সেগুলি যেন আরো অনাবৃত হয়ে লক্ষ্মীকান্তর চোখ টানছে আর ভিতর টানছে। রঞ্জনা সেটা টের পেয়েছিল। খিলখিল করে হেসে উঠেছিল হঠাৎ। বলেছিল, পথ দেখে চলো না, হোঁচট খাবে যে গো!

এর ঠিক তিনদিন বাদে বিকেলের দিকে পুকুর-ঘাট ধরে রঞ্জনাদের বাড়ি আসছিল লক্ষ্মীকান্ত। কিন্তু পুকুরের কাছ অবধিই আসা হল। পুকুরটার তিনদিকে ঝোপ-ঝাড় —ঐটুকুই যা আবরু। জল নিতে এসে রঞ্জনা মনের আনন্দে পুকুরে নেমে হেলেদুলে সাঁতার কাটছে। ঐ পুকুরের জলে যেন নিজেকে বিলোচ্ছে ও—চিৎ হয়ে, উবুড় হয়ে, ডুব দিয়ে। আর ওদিকে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ড্যাব-ড্যাব করে সেই দৃশ্য দেখছে ভদ্রঘরের দুটো বখাটে ছোকরা। রঞ্জনা যে ওদের দেখে নি তাও নয়, দেখেছে বলেই যেন মজা পাচ্ছে। বুকে অবশ্য গামছা জড়ানো। আড়ে আড়ে দেখছে, হাসছে অল্প অল্প, জলের ওপর অঙ্গ বিছিয়ে শুয়েই পড়ছে যেন। সোজা হয়ে একমুখ জল নিয়ে ওদের দিক ফিরেই পিচ করে ছুঁড়ে দিল।

লোভে লোভে ছোকরা দুটো ঝোপের পাশ ছেড়ে আরও দু'পা এগিয়ে এলো আর তারপরেই হঠাৎ ভূত দেখে গা-ঢাকা দিল। ব্যাপার না বুঝে রঞ্জনা জলের মধ্যে পিছন ফিরে দেখে এ-পাড়ে লক্ষ্মীকান্ত দাঁড়িয়ে। চোখ দিয়ে যেন ভস্ম করবে তাকে।

রঞ্জনা অপ্রস্তুত একটু হল বটে, কিন্তু ভয় পেল না। ঐ মরদের চোখে সিক্ত-অঙ্গের নেশা কেমন লাগে তা সেদিন জলে ভিজেই বেশ টের পেয়েছে। ধীরে-সুস্থে বুকজলে এসে দাঁড়াল। আরো গোটা দুই ডুব দিয়ে পাড়ে এসে উঠল, কলসীতে জল ভরল, তারপর হেলে-দুলে কাঁচা মাটির ধাপ ধরে উঠতে লাগল। ঠোঁটের ফাঁকে কিছুই লক্ষ্য না করার নির্লিপ্ত হাসি।

লক্ষ্মীকান্ত ততক্ষণে ঘুরে এসে এই পারে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন বৃষ্টিতে নেয়েছিল রঞ্জনা, এইদিন পুকুরে। রক্তে সেদিন নেশা লেগেছিল লক্ষ্মীকান্তর, এইদিনে আগুন জ্বলল।

—লজ্জা করে না, চোখ-কানের মাথা খেয়ে দিনে-দুপুরে এভাবে গা ভাসিয়ে চান করতে? খুব গরম হয়েছে, শরীরের খুব তাপ বেড়েছে আজকাল, না?

ফলে রঞ্জনার মেজাজও ঠাণ্ডা থাকল না খুব। ঠমক দেখিয়ে ঘাড় তেরচা করে তাকালো তার দিকে।

—লজ্জা আবার কি, নিজেদের পুকুর, চান কবব না, গা ধোব না?

মুখে মুখে জবাব না দিলেও লক্ষ্মীকান্ত ঠাণ্ডা হতে পারত একটু। মারমুখো হয়ে কাছে এগিয়ে এলো।

—সকলের চোখের ওপর খোলা পুকুরে চান করতে হবে, কেমন? আর ওদিকে যে বদমাস ছোঁড়াগুলো হাঁ করে রূপ গিলছিল, তা দেখতেও খুব মজা লাগছিল, অ্যাঁ? ফের দেখি তো হাড়মাস একেবারে আলাদা করে দিয়ে ঠমক দেখিয়ে চান করা আর রূপ-গেলানো বার করব আমি—

—ইস, হাড়-মাস আলাদা করবে, বেশ করব চান করব, বেশ করব রূপ দেখাব।

বিষ্টিতে ভেজার কালে নিজের যে রূপ ছেড়ে হাড়-মাস সুদ্ধ গেলার নেশা লাগে, সে গেলায় দোষ হয় না—

ব্যস, তারপরেই তাজ্জব ব্যাপার। রঞ্জনার কাঁখের কলসী মাটিতে পড়ে খান-খান, মাথা ঘুরে তিন হাত দূরে ছিটকে শেষে বসেই পড়েছে সে। চোখে লাল-নীল-হলদে দেখেছে। তার ভেজা-ভেজা গালে লক্ষ্মীকান্তর পাঁচটা আঙুলই বসে গেছে। এমন একটা চড় রঞ্জনার গালে বাপের শাসনের কালেও পড়ে নি কোনদিন।

চড়ের ফলাফল কি দাঁড়াল তা দেখাব জন্য লক্ষ্মীকান্ত আর সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল না। পায়ে করে মাটি আছড়াতে আছড়াতে প্রস্থান করেছিল। পরে অবশ্য তার ভিতরটা একটু চড়-চড় করেছে। আর মনের দুঃখে ব্যাপারটা সুদামকে বলেওছে।

সুদাম তারপর কি কাণ্ড করেছে লক্ষ্মীকান্ত জানে না। চড় না দিয়ে বা না খেয়েও ভিতরটা তার ইদানীং সর্বদাই চড়-চড় করছিল। দেখতে শুনতে যা হয়েছে আজকাল-রঞ্জনাকে দেখলেই তার ভিতরটা হু-হু করে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

অতএব ফাঁক পেয়েই সে রঞ্জনাদের বাড়ি ছুটেছে। সেখানকার বাতাস গবম, সুদামের সহৃদয় পদার্পণে আরো গরম হল। রঞ্জনার মা চিৎকার করে বাতাসে ঘোষণা করছে, অমন ডাকাতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না—দেবেই না। চোখ বোজার আগে মিনসে নেহাৎ কথা দিয়েছিল বলেই ওর কাছে মেয়ে দিতে বঞ্জনার মা আপত্তি করেনি—কিন্তু এত সাহস ওর যে বিয়ের আগেই মেয়েকে খুন করে—বিয়ের পরে কি করবে? অতএব আর তার সোয়ামীর কথা রাখার দায় নেই, খুনীর হাতে মেয়ে দেবার একটুও ইচ্ছে নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুদাম বিষণ্ণমুখে জানিয়েছে খবরটা শুনেই সে ছুটে এসেছে। লক্ষ্মীকান্ত এখান থেকে গিয়েই চড় মারার কথাটা বাহাদুরি করে তাকে বলেছে।

এই সহানুভূতির সুফল পেয়েছে সুদাম। রঞ্জনার মা মেয়েকে ডেকে এনে সেই কথা তাকে শুনিয়েছে। ফলে মা-মেয়ে দু'জনেরই চোখে নতুন করে আগুন লেগেছে। আর রঞ্জনার গালে এখনো সেই চড়ের দাগ আবিষ্কার করে সুদাম শিউরে উঠেছে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে।

তারপর রয়েসয়ে লক্ষ্মীকান্তর প্রশংসাই করেছে সে, লোক তো ভালই, ভাল জামাই-ই করতে চেয়েছিল রঞ্জনার বাবা। কিন্তু রাগলে একেবারে চণ্ডাল, একেবারে খুন না করা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হওয়ার ধাত নয়। সঙ্গে সঙ্গে চড়ের এক মর্মান্তিক ঘটনাও মনে পড়ে গেছে তার। কোন বাপ তার সোমত্ত ছেলের গালে চড় কষিয়েছিল একটা—রগ ছিড়ে গিয়ে ছেলেটা চোখের সামনে ধড়ফড় করে মরে গেল। সামান্য থেকে কখন যে কি অঘটন ঘটে যায়। লক্ষ্মীকান্তর তো কথায় কথায় হাত ওঠে—

রঞ্জনা আর তার মায়ের মনে অঘটনের ছায়া বেশ এঁটে বসল। তার ওপর রাগের জ্বালা তো আছেই। অতএব লক্ষ্মীকান্ত বাতিল, একেবারে বাতিল, খুনীর ঘরে ঘর করতে যাওয়ার বাসনা আর রঞ্জনার একফোঁটাও নেই। এখন শুধু ওকে জব্দ করে জ্বালা জুড়োতে চায় ও।

জব্দ হবার জন্য লক্ষ্মীকান্ত পরদিনই সেধে এসেছিল। রঞ্জনার মা তাকে ঝাঁটা দেখিয়ে দূর করে দিয়েছে। ফাঁক খুঁজে লক্ষ্মীকান্ত রঞ্জনার কাছেও এসেছিল। ও-ও তাকে মনের সাধে অপমান করেই বিদায় করেছে।

লক্ষ্মীকান্তর মাথায় আবারও আগুন জ্বলেছে, আবারও একটা হেস্তনেস্ত করতে চেয়েছে সে। কিন্তু সে সুযোগ আর পাবে কেমন করে? দু'-চার মাসের মধ্যেই বুঝতে পারল, হেস্তনেস্ত হয়েই গেছে—তার ঘরে রঞ্জনা আর আসবেই না। সুদাম জানিয়েছে এত করে বলেও ওই মা-মেয়েকে বোঝানো গেল না—লক্ষ্মীকান্তর নাম শুনলে মা-মেয়ে দু'জনেই ঝাঁটা নিয়ে আসে। রঞ্জনার মা সুদামকেই জামাই করতে চেয়েছিল, কিন্তু বন্ধুর মুখ চেয়ে সে রাজি হচ্ছে না বলে রেগে গিয়ে এখন ভিনগাঁয়ে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে ঐ মা—বিয়ে হয়েই যাবে বোধহয়।

ভেবে-চিন্তে শেষে লক্ষ্মীকান্ত সুদামকে প্রায় অনুরোধই করেছে, বিয়েটা তুই-ই করে ফেল সুদোম—আমার জন্যে আর দুঃখ করে কি করবি, অদেষ্টে নেই হবে কি করে। রঞ্জনাকে তোরও তো ভালই লাগত, কেন মিথ্যে অপরের ঘরে যেতে দিবি।

সুদাম সহজে রাজি হয়নি, লক্ষ্মীকান্ত তাকে অনেক করে বোঝাতে তবে নরম হয়েছে।

সে-সব সাত বছর আগের কথা। কিন্তু রঞ্জনার রাগ এখনো যায় নি। লক্ষ্মীকান্ত সুদামের বাড়ি প্রায়ই যায়। ফাঁক পেলেই রঞ্জনা ঠারে-ঠোরে অপমান করতে চেষ্টা করে তাকে। তাকে দেখিয়ে স্বামীর সঙ্গে চোখে বেঁধার মতই ঢং-ঢাং করে। তাকে জব্দ করার তাড়নায় ফাঁক পেলে সুদামকেও দুর্বুদ্ধি দেয়। সাত বছরেও একটা ছেলেপুলে হয় নি রঞ্জনার, শরীরের বাঁধুনি এখন আগের থেকেও ভালো। এক-একসময়ে লক্ষ্য করে লক্ষ্মীকান্ত, আবার নিজেকেই চোখ রাঙায়—পরস্ত্রীকে ও-ভাবে দেখতে নেই, পরস্ত্রীকে নিয়ে ভাবতে নেই।

নেই নেই করে আর নিজের ওপর চোখ রাঙিয়ে ভিতরের অশান্ত তাড়নাটাকে অনেকটাই বশে এনেছিল লক্ষ্মীকান্ত। তবু এক-একসময় দেহের হাড়গুলো সুদ্ধু যেন গুমরে উঠতে চাইত। সে-ভাবটা গেল গতবারের ঐ ঘটনার ফলে—যে ঘটনার জের সামলাবার তাগিদে জীবন থেকেই মিথ্যেকে দূর করে দেওয়ার সঙ্কল্প তার।

সুদাম আর ও একই ফ্যাক্টরিতে চাকরি করত। বুদ্ধির জোরে আর মুখের দাপটে সুদাম ফাক্টরির মেহনতী মানুষদের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরের বাবুরা এসে তাদের অনেক রকমের প্রেরণা জুগিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছে। ওদের ইউনিয়ন হয়েছে। সেই ইউনিয়নের পাণ্ডা সুদাম। দাবি জানিয়ে এ-যাবৎ কিছু সুবিধাও আদায় করা গেছে। খোদ ম্যানেজার দত্তসাহেব তাদের দাবি শুনেছেন, আর ওদের আরজি-মাফিক কিছু সুব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এই ম্যানেজার হালের আমদানী, মাত্র বছর দেড়েক হল এসেছেন। বয়স বেশি নয়, আর মেজাজপত্তরও আগের জনের মত তিরিক্ষি নয়। প্রথম দফা দাবির বেশির ভাগ মেনে নেওয়ার ফলে দত্তসাহেবকে একটু নরম মানুষ ভেবেছিল সবাই। তাই সুদামের উৎসাহে ইউনিয়নের চাহিদার সুর চড়ছিল একটু একটু করে, সাত-আট মাস না যেতে নতুন একদফা দাবির তোড়জোড়

করছিল তারা। দত্তসাহেব একদিন সুদাম আর দলের আরো জনাকয়েক পাণ্ডাকে ডেকে মিষ্টি করে বলে দিলেন, আমাদের ছোট ফ্যাক্টরি, আর তোমাদের নতুন ইউনিয়ন। ফ্যাক্টরিও বড় হোক, তোমাদের ইউনিয়নও বড় হোক।—কিন্তু গোড়াতেই দাবিটাবিগুলো বেশি উঁচিয়ে উঠলে ফল ভাল হবে না, তাহলে নতুন ইউনিয়ন ভেঙে দিতেই চেষ্টা করবেন তিনি।

সুদাম তখনকার মত ঘাবড়েছিল। কিন্তু সাকরেদদের সঙ্গে পরামর্শ করে মনে হয়েছে, ওটা দত্তসাহেবের হুমকি ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে ভয় মালিকদেরই পাওয়ার কথা, তাদের নয়। অতএব দিনকয়েক চুপ করে থেকে আবারও তারা নরম-গরম প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

ঠিক সেই সময়ে এক কাণ্ড। লক্ষ্মীকান্তর ভিতরে এমন এক পরিবর্তন আসবে বলেই বুঝি ঘটেছিল ব্যাপারটা। নইলে এমন তো সচরাচর ঘটে না।

গরমের সময় সেটা। কি জন্যে যেন ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল সেদিন। সুদামেব বাড়ি থেকেই মেঠো রাস্তা ধরে ফিরছিল। কাজ-কর্মে গাফিলতি করে ইউনিযন নিয়ে বেশি মাতামাতি না করার পরামর্শ দিতেই গেছল তাকে। বলেছিল, নাগালের বাইরে হাত বাড়ালে সে হাতের মুঠোয় শেষ পর্যন্ত কিছু আসে না—যা কববে রয়েসয়ে করো।

শুনে রঞ্জনা ফোঁস করে উঠেছিল, সুদামকে বলেছিল, খুব উচিত পরামর্শই দিয়েছে বন্ধু তোমাকে, খাঁটি কথাটি বলেছে—নাগালের বাইবে হাত বাড়িয়ে কি দশা হয়েছে এখনো দেখছ না? পরে হেসে হেসে লক্ষ্মীকান্তর মুখখানাই ঝলসে দিতে চেষ্টা করেছে সে, বীরপুরুষেরা বড়জোর মেয়েছেলে ঠেঙায়, ম্যানেজারের সঙ্গে লাগতে যাবে কেন! কি বলো?

সুদাম হি-হি করে হেসে বউয়ের কথার তারিফ করেছে। দূবে বসে সুদামের তেরো বছরের ভাগ্নে দুলালও মামীর দিকে চেয়ে কিছু যেন রসের সন্ধান পেয়েছে। না, সুদাম আর কিছু বলে নি, উঠে চলে এসেছে। অন্যমনস্কের মতই হেঁটে আসছিল।

হঠাৎ মুগুরের ঘা পড়ল বুঝি বুকের মধ্যে একটা। গেল—কার ছেলেটা বুঝি গেল। ফ্যাক্টরির পিছনের দিকের নিরিবিলি উঁচু রাস্তা। মেঠো পথ ধরে সেদিকেই আসছিল লক্ষ্মীকান্ত। একেবারে কালান্তক যমের মুখে ফুটফুটে একটা আট-ন' বছরের ছেলেকে দেখে অস্ফুষ্ট আর্তনাদ করে উঠল সে। ছেলেটার সাত-আট গজ দূরে রাস্তা আগলে মস্ত ফনা তুলেছে এক কালনাগ। দেখলেই গায়ের রক্ত হিম হবার মত। কুণ্ডলী পাকিয়ে আধ-কোমরের বেশি ফনা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ছেলেটার সমস্ত চেতনাই লোপ পেয়ে গেছে বুঝি, এক পা-ও নড়তে পারছে না, পিছন ফিরে দৌড়তেও পারছে না—দাঁড়িয়ে কাঁপছে থর থর করে। দূরে একটা লোকের হাঁক শোনা গেল, কিন্তু সেদিকে তাকাবার অবকাশ নেই লক্ষ্মীকান্তর। ঐ বিষধর ফণা নামানোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কি হবে, কি হতে পারে, খুব ভালো করেই জানে সে। ছেলেটার সর্বাঙ্গ বিষে নীল হয়ে যাবে। ছোবল মারবার উদ্দেশ্যে না থাকলে মেঠো ঝোপঝাড় ছেড়ে এভাবে রাস্তায় উঠে আসত না।

লক্ষ্মীকান্তর হাতে বুকসমান পাকা বাঁশের লাঠি একটা। ফ্যাক্টরি হবার পর

এদিকটায় সাপের উপদ্রব কিছু কমেছে বটে, লোকে মেরে-মেরেই এদিকে সাপের বংশ লোপ করে এনেছে প্রায়। কিন্তু এদিক-সেদিক যেতে হলে লাঠি একটা করে প্রায় সকলের সঙ্গেই থাকে। বিশেষ করে মেঠো আল ধরে বা জংলা রাস্তায় যাতায়াত করতে হলে। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তর দৌড়ে গিয়ে ছেলেটাকে রক্ষা করার সময় নেই। সে দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় বিশ গজ দূরে। ততক্ষণে যা হবার হয়েই যাবে। সাপের দৃষ্টি সামনেব দিকে, আর লক্ষ্মীকান্ত দাঁড়িয়ে আছে আড়াআড়ি।

চোখের আর সমস্ত ভাবনা-চিন্তাব মধ্যে যে বিদ্যুৎ খেলে গেল তা কয়েক নিমেষের ব্যাপার মাত্র। লক্ষ্মীকান্ত যা করবার করে ফেলেছে, বাতাস কেটে লাঠি ছুটেছে—এখন ভগবান জানেন ঐ দুধের ছেলে রক্ষা পাবে কিনা।

সাপটাব ফণা ওপাশেব মাটিতে সজোরে আছাড় খেয়েও আস্তে আস্তে সোজা হতে থাকল আবার। ফণার নীচে গলার কাছেই লেগেছে লাঠিটা, আঘাতটা কোনদিকে থেকে এলো বোঝবার জন্য এদিকে ফিবল একটু। লক্ষ্মীকান্ত ততক্ষণে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে ছেলেটাব দিকে। ওদিকে আহত কালনাগ মাটিতে ফণা নামিয়েছে। আঘাত জোরেই লেগেছে, তাই ক্রোধ যত, গতি তত নয়। আব আক্রমণটা কোনদিক থেকে এল বুঝতে চেষ্টা করেও সে সময নষ্ট কবেছে একটু।

হাত চাবেকেব মধ্যে আসার আগেই লক্ষ্মীকান্তর একধাক্কায় ছেলেটা রাস্তাব ওধারে ছিটকে পড়েছে। আস্তে আস্তে সাপটা ফণা তুলেছে। কিন্তু কালনাগেরই কাল ঘনিযেছে এবাবে, কাবণ হাতেব লাঠি আবাব লক্ষ্মীকান্তেব হাতে। লাঠিটা ভালোমত লাগার দরুণ বেশি দূবে ছিটকে পড়ে নি। লক্ষ্মীকান্ত আগে ধবাশায়ী ছেলেটাকে আড়াল করেছে—তাবপব কে কাব যম সেই বোঝাপড়াব মুহূর্ত।

বিষধবেব নাগ-লীলা একেবারে শেষ হবার আগে কোনদিকে তাকাবার অবকাশ ছিল না লক্ষ্মীকান্তব। এতক্ষণে খতম হয়েছে। সাপ বটে একটা। হাঁফাতে হাঁপাতে লক্ষ্মীকান্ত এদিক-ওদিক তাকাল এবার। ছেলেটাকে কে একজন কোলে তুলে নিয়েছে। বাড়ির চাকব হবে, ওরই গলা শোনা গেছল বোধহয় একটু আগে। ও ছাড়া আরো তিন-চাব জন লোক এসেছে। কিছু একটা ঘটেছে বুঝে দূব থেকে কেউ কেউ ছুটে আসছে।

ছেলেটাকে ভালো করে দেখল লক্ষ্মীকান্ত। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গা-হাত-পা ছড়ে গেছে। ফুটফুটে ছেলে, কিন্তু সমস্ত মুখ ভয়ে সাদা তখনো। লোকটার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

লক্ষ্মীকান্ত বড় করে একটা দম নিযে জিজ্ঞাসা কবল, কাদের বাড়ির ছেলে গো, দিয়েছিল তো শেষ করে।

ছেলে কাধে পাংশুমূর্তি লোকটা আঙুল দিযে দূরের একটা বাংলো দেখালো। আর সেই মুহূর্তেই বিস্ময়ের বুঝি শেষ নেই তার। ঠিক দেখল কিনা বা ঠিক বুঝল কিনা সংশয়।

—ফ্যাক্টবির ম্যানেজার সাহেবেব? দত্তসাহেবের?

লোকটা ঘাড় নাড়ল।

সাপ মেরে লক্ষ্মীকান্ত নিজেই তাজ্জব। আর যারা এসেছিল, লক্ষ্মীকান্তর বুদ্ধি, সাহস আর ক্ষিপ্রতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তর সে-সব কানেও যাচ্ছে না। লোকটার কাঁধে ঝিমিয়ে-পড়া ছেলেটাকে দেখছে আর ভাবছে সময়ে এসে না পড়লে বা ঠাকুর মুখ তুলে না তাকালে ম্যানেজার সাহেবের বাড়িতে আজ কি শোকের ব্যাপারটাই না ঘটে যেত। সুদামের বাড়ি থেকে বেরুবার পর এই সময়টুকুর মধ্যেই জীবনের স্বাদই বুঝি বদলে গেল লক্ষ্মীকান্তর।

বড় বাঁশ আনা হল একটা। সাপটাকে তার মাঝে ঝুলিয়ে দু'টো লোক বাঁশটা কাঁধে তুলে নিল। তারপর সকলে মিলে চলল দত্তসাহেবের বাড়ি। বাঁশের লাঠি হাতে লক্ষ্মীকান্তকেও সাদরে নিয়ে চলেছে তারা। এ সাপটা অবশ্য খুবই বড়, তবু সাপ অনেক মেরেছে সে। বড়ও মেরেছে দু-পাঁচটা। কিন্তু এত রোমাঞ্চ আর কখনো অনুভব করে নি। লাঠি হাতে বোকা-বোকা মুখ করে সঙ্গে চলেছে সে।

দূর থেকে দেখল বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছেন দত্তসাহেব আর তাঁর বউ। বাঁশে একটা সাপ ঝুলিয়ে পাঁচ-সাত জন লোককে বাংলোয় ঢুকতে দেখে দু'জনেই অবাক হয়েছেন। তারপরেই চোখে-মুখে ত্রাস তাঁদের। চেয়ার ছেড়ে দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। ছেলেকে চাকরের কোলে দেখেই সম্ভবত।

চাকর তাঁদের সামনে ছেলেকে নামিয়ে দিল। বাবা-মাকে দেখে ছেলেটা পায়ে জোর পেয়েছে এতক্ষণে। কিন্তু ভয়ে বুক শুকিয়ে আছে তখনো। দু'হাতে মা-কে জড়িয়ে ধরল সে। তার গা-হাত-পায়ে ক্ষতচিহ্ন দেখে দত্তসাহেব আর তাঁর বউ দু'জনেই ভয়ে বিবর্ণ। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে দত্তসাহেবের বউ কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে বসে পড়েছেন আবার।

বড় অঘটন কিছু ঘটে নি সেটা বুঝতে অবশ্য সময় লাগল না। ছেলে তাহলে এভাবে মাকে জড়িয়ে ধরতে পারত না।

ঘটনাটা চাকরের মুখে শুনলেন তাঁরা। ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেঠো-আলের একটা বককে তাড়া করে খোকাবাবু এগিয়ে গেছল। তাতেই এই বিভ্রাট। মাঠ থেকে ঐ সাপ উঠে এসেছে। তার পরের ঘটনা বিস্তারে শুধু চাকর নয়, আর যারা ছিল তারাও যোগ দিয়েছে—নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে খোকাবাবুর প্রাণটি ঐ ও রক্ষা করেছে—ঐ লক্ষ্মীকান্ত।

রক্ষা করবার সেই বিবরণ শুনে দত্তসাহেবের বউকে বার বাব শিউরে উঠতে দেখেছে লক্ষ্মীকান্ত। সাপটার দিকেও যতবার তাকিয়েছেন—কেবল শিউরে উঠেছেন। অত বড় সাপ আর দেখেন নি।

দত্তসাহেব স্তব্ধ। বারকয়েক চেয়ে চেয়ে লক্ষ্মীকান্তকে দেখেছেন শুধু।

দৃশ্যটা লক্ষ্মীকান্তর কেন যে এত ভালো লেগেছে, জানে না। সব থেকে বেশি চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে ছেলে জড়িয়ে ধরে মায়ের বসে থাকার মূর্তি দেখে। দত্তসাহেবের বউকে এই প্রথম দেখল সে। বয়েস তিরিশের মধ্যে। সুশ্রী। মুখখানা ফ্যাকাসে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় আবার ছেলেপুলে হবে। পিঠের ওপর খোলা চুল।...যমের মুখ থেকে ফেরা ছেলেকে জড়িয়ে-ধরে-বসা মায়ের এমন মূর্তি আর দেখে নি।

চোখে পলক পড়ে না, লক্ষ্মীকান্ত দেখছে।

দত্তসাহেবের হুঁস ফিরল যেন। তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলেন। তুলো আর ডেটলের শিশি নিয়ে তক্ষুনি ফিরলেন। ছেলের হাত-পা-গায়ের যে-সব জায়গা ছড়ে গেছে, তুলো ভিজিয়ে সে-সব জায়গা মুছে দিলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীকান্তর দিকে ফিরলেন। লোকটাকে চেনা-চেনা লাগল। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোথাও লাগেনি তো?

লক্ষ্মীকান্ত মাথা নাড়ল, লাগেনি।

এগিয়ে এসে মরা সাপটাকে আর একবার ভালো করে দেখলেন তিনি। তারপর পকেট থেকে ব্যাগ বার করে একটা দশ টাকার নোট যারা সাপ বয়ে এনেছিল তাদের একজনের হাতে দিয়ে বললেন, আচ্ছা তোমরা এসো—এটাকেও তুলে নিয়ে যাও। লক্ষ্মীকান্তর দিকে ফিরে ইশারায় তাকে একটু অপেক্ষা করতে বললেন।

তারা সাপ তুলে নিয়ে আনন্দ করতে করতে চলে গেল।

দত্তসাহেব কাছে ডাকলেন লক্ষ্মীকান্তকে, বললেন, ওই চেয়ারটায় বোসো।

লক্ষ্মীকান্ত বারান্দায় উঠে এলো বটে, কিন্তু বসতে পারল না। দাঁড়িয়েই রইল।

—ওটা কি সাপ?

—আজ্ঞে, আমরা কাল-নাগ বলি।

চুপ করে মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে দত্তসাহেব আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় কাজ করো?

—হুজুরের কারখানায়।

এইজন্যেই চেনা-মুখ মনে হয়েছিল।—কি নাম তোমার?

—লক্ষ্মীকান্ত।

কি ভেবে দত্তসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ছেলে, জানতে?

লক্ষ্মীকান্ত মাথা নাড়ল, জানত না। একটু চুপ করে থেকে দত্তসাহেব বললেন, তুমি আমার কি ফিরিয়ে দিয়েছ বুঝতেই তো পারছ।...এখন আমি কি করতে পারি বলো।

দত্তসাহেব সিগারেট ধরাচ্ছেন। সেই ফাঁকে লক্ষ্মীকান্ত ছেলে আর মায়ের দিকে তাকালো। ছেলেটার মুখের রঙ ফিরেছে এতক্ষণে। তাকেই দেখছে। আর তার মা-ও তার দিকেই চেয়ে আছেন। ওই মুখেই শুধু ভাষা নেই, কিন্তু টানাটানা চোখে কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ছে বুঝি। ভিতরটা জুড়িয়েই যাচ্ছে লক্ষ্মীকান্তর। ওই মা আবারও মা হতে চলেছে সেইজন্যই অত ভালো লাগছে কিনা জানে না।

সিগারেট ধরিয়ে দত্তসাহেব তাকিয়েছেন তার দিকে। লক্ষ্মীকান্ত একটু ভেবে তাঁর কথার জবাব দিল। বলল, খোকাবাবুর জন্য একটু পুজোটুজো দেন হুজুর।

দত্তসাহেবের দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর আটকে রইল খানিক। হাসলেন তারপর। —তা তো দেব, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি?

মাথা খাটিয়ে লক্ষ্মীকান্ত জবাব দিল, খোকাবাবুর জীবন রক্ষা হয়েছে, আমি তাতেই অনেক পেয়েছি হুজুর।

খবরটা ফ্যাক্টরিতে প্রচার হতে সময় লাগেনি। দশ টাকা বখশিশ নিয়ে যারা ফিরেছিল, তাদের মুখ থেকেই সকলের কানে উঠেছে। এ-দিকে দত্তসাহেব নিজেও সহকর্মীদের কাছে ছেলের প্রাণ বাঁচার আর বাঁচানোর গল্প করেছে। সেই সব অফিসাররাও লক্ষ্মীকান্তকে ডেকে পিঠ চাপড়ে আর তার সাহস আর বুদ্ধির প্রশংসা করেছেন।

সকলের কাছে লক্ষ্মীকান্তর কদর বেড়ে গেছে।

শুধু একজনের কাছে ছাড়া। রঞ্জনার। লক্ষ্মীকান্ত আবার বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে সুদামকে সাবধান করার স্থলে তাকে ঠেস দিয়েছে, সাপ ঠেঙিয়ে ম্যানেজারের পেয়ারের লোক হয়েছে, এখন একটু কথা-বার্তা শুনে চলো—নইলে কোনদিন গিয়ে হয়ত দেখবে চাকরি নেই।

রঞ্জনার জ্বালা কোথায় লক্ষ্মীকান্ত ভালই বুঝতে পারে। মনে মনে হাসে সে। চাকরির উন্নতি যে হবে ক্রমশ তাতে তারো সন্দেহ নেই। এখন আরো মন দিয়ে কাজ-কর্ম করছে সে। সর্বদিক শেখা হলে দত্তসাহেবের কৃপায় হেড-টার্নার ছেড়ে একদিন সমস্ত কর্মচারীদের চার্জ-হ্যাণ্ডও হয়ে বসতে পারে। লোভে পড়ে যে সেই দিন ছেলের জীবন রক্ষার বিনিময়ে দত্ত সাহেবের কাছ থেকে কিছু চেয়ে বসেনি—এজন্যে নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করে সে। নইলে বড় হবার লোভ আর টাকার লোভ দুইটি বিলক্ষণ আছে তার।...দত্তসাহেবের বউকে দেখাব পর আর এক লোভও ভিতরে উঁকিঝুঁকি দেয়। টাকা হলে মোটামুটি ভদ্রঘরের একটি মেয়েকে হয়ত সেও ঘরে আনতে পারবে একদিন, মা হলে বা মা হবার মুখে যাদের ওই রকম সুন্দর দেখায়।...পারবে না কেন, সেও তো একেবাবে দিনমজুরের ঘরের ছেলে ছিল না—বাপ বেঁচে থাকতে ইংরেজী স্কুলেও সাত ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল। আব সে-বকম একটা মেয়েকে ঘরে আনতে পারলে রঞ্জনার ভিতরটা কত জ্বলবে কল্পনা করতেও কৃত যে ভালো লেগেছে ঠিক নেই।

কিন্তু স্বপ্ন ছুটে যাবার মতই গণ্ডগোল পাকালো একটা। আর সেই গণ্ডগোলের জের সামলাতে গিয়ে লক্ষ্মীকান্তর ভিতরে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সূত্রপাত।

ইউনিয়নের দাবি-দাওয়া নিয়ে সুদাম আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ফ্যাক্টরীর বাতাস গরম করে তোলার চেষ্টায় মেতে উঠেছিল অনেক দিন ধরেই। বেশি পাবার লোভে কর্মচাবীরাও সুর মেলাতে শুরু করছিল। এই সঙ্ঘবদ্ধ সুরটাই বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে। শীগগিবই কিছু একটা হেস্ত-নেস্ত করতে ঝাঁপিয়ে পডবে সকলে বোঝা যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়ে রক্ত গরম হবার মতই ব্যাপার ঘটে গেল একটা। সুদামের সাগবেদ আব্দুলকে সেই বিকেলে ঠিক ছুটির আগে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছেন দত্তসাহেব। স্বচক্ষে তাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে অনেকে। ইউনিয়ন ভাঙার মতলবেই যে মিথ্যে কোনো অজুহাতে তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়েছে—কর্মচাবীদের কাছে আগুনেব ফুলকির মত সেই খবরটাই ছড়িয়ে পড়ল।

ফলে ছুটির পর এক ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। স্ট্রাইক হবে। শতকরা পঁচাত্তরজনেরও বেশি কাজে অনুপস্থিত পরদিন। কাজে যারা গেল তাদের জীবনের মত শিক্ষা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর সকলে।

রাগ লক্ষ্মীকান্তরও হয়েছিল। সেও কাজে যায় নি। তা বলে হঠাৎ এভাবে মাথা গরম করার পক্ষপাতী ছিল না সে। সুদাম তাকে চোখে চোখে আগলে রেখেছে। কিন্তু লক্ষ্মীকান্ত নির্বিবাদে কামাই করেছে সুদামের ভয়ে নয়, রঞ্জনার গঞ্জনার ভয়ে। জানতে পারলে রঞ্জনা বিষ উগরবে।

এদিকে বিকেলের মধ্যেই খবর শুনে হতভম্ব সকলে। আব্দুলকে পুলিসে দেওয়া হয়েছে ইউনিয়নের কোনো উদ্দেশ্য পণ্ড করার জন্যে নয়। আগের দিন ফ্যাক্টরীর কি সব যন্ত্রপাতি চুরি করেছিল সে। নানা কারণে ফোরম্যানের তাকেই সন্দেহ হয়েছিল। জেরার ফলে দত্তসাহেবেরও সেই রকমই মনে হয়েছে। পুলিসের কাছে সে চুরি স্বীকার করেছে, বামাল উদ্ধার হয়েছে।

কর্মচারীরা হকচকিয়ে গেল। পরদিন আবার কাজে লাগার হিড়িক। কিন্তু এবারে কোম্পানীর কৈফিয়ত নেবার পালা। দত্তসাহেব সকাল থেকে একে একে সকলকে ডেকে কৈফিয়ত নিচ্ছেন। সকলেরই একদিনের মাইনে কাটা যাচ্ছে আর কালো খাতায় নাম উঠছে।

দুরু দুরু বক্ষে লক্ষ্মীকান্তকে এসে দাঁড়াতে হয়েছে দত্তসাহেবের সামনে। অনুযোগের সুরে গম্ভীর দত্তসাহেব বললেন, তোমাকে আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম, তুমিও এই দলে ভিড়লে?

দত্তসাহেবের সামনে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কি যে হল লক্ষ্মীকান্তর কে জানে। চোখের সামনে সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখল। চোখ-কান বুজে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বসল সে। বলল, না, আমি হঠাৎ বড় মুসকিলে পড়ে গেছলাম, সেজন্যে কামাই হয়ে গেল।

দত্তসাহেব চেয়ে রইলেন একটু। তাব শুকনো মুখও লক্ষ্য করলেন।—কি হয়েছিল?

এই একজনেব সহানুভূতি হারালে সবই গেল বুঝি। আর ঘরে গিয়ে দত্ত সাহেব তার সেই বউকে বলবে লক্ষ্মীকান্ত সুদ্ধ কতগুলো বাজে লোকের সঙ্গে হুজুগে মেতেছে—সেটা কেন যেন আরো বেশি দুঃসহ। কিন্তু জবাব কি দেবে? মুহূর্তের মধ্যে যা মাথায় এলো তাই বলে ফেলল সে।—আজ্ঞে হুজুর বাড়িতে খুব অসুখ...কালই হঠাৎ জ্বরটা চেপে এলো, আসব-আসব করেও আসা হল না।

দত্তসাহেবের মুখের মেঘ একটু হাল্কা হতে দেখল যেন লক্ষ্মীকান্ত। গলার স্বরও কোমল শোনালো।—কার অসুখ?

লক্ষ্মীকান্তর কি ভীমরতি ধরেছিল? বুকের ভিতর কাঁপছে ঠক-ঠক করে। শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট ঘষে নিল একবার।—আজ্ঞে ছেলের।

দত্তসাহেবের মুখ একেবারে বদলেছে এখন। কিন্তু তবু বুকের কাঁপুনি থামছে না কেন লক্ষ্মীকান্তর?

—কতদিন জ্বর চলছে?

—এই দিনকতক।

—ডাক্তার দেখিয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নরম গলায় দত্তসাহেব বললেন, আচ্ছা তুমি যাও।

লক্ষ্মীকান্ত বেরিয়ে এলো। ঘামছে দরদর করে।

এই মিথ্যের একমাত্র সাক্ষী রামলাল। দত্তসাহেবের খাস বেয়ারা। তা সেও দত্তসাহেবের সঙ্গেই কলকাতা থেকে এসেছে—লক্ষ্মীকান্তর ঘরের খবর রাখে না। ফাঁস হবার ভয় কম। কিন্তু অন্যের কাছে যদি গল্প করে? যদি প্রকাশ হয়ে যায় একদিন? দু'পাঁচ দিনের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত একটা বিয়ে হয়ত করে ফেলতে পারে, কিন্তু ছেলে পাবে কোথায়? বউয়ের জ্বর তো বলে নি, ছেলের জ্বর বলেছে, রামলাল সাহেবের বাড়িতেই থাকে, পাঁচজনের সঙ্গে বসে গল্প করাব ফুরসত পায় না এটুকুই যা ভরসা।

কিন্তু বিপদ যে কোন দিক থেকে গড়াতে পারে স্বপ্নেও ভাবেনি। সন্ধ্যের পর খবর ছড়ালো দত্তসাহেবের মোটর গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সাহেব নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন, পিছনে রামলাল ছিল। একটা বাঁকের মাথায় গাড়ি চাকা পিছলে নিচেব মাঠে উল্টে পডেছে। দত্তসাহেব ভালোমত জখম হয়েছেন, তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওযা হয়েছে। রামলাল অল্প-স্বল্প আঘাত পেয়েছে, তার বিশেষ কিছু হয় নি।

রামলাল তক্ষুনি হাসপাতালে ছুটেছে। দত্তসাহেবের দেখা পায়নি, তাঁর ছেলে আব বউকে দেখেছে সেখানে। বউটির মুখ ভযানক শুকনো।...দুঃসংবাদ পেয়ে ওই শরীব নিয়েই ছুটে এসেছেন।

লক্ষ্মীকান্ত খবর নিযে জেনেছে সাহেবেব আঘাত খুব গুরুতর নয়, তবু পাঁচ-সাতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েই ঘরে ফিবেছিল লক্ষ্মীকান্ত।

পরদিন কাজে এসেই হতভম্ব একেবারে। মুচকি হেসে সর্বপ্রথম সুদাম এসে শুধালো, কিগো, তোমাব ছেলের জ্বব কেমন?

কিছু একটা ঘটেছে লক্ষ্মীকান্ত বুঝতে পেরেছে। কি সেটা জানে না। সকলেই হাসছে তার দিকে চেযে। তাদের হাব-ভাব দেখে বুকের ভিতরে কাপুনি ধরেছে লক্ষ্মীকান্তর। মোলায়েম করে একজন বলল, আমাদেব সক্কলের একদিনেব মাইনে কাটা গেছে আর কালো খাতায় নাম উঠেছে—কেবল তুমি বাদে। তা তোমার শাস্তি হবে কেন, তুমি হুজুগে মেতে কামাই কবনি।—ছেলের অত জ্বর, আসবে কেমন করে! মাঝখান থেকে মাথায দরদ ঠেসে গাড়ি চালাতে গিয়ে দত্তসাহেবের এই দুর্ভোগ।

লক্ষ্মীকান্ত নির্বাক, বোবা একেবারে। তার মিথ্যে ফাঁস হয়ে গেছে বুঝেছে, কিন্তু শেষের কথাগুলো একটুও মাথায় ঢুকল না।

কিন্তু আস্তে আস্তে সবই বোঝা গেল। ওদেরই কে দুই-একজন রামলালের মুখ থেকে দুর্ঘটনার ব্যাপারটা শুনে এসেছে। ফ্যাক্টরী থেকে ফেরার মুখে দত্তসাহেব ফল কিনেছেন, তারপর বাড়ি এসে লক্ষ্মীকান্তর ছেলের অসুখের কথা বউকে বলেছেন। শুনে বউয়েরও খুব মন খারাপ হয়েছিল। জলটল খেয়ে ফল নিয়ে সাহেব আবার বেরিয়েছেন। কোয়ার্টারস থেকে ডাক্তারকে তুলে নিয়ে লক্ষ্মীকান্তর ছেলেকে দেখাতে

নিয়ে যাওয়ার কথা। ফল ছাড়া ছেলের চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকাও নিয়েছিলেন সঙ্গে। পথে এই বিভ্রাট।

সমস্ত রাত লক্ষ্মীকান্ত মাথার চুল ছিঁড়েছে নিজের। মাটিতে মাথা ঠুকেছে। অজস্রবার নিজেকে অভিশাপ দিয়েছে, তুই মরে যা, মরে যা! কিন্তু মরে যাচ্ছে না বলেই মৃত্যুযাতনা। তার ছেলের অসুখ এই মিথ্যায় ভুলে সাহেব টাকা নিয়ে ফল নিয়ে আর ডাক্তার নিয়ে তারই জন্যে ছুটে আসছিলেন! তার চাকরি যাবে, কিন্তু এ যাতনার তুলনায় চাকবি যাওয়াটা কিছুই নয়—চাকরি যাক, প্রাণটাও যাচ্ছে না কেন!

সকাল তখন সাতটাও বাজেনি। তাকে দেখেই চমকে উঠলেন দত্তসাহেবের বউ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? এমন চেহারা কেন তোমার? তোমার ছেলে কেমন আছে?

পবের মুহূর্তে মহিলা বিমূঢ় একেবারে। লোকটা তাঁর দু'পায়ের ওপর পড়ে পা দুটো আঁকড়ে ধরে হু-হু কবে কেঁদে উঠল। তারপর পায়ে মুখ মাথা ঘষতে ঘষতে পাগলের মত বলতে লাগল, মা-গো আমি পাপী, আমি মিথ্যেবাদী, আমি শয়তান, আজই গিয়ে সাহেবকে বলুন আমার চাকরি খেয়ে দিতে আর তার আগে লোক দিয়ে চাবকে আমার পিঠের ছাল তুলে দিতে—আমার জন্যেই সাহেবের এই হাল হয়েছে মা—আমাকে যা ইচ্ছে শাস্তি দিতে বলুন, যা ইচ্ছে করতে বলুন—আর তাবপর আপনারা শুধু আমাকে ক্ষমা করুন মা—আমি আর কিছু চাইব না, কিছু না—

মহিলা হাঁ করে চেয়ে রইলেন তার দিকে। পাও ছাড়িয়ে নিতে পারছেন না। শেষে ধমকের সুরেই বললেন, পা ছাড়ো, ওঠো—!

লক্ষ্মীকান্ত পা ছাড়ল। উঠে বসে চোখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল।

—কি হয়েছে? কি কবেছ তুমি?

একটু সামলে নিয়ে লক্ষ্মীকান্ত বলল কি হয়েছে, কি করেছে। একটা কথাও গোপন করল না, কেন এই কাজ করেছে তাও বলল।

মহিলা শুনলেন সব। নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। পড়া ফেলে ছেলেও তখন মায়ের গা ঘেঁষে দাড়িয়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, তুমি অত খারাপ হলে ভগবান তোমার হাত দিয়ে আমার ছেলেকে রক্ষা করতেন না। যেটুকু খারাপ ছিল তাও ধুয়ে-মুছে গেল—ভালই হল। তোমাদের সাহেব ভালো আছেন, মন খারাপ না করে বাড়ি যাও, কিছু ভেব না।

হাসপাতালে গিয়ে দত্তসাহেবকে তিনি কি বলেছেন লক্ষ্মীকান্তর জানার কথা নয়, জানেও না। সে ফ্যাক্টরীতে যাচ্ছে, আসছে, তাকে শুনিয়ে অনেকে অনেকরকম ঠাট্টা করছে, টিটকিরি দিচ্ছে—কিন্তু এ-সবে তার যাতনা কত আর বাড়াবে। ভিতরের দাহই তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

ওদিকে বুদ্ধিমান সুদামের মাথায় এবারে বুদ্ধি আর প্রেরণা যোগাচ্ছে রঞ্জনা। পরামর্শ দিয়েছে, সাহেবকে হাসাতালে দেখতে যাও তোমরা। তারপর সব বলে এসো তাঁকে, ওর সব মিথ্যে ফাঁস করে দিয়ে এসো। তোমাদের সব একদিনের মাইনে কাটা

গেল, কালো খাতায় নাম উঠল—আর ও একাই মিথ্যে বলে বেঁচে গেল, রাগ নেই তোমাদের? সেই মিথ্যের ফল কি হল সাহেবকে জানিয়ে আসতে পারো না?

এত দিনের আক্রোশ মিটবে রঞ্জনার। লক্ষ্মীকান্তর মুখে চুনকালি পড়বে, শাস্তি হবে—রঞ্জনার সবুর সইছিল না, তিন দিন ক্রমাগত তাগিদ দিয়েছে সুদামকে, হাসপাতালে গিয়ে সাহেবকে বলে এসো সব কথা।

স্ত্রী খুশি হবে বলে নয়, মনে মনে রাগ সুদামেরও আছে। রঞ্জনার পরামর্শ মতই কাজ করলে সে। জনাদুই সঙ্গী নিয়ে ছুটির পর হাসপাতালে সাহেবকে দেখতে গেল আর সবিনয়ে লক্ষ্মীকান্তর মিথ্যের ব্যাপারটা নিবেদনও করল।

দত্তসাহেব বললেন, শুনেছি। আমি অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করব। ও কাজে আসছে তো?

সুদাম ঘাড় নাড়ল, আসছে।

শুনে রঞ্জনাব মুখে খুশি ধরে না। কত দেমাক ওই লোকের, এবারে দেখা যাবে!

হ্যাঁ, সাহেব ফ্যাক্টরীতে ফেরার মাসখানেকের মধ্যে লক্ষ্মীকান্তকে আবারও কাঁদতে হয়েছিল বই কি। এমন তাজ্জব শাস্তি সে কল্পনাও কবতে পারে না। প্রথম বিশ-বাইশ দিন দত্তসাহেব তাকে ডাকেন নি বা মুখদর্শনও করেন নি। অন্য সকলের সঙ্গে সেও রোজই ভেবেছে, গিয়েই শুনবে চাকরি নেই। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না কেন সেও ভেবে পাচ্ছে না, অন্যেরাও না।

তিন সপ্তাহের মাথায ফ্যাক্টরীতে চাপা উত্তেজনা একটা। কাজে উন্নতি হযেছে লক্ষ্মীকান্তব, হেড টার্নারের পরেই সে। এ-রকম কোনো পদ আগে ছিল না। নতুন হল। লক্ষ্মীকান্ত সহকারী হেডটার্নার, মাইনের হার একলাফে বাইশ টাকা বেড়ে গেল। বিকেলের দিকে দত্তসাহেব.সেদিনই ঘবে ডেকেছিলেন তাকে। ভালো কবে দেখেছেন আর মিটি-মিটি হেসেছেন। তাবপর বলছেন, শিক্ষা হল তো? আর কখনো এমন কাজ কোরো না।

সেই বাতেই আবার কেঁদেছে লক্ষ্মীকান্ত। কেঁদেছে আর প্রতিজ্ঞা করেছে, মিথ্যে বলব না, মিথ্যেকে এ-জীবন থেকে বাদ দিলুম—চিরজীবনের তবে বাদ দিলুম।

বছর না ঘুরতে চাকরিটা সুদামেরই গেল।

সকালে কাজে আসে নি, বিকেলের দিকে মদ খেয়ে ভিতরে ঢুকে দাবি-দাওয়া নিযে হই-হল্লা করেছে। ব্যস, সেদিনই চাকরি খতম। দত্তসাহেব একেবারে দরোয়ান ডেকে বলে দিয়েছেন, ওকে যেন আর ঢুকতে না দেওয়া হয়।

সুদামের জন্য লক্ষ্মীকান্তর দুঃখ হয়েছিল খুব। তার মদের মাত্রা ইদানীং বেড়ে গিয়েছিল। আর আরো বেশি আঘাত পেয়েছিল দিনতিনেক বাদে ওদের বাড়ি গিয়ে যখন শুনল, মদ সেদিন ওরা দু'জনেই খেয়েছিল—সুদাম আর রঞ্জনা। ওদের বিয়ের তারিখ সেটা, তাই দুজনেই একটু ফুর্তি করেছিল। সুদাম নিজেই বলেছে। সেদিনও প্রকৃতিস্থ ছিল না ও, কথা বলার সময় নাকে কাপড় চাপা দিতে ইচ্ছে করছিল লক্ষ্মীকান্তর। সুদাম নেশার ঘোরে রঞ্জনারও মদ খাওয়ার কথা ফাঁস করে দিয়েছে। এই দিন অবশ্য রঞ্জনা খায় নি, সে গুম হয়ে বসেছিল। সুদাম শেষে কাঁদ-কাঁদ হয়ে

লক্ষ্মীকান্তর হাত ধরে বলেছে, সাহেব তোকে ভালবাসে, সাহেবকে বলে-কয়ে ক্ষমা করিয়ে দে—বলবি, সুদাম মদ আর স্পর্শও করে না, জীবনের মত শিক্ষা হয়েছে তার।

সখেদে লক্ষ্মীকান্ত বলেছে, শিক্ষা যে কত হয়েছে তা তো দেখছি, আমি বললেও কিছু হবে না, তা'ছাড়া আমি মিথ্যে বলা ছেড়ে দিয়েছি রে—

এইবার ফোঁস করে উঠল রঞ্জনা, উঃ ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির একেবারে, মিথ্যে চিবিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে এখন মিথ্যে ছেড়ে দিয়েছি! লজ্জাও করে না জিভ নাড়তে—

পরক্ষণে ঘরের লোকের ওপর ঝলসে উঠেছে সে, বলি নেশার ঘোরে মানের মাথা খেয়েছ একেবারে—ওর কাছে কাঁদতে ধরেছ তুমি? মরদ হয়ে তুমি ওর পা চাটতে গেছ? চাকবি না জুটলে গলায় দড়ি তো জুটবে, না কি?

চাকরিই জুটেছে। দিন পনের বাদে হাসিমুখে সুদাম সুখবরটা দিয়েছে তাকে। তিন মাইল দূরে নদীর ওপাবের কলের চাকরি। যাতায়াতে কষ্ট এই যা, নইলে এখানকার থেকে অনেক ভালো কাজই পেয়েছে, মাইনে-কড়ি অনেক ভালো।

শুনে লক্ষ্মীকান্ত যথার্থ খুশি। তারই যেন দুর্ভাবনা গেল একটা। সানন্দে বলে উঠল, খুব ভালো হয়েছে, তোর মাথা আছে, কিছু একটা কববিই জানতাম...কিন্তু মদ আর খাসনে সুদোম।

সুদাম তক্ষুনি বলেছে, ঠাকুরেব পা ছুঁয়ে দিব্বি করে মদ ছেড়েছি জানিস না বুঝি?...শুধু তাই নয়, এ-জীবনের মত মিথ্যে বলাও ছেড়েছি রে, খুব শিক্ষা হয়েছে, আর না। দত্তসাহেবকে একদিন গিয়ে বলে আসব, শাস্তি দিয়ে বড় উপকার করেছেন তিনি আমার, তাঁর হাতের শাস্তি দেবতার আশীর্বাদের মত, উপকার ছাড়া অপকার হয় না।

আনন্দে সুদামকে জড়িয়ে ধরেছে লক্ষ্মীকান্ত।

নিজেব বা লক্ষ্মীকান্তর রাতে ডিউটি না পড়লে সুদাম এরপর ঘন ঘন আসতে লাগল। প্রাণের কথা হয় দুজনের, ধর্মের কথা হয়। বদলেই গেছে বটে সুদাম, ভিতর একেবারে সাদা হয়ে গেছে। ফাঁক পেলে লক্ষ্মীকান্তও আগের মতই ওদের বাড়ি যায়। বঞ্জনারও যেন রাগ পড়ে গেছে তার ওপর। আগের মত কথায় কথায় ছোবল মারার ফাঁক খোঁজে না। একদিন তো একটু যত্ন-আত্তি করে ওরা দুজনে মিলে খাইয়েই দিল তাকে।

লক্ষ্মীকান্ত আনন্দে ভরপুর কিছুদিন।

এরপর সুদাম এসে একদিন কথায় কথায় জানালো, কলের চাকরি তো করছেই, সঙ্গে ব্যবসাও করবে একটা। এমন সুযোগ আর হয় না। এত বড় কল তাদের, কিন্তু ওর ধারেকাছে একটা ভালো পানবিড়ি, সোডা, লিমনেডের দোকান নেই। জায়গাও দেখে রেখেছে সে, সে-রকম জাঁকিয়ে বসতে পারলে চোখবুজে দিনে পনের-বিশ টাকা লাভ করাও জলভাত ব্যাপার। রঞ্জনা গায়ের রূপোর গয়নাটয়না সব বার করে দিয়েছে, বলেছে করো ব্যবসা, সৎ পথে থেকে টাকার মুখ দেখতে চাই। তাতেও

দেড়শ টাকা মাত্র হয়েছে, আরো শ'দুই হলে চমৎকার হত, গোড়া থেকেই মোটা লাভের মুখ দেখা যেত।...ওর খুব ইচ্ছে তোকেও ডাকে, তোর তো আর টাকার অভাব নেই, কিন্তু মুখে কিছুতে বলবে না। আমি বলতে মুখঝামটা দিয়ে উঠল, বলল, দরকার নেই পরের টাকা নিয়ে, কক্ষনো বলতে পাবে না। সুদাম হাসল হি-হি করে, কিন্তু মনের ইচ্ছে আমি খুব ভালো করেই জানি, আমার বাপু মিথ্যের সঙ্গে কারবার নেই আর, হক কথা—আসলে তো এখনো তোব ওপরেই টান বেশি—বেশি টান বলেই বেশি ঝাল। তুই ওকে না পেয়ে জিতেছিস—

সুদাম হাসতে লাগল। ওদিকে লক্ষ্মীকান্তব কান গবম। একটুও অবিশ্বাস করল না সে। আবার অমন লাভের ব্যবসার কথা শুনেও দু'চোখ চকচক করে উঠেছে তার। সৎ পথে থেকে টাকা রোজগারের লোভ তারও। ধর্মের দিকে মতি বেড়েছে বলে টাকার লোভ কমে নি। বরং টাকা হলে ভদ্রঘবেব একটা মেয়েকে ঘরে আনা যেতেও পারে, সে-কথা এখনো মনে হয়। আর আগে তো যুৎসই একটা ব্যবসায় নেমে পড়ার আলোচনা সুদামের সঙ্গে কতদিনই করেছে। সুদাম ওর টাকা বোজগারের ঝোঁকটা ভালই জানে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবসার প্রসঙ্গেই এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগল সে। পবদিনই লক্ষ্মীকান্ত নিজেই গেল সুদামের বাড়ি। যেতে যত ভেবেছে মন ততো একদিকেই ঝুঁকতে চেয়েছে।...ওদেব ভালবাসে, ওবা বড় হলে সে সুখী হবে, কিন্তু নিজেব অবস্থা তখনো এইরকমই থাকবে ভাবতে ভয়ানক খাবাপ লেগেছে। তার ওপব রঞ্জনা কেন তাকে ডাকতে চায় না শোনার পর ভেতর আরো দুর্বল হয়েছে। ওদের সঙ্গে যুক্ত হবার ঝোঁক আরো বেড়েছে। সুদামের মাথায় এত বুদ্ধি, ব্যবসায় নামলে টাকা যে করতে পারবে তাতেও সন্দেহ নেই।...আব সুদাম সত্যিই মাটির মানুষ হযে গেছে, নইলে নিজের স্ত্রীব সম্বন্ধে সত্যি কথাটা এমন সহজ হাসিমুখে কেউ বলে দিতে পারে!

সুদামকে বাইরে ডেকে নিয়ে ওদের ব্যবসার প্রসঙ্গেই কথা তুলেছে আবাব। সুদাম যে-ছবিটা এঁকে দিয়েছে তাতে দ্বিতীয় দফা ঘোব লেগেছে চোখে। শেষে আমতা আমতা করে লক্ষ্মীকান্ত বলেছে, বড় করেই আরম্ভ কব তাহলে, আমি দিচ্ছি দু'শ টাকা। লাভেব আধা-আধি ভাগ—

সুদাম খুশি, চিন্তিতও আবার একটু—আমি তো তাই চাই, কিন্তু মনে যত ইচ্ছেই থাক, শুনলে রঞ্জনা হাঁক-ডাক কবে বাগ দেখাবে যে—

কথাগুলো বড় মিষ্টি লেগেছে লক্ষ্মীকান্তর। হেসে বুদ্ধি দিয়েছে, টাকা নেবাব কথা এখন কিছু বলিস না তাহলে, পরে শুনে আকাশ থেকে পড়বে।

সুদাম সানন্দে সায় দিয়েছে, সেই ভালো।

একা মানুষ, পানবিড়ির নেশাও নেই লক্ষ্মীকান্তর। পোস্ট অফিসে ফি মাসেই রোজগারের অর্ধেক টাকা জমা পড়ে। তারই থেকে দু'শ টাকা তুলে সুদামের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত সে। উদ্দীপনায় ভিতর ভরপুর। রঞ্জনার আকাশ থেকে পড়ার মত মুখখানা কল্পনা করতে ভালো লেগেছে। অনায়াসে টাকা আসছে ভাবতে ভালো লেগেছে।

ভদ্রঘরের কোনো এক অদেখা মেয়ের মুখ মনের তলায় আগের থেকেও বেশি উঁকিঝুঁকি দিতে চেয়েছে। তবু সুদামের বউ রঞ্জনাকে ভালই বাসবে সে ; বন্ধুর বউকে যেভাবে ভালবাসলে মন একটুও ছোট হয় না, বরং অনেক বড় হয়—সেইরকমই ভালবাসবে সে রঞ্জনাকে।

বলা বাহুল্য, সেই রাতে অন্য দিকের চিত্রটা। একটু অন্যরকম করকরে দু'শ টাকার কুড়িটি টাকা বাইরে রেখে বাকিটা সুদাম কোমরে বেঁধেছে। তারপর সোজা ভাঁটিখানায় এসেছে। দু' বোতল মদ কিনেছে। দোকান থেকে কিছু খাবার কিনেছে। তারপর বাতাস সাঁতরে ঘরে ফিরেছে। একটানা অনেক দিনের শুকনো জীবনে এক আলোঝলমল উৎসব নেমে এসেছে বুঝি।

সুদাম আর রঞ্জনা মদ গিলেছে আর হি-হি করে হেসে গড়িয়েছে। টোপ যখন ফেলা হয়েছে তখনো সন্দেহ ছিল লক্ষ্মীকান্ত এতটাই নির্বোধ কিনা। সেই সন্দেহ গেছে। করকরে দু'শ টাকা সেধে হাতে গুঁজে দিয়েছে। মদের বোতল উবুড় করে গলায় ঢালছে আর প্রেম-জরজর নির্বোধের বড়লোক হবার আশা দেখে হেসে গড়াচ্ছে তারা।

ওদিকের অন্ধকার ঘরের দরজা ফাঁক করে হাঁ করে মামা-মামীর আনন্দ দেখছে তাদের ভাগ্নে তের বছরের দুলাল।

লক্ষ্মীকান্তর মনে খটকা লেগেছে মাসখানেকের মধ্যে। সুদাম আর আসে না। সে গেলেও কেমন ব্যস্ত-সমস্ত হাবভাব! ব্যবসার খোঁজ নিতে গেলে উড়ো উড়ো জবাব দেয়। বলে ঘরটা পেতে গণ্ডগোল হচ্ছে, কখনো বলে মাল-পাওয়ার পাকা ব্যবস্থা করতে সময় লাগছে, কখনো আবার বিরক্তি দেখায় সবুর না সইলে টাকা ফেরত নাও বাপু, টাকা বেশির ভাগই দাদন দিয়ে ফেলেছি, আর রঞ্জনাকেও বলি নি কিছু—শুনলে আমার মাইনের টাকা থেকেই কিছু কিছু করে তোমার টাকা শুধে দেবে—একবেলা উপোস করতে হলেও দেবে।

লক্ষ্মীকান্ত তক্ষুনি বলেছে, থাক থাক, আমি খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম শুধু—

দ্বিতীয় মাসে সন্দেহ ভালোরকম দানা পাকালো। বাড়ি গেলেও প্রায়ই তার দেখা মেলে না। রঞ্জনার গম্ভীর মুখ। কখনো বলে, কল থেকে ফেরে নি, কখনো বলে বেরিয়েছে।

তৃতীয় মাসে স্পষ্টই বুঝল টাকাটা সুদাম ভাঁওতা দিয়ে বার করে নিয়ে গেছে তাব কাছ থেকে। কারণ এক ছুটির দিনে নিজে সে নদীর ওপারের কলে গিয়ে দেখে এসেছে, একটা ছেড়ে দশ বারোটা সোডা লেমনেড পান বিড়ির দোকান সেখানে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফিরল লক্ষ্মীকান্ত। এমন দুর্জয় রাগ জীবনে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ।

চুপচাপ ক'টা দিন কেটে গেল। একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির হবে ওদের বাড়ি, নইলে ওকে ধরা যাবে না। আর ধরতে পারলে একটুও খাতির করবে না, রঞ্জনার সামনেই টাকা ফেরত চাইবে। রঞ্জনা সবই জানতে পারবে তখন। ওর স্বামী কেমন, খুব ভালো করেই জানতে পারবে। জানানোই দরকার।

কিন্তু বেশি দিন সবুর সইল না। নাইট ডিউটি ছিল লক্ষ্মীকান্তর। বেলা তিনটের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। তার হিসেবমত সুদামের সকালে ডিউটি, দুটো আড়াইটের মধ্যে ফিরবে। এ সময়ে তাকে আশা করবে না বলেই ধরা যাবে হয়ত।

আক্রোশে হাতের লাঠি দোলাতে দোলাতে হনহন করে হেঁটে চলল লক্ষ্মীকান্ত। হঠাৎ কি মনে পড়তে বুকপকেটে হাত ঢোকালো একবার, না, বাড়িতে ফেলে আসে নি, পকেটেই আছে। দুটো দশ টাকার নোট, ফ্যাক্টরীর এক বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে কলকাতা থেকে খুব ভালো কয়েকটা বই আনিয়ে দেবে তার জন্যে। ধর্মের বই, সত্যকে আঁকড়ে ধরার অলৌকিক ফলাফলের বই, ভগবানে বিশ্বাসের বই, আর মহাপুরুষদের অমৃতকথা—যে-সব বই পড়লে সেও অনায়াসে বুঝতে পারবে শুনেছে। নাইট ডিউটি বলে টাকা কুড়িটা ক'দিন ধরে পকেটেই ঘুরছে। কালকের মধ্যে বাবুকে টাকাটা দিয়ে দেবে। ওই বই-ই সম্বল করবে সে। ধর্মের থেকেও, সত্যের থেকেও টাকার লোভ বড় হয়েছিল বলেই ধু'শ টাকা খুইয়ে বসেছে। লোভের শাস্তি হয়েছে। অমন লোভ আর করবে না। কিন্তু সুদামকে একবার দেখে নেবে সে, টাকা যায় যাক, ওর বউযেব সামনেই ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে সব ফাঁস করে দেবে।

কিন্তু অর্ধেক পথ আসতেই এক পরিচিত লোকের মুখে যে-খবরটা শুনল, তাতে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করল সে। খানিকটা এসে আব একজনের মুখেও এক কথাই শুনল। নদীর ওপারের কলে সাঙ্ঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে একটা। বয়লার না কি একটা ফেটেছে, চারদিক বন্ধ বিশাল মেসিন ঘরে আগুন লেগেছে—বহু লোক আঘাতে মরেছে, বহু লোক আগুনে পুড়ে মরেছে, আর বহু লোক হাসপাতালে গেছে। নদীর এপার থেকে নাকি ওপারের কলের আগুন দেখা গেছে।

রাগ সত্ত্বেও ভিতরটা উতলা হয়ে উঠল লক্ষ্মীকান্তর। ওই পাজী হারামজাদার আবার কিছু হল কিনা কে জানে।...কিছু হয় নি বোধ হয়। এ তো আর তাদের মত ছোট ফ্যাক্টরী নয়, হাজার লোক কাজ করে—ক'জন আর মরেছে। ভালই দেখবে, গলায় হাত দিযে লক্ষ্মীকান্তই বরং প্রাণসঙ্কট কাকে বলে বুঝিয়ে দেবে তাকে।

দূর থেকে ওর ভাগ্নেটাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। তাই।...কিন্তু তাকে দেখে ভিতরে চলে গেল কেন? দূর থেকে বাচ্চা ছেলেটার মুখও গম্ভীরই মনে হল লক্ষ্মীকান্তর। আবারও অস্বস্তি। ওদের ঘরের কাছে আসার আগেই ছেলেটা আবার বেরিয়ে হন হন করে একদিকে চলে গেল। হাব-ভাব কেমন যেন।...যে পাজীর পাজী, ভগবানই সাজা দিল কিনা—থাক, ও-সব ভেবে কাজ নেই।

বাইরের দিকের মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই লক্ষ্মীকান্তর বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল। হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেল সে। পা দুটো আড়ষ্ট।

মেঝেতে ধুলোর ওপর রঞ্জনা বসে। শুকনো কালচে মুখ। খোলা চুল। নিষ্প্রাণ মূর্তির মত বসে আছে। সে-যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাও টের পায় নি হয়ত।

লক্ষ্মীকান্তর বুকের ভিতর ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে যেন। গলাখাঁকারি দিল একবার। ঘরে এসে দাঁড়াল।—কি হয়েছে? সুদোম বাড়ি নেই?

রঞ্জনা এবার তাকালো তার দিকে। চাউনিটা ঘোলাটে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। বাড়ি নেই।

লক্ষ্মীকান্তর ঘেমে ওঠার দাখিল। কি যে জিজ্ঞাসা করবে ভেবে পাচ্ছে না। —ইয়ে, কখন বেরিয়েছে?

রঞ্জনা অস্ফুট জবাব দিল, কাল ভোরে।

লক্ষ্মীকান্ত আঁতকে উঠল।—সে-কি! কাল তো ওদের কলে কি অঘটন হয়েছে শুনলাম—সেই থেকে বাড়ি ফেরে নি?

রঞ্জনা আবার মাথা নাড়ল। না।

—কি মুশকিল! দুশ্চিন্তায় ভিতর ছেয়ে গেছে লক্ষ্মীকান্তর।—কাল থেকে ফেরে নি, তুমি খবর নাও নি কেন?...অল্প-স্বল্প জখম তো হয়ে থাকতে পারে, হয়ত হাসপাতালে আছে, ভালই আছে।...আমার যে আবার নাইট ডিউটি, কি করি! এক্ষুনি মনে পড়ল কি।—ওই দুলাল তো আছে, ওকে পাঠাও নি কেন? ওকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও, খবর নিয়ে আসুক—পারবে না?

রঞ্জনা ঠাণ্ডা জবাব দিল, পাঠাবার পয়সা নেই।

খবর নিতে পাঠাবারও পয়সা নেই শুনে লক্ষ্মীকান্তই যেন ফাঁপরে পড়ল। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢোকালো সে। বই কেনার দশ টাকার নোট দুটো হাতে উঠে এলো। খবর আনতে কুড়ি টাকা লাগে না সে খেয়াল থাকল না। নোট দুটো তার সামনে রেখে বলল, এক্ষুনি দুলালকে পাঠিয়ে দাও, কোথায় গেল ও?

রঞ্জনার দৃষ্টিটা এবারে পুরোপুরি ঘুরল তার দিকে। দু'চোখ মুখের ওপর থমকে রইল খানিক।—তোমার টাকা নেব কেন?

—কি মুশকিল! লক্ষ্মীকান্তর মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেমন, মুখে যা এলো তাই বলে দিল।—আমার টাকা হবে কেন, সুদামেরই—টাকার সেদিন হঠাৎ দরকার পড়তে চেয়ে নিয়েছিলাম—আজ ফেরত দিতে এসেছিলাম। দেরি না করে দুলালকে শীগগির পাঠিয়ে দাও—

রঞ্জনা অপলক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

তাই দেখে লক্ষ্মীকান্তর হঠাৎ মনে হল, সে সত্যি কথা বলে নি, আর রঞ্জনার চোখে তাই যেন ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছে। ধরা পড়ার ভয়েই যেন তাড়াতাড়ি পালাতে চেষ্টা করল সে, আমার আবার সময় নেই, সন্ধ্যায় ডিউটি, দুলালকে তাড়াতাড়ি পাঠাও—আমি কাল আবার সকালে এসে খবর নেব।

রঞ্জনার ওই চাউনিতে মিথ্যে ধরা পড়বার ভয়েই যেন শশব্যস্তে ঘর ছেড়ে পালিয়ে বাঁচল লক্ষ্মীকান্ত।

রঞ্জনার দু'·চোখ দরজার বাইরের উঠোন পর্যন্ত অনুসরণ করল তাকে। তারপর সেদিকে চেয়ে তেমনি মূর্তির মত বসে রইল।

একটু বাদে হাসির শব্দে চমক ভাঙল তার। পেট চেপে হাসতে হাসতে সুদাম ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হাসি আর থামতেই চায় না।—কি অভিনয়ই না করলি মাইরি, যেন সত্যি সত্যি সদ্য পতিবিয়োগ হয়েছে তোর। কাঁধে নিয়ে নাচতে

ইচ্ছে করছে তোকে! আহাম্মকটা ডাণ্ডা হাতে করে টাকা আদায় করতে এসেছিল আর তুই কিনা উল্টে তার কাছ থেকে টাকা আদায় করে ছাড়লি!

আবারও হেসে কুটিপাটি সুদাম।—কাল সকালে খবর নিতে এসে তোকে সুদ্ধ হাওয়া দেখে মুখখানা কেমন হবে দেখতে ইচ্ছে করছে—ভাগ্যি ছোঁড়াটা এসে খবর দিয়েছিল, নইলে ভিতরের ঘরে ঢুকে সব গোছগাছ করতে তো দেখেই ফেলত! বরাত খুব ভালো বুঝলি, কালকেব দুর্ঘটনায় কলের অনেক লোক টেঁসে গেছে—এবারে হতেও পারে চাকরিটা। টাকা কুড়িটা দে, অনেক খরচ এখন, বোকাটার হাত দিয়ে ভগবানই দিয়ে গেল—আমি গরুর গাড়ি বলে আসি, তুই বাকিটা গোছগাছ করে নে, সন্ধ্যের পরেই বেরুতে হবে, নইলে নৌকো পাব না।

রঞ্জনা নির্বাক। নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে।

আর এক দফা হাসতে গিয়েও সুদাম থমকালো একটু। তারপর তাগিদের সুরে বলল, কি হল, দিবি না টাকা ক'টা?

মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে রঞ্জনা আগুনের ফুলকির মতই ঝলসে উঠল হঠাৎ। তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে বলে উঠল, দেব না কেন, দেব, এই নাও, নিয়ে তোমাব আমার দুজনের জন্যেই খুব ভালো করে চিতা সাজাওগে দুটো। পাগলের মতই নোট দুটো সজোরে তার গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারল।—যাও! খুব ভালো করে চিতা সাজাওগে, ওই টাকাতেই হয়ে যাবে—যাও আমাব সমুখ থেকে দূর হয়ে যাও বলছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে এই পরিবর্তন দেখে সুদাম হকচকিয়ে গেল একেবারে। ওই জ্বলন্ত মূর্তির দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে।

এও অভিনয় কিনা বুঝতে পারছে না।

বিষয়

জীবনেব শেষ অতিথি আসছে ও-ঘরে। তার গতি মন্থর, কিন্তু অমোঘ—এবারে সে শুধু-হাতে ফিরে যাবে না, ও-ঘরের সকলে সেটা অনুভব করছে আজ দু'রাত ধরে। ও-ঘরের নীরবতা অনেকটা নীরব প্রতীক্ষার মতই।

এ-ঘরে মিনা বসে আছে মূর্তির মত। খানিক আগে পর্যন্তও সে ও-ঘরে গেছে, দিন-রাতেব বেশিব ভাগ সময়ই ও-ঘরে কাটিয়েছে, বসেছে, কর্তব্য করেছে। বড় দুই ননদ মুখে শোকেব বর্ম এঁটে আড়েআড়ে দেখেছে তাকে, তাও লক্ষ্য করেছে। দুই নন্দাই কোণে কোণে দুটো মোড়ায় বসে—ভয়ানক গম্ভীর তারাও। তাবা মাঝে মাঝে উঠে যায়, কাজের মানুষ কাজ একেবারেই বর্জন করতে পাবে না। কিন্তু কর্তব্য আরো বড়, ঘণ্টা দু'ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসে, বসে খানিকক্ষণ, আবার বেরিয়ে যায়।

গত পরশু থেকে এই রকমই চলছে। ঘণ্টা দুই ধরে একটু ব্যতিক্রম হয়েছে। এই দু'ঘণ্টার মধ্যে মিনা একবারও ও-ঘরে যায় নি। ঠায় এ-ঘরেই বসে আছে। দশটা বাজতে চলেছে রাত্রি। খেয়াল নেই। সাত বছরের ছেলেটা ক্রমাগত এ-ঘর ও-ঘর

করছে। মাকে না দেখে দু'দণ্ড থাকতে পারে না, আবার পাশের ঘরের ভয়াবহ রকমের গম্ভীর রহস্যও কম কৌতূহলের ব্যাপার নয়। ও-ঘরে পিসীদের কাছে ঘেঁষে না, পা টিপে বাবার কোলে গিয়ে বসে, ঠাকুমার চোখ বোজা মুখখানা চেয়ে চেয়ে দেখে খানিক, ঘরের সকলকেও দেখে—বিশেষ করে বাবাকে। ঘরে মা নেই, মনে হলেই আবার এ-ঘরে চলে আসে মাকে দেখতে।

এবারে আসতে মিনা খেয়াল করল, ঘুমে দু'চোখ ছোট হয়ে এসেছে। ব্যগ্র দুই হাত বাড়িয়ে হঠাৎ কাছে টেনে আনল, গভীর আবেগে দুই ঠোঁট ছেলের মাথায় ছোঁয়ালো। এতক্ষণ মাকে দেখে পিন্টুর ভয়-ভয় করছিল একটু, এখন অবাক হয়ে মায়ের গাল ঘষটে মাথা উঁচিয়ে তাকে দেখতে চেষ্টা করল।

কিন্তু মিনার খেয়াল নেই, এক অজ্ঞাত আবেগে তার ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠছে এক একবার। শাশুড়ীর দু'বছর আগের কটা কথা ঝলমল করে কানে বাজছে। কি কারণে যেন ঠাকরোণের মেজাজ সেদিন প্রসন্ন ছিল। পাঁচ বছরের নাতিরও যে উক্তির ফলে তুমুল হতে পারত, সেই কথা শুনে হরষে বিষাদে ছেলের উদ্দেশে বলে উঠেছিলেন—পাজীর কথা শোন, আমি নাকি দুষ্টু, মন্দ—খালি খালি তোকে বকি, ওর মাকে বকি। তারপর মন্তব্য জুড়েছিলেন, এটা বড় হলে ঠিক তোর মত হবে—মা মা করে অজ্ঞান, ভালো চাস তো দেখে-শুনে বিয়ে দিস।

শেষের খোঁচাটাই মিনার কানে বিঁধেছিল। কান থেকে বুক পর্যন্ত জ্বলেছিল। সেদিন হঠাৎ ছেলের উপর সদয় কেন জানে না, নইলে উঠতে বসতে ওই চল্লিশ বছরের ছেলেকেও কম যাতনা-গঞ্জনা দেন না শাশুড়ী।

ছেলেটা বড় দুষ্টু হয়েছে। এ-ঘরে এসে ছেলের বাবা বলেছিল।

চাপা আক্রোশে মিনা গলা খাটো করেই ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, কেন, দুষ্টু কেন, তোমার মত হবে শুনে আনন্দে আটখানা হও। রাগের জ্বালায় শেষে নিজের মনেই বলেছিল, অমানুষ হলেও তোমার মত যেন না হয়, হাড় কালি হয়ে গেল।

কিন্তু শাশুড়ীর সেই কথাগুলোই আজ হঠাৎ বুকের কোথায় যে নাড়া দিচ্ছে, ঠাওর করতে পারছে না। দু'ঘণ্টা আগেও মনে হয়েছিল এ-ঘরের সব বাতাস ওই ঘর টেনে নিচ্ছে। শুধু আজ নয়, অনেক—অনেক দিন ধরেই টেনে নিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, বাতাস ওই ঘরেই নেই, কোন কালে ছিলও না। বাতাস এই ঘরেই, এখানেই নিঃশ্বাস নিতে ও ফেলতে পারছে।

ছেলেকে তুলে খাটে শুইয়ে দিল, বলল, ঘুমো। তার কাঁধে একটা হাত রেখে তেমনি বসে রইল চুপচাপ। আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে...।

সচকিত হল একটু বাদেই। অমরেশ! এই দুই রাতের মধ্যেই ক'বার মায়ের শয্যা ছেড়ে উঠেছে হাতের এক আঙুলে গোনা যায়। উস্‌খো-খুস্‌কো মূর্তি, থমথমে মুখ, বিষণ্ন বেদনাভরা দৃষ্টি। খোলা আলমারী খুলে কিছু একটা নিল। হোমিওপ্যাথির শিশিও হতে পারে, নিজে একটু আধটু চর্চা করে, মায়ের মুখে হয়ত দুই একটা বড়ি ফেলে দেখতে চায়, যদিই পরম বিস্ময়ের কিছু ঘটে যায়।

ও-ঘরের দিকে পা বাড়িয়েও স্ত্রীর দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। দেখল একটু।

মিনাও তার দিকেই চেয়ে আছে। বিরক্ত গম্ভীর চাপা ভর্ৎসনার সুরে অমরেশ বলল, 'এই দিনেও তুমি রাগ করে এখানে বসে থাকবে। আর কতক্ষণ, হয়তো গেল, এর পর আর কেউ তোমাকে কথা শোনাতে আসবে না।'

নিঃশব্দে মানুষটাকে যেন আবার নতুন করে দেখছে মিনা। আর দুই চোখের গভীরে জমাট বাঁধা কান্না দেখছে। কথার অনুশাসনে ননদদের থেকেও এই লোকই তাকে বেশি আঘাত করেছিল। রাগে ক্ষোভে এক ঘর লোকের মধ্যে তাকে উঠে যেতে বলেছিল। কিন্তু মিনার দৃষ্টিতে কোনো অভিযোগ নেই। সে দেখছে। শুভদৃষ্টির পর থেকে এযাবৎ অনেক দেখেছে। দেখতে কিছু বাকি আছে ভাবেনি কখনো। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—দেখা হয় নি, সবটুকুই বাকি।

ও-ঘরের দিকে এগিয়েও অমবেশ থামল আবার, জিজ্ঞাসা কবল, 'রমা কোথায়?'

মিনা অস্ফুট জবাব দিল, 'বেরিয়েছে, এক্ষুণি আসবে।'

এ সময়ে বেবিয়েছে শুনে সে হতাশ-বিরক্তিতেই ও-ঘরে ঢুকে গেল। রমাপদ ডাক্তার, অমরেশের মাসতুত ভাই। মাসি-মেশোর কাছে থেকেই সে ডাক্তারি পাশ করেছিল, তাই এ বাড়ির সকলেরই জোর তার উপর।

ও-ঘব থেকে অপমানিত হয়ে এসেছিল বলে এ-ঘরে এইভাবে বসে নেই মিনা। এ-বকম অপমান এখন প্রায় গা-সওযা। গত চার পাঁচ বছব ধবেই অনেক শুনেছে। কথা আব অত বেঁধে না এখন। কিন্তু ননদদের উপব আব কিছুটা দাদার উপব বাগ করেই এ-ঘরে এসে রমাপদ ঝোঁকের মাথায় কিছু বলে ফেলেছিল। বাকিটা মিনা তাকে জেরা করে বুঝে নিয়েছে। যে অবিশ্বাস্য সংশয় তার অগোচব মনে এক একবাব উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে, তার উপবকার দুর্ভেদ্য কালো পর্দাটা হঠাৎ তুলে দিয়ে গেছে রমাপদ। তারপর দু'হাত জোড় করে স্বভাবসুলভ হালকা অনুনয় করেছে, খবরদাব, অমরদা জেনেছে কি আমাব আর টিকিটি দেখতে পাবে না, সে তোমাব থেকেও আমাকে বেশি বিশ্বাস কবে, আব তোমাকেই সব থেকে বেশি ভয় তাব—বিশ্বাসঘাতকতা কবেছি জানলে আর আমার মুখ দেখবে না।

জলেব নীচেব ছোট বুদবুদও উপরে ভেসে উঠলে তবে মুক্তি। তেমনি করেই মিনার বুকের তলা থেকে কিছু যেন উপরের দিকে উঠছে। আত্মবিস্মৃতির মত সে তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে।

* * *

মিনা এই সংসারে এসেছে আট বছর আগে। শ্বশুর তাকে পছন্দ করে এনেছিলেন। আগ্রহ এই শাশুড়ীরও কম ছিল না। ননদেরাও খুঁটিয়ে দেখেছিল তাকে। এমন দেখা দেখেছিল যে, মিনা অগ্নিমূর্তি হয়ে মাকে বলেছিল, 'ওখানে বিয়ে দিতে হবে না, নিজেরা কত রূপসী, আস্পর্ধা কত—

ননদেরা অনেক বড়, বড় ননদ প্রায় মায়ের বয়সী। দেখতে গিয়ে নিজের হাতে সে মিনার চুল খুলে দিয়েছে, হাঁটিতে বলেছে, হাসতে হুকুম করেছে, রান্নার মৌখিক পরীক্ষা নিয়েছে, সেলাই দেখতে চেয়েছে। সেবারে মিনা বি, এ পরীক্ষা দিয়েছে আর

ভালো গান জানে—এই দুটো খবর জানা ছিল বলেই হয়ত এই দুই প্রসঙ্গের ধার-কাছ দিয়ে যায়নি বড় ননদ।

দুই পর্বে মেয়ে দেখা হয়েছিল। প্রথম পর্বে শ্বশুর শাশুড়ী আর ননদেরা, দ্বিতীয় পর্বে রমাপদ আর দুই ভগ্নিপতিসহ্ ছেলে নিজে। বিয়ের পর অমরেশ নিজেই গল্প করেছে, কি ভয়েই না তার কেটেছিল ক'টা দিন। বড়দি ছোড়দি মত না দিলে তো আর বিয়ে হত না, তারা মত দিতে তবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল।

কথাগুলো তখনও মিনার খুব ভালো লাগেনি। অমরেশের প্রত্যাশাটুকুই শুধু ভালো লেগেছিল।

এ সংসারে এসে সংসারের বাইরের আর একজনকে খুব ভালো লেগেছিল মিনার—সে রমাপদ। অমরেশের থেকে বছর তিনেকের ছোট, মিনার থেকে বছর দুইয়ের বড়—কিন্তু কথাবার্তায় শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই সমবয়সী। সংসারে দুই একজন লোক থাকে, সকলেই যাকে নিজের নিজের একান্ত আপনার জন ভাবে। শ্বশুর তাই ভাবতেন, শাশুড়ী তাই ভাবেন, আর—আর একজনের তো চোখের মণি।

এ বাড়িতে আসার প্রথম দিনেই এক ঘর লোকের মধ্যে বলে বসেছিল, মাসিমা! ছেলে তো তোমার সোনার ছেলে, এ যে দেখি সোনার উপর একেবারে মিনের কাজ হয়ে গেল, অ্যাঁ?

সকলে হেসে উঠেছিল। হাসি চেপে আর এক দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছেন শ্বশুরও। রমাপদ আবার চোখ পাকিয়ে নিরীক্ষণ করেছে তাকে, তারপর ভারিক্কি সুরে জিজ্ঞাসা করেছে, মাসিমার সোনার ছেলেকে ভাত মেখে খাইয়ে দিতে পারবে তো? দাদা কিন্তু নিজের হাতে খেতে পারে না—

উক্তিটা যে নিছক ঠাট্টা নয়, সেটা পরে বোঝা গেছে। কিন্তু সেদিন ছদ্ম কোপে শাশুড়ী পাল্টা চোখ পাকিয়েছিলেন, আমি থাকতে ও খাইয়ে দিতে যাবে কেন রে! আমি দু'জনকেই খাইয়ে দেব—

বড় ননদও একেবারে মুখ বুজে থাকেনি সেদিন। রমাপদকে বলেছে, তোর রকম সকম ভালো দেখছি না, নতুন বউয়ের তাঁবেদারি করে দেখ, তোকে যদি খাইয়ে টাইয়ে দেয়!

রমাপদ তক্ষুণি সাড়ম্বরে পায়ের ধুলো নিয়েছে তার। বলেছে, আশীর্বাদ করো বড়দি, তুমি আশীর্বাদ করলে ভরা বরষার আকাশে চাঁদ ওঠে—

আশীর্বাদের বদলে রমাপদর মাথায় সশব্দে একটা চাঁটি পড়েছিল।

নতুন জামাই কোনো উপলক্ষেও শ্বশুড়বাড়ি গিয়ে পর পর তিনটে দিন থাকতে পারে নি। বোনেদের সামনে মিনাও ঠাট্টা করেছে, ছোট ছেলে মাকে ছেড়ে থাকে কি করে! রাখার ইচ্ছে তো—তোরা মা-কে সুদ্ধু নেমন্তন্ন করলি না কেন?

বোনেরা এই নিয়ে ভগ্নিপতিকে অনেকদিন অনেক ঠাট্টা করেছে।

আড়াইখানা ঘরের ছোট ফ্ল্যাট, তারই ভাড়া মাসে দু'শ টাকা। বাড়িটাতে আরো অনেকগুলো ফ্ল্যাট, অনেক ভাড়াটে। তবে এই ফ্ল্যাটটাই সব থেকে ভালো। এতকাল মিনা নিজেদের খোলামেলা বাড়িতে থেকে অভ্যস্ত—নিজেরই তার দুটো ঘর ছিল বাপের

বাড়িতে। একটা শোয়া আর পড়ার ঘর, আর একটা গানের। বাবা খুব বড়লোক না হলেও মোটামুটি অবস্থাপন্ন—আর ওই পৈতৃক বাড়িতে ঘরের অভাব ছিল না।

তবু এই আড়াই ঘরের ফ্ল্যাটে এসেও মিনা তেমন অসুখী ভাবে নি নিজেকে। এইটুকুই সে নিজের ভাবতে পেরেছিল। অনাদরের ছায়া পড়েনি তখনো, শ্বশুর তো রীতিমত ভালবাসতেন তাকে। নিজে মাইনে গুনে মাষ্টার রেখে তার গান শেখাটা চালু রেখেছিলেন তিনি।

কিন্তু প্রায়ই শ্বশুরের একটা কথা খট করে কেমন কানে লাগত মিনার। অনেকেই আসত তাঁর কাছে, অন্যান্য ফ্ল্যাটের সমবয়সীরাও আসতেন। তাঁরা চলে গেলে প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যেত—সব স্বার্থের খাতিরে আসে, টাকা আছে জানে বলেই আসে —না থাকলে কেউ ফিরেও তাকাতো না—সব ব্যাটাকে আমার জানা আছে।

ওদিকে অন্যান্য ফ্ল্যাটের বর্ষীয়সী মহিলারাও সময় পেলে অবকাশ যাপন করতে আসতেন শাশুড়ীর কাছে। তাঁদের মুখেও একই ধরনের স্তুতি: আপনার আর কি দিদি, আপনার টাকা আছে যখন, সবই আছে। কারো অভিযোগ, ছেলে-বউ কলকাতায় থেকেও তিন মাসে একবার বুড়ো-বুড়িকে দেখতে আসে না (কোন লোভে আসবে?), কারো বা খেদ, কর্তার বড় চাকরি বা বড় ব্যবসা যখন ছিল, তখন কত কদর, কত খাতির ছিল তাঁদের—এখন ওদিকও গেছে, এদিকও গেছে। ছেলে, ছেলের বউরা পর্যন্ত হেলাফেলা করে, উঠতে বসতে মুখ-ঝামটা দেয় (কেন দেবে না, এখন আর কি প্রত্যাশা?)।

শ্বশুর-শাশুরীর এই নিয়ে আলোচনা মিনার ভালো যে লাগত না, তারও একটু কারণ আছে। অমরেশ এমন কিছু বড় চাকরি করে না, মাইনে যা পায়, সেটা ছোট পরিবারের পক্ষেও খুব সচ্ছল নয়। মিনাব বাবা এইখানে মেয়ের বিয়ে দেবেন কি দেবেন না—তা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছিলেন। ছ'টি ছেলে-মেয়ে না হলে এখানে বিয়ে দেবার আগ্রহ তাঁর আদৌ হত না। শেষ পর্যন্ত সংগতির দিকটা ভেবেই বিয়ে দিয়েছেন। টাকা, বিষয়আশয় যা আছে—এক ছেলে বসে খেলেও চলে যাবে। শ্বশুর মফঃস্বল শহরের নামজাদা উকিল ছিলেন, দেশে বাড়ি আছে, প্রচুর জমি আছে, সম্বৎসরের ধান চাল সেখান থেকেই আসে—খাজনাও কম পান না। তার উপর হাতে নগদও খুব কম নেই—নইলে কেনার জন্য বাড়ি দেখে বেড়াতেন কি করে?

এই সব চিন্তা করেই এখানে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মিনার বাবা। মিনা তা জানে। জানে বলেই শ্বশুর বা শাশুড়ীর এ ধরনের মন্তব্য কানে এলে তার খুশি না হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্বশুর হঠাৎ মারা গেলেন। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই একটা অবাঞ্ছিত ছায়া পড়ল এই সংসারে। ছায়াটা ক্রমশ বড় হতে থাকল।

বিষয়আশয় সব শাশুড়ীর নামে উইল করা ছিল। প্রথম ছ'মাস এসব দিকে ফিরেও তাকান নি তিনি। অমরেশ সারাক্ষণ ছোট মেয়ের মতই আগলে রাখত মাকে, মিনাও যথাসাধ্য করতে চেষ্টা করত। কিন্তু শোকের পর্ব কমে আসতে দেখা গেল, তার খুঁতখুঁতুনি বাড়ছে, মেজাজ রুক্ষ হচ্ছে, একটুতেই মুখ ভার করেন, রাগ করেন,

খোঁটাও দেন। ছেলের উপর নির্ভররতা বাড়ছে বলেই অবুঝপনাও বাড়ছে। অথচ অমরেশের চাকরি আছে, বাপ নেই বলে আরো পাঁচ বিষয় দেখাশোনা আছে—ওদিকে তিনি চান ছেলে সর্বদা তাঁকে নিয়েই থাকুক।

থাকেও যতটা সম্ভব। কিন্তু তাতে মন ভরে না।

একজন নয়, অনেকে মিলেই যেন শত্রুতা করেছে মিনার সঙ্গে। কেউ জ্ঞাতসারে করেছে, কেউ অজ্ঞাতসারে। শাশুড়ীর ক্রমশ ধারণা জন্মেছে, ছেলে ছেলের বউ যেটুকু এখন করছে বিষয়আশয় সব তাঁর নামে বলেই করছে। নইলে করত কি করত না-—তাঁর সেই সন্দেহ। একটু একটু করে ক্রমশ এই সন্দেহটাই স্পষ্ট হয়েছে, তারপর সারাক্ষণ মাথার মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলেছে। একমাত্র নাতির সঙ্গেও তখন ভালো ব্যবহাব কবেন নি তিনি—ছেলে, ছেলের বউয়ের সঙ্গে তো নয়ই।

অমরেশ মায়ের দু'পা জড়িয়ে এক-একদিন হাউহাউ করে কেঁদেছে। বলেছে, মা, তুমি এ রকম ভাবো কেন? তুমি কি আমাকে আগে দেখো নি? এক এক সময় কেঁদে ফেলেছে মিনাও। এই কান্না দেখে শাশুড়ী গোড়ায় গোড়ায় নরম হতেন, নিজেও কাঁদতেন—ছেলের গায়ে পিঠে হাত বুলোতেন। বলতেন—বালাই ষাট, তুই কি কখনো পর হতে পারিস—মাথায় যে এক এক সময় কেন আসে, বুঝি না।

কিন্তু তবু আসেই। এ এক রোগের মত হয়ে দাঁড়াল তাঁর। শ্বশুর মাবা যাবার পর বড় ননদ ছোট ননদ সপ্তাহে কম করে চার পাঁচ দিন আসে, মায়ের একটু কিছু হলেই ঘণ্টাব পর ঘণ্টা সেবাযত্ন করে, নিজেদের ডাক্তার নিয়ে আসে, হাতে করে ফল নিয়ে আসে। চিকিৎসার একটু ত্রুটির সম্ভাবনা দেখলে ভাইকে আর ভাইয়ের বউকে বকে তুলোধুনো করে দেয় তারা। নিঃস্বার্থ দরদ, নিঃস্বার্থ টান কাকে বলে—মেয়েদের ইঙ্গিত করে বউকে বহু দিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে ছাড়েন নি শাশুড়ী।

প্রায়ই গোল বাধত মিনার গান নিয়ে। তখনো গানের মাষ্টার আসত। গান ছাড়ার কথা মিনা ভাবতেও পারে না। নামও হয়েছে তখন, গোটাকতক গান রেকর্ড হয়েছে—গাইতে যেতেও হয় দু'চার জায়গায়। শাশুড়ীর একটু আধটু শরীর খারাপ তো লেগেই আছে, মাষ্টারকে কত আর ফেরাবে। দরজা বন্ধ করে গান শেখে। মাষ্টার চলে গেলেই তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর খবর নিতে যায়। শাশুড়ীর প্রায়ই মুখ ভার তখন। উপরতলার যাঁবা আসেন তাঁর কাছে, তাঁরাও মুখ মুচকে তাকান মিনার দিকে। একদিন তো এক মহিলা ইনিয়ে বিনিয়ে বলেই ফেললেন, শাশুড়ী গেলে টাকাপয়সা অনেক পাবে মা, কিন্তু এমন শাশুড়ী আর পাবে না, যতকাল আছে—সেবা-যত্ন কোরো।

ননদেরাও এই নিয়ে খোঁটা দিতে, গঞ্জনা দিতে ছাড়ে নি। কিন্তু মিনা গান ছাড়বে কি করে? রাগের মাথায় অমরেশকে অনেক দিন বলেছে, গানটান সব চুলোয় যাক—কিন্তু সত্যিই চুলোয় পাঠাতে পারে নি। আরো পারেনি রমাপদর জন্যে, অমরেশকেই সে বকে-ঝকে এমন কি মাসিকেও দু'কথা শুনিয়ে ফয়সালা করে দিয়েছে। মিনাকে ঠাট্টা করেছে, তোমার বরাত বটে, একটা বিয়ে করে এ-রকম দু'দুটো লোক খুব কম লোকই পেয়েছে। গান ছেড়েছ তো একজনকে, অর্থাৎ আমাকে খোয়াবে।

মিনা রাগ করে বলেছে, বয়ে গেল। কিন্তু আসলে রাগ আর তখন নেই।

ওদিকে সদাসন্তপ্ত শাশুড়ী মেজাজের ঝোঁকে দু'তিন দিনের জন্য এক-একবার মেয়েদের বাড়ি চলে গেছেন। মেয়েরা পরম সমাদরে রেখেছে তাঁকে। কিন্তু ছেলে কান্নাকাটি করে, অকারণে ক্ষমা চেয়ে, মিনাকে দিয়েও ক্ষমা চাইয়ে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে আবার। নিজেও তিনি না এসে থাকতে পারেন নি। এসেই দুই একদিন নাতিকে আদরে আদরে অস্থির করেছেন, তারপর আবার যে কে সেই। মিনা বেশি কিছু বলতেও পারে না অমরেশকে, বলতে গেলে সে রেগে যায়, সহ্য করতে পারে না বলে উল্টে তাকেই দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। শাশুড়ী ভাবেন, এও ছেলের মেকি শাসন, আসলে তাঁর চোখ বোজার অপেক্ষা ওদের।

শাশুড়ী হঠাৎ একদিন ঘোষণা করলেন, গানের মাষ্টারের মাইনে আর তিনি চালাতে পারবেন না। অনেক হয়েছে, এবারে যেন তাঁকে নিষেধ করে দেওয়া হয়। মিনা কোন রকম জবাব দিল না। মাষ্টার তেমনি আসতে লাগল। রাগে ক্ষোভে জ্বলতে লাগলেন শাশুড়ী। ওদিকে এই নিয়েই অমরেশের সঙ্গেও একহাত হয়ে গেল মিনার, কারণ নিরুপায় অমরেশ তাকে বোঝাতে চেয়েছিল, এখন যা গলা তার, মাষ্টার ছাড়াও গান চলতে পারে, আর মিনার গোঁ, মাষ্টারকে জবাব দিলে সে আর গান গাইবেই না।

শাশুড়ী মেয়েদের বললেন, আমি টাকা দেব না তাতে কি, আমি চোখ বুজলেই তো অনেক টাকা হাতে আসবে, সেই আশায় এখন হয়ত ধার করেই মাষ্টারের মাইনে চালাচ্ছে। শোনামাত্র মেয়েদের অগ্নিমূর্তি। ভাইকে ডেকে প্রথমে একপ্রস্থ শাসালো তারা, মা বারণ করছে, তোর এত স্পর্ধা কি ক'রে হয়? দিদিদের মুখের উপর অমরেশ কোনদিন কথা বলেনি, সেদিনও চুপ। এ-ঘরে মিনা ফুঁসছিল, তারও ডাক পড়তে আস্তে আস্তে সামনে এসে দাড়াল। বড় ননদ বলল, তুমি অন্য কোথাও গান শেখার ব্যবস্থা ক'রে নাও, বাড়িতে হবে না।

মিনা চুপ করে রইল একটু, তারপব শান্ত মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'অন্য কোথায় ব্যবস্থা করব?'

ও...! বড় ননদ বিস্মিত, আজকাল মুখের উপর কথা বলতেও শিখেছ তা'হলে? ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, যেখানে খুশি ব্যবস্থা করো, এখানে মায়ের অসুবিধে হয়।

ধীর মৃদু স্বরে মিনা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'মায়ের কি অসুবিধে হয়?'

ব্যস্তসমস্ত অমরেশ বউকে ঘর থেকে ঠেলে পাঠাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বড়দিই বাধা দিল তাকে, ধমকে উঠল, দাঁড়া! এর হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। মিনার দিকে ফিরে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল, এতবড় সাহস তোমার, মায়ের কি অসুবিধে হয়? তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে! বলি কোন লাট সাহেবের ঘর থেকে এসেছ তুমি—

'আস্তে কথা বলুন, নিচে উপরে অন্য ভাড়াটেরা আছে। জবাবদিহি করতে বলি নি। জানতে চাইছি মায়ের কি অসুবিধে হয়, সপ্তাহে একদিন গান শেখার সময় ঘরের দরজা বন্ধ থাকে, এ-ঘর থেকে শোনাও যায় না—

বড়দির মুখের আগুন যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। স্তব্ধ নেত্রে বউয়ের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর হঠাৎ আত্মস্থ হয়ে বলল, মা আমি চললাম, আর এখানে অপমান হতে আসব না।

বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা ছিল না শাশুড়ীরও। মেয়ের কথায় তাঁরও সম্বিৎ ফিরল যেন। হাত বাড়িয়ে মেয়ের শাড়ির আঁচলটা ধরে ফেললেন তিনি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দাঁড়া, আমিও যাব, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

মিনা ও-ঘরে চলে এসেছে। এখান থেকেই অমরেশের কাকুতি মিনতি হাতে পায়ে ধরা—সবই টের পেয়েছে সে। শাশুড়ী গর্জে উঠেছেন, ছাড় আমাকে, ছাড় বলছি, আর না, বউ নিয়ে খুব শান্তিতে থাক এখন।

চলে গেছেন।

উদভ্রান্ত বোষে অমবেশ এ-ঘরে এসেছে। 'করলে কি তুমি, এটা করলে কি?'

মিনাবও দুই চোখে আগুন, তেমনি জবাব দিযেছে, 'অন্যায হয়েছে, এবাবে আমাকে তাড়িয়ে ওঁদের নিযে এসো।'

'তাই আনব, তাই আনব, বুঝলে?' ঝড়ের মত বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে সে।

অনেক করেও ছ'মাসেব মধ্যে ছেলে তার মাকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। রাগ পড়তে মিনাও দুই একবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অপমান হয়েই ফিরেছে। শাশুড়ী আসেন নি, পালা করে এক এক মেয়ের বাড়িতে থাকছেন। মেযেদের আদর-যত্নের ত্রুটি নেই। এদিকে রমাপদব কাছে শুনেছে, মেযেরাও মাযের প্রতি অখুসি, কারণ এত করেও মায়ের ওই বেইমান ছেলের জন্যেই নাকি ভিতবটা পুড়ছে সর্বদা।

এদিকে অমরেশের মুখের হাসি গেছে। নিঃশব্দে এক অশান্তি পুষছে সে। রোজই মায়ের সঙ্গে দেখা করে ফেবে যখন, মুখ আবো শুকনো।

শাশুড়ীব মস্তিষ্কের বিকৃতি দেখা দিয়েছে আগেই শুনেছিল মিনা, সেদিন আর একটা খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সমস্ত টাকাপয়সা বিষয়আশয় শাশুড়ী দুই মেয়েব নামে লিখে দিয়েছেন। শুধু তাই নয, বোনেরা মানসিক চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা কবছে না তাব কারণ এই ব্যাধি প্রমাণ হলে সম্পত্তি লেখাপড়া করা কোনো দাম থাকবে না।

বাড়িতে কতদিন লুকিয়ে কেঁদেছে অমবেশ, মিনা তাও টের পেয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে একটি কথাও সে বলে নি।

আবো ছ'মাস বাদে হঠাৎ একদিন মাকে নিয়ে এলো সে। মনে হল যেন আকাশের চাঁদ ধরে এনেছে। সাড়ম্বরে চিকিৎসা শুরু করে দিল। তার মুখ চেয়ে মিনা কর্তব্যের কোনো ত্রুটি না রাখতেই চেষ্টা কবল। কিন্তু শাশুড়ীর তখন মস্তিষ্কের গোলযোগ বেড়েছে—হঠাৎ হঠাৎ বকাবকি শুরু করেন, হাসেন, কাঁদেন, আবার কখনো বা গুম হয়ে বসে থাকেন।

তবে কিছুটা শান্ত থাকেন নাতিকে কোলে পেলে। গোড়ায় গোড়ায় মিনার ভয় করত, কিন্তু অমরেশই ছেলেকে নিয়ে মায়ের কোলে বসিয়ে দিত, তাকে আশ্বাস দিত, কিছু ভয় নেই। নাতিকে কোলে নিয়েও শাশুড়ী অনেক কেঁদেছে, কিন্তু সে কান্নাটা অন্যরকম লেগেছে মিনার। অনেকটা সুস্থ অনুশোচনার মত মনে হয়েছে। আবার অনেক সময়েই এ-ঘরে বসে ও-ঘরের মাকে শুনিয়ে মিনাকে উদ্দেশ করে অমরেশ বলে,

দিদিদেব সব সম্পত্তি লিখে দিয়ে মা খুব ভাল কাজ কবেছে, আমাকে নিজেব চেষ্টায বড হবাব দিকে এগিযে দিযেছে—ছেলেব মঙ্গলেব দিক চেযে অনেক বড বড লোকেব মাযেবাই এই কাজ কবেছে—তবে তাঁদেব ছেলেবা বড হযেছে।

মিনাব বুকেব ভিতবটা জ্বালা-জ্বালা কবেছে, মন অনেক সময বিদ্রোহ কবতে চেযেছে, আবাব এই একজনেব মুখ চেযেই সে নিঃশব্দে সহ্য কবেছে।

শেষে এই দিনেব বিভ্রাট।

শাশুডীব শবীব ক'দিন ধবেই বেশ খাবাপ যাচ্ছিল। এ যে সেবিব্রাল অ্যাটাকে দাঁডাবে কেউ ভাবেনি। মিনাব বেডিও প্রোগ্রাম ছিল আজ। কিন্তু শাশুডীব শবীবেব অবস্থা দেখে ক'দিন আগে গিযে সে বেকর্ড কবিযে এসেছিল—যেতে পাববে কি পাববে না—ঠিক কি। ইদানীং বাবকযেক এবকম কবেছে।

হঠাৎ পবশু বিকেলে এই অঘটন। শাশুডী অজ্ঞান। তাবপব এই দু'দিন যমে মানুষে, অক্লান্ত টানা-হেচডা। ডাক্তাববা আশা ছেডেছেন। এখন শুধু শেষেব প্রতীক্ষা।

সন্ধ্যাব আগে ক্লান্ত বমাপদ মিনাব ঘবে বসে এক পেযালা চা খাচ্ছিল। সে ডাক্তাব মানষ, গুমোট ভাবটা কাটাবাব জন্যেই ডিশে খানিকটা চা ঢেলে মিনাব দিকে বাডিযে দিযে বলছিল—সবাই ব্যস্ত, এই ফাকে একটু ভাগাভাগি কবে নিই, চট কবে মেবে দাও।

মিনাও হেসেই ফেলেছিল, আব কিছু বলতেও যাচ্ছিল হযত। বলা হল না, বড ননদ মুখ বাডিযে বমাপদব উদ্দেশে গম্ভীব অনুশাসন কবল, হাসাহাসিব অনেক সময পাবি, এ ঘবে এসে দ্যাখ—

চমকে ছুটে এসেছিল বমাপদ। মিনাও। কিন্তু এসে দেখা গেল শাশুডী সেই একভাবেই আছেন কোনো তাবতম্য নেই। কিন্তু বড ননদেব কথা এ-ঘবেবও সকলেব কানে গেছে। অমবেশেব গম্ভীব মুখে গভীব বিবক্তি।

আবো আধ ঘণ্টা পবে। সকলেই বোগিণীব ঘবে। বমাপদ আব মিনাও। ঘবেব জানলা ক'টা খোলা। বেতাব বাণী শোনা গেল হঠাৎ ও-পাশেব দোকানঘব থেকে, এবাবে গান শোনাচ্ছেন—মিনা চক্রবর্তী।

এ ঘবে সচকিত সকলে। মিনাও। আজই গান তাব, ভুলেই গিযেছিল। গান স্পষ্ট ভেসে আসছে। অস্বস্তিব একশেষ মিনাব। বড ননদ, ছোট ননদেব ঠোঁটে কঠিন হাসিব আভাস। কি যে কববে মিনা, সে ভেবে পাচ্ছে না।

বড ননদ গা-ঝাডা দিযে উঠে জানলা ক'টা বন্ধ কবে দিল। তাবপব মিনাব দিকে ফিবে বলল, তুমি না হয ও-ঘবেব দবজা বন্ধ কবে নিজেব গান শুনে এসো, আমাদেব আব মাযেবও বোধ হয অসুবিধে হচ্ছে।

অপমানে মিনা নির্বাক, পাংশু দুই নন্দাই পর্যন্ত ঘবে বসে। কিন্তু এই অপমানে মাথায বোধ কবি আগুন জ্বলে উঠল আব একজনেবও। নিরুপায বাগটা স্ত্রীব উপবে গিযে পডল অস্ফুট বোষে অমবেশ বলে উঠল, এ-সমযেও তুমি প্রোগ্রাম বাতিল কবতে পাবোনি, তুমি যাও এখান থেকে, যাও বলচি।

মিনা উঠে এলো। একবাবও বলল না, বেকর্ড যখন কবে এসেছিল এ-সমযেব কথা তখন কাবোই জানা ছিল না।

একটু বাদেই রমাপদও উঠে এলো পাশের ঘর থেকে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, আমিও চললাম বউদি, আর বেশিক্ষণ এখানে থাকলে আমারও ওই অ্যাটাক হবে।

মিনা নিরুত্তর।

তার আসল রাগ কার উপর রমাপদ বুঝেছে, বুঝেই কি ভেবে বলেছে, দাদা সহিষ্ণুতার পাহাড় একখানা, তবু মানুষ তো...তার জন্যেই ভয় আমার। স্বাভাবিক মানুষের মত সে রাগারাগি করলে তুমি বরং খুশি হতে চেষ্টা কোরো, তার সঙ্গে সদয় ব্যবহার কোরো।

কথাগুলো কেমন দুর্বোধ্য মনে হয়েছে মিনাব।

...রমাপদ আরো কিছু বলেছে। মিনা শুনেছে। আর তারপর স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে বসেই আছে সেই থেকে।

মাসি অর্থাৎ শাশুড়ী টনটনে জ্ঞান থাকতেই মেয়েদের সব বিষয়-সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন। তার আগে একান্ত বিশ্বাসে রমাপদকে বলেছিলেন, ছেলে শুধু বিষয়ের জন্য তাকে চায় এই সংশয় নিয়ে তিনি বাচবেন না, বাঁচতে পারবেন না। তাঁর এই বিকৃতিতে ইন্ধন যুগিয়েই ননদেরা সব লিখিযে পডিযে নিয়েছে। ফলে তারপর থেকে মাথা যেটুকু না খারাপ হয়েছে, তার থেকেও অনেক বেশি পাগলের মত থেকেছেন তিনি। নিঃসম্বল এই মাকেও ছেলে সাদবে ফিরিয়ে নেয কিনা সে-ই নির্মম পরীক্ষা করেছেন।

অমরেশও জানে সবই। রমাপদর হাত ধবে সেই অননয় করেছে, মিনা যেন কিছু না জানে।

সে শুধু জানুক, মানসিক বিকৃতির ফলেই মা বোনেদের সব লিখে পড়ে দিয়েছে —সে সম্পত্তি চায না, সে শুধু তার মাকে চায়, মায়ের সম্মানটুকু চায়।...রমাপদর মতে, শেষের দিকে দিবারাত্র অনুশোচনায় জ্বলতেন বলেই মা আজ এই রোগে যেতে বসেছেন।

পরদিন। বেলা বেড়েছে। ননদদের আনুষ্ঠানিক কান্নাকাটি সাবা। বাইরে শব তোলার তোড়জোড়ও প্রায় শেষ।

শাশুড়ী শেষ নিশ্বাস ফেলার পব মিনা এই ঘরে উঠে এসেছিল। এবারে পায়ে পায়ে আবার ও-ঘরে এসে দাঁড়াল। সমস্ত মুখ থমথমে, কি একটা দাহ মুক্তির পথ না পেয়ে যেন দুই চোখে জমাট বেঁধে আছে।

অমরেশ মায়ের শিয়রের কাছে বসে, তার দুই চোখ জবাফুলের মত লাল।

মিনা অপলক নেত্রে শাশুড়ীব মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। হঠাৎ মনে হল শান্ত ঘুমের মধ্যে তিনি যেন হাসছেন। নন্দাইরা দেহ তোলার জন্য তাড়া দিচ্ছে।

শাশুড়ীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল মিনা। গলায় আঁচল জড়িয়ে হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর দুইহাতে শাশুড়ীব দুটি পা বুকে জড়িয়ে নিয়ে ওই পায়ে মাথা গুঁজে দিল। বিস্ফারিত নেত্রে অমরেশ দেখল, ননদেরা দেখল—চোখের জলে মায়ের দুই পা ভেসে

যাচ্ছে, এ কান্না যেন আব থামবে না।

কিন্তু তাবা শুধু কান্নাই দেখল, মিনা কি বলছিল তা জানে না।

আকুল কান্নায ভেঙে বাব বাব শুধু এক কথাই বলছিল মিনা। বলছিল, এই পাপ চোখে আব যেন কোনো দোষ না দেখি মা, এই ছেলে মা-গো তোমাব, তোমাকে শত কোটি প্রণাম—শত কোটি প্রণাম।

বাতাসে মিশে থাক

প্রথমে মনে হযেছিল গোটা জীবন ধবেই তো দেখে এলাম ওকে। মাঝে এক-এক বাব দু'পাচ বছবেব ছেদ পডেছে এই যা, কিন্তু তাতে আস্ত একটা জানা মানুষ সচবাচব কতটুকু আব বদলায।

ওব সম্বন্ধে ভাবতে বসে মনে হযেছে, কাছে থাক আব দূবে থাক, ঠিক ঠিক দেখেছি তাকে বাবচাবেক মাত্র। যে চাব বাবেব চাবটে চিত্র মনে দাগ কেটে বসে আছে। সেই দেখা-কটাই সম্পূর্ণ মনে হযেছিল প্রত্যেকবাব।

আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে, আসলে তাকে আমি দেখেছি একবাব—এই শেষবাব। কিন্তু সে কতটুকু দেখা, বলতে পাবব না। আধাব হিসেবে দেখাবও বোধ কবি একটা পবিমিত শক্তি আছে। মাথাব ওপবদিকে তাকালে অনন্ত আকাশ দেখা যায, কিন্তু কতটুকু দেখা যায? সমুদ্রেব দিকে তাকালে অনন্ত জলবাশি দেখা যায, কিন্তু সত্যি কতটুকু দেখা যায?

ভূমিকা থেকে মনে হবে, মস্ত কাবো কথা লিখতে বসেছি। তা হতে পাবে, না-ও হতে পাবে। কিন্তু আসলে আমি লিখতে বসেছি এক অতি অদ্ভুত জীবনপটে অলক্ষ্য এক বিচিত্র শিল্পীব বেপবোযা কাবিগবীব কথা, মৃত্যুব পাতায জীবনেব কৌতুক বচনাব কথা।

সেই অলক্ষ্য দেবতাকে প্রণাম।

তাব আসল নাম অনুক্ত থাক। কাবণ নাম যখন নামীব আসনে ঠাঁই পায, সেই নাম-দর্পণে তখন বহু সগোত্রীযেব সাফল্যেব বহস্য ভেসে উঠতে পাবে। ধবা যাক তাব নাম বিজযেশ—বিজযেশ সবকাব, আব আমবা তাকে ডাকতাম বিজু বলে।

কিন্তু মিথ্যেব বোঝাব উপব আবাব এক মিথ্যেব আটি চাপানো হল। ছাব্বিশ বছব বযস পর্যন্ত সকলে আমবা একটা নামেই তাকে ডেকেছি, সেই নাম গোপন কবলে গল্প এক কদমও এগোবে না।

ঃ টেন এইচ পি ফোব সিলিণ্ডার্স অ্যাট সিক্সটি এম পি. এইচ। দুর্বোধ্য শব্দ নয কতগুলো, সব মিলিযে এ-ই একজনেব নাম, যে নামে গোবখপুবেব অতি সম্ভ্রান্ত মহলেব বাঙালী অবাঙালী মেযে-পুরুষেবাও তাকে চিনত। মানে ছাডা নাম হয না নাকি। খুজলে এই নামেবও সবল মানেই বেরুবে। টেন এইচ পি অর্থাৎ দশ হর্স

পাওয়ার যার শক্তি, ফোর সিলিণ্ডার্স-এর সাদা মানে চার সিলিণ্ডার যন্ত্রযুক্ত, আর সিক্সটি এম. পি. এইচ. বলতে ঘন্টায় ষাট মাইল যার গতি।

বন্ধুরা ভাবাবেগে অনেক সময় গোটা নাম আর ছাঁটা নামে অভিষিক্ত করত তাকে, বলত, এই কাজ বা এই ফাংশানের ভার দাও মিস্টার টেন হর্স পাওয়ার ফোর সিলিণ্ডার্স অ্যাট সিক্সটি মাইলস পার আওয়ারকে—মিস্টার টেন এইচ. পি., উইল ইউ ওবলাইজ আস?

—মিস্টার ফোর সিলিণ্ডার, উইল ইউ?

অথবা, মিস্টার সিক্সটি এম. পি. এইচ. উইল ইউ?

বিজয়েশ সরকার ঘাড় কাত করেই আছে। সর্বকর্মে গণেশ স্মরণ। বন্ধুদের প্রয়োজনে এবং বন্ধুদেব অন্দব মহলের প্রয়োজনে বিজয়েশ সরকাবের সদানন্দ গণেশের ভূমিকা।

এই নামায়নেব বাহাদুবি জানকীর—বিজযেশেব নিজের খুড়তুতো ভাই জানকীজীবনের। জানকীজীবন এক বড কলেজেব নামকরা অধ্যাপক এখন, তার স্ত্রী স্মৃতিকণা এক মেযে ইস্কুলের বাশভারী হেড মিসট্রেস। তিনটি ছেলেমেয়ে, তাদেরও কাঁচা মুখে প্রতিশ্রুতিব ছাপ উজ্জ্বল। বেশ আদর্শ পরিচ্ছন্ন সংসার। আমাব সঙ্গে দেখা হলে এখনো আদর-যত্ন করে, চা বিস্কুট খাওয়ায়, আবার আসতে বলে। কিন্তু গোরখপুরের আর কাউকে যেন চেনে না তারা, আর কারো কথা জিজ্ঞাসাও কবে না।

কিন্তু তখন আরো একজনকে বিশেষ করে চিনত দুজনেই, বিশেষ করে তার কথাই বলত। দু'চার মাসেব এদিক-ওদিক সমবয়সী বিজয়েশ আর জানকী। ওদের বংশটাই বোধহয় স্বল্পায়ুক বংশ। অল্প বয়সে সংসারের হাল ধরেছিল বিজয়েশের দাদা —প্রতিভাধব মানুষ ছিল সে। তারই দুটি পোষ্য ছিল ওরা—বিজয়েশ আর জানকী।

বিজয়েশ অজাতশত্রু, কিন্তু জানকীর সঙ্গে তার রেষারিষি খটাখটি লেগেই ছিল। কৌতুকের ছলে তাদের এই রেষারিষিতে ইন্ধন যুগিয়েছে দাদা-বউদিও। একজনকে আর এক জনের পিছনে লাগিয়ে দিযে সবল আনন্দ উপভোগ করতে দেখেছি তাদের। তখন সেটা দোষের মনে হয়নি কাবোই, আমাদেরও না।

বিজয়েশের দাদা ছিল সেখানকার মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারী। বিরাট চাকরি, বিরাট প্রতিপত্তি আর মর্যাদা। অফিসের মস্ত আবাস-বাংলোয তারা থাকত, আঙুলের ইশারায় দু'পাঁচটা বেয়ারা আরদালি ছুটে আসত। আমরা ঈর্ষাই করতাম ওদের। ওদের থেকে বেশি ভাগ্যবান আর কাউকে ভাবতুম না। শহরের হোমরা-চোমরা লোকেরাও দাদার খাতিরে ওদের খাতির করত।

কোন রকমে বি. এ. পাস করেই পড়াশুনার পাট শেষ করেছিল বিজয়েশ। আগেই শেষ কবত, নেহাত দাদা-বউদির ভয়ে পারেনি। যে ব্যাপারে মাতামাতি নেই তাতে বিজয়েশও নেই। এদিক থেকে পরীক্ষা-পর্বটা বোধ করি জীবনের সব থেকে নীরস অধ্যায়। পরীক্ষার আগের দিনও নিজে হলঘরে ঘোড়া হযে চোখের মণি দুই শিশু ভাইপোকে একটু ঘোড়ায়-চড়ার আনন্দ দিচ্ছিল বলে দাদা তাদের কানে হাত দিয়ে ওকে অপ্রস্তুত করেছে। যার ফলে ওকে খাওয়ানোর জন্য বউদিকে ঝাড়া দেড় ঘন্টা

সাধ্য-সাধনা করতে হয়েছে। আর যার ফলে জানকীকে মুখচেপে হাসতে দেখে বিজয়েশ ঘোষণা করেছে, একদিন তোর পিঠে আমি না চাপি তো কি বললাম। মুখ দিয়ে হাসির বদলে ফ্যানা বেরুবে দেখিস তখন!

খটকা লাগে এক-একসময়। বিজয়েশের স্মৃতির বোঝা আজও সত্যিই কি জানকী পিঠ থেকে নামাতে পেরেছে?

যাক, দাদা তার সুপারিশের জোরে সেখানকাব কোনো প্রতিষ্ঠানের এক ইনস্পেক্টরের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল তাকে। সখেদে বলেছিল, ওটা আর বড় হল না, অদৃষ্টে না থাকলে কে আর টেনে বড় করতে পারে। এখন বুঝছে না, পবে বুঝবে—

খুড়তুতো ভাই সেদিক থেকে দাদার আশা অনেকটাই পূরণ করেছে। বিজযেশ যখন দুবছর ইনসপেক্টরি করে বিশ টাকা ইনক্রিমেন্ট পেযে আনন্দে বুক ফুলিয়ে দশ বিশ টাকা খবচ করেছে, জানকী ততদিনে সসম্মানে এম. এ. পাস করে ওই দাদাব মুরুব্বির জোরেই স্থানীয় কলেজের লেকচারার হয়ে বসেছে। দাদা তাকে আবো বড় দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু জানকীজীবনের নিরুপদ্রব কলেজের চাকরিই পছন্দ।

কিন্তু এ অনেক পরের প্রসঙ্গ। তার আগে জানকীজীবনের নামায়ন প্রসঙ্গের বিস্তার প্রয়োজন।

বিজয়েশেব মাযেব কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল। সে যখন বি. এ. পড়ে, তখন তার অংশের পাসবইটা বউদির মারফৎ দাদার কাছ থেকে হস্তগত কবল। সেই থেকে হাত খুলে গেল তার।

কিছুদিন বাদে খবর পেল নিলামের আক্রায় ভালো একটা মোটরবাইক নিলাম হবে। কোন ছোকরা সাহেব নাকি তার সখের মোটরবাইক বিক্রী করে দিচ্ছে। শোনামাত্র সেখানে গিয়ে হাজির সে। কিন্তু গিয়ে দেখে আগে জানকীজীবন উপস্থিত সেখানে। মনে মনে তারও একটা মোটববাইকেব সখ ছিল বিজয়েশ জানে। কিন্তু তার সঙ্গেই যে পাল্লা দিতে হবে একবারও ভাবেনি। জমানো টাকা কিছু জানকীর হাতেও ছিল।

মোটরবাইকের ডাক শুরু হতে বিজয়েশ তৎপর হয়ে উঠল। দর চড়তে লাগল। জানকী বেশির ভাগই চুপ করে থাকছে আর মাঝে মাঝে দর দিচ্ছে। বিজয়েশের তখনো ধারণা, সে এক-এক ধাপে বেশি বেড়ে যাচ্ছে বলে জানকী তাব হয়েই আস্তে ধীবে দর বাড়াচ্ছে। কিন্তু অন্য ক্রেতা থেমে যেতে জানকী যখন তার দামের ওপর দাম চড়ালো তখন প্রথমে অবাক এবং পরমুহূর্তে ক্রুদ্ধ সে। চড়া গলায় একবারে পঞ্চাশ টাকা টপকে জানকীর দিকে তাকালো সে।

অর্থাৎ, আব বাড়ার ইচ্ছে আছে?

জানকী হিসেবী মানুষ। সে চুপ করে গেল। মোটরবাইক নিয়ে বিজয়ীর আনন্দে বিজয়েশ বাড়ি ফিরল। জানকী মনমরা, মোটরবাইকটার প্রতি তার লোভ ছিল। সেটা টের পেয়ে বিজয়েশ তাকে বলল, হাত জোড় করে আমার কাছে ভিক্ষে চা, ওটা অমনি দিয়ে দেব।

জবাবে জানকী নিঃশব্দে ভস্ম করেছে তাকে। এরপর মোটরবাইক ধ্যানজ্ঞান বিজয়েশের। যত টাকায় কিনেছিল আরো প্রায় ততো টাকা খরচ করল ওটা সংস্কার

করতে। যন্ত্র বদলে বদলে শক্তি বাড়ালো, সাইলেন্সার লাগিয়ে শব্দ নিয়ন্ত্রণ করল। তার গর্ব ধরে না, গোরখপুরে কার মোটরবাইকের চার সিলিণ্ডার, দশ হর্স পাওয়ার, ঘণ্টায় ষাট মাইল অনায়াস গতি?

ব্যস এই থেকেই এই নামকরণ। জানকী সকলের সামনেই তাকে ডাকত, টেন হর্স পাওয়ার, বা ফোর সিলিণ্ডার, অথবা সিক্সটি এম. পি. এইচ. বলে। ক্রমে সব মিলিয়ে ওই নাম দাঁড়িয়ে গেল।

আমরা দেখতাম, ওই মোটরবাইক যেন প্রাণ বিজয়েশের। ঝাড়া-মোছা করছে, তেল খাওয়াচ্ছে, শৌখিন সরঞ্জাম জুড়ছে। গোঁ-গোঁ শব্দে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগেই চালায় মোটরবাইকটা, অথচ এমন ব্রেক যে ইচ্ছেমত সহজেই থামাতেও পারে।

কলেজে পড়তেই বিজয়েশের প্রধান কাজ ছিল পাবলিক রিলেশনস মেনটেন করা। এও জানকীর উক্তি। অর্থাৎ পরিচিত গোষ্ঠীর অন্দরমহলে পর্যন্ত তার অবাধ গতিবিধির ফলে তাদের ফাইফরমাশ খাটারও অন্ত ছিল না। বিপদ তারণ করতে বা সমস্যার সমাধান করতে বিজু যেমন পারে তেমন আর কেউ পারে না—এইটুকু প্রীতিবচনেই কাজ হত। মোটরবাইক হবার ফলে এই পরোপকার বৃত্তি চারগুণ বেড়ে গেল। কাকে কোথায় পৌঁছে দিতে হবে, কাকে কোথা থেকে নিয়ে আসতে হবে, কোন ফাংশানের কোন দুর্লভ জিনিসটি কত দূর থেকে সংগ্রহ করতে হবে—এই সবকিছুর জন্যে প্রসন্নবদন বিজয়েশ এক পায়ে প্রস্তুত।

একবার বললেই হল, ওহে ফোর সিলিণ্ডার, কি হবে?

সমস্যার তক্ষুনি সমাধান। ষাট মাইল বেগে গোঁ-গোঁ শব্দে ছুটল মোটরবাইক।

তার মোটরবাইকের পিছনে সঙ্গী একজন না একজন আছেই, আবার সুপরিচিতা সঙ্গিনীও দেখা যেত জনাকয়েক। সব থেকে বেশি দেখা যেত স্মৃতিকণাকে। তাদের বাড়িব কাছে বাড়ি, অনেক দিনের পারিবারিক হৃদ্যতা। মোটরবাইক কেনার কয়েক মাসের মধ্যে স্মৃতিকণার ইস্কুলের পড়া শেষ হয়েছে। এখানকার কলেজে আই. এ. পড়বে। সঙ্গিনীদের মধ্যে সেই পাকা সোয়ার হয়ে বসল।

এই সহরের উচুঁ মহলের মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে ছোটাছুটি করতে অভ্যস্ত। সাইকেল অনেক বয়স্কা মহিলাও চালায়। কাজেই এটা এমন কিছু দৃষ্টিকটু ঠেকল না কারো চোখে। কিন্তু স্মৃতিকণা যখন বি. এ. পড়ে আর বিজযেশ চাকরি করে তখনো এই পাবলিক রিলেশনের কাজে বিশেষ করে তার প্রতিই বিজয়েশের উৎসাহ দেখে আমাদের অনেক সময় চোখ টাটিয়েছে। আমাদের টিকা টিপ্পনী মুখর হয়ে উঠেছে। তাতেও বিজয়েশ মহাখুশি। প্রেমের ব্যাপারেও কিছু গোপন করার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। বলেছে, বিয়ে পাকা, এখন পূর্বরাগ চলছে।

কেমন চলছে? কেমন? আমরা উৎসাহিত।

মন্দ না, তবে বিয়ে শেষ পর্যন্ত হবে কিনা সে-সম্বন্ধে স্মৃতির সন্দেহ আছে।

কেন? কেন?

ও বলে, তার আগেই এই মোটরবাইক থেকে পড়ে তার প্রাণটা যাবে।

আর তুই কি বলিস?

আমি কিছু বলি না, একটা হাত পিছনে চালিয়ে দিয়ে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি।

ও কি বলে?

ও বলে, কামড়ে দেবে।

দেয়?

না, হাত ঠেলে দেয়।

আমরা আনন্দে আটখানা, কিন্তু জানকীজীবনের তেমন আনন্দ দেখি না।

এরপরে একদিন ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটল হঠাৎ। মাত্র পাঁচ দিনের জ্বরে বিজয়েশের দাদা মারা গেল। একটা বড় জাহাজের তলা ফুটো হয়ে গেল যেন।

প্রাসাদ ছেড়ে ছোট তিন ঘরের ফ্ল্যাটে উঠে আসতে হল তাদের। দেখা গেল দাদাব লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকা কটিই সম্বল। আর বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেনি সে। যারা ছিল ঈর্ষার পাত্র, রাতারাতি তারা অনুকম্পার পাত্র হয়ে দাঁড়াল।

অথৈ জলে পড়ল বিজয়েশ।

তবু উৎসাহের অন্ত নেই তার। কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করে দেখল, প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা লোকের কাছে পাওনা আছে তার। অসময়ে কারো টাকার দরকার হলেই তার কাছে ধার মিলত। বিজয়েশ ঠিক করল, এই টাকা চেয়ে নিয়ে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা করবে সে। বউদিকে আশ্বাস দিল, আবার সব হবে, দেখ না।

কিন্তু অবাক হয়ে বিজয়েশ নিজেই কিছু দেখল। সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে সাড়ে তিনশ টাকাও উশুল করা সম্ভব হল না।

বউদি মেয়ে স্কুলের চাকরি পেল, দু' ঘরের কোয়ার্টারও। নাবালক ছেলে দুটিকে নিয়ে সে সেখানে চলে গেল। বিজয়েশ হাসি হাসি মুখেই তাদের একেবারে কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে মেসে আমার ঘরেই এসে উঠল। সেইদিন এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম আমি।

মেজেতে উবুড় হয়ে পড়ে বিজয়েশ ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। ভাইপো দুটোকে ভালবাসত সে, কিন্তু এত যে ভালবাসত সেটা এই কান্না দেখার আগে অনুভব করিনি।

তারপরেও বিজয়েশ চাকরি করে, মোটরবাইক ছোটায়। কিন্তু তার পিছনে সঙ্গী বা সঙ্গিনী আর বিশেষ দেখা যায় না। প্রোফেসার জানকী তখন কলেজের হস্টেলে থাকে। স্মৃতি এম. এ পড়ে, তাকে পড়ার সাহায্য করার জন্য প্রায়ই তাকে স্মৃতিদের বাড়িতে আসতে দেখা যায়। মাঝেসাজে এখানে সেখানে বেড়াতেও দেখা যেত দু'জনকে।

বিজয়েশকে জিজ্ঞাসা করতাম, কি রে, কি ব্যাপার?

বিজয়েশ হাসত, বলত, আমার সঙ্গে স্মৃতির ঝগড়া হয়েছে, তাই লোক দেখিযে ওর সঙ্গে বেড়ায়।

এক-একদিন এক-একটা ঝগড়ার বিবরণ দিত বিজয়েশ। বলে, এম. এ পাস করে বিলেত যাবে বলছে, আমি রাজি নই বলে রাগ করেছে। কখনো বলে, আমি বাউণ্ডুলেগিরি করে বেড়ানো না ছাড়লে আমার সঙ্গে কথা বলবে না বলেছে।

কিন্তু যাই বলুক, ওকে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে স্মৃতি যে ঝাঁপিয়ে পড়বে

না, অথবা তার বাবা মা-ও যে এ-প্রস্তাবে আর রাজি হবে না, সেটা কিছু দিনের মধ্যেই বোঝা গেছে। বিজয়েশ নিজেই একদিন বিমর্ষ মুখে বলেছিল, স্মৃতি আজকাল আমাকে এড়িয়ে চলছে বুঝতে পারছি।

দেরিতে হলেও ও বুঝতে পেরেছে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

এরপর জানকীজীবনের সঙ্গে একদিন স্মৃতির বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকে গেলও। সেই রাত্রিতে প্রায় তিনটে পর্যন্ত আমি জেগে। বিজয়েশ ঘরে নেই। মাঝে মাঝে তার মোটরবাইকের গোঁ-গোঁ শব্দ কানে এসেছে। একটা অশান্ত মানুষ অশান্ত গতিতে গোটা গোরখপুর শহরটাকে যেন প্রদক্ষিণ করে বেড়িয়েছে।

পরদিন অফিস থেকে ফিরে দেখি, চুপচাপ সে ঘরে বসে আছে। দেয়ালের গায়ে তার মোটরবাইক ঠেস দেওয়া। আমি ঘরে ঢুকেছি তাও টের পায়নি। এই দৃশ্যটাও বড় অদ্ভুত লেগেছিল আমার। মনে হয়েছিল, ওর দুনিয়ায় শুধু দুটি অস্তিত্ব অবশিষ্ট এখন। এক ও নিজে, আর ওব মোটরবাইক, টেন এইচ. পি. ফোর সিলিন্ডার্স...

সন্ধ্যের সময় দেখি মোটরবাইকটা ঝেড়ে মুছে তক-তক কবছে। এক সময় বলল, জানকীর বিয়েতে কিছু দেওয়া হয়নি, এটাই দিয়ে দেব, খুব সখ ছিল ওর...।

আমি নির্বাক। ও আবার একটু হেসেই বলল, এবারে দাদার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ, দাদা বলেছিল আমার দ্বারা বড হওয়া হবে না। দেখা যাক—

পরদিন থেকে ওকে আর মেসে দেখিনি। মেসে অনেক টাকা বাকি ফেলেই চলে গিয়েছিল। ঘাটতি আমাকেই পুরিয়ে দিতে হয়েছিল বলে মনে মনে খুব খুশি ছিলাম না। কিন্তু বছর-দেড়েক বাদে হঠাৎ ওর এক মনি অর্ডার—দেনা শোধ।

আরও সাত আট বছর বাদে একদিন এই কলকাতায় দেখা। ঝকঝকে মস্ত একটা গাড়ি থেকে ওকে নামতে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাহেব, পরনে দামী স্যুট দামী জুতো দামী টাই—মুখে পাইপ। সঙ্গে অতি আধুনিকা এক সঙ্গিনী। গাড়ি থেকে নেমে এক নামী হোটেলে ঢুকতে যাচ্ছিল, দাঁড়িযে গেল সে-ও।

হ্যা-ল-লো! হোয়ট এ সারপ্রাইজ! কাম অন—

আমাকে নিয়েই সেই নামজাদা হোটেলে ঢুকে গেল। ইংরেজিতে তরল বিস্ময় জ্ঞাপন করতে করতেই দোতলায় নিজের তাপনিয়ন্ত্রিত সুইটএ নিয়ে গেল। সঙ্গিনীর পরিচয় দিল, মিস স্টেলা, এ ফাইন লেডি!

আমি যত অবাক, ও ততো খুশি। বয়কে ডেকে লোভনীয় খাবারের অর্ডার দিল। খাবার এলো, সঙ্গে হুইস্কির বোতলও। এই তবল পদার্থ আমার চলল না দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপও করল।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগছে।

আহার সমাধা হতে বেয়ারা ডিশ সরিয়ে নিয়ে গেল। শুধু বোতলটা থাকল। সঙ্গিনীকে আচমকা বিদায় দিল সে, বলল, অনেকদিন বাদে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা, আজ তুমি পালাও।

মিস স্টেলাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিল বিজয়েশ।

এইবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুই এখানেই থাকিস?

পাইপ ধরাতে ধরাতে জবাব দিল, কলকাতায় থাকলে এখানেই থাকি—কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ হিল্লী দিল্লী করে বেড়াতে হয় তো।

কি করছিস?

এক নম্বর দেশসেবা, দু' নম্বর কন্ট্রাকটারি—দেশসেবায় যত নাম হচ্ছে বড় বড রথীমহারথীর নেকনজরে ব্যবসাটা ততো জমে উঠেছে।

কিসের কন্ট্রাকটারি?

এনিথিং—মেসিনারি, ফুড, ক্লথ—এন-ই-থিং—যার মধ্যে হাত দেবে তাই সোনা—প্রোভাইডেড ইউ নো হাউ টু আর্ন। ক্রিয়েট ডেডলক, শাউট অ্যালাউড, অ্যাণ্ড পুল মানি। হা-হা শব্দে হেসে উঠে কাঁচা মদ গলায় ঢালল।

আমার ভিতরটা বিমুখ হয়ে উঠেছে। তবু জিজ্ঞাসা কবলাম, অনেক টাকা করেছিস তা হলে?

প্লেন্টি...আ—জাস্ট ডোণ্ট নো হাউ টু স্পেণ্ড। দাদা থাকলে দেখত কত বড হয়েছি, আ—অ্যাম রিয়েলি এ বিগ গায় নাও। বড় হইনি? সগর্বে তাকালো আমার দিকে।

আমি নির্বাক খানিকক্ষণ। ও বোতলটা প্রায় খালি করে আনল। হাসছে। প্রকৃতিস্থ মনে হচ্ছে না খুব।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই মিস স্টেলাটি কে?

জাস্ট এ ফ্রেণ্ড!

আর কেউ হবাব সম্ভাবনা আছে?

বিস্ময়ে তরল দুই চক্ষু টান করে তাকালো আমাব দিকে। তারপর হেসে উঠল। বলল, ইউ আর দ্যাট ড্যাম ওলড ফেলো! ওর সঙ্গে আমার পাঁচ দিন আগে মাত্র পরিচয়, দিস টাইম আই হ্যাভ পিকড হার আপ—এক-একবার এক-একজন জোটে—

হেসে অস্থিব বিজযেশ।

আমাব মনে হল, আমি এক নরকের পরিবেশে বসে আছি। মানুষের এমন অধঃপতন হয় আমার শোনা ছিল, জানা ছিল না। উঠব উঠব করছি, তার আগে বিজয়েশই বিদায় দিল, বলল, ডাল লাগছে, একটু ঘুরে আসি—আর একদিন আসিস, দিনকতক এখানে আছি।

এর পরে আবাব তাকে দেখেছি আরো ছ'সাত বছর পরে। সেই শেষ দেখা। ততদিনে ওর ক্লেদাক্ত স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে গেছে।

হরিদ্বারে এক নামকরা আশ্রমে দিনকতকের জন্য অতিথি হয়েছিলাম। দেখা সেইখানে, সেই আশ্রমের হাসপাতালে। তার আগে এক তরুণ আশ্রমবাসীর মুখে আর এক বিচিত্র আশ্রমবাসীর গল্প শুনেছিলাম। তিনি গল্প করলেন, সেই ভদ্রলোক ঠিক সন্ন্যাসী নন কিন্তু বছরখানেক ধরে এখানে আছেন। মস্ত পয়সাঅলা লোক, অথচ কেউ

নেই। ক্যান্সার রোগে শেষ অবস্থা এখন, সকলে আশা করেছিল তাঁর যা আছে সব আশ্রমে দিয়ে যাবেন, কিন্তু উইলে দেখা গেল এই অজস্র টাকার শেষ কপর্দক পর্যন্ত তিনি আশ্রমের এই হাসপাতালে দিয়ে যাচ্ছেন, হাসপাতাল ভিন্ন আশ্রমের আর কোনো কাজে এক পয়সাও খরচ করা চলবে না।

দাতার নাম শুনেই আমি বিষম চমকে উঠেছিলাম, তারপব হুঁস ফিরতে হাসপাতালে ছুটেছি।

একটা সাধাবণ বেড-এই শুযে আছে বিজযেশ। পবনে গেরুয়া নয়, সাদা থান, গাযে সাদা ফতুয়া। আমি অবাক হয়ে দেখছি, এমন সুন্দর কমনীয় মুখ আমি যেন আব দেখিনি।

সে-ও দেখল আমাকে, চিনল। ঠোঁটেব ফাকে হাসির আভাস ফুটল একটু, কিন্তু কোনো রকম উচ্ছ্বাসেব লক্ষণ দেখা গেল না। ঠোঁট দুটো নডছে একটু একটু, মনে হল নিবিষ্ট মনে কিছু মন্ত্র জপ কবছে।

আরো ছ'দিন বেঁচে ছিল। ক্যানসাবেব দুঃসহ মৃত্যুযাতনা এমন অবিকৃত শান্তসুন্দর মুখে সহ্য করতে দেখে চিকিৎসক অবাক হয়েছেন। কিন্তু কে জানে কেন, আমিই শুধু অবাক হইনি। আমি নির্নিমেষে শুধু তাকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি। শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত।

আব বুক ঠেলে কতগুলো কথা শুধু আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, বিজু, আজ দাদা থাকলে দেখত তুই কত বড় হয়েছিস। তোর এই বড় হওয়া আমাদের বাতাসে মিশে থাক বিজু, মাটিতে মিশে থাক—

বলতে পারিনি।

মনমধুচন্দ্রিকা

রোজ দেখা হয়।

মেয়েটি থাকে বড বাড়িব দোতলায়। ছেলেটি থাকে ছোট বাড়ির একতলায। রাস্তাব দুদিকে মুখোমুখি দুটো বাড়ি। বড বাড়িব লোকেরা বনেদী বড়লোক। কিন্তু পাযের ওপর পা নাচিয়ে দিন কাটায় না তারা। পুরুষের ভাগ্য জয় করতে রোজ পথে নামে। নেমে অবশ্য ঝকঝকে গাড়িতে ওঠে। একটু আগে-পরে তিন গ্যারাজ থেকে তিনটে গাড়ি বেরোয়। ফেরার সময়ের বকম-ফের হয় প্রায়ই। কোনোটা সন্ধ্যে-বাতে ফেরে, কোনোটা কাঁচা-রাতে, কোনোটা বেশি রাতে। বিকেল ছ'টার পর বিশ্রামের সময়, অবকাশ-বিনোদনেব সময়। দিনের পরিশ্রমের পর এই সময়টুকুর ওপর অবাধ অধিকার। বড় বাড়ির মালিকদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী এক-একদিন এক-এক-সময় এক-একজনের গাডি ফেবে।

ছোট বাড়ির তিন মালিকের মধ্যে দুই মালিক হালের বড়লোক। বড়লোকও ঠিক নয়, হালে পয়সার মুখ দেখছে। বেশিই দেখছে। ছাপ-মারা বড়লোক হতে বেশি সময়

লাগার কথা নয়। দু' ভায়ে মিলে আপাতত একটা গাড়ি কিনেছে। বাড়িতে গ্যারাজ নেই। একতলার ছোট কোণের ঘরটা ভেঙে-চুরে গ্যারাজ করা যেতে পারে। কিন্তু করা যাচ্ছে না। সেই ঘরে বাড়ির ছোট মালিক থাকে। তাকে ঘর দেবার মত বাড়তি ঘর নেই বাড়িতে। বাকি চার ঘরে বড় দু'জনের ঠাসাঠাসি সংসার। দোতলা তোলার মতলবে এঞ্জিনীয়ার তলব করা হয়েছিল। এঞ্জিনীয়ার এসেই প্ল্যান চেয়েছে। ঘণ্টাখানেক খোঁজাখুঁজির পর গুদোম-খুপরিতে পৈতৃক একটা ভাঙা ট্রাঙ্ক থেকে নীল প্ল্যান বেরিয়েছে। সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়েই এঞ্জিনীয়াব মাথা নেড়েছে। হবে না। দোতলার ফাউণ্ডেশন নেই, স্যাংশন নেই।

পিতৃপুরুষের ওপর বীতশ্রদ্ধ ছোট-বাড়ির বড় দুই মালিক। সেই সঙ্গে তাদের গৃহিণীরাও। এতই গরীব ছিল যে ভিতটা পর্যন্ত দোতলার করে রেখে যায়নি! এমন বাড়ি করার দরকার ছিল কি? আর সেই একতলাও যা ছিল—দু' ভায়ের চেষ্টায় সংস্কার হতে হতে এখন একটু ভদ্র চেহারা নিয়েছে। আর এখন কিনা দোতলাব ভিতটুকু পর্যন্ত নেই! দোতলা-তিনতলা করতে হলে গোটা বাড়ি ভেঙে জমিতে মেশাতে হবে, নতুন ভিত করতে হবে— তারপর হবে। তার থেকে নতুন জমি কিনে নতুন করে করা সহজ। পাশেই একটা খালি জমি পড়ে আছে বটে, কিন্তু সেটার আকাশ-ছোঁয়া দাম। শুধু গরীব বলে নয়, নিতান্ত অদূরদর্শী বলেই দোতলাব ভিতটুকুও করে রাখা হয়নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বড় দুই মালিকেরও না, তাদের স্ত্রীদেরও না। অথচ ওই সামনের দোতলা বাড়ি তাদের চোখের সামনে তিনতলা হয়েছে, তিনতলা থেকে এখন চারতলা হয়েছে। একতলায় পর পর তিনটে গ্যারাজ, তিনটে গাড়ি। দেখলে মনের ভিতর খচ-খচ করে, চোখ কটকট করে। করবেই। কারণ তাদের একটা গাড়ি রাখারই ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, সেটা রাখতে হয় দেড়শো গজ দূরের এক ভাড়াটে গ্যারাজে। বড় বাড়ির তিন মালিক ঝকঝকে পোশাক পরে তকতকে এক-একখানা গাড়িতে ওঠে, ছোট বাড়ির বড় দুই মালিকের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। তাদের স্ত্রীদেরও। কারণ টাকা এখন তাদের ঘরেও কথা কইতে শুরু করেছে। নতুন কথা। নতুন কথা ফুটলে সে-কথা কি সহজে থামে, না থামতে চায়? ছোট বাড়িব বড় দুই ভাইয়ের বড়লোক হবার নেশা অনেক দিনের। লেখা-পড়া শিখেছে মন্দ নয়, কিন্তু ছোট চাকরি আর ছোট বরাত নিয়ে কাল কাটাতে রাজি ছিল না তারা। স্ত্রীদের গোপন করে প্রতি ছ' মাসে আড়াই টাকা পাঁচটাকা দিয়ে বছরে দুটো লটারির টিকিত কিনত। পাঁচ টাকা টিকিটের দাম, ভাগে আড়াই টাকা করে দিতে হিমসিম অবস্থা এক-একজনের। প্রতিবারই ভাবত আর না, এই শেষ। কিন্তু সময় এলে আবারও কিনত আর তারপর হতাশ হত। তবু কেনাটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল।

হাতাশার দিন গেল। লটারির তৃতীয় কি চতুর্থ ভাগ্যের সিকেটা হঠাৎ তাদের ভাগ্যে ছিড়ল। অপ্রত্যাশিত অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাই ঘটে গেল। চৌদ্দ হাজার টাকার মালিক হয়ে বসল দুজনে মিলে। হাতে যখন এলো, কি-সব কাটান গিয়ে দশ হাজার কয়েক শ'য় দাঁড়াল। ছোট বাড়ির বড় দুই ভাই বেপরোয়া হয়েই তাবপর ভাগ্যের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অমৃত চাই, গরল যদি ওঠে উঠুক। দশ হাজারের সুড়সুড়ি ভালো

লাগে না। যায় যদি দশ হাজারই যাবে—চাকরি তো আর এই মুহূর্তে ছাড়ছে না।

পুরাণে আছে, মাছ দেখে যাত্রা করো, শুভ হবে। তা অনেক ভেবেচিন্তে তারা মাছ দেখে নয়, মাছের পিঠে চড়েই ভাগ্যপথে যাত্রা করল। দিন-কতক ছুটি নিয়ে দু' ভাই নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে মাছ চালান দেবার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফিরে এলো। সকাল পাঁচটা না বাজতে মাছ দখল করতে স্টেশনে ছোটা আর সেখান থেকেই পাইকিরি হারে সব খালাস করে দিয়ে সাতটার মধ্যে ফিরে আসা। গোড়ার একটা বছর ঠিক এইভাবে কেটেছে। মূলধন বেড়েছে। কিন্তু যতটা আশা করেছিল ততটা নয়।

এরপর এক-এক করে তারা পুকুর কিনেছে গোটাকয়েক। রীতিমত মাথা ঘামিয়ে মাছের চাষ শুরু করেছে। ঝিল পেলে ভালো হত। পায়নি। ফলে পুকুরের সংখ্যা ক্রমে বেড়েছে। বছর কয়েকের মধ্যেই ভাগোব পরিবর্তনটা বোঝা যেতে লাগল। ইতিমধ্যে পাইকিবি চালানের ব্যবসায়েও চটক বেড়েছে। এখনকার কাঁচা টাকায় ঝনঝন শব্দ হয় না। নোট গোনার খস খস শব্দ হয়। সেই শব্দে ছোট বাড়ির বাতাসে আমেজ লেগেছে।

সরকারী ব্যবস্থার অনেক নতুন নতুন ঢেউ এলো। ফলে সব বাজারের মতই মাছের বাজাবেও আকাল দেখা দিল। যে-বস্তুর ওপরেই সরকারী বিধিনিষেধের ভ্রূকুটি, সে-বস্তুই বাজাব থেকে উধাও। এই সরকারের প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞ ওই সব বস্তুর মালিকেরা। অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা। নেই-নেই রবের মধ্যে মাছও আপন মর্যাদায় অনায়াসে পঙক্তিভুক্ত হল। সামনের দরজা দিয়ে তাকালে দেখা যাবে ছোট বাড়িতে টাকাব স্রোত তির-তির করে বইছে। পিছনের দরজা দিয়ে বন্যা।

ছোট বাড়ির বড় দুই ভাই এখন কৃতী মানুষ। তাই তারা এখন সামনের বড় বাড়িটাকে লক্ষ্য করে। ঝকঝকে গাড়ি তিনটে দেখে। তাদের গৃহিণীরাও লক্ষ্য করে। দেখে।

লক্ষ্য আর একজনও করে। দেখেও। ছোট বাড়িব কোণের খুপরি ঘরের ছোট মালিক অভয় দত্ত। কিন্তু সে ওই চারতলা চকচকে বাড়িটা দেখে না, ঝকঝকে গাড়িগুলোও না। জানলায় দাঁড়িয়ে, দিবারাত্র-বিছানো শয্যায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে বা হাতলভাঙা কাঠের চেয়ারটায় বসে বড় বাড়ির দোতলার একজনকে দেখে সে। একটি বউকে। মাত্র গত বছর যার বিয়ে হয়েছে ওই বড় বাড়ির ছোট মালিকের সঙ্গে। বযেস যার বড়জোর একুশ। নিবিড় কালো টানা দুটো চোখ, গায়ের রঙ ফর্সা নয় তেমন কিন্তু বারান্দায় এসে দাঁড়ালে লাজুক পথচারীও ঘুরে-ফিরে মুখখানা দেখে নেয়। পরিমিত দীর্ঘাঙ্গী, পরিমিত নিটোল পেলব দুই বাহু, এক-পিঠ কোমর-ছাড়ানো ঠাস-বুনোট চুল।

ছোট বাড়ির অভয় দত্ত তাকেই দেখে।

বিধাতার যত্নে গড়া একখানি জীবন্ত বিনম্র শিল্প দেখে। আর, পথ-চলতি যে মানুষেরা ফিরে ফিরে তাকায়—তাদেরও লক্ষ্য করে। ঈর্ষা করে না। বরং খুশিতে হাসে মিটি মিটি। সে মোহগ্রস্ত হয়নি। অর্ধেক মানবীকে অর্ধেক কল্পনা দিয়ে সাজায়নি। পথেঃ

লোক ফিরে তাকায় কারণ তাদেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হয়। না হলেই বরং নিজের চোখের ওপর বিশ্বাস কমত অভয় দত্তর।

ও-বাড়ির ছোট মালিকের বিয়ের মাস কয়েকের মধ্যে মাত্র বার কয়েক দেখেছিল বউটিকে। লক্ষ্য করলে আরো বেশিই দেখতে পারত। কিন্তু লক্ষ্য করার চোখ ছিল না তখনো। তাছাড়া নতুন বউ তার ঘরের লাগোয়া ওই একফালি বারান্দায় এসে দাঁড়াত যখন, মাথায় ঘোমটা থাকত। তখন শীতের শেষ, গায়ে উলের চাদর জড়ানো থাকত।

মাস কয়েক বাদে এক দুপুরে অভয় দত্ত হঠাৎ একদিন আবিষ্কাব কবেছিল তাকে। সেদিন আকাশে মেঘ ছিল। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছিল। দূরেব শূন্যে পাক খেয়ে তিন-চারটে চিল উড়ছিল। খুপরি ঘরেব শয্যায বুকে বালিশ চেপে উপুড় হযে কলম বাগিয়ে মগজ ওলট-পালট করে কড়া-গোছের একটা কবিতা লিখে ওঠাব চেষ্টায তন্ময় হয়ে ছিল অভয় দত্ত। পাঁচ কাগজে পাঁচটা কবিতা পাঠিয়েছিল, তিনটে ছাপা হয়েছে, দুটো ফেরত এসেছে। ফেবত আসেই। কিন্তু একটা ফেবত এলে নতুন তিনটে কবিতা না লিখে ওঠা পর্যন্ত তার মেজাজ ঠাণ্ডা হয় না। সেদিন একই দিনে দুটো কবিতা ফেবত আসার ফলে ভিতরে ডবল তাপ। কবিতা ফেরত এলে কবির কেমন লাগে সেই অনুভূতির একটা বুক-ছোঁয়া বাস্তব রূপ দেবার সঙ্কল্প এই কবিতাটায়।

হঠাৎ গুমোট-তাড়ানো একটা ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগতে সামনেব জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। চোখ দুটো দূরের চিল-ওড়া শূন্যের দিকে উধাও হতে গিয়ে আচমকা বাধা পেয়ে থমকালো।

বড় বাড়িতে ছোট মালিকের বউ তার ফালি বারান্দাটুকুতে দাড়িয়ে। গোল-মত, ছোট্ট। একসঙ্গে তিনজন স্বচ্ছন্দে দাঁড়াবার মতও প্রশস্ত নয়। বউটি সেইখানে দাঁড়িযে আছে। দাঁড়িযে যে আছে নিজেও জানে কিনা সন্দেহ। শিথিল একখানা হাত রেলিংয়ের ওপর, সামান্য ঠেস দিযেছে কি দেয়নি। আধখানা ঘুবে দূরের মেঘলা শূন্যের দিকে চেয়ে আছে। বাতাসে শাড়িব আচল উড়ছে, খোলা চুল উড়ছে, কিন্তু সে দাঁড়িয়ে আছে পটে-আকা মূর্তিব মত। কাছে নেই, দূরেও নেই, দুনিয়াব গণ্ডীব মধ্যেই নেই যেন।

অভয় দত্ত কখন বুকের বালিশ ছেড়ে উঠে বসেছে, কখন নেমে এসে জানলায় দাঁড়িযেছে, আর কতক্ষণ ধরে সমস্ত সত্তা দিয়ে দেখেছে এই দুর্লভ সমাহিত চিত্র—কিছুই জানে না। কবিতা লেখা হয়নি। একখানি কবিতা দেখেছে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ঠিক এমনি করেই দুপুর পেরিয়ে বিকেল গড়িয়ে যেতে পারত।

যায়নি। চিত্রে প্রাণের সাড়া জাগল। খুব ধীরে। কোনো অনন্ত পরিক্রমা সেরে বউটি এখান থেকে এখানেই ফিবল যেন। ঘুবে দাঁড়াল। দূরের তন্ময় দৃষ্টি সামনের ছোট বাড়ির জানলায় এসে হোঁচট খেল হঠাৎ। মুহূর্তের জন্য সচকিত হল হয়তো, কিন্তু বিরক্তির আড়ম্বর কিছু করল না। সরোষে চলে গেল না তক্ষুনি। নিবিড় দৃষ্টিটা জানলা থেকে সরিয়ে কাছে-দূরের বাড়িগুলোর দিকে ফেরালো, আর সেই সঙ্গে এক হাতে পিছনের খসে-পড়া আঁচলের দিকটা মাথায় তুলে দিল। একবারও এদিকে

তাকায়নি, তবু ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের জানলায় একজনের বিহ্বল অবস্থান অনুভব করেই আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চলে গেল।

আর যখন দেখা গেল না, তখনই শুধু আত্মস্থ হল অভয় দত্ত। তখনি শুধু মনে হল, কিছু একটা ঘটে গেল যা ঘটা উচিত হয়নি। অনুচিত কাজটার জন্যে নিজেকে চোখ রাঙাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ভিতরে কোনো অনুশাসন পৌঁছল না। বরং তার মনে হল, কবিতা তার এত কাছে অথচ সে মুখ ফিরিয়ে ছিল! আশ্চর্য, এতদিন দেখেনি কেন?

ঝাঁকড়া চুল মুঠো করে ধরে টান মেরে মেরে মগজের সাদা কণাগুলো সক্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করল অভয় দত্ত। এটা অভ্যাস। কোনো কারণে মেজাজ বিগড়োলে এই করে, মাথায় কবিতা আসি-আসি করলেও এই করে, আবার কোনো কারণে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়লেও এই করে।... বউটি কি নির্লজ্জ ভাবল তাকে? অভদ্র ভাবল? অভয় দত্ত বিশ্লেষণে তন্ময়। মনে মনে সমর্থন খুঁজছে সে। এমন তো কখনো হয়নি তার, তবে আজ হল কেন? দৃষ্টি তো তার অবাধ্য হয়নি, বিভোর হয়েছিল—সে কি করবে? ওই শামলা মেয়ে কি আয়নায় নিজের মুখ দেখেছে কখনো? দেখে থাকলে তো ক্ষমা করা উচিত।

বিশ্লেষণের আরো গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল অভয় দত্ত। বউটিকে সচকিত হতে দেখেছে বটে, রূঢ় বিরক্তি দেখেনি। পুরুষের দু'চোখের আওতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে টের পেয়েও তপ্ত ভর্ৎসনা ছুঁড়ে দেয়নি, অসহিষ্ণুতায় নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অপমান করেনি। বরং মনে হয়েছে, সে যেন কোনো পরিচিত মানুষের অপ্রত্যাশিত নিবিষ্টতার মধ্যে পড়ে বিড়ম্বিত হয়েছে। তারপর যা করা উচিত তাই করেছে। তাকে অপদস্থ না করেও চলে গেছে।

বিকেলের মধ্যে আরো বার কয়েক দেখল বউটিকে। ওই ফালি-বারান্দাতেই দেখল। এসেছে যখন আপন মনেই এসেছে। কিন্তু এসে তারপর থমকেছে। জানলার দিকে চোখ পড়তে দুই-একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার চলে গেছে। এই ফিরে যাওয়ার মধ্যে অভয় দত্ত ঈষৎ চঞ্চলতার আভাস পেয়েছে অবশ্য। বি. এ-তে ফিলসফি অনার্স নিয়ে ভালো পাস করেছিল অভয় দত্ত, এক বছর এম. এ-ও পড়েছিল। এই দর্শনের সঙ্গে সেই দর্শন না মিললেও মাথা খাটালে বিশ্লেষণ মোটা নয় তার। তক্ষুনি বুঝে নিল, বড় বাড়ির দোতলার ওই ঘর-সংলগ্ন ফালি বারান্দাটুকু নিজস্ব অবকাশ-বিনোদনের জায়গা বউটির। ঘুরে-ফিরে ওখানে আসে, দাঁড়ায়, দেখে, অন্যমনস্ক হয়। আজ তাতে বার-বার ব্যাঘাত ঘটছে। কারণ, এতদিনের মধ্যে মাত্র আজই অভয় দত্ত তাকে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু বউটি হয়তো অনেকদিন ওখানে দাঁড়িয়ে অনেক-কিছুর সঙ্গে তাকেও দেখেছে—লক্ষ্য করেছে। আজ নিজেই সে লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে যেটুকু অস্বস্তি। এর বেশি তার কোনো অভিযোগ নেই।

বিশ্লেষণে যে ভুল হয়নি সেটা স্পষ্ট হল পরের কয়েকটা দিনে। বউটির অসুবিধে সে অনুভব করতে পারে। আসে, দাড়ায়, আবার সচেতন হয়ে চলেও যায়। সচেতন হয়েও চেষ্টা করে দাঁড়িয়েই থাকে কখনো-সখনো। অবুঝের মত কেউ যদি তার

অবকাশ-মুহূর্তের ওপর হামলা করে—দাঁড়িয়ে না থেকে করবে কি? কতবার এসে এসে ফিরে যাবে? ক'দিন যাবে? অন্যমনস্কের মত চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ এদিকে তাকিয়েছে আর ফিরে গেছে। তাই এ ক'দিনে ফেরাটা কমেছে একটু। কিন্তু অভয় দত্ত স্পষ্টই বুঝতে পারে সে অসুবিধে ঘটাচ্ছে। শিথিল অবকাশে ওখানে দাঁড়িয়ে নিজস্ব জগৎ রচনার তন্ময়তা থেকে সে ওই বউটিকে বঞ্চিত করছে। কিন্তু সে-ই বা কি করবে? জানলা দুটো বন্ধ করে দেবে?

করেছিল। কিন্তু দম বন্ধ হওয়ার দাখিল। ছোট বাড়ির আর সব ঘরে পাখা আছে, শুধু এই খুপরি ঘরটা ছাড়া। কিন্তু পাখা থাকলে বন্ধ করতে পারত? চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করেছে, পাখা কল্পনা করেছে। কিন্তু তখনো অন্তরাত্মা বলেছে, খুলে দাও, খুলে দাও— !

খুলে দিয়েছে।

পুরাণের প্রণয়-কাণ্ডে বিশ্বস্ত পরিচারিকাদের বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল। সে যুগ বাসি বটে, তবু জেনে হোক বা না-জেনে হোক এ-যুগেও কখনো-সখনো তারা সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। ছোট বাড়ির পুরনো ঝি মানদা। এ বাড়ির ছোট মালিক অভয় দত্তকে কেউ যদি একটু অনুকম্পার চোখে দেখে তো সে মানদা। সেও অপর দুই মালিক-পত্নীর চোখ বাঁচিয়ে, কান বাঁচিয়ে। চাকরি রাখার দায়ে তাদেব খুশি করার জন্য সে বরং অনেক সময় ছোটদাদাবাবুর বিরুদ্ধে গজর-গজব কথা শোনায়। ছোটদাদাবাবুর ঘর আস্তাকুঁড় হয়েই আছে, ছোটদাদাবাবুর বিছানার চাদর-বালিশের ওয়াড়ের দিকে তাকানো যায় না, সোমত্ত মানুষ কেচে নিলেই তো পারে, ইত্যাদি। কিন্তু আসলে এই ছোটদাদাবাবুটিকেই মনে মনে সে একটু পছন্দ করে। গিন্নীদের চোখে ধুলো দিয়ে ফাঁকে-টাকে তার ঘর পরিষ্কার করে দেয়, চাদর-ওয়াড়ও কেচে দেয়। ছন্নছাড়া ছোটদাদাবাবু কোনদিন মানুষ হবে এ আস্থা অবশ্য তারও নেই। এই জন্যেই বুঝি বেশি মায়া তার ওপর। আরো কারণ আছে। প্রতি মাসকাবারে মেদিনীপুরে বড়ছেলের কাছে টাকা পাঠাতে হয় মানদাকে। সেখানে তার বিকলাঙ্গ ছোটছেলেও থাকে, মৃতা মেয়ের ঘরের নাবালক নাতি থাকে। তাদের কিছু খরচ মানদা চালায়। অতএব প্রতিমাসে মনি-অর্ডার ফরম লেখানোর দায় আছে। এ ছাড়া মাসে একখানা অন্তত দীর্ঘ চিঠি লেখার দরকার হয় তার। আবার সেখান থেকে চিঠি এলে পড়ে দেবারও লোক চাই। এ-সব ব্যাপারে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানুষ ছোটদাদাবাবু। এক ঘণ্টা ধরে চিঠি লেখালেও বিরক্ত হয় না, একটা চিঠি তিনবার পড়ে দিতে বললেও না।

একগাল পান মুখে দিয়ে মানদা রোজ দুপুরে যায় বড় বাড়িতে আড্ডা দিতে। সেখানে সমবয়সী তিনটি ঝি আছে। শুধু তাদের সঙ্গে নয়, বড় বাড়িতে কর্ত্রীদের সঙ্গেও তার ভাবসাব মন্দ নয়। সুযোগ পেলে তাদের সঙ্গেও দু'পাঁচটা ভালো-মন্দ কথা হয়।

বিকেল চারটে নাগাত সেদিন ঝাঁটা হাতে মানদা ঘরে ঢুকল। অভয় দত্ত তখন হাতল-ভাঙা চেয়ারে গা ছেড়ে বসে ছিল। দু'ঘণ্টা হয়ে গেল ক্লান্ত দৃষ্টিটা বড় বাড়ির

দোতলার শূন্য ফালি-বারান্দায় ঘুরে ঘুরে ফিরে এসেছে। মানদা ঘরে ঢুকেছে, তাও খেয়াল করেনি।

—ও-বাড়ির ছোট বউটি আজ তোমার কথা বলছিল গো ছোটদাদাবাবু।

আচমকা ধাক্কা খেয়ে হাতল-ভাঙা চেয়ার উল্টে পড়ার দাখিল, সামলে নিয়ে অভয় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তার দিকে।

গলা আর একটু খাটো করে মানদা বলল, বউটি জিগেস করছিল, তোমাদের ছোটবাবুকে বাড়ির লোকেরা অত খাটায় কেন—দাদাদের অবস্থা তো ভালো, লোক রাখে না কেন আরো? আর জিগেস করছিল, ফাক পেলেই ঘরের দরজা বন্ধ করে মাথা গুঁজে কি এত লেখে?

বিলম্বিত লয়ে ঘর ঝাঁট দেবার ফাকে মানদা এর পর অনেক কথা নিবেদন করল। বউটি বড় লক্ষ্মী, অন্য বউগুলোর মত নয়। বড় ঘরে পড়েছে বলে একটুও দেমাক নেই। সকালে বিকেলে বাড়ির ফাই-ফরমাশ খাটতে দেখে আর দুপুরে ঘরে বসে থাকতে দেখে বউটি ধরে নিয়েছিল ছোটদাদাবাবু লেখা-পড়া তেমন করেনি, তাই চাকরি-বাকরিও তেমন জোটেনি। মানদা তখন বলেছে বাড়ির মধ্যে সকলের থেকে বিদ্বান হল গিয়ে ছোটদাদাবাবু—জলপানি পেয়েছে, তিনটে পাস দিয়েছে, শেষটাও দিত, মতি হল না বলে দিল না। বলেছে, এ পর্যন্ত পাঁচ-পাঁচটা চাকরি ছেড়েছে ছোটদাদাবাবু, কবিতার ভূত মাথায় চেপে থাকলে চাকরি করা আর হয় কি করে। বলেছে, ছোটদাদাবাবু একজন মস্ত কবি, তার কবিতা ছাপার অক্ষরে কত কাগজে দেখা যায়—ফাক পেলেই ছোটদাদাবাবু মাথা গুঁজে শুধু কবিতা লেখে, আর কিছু লেখে না—লোকে কত-রকম নেশা করে, ছোটদাদাবাবুরও কবিতা লেখা নেশা।

দূতীর কাজ সম্পন্ন করে মানদা চলে গেছে। কিন্তু কবি অভয় বিহ্বল, মোহগ্রস্ত।

ফালি-বারান্দার নিজস্ব জগৎটুকুতে দাঁড়িয়ে অনেকদিন ধরে অনেক কিছুই লক্ষ্য করেছে তাহলে। দিনের মধ্যে, বিশেষ করে সকালের দিকে ক'বার করে বাজারে আর দোকানে যেতে হয় ঠিক নেই। দাদাদের দিন ফেরার পর থেকে বাড়িতে চাকরও একটা আছে বইকি। তবু থলে হাতে বউদির ফর্দ নিয়ে রোজ বাজারে যেতে হয় তাকেই। তাদের যুক্তি ভালো, শক্ত-সমর্থ মানুষটা যাচ্ছেই যখন, সঙ্গে চাকর দেবার দরকার কি। সে ততক্ষণে বাড়ির কাজ করুক। শুধু বাজার নয়, সপ্তাহের র‍্যাশন তাকে আনতে হয়, ঘিয়ের টিন তেলের টিন হাতে করেও তাকেই বেরুতে হয়, খুব ভোরে উঠে দুধ আনার দায়টাও তারই। এ-রকম আরো অনেক আছে।

অভয় দত্ত অম্লানবদনে করে সব। এতে তার আত্মসম্মান খোয়া যায় না একটুও। সে চাঁদ-দেখা ফুল-দেখা কবি নয়। তার কবিতায় মৌ গুনগুন করে না। করেও যদি, শেষে হুল ফোটায়। 'কলঙ্ক-বুকে চাঁদের হাসি কুৎসিত কুটিলতা-বুকে সুন্দরী যুবতীর হাসির মত' লিখতে দ্বিধা করে না। সে আধুনিক যুগের কবি, যন্ত্রণা-যুগের কবি—যা করছে তা না করলেই বরং তার কবি-জীবন অসম্পূর্ণ।

কিন্তু তবু এর পর মুশকিল একটু হল। বাজারের থলি, র‍্যাশন ব্যাগ, ঘি-তেলের

টিন, দুধের বোতল হাতে যাতায়াতের সময় কোনদিন কোনদিকে খেয়াল করত না। এখন করতে লাগল। রোজ যে বউটিকে দেখতে পেত এমন নয়। আবার দেখতেও পেত। কোনদিন ফালি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, কোনদিন বা জানলার সামনে।

কবিতা ফেরত আসার কবিতাটা আর লেখা হয়নি। তার বদলে লিখেছে 'তুমি বাস্তবে নেই'। অর্থাৎ কবির দেখা যে-বাস্তবে কুৎসিতের ছড়াছড়ি যে-বাস্তব প্রাণের ওপর সাড়ম্বর সমাধি-রচনায় মগ্ন, যে-বাস্তবে মরুভূমির রিক্ত হাহাকার—সেই বাস্তবে দাঁড়িয়ে আছে একজন, অথচ কোনো কুটিলতা, কোনো গ্লানি সেই অনন্যাকে স্পর্শ করছে না।

কবিতাটা এক নামী সাপ্তাহিক পত্রে ছাপা হয়েছে। সম্পাদক বলেছিলেন, ভালই। এই মন্তব্যটুকুব মূল্য দশ টাকা। তাব কবিতার দাম এখনো দশ-টাকার বেশি ওঠেনি। কিন্তু এর দশ গুণ হাজার গুণ মূল্য সে পেয়েছে। সামান্য একটুখানি কৌতুক-কণা এমন হৃদয়ের সম্পদ হতে পারে কে জানত ? যন্ত্রণা-যুগের কবি অভয় এ-সম্পদের খবরও রাখত না।

সকাল থেকে প্রায় বিকেল পর্যন্ত দেখেনি। তারপর হঠাৎ দেখেছে। বিকেলেব দিকে বড়বউদি তাব ছেলেকে দিয়ে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছিল কবি-দেওরকে। ছেলের কাসি কমছে না সেই অভিযোগ। তাকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ কিনে ফেরাব সময়ও ছেলেব মাকে ডাক্তারের অভযবাণী শুনিয়ে আব ওষুধ বুঝিযে দিযে নিজেব খুপবি ঘরে ঢোকামাত্র এই বিস্ময়। জ্যৈষ্ঠেব একটানা প্রখর তাপেব ফাঁকে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি নামবাব কথা কবে একটা কবিতায বুঝি লিখেছিল অভয দত্ত।

কিন্তু মিথ্যেই লিখেছিল। তখন অনুভব করেনি। ওটা কিছুই হয়নি। আজ লিখলে হত। আজ অনুভব কবেছে।

প্রথমে খেযাল কবেনি বউটিব হাতে ওটা কোন কাগজ। কাবণ ফালি বারান্দায প্রথমে শুধু একজনের আবির্ভাবটুকুই অনুভব করেছে। তাবপর ভালো করে লক্ষ্য কবতে বুকেব তলায হৃৎপিণ্ডটা সজোবে লাফিয়ে উঠেছে। তার হাতে সেই সাপ্তাহিক—যেটাতে 'তুমি বাস্তবে নেই' ছাপা হযেছে। রেলিংযে আলতো ঠেস দিয়ে গম্ভীব তন্ময়তায় কাগজটা পড়ছে। কিন্তু অভয দত্ত হলপ করে বলতে পারে গম্ভীব একটুও না, হলপ করে বলতে পারে শামলা মেয়ের ওই গাম্ভীর্যে কৌতুক ঠাসা—এমন কি হলপ করে বলতে পারে কাগজটা সে পড়ছেই না।

কতক্ষণ মন-সাগরে ভেসেছে যন্ত্রণাযুগের কবি, ঠিক জানে না। সম্ভবত খুব বেশিক্ষণ নয। কিন্তু অনন্তকালেব স্পর্শ ছিল তাতে। বউটির হাতের কাগজ বন্ধ হয়েছে আস্তে আস্তে। তারপব দুটো কালো টানা চোখের গভীর দৃষ্টি যাত্রা করেছে ছোট বাড়ির জানলার দিকে—সেটা সম্পূর্ণ হয়েছে নির্বাক কবির মুখের ওপর। অচপল ক্ষণিক দৃষ্টি মৌন গাম্ভীর্যে আবার সরে গেছে—রাস্তার দিকে, কাছে দূরের বাড়িগুলোর দিকে, আকাশের দিকে, তাবপর নিজের ঘরের দিকে। সাপ্তাহিক হাতে মন্থর পায়ে ওই ফালি-বারান্দাটুকু ভরাট করে রেখে অদৃশ্য হয়েছে।

এব পর কবিতা লেখা অনেক শক্ত হয়ে উঠল। লেখে অনেক। কাটে, ছিঁড়ে

ফেলে। দশটা টাকাব কথা ভেবে কবিতা লেখে না, শুধু মাত্র নিজেব দুটো চোখ দিযে কবিতা বিচাব কবে না। যে কবিতা তামাম দুনিযায শুধু একজনেবই ভালো লাগতে পাবে, সেই কবিতাই লিখতে চায। চায, কিন্তু ঠিক যেন হয না। কাগজে পাঠিযে দেবাব পবেও দুই-একটা কবিতা ফেবত এনেছে।

কবিতা ছাপা হবাব পব দুরু দুরু প্রতীক্ষা। সে-প্রতীক্ষায যাতনা, আবাব সে-প্রতীক্ষায আনন্দও। চোখে পডল, না পডল না? ভালো লাগল, না লাগল না? অভয দত্তব অনেকবাব ইচ্ছে হযেছে মানদাব হাত দিযে-কাগজ পাঠিযে দেয। কিন্তু দেয না কখনো। এ দুর্বলতা জয কবতে পেবেছে বলে পবে নিজেব কাছেই কৃতজ্ঞ সে। পছন্দসই কবিতা মাত্র দু তিনটে নাম কবা মাসিক-সাপ্তাহিকেই পাঠিযে থাকে। বিহ্বল আনন্দে আবিষ্কাব কবেছে ওই ক'টা সাহিত্যপত্রই বড বাডিব দোতলাব বউটি বাখে। আব পুবস্কাবও দেয। যখনই কোনো কবিতা ছাপা হয, ফালি বাবান্দাব আলসেতে ঠেস দিযে নযতো এক পিঠ চুল ছডিযে ঘবেব খোলা জানলাব মেঝেতে বসে সেই সংখ্যাটা তাকে পডতে দেখা যায।

দিন যায। মাস যায।

বোজ দেখা হয। কথা হয না।

ছোট বাডিব বদ্ধ গবম খুপবি ঘবেব যন্ত্রণা যুগেব এক কবিব সঙ্গে বড বাডিব ফালি বাবান্দাব 'বাস্তবে নেই' অমন এক অনন্যাব বোজ দেখা হয—কথা হয না। এই দেখা হওযাটুকুব মধ্যেও কোনো অতিশয্য নেই, কোনো ছল চাতুবি নেই। এই দেখা হওযা প্রশান্ত মৌন নীববতায সম্পূর্ণ।

বউটিব নাম দীপান্বিতা।

বিযেব আগে সে ও ছোট বাডিব ছোট ঘবে থাকত। কপালগুণে বড ঘবে এসেছে। তাব বাপেববাডিব আব শ্বশুববাডিব মানুষদেব তাই ধাবণা বড দুই জা মস্ত ঘব থেকে এসেছে। অভয ভাবে কপালগুণেই বড ঘবে এসেছে বটে, কিন্তু কাব কপালগুণে নিঃসংশয নয।

বাপেব বাডিব আদবেব নাম দীপু। কাকাবা ভাবে দীপুব বাপেব ইচ্ছেই পূবণ হযেছে। ভদ্রলোক নামী শিল্পী ছিলেন। কিন্তু বস্তুতন্ত্রীয দৃষ্টি কম ছিল বলে নামেব দাম কমই পেযেছেন। সমস্তটা জীবন অনটনেব মধ্যে কাটল, দীপুব মাযেব সেই খেদ একটু বেশি মাত্রাতেই ছিল। সেই খেদ নিযে তিনি অসমযে চোখ বুজেছেন। বাবা যখন ছবি আকতেন, দীপু তাব সামনে বসে থাকত, কলেজেব বই পডত, কবিতাব বই পডত—আব মাঝে মাঝে বাবাব সঙ্গে চোখাচোখি হযে যেত তাব। বাবা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হযে তাব দিকে চেযে থাকতেন। কি তিনি ভাবতেন জানে না, কিন্তু তাব ভাবনাটা পবে কাকাদেব কথা থেকে বুঝে নিযেছিল। তিনি ভাবতেন, যেমন কবে হোক মেযেকে বড ঘবে দিতে হবে—মাযেব মত অসচ্ছলতাব ছাযা ওব জীবনে আব পডতে দেবে না। হঠাৎ খাটুনি বাডিযে দিযেছিলেন তিনি। মা মাবা যাবাব পব থেকেই শবীব ভালো যাচ্ছিল না তাব, তাব ওপব বাত জেগে ছবি আঁকতেন। তাবও

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে লাগল। কাকারা বাধা দিতেন, তখনই তাঁদের কাছে মনের বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি—মেয়েকে বড় ঘরে দিতে হবে।

কিন্তু দীপু বলবে কাকে, বড় ঘরের স্বপ্ন সে কোনদিনও দেখেনি। বাবার এই ছোট ঘরের শুচিতা তার ভালো লাগে। বাবার সমাহিত তন্ময়তার ফাঁক দিয়ে এক-একটা ছবি যখন জীবন্ত হয়ে ওঠে—দীপু নির্নিমেষে দেখে চেয়ে চেয়ে—বাবার সঙ্গে সে-ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যায়।

বাবা তাঁর বাসনা সফল করে যেতে পারেন নি। মা মারা যাবার এক-বছরের মধ্যে তিনিও গত হয়েছেন। দীপান্বিতা সবে আই. এ. পড়ে তখন। তারপর কাকারাই তার বাবা হয়েছেন। সকলেই ভালোবাসতেন তাকে, বাবা মারা যাবার পর তাঁরা আরো কাছে এসেছেন। দীপান্বিতা বি. এ. পাস করার পর কাকারা তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। বিয়ে আরো আগেই হতে পারত, বিয়ে সে নিজেই করতে পারত। আই. এ. পড়ার সময় থেকে সে বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদের চিঠি পেতে শুরু করেছিল। না, একটা ছেলেও কোনরকম অশোভন চিঠি লেখেনি কখনো। বুকের তলায় গোপন বাসনাটুকুই ব্যক্ত না করে পারেনি তারা। তাদের অনেকের গাড়ি ছিল, অনেকের বড় বাড়ি ছিল। চিঠি পেয়ে দীপান্বিতা রাগ করেনি, কিন্তু সাড়াও দেয়নি। তার নিভৃতে সাড়া না জাগলে সে সাড়া দেবে কেমন করে। তার মনে যদি কোনো ঘরের ছায়া পড়ে থাকে তো সে তার বাবার ঘর। ছড়ানো, এলোমেলো, অথচ একজনের তন্ময়তায় সব শুচিস্নিগ্ধ।

বি. এ. পড়ার কালে দুই-একজন তরুণ প্রোফেসরের ঘরণী হতে পারত সে। তাদের আবেদনের আভাস পেয়ে সে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে, অনুকম্পাও বোধ করেছে। রাগ কখনো করেনি। সে শুধু সায় দিতে পারেনি, সাড়া দিতে পারেনি। দীপু জানে তার কাকারা আছেন, কাকারা ভাবছেন। তার নিজের কিছু করার নেই, ভাবার নেই।

বি. এ. পাসের পর বাবার কথা মনে রেখেই কাকারা প্রথম আই. এ. এস. আই. পি. এস.-এর সন্ধানে ছিলেন। কিন্তু মুখে না বললেও তারা রূপের সঙ্গে রূপো খোঁজে। মেয়ে দেখে গিয়ে আমতা আমতা করে তারা জবাব দেয়, মেয়ে দেখতে ভালই তবে রঙটা মাজা—তারা আরো ফর্সা খুঁজছে। ওদিকে হল না, এখানে হয়ে গেল। দাদাদের সঙ্গে ছেলে নিজে দেখতে এসেছিল, পাচ কথার ওপর সাত কথার দরকার হয়নি। তারা জানিয়েছে, রাজী, বিয়ে দাও।

কাকারা অখুশি হন নি। বড় ঘরই তো হল। গ্র্যাজুয়েট— তিন ভাইয়ে বড় একটা কোম্পানি চালাচ্ছে। যতটা সম্ভব দিয়ে-থুয়েই তাঁরা ভাইঝিকে পাত্রস্থ করে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বড় ঘরে আসার রোমাঞ্চে দুমাস না যেতে ক্লান্তি এলো। সবই চকচক করছে এখানে, ঝকঝক করছে, কিন্তু বড় প্রাণশূন্য। এ বাড়িতে সে কিছুটা অনুগ্রহের পাত্রী। বড় দুই জায়ের মত বড় অবস্থার ছাড়পত্র নিয়ে সে এখানে আসেনি। ছেলের ঝোঁক হয়েছিল বলে অনুগ্রহ করে তাকে আনা হয়েছে। এ বাড়ির সবক'টি মানুষের আলাপ-আলোচনায় আচারে-ব্যবহারে উঁচু মহলের মার্জিত চটকের ছটায় গোড়ায়

গোড়ায় ধাঁধা লেগে যেত তার। এ বাড়ির পুরুষেরা কোন উঁচুতে উঠতে চায় সে ঠাওর করতে পারে না, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বউরা মেয়েরাও আভিজাত্যের কোন বৈচিত্র্য খোঁজে, দীপান্বিতা তাও ধরে উঠতে পারে না।

ঝোঁকের বশে যে মানুষ তাকে এই বড় বাড়ির দোতলার ঘরে এনে তুলেছে, তারও মানসিক গতির তলকূল পায় না সে। প্রথম দিকের রমণীসঙ্গলোলুপতার তাপ জুড়োতে দুমাসও লাগেনি। সেই লোলুপতা একটা নির্দিষ্ট ছকের দিকে ঘুরেছে। মাঝে মাঝে রাত করে বাড়ি ফেরে, কোন বড় পার্টিতে কতখানি মর্যাদা লাভ করল্ল সেই গল্প করে। কথা বলার সময় মুখে একটা অচেনা গন্ধ পায়। অচেনা হলেও বস্তুটা কি অনুমান করতে পারে। ঢিলে-ঢালা ভাব দেখে, কথাবার্তা একটু টানা-টানা মনে হয়। সিগারেটের পর সিগারেট পুড়তে থাকে। ঘরের বাতাসে গুমোট ছড়ায়, মাথার উপর পাখা সত্ত্বেও গা গুলোতে থাকে দীপান্বিতার।

এই ব্যাপারটা দেখে বিশেষ করে ছুটির দিনে। অন্যান্য দিন বাড়ি ফেরার পরেও অনেক সময় আপন চিন্তায় মগ্ন থাকে। কেমন করে আরো ওপরের ধাপে উঠবে সেই চিন্তা। কখনো বা বউকে সাজিয়ে-গুজিয়ে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি যায়, দুই-একটা পার্টিতেও নিয়ে যায়। সে-সময় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার সাজ-পোশাক লক্ষ্য করে। বিরক্তও হয়। রুক্ষস্বরে বলে, বউদিদের কাউকে ডাকো—ঠিক করে দিক, কিছুই তো জানো না।

বউদিরা এসে ঠিক করে দেয়। সেই ঠিক করার ধকলে দম বন্ধ হওয়ার দাখিল ছোট বাড়ির এক শিল্পীর ঘরের মেয়ের।

ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রায়ই রাত দশটা বা এগারোটার পর। হঠাৎ-ই একসময় মানুষটা সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার প্রতি সচেতন হয়। একের পর এক সিগারেট টানে আর চেয়ে চেয়ে দেখে। আর তখনি সবথেকে অস্বস্তি বোধ করে দীপান্বিতা। কারণ, এই ব্যতিক্রম আর এই চাউনি সে এখন ভালই চিনেছে। অব্যর্থলক্ষ্য শিকারীর শিথিল দৃষ্টি যেন। দেখে দেখে দেখে। একে একে দুটো তিনটে সিগারেট পোড়ে। তারপর সিগারেট ফেলে হঠাৎই ওঠে। সব দিন ঘরের আলোটা নেভানোরও ধৈর্য থাকে না। আচমকা আক্রমণটা তখন আরো বীভৎস মনে হয় দীপান্বিতার। সে যেন সত্যিই মানুষ নয়, শয্যাশায়িনী শিকার মাত্র। যে মানুষটা ঝাঁপিয়ে পড়ে, নির্মম ক্রুর অসহিষ্ণু শিকারীর সঙ্গে তার তফাত নেই একটুও। সে তাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে, হাড়-পাঁজর গুড়িয়ে দেবে, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সঙ্কোচ পরুষ উত্তেজনায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে তছনছ করে দেবে, আক্রান্ত দেহতট গোটাগুটি দীর্ণবিদীর্ণ করে তবে ক্ষান্ত হবে।

এই মানসিকতার মধ্যেই ক্রমশ ভারি একটা বৈচিত্র্যের দিকে চোখ গেছে তার। যে-বৈচেত্র্য তাকে টেনেছে সেটা ওই ছোট বাড়ির একতলার খুপরি ঘর। নড়বড়ে টেবিলে মুখ গুঁজে বা এলোমেলো শয্যায় উপুড় হয়ে একটা ছেলে সারাক্ষণ বসে লেখে কি। সারাক্ষণ বলতে যতক্ষণ ঘরে থাকে। একমাথা ঝাকড়া কোকড়া চুল, আধময়লা জামাকাপড়, মুখখানা ভারি মিষ্টি অথচ করুণ, বড় বড় চোখে সর্বদাই কি

যেন তন্ময়তা। দীপান্বিতা প্রায়ই দেখে। বাড়ির লোকেরা ছেলেটাকে খাটায় খুব। ছোট বাড়িতে দুটি বউ থাকে। প্রায়ই তাদের ঘরে ঢুকে কিছু হুকুম করতে দেখা যায়। অমনি ছেলেটা লেখা ফেলে উঠল, কিছু একটা হাতে করে বাড়ি থেকে বেরুলো, নয়তো কিছু হাতে করে ফিরল।

বাজার করে নিয়ে আসতে দেখে, দুধ আনতে দেখে, তেল-ঘিয়ের টিন নিয়ে আসতে যেতে দেখে—আরো কত ফাই-ফরমাশ খাটতে দেখে ঠিক নেই। দীপান্বিতার কষ্ট হয়, ছেলেটাকে অত খাটায় কেন বাড়িব লোকগুলো? আর ও-ই বা মুখ বুজে খাটে কেন অত?

কিন্তু যে ব্যাপারটা তার সব থেকে বেশি চোখ টেনেছে, সেটা ওই খুপরি ঘরের তন্ময় পরিবেশ। ঠিক যেমন তার বাবার ঘবে দেখত। মুখ গুঁজে ছেলেটা লিখছে তো লিখছেই। খাবার ঢাকা পড়ে আছে তো আছেই। আকাশের দিকে চেয়ে আছে তো আছেই। এ যেন এক ধ্যানস্থ চিত্র—যে-চিত্রটা তাব বাবা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। তাই সাগ্রহে দেখত দীপান্বিতা। দেখাটা খুঁটি-নাটির দিকে গড়াতো।

ছেদ পড়ল। হঠাৎই এক দুপুরে খুপরি ঘরের তন্ময় অধিবাসীটির ধ্যান-ভঙ্গ হল বুঝি। হোক, দীপান্বিতা তা একদিনও চায়নি। হল বলেই বিড়ম্বিত মনে মনে। কারণ, তারপর থেকে দেখাটা আর একতবফা থাকল না। ওই ঘবের মানুষের তন্ময় দৃষ্টি এবার এদিকে ফিরল। এদিকেই তন্ময় হতে থাকল। ও-বাড়িব ঝিয়ের মুখে শুনল ছোটদাদাবাবু অশিক্ষিত বলে বাড়িতে বেকার বসে থাকে না—ভাইযের বউয়েদের ফাই-ফরমাশ খাটে না। বাড়িব মধ্যে বরং সব থেকে বেশি শিক্ষিত সে-ই। তবু তার এই দুরবস্থার কারণ, তার মাথায় কবিতার ভূত চেপে আছে। অতএব তার কপাল মন্দ, তার দ্বারা আর কিছু হবার আশা নেই নাকি।

বড় বাড়ির কারো সাহিত্য-প্রীতির বালাই নেই। কাগজ বলে দুখানা খবরের কাগজ আসে এই পর্যন্ত। হঠাৎ সাহিত্য-পত্রও আসতে লাগল। মানদার মুখে ওদের ছোটদাদাবাবুর নাম শোনার পর নামটা একেবারে যেন অপরিচিত লাগল না দীপান্বিতার। কারণ, বাপের বাড়িতে দুই-একখানা মাসিক-সাপ্তাহিক নিয়মিত আসত। সেগুলো আদ্যোপান্ত পড়ত সে। কোন কবিতা ভালো লাগলে অনেকবার করে পড়ত।

ছাপা কবিতা চোখে পড়তে লাগল মাঝে-সাঝে। ভালো লাগে। বিচার-বিশ্লেষণ করে না। কাগজ খুলে কবির নামটা দেখলেই খুশি। সেই খুশির চোখ নিয়ে যা পড়ে তাই ভালো লাগে। বিচার-বিশ্লেষণ না করে বাবার এক-একটা ছবি আঁকা শেষ হলেই যেমন ভালো লাগত, অনেকটা সেই রকম। বিশ্লেষণ করা বা খুঁটিয়ে দেখাটা পরের ব্যাপার। এখানেও ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের কবির কবিতা খুঁটিয়ে পড়াটা পরের ব্যাপার। কিন্তু এই পরের ব্যাপারটাই গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমশ। যতবার পড়ে ততবার যেন দীপান্বিতার সুরে-বাঁধা হৃদয়ের তারে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অনুভূতির মোচড় পড়ে। দাদাদের উপেক্ষায়, ভাই-বউয়েদের গঞ্জনায় নির্বিকার কবি নিজের মধ্যে একটি সাম্রাজ্য গড়ে বসে আছে। সেখানে বসে নিবিষ্ট চিত্তে বেদনার শর নিক্ষেপ করে চলেছে একের পর এক। বুক যার আছে তাকেই খুঁজে ফেরে সেই শর, তাকেই

বেঁধে। শরগুলো তিক্ত নয়, বিষাক্ত নয়, অথচ বড় যাতনাদায়ক। প্রায় দুর্বহ, অথচ বুক পেতে না নিলেও শান্তি নেই। উল্টে, নেবার জন্যে ভিতরটা লালায়িত হয়ে ওঠে।

কিন্তু দিনে দিনে দীপান্বিতা গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কবিতার কারণে নয়, কবির কারণে। খুপরি ঘরের জানলার ধারে একজনের অবুঝ প্রতীক্ষা দিনে দিনে তাকে উতলাই করে তুলছে। টেবিলে মুখ গুঁজে কবিতা লেখার মতই ক্লান্তিশূন্য নীরব প্রতীক্ষা। শিশুর প্রতীক্ষার মত। যে-শিশু জানে তার কোন দাবি নেই, জানে কোনো অভিমান খাটবে না—আশা নিয়ে তবু বসেই থাকে, সেই রকম। দীপান্বিতা অনেক সময় বিরক্ত হয়েছে, অনেকদিন রাগ হয়েছে তার. গোঁ ধরে ফালি-বারান্দায় আসেনি, ঘরের জানলায় এসেও দাঁড়ায়নি। কিন্তু শেষে আবার হার মেনেছে। না এসে পারেনি। ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের জানলায় ঘন্টার পর ঘন্টা সেই অবুঝ প্রতীক্ষা তাকে টেনেই এনেছে শেষ পর্যন্ত। না এলে আরো ক'ঘন্টা কেটে যাবে কে জানে। ঢাকা-খাবার তুলে খাবে কিনা সন্দেহ।

জ্বালা দিনে দিনে বাড়ছে দীপান্বিতার, কোনো কবিতা ছাপা হলেও সেই অধীর প্রতীক্ষা টের পায়। সে পড়ল কিনা না-জানা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে পায়চারি করবে আব জানলায় এসে এসে দাঁড়াবে। একটা কিছু ভালো কাজ করলে দাবিহীন শিশু তার কল্যাণময়ীর কাছে যে আকৃতি নিয়ে একটু বাড়তি দাক্ষিণ্য আশা করে—সেই গোছের আকৃতি, সেই গোছের আশা। অতএব কবিতা ছাপা হলে সেই কাগজ হাতে করে ফালি-বারান্দায় এসে না দাড়িয়ে বা ওটা নিয়ে ঘরের খোলা জানলার ধারে না বসেও পারে না শেষপর্যন্ত। তিন-চারদিনও এই দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত করে দেখেছে দীপান্বিতা। কাগজ হাতে নিয়ে বসেনি বা ফালি-বারান্দায় গিয়ে দাড়ায়নি। সেই ক'টা দিন যে ওদিকে আর এক অক্ষরও লেখা হয়নি বা লেখার চেষ্টাও করা হয়নি, তাও খুব ভালো করেই লক্ষ্য কবেছে। শেষে দীপান্বিতা হার মেনেছে, হাল ছেড়েছে। সেই কবিতা-ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিক হাতে ফালি-বারান্দায় এসে দাড়িয়েছে, নয়তো জানলার ধারে এসে বসেছে। তারপরেই নীরব অস্থিরতার ওপর প্রলেপ পড়ল, নতুন উদ্যমে কবিকে আবার নতুন রচনায় তন্ময় হতে দেখা গেল।

তার বাড়ির মানুষের উপদ্রবেও সেই তন্ময়তায় ছেদ পড়তে দেখে প্রায়ই। ওই একজনের প্রতি সকলের উপেক্ষা আর গঞ্জনার ফিরিস্তি মানদার মুখেও অনেক শুনেছে। নিজের চোখেও দেখে। ছোট বাড়ির দুই বউয়ের কেউ না কেউ ওই খুপরি ঘরে এসে হাত-মুখ নেড়ে কি বলে গেল—লেখা ছেড়ে উঠতে হল। ঝি বা চাকর এসে কি জানিয়ে গেল—লেখা ফেলে উঠতে হল। ছোট ছেলে-মেয়েরা এসে কার কি হুকুম পেশ করে গেল—ভাব-ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে কলম ফেলে উঠতে হল। দীপান্বিতা সবই লক্ষ্য করে। রাগ হয়। বাড়ির মানুষগুলোর ওপর রাগ হয়। যে ওঠে তার ওপরেও।

রোজ দেখা হয়। কথা হয় না।

'চিরায়ু বিদ্যাপতি' কবিতাটার প্রশংসা বৃদ্ধ সম্পাদক একটু বেশিই করলেন। কয়েকজন নামী কবি চিঠি লিখে ওই কবিতাটার জন্য কবি এবং সম্পাদক দুজনকেই

ধন্যবাদ জানিয়েছে। ইদানীং অভয় দত্তর প্রায়-কবিতা প্রসঙ্গেই অনেক কাব্যানুরাগীর মুখে একটু-আধটু প্রশংসা শুনছিলেন সম্পাদক। 'চিরায়ু বিদ্যাপতি' ছাপা হবার পর আব নামী কবিদের মিলিত স্বাক্ষরের অভিনন্দনপত্র আসার পর অভয় দত্তব কবিতার দাম দশ থেকে পনেবোয় তুলে দিলেন সম্পাদক। এবং কবি আসতে হাসিমুখে সে খবরটা তাকে জানালেন।

কিন্তু কবি অভয় দত্ত এক বিচিত্র নিবেদন পেশ করেছে সম্পাদকের কাছে। টাকা না বাড়ালে সে একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না, টাকা একেবারে না দিলেও সে আপত্তি কববে না। তার শুধু একটা আবেদন। নামী কবিদের ওই সহৃদয় প্রশংসাপত্রটি তাব কাগজে ছেপে দিতে হবে। বৃদ্ধ সম্পাদক সানন্দেই রাজী হলেন। টাকাও দিলেন. প্রশংসাও ছাপলেন।

'চিবায়ু বিদ্যাপতি' ঠিক এই গোছের সমাদর পাবে অভয় দত্ত কল্পনাও কবেনি। সে শুধু অনুভূতির কথাই লিখেছিল. ওর মধ্যে চমক লাগবার মত কিছু আছে এখনো ভাবে না। কবিতাব মর্মকথা—বাণীকে না দেখলে কবি বিদ্যাপতিব কাব্যেব উৎস যেত শুকিয়ে, লেখনী যেত থেমে। আর দেখলে তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে অন্ধকাবের অববোধ যেত সবে, লেখনী চলত কলস্বনা তটিনীব ধারার মত। কিন্তু ভাবীকালেব কবিদেব প্রতি কি সুবিচাব করে গেছেন বাজ-কবি বিদ্যাপতি? যুগ গেছে, শতাব্দী গেছে, সেই দেখাব তৃষ্ণাটি তিনি এ-ভাবে ছড়িযে রেখে গেলেন কেন আগামী কালেব কবিদের চেতনামানসে? এই যন্ত্রণা-যুগের চিত্র কি তিনি কল্পনা কবতে পেরেছিলেন? ওই তৃষ্ণাসম্বল কবিরা এ-যুগে বাণী কোথায পাবে? পায় না বলেই তো আজ তারা যত বাস্তবেব ডাস্টবিন নিযে ঘাঁটাঘাঁটি করে চলেছে। কিন্তু তবু—তবু যুগের এই যাতনাবিদ্ধ কবি তাব পুরোধা কবি বিদ্যাপতিব কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি শুধু তৃষ্ণা ছড়িয়েই ক্ষান্ত হন নি, এই অকরুণ ব্যাস্তবের মধ্যে প্রেরণারূপিনী রাণীব কল্পনাটিকেও তিনি অমব করেই রেখে গেছেন। সেই কল্পনাব রূপ ধরে একটি দু'টি রাণীর দেখা আজও মেলে। যে ভাগাহতরা সেই কল্প-রমণীর সন্ধান পেল না, পুবোধা কবিকে তারা অভিশাপ দিক, ব্যঙ্গ করুক। কিন্তু অভয়-কবি অভিশাপ দেবে না, ব্যঙ্গ করবে না। কারণ অনিঃশেষ এই বেদনার তটে দাঁড়িয়েই ঘুমের ঘোরে হোক, স্বপ্নেব ঘোবে হোক, বা জাগরণেব মধ্যে হোক—সে ওই চিরায়ুষ্মতী প্রেরণারূপিনীকে দেখেছে।

কথা হয়নি, দেখা হয়েছে।

বড় বাড়িব ফালি-বারান্দাব ছোট বউ এসে দাড়িয়েছে। কালো চোখের গভীব দৃষ্টি ছোট বাড়ির খুপবি ঘরেব জানলায় এসে বিমনা হয়েছে। হাতে কাগজ নিয়ে আসেনি, কাগজ নিয়ে জানলায়ও বসেনি। কিন্তু 'চিরায়ু বিদ্যাপতি' পড়া যে হয়েছে, সেটুকু অনুভব করতে অভয় দত্তর একটুও সময় লাগেনি। তার প্রেরণারূপিনী সগোচরে এসেছিল হয়তো, কিন্তু দাড়িয়ে ছিল অগোচরে, তার বিমনা দৃষ্টি বিহ্বল হয়েছিল বুঝি কোন সে-যুগের এক রাজ-কবির বাতায়নের দিকে চেয়ে চেয়ে।

কিন্তু যুগের বাস্তবে বিদ্যাপতি নেই, বাতায়ন নেই। থাকলেও স্বীকৃতি নেই।

ছোট বাড়ির দিন বদলাচ্ছে বলেই সেখানে এক অকর্মণ্যের অবস্থান ক্রমে চক্ষুশূল

হয়ে উঠছে সকলের। পৈতৃক বাড়িতে তার একটা থাকার জায়গার দাবি আছে সেটা সকলেই জানে। দাবি আছে বলেই তাকে বরদাস্ত করা আরো কঠিন। শুয়ে বসে কাবা করে দিন কাটাবে আর অপরের ঘাড়ে বসে খাবে—এমন দাবি স্বীকার করে নেওয়ার দায় নেই কারো। অতএব অলসতার খোঁচা ঠেস-ঠিসারা লেগেই আছে। দাদারা বলেছে, আমাদের ব্যবসার দিকে একটু-আধটু দেখলেও তো পারে—মাইনে গুনে তো ক'টা বাইরের লোক রাখতে হচ্ছে। বউরা অমনি ফোঁস করে ওঠে, কবিতার রাজ্যে মাছের জায়গা আছে, না কোনো কবি কোনদিন জেলের কাজ করেছে। মাছ বেচে যখন দাদারা, কবির চোখে জেলে ছাড়া আর কি। তাদের টাকায় বসে খেতে আপত্তি নেই শুধু, কিন্তু ওই কাজ করতে গেলে মান খোয়া যাবে না?

সত্যি মান খোয়া গেলে বাজারের থলে, র‍্যাশন ব্যাগ, ঘিয়ের টিন, তেলের টিন বইতেও মান খোয়া যেত—অতশত বউয়েরা ভেবে দেখে না।

দাদাদের চোখ এখন পাশের আকাশছোঁয়া চড়া দামের খালি জমিটার ওপর। এখন তারা একেবারে নাগালের বাইরে ভাবছে না জমিটাকে। এর দুর্ভোগ কিছুটা অভয়ের ওপর আসবে বলেই একটা অবাঞ্ছিত যোগাযোগ বেরিয়ে গেল। জমির মালিকের ছেলে অভয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুই ছিল এককালে। এখন দেখা-সাক্ষাৎ কম হয়। অতএব দাদারা প্রস্তাব দিল, ছোট ভাইয়ের ঘোরাঘুরি করে চেষ্টা করা উচিত জমিটা কিছু শস্তায় মেলে কিনা। কিন্তু বউদিরা ঘাড়ে চেপে বসল একেবারে। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় ছোট দেওরের ঘরে এসে হানা দেয়। উপদেশে উপদেশে জর্জরিত করে জমির মালিকের কাছে ঠেলে পাঠাতে চায় বার বার।

অভয় গিয়েছিল। খোঁজ-খবর করেছিল। কিন্তু ছেলের বন্ধুকে শস্তায় জমি ছেড়ে দেবে এমন আশা নিয়ে যায়নি। এমন কি বন্ধুর কাছ থেকেও তেমন ভরসা পায়নি। মোট কথা ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। এই ব্যর্থতাও বউদিদের কাছে অকর্মণ্যতা আর নিস্পৃহতার নজির। তাদের মতে একদিন গেলে কিছুই হয় না, প্রত্যহ ঘোরাঘুরি করা দরকার। লেগে থাকা দরকার। কিন্তু ছোট দেওরের সেই উৎসাহের একান্ত অভাব।

দাদাদের ঘাড়ের ওপর বসে খায় যে, নির্বিকার চিত্তে তাকে শুয়ে-বসে কাবা করতে দেখলে কার না পিত্তি জ্বলে? ছোট বাড়ির দুই বউয়ের অন্তত জ্বলে। জমির তাগিদ দেবার সঙ্কল্পে যখন তখন তারা ছোট দেওরের ঘরে হানা দিয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। দেওরটি চিৎপাত হয়ে শুয়ে শুয়ে সময় কাটায় না বেশিক্ষণ। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, নয়তো ভাঙা চেয়ার জানালার ধারে টেনে নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। কবিতা লেখাও যেন আগের থেকে কমেছে একটু। কতদিন ঘরে ঢুকে দেখেছে, কবি-দেওর এত তন্ময় যে, ঘরে কে এল না এল টেরও পায়নি। আর টের পেলেই কেমন যেন চমকে ওঠে। দুই বউই এই ব্যাপারটা ঠিক লক্ষ্য না করলেও দেখেছে।

আর এই থেকেই বড় বাড়ির ছোট বউয়ের দিকে হঠাৎই একসময় বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে তাদের। প্রথমে মেজ বউয়ের চোখে পড়েছিল। দেওর দুনিয়া ভুলে জানালা দিয়ে ওই বড় বাড়ির দিকে চেয়ে আছে, আর দোতলার ফালি-বারান্দায় তাদের ছোট

বউ দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বাড়ির মেজ বউয়ের এমনও মনে হল, বউটি যেন দেওরের ঘরে তাকে দেখেই আস্তে আস্তে চলে গেল। আর তার পরেই কেমন একটু অস্থিরতা ছোট দেওরের।

মেজ বউ তখনো ভাঙল না কিছু। নিজেই চোখ রাখল একটু। ও-ধারের বারান্দা থেকে বড় বাড়ির ছোট বউকে খোলা জানালায় বা ফালি-বারান্দায় এসে দাঁড়াতে দেখলে নিঃশব্দে দেওরের ঘরে এসে আড়াল থেকে উঁকি দেয়। আর দু'তিন দিন উঁকি দিয়েই রোগের ব্যাপারে নিঃসংশয়। অতএব বড় জায়ের কানে সন্দেহটা তুলতে আর দেরি করল না। দু'দিন লক্ষ্য করে বড় জায়েরও ছোটব সঙ্গে মতের মিল হতে দেরি হল না। অকর্মণ্য ছোট দেওরের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে দস্তুরমত ভাবনায় পড়ল তাবা। অর্থাৎ বড় গোছের একটা উদ্দীপনার খোরাক পেল।

আর দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই হয়তো দাদাদেব কানে উঠত সবই। কিন্তু বিধাতা আরো একটু জটিলতা-অভিলাষী বোধহয়। বউদিবা যথাস্থানে রোমাঞ্চকর বিপদেব বারতা পেশ করার অবকাশ পেল না, তার আগেই কবি অভয় দত্ত হঠাৎই চাকরি পেযে গেল আবার একটা। খবরের কাগজেব আপিসে চাকরির চেষ্টা অনেক আগে থেকেই করছিল সে। বড় বাড়িব ফালি-বারান্দায় জীবন্ত শিল্প আবিষ্কাবেব অনেক আগে থেকে। ভেবেছিল, কাগজের আপিসের লেখা-পড়ার চাকরি ভালো লাগবে। কিছু যে একটা করা দরকার বিবেকের পরদায় সেই নীতিবোধেব আঁচড তো সর্বদাই পড়ে। আরো বেশি পড়ে নিষ্কর্মা ভাইয়ের প্রতি দাদাদের গম্ভীর অবজ্ঞা-মেশানো উপদেশ আব বউদিদের সর্বক্ষণের জ্বালাতনেব দরুন।

সদ্য বর্তমানের মানসিকতায় চাকরিটা পেযে কিন্তু হকচকিয়ে গেল সে। চাকবি কলকাতায় নয়, দুর্গাপুরে। সেখানকার বার্তা-প্রতিনিধি, অর্থাৎ কবেসপনডেন্ট। মাইনে ভালো। অভয় দত্ত বিমর্ষ। চাকরি হলই যদি, এখানে হল না কেন? কিন্তু এ-চাকরি হাতে পেযে ছেড়ে দিলে জীবনে করবে কি? তাছাড়া বউদিদের গঞ্জনা আর ঠাবে-ঠোবে কথা শোনানো যে-হারে বেড়েই চলেছে! কোন গোপন ব্যাপার নিযে তারা মাথা ঘামাচ্ছে এখন, সে-সম্বন্ধে অবশ্য ধাবণা নেই। তাদের সাংসাবিক কাজেব তাগিদ আর তার কাব্য-তন্ময়তা নিয়ে ইসাবা-টিসারা অসহ্যই লাগে এক-একসময়। অতএব নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া শুরু হল তার। দুর্গাপুব দূরে নয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসা যায়। আপিসের নিয়োগকর্তারাও বলেছে, মাসে দুই-একবার আপিসেব কাজে কলকাতায় আসতে হবে। কাগজের আসল আপিস যখন কলকাতায়, কাজেব ছুতোয় একবারের বেশিই আসতে পারবে। তাছাড়া কিছুকাল কেটে গেলে চেষ্টা-চরিত্র করে কলকাতাতেই যে পাকাপাকি বহাল হতে পারবে না কে বলল? অতএব এ চাকরি না নিলেই নয়।

নিল। নেবার পর প্রথম বিষণ্ণ অনুভূতির মধ্যেই যেন একটু বৈচিত্র্যের স্বাদও পেল। সেটা নিছক আসন্ন বিরহ-বৈচিত্র্য!... এই তো বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জানেও না, দু'দিন বাদেই তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু জানবে নিশ্চয়। মামদাই বলবে। অভয়ের ধারণা ওই বউটিই তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে।

তারপর? তারপর কি হবে?

অভয় দত্ত ভাবতে চেষ্টা করেছে কি হবে। বউটির মুখে বিষাদের ছাপ সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আবার আটদিন হোক, দশদিন হোক, পনেরো দিন হোক—হঠাৎ তাকে দেখবে এই জানালায়, তখনই বা মুখখানা কেমন হবে?

দাদারা শুনে বলল, খুব ভালো, যাও। মাইনে শুনে একটু বেশিই নিশ্চিন্ত বোধ করল তারা। সব মিলিয়ে শুরুতে তিনশো কুড়ি টাকা পাবে মাসে—যদিও এ-টাকা তাদের কাছে টাকাই নয় আজকাল, কিন্তু কবি-ভাইয়ের যা দাম, তিনশো কুড়ির বদলে একশো কুড়ি শুনলেও তারা খারাপ বলত না। বউদিরা অবশ্য তিনশো কুড়ি শুনে অবাকই হয়েছিল—এই নিষ্কর্মা মানুষকে অত টাকা দেবার আছে কেউ এটাই প্রায় বিস্ময় তাদের কাছে। মুখে তারাও খুশিই হতে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু তাদের গোপন উদ্দীপনাটুকু স্তিমিত হয়ে গেল।

পর পর তিন দিন ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের জানলা বন্ধ দেখে বড় বাড়ির ছোট বউ দীপান্বিতা অবাকই বটে। আশ্চর্য, তিন দিনের মধ্যে একটাবার ওই জানলা খুলল না। প্রথম দিন এই ব্যাপার দেখে ধাক্কাই খেল একটা। গণ্ডগোলের কিছু হয়েছে? মানদা বলেছিল, ও বাড়ির দুই গিন্নী একটুও সদয় নয় দেওরের ওপর— তারাই নীচ কিছু ধরে নিয়ে গোলমাল পাকিয়েছে কিছু? পরের দু'দিনও জানলা বন্ধ দেখে ভাবল তা নয়, কারণ বাজার-হাট-র‍্যাশনও তো বাড়ির চাকরই করছে এখন। তারপরেই ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল তার। হঠাৎ বাবার মৃত্যু মনে পড়ে গেল। ওই খুপরি ঘরটার সঙ্গে তার বাবার স্মৃতি যেন অচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। খারাপ কিছু অসুখ বিসুখ করল তাহলে? দিন-কাল তো ভালো নয়। ভয়ানক ছটফট করতে লাগল সে। এই ক'দিনের মধ্যে মানদাটা পর্যন্ত আসেনি। এলেও সে টের পায়নি।

চার দিনের দিন মানদাকে ধরা গেল। ওপরে ডেকে নিয়ে এল তাকে। তারপর সাদাসিধে ভাবেই বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করল সে। এ-কথা সে কথার পর এক-গাল হেসেই কুশল-সমাচার জানালো মানদা। ছোটদাদাবাবুর মস্ত চাকরি হয়েছে দুর্গাপুরে। সেখানে চলে গেছে।

দীপান্বিতার বুকের ওপর থেকে একটা দুশ্চিন্তার পাষাণ নেমে গেল প্রথম। কিন্তু তারপর কবির কল্পনার সঙ্গে তার মুখের ছায়া কিছুটা মিলল। একটু বিষণ্ণই বোধ করল সে। কিন্তু আমল দিল না। ভালই করেছে। পুরুষমানুষের কাজ করেছে। তবু কোথায় যেন ব্যতিক্রমের মত লাগছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে, তার বাবা যদি একটা ভালো চাকরি করত, কেমন লাগত? ভালো লাগত না। চাকরি বাবাকে মানাত না। এও যেন অনেকটা সেই রকমই। খুপরি ঘরের ওই কবি-মানুষ চাকরি করতে গেছে—ঠিক যেন মানায় না। তবু ভাবতে চেষ্টা করল, ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে।

বিধাতার যোগাযোগ বড় বিচিত্র। অনেক সাধ্য-সাধনা করে শ্বশুরবাড়ি থেকে

দীপান্বিতার পনেরো দিনের ছুটি মঞ্জুর করল তার কাকারা। দুই কাকার দুই মেয়ের একদিনে বিয়ে। আগে-পরে মিলিয়ে পনেরো দিনের মেয়াদে দীপান্বিতা বাপের বাড়ি চলে গেল।

কিন্তু এদিকে পাঁচ দিন না যেতে ছোট বাড়ির মানুষদের গালে হাত। চাকরিতে সরাসরি ইস্তফা দিয়ে অভয় দত্ত তার খুপরি ঘরে ফিরে এসেছে। জীবনের হার-মানা হাল-ছাড়া একটা মানুষ ফিরেছে যেন।

না, দুর্গাপুরে সে টিকতে পারেনি। একটা পল না, একটা মুহূর্ত না, একটা দিন না। শূন্যতার এমন নিদারুণ হাহাকার আর কি জীবনে অনুভব করেছে সে? নিজেরই মনে হয়েছে এটা রোগ, এই রোগের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। দিলে বিপদ। জীবনে তাহলে আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মুখ বুজে চার দিন দাঁত কামড়ে পড়েছিল, অক্লান্ত যুঝেছিল নিজের সঙ্গে। কিন্তু কি করবে? না যদি পারে থাকতে, সে কি করবে? দুর্গাপুর শিল্পনগরী—সে শিল্প-বিষয়ক করেসপনডেন্ট। এ-কাজও ভয়াবহ রকমের নীরস বর্ণশূন্য মনে হল তার। শিল্পের খবর লিখতে একটুও ভালো লাগে না, এক লাইনও না। সব যেন দুর্বোধ্য, পণ্ডশ্রম। তবু চেষ্টা করেছে, লিখেছে, আব তারপর ছিঁড়ে ফেলেছে।

দুর্গাপুরে বসেই খুপরি ঘরের জানালার উল্টোদিকেব বড় বাড়ির ফালি-বারান্দা আর খোলা জানালার দিকে চোখ ফিরিয়েছে সে। যাকে দেখতে চেয়েছে, সেখান থেকেই তাকে দেখেছে। দেখেছে কিন্তু হারিয়েছেও। ক্রমে সেই হারানোটাই দুঃসহ মর্মান্তিক হয়েছে।

চলে এসেছে।

দাদারা গম্ভীর। এ-রকম যে হবে তারা যেন জানতই। কিন্তু দ্বিগুণ উত্তেজনা আর উদ্দীপনার খোরাক পেল বউদিবা। তাদের গোপনে অনেক কথা হল, চোখে চোখে দিনের মধ্যে বহুবার করে কথা হতে থাকল। কিন্তু তাবা কাঁচা কাজ করার পাত্রী নয়। তাবা সবুর করতে জানে। কার টানে এমন চাকরি ছেড়ে চলে আসা হল তাদের জানতে বাকি নেই, বুঝতে বাকি নেই। কবির প্রেয়সী আগে ফিরুক বাপের বাড়ি থেকে। এসে তাকে না-দেখার ছটফটানি তারা ঠিকই লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

ছটফটানিই বটে।

জীবনের সকল দিক তুচ্ছ করে এক প্রাণান্তকর শূন্যতা অবসান করে দেবার জন্য ছুটে এসেছিল সে। বাড়িতে পা দেবার সময হৃৎপিণ্ডে বুঝি হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। কিন্তু হঠাৎ সব থেমে গেছে। একটা গোটা দিনের দুঃসহ প্রতীক্ষার পরে। বউদিরা ক'বার করে এসে ঘরে দাঁড়িয়েই লক্ষ্য করে গেছে তাকে, তাও খেয়াল করেনি। মাঝে পাঁচ দিন কেটেছে কি পাঁচ যুগ—জানে না।

গোপনে মানদাকে জিজ্ঞাসা না করে পারা গেল না। শুনল বাপের বাড়ি গেছে। নিশ্চিন্ত একটু হল বটে। অবজ্ঞা করেনি তাকে, অবহেলা করেনি।... কিন্তু আরো দশ দিন! আরো দশটা দিন এই শূন্যতার চাপ সে বহন করবে কি করে?

কবিতা লিখল একটা। 'তুমি ছিলে না'। পাঁচ দিন বাদে সে কবিতাটা ছেপে

বেরুলো। সম্পাদক বললেন, তার হাত ক্রমেই মোলায়েম হচ্ছে, ভাব স্নিগ্ধ হচ্ছে। বাস্তবের আগের সেই কর্কশ দিকটা অনেক নরম হয়েছে।

কবিতার সার, রূঢ় বাস্তব কবিকে টেনে নিয়ে গেছে কঠিন কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু কবি হার মেনেছে সেই বাস্তবের কাছে, হার মেনে পালিয়েছে। তার এই পরাজয়ের অপরাধ আর গ্লানি দুনিয়ায় একজন অন্তত ক্ষমা করবে, মুমূর্ষুর শেষ আশার মত এটুকুই আশা নিয়ে ফিরে এসেছিল সে। কিন্তু এসে দেখল সেই একজন নেই। সমস্ত গ্লানি মুছে দেবে এই আকূতি নিয়ে কবি যে ছুটে আসবেই তার কাছে—এটুকুও সে অন্তর দিয়ে অনুভব করেনি। বাস্তব দুনিয়ার বাস্তব উৎসবে সাড়া দিতে গেছে সে—তাই সে নেই। কিন্তু সে কি জানে না, এই বিশ্বের অস্তিত্বটুকুও কবির বুকের তলা থেকে নিঃশেষে নেই হয়ে গেল?

আবার দেখা হল। আগের মতই। আগের মত, কারণ, শুধু দেখা—কোনো আভাসে কোনো ইঙ্গিতে কোনো কথা না। কিন্তু তবু ঠিক আগের মতই না বুঝি।

তাকে দেখামাত্র বউটির চোখে যেন বিস্ময় দেখেছে কবি। নীরব বিস্ময়। তার পরদিন যেন একটু অনুযোগ দেখেছে। গম্ভীর, প্রচ্ছন্ন। অভয় দত্ত তক্ষুনি বুঝেছে তার ফেরার সমাচার আর সেই সঙ্গে বাড়ির মানুষদের অভ্যর্থনার সমাচার বউটি মানদার মুখে পেয়ে গেছে। কিন্তু ওই অনুযোগও একদিনেরই অনুযোগ। তারপরেও গম্ভীরই বটে, কিন্তু অপ্রসন্ন নয়। অকরুণ তো নয়ই। একটিও কথা হয় না, তবু নিঃসংশয়ে জানে অভয় দত্ত, তার কবিতার অভিমান ওইখানে পৌঁছেছে। 'তুমি ছিলে না'র অনুযোগ যেন প্রাপ্য বলেই মেনে নিয়েছে। এতদিন আসত, দেখা দিত, চোখে চোখে বিনিময় দুই এক মুহূর্তের বেশি হত না—কোনদিন বা হতই না। তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। জানলায় দাঁড়িয়ে বা ফালি-বারান্দায় এসে-এসে দু'চার মিনিটের মধ্যেই চলে যায়নি। অথবা ঈষৎ-গম্ভীর দৃষ্টিটা চারদিকের শূন্য থেকে শূন্যের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়নি।

অনেকবার সামনা-সামনি ছোট বাড়ির এই জানালার দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়েছে। এক অভিমানী মানুষের উদ্দেশে যেন দু'চোখের নীরব সান্ত্বনা পাঠিয়েছে। যেন বলতে চেয়েছে, আচ্ছা, এ ভাবে চলে যাব না।

কথা হয় না, শুধু দেখা হয়। দেখার প্রশান্ত নিবিড়তা দিনে দিনে বাড়ে।

অনেক দিন অনেক বছর অনেক যুগ ঠিক এমনিই কেটে যেতে পারত।

ওপরওলার ইচ্ছে তা নয়।

বউয়েদের কাছ থেকে দাদারা ছোটভাইয়ের মতি-গতির একটা পূর্ণ চিত্র পেল। দাদারা নিজেরাও লক্ষ্য করল তারপর। তাদেরও কিছুমাত্র সন্দেহ থাকল না। প্রথমে ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে গভীর আলোচনায় মগ্ন হল। কিন্তু রাস্তা কিছু খুঁজে পেল না। শেষে ভাইকে ডেকে সোজাসুজি ধমকে দেওয়া এবং সাবধান করে দেওয়াই সুবিবেচনার কাজ মনে করল তারা। কিন্তু আজ বলি কাল বলি করতে করতেও ক'টা দিন কেটে গেল।

ইতিমধ্যে শুধু তাদের নয়, বউদেরও ঘেন্নায় লজ্জায় মরে যাবার মতই অপমানকর ব্যাপার ঘটে গেল একটা।

বড় বাড়ির বড় দুই বউয়ের দিকে কারো চোখ ছিল না। কিন্তু তাদেরও দু'টো করে চোখ তো ছিলই। সেই দুজোড়া চোখ প্রায়ই দেখে ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের ছেলেটা সকাল নেই দুপুর নেই বিকেল নেই এ-বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। তার সেই হাঁ-করা দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রায়ই তারা নিজেদের বাড়ির ছোট জা'টিকে আবিষ্কার করতে লাগল। শেষে চালচলন ও-বাড়ির ছেলেটার থেকেও নিজেদের বাড়ির বউয়েরই বে-খাপ্পা বেশি মনে হল। পুরুষমানুষ অমন হ্যাংলার মত অনেকেই চেয়ে থাকে, কিন্তু দীপান্বিতা কেন ও-ভাবে এসে দাঁড়ায় যখন-তখন—কেন চেয়েই থাকে ফিরে। ক্রমশ তাদের মনে হল, সে যেন তার ভক্তকে দেখতে আর দেখা দিতেই আসে।

বিচ্ছিরি রকমের দৃষ্টিকটু ঠেকতে লাগল তাদের কাছে ব্যাপারটা। দু'জনে পরামর্শ করে শেষে চুপিচুপি ছোট দেওরকেই একটু লক্ষ্য রাখতে বলল—কারণ তাদের ভালো মনে হচ্ছে না ব্যাপারটা। নালিশ অবশ্য বেশি ছোট বাড়ির ওই হ্যাংলা ছেলেটার নামেই করল, কিন্তু ছোট জায়ের সম্পর্কে আভাসে-ইঙ্গিতে যেটুকু ব্যক্ত করল— তার স্বামীর মাথায় রক্ত ওঠার পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট।

ক'টা দিন সঙ্গোপনে লক্ষ্য সে-ও ঠিকই করল, আর যা বোঝবার বুঝে নিল।

এর পর তার বড় দুই দাদা ছোট বাড়ির দুই দাদার কাছে খুপরি ঘরের বাসিন্দার নামে সরাসরি নালিশ জানিয়ে গেল।

অপমানে অভয়ের দুই দাদা সাদা হয়ে গেল। আর সেই অপমান তাদের বউদের পিত্তি জ্বালিয়ে দিল।

সকলে মিলে গঞ্জনায় ভর্ৎসনায় শাসনে তাকে বিদ্ধ করতে লাগল। সেটা এমন নির্মম হিংস্র কুৎসিত যে, কবি অভয়ের বুকের ভিতরটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। খুপরি ঘর থেকে তাকে বাড়ির সেই গুদোম খুপরিতে চালান করা হল। নিঃশব্দে আর্তনাদ করতে থাকল অভয় দত্ত। নিঃসাড়ে রক্ত ঝরতে থাকল।

ওদিকে বড় বাড়ির দোতলার ঘরের সামনের জানালা আর ফালি-বারান্দার দরজা বুঝি চিরকালের মত বন্ধ হয়ে গেল। তার আড়ালে কি ঘটল বা ঘটতে লাগল কেউ জানে না।

একে একে দুটো বছর কেটেছে আরো। বিকেলের দিকে কোনো বড় বাড়ির একটি বউয়ের সঙ্গে ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের এক কবির রোজ বিকেলে দেখা হয় এখন আবার। দেখা হয় বটে, কিন্তু কেউ কাউকে দেখে না। কথাও হয় না, অথচ কথা ইচ্ছে করলেই এখন হতে পারে। একই বিশাল আঙিনার মধ্যে দুটো ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে থাকে তারা এখন। বিকেলে একই বাগানে বেড়ায় তারা। তারা এবং আরো অনেকে। তবু কথা হয় না।

কারণ কেউ কাউকে চেনে না তারা।

কলকাতার থেকে দূরে এটা একটা নাম-করা মানসিক হাসপাতাল।

বড় বাড়ির ছোট বউ থাকে দোতলার এক ঝকঝকে সুইটে। মাসে সে জন্যে মোটা টাকার মনি-অর্ডার আসে বড় বাড়ি থেকে। বড় ঘরের বউয়ের কষ্ট বা অসুবিধে বা অসম্মান হতে দেয়নি বড় বাড়ির লোকেরা। আর ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের কবি অভয় থাকে অদূরের ফ্রী কোয়ার্টার্স-এর এক ফ্রী বেডে। অনেককে ধরাকরা করে বড় ভাইয়েবা তার জন্য এই কর্তব্যটুকু করেছে। তারা জানে না, বড় বাড়ির ছোট বউমার হঠাৎ কি হল. কোথায় গেল। বড় বাড়ির লোকেরা ধরে নিয়েছে, দাদাদের শাসনে ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের হ্যাংলা ছোঁড়াটা কোথাও চলে গেছে।

বড় বাড়ির সঙ্গে ছোট বাড়ির এখন সদ্ভাব মন্দ নয়। সম্পর্কটা আরো ভালো হয়েছে ছোট বাড়ির বড় দুই ভাই পাশের ওই চড়া দামের জমিটা কেনার পর। বড় বাড়ি হবে একটা সেখানেও। ছোট বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে। হাল-ফ্যাশনের বাড়ি তৈরির সর্বাধুনিক যাবতীয় সরঞ্জামের মস্ত কোম্পানি করেই বড়লোক বড় বাড়ির লোকেরা। দু'তরফেব স্বার্থেই দু' তরফের সঙ্গে অনায়াসে খাতির হয়ে গেছে।

হাসপাতালের সর্বময় কর্তৃত্ব ডক্টর সোম আর তাঁর স্ত্রী ডক্টর মিসেস সোমের। ডক্টর সোম মানসিক রোগেব বিশেষজ্ঞ। বহু গবেষণা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাধনায় মগ্ন তিনি। ডক্টর মিসেস সোম তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী, যোগ্য সহকারিণী।

বড় বাড়ির ছোট বউ মিসেস সোমের কাছে ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের এক কবির কথা বলে—যার বড় বড় ভাসা-ভাসা দুটো চোখ, একমাথা ঝাকড়া কোঁকড়া চুল—যাব স্বভাব ফুলের মত, তন্ময়তা যোগীর মত। নিজের বাড়ির কোনো লোকের নামে কোনরকম অভিযোগ নেই তার। সে শুধু সেই কবির কথা বলে আর কাঁদে। ভাইয়েদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে কোথায় সে হারিয়ে গেল। কোথাও না কোথাও গিয়ে সে আত্মহত্যাই করেছে নিশ্চয়। নইলে তাকে না দেখে সে আছে কি করে।

ছোট বাড়ির খুপরি ঘরের কবি সোমের কাছে প্রায় সেই গোছেরই কথা বলে। বলে, ভগবানের বড় সুন্দর পবিত্র একটি জীবন্ত শিল্পকে চারদিকের দরজা বন্ধ করে নিপীড়নে ওরা বুঝি মেরেই ফেলল, হত্যাই করল। নইলে দু'চোখ ভরে সে যে তাকে আশ্বাস দিয়েছিল, সে কোথাও আর যাবে না—তার সামনে ওই ফালি-বারান্দাতেই এসে দাঁড়াবে, দেখা দেবে।

চিকিৎসার কারণে রোগী আর রোগিণীর বাড়ির পরিবেশ দেখতে এসেছিলেন ডক্টর সোম। সংগোপনে দু'বারে দু'বাড়িতেই এসেছেন। কথাবার্তা বলে গেছেন। কি বুঝে গেছেন তিনিই জানেন।

কিন্তু ডক্টর মিসেস সোম স্বামীকে যেন এই দুটি রোগী আর রোগিণীর প্রসঙ্গে চিন্তিত দেখেন একটু।

সেদিন সন্ধ্যায় একসঙ্গে দু'জনকেই তাঁদের খাস চেম্বারে আনা হল।

দু'জনের দেখা হল। কিন্তু কেউ কাউকে চেয়ে দেখল না ভালো করে। চিনল না।

দু'চার কথার পর তাদের যে-যার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

তারপর মিসেস সোম স্বামীকে লক্ষ্য করলেন একটু। চিন্তামগ্ন, একটু যেন বিষণ্ণও। বিশেষজ্ঞ স্বামীর হাতে বহু রোগীকে অনেক দুরূহ জটিলতা-মুক্ত হতে দেখেছেন, তাই বিস্মিত তিনি। জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না।— খুব সাঙ্ঘাতিক কেস তো কিছু নয়, একটু সময় লাগতে পারে, কিন্তু দু'জনেই তো ভালো হয়ে যাবে মনে হয়। অত ভাবছ কি?

অন্যমনস্কের মত মানসিক রোগের নামজাদা বিশেষজ্ঞ ডক্টর সোম জবাব দিলেন, সেই জন্যেই তো ভাবনা...

ব্যক্তিত্ব

ভদ্রলোক উঠে চলে গেলেন। ডরোথির মনে হয়েছিল, তার চোখের সামনে একরাশ মৃত্যুর অন্ধকার ছড়িয়ে উঠে গেলেন ভদ্রলোক। একটু বাদে তার গাড়ি চলে যাওয়াব শব্দ কানে এলো। ডরোথি নির্বাক, নিস্পন্দ, বোবার মত বসে। তার পরনে তখনো শোকের বসন, বাহুতে শোকের চিহ্ন, চোখেমুখে শোকের ছাপ। হাতে একখানা চিঠি।

শোক মিথ্যে নয়। শোক হয়েছিল। বুকের ভেতরটা নিঃশেষে শূন্য হয়ে গেছল। পাহাড়ের মত এক পুরুষ একটানা ষোল বছর পরে তার জীবন থেকে বড আচমকা বিদায় নিয়েছিল। চোখের সামনে শেষ ঘনাতে দেখেও এতবড বিচ্ছেদ বিশ্বাস কবতে পারে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে তাব শোক বড় কি আর কিছু, ডরোথি জানে না

বসেছিল চিত্রার্পিতের মত। হঠাৎ সর্বাঙ্গে কাটা দিয়ে উঠল তার। মনে হল কেউ তাকে দেখছে, কেউ তাকে লক্ষ্য কবছে। বিশালকায় কালো লোমশ একটা অদৃশ্য অস্তিত্ব ছোট চোখ মেলে সকৌতুকে দেখছে তাকে আর হাসছে অল্প অল্প। সেই হাসির ফাঁকে তার পুরু ঠোটেব ভিতরদিকেব লালচে অংশটুকুও যেন দেখা যাচ্ছে। ডরোথি শিউরে উঠল আবারও। দেহাতীত আত্মা কি আসে? দেখে? তার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, ঘরের মধ্যে সে একা বসে নেই, আরো কেউ আছে, নিবিষ্ট কৌতুকে দেখছে তাকে, তাব অনুভূতিব এই সদ্য বিপর্যয়টুকুও বুঝি অগোচর নয তার।

হঠাৎ শূন্য ঘরের চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে অস্ফুট স্বরে ডরোথি বলে উঠল, টনি বানডোডকার? যতদিন ছিলে তুমি একদিনেব জন্যেও আমাকে অসম্মান কবো নি, কিন্তু আমার বুকের ভেতরটা গুড়িয়ে দিয়েও সব থেকে বড় সম্মান আজ দেখালে তুমি, তোমাব এই ইচ্ছেব মর্যাদা সে রাখবে, তুমি যা চেয়েছ তাই হবে।

ডরোথির কাছে কোনোদিন কথার খেলাপ কবে নি টনি বানডোড্রকাব। কেবল একবার ছাড়া।

তার ফল শুভ হয় নি। ডরোথি জানে সেটা অঘটন একটা। সে প্রস্তুত ছিল না। এই অঘটন বরদাস্ত করতে তাব বিক্ষিপ্ত স্নায়ু অনেক সময নিয়েছে। ববদাস্ত ঠিকমত কোনোদিনও করতে পারে নি হয়ত। কিন্তু স্থির বুদ্ধির মেয়ে সে। নিজেব

সঙ্গে আপোষ করে নিয়েছিল। তাছাড়া, মানুষটাও তো সুস্থ ছিল না তখন। কেন যেন হঠাৎ এক বিষাদ রোগে পেয়ে বসেছিল তাকে। কথা খেলাপ করার সেই অবুঝ মত্ততা তারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া। সেটা যে এ-ভাবে আসবে ডরোথি কল্পনা করে নি। টনিকে নিয়ে হিমসিম অবস্থা তার তখন। ডাক্তারদের একটা কমিটিই বসিয়ে দিয়েছিল সে। দরকার হলে বোম্বে থেকে আরো বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে বলেছিল সে। ডরোথি আরো ঘাবড়ে গেছল কারণ, আপদে-বিপদে যে অনুগত লোকটা মুখ বুজে টনিকে সামলাতে পারত, ব্যবসায়ের কাজে সেই শিবাং কারমালিও তখন জাপানে। টেলিগ্রাম করে তাকে চলে আসতে বলবে কিনা সেই চিন্তাও করেছিল ডরোথি।

সে-অবকাশ মেলে নি। মাস দুয়েকের মধ্যে সেরে উঠেছে রানডোডকার। তার মাথা থেকে যেন একটা ভূত নেমে গেছে। কিন্তু তাকে সারিয়ে তোলার ব্যাপারে চিকিৎসকের থেকেও ডরোথি রানডোডকারের কৃতিত্ব কম নয়। সব থেকে বড় ঝড়টা বুঝি তার ওপর দিয়েই গেছে। তার দেহের ওপর দিয়ে, মনের ওপর দিয়ে -নিরুপায় হয়েই নিজেকে সমর্পণ করেছে সে, এক উদভ্রান্ত যৌবনের অশান্ত ক্ষুধার মুখে আত্মসমর্পণ করেছে। তার ফলে ডরোথির দুর্দুবারের সেই অটুট ব্যক্তিত্ব আর আত্মবিশ্বাস ধূলিসাৎ। সেই অন্তর্নিভৃতে পুরুষের সবগ্রাসী অধিকারের অশান্ত ব্যক্তিত্বটাই যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছিল

আস্তে আস্তে তারপর টনি রানডোডকার ঠাণ্ডা হয়েছে, শান্ত হয়েছে আগের থেকেও ভদ্র নম্র হয়েছে ডোরার বিষণ্ন উৎকণ্ঠার কারণ উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে সে। কথার খেলাপের দরুন তার পরিতাপের শেষ নেই। শুকনো মুখে বার বার ডোরাকে বলেছে, নিজের ব্যক্তিত্ব আর ইচ্ছাশক্তি বড় করে তোলো—দুর্দুবার ঈশ্বর দয়া করেছেন, এবারও করবেন না তোমাকে কে বলল?

তার মুখের দিকে চেয়ে ডরোথির মায়া হয়েছে। হেসেই জবাব দিয়েছে, আয়নায় নিজের মুখখানা চেয়ে দেখোগে যাও, কে বলেছে। এই নিয়ে উতলা হয়ে ফের যদি রোগ বাড়াও, আর আমাকে কাছে পাবে না বলে দিলাম।

কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছে টনিও। ভিতরে একটা চাপা দুশ্চিন্তা তারও আছে বইকি। দুজনেরই আছে। টনি বলেছে, ভাল মন্দ যা-ই হোক কথার খেলাপের জন্য তুমি আমাকে ঘৃণা করবে না বলো?

ডরোথি আবারও না হেসে পারে নি

টনি রানডোডকার কথা দিয়েছিল তার দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ট হবার পর। আঠারো ঘণ্টা উদগ্রীব হয়ে নার্সিংহোমে বসে থাকার পর খবর পেয়েছিল, এবারেও ছেলে হয়েছে। উত্তেজনায় আরো যেন ঘাম দেখা দিয়েছে টনির সর্বাঙ্গে। ডোরা খানিকটা সুস্থ হবার পরেও তার কেবিনের দিকে পা বাড়াতে পারে নি। শিবাং কারমালিকে হুকুম করেছে, কেমন হয়েছে দেখে এসো তো।

চিরানুগত কারমালি মনিবের হুকুম পালন করে ফিরে এসেছে। বলেছে, ভাল স্যার।

—ভাল তো তুমি আমাকেও দেখো—কেমন ভাল, কেমন?

কাবমালি হুকুম পালন কবতে যত পটু বাচনে তত নয়। জবাব দিল, বড্ড ছোট, ভালই মনে হল।

—আঃ, উত্তেজনাব ফলে দ্বিগুণ বিবক্তি, গাযেব বং কেমন?

—লাল দেখলাম।

—ত'ব মানে কালো—কেমন লাল' কালচে লাল?

—ন-না।

—আব নাক মুখ চোখ?

—তাও ভালই বোধ হয। মিসেস বানডোডকাব আপনাকে ক্যাবিনে যেতে বলেছেন স্যাব।

উৎকণ্ঠা একেবাবে কমে নি, তবু খানিকটা স্বস্তি নিযে ক্যাবিনে ঢুকেছে টনি বানডোডকাব। প্রথম শ্রেণীব মধ্যেও বাছাই কবা ক্যাবিন। একদিকেব শয্যায ডবোথি শুযে। আব একধাবে বেবি-বেডে নবজাতক। ভীরু পদক্ষেপে টনি বানডোডকাব আগে সেদিকে এগিযেছে। নির্নিমেষে দেখেছে খানিক দাঁডিযে। মুখ থেকে দুশ্চিন্তাব ছাযা সবেছে একটু একটু কবে।

ফিবে দেখে ডবোথি ডাগব চোখে চেযে আছে তাব দিকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, কিন্তু ঠোঁটেব ফাকে মিষ্টি হাসি। চোখোচোখি হতে বিশাল বপু টনি বানডোডকাবেব কচি ছেলেব মত লাজুক মুখ।

কাছে এসে দাঁডিযেছে, ডবোথিব দু'চোখ নডে নি তাব মুখেব ওপব থেকে। আবাবও হেসেছে মিষ্টি কবে।—নিশ্চিন্ত?

আনন্দে টনিব ওকে আদব কবতে ইচ্ছে যাচ্ছিল একটু। নীচু হযে মুখেব কাছে ঝুঁকেছে, তাবপব মাথা ঝাকিযেছে অর্থাৎ খুব। তাবপব চাপা উচ্ছ্বাসে বলে উঠেছে, এটাও কালোই হবে একটু, কিন্তু আমাব মত আলকাতবাব কালো নয—নাক মুখ চোখ পার্ফেক্ট, জাস্ট লাইক ইউ, আমাব মত হতভাগা-মাকা হবে না হি উইল বি এ জেন্টলম্যান।

ডবোথি হেসে ফেলেছিল, বলেছিল, তোমাব থেকে জেন্টলম্যান তামাম দুনিযায নেই আমাব জিনিসেব এ ভাবে নিন্দে কবলে বেগে যাব বলে দিচ্ছি।

এ নিযে আবো খানিক হাসাহাসিব পব দুজনেই চুপ। ডবোথি জিজ্ঞাসা কবল, কি ভাবছ?

মৃদু হেসে বানডোডকাব জবাব দিযেছে, ভাবছি তোমাব ব্যক্তিত্বেব কথা, আব বেভাবেণ্ড ফার্নান্ডিজেব কথা। হাউ লাকি আই অ্যাম।

একটু বাদে অন্যমনস্কেব মত ডবোথি ডাকল টনি—

—ইযেস মাই ডিয়াব?

—একটা কথা বলব?

—হোযাই একটা, অনেকগুলো বলো।

—বাগ কববে?

—রাগ? তোমার উপর? বিশেষ করে এই দিনে?

আশ্বাস পেয়েও ডরোথির বিড়ম্বিত মুখ। একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল, দু' দুবার ঈশ্বর আমার মুখ রক্ষা করেছেন টনি, এই দুটিই বেঁচে থাক, এরপর আর না...লোক তো বরাবর একরকম থাকে না, এরপর অন্যরকম ব্যাপার দাড়ালে তুমিই সব থেকে বেশি আঘাত পাবে টনি—তোমার জন্যেই আমার ভয়।

টনি বানডোডকারের খুশি মুখ। সেও সকৌতুকে চেয়ে আছে। তারপর হেসেই বিস্ময় প্রকাশ করেছে, তোমার পাবসোন্যালিটিব জোরে ঈশ্বরের বিধান উল্টে দিতে পারো তুমি, তোমারও ভয়! তুমি কি নিজেকে চেনো না ডোবা, নিজের শক্তি জানো না!

—ঠাট্টা নয় টনি, দুবাবে তোমাব মুখ বক্ষা কবতে পেবেছি, এবারে আমার এখন থেকেই ভয় ধরেছে। তমি কথা দাও।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, দাস ফাব অ্যাণ্ড নো ফার্দাব, বংশের দুর্নাম দু'দুবাব খণ্ডেছে, অ্যাম দা প্রাউডেস্ট ম্যান ইন দি ওয়ার্লড নাও—ঠিক আছে, তুমি ভয়-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও।

—কথা দিচ্ছ?

—সিওব, এ জেন্টলম্যানস ওয়ার্ড।

টনির ঠাকুরদা বলত, তার সময় থেকেই এই পবিবারের ওপব অভিশাপ লেগেছে। ওই অভিশাপেব সে প্রথম দূত। নইলে ঠাকুবদাব বাবা-মায়ের চেহাবা নাকি তেমন খারাপ ছিল না। কিন্তু কোথা থেকে কেমন করে যে এলো সে সেটাই বিস্ময় তাব। টনির আবার সেই ঠাকুরদার মা বুড়ির ওপব সন্দেহ, কেমন ছিল সেই মা বুড়ির চরিত্র কে জানে।

ঠাকুরদাকে সে দেখেছে কিনা মনে নেই। তাব ফোটো দেখেছে। পাহাড়ের মত দেহ, কালো কুৎসিত লোমশ আকৃতি। নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট বিসদৃশ পুরু, চোখ ছোট। গোটা অস্তিত্বটাই যেন অশুভ। নিজেকে নিজে অভিশম্পাত কবত তার ঠাকুবদা, তার বাবাও!

টাকার জোরে ঠাকুবদা সুশ্রী মেয়েই বিয়ে করেছিল। বংশগতভাবে টাকার পাহাড় জমেছে তাদের। লৌহ আকরের খনির মালিক তাবা—আয়রন ওর চালান দেয় জাপান, বোম্বাইয়ে, বাংলা দেশেও।

ঠাকুবদার আশা ছিল ছেলেটা অন্তত মোটামুটি সুশ্রী হোক। কিন্তু টনির বাবাবও সেই রকম চেহারা নিয়েই আবির্ভাব। তেমন বীভৎস কুৎসিত, অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলে ধারে কাছে ঘেঁষত না। আর টনি শুনেছে তার মা আত্মহত্যা করেছে তার জন্মের পব। আত্মহত্যার কারণ একটু বড় হয়ে সহজেই সে অনুমান করতে পেরেছে। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেই পেরেছে।

ছেলে বড় হয়ে উঠতে টনির বাবা চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। ছেলেটার মতিগতি অন্যরকম। অল্প বয়সেই তার কুৎসিত চেহারার মধ্যে বাসনার যে আগুন জ্বলত, বাবা তা টের পেয়েছিল। সেই অল্প বয়সেই দুই-একটা দুঃসাহসিক অঘটন ঘটিয়েছে। টাকার জোরে বাবা বিপদ সামলে উঠেছে। সমস্ত রমণী জাতটাব ওপরেই যেন একটা

জাতক্রোধ ছেলের।

অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ তার বাবাকে বলেছে, জন্ম থেকে মায়ের স্নেহ পায় নি বলেই এমন হয়েছে। মায়ের স্নেহ ভালবাসা পেলে এ রকম হত না।

কিন্তু ঠিক এরকম রমণী টনির বাবা পাবে কোথায়? টাকা অনেক আছে, কিন্তু টাকা দিয়ে কি স্নেহ ভালবাসা কেনা যায়?

তবু ঈশ্বরের দয়ায় সেই রকম যোগাযোগই হল একটা। দেশে বিষম গোলযোগ চলেছে তখন। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকেই কানাঘুষো বেশ জোর শোনা যাচ্ছে ভারত এসে গোয়া দখল করবে। পর্তুগীজ আধিপত্যের অবসান হবে। দেশের মধ্যে একটা অরাজকতা চলেছে তখন এমন দিনে সে সময়ের গীর্জার প্রধান ফাদার থরম্যান টনির বাবাকে বলল, একটি বিপন্ন মহিলা আর তার সতের আঠারো বছরের একটি মেয়েকে রক্ষা করতে হবে।

ফাদার থরম্যান ভারী স্নেহ করে টনির বাবাকে, আর সে ভদ্রলোকও ফাদারের কথায় প্রাণ দিতে পারত ১৯৫০ সালের কথা। এক প্রতিপত্তিশালী পর্তুগীজ গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছে একটি মেয়ে আর তার মা। মা'টি পণ্ডিত আয়া ছিল। দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে দেখে সেই গুণ্ডা মা মেয়েকে দেশে চালান দেবার ব্যবস্থা করছে। উদ্দেশ্য অসৎ। তাদের দেশে সশ্রী প্রাচ্য মেয়ের কদর খুব। মা-কে শাসিয়েছে, কোনোরকম গণ্ডগোল করলে তাকে গুলী করে মেরে শুধু মেয়েকে নিয়ে চলে যাবে।

সেই মহিলা ফাদারকে গোপনে চিঠি লিখে বিপদ জানিয়েছে। মহিলারও বয়েস তখন ছত্রিশ সাঁইত্রিশ—রূপ যৌবন আছে

টনির তখন একুশ বাইশ বছর বয়েস। বাপের মতই অসম সাহসী সে। না, তার থেকেও বেশি নিজেদের বিপদ তুচ্ছ করে বন্দুকের মুখে সেই মা মেয়েকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছিল তারা। সেই মেয়ে ডরোথি। তার পর থেকে ডরোথির মা এ বাড়িতে গভর্ণেসের মত থাকলেও সেই কর্ত্রী।

কিন্তু তাদের বাড়িতে আনার পর টনির সপ্ত প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ডরোথিকে ঘিরে বাসনা দানা বেঁধে উঠেছিল। বাবা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, ফাদারের পাঠানো অতিথির প্রতি এতটুকু অশালীন ব্যবহার করলে ছেলেকে গুলী করেই মারবে সে বিপদ কেটে গেলে ওই মা মেয়ের অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থাও ঠিক করে রেখেছিল টনির বাবা।

কিন্তু তার আগেই বিপদের সূচনা দেখল ডরোথির মা। এক রাতে সোজা এসে টনির মাথায় হাত রাখল মহিলা বলল, তুমি আমার ছেলে, ছেলে মাকে উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করে এনে এতবড় কলঙ্কের কাঁটা মাথায় নেবে বাবা? কি পারবে? আমি আর ডরোথি আত্মহত্যা করব। আমরা মুছে যাব, কিন্তু তোমাদের বীর বংশের এত বড় কলঙ্ক আর মুছবে কি।

সেই থেকে মাথায় যেন ধুলো পড়ল টনির। আর সেই থেকে ডরোথির মা টনিরও মা হয়ে বসল। মায়ের অধিকার নিয়ে ডরোথির সঙ্গে রীতিমত ছেলেমানুষি রেষারেষি চলত তার। আর মায়ের পক্ষপাতিত্ব টনির প্রতিই।

সব শুনে ফাদার থরম্যান হেসেছিল। রেভারেণ্ড ফার্নান্ডিজ তখন টনির থেকে বছর চারেকের বড় যুবক, কালো রঙ, সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। তার সামনেই থরম্যান বলল, সব পারসোন্যালিটি ফ্যাক্টর, বুঝলে—ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তিত্ব দিয়ে অসাধ্যসাধন করা যায়। সে রকম ব্যক্তিত্বশালী মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দিতে পারলে, তার ছেলেপুলের চেহারা পর্যন্ত অন্যরকম হতে পারে, অফ কোর্স তোমার ছেলের থেকেও সেই মেয়ের ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি হওয়া চাই।

কথাগুলো টনির বাবার মনে ভারী ধরেছিল। ছেলের থেকেও বেশি একটি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না মেয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছিল ভদ্রলোক। আর ফাদার থরম্যানের সেই উক্তি পরিহাসের ছলে টনিকে বলেছিল ফার্নান্ডিজ। চার বছরের ছোট হলেও তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বাবা ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ের খোঁজে আছে টনি জানত কিন্তু সে রকম মেয়ে যে তাদের ঘরেই আছে, বাবা শুধু সে খবরটাই রাখত না। টনির চোখে ডরোথির শান্ত ব্যক্তিত্বটুকুই যেন আসল রূপ। ডরোথির না কিছু বললেও প্রতিবাদ করা যায়, অমান্য করা যায় কিন্তু ডরোথি কিছু বললে তা যেন পারাই যায় না প্রতিবাদ করলে বা অমান্য করলে সে কিছু বলবে না, দ্বিতীয় অনুরোধ করবে না। শুধু মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নিঃশব্দে চলে যাবে। ঠোঁটের কোণে তার সামান্য একটু হাসির আভাস দেখা যাবে কি যাবে না। কিন্তু তারপর যেন অনুরোধ পালন না করে উপায় নেই তার। আর তারপরেও ডরোথি হাসতই শুধু। অর্থাৎ, সে যেন জানতই যা চেয়েছে তাই হবে।

পরের তিনটে বছরের মধ্যে অনেক পারিবারিক বিপর্যয় ঘটে গেল টনির বাবা আর ডরোথির মা মরে গেল ওদিকে চোখ বুজল ফাদার থরম্যানও। বাবার ব্যবস্থামত ডরোথিরা অবশ্য তার আগেই ভিন্ন ডেরায় উঠে গেল।

টনি এতবড় ব্যবসার মালিক। ডরোথি আপিসে আসে, ব্যবসা দেখে, টনিকে পরামর্শ দেয়। মোটা মাইনেও পায় সে, যোগ্যতার মর্যাদা হিসেবে টনি তাকে আরো বেশি দিতে চায়, কিন্তু ডরোথি নেবে না। যত দিন যায়, এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণী যেন টনি আর দুটি দেখে না।

মনের কথাটা একদিন খোলাখুলিভাবে রেভারেণ্ড ফার্নান্ডিজকে বলল সে ডরোথিকে বিয়ে করতে চায়। তার ধারণা, যে ব্যক্তিত্বের কথা ফাদার থরম্যান বলে গেছল সেই ব্যক্তিত্ব ডরোথির আছে—তার থেকে বেশিই আছে।

খুশি মুখে ফার্নান্ডিজ তার পিঠ চাপড়েছে। বলেছে, গো অ্যাহেড, দেখো ডরোথি রাজী হয় কিনা। আমারও বিশ্বাস, ফাদার থরম্যান ঠিকই বলেছিলেন, পারসোন্যালিটি ফ্যাক্টর ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পরট্যাণ্ট থিং।

রেভারেণ্ড ফার্নান্ডিজের কালো মুখখানা সেদিন অনির্বচনীয় মনে হয়েছিল টনির।

প্রস্তাবটা পরদিনই আপিসের পর ডরোথির কাছে পেশ করেছে সে। তার আগে ফাদার থরম্যানের পারসোন্যালিটি ফ্যাক্টরের মহিমার কথা বলেছে, তার বাবার ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়ের খোঁজের কথা বলেছে, আর রেভারেণ্ড ফার্নান্ডিজের বিশ্বাসের

কথাও বলেছে। তবু টনির মনে হয়েছিল, বিয়ের প্রসঙ্গ তোলার সঙ্গে সঙ্গে ডরোথি যেন চমকে উঠেছিল।

খানিক চুপ করে থেকে বিমর্ষ মুখে টনি বলেছে, থাক—।

ডরোথি তখুনি বুঝেছে, কেন বলল। তবু জিজ্ঞাসা করেছে, কেন?

—তুমি ভয় পেয়েছ।

একটু চুপ করে থেকে ডরোথি জবাব দিয়েছে, আমার ভয় শুধু তোমার জন্যেই, নইলে তোমার মত এমন মানুষ হয় নাকি?

সাগ্রহে টনি বলেছে, আমার কিছু ভয় নেই, আমার স্থির বিশ্বাস তোমার ব্যক্তিত্ব দিয়েই তুমি আমাদের বংশের অভিশাপ মুছে দিতে পারবে—ফাদার থরম্যানের কথা মিথ্যে হবে না, ফার্নানডিজেরও বিশ্বাস মিথ্যে হবে না।

আবারও খানিক চুপ করে থেকে ডরোথি বলেছে, আচ্ছা তাই হবে। কাল আমরা একবার রেভারেণ্ডের কাছে যাই চলো, আগে তার সঙ্গে কথা বলে তার আশীর্বাদ নিয়ে আসি।

আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে টনি। তক্ষুনি বিসদৃশ কিছু করে বসতে যাচ্ছিল। তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে চোখ পাকালো, এই!

হাসতে হাসতে টনি আবার বসে পড়ে প্যাঁক-প্যাঁক করে টেবিলের বেল টিপেছে। প্রাইভেট সেক্রেটারি শিরাং কারমালি হাজির।

—হ্যালো কারমালি, আমার বিয়ে!

—কংগ্র্যাচুলেশনস স্যার।

—আর ইউ হ্যাপি?

—ভেরি মাচ ইনডিড স্যার।

—কার সঙ্গে বিয়ে বুঝতে পেরেছ?

এবার ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে ডরোথির দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না কারমালি। ডরোথির মুখ লাল। কারমালি মাথা নাড়ল, পেরেছে।

—সো অ্যারেঞ্জ।

ঘটা করে বিয়ে হয়েছে।

আড়াই বছর পর পর দুটি সন্তান হয়েছে তাদের। কালো হলেও ছেলে দুটির চেহারা সুশ্রী, ভদ্র।

টনির দুর্বার বাসনা নিজের ব্যক্তিত্বের গুণেই সংযত করতে পেরেছে ডরোথি। তা বলে উপেক্ষা বা বঞ্চিত করে নি তাকে। তার মুখের দিকে তাকালে বাসনার তাপ বুঝতে পারে ডরোথি। তাই প্রস্তুত হবার অবকাশ পেয়েছে। গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করেছে।

সন্তানসম্ভবা হবার সময় থেকেই স্থির, সংযত, গম্ভীর সে। কিন্তু টনি তখন বেপরোয়া, মত্ত। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হল তোমার?

ডরোথি হেসেই জবাব দিয়েছে, চাম্স করেছি।

সত্যি তখন এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দেখেছে টনি তার।

দ্বিতীয সন্তান হবাব পব।

ডবোথি কথা আদায কবেছে টনিব, আব না, এই শেষ।

সানন্দে কথা দিয়েছিল টনি বানডোডকাব।

কিন্তু বছব তিনেক না যেতে এই কথাবই খেলাপ কবেছিল সে। ডবোথি তাকে বিশ্বাস কবত, তাই অবাক হয়েছিল সে। ঘাবডেও গেছল।

এই দুর্যোগ এত আচমকা এসেছে যে ডবোথি হতভম্ব। বিযেব পবে আপিস দেখা ছেডে দিয়েছিল সে। ব্যবসাযেব কোনো গণ্ডগোলেব ফলে এবকম হল কিনা জানে না। জানবে কাব কাছ থেকে, কাবমালি তখন জাপানে নিশ্চিন্ত আনন্দে কেটেছিল এই তিনটে বছব। বিজ্ঞানেব যুগে নিবাপদে থাকতে চাইলে বিপদ এডানো সহজ। কিন্তু গো-ভবে এই বিপদেব মধ্যেই যেন ঝাপ দিল মানুষটা। ক্ষণে ক্ষণে উদভ্রান্ত। উদভ্রান্ত যখন, তখনই অবুঝ বেপবোযা সে। ডবোথি তখন প্রাণপণে তাকে সচেতন কবতে চেষ্টা কবেছে, কথাব খেলাপেব কথা বলেছে, বিপদেব সম্ভাবনাব কথা বলেছে। টনি বানডোডকাব কানেও তোলে নি। উল্টে বিবক্ত হযেছে বিবক্তি বাডলে ক্ষিপ্ত হযে উঠেছে।

পুরুষেব এই গ্রাস থেকে ডবোথি নিজেকে উদ্ধাব কবতে পাবে নি। তাকে আত্মসমর্পণ কবতে হযেছে। তবে সমস্ত ব্যক্তিত্ব বলিসাং গেল

ঘন ঘন গীর্জায গেছে এব পব। ফার্নানডিজেব সঙ্গে পবামর্শ কবেছে। চিকিৎসাব ঢালা ব্যবস্থা কবেছে। মানুষটাকে সুস্থ কবে তোলা ছাডা আব কিছু ভাবাব অবকাশ নেই তাদেব।

টনি বানডোডকাব সুস্থ হল যখন, ডবোথি তখন অন্তঃসত্ত্বা।

সময যত এগিযে এসেছে ততো যেন শান্ত নির্জীব হযে পডেছে টনি বানডোডকাব। পবিতাপেব শেষ নেই তাব।

ডবোথিবও বিবর্ণ পাণ্ডুব মূর্তি। সে ভেবে পায না হঠাৎ এবকম মানসিক বোগগ্রস্ত হযে পডেছিল কেন লোকটা। ভালো যে হযে উঠেছে এটুকুই ভাগ্য ভাবে সে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। এটিও ছেলে। কিন্তু আগেব ছেলে দুটোব মত নয। টনিব মত বীভৎস কুৎসিত নয বটে, তবে কুৎসিতই। এই ছেলেব বেলায বংশেব অভিশাপ ছ'আনা কেটেছে বলা যেতে পাবে।

টনি বানডোডকাব সদা বিষণ্ণ। না, ডবোথি কোনোদিনও অনুযোগ কবে নি তাকে, ভর্ৎসনা কবে নি। ঈশ্ববেব এই বিধান সে মেনে নিযেছে। প্রযোজনে টনিকে সে সান্ত্বনাও দিযেছে।

কিন্তু সান্ত্বনা খুব পায নি টনি। দিনেব বেশিব ভাগ সময এক নীবব যাতনা ভোগ কবেছে। পবিশ্রম দ্বিগুণ বাডিযে দিযেছে। ডবোথি আবাব চিন্তিত হযেছে।

ছোট ছেলে সনি দিনে দিনে বড হচ্ছে। কিন্তু এই ছেলেটা যেন চক্ষুঃশূল টনিব। কোনো সময তাকে কাছে ডাকে না, আদব কবে না। তাব মাযামমতা সব বড দুই ছেলেব জন্য। ছোট ছেলে সনিকে খুব প্রীতিব চোখে দেখে না ডবোথিও। কিন্তু বাপেব এতটা একচোখোমিব প্রতিবাদ না কবে পাবে না এক এক সময। বলে, কেন, তোমাব

বাপ-ঠাকুরদার মত অত কুৎসিত তো হয় নি। এর ছেলেপুলে দেখো আরো ভালো হবে।

কিন্তু ওই ছেলেটার দিকে চেয়ে ডরোথির নিজেরই ভেতরটা আবার এক এক সময় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত।

সাত আট বছর বয়সের সময় এই শিশু যেন বাবা-মায়ের ব্যবহারের তারতম্য বুঝতে পারত। এমনিতে নিরীহ, শান্ত, কিন্তু নির্বোধ যে নয়, তাও বোঝা যেত। দৈবাৎ মেজাজ বিগড়লে বাপের দ্বিতীয় সংস্করণ যেন। তখন সনিকে ঠাণ্ডা করা এক দুরূহ ব্যাপার।

হঠাৎ ছোটখাটো একটা স্ট্রোক হয়ে গেল টনি রানডোডকারের।

তার এক বছর বাদে দ্বিতীয় স্ট্রোকে সব শেষ। ডরোথি চেষ্টার ত্রুটি করে নি। শেষ সময়েও সে ভাবতে পারে নি টনি তাকে ছেড়ে যাবে।

একটু আগে যে ভদ্রলোক চলে গেল সে এই পরিবারের অ্যাটর্নি। সে শিলমোহর করা একখানা চিঠি দিয়েছে ডরোথির হাতে, তাকে একটা উইল পড়ে শুনিয়ে গেছে। উইলে নির্দেশ আছে, ডরোথি রানডোডকার সম্মত হলে তবে এ উইল কার্যকর হবে, অন্যথায় এর কোন মূল্য নেই। উইলে লেখা, তার যাবতীয় বিষয়-আশয় এবং ব্যবসার একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে তার ছোট ছেলে সনি রানডোডকার। যতদিন না সে সাবালক হয়, ততদিন তার হয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করবে ডরোথি রানডোডকার এবং শিরাং কারমালি। এবং এই দায়িত্বভার বহনের জন্য অবশ্যই তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেবে।

তড়িতাহতের মত খানিক বসে থেকে অ্যাটর্নির সামনেই ডরোথি হাতের শিলমোহর করা খামটা খুলেছে। রুদ্ধশ্বাসে পড়েছে। চিঠি নয়, ছোট্ট বক্তব্য গোছের একটু কিছু। তার মর্ম

এই উইলে ডরোথির আপত্তি থাকলে সেটা ছিঁড়ে ফেললেই হবে। ডরোথির ভালবাসা সম্পর্কে এতটুকু সংশয় নেই টনি রানডোডকারের ডরোথির এই ভালবাসা আত্মত্যাগের মতই দুর্লভ। তবু, উচিত বিবেচনায় এই নির্দেশ রেখে গেল সে। কারণ বিবেকের তাড়না থেকে মুক্ত হবার জন্যেই প্রথম দুটি সন্তানের দায়িত্ব ডরোথি এবং শিরাং কারমালির নেওয়া উচিত।

প্রতিবিম্বিতা

দু'বছর আগে সদলবলে আর একবার এসেছিলাম। তখন এই পান্থনিবাস আবিষ্কারটা একটা বড় রকমের কৃতিত্ব গোছের মনে হয়েছিল। ছাপ মারা স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জায়গা। তার ওপর সেও এক পুজোর মৌসুম। আগে থেকে ব্যবস্থা করে না এলে কোথাও জায়গা মেলা ভার। এক হোটেল থেকে আর এক হোটেলে হানা দিচ্ছিলাম। সঙ্গীসাথীরা বিরক্ত। সঙ্গে সকলেরই একটা করে বেডিং স্যুটকেস—সেগুলো ট্যাক্সিতে নিয়ে কাহাতক ঘোরা যায়?

বন্ধুরা সব বাজার হোটেলের বাইরের বারান্দায় মাল-পত্র নিয়ে বসে গেছল।

আমাকে বলেছিল, আস্তানা খুঁজে বার করো, তারপর নড়ব. আর পারিনে।

আমার অবস্থা কাহিল খানিকটা। সর্দারি করে দলবল জুটিয়ে বলতে গেলে আমিই সকলকে নিয়ে বেরিয়েছি। অতএব দায় আমার ছাড়া আব কার?

বাইরে আসতে বুড়ো-মত এক সাইকেল রিকশাঅলা বলল, ওমুক হোটেলে যান না বাবু, জায়গা পেয়ে যাবেন।

তার কথামত ওমুক হোটেলে গেলে জায়গা পেতে পারি আমিও জানি। যতদূর জানি, সেটাই সব থেকে বড় হোটেল এখানকার। তার মাশুলও তেমনি। দিনে পচিশ টাকা শুনেছিলাম। আমাদের দৌড় বড় জোর দিনে সাত-আট টাকা।

মাথা নেড়ে তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কম-সমে আব কোথাও ভালো জায়গা মেলে না?

একটু ভেবে সে বলল, এ-সময়ে এ-তল্লাটে আর ভালো জায়গা পাবেন না। তবে এক জায়গায় গিয়ে দেখতে পারেন, কিন্তু সে বড় দূবে, শহরের বাইরে। জায়গা পেলে অবশ্য থাকবেন অনেক ভাল, এখান থেকে ঢের ভাল খেতে পাবেন আর যত্নআত্তিও পাবেন।

শহরের বাইরে শুনেই আমার আগ্রহ বাড়ল। এ জায়গাটা এমন কিছু মনোরম তো নয়ই, ঘিঞ্জিও। ভাল খাওয়া-দাওয়ার খবরটাও ফেলনা নয়। রিকশাঅলার কাছ থেকেই খবর নিয়ে জানলাম, এক মহিলা পরিচালিত পান্থনিবাস সেটা, শহরের বাইরে, ক্রোশ আড়াই পথ এখান থেকে।

কপাল ঠুকে ওই রিকশাতেই চেপে বসেছিলাম। শহর ছাড়িয়ে যত এগোচ্ছিলাম, ততো ভাল লাগছিল। বাঁধানো রাস্তা, দু'দিকে বড় বড় ঝাউ পাম ইউকলিপটাস গাছের সারি। মাঝে মাঝে দু'দিকে মহুয়ার জঙ্গল। কিছুকাল আগেও বাঘ-ভালুকের উপদ্রবে এসব জায়গা খুব নিরাপদ ছিল না শুনলাম।

আড়াই নয়, পাক্কা তিন ক্রোশই হবে পথ। ছবির মত বাড়ি একখানা। ঝকঝকে তকতকে। অদূরে পাহাড়, ঠাণ্ডা পরিবেশ। দেখেই ভাল লাগল।

রিকশা দাড় করিয়ে রেখে আমি ভিতরে ঢুকলাম। প্রথমেই বাঁধানো উঠোন একটা। তার তিন দিক ঘিরে বেশ বড় বড় তিন সারি ঘর। সেগুলোর দিকে তাকিয়েই দমে গেলাম। একটাও খালি মনে হল না। কেউ কেউ দরজার কাছে আগন্তুক পর্যবেক্ষণ করল।

তাদেরই একজনের কাছে শুনলাম, পান্থনিবাসের কর্ত্রী ভিতরের অর্থাৎ পিছনের অংশে থাকেন। সেখানেই তাঁর আপিসঘর।

উঠোনের এক পাশ দিয়ে পিছনের দিকে যাওয়ার পথ। সেদিকে এগোতে মন্তব্য শুনলাম, ঘর তো মাত্র সাতখানা, সবগুলোই অকুপাইড, জায়গা পাবেন না বোধহয় —অবশ্য দিন তিনেকের মধ্যে দুটো ঘর খালি হবার কথা।

শুনে নিয়ে হতাশ হৃদয়েই ভিতরের অংশে এসে দাঁড়ালাম।

হোটেলের মত দরোয়ান-টরোয়ান চোখে পড়ল না। ফিরে না গিয়ে কেন যে কর্ত্রী দেখার সাধ হল জানি না। দ্বিধাগ্রস্ত বদলে সামনের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

প্রথম দর্শনে মনে ধরার মত মুখ নয় কর্ত্রীর। রোগা, তামাটে রং, চোখে নিকেলের চশমা, বিধবা, বয়েস পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টির ভিতরে। সদাপ্রসন্ন চেহারা নয়, টানধরা রুক্ষ গোছের।

আর্জি শুনেই মাথা নাড়লেন, ঘর খালি নেই. দিনতিনেক বাদে খবর নেওয়া যেতে পারে।

শোনাই ছিল। বিরস বদনে বললাম, তিনদিন ছেড়ে তিন ঘণ্টার ধৈর্য নেই আর। অনেক ঘুরেছি।

...বেশ ভাল লেগেছিল এখানে এসে, হোটেলের মত নয়, নিজেদের বাড়ি-ঘরের আবহাওয়া।

তিনি বললেন, বাড়ি-ঘরই তো, হোটেলি চালের কোনো ব্যবস্থা আমি রাখিনি।

আমার ধারণা, এই কটা কথাই আরো মিষ্টি করে বলা যেত। আনুষ্ঠানিক শেষ চেষ্টা করে এবারে ওঠা যেতে পারে ভেবে আমি বললাম, দেখুন তিনটে দিনের জন্যে কোনো ব্যবস্থাই কি হতে পারে না, বড় মুশকিলে পড়ে গেছি আমরা, তারপর ঘর খালি হলে না-হয় উঠে যেতাম।

মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কে, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে?

—আজ্ঞে না, আমার গুটিচারেক বন্ধু।

নির্লিপ্ত মুখে তিনি বললেন, তাহলে আর কি করা যাবে।

অর্থাৎ, সঙ্গে মেয়েছেলে থাকলে কিছু বা করা যেত। মনে মনে একটা কটূক্তি করে উঠতে ইচ্ছে যাচ্ছিল। মহিলা তাঁর এই আপিস ঘরটা ছেড়ে দিলেও আমরা তিনটে দিন মাথা গুঁজে বাঁচি, তারপর তো ঘর খালিই হয়ে যাচ্ছে। আমতা-আমতা করে বলে ফেললাম, আজ্ঞে যাঁরা আছেন ইয়ে, মানে আমরা কেউ ব্যাচিলর নই —তবে পরিবারবর্গ আনা হয় নি বটে।...আমাদের বিপদ দেখে রিকশাঅলাটা পর্যন্ত বলল, মা-জী'র পান্থনিবাসে চলুন, ঠিক জায়গা পেয়ে যাবেন, তাই সকলকে বসিয়ে রেখে ছুটে এসেছিলাম।

কিন্তু এই বিনয়ের জবাবেও মহিলার রুক্ষ মূর্তি। আর তারপরেই যে উক্তি করে অসন্তোষ জ্ঞাপন করলেন, শুনে আমি হতচকিত। সকলেই বিবাহিত, আর বউগুলোকে বাড়িতে ফেলে রেখে নিজেরা ফূর্তি করতে বেরিয়ে পড়েছেন?

কি যে বলি ভেবে পেলাম না, যেন মস্ত অপরাধ করেছি এবং তাঁর কৈফিয়ত নেবার অধিকার আছে। বললাম, ইয়ে টাকা রোজগারের জন্যেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তে হয়, সঙ্গে দুজন আর্টিস্ট আছেন—তাঁদেরও তাই, সেইজন্যেই হয়ে ওঠে না—

—আপনি কি করেন?

—এই...লিখি-টিখি।

—কি লেখেন? হিসেবের খাতা?

অর্থাৎ, তা ভিন্ন এ-রকম বে-রসিক আর হয় কি করে। জবাব দিলাম, অনেকটা

তাই, লেখার পরে কি পাব না পাব হিসেব করি।

ধমকালেন একটু। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি লেখেন?

—উপন্যাস, গল্প-টল্প...

এর পরের প্রশ্ন সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত।—কি নাম আপনার?

অগত্যা নাম বললাম। লজ্জার কথা, ভদ্রমহিলার চোখে মুখে প্রায় অবিশ্বাস-সূচক বিস্ময় দেখলাম। কয়েক পলক চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, ওমা, আপনি! একেবারে তো ছেলেমানুষ!

গো-বেচারার মত মাথা নাড়লাম আমি, বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি অনায়াসে আমার নাম ধরে ডাকতে পারেন, আপনি তো মা-মাসির মতই।

মহিলার মুখের পরিবর্তনটুকুই আমার কাছে আশ্বাসের মত। গাম্ভীর্য তরল হয়েছে, বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুক মিশছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ চেয়ে থাকার পর কিছু যেন মনে পড়ল। বললেন, আচ্ছা, 'রাগশর' বইখানা শেষ পর্যন্ত ও-রকম বিচ্ছিরি ট্রাজেডি হল কি করে? নায়ক-নায়িকা শেষ পর্যন্ত যেভাবে কাছাকাছি হতে পেরেছিল—তাতে মিলন হতে পারত না?

ত্রুটি স্বীকারের মুখ করে সবিনয়ে বললাম, বইটার শিগগীরই নতুন সংস্করণ হবে, তাতে না হয় মিলন করে দেব'খন!

মহিলার দু' চোখ আমার মুখের ওপর আর এক প্রস্থ থমকালো। তারপরেই বোঝা গেল তিনি আর যাই হোন নির্বোধ নন। কারণ হঠাৎ হেসেই ফেললেন তিনি। বললেন, দুষ্টুমিতে বেশ পাকা দেখছি, এইজন্যই অল্পবয়সে নাম করেছ।

অপ্রস্তুত একটু হলেও রীতিমত আশান্বিত হয়ে উঠলাম। আমার প্রতি না হোক, লেখকের প্রতি করুণা হলেও হতে পারে। মিনিট তিনেকের মধ্যে নিশ্চিন্ত একেবারে। একজন চাকরকে ডেকে আদেশ দিলেন, বাবুর জন্যে চা আর জলখাবার নিয়ে আয়।

আমি বাধা দেবার উপক্রম করতে তিনি থামিয়ে দিলেন, দাঁড়াও, ওর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করতে দাও, পাঁচজন না বললে তোমরা?...শোন, ঠাকুরকে বলে দে, এ-বেলা থেকে পাঁচটি বাবু খাবেন। আর দিদিমণিদের ডেকে দিয়ে যা।

শেষের নির্দেশও যে লেখকের সম্মানে, বুঝতে দেরি হল না। নির্দেশ নিয়ে লোকটা চলে যেতে হৃষ্টমুখে তিনি এদিকে ফিরলেন। মুহূর্তের দ্বিধা।—তোমার চারজন বন্ধুর মধ্যে দুজন আর্টিস্ট, আর বাকি দুজন?

তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, তারা কলেজের মাস্টার, খুব ভালো লোক।

দুটি মেয়ে সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকল, একজনের বয়েস আঠার-উনিশ আর একজনের একুশ-বাইশ। মেয়ে দুটি বেশ সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী। তাদের মুখে সঙ্কোচ আর বিস্ময়ের আঁচড় দেখে মনে হল, অপরিচিতের সামনে এ-রকম তলব পেয়ে অভ্যস্থ নয় খুব।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, একে চিনিস?

বিড়ম্বিত মুখ করে সামান্য মাথা নাড়ল তারা। চেনার কৃতিত্ব একা তাঁর, মুখে সেই পরিতুষ্ট গাম্ভীর্যের পরিচয় দিলেন। শুধু তাই নয়, চেনার গভীরতা কত বেশি সেটা ওদের বোঝাবার জন্যেই বললেন, আমার এই ওপাশের বড় হলঘরটা তোমাদের

ছেড়ে দেব, একটা ঘরে পাঁচজনের অসুবিধে হবে হয়ত। তবে সঙ্গে কল-বাথরুম আছে, নেওয়াড়ের খাটও আনিয়ে দেব'খন, মাসির কাছে এসেছ যখন কষ্ট করে থাকো ক'টা দিন।

মেয়ে দুটির চোখে-মুখে এবারে নির্ভেজাল বিস্ময়। তাড়াতাড়ি প্রণাম করতে এগিয়ে এলো তারা। বাধা দিতে চেষ্টা করেও পারা গেল না, তারা প্রণাম সারল যথার্থ খুশির অভিব্যক্তি দেখলাম তাদের মুখে।

মহিলা এবারে ওদের পরিচয় দিলেন, বড়টিকে দেখিয়ে বললেন, ওর নাম কমলা—কুমু, আর ছোটটিকে দেখিয়ে বললেন, ওর নাম রমলা—রুমু। আমার ভাসুরের মেয়ে, বাপ মা নেই, ভাইয়েরা বিয়ে-থা করে পর হয়েছে, এ দুটোকে নিয়ে আমার হয়েছে জ্বালাতন।

আমি অপ্রস্তুত, কিন্তু মেয়ে দুটো হাসছে। শেষের উক্তি গায়ে মাখল বলে মনে হল না। আর ওদের তাজা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখে অনাদরে আছে বলেও মনে হল না। মহিলা আবার বললেন, ওরা তোমার বই পেলেই পড়ে আর তোমার কথা খুব বলে।

হাসিমুখে বড় মেয়ে কুমু বলল, আমাদের থেকে কাকীমা বেশি প'ড়েন আর বেশি বলেন।

পরমুহূর্তে আমি ভ্যাবাচাকা। মহিলার হঠাৎ তপ্ত মূর্তি আর তপ্ত কণ্ঠ। বলে উঠলেন, খুব হয়েছে, কাকীমাকে আর নিজের দলে জুড়তে হবে না ওই নাটক-নভেল পড়েই তো চাল-চলন বিগড়েছে। কানাই কি করছে দেখ, চা-জলখাবার আনতে তো দিন কাবার করল।

মেয়েটা পালিয়ে বাঁচল যেন। মহিলার টান-ধরা মূর্তি দেখে মাথায় ছিট আছে কিনা সেই সন্দেহ হল। তিনি আবার বললেন, লেখা পড়া শিখে ওই মেয়েটা ত্যাঁদড় হয়ে উঠেছে, সাহসও বেড়েছে খুব। এই মেয়েটা তবু এখনো পদের আছে।

পদের মেয়ে অর্থাৎ ছোট মেয়ে রুমুর মুখখানায় লজ্জার আভা পড়লেও মলিন দেখালো। সদ্য পরিচিত লোকের সামনে দিদির প্রতি এই অকরুণ উক্তির ফলে ব্যথিত এবং বিড়ম্বিত। আমি সামাল দেবার জন্যেই তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, কেন, কুমুকেও তো বেশ ভাল মেয়ে মনে হল আমার।

না বললেই ভাল ছিল। প্রায় নিজের মাসির মতই মহিলা ঝাঁকিয়ে উঠলেন, থাক, তোমার আর ওর হয়ে ওকালতি করতে হবে না, হাড় জ্বালিয়ে খেলে।

আমার মনে হল ওই বড় মেয়েটার ওপর মহিলার বিরূপ হবার বিশেষ কোনো কারণ আছে।

বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সেই দু'বছর আগে মাসির আশ্রয়ে এসে উঠেছিলাম। মাসি বলছি কারণ, গেলবারের সেই পনেরদিনের মধ্যেই সম্পর্কটা প্রায় অবিচ্ছেদ্যরকমের পাকা হয়ে গেছল। সদ্য-পাওয়া বোন-পোর ওপর মাসির টান দেখে বন্ধুরা অনেকরকম টিকাটিপ্পনী কেটেছিল।

তা সেই ক'দিনে মাসির স্নেহসিঞ্চনে আমিও ফাঁপরে পড়েছিলাম। তাঁর সাহিত্য রসাস্বাদনের আগ্রহে আমাদের যথেচ্ছ বেড়ানো আর আড্ডা ব্যাহত হয়েছে। কোন বইখানা কবে লেখা হয়েছে, কতদিন ধরে লেখা হয়েছে, সেই সব নায়ক-নায়িকাদের চিন্তা মাথায় এলো কেমন করে, বাস্তবে সেইগোছের মেয়ে-পুরুষ দেখা আছে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, তার বেশির ভাগ কৌতূহল মিলনান্তক উপন্যাসের ব্যক্তিত্বসম্পন্না মেয়েদের নিয়ে।

আমার প্রাণান্ত অবস্থা এক একদিন। তিনি ডেকে পাঠালেই পালাবার ফিকির খুঁজতে হয়েছে। অথচ এমন অতিথিপরায়ণা মহিলাও কম দেখেছি। একদিনের জন্যেও আমাদের তিনি তার পান্থনিবাসের খদ্দের ভাবেন নি। হোটেলের খাবার ছাড়া দু'বেলা কত-রকমের যে খাবার করে খাইয়েছেন এই ক'দিনে, ঠিক নেই।

ভদ্রমহিলার বাইরেটা যেমন রুক্ষ, ভেতরটা তেমন নয়। তবু বড় ভাসুরঝি কমলার ওপরে অনেক সময় অকরুণ মনে হয়েছে তাকে সেই ক'দিনের মধ্যে তার কারণটাও নিজেই বলেছেন গলগল করে।

একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমঘটিত ব্যাপার আবিষ্কার করেছেন তিনি। ছেলেটা মোটামুটি ভালই এবং শিক্ষিত, বামুন হলেও তার মত উঁচুদরের বামুন নয়। পাণ্ডা। তাতেও আপত্তি হত না মাসির, কিন্তু সেই ছেলের পূর্বপুরুষদের কে নাকি অগ্রদানী বামুন ছিল। অতএব মাসি মেয়ের উপর ক্ষিপ্ত। সেই ছেলেটার ওপরেও। ছেলেটাকে আগে কত স্নেহ করতেন ভালবাসতেন মাসি— ভাল না বেসে পারেন কি করে, শুকদেবের নিজের ভাগ্নে যে।

শুকদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই পান্থনিবাসেই আলাপ হয়েছে আমাদের সেই ভদ্রলোক মাসির ছোট ভাইয়ের মত, তার বাপের আশ্রিত ছিল ছেলেবেলায়। এখানে কনট্রাক্টারি করেন, অবস্থা ভালই এখন। ভাগ্নেটি লেখাপড়া শিখে মামার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আপদে বিপদে শুকদেব ভট্টাচার্য এখনো মাসির ডানহাতের মতই। এই বিয়ে হতে পারে না সে বিষয়ে সেই ভদ্রলোকও একমত, কিন্তু চেষ্টা করেও ভাগ্নেকে তিনি সামলে উঠতে পারছেন না অনেক শাসন করেও ফল হয় নি। আবার ভাগ্নেকে তাড়াতেও পারেন না—ব্যবসা অচল হবে তাহলে।

আমাকে যে ঘরের কথা শোনানো হয়েছে, মেয়ে দুটো টের পেয়েছে। কারণ ভদ্রমহিলা রেখে ঢেকে চেপে চুপে বলেন না। যা বলেন গলা ছেড়েই বলেন। ওদিকের ঘর থেকে তাদের শুনতে না পাবার কথা নয়। কমলা তারপর থেকে আমার ধারে কাছে ঘেঁষে না। এখানকার কলেজ থেকে সে বি এ পাশ করেছে, তা ছাড়া বেশ বুদ্ধিমতীও মনে হয়। অতএব ওর জন্যে আমার দুঃখই হয়েছিল।

ওদের দুজনের সামনেই একদিন মহিলা বলে বসলেন, লেখাপড়া শেখানোটাই কাল হয়েছে আমার। তবে ওই ছেলেটা এখনো ভাল আছে, আমার এই বাড়িঘর যা-কিছু সব ওই রুমুই পাবে। শুকদেবকে বলেছি, কোনো উকীলকে দিয়ে সেইরকম একটা উইল করে আনতে। আমাকে এখনো চেনে না কেউ—

রুমু তক্ষুনি প্রস্থান করেছে, রুমুর মুখখানা শুকনো।

যাই হোক, সে-যাত্রায় পনের দিন থেকে কলকাতায় ফিরেছি। আসার আগে মাসির চোখে জল দেখব কিনা সেই ভয় ধরেছিল।

বার বার করে তিনি ছেলেমেয়ে আর বউ নিয়ে আবার আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পান্থনিবাসে আসার মত আসা নয়, বউমা তার মাসিশাশুড়ীর কাছে আসবে, আর ছেলেমেয়েরা তাদের দিদুর কাছে। আমি তখনকার মত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।

কিন্তু কলকাতায় এসেও যে নিয়মিত চিঠি পাব তাঁর, ভাবি নি। সে এমন অন্তরঙ্গ চিঠি যে আমার স্ত্রীটিরও সেই অদেখা মাসিশাশুড়ীর সঙ্গে পত্রালাপ করতে হয়েছে। প্রতি চিঠিতেই মাসির আমন্ত্রণ। কোনো নতুন বই ছাপা হলে তাঁকে না পাঠাবার দরুন অনুযোগ। তাব চিঠিতেই জেনেছি, মাসির ঘোর অমতে সেই পাণ্ডা ছেলেব সঙ্গে কমলাব বিয়ে হয়ে গেছে। মন্দিরে পালিযে গিযে পুরুত ডেকে বিয়ে করেছে। তারপর থেকে এখানে আর আসে নি, শুকদেবের কাছেই আছে। শুকদেব খুব অসন্তুষ্ট হলেও মাসির ভাসুরঝি বলেই ফেলে দিতে পারে নি। মাসির মন্তবা, কুমুকে তিনি তাঁর সমস্ত বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত করাই সাব্যস্ত কবেছেন—সবই তিনি রুমুব নামে লেখা-পড়া কবে দিয়ে যাবেন।

বেশ জানি, চিঠিব হাতের লেখাও রুমুবই—ওকে দিযেই চিঠি-পত্র লেখান তিনি। আমার ধারণা এ-কথাগুলো লিখতে ওর কষ্টই হযেছে।

দু'বছব বাদে এই আবার এলাম। বলাবাহুল্য এবারে স্ত্রী আব ছেলেমেয়ে নিয়েই এসেছি। আর আত্মীয়েব মত ওই পান্থনিবাসে ভদ্রমহিলার অন্তঃপুবে স্থান পেয়েছি।

মাসি যথার্থ খুশী। স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের সঙ্গে একেবাবে আপনাবজনেব মত ব্যবহার। আমাব স্ত্রীকে দেখে চোখ নাকি জুড়িযে গেছে তাঁর। বলে রাখি, স্ত্রীটি রূপসী তো নয়ই, তাঁর ভাসুর-ঝি'দের মত সুশ্রীও নয। তবুও রুমুর সামনে মাসি একেবারে লক্ষ্মীব মত দেখলেন তাকে।

এই দু'বছবে বমলাব চেহারা আরো সুন্দর, আবো কমনীয় হয়েছে। ওকে এখন বেশ সুন্দরীই বলা যায়। কিন্তু মুখখানা যেন ভারী শুকনো দেখলাম এবার এসে। শুধু তাই নয়, মাসিব মেজাজ যেন আগেব থেকেও তিনগুণ তিরিক্কি। আব সদ্য বর্তমানে ওই রমলাই যেন চক্ষুশূল তাব। উঠতে-বসতে তেতেই আছেন তার ওপর।

যাবতীয সমাচাব কানে আসতে তিন দিনও লাগল না। মাসিব স-রব ক্ষোভ থেকেই সব জানা গেছে।...রমলাও সেই বড়বোনেব বাস্তাতেই পা ফেলেছে। মাসির মতে কমলাব থেকেও অনেক বড়রকমের গর্হিত ব্যাপারে জড়িয়েছে বমলা। কারণ, এবারেব ছেলেটা বামুনও নয়। তার চাদমুখ দেখেই মেয়ে একেবারে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসেছে। দুধ কলা দিয়ে ঘরে কাল-সাপ পুযে এখন আব ভদ্রমহিলার মনস্তাপের অবধি নেই।

বমলা নাকি তাব কাকীমার মুখেব ওপবে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, সুশোভন সরকারকে সে বিয়ে করবেই। সুশোভন সরকার হল রমলাদের কলেদের এক তরুণ

প্রোফেসর। বছরখানেক আগে এখানকার কলেজে চাকরি নিয়ে এসেছে। তখন কোথাও জায়গা না পেয়ে এই পান্থনিবাসে এসে উঠেছিল। অমন সুশ্রী সুন্দর মুখ দেখে মাসির মায়া হয়েছিল, তাই আদরযত্ন করে ঘরের ছেলের মতই রেখেছিলেন ক'টা দিন। কিন্তু তখন কি জানতেন এ-রকম সর্বনাশ করার জন্য এসেছিল! মাসির মতে এ-সব মাস্টারকে ঝেঁটিয়ে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

আরো খবর পেলাম, রমলা যে বিষয়ে অনার্স পড়ে, সেই বিষয়েই এক পেপারের মাস্টার সেই ছেলে। অতএব পড়াবার ফিকিরে ছ'মাস ঘরের ছেলের মতই বাড়িতে আনাগোনা করেছে, তারপর ওদের ভাবগতিক দেখে মাসি ধরে ফেলেছেন ব্যাপারখানা।

সেদিন একলা পেয়ে রমলাকে বললাম, তোমার কাকীমার মেজাজ তো জানই, তবু এই কাণ্ড করে বসলে? একটা আঘাতই সহ্য হয়নি...

মুখ টিপে হেসে রমলা জবাব দিল, এ-রকম কাণ্ডব কথা তো আপনি অনেক গল্পে লিখেছেন, কারোই মেজাজ একটা সাংঘাতিক কিছু বাধা হয়ে উঠতে পারে নি।

এই দু'বছরে মেয়েটা অনেকখানি বদলেছে বটে।

এ-সময় না এলেই বোধহয় ছিল ভাল। অশান্তিটা বেশ দ্রুততালে ঘন হয়ে উঠেছে টের পাচ্ছি। শুকদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হতে তিনি মুচকি হেসে বলেছেন, বেশ ভালসময়েই এসেছেন, শিগগীরই জমাট নাটক দেখতে পাবেন আশা করা যাচ্ছে —তা আমার বাড়িতে একদিন পায়ের ধুলো দিন, আপনি এসেছেন শুনেই কমলা মা আপনার দেখা পাবার আশায় আছে।

ওদিকে ভদ্রমহিলার তপ্ত মেজাজ আক্রোশে স্থির কঠিন হয়ে উঠছে ক্রমশ। আর রমলা যেন সর্বক্ষণ এই বাড়িতে থেকেও নেই। আমাদের হয়েছে আরো মুশকিল, সত্যিকারের আত্মীয়জ্ঞানেই যেন ভদ্রমহিলা এক-এক সময় আমাদের কাছে ভাসুরঝি'র বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন। এ-পাশ ও-পাশের ঘর থেকে রমলার কানে যাচ্ছে সবই, ফলে তার সামনে আমরা আবার অপ্রস্তুত।

সেদিন রমলার সামনেই একটা কাণ্ড হয়ে গেল। তার কাকীমা একটা লম্বা বড় খাম হাতে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন। আমার দিকে খামটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার উইলের খসড়াটা একবার পড়ে দেখো তো সব ঠিক আছে কিনা, শুকদেব এক উকীলকে দিয়ে করিয়ে এনেছে, তারও তো স্বার্থে ঘা পড়েছে, কোনোরকম মারপ্যাঁচ আছে কিনা ভালো করে পড়ে শোনাও দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে রমলা উঠে যাচ্ছিল, তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, যাচ্ছিস কেন, বসে শুনে যা তোদের বেইমানির জন্য কি ব্যবস্থা করলাম আমি।

--কি ব্যবস্থা করলে জানাই তো আছে। রমলা চলেই গেল।

সেদিকে চেয়ে দু'চোখে তাকে যেন ভস্ম করে নিলেন মহিলা, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বলে উঠলেন, দেখলে, দেমাক দেখলে? তোদের দেমাক বার করছি আমি দাঁড়া। নাও তুমি পড়ো—

তাঁর মেজাজের ভয়েই পড়তে হল। সারমর্ম তাঁর অবর্তমানে ি

তাঁর ব্যাঙ্কের যাবতীয় টাকাকড়ি সব স্থানীয় হাসপাতালের সাহায্যার্থে সরকারের হেফাজতে যাবে। এ-সবের ওপরে তাঁর কোনো আত্মীয়ের কিছুমাত্র দাবি থাকবে না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু ভদ্রমহিলা যে-রকম ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন, তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা মিথ্যে। ওদিকে রমলাও হয়ত আমাকে শত্রুপক্ষ ভাবছে, পারতে সেও সামনে আসে না।

সেইদিনই শুকদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হতে তিনি অনুযোগ করলেন, কই, আপনি তো এলেন না একবার।

আমি বললাম, যাব। কিন্তু এদিকের অশান্তিটা কি ঠেকানো যায় না? উইলের খসড়া তো আপনিই করিয়ে এনে দিয়েছেন শুনলাম

ভদ্রলোক হেসে বলে উঠলেন, অশান্তি ঠেকাব কি করে, বিয়ে বন্ধ করে? ক্ষেপেছেন। নিজের ছেলেটা নেহাত ছোট, আর একটা ভাগ্নে-টাগ্নে থাকলে ওই মেয়েটাকেও নির্ঘাত নিজের ঘরে নিয়ে আসতাম।

এই গোছের হাল্কা উক্তি দুর্বোধ্য ঠেকল, ভালও লাগল না।

এর দিনতিনেক বাদে সকাল থেকেই রমলাকে বাড়িতে দেখলাম না। বিকেলেও না, রাত্রিতেও না। সন্ধ্যার পর পুরনো চাকরটা চুপি চুপি জানালো, দিদিমণির আজ রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেল।

সেই রাতে মাসির সঙ্গে আর দেখাই হল না। ঘর থেকেই বেরোন নি তিনি বাড়ির মধ্যে আমি এবং আমার স্ত্রী তটস্থ। ছেলেমেয়ে দটোও একেবারে চুপ।

কিন্তু পরদিন ভদ্রমহিলার নির্লিপ্ততা দেখে আমাদের অবাক লাগল একটু। নিয়মিত নীচে নেমে এসে পার্শ্বনিবাসের তদারকে বসলেন। আমাদের সঙ্গেও সহজ স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা কইলেন। যেন কিছুই হয় নি, কিছুই ঘটে নি।

ভয়ানক খারাপ লাগছিল। দুপুরের দিকে চুপি চুপি বেরিয়ে চলে এলাম শুকদেব ভট্টাচার্যের বাড়িতে। রমলার খবরটা অন্তত তার কাছে পাওয়া যেতে পারে।

রমলার খবর নয়, রমলাকেই সেখানে দেখে অবাক আমি। তার বরকেও দেখলাম। সত্যি চাঁদ-পানা ছেলে। হাসি মুখে কমলা-রমলা এগিয়ে এসে প্রণাম করল আমাকে, ওদের বরেরাও। আর শুকদেব ভট্টাচার্যের মুখে হাসি ধরে না।

সেই দুপুরেই জোরজবরদস্তি করে খাওয়ানো দাওয়ানো আদর আপ্যায়নের পর আমাকে আড়ালে এনে ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনি মশাই অত ভাবনায় পড়েছেন কেন, খুশী বোধহয় সব থেকে বেশি আপনার ওই মাসিটিই হয়েছেন, বুঝলেন?

—সে কি।

ভদ্রলোক জোরে জোরে মাথা ঝাকালেন, ঠিকই বলছি। মাথাখারাপ আর কাকে বলে, ক্ষমাদি যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে।

মহিলার নাম ক্ষমা।

আমি অবাক, বলেন কি?

—না তো কি, আমার গোবেচারা ভাগ্নেটাকে দিনের পর দিন জামাই আদরে রেখে ব্যাপারখানা এগিয়ে দিলেন। তারপর সুশোভন সরকারকে তো বাড়ি থেকে ছাড়তেই

চান না, সে-কি আদবযত্নেব ঘটা—ঝনুকে বাডি এসে পডানোব ব্যবস্থাও তো উনিই বলে-কযে কবিযেছিলেন।

যা শুনছি, আমি যেন ঠিক বুঝছি না।—কি ব্যাপাব বলুন তো?

বিব্রত হাসি মুখ ভদ্রলোকেব।—কাউকে বলবেন না তো?

আমি মাথা নাডলাম, বলব না।

—এও এক ধবনেব পাগলামি বুঝলেন, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি তো ওকে নিজেব বিযেব আগে একজনকে খুব মনে ধবেছিল ক্ষমাদিব, কিন্তু তাব বাবা শাসিযেছিলেন, অবাধ্য হলে কেটে দু'আধখানা কবে ফেলবেন। ধবে বেঁধে অন্যত্র বিযে দেওযা হযেছিল ক্ষমাদিব। সেই ক্ষোভই আব যায নি মনে হয। দু'দুটো মেযেব সামনে নিজেই টোপ ফেলেছেন, আব তাবপব নিজেই খাডা হাতে নিযেছেন—ভয-ডব বিসর্জন দিযে নিজে যা পাবেন নি, এই মেযেবা তা পাবে কিনা দেখতে চান। এ ছাডা আব কি হতে পাবে বলুন

হতভম্বেব মতই আমি পার্শ্বনিবাসে ফিবেছি। শুকদেব ভট্টাচাযেব কথা বিশ্বাস কবব কি কবব না ভেবে পাই নি। গল্পে উপন্যাসে বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ ভালবাসাব মিলনান্তক পবিণামেব প্রতি ভদ্রমহিলাব প্রীতিব ব্যাপাবটা মনেব তলায উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

তাব ঘবে ঢুকে দেখি, শয্যায বসে কতগুলো কাগজ ছিঁডে কুটি কুটি কবেছেন তিনি মুখখানা হাসি হাসি। আমাকে দেখে লজ্জা পেলেন যেন একটু। ডাকলেন, এসো, বেবিযেছিলে বঝি

কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, তাব আগেই চোখ আটকালো তাব হাতেব দিকে। লক্ষ্য কবে দেখি, নিবিষ্ট মনে সেই উইলেব খসডাটা ছিঁডছেন তিনি।

আমি বলে ফেললাম, ও কি?

একদফা থতমত খেলেন তিনি, তাবপব আমাব বিস্ময়েব কাবণ বুঝে বিব্রত মুখে বললেন, উইলেব খসডাটা কবেই ফেলল যখন বিযে কি আব কবা যাবে। ভাবছি ওই বজ্জাত মেযে দুটোকে আব জামাই দুটোকে বাডিতে ডেকেই পাঠাই, কি বলো?

নিজেব অগোচবেই হা কবে মহিলাকে দেখছিলাম আমি। আত্মস্থ হওযামাত্র সানন্দে বলে উঠলাম, খুব ভাল ভেবেছেন মাসিমা, খু-ব ভাল, এব থেকে ভাল আব কিছু হয না।

বর্ষা

কদিন আগে কাব্য কবে কাগজে লিখেছিল, 'ববষাব ভবসা নেই'। আব লিখেছিল 'প্যাচপেচে গবমে কলকাতাব মানসিক জীবনযাত্রা অচল হতে চলেছে। কলকাতাবাসী, যাদেব এযাব কণ্ডিশন ঘব নেই, থেকে থেকে তাবা চাতক পাখিব মত আকাশেব দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু আবহাওযা আপিসেব ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস কবলে বলতে হবে ববষাব আপাতত ভবসা নেই।'

কলকাতার জনসমুদ্রের একটি প্রাণীও এই অসহ্য গরমে বর্ষা চায় নি বললে অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের ব্যাপার হবে।

কিন্তু সত্যিই একজন চায় নি। অমিতা সরকার চায় নি। চায় না।

শুধু তাই নয়, কাগজের হা-হুতাশ পড়ে রাগ করে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আকাশের বুকে কালো ফরাস বিছানা দেখলে বুকের তলার এক অসহ্য গুমটে ছটফট করতে থাকে সে। আর, আকাশ ভেঙে বাদলের ধারা নামে যখন, ওই বুকের ভিতরে একটা জ্বলুনি শুরু হয় তার তখন।

...আকাশ-ভাঙা এক বর্ষার রাতে একজনের হাতে এই জীবনের সর্বস্ব সঁপে দিয়েছিল অমিতা সরকার। সেই ঘনঘটা দুর্যোগের বাতে মহা অস্তিত্বের মধ্যে এক অস্তিত্বশূন্য মিলন সম্পূর্ণ হয়েছিল তার।

চোখ বুজলেই সামনে ছবির মত জীবন-বাস্তব আর যৌবন-বাস্তবের একটা মিছিল দেখতে পায় অমিতা সরকার। পুরনো, পবিত্যক্ত, কিন্তু সমস্ত সত্ত্বা খাক কবে দেওয়ার মত সজীব। অমিতা সরকার দেখতে চায না। তবু দেখতে হয়। মিছিলের মত সার বেঁধে আসে ওই ছবির দল। বর্ষাব দিনে বা রাতে সবথেকে বেশি আসে।

...বিকেল থেকেই সেই একদিন আকাশ দুর্যোগে ছেয়ে ছিল। কালো কালো মেঘগুলো এসে এসে আকাশের কালো আস্তরণটা ঘন ভাবী পুরু কবে তুলেছিল। তার প্রলয় নামবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে জলদ গুরু-গুরু ডাক শোনা যাচ্ছিল।

বিকেল থেকে অমিতা সরকার কতবার সেদিন আকাশ দেখছিল, ঠিক নেই। যত দেখছিল, উল্লাসে ভেতরটা তত ভরে উঠেছিল। ওই প্রলয় আশীর্বাদ ছাডা আর কিছু ভাবে নি সে। ও চাইছিল আসুক প্রলয়, আকাশ ভেঙে পড়ুক। সামনেব এই রাতে সে সব পাবে, অথবা সব হারাবে। তাই আশা আনন্দের মধ্যেও বুকের ভেতবটা দুরুদুরু কাঁপছিল তারও।

দুটি প্রবল রাগী পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল অমিতা সরকাব। না, সরকাব তখনো হয় নি, দাঁড়িয়ে ছিল অমিতা চাটুজ্জে। তাদের একজন তার দাদা, আর একজন সমর সরকার। দুজনের ক্রোধান্ধ টানাহেঁচড়ায় প্রাণান্ত দশা অমিতার। এই দুর্যোগেব রাতে ওই অসহ্য টানাহেঁচড়ার চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। অন্তত হবার কথা। অমিতা আশা করেছিল সমর সবকার জিতবে। চেয়েছিল সমর সরকার জিতুক।

কারণ দাদাকে সেও তখন জীবনের পরম শত্রু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিল না।

চণ্ডাল রাগী দাদা তার প্রতিজ্ঞাব কথা শুনিয়ে দিয়েছিল অমিতাকে। বলেছিল, মুখে যদি সত্যিই এভাবে চুন-কালি দেয় ও, হয় তাকে কেটে দুখানা করবে, নয়তো সমরকে। পারলে দুজনকেই। স্বদেশী করতে গিয়ে একবার ফাঁসি হতে হতে বেঁচেছিল দাদা, এবার না হয় আর বাঁচবে না। কিন্তু তার কথার নড়চড় হবে না।

আর একজনের তেমনি মেজাজ। ওই সমর সরকারের। মুখের ওপর সে দাদাকে অপমান করেছিল। বলেছিল, খুন করা হবে না, তবে বুদ্ধিভ্রংশ হলে আত্মহত্যা করে

বসতে পারে বটে। তখন অমিতাকে সান্ত্বনা দিতে বেশ বেগই পেতে হবে তাকে। কারণ দাদা যেমনই হোক, তাকে অমিতা ভালবাসে মনে হয়।

দাদার হুমকিতে অমিতা ভয় পেয়েছিল। রক্ত চড়লে সে রক্তপাত করতেও পারে। আবার আর একজনও কম নয়। অমিতার এক-এক সময় সন্দেহ হয়, অসবর্ণ বিয়েব নামে দাদা এমন মারমুখী, নাকি ওই অপমানের ফলে।

এক সময দাদার বন্ধুই ছিল সমর সরকার। সমরের বাবা তখন ব্যবসায় মন্দ টাকা করে নি। দাদার রাগের আরো কারণ আছে। তার মতে সমর সরকার শুধু গোঁয়ার নয় অপদার্থও। নিজেব গাফিলতিতে বাপের ওই চালু ব্যবসা ডুবিয়েছে নাকি। কিন্তু ব্যবসায় সমর সরকারেব উদ্যম কম দেখে নি অমিতা। দোষের মধ্যে লোকটা হৈ-চৈ-ফুর্তি ভালবাসে। আব ভালবাসে সিনেমা থিয়েটার। ফিল্ম স্টুডিওতে ঘোরাফেরা করে, আড্ডা দেয়। এই সব বলে তার চরিত্র সম্পর্কেও অমিতাকে সন্দিগ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেছে দাদা।

কিন্তু পুরুষের মেজাজের সঙ্গে লোকটার এই গোছেব ফুর্তির যোগও অমিতার উল্টে ভালই লাগে।

যাই হোক, অমিতাকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংসারে একটা অশান্তি পুষ্ট হয়ে উঠছিল। সেই থেকেই রক্তাবক্তি হওয়ার আশঙ্কা। চোখের দেখাসাক্ষাতও বন্ধ। কিন্তু সত্যি বন্ধ কিনা দাদার সেই সন্দেহ। তাই অনেক ভেবে অমিতাকে দীর্ঘদিনেব জন্য বাইবে এক আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবার সঙ্কল্প করেছিল সে। পরের দিনই সেই যাত্রার তারিখ। দাদাব মুখের ওপর আপত্তি করার সাহস অমিতার হয় নি।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অমিতা বিদ্রোহ কবেছিল।

সমরের সঙ্গে যোগাযোগ সতিাই বন্ধ ছিল না। অমিতা তাকে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার কথাই বলেছিল। বলেছিল, বাইরে পা দেবার আগে সে যদি তাকে এ বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে এ জীবনে সে অবকাশ আর বোধহয় হবে না।

সমর সরকার কথা দিয়েছে ওকে নিয়ে বাইরে চলে যাবে। বাইরে গিয়ে ঘব বাঁধবে তারা। সেই ব্যবস্থার দিকেই এগোচ্ছে সে। তারপর খুব সংগোপনে ঘর ছাড়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে।

এই সেই দিন। এদিনে এই দুর্যোগ তাই আশীর্বাদ অমিতার কাছে। মানুষ যখন ঘর ছেড়ে, শয্যা ছেড়ে নড়তে চাইবে না, সেই লগ্নেই অমিতা ঘর ছাড়বে।

তাই ছেড়েছে।

রাতের প্রলয় আগে ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। বাড়ির একটি প্রাণীও যখন জেগে নেই, অমিতা নিঃশব্দে তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছে। ও-রাস্তায় জল জমে না বলে রক্ষা। অত রাতে আর অমন দুর্যোগে রাস্তায়ও জনমানব নেই। ঝড়ের ঝাপটায় সন্ধ্যার আগেই রাস্তার আলোগুলো নিভে গেছে।

দুটো মোড় ছাড়িয়ে তৃতীয় মোড়ে সমরের গাড়ি অপেক্ষা করছে। নীরবে দরজা খুলে অমিতাকে ভেতরে টেনে নিল সে। সাড়ে তিনশ টাকা গুনে ওই গাড়ি ঠিক

করেছে সমর—ট্রেনে নয়, যতদূর সম্ভব গাড়িতেই কলকাতা থেকে দূরে চলে যাবে তারা।

সমরের বাহুর মধ্যে থর থর কাঁপছিল অমিতা। এমন কাঁপুনি আর জন্মে কাঁপে নি। সেটা দুর্যোগের দরুন খানিকটা বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গে পাতলা কাগজের মত ওয়াটার প্রুফ মোড়া তার—তাই খুব বেশি ভিজেছে এমন নয়। তবু অত কাঁপছিল কেন সমরের বুঝতে দেরি হয় নি। এক হাতে তাকে খুব কাছে আগলে রেখে ফিসফিস করে সান্ত্বনা দিয়েছে, ভয় কি, আমি তো আছি।

দুনিয়ায় এই একটাই যেন ভরসার কথা আছে। সামনে চালক বসে, কোনো অজুহাতে সে ফিরে তাকাবে কিনা সে হুঁশ পর্যন্ত অমিতার নেই। দু হাতে তাকে আঁকড়ে ধরে অমিতা শুধু ঠক ঠক করে কেঁপেছে।

অনেক—অনেকক্ষণ বাদে সে কাঁপুনি থেমেছে। তারপর তার ভাল লাগতে শুরু করেছে তার ভিজে বর্ষাতির জলে সমরও ভিজে গেছে প্রায় সেটা খুলে ফেলে সমরের গা ঘেঁষে বসেছে। তার পরের কাঁপুনিটা ভাল লাগার কম্পনের মত কলকাতা ছাড়িয়ে গাড়ি যত দূরে গেছে, তত বেশি ভাল লেগেছে তার।

সমরের পাশে বসে গাড়িতে আগেও তো কম পথ পাড়ি দেয় নি। কিন্তু এত ভাল আগে কখনো লাগে নি। এমন রোমাঞ্চও কোনোদিন অনুভব করে নি।

এটাই একমাত্র বিলাস অমিতার। এই গাড়ি চড়াটা। দাদার সঙ্গে বেড়িয়েছে, সমরের সঙ্গে তো কত বেড়িয়েছে ঠিক নেই। তার একমাত্র সাধ, নিজের একটা ছোট্ট গাড়ি হবে একদিন। বড় দামী গাড়ির স্বপ্ন সে আর দেখবে কি করে। ছোট গাড়ি হলেই খুশী। সেই ছোট গাড়িতে তাকে নিয়ে সমর কোথা থেকে কোথায় পাড়ি দেবে এক একদিন ঠিক নেই। ভাবতেও ছোট মেয়ের মতই রোমাঞ্চ তার। তার এই সাধের কথা সমর জানে সে কথা দিয়েছে, ঘর বাঁধার দু বছরের মধ্যে গাড়ি একটা করবে—করবেই।

কিন্তু বাদল ঝরা এই রাতে অমিতা সে সব কিছু ভাবছিল না। ও শুধু একান্ত প্রিয় সান্নিধ্যে বসে ছিল। আবারও মনে হয়েছিল দুর্যোগের এই রাত আশীর্বাদ, জীবনের আশীর্বাদ তার।

ঘর বেঁধেছে ইউ পি'র কোনো এক জায়গায়। সে ঘর সুখেরই হবে মনে হয়েছে দুজনের—নিরবচ্ছিন্ন সুখের। সেখানে এক পুরনো বন্ধু ছিল সমরের—আগে থাকতেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করা ছিল। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে শেষের পথটুকু তারা ট্রেনে এসেছে। বন্ধুর বাড়িতে উঠেছে। বন্ধুটি আবগারী দপ্তরের পদস্থ কর্মচারী। প্রণব ঘোষ। সেই হৈ চৈ করে বিয়ে দিয়েছে দুজনার, তারপর দেখেশুনে দু'ঘরের একটা আস্তানা যোগাড় করে দিয়েছে।

কিন্তু যৌবন-বাস্তবের আবেগে টান ধরেছে এক বছর না যেতে। তার প্রধান কারণ উপযুক্ত সংস্থানের অভাব। সমরের হাতে কাঁচা টাকা মন্দ ছিল না। বন্ধু প্রণব ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবসায় নেমেছিল সমর সরকার আর রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখেছিল। পুঁজির টাকা অর্ধেকের বেশি ক্ষয় হয়েছে তার, ব্যবসায় মার খেয়েছে।

অনেক ভেবে-চিন্তে আবার অন্য ব্যবসা ধরেছে, অল্প পুঁজি খাটিয়েছে তাতে। ওই থেকে এখন গ্রাসাচ্ছাদন চলছে বটে, কিন্তু এই ব্যবসারও স্তিমিত ভবিষ্যৎ। অমিতার নিজের গাড়ি কেনার স্বপ্ন ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে।

কিন্তু যখন-তখন গাড়ি চড়ার আনন্দ থেকে সে একেবারে বঞ্চিত হয় নি। কারণ প্রণব ঘোষের গাড়ি আছে। সে এসে হানা দেয়। অমিতার গাড়ি চড়ার নেশার সে সমজদার বটে। দুজনকেই ছো মেরে তুলে নিয়ে প্রায়ই গাড়ি ছোটায় সে। কখনো বা অমিতাকে একলা তুলে নিয়ে। সমর ব্যবসার চিন্তায় আর দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত, তাকে সর্বদা পাওয়া যায় না।

প্রণব ঘোষকে অকৃত্রিম সুহৃদই ভাবে সমর সরকার, তবু অমিতার সঙ্গে খিটির মিটির বাধে প্রায়ই একগুয়ে রণচটা মানুষ, এক এক সময় মাত্রা ছাড়ায়। সেটা বেশি হয়, প্রণবের গাড়িতে বেড়িয়ে ফেরার পর। অমিতা বুঝতে পারে সারা দিনের ক্লান্তির পর মানুষটা তাকে না পেয়ে বিগড়য়। ভাবে আর বেরুবে না—অন্তত একা না। কিন্তু দিনকতকের মধ্যেই হাপিয়ে ওঠে কেমন। তার ওপর প্রণব ঘোষের অন্তরঙ্গ জুলুম। সঙ্কল্প ভুলে আবার হয়ত বেরিয়ে পড়ে একদিন।

এরই মধ্যে বর্ষার দিনে বা বর্ষার রাতে অমিতার আনন্দে কাটত একা, লোকটার মেজাজ বদলায় তখন। কাছে আসে, ওকে কাছে পেতে চায়। বর্ষার সঙ্গে দুজনারই ওদের নাড়ির যোগ।

এই যোগ থাকল না শেষ পর্যন্ত। তিন বছর না যেতে ঘর ভাঙল। এমন করে ভাঙল যে সেটা আর জোড়া লাগার আশাও থাকল না

তার আগে ওই ঘরে অনটনের ছায়া আরো বিস্তারলাভ করেছে। কিন্তু সেই কারণেও নয়, অমিতা হাঁপিয়ে উঠেছিল লোকটার অসহিষ্ণু উগ্র মূর্তির ক্রমশ নগ্ন প্রকাশ দেখে। অমিতার প্রতিটি চলন বলন পর্যন্ত বাকা চোখে দেখতে শুরু করেছিল সমর।

প্রণব ঘোষের পাগলামিতে পড়ে সত্যিই ফিরতে রাত হয়েছিল সেদিন অমিতার। প্রথমে বার বার সে ফেরার তাগিদ দিয়েছিল, কিন্তু তারপর নিজেরই কেমন নেশা ধরেছিল।

সমর চুপ করে সহ্য করলে অমিতা নিজেই অনুতপ্ত হত। কিন্তু তার বদলে এমন কটূক্তি শুরু করল যে, অমিতারও শেষ পর্যন্ত মেজাজ ঠিক থাকল না। খানিক বচসার পরেই সমরের শক্ত হাতের পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেল অমিতার গালে।

পরের দিন সন্ধ্যার গাড়িতেই নিশ্চুপে কলকাতায় রওনা হল অমিতা। সমর সরকার তখন কর্মস্থলে বসে ব্যবসার হিসেব দেখছে।

প্রণব ঘোষের কাছে এসে কলকাতা যাবার টাকা চেয়েছিল অমিতা—সেটাই কাল হল। সব খবরই রাখত প্রণব ঘোষ, অমিতাও গোপন কিছু করে নি। এমন কি গালের একটা দিক যে সকাল পর্যন্ত লাল হয়ে আছে, তাও দেখিয়েছে। প্রণব ঘোষ তবু বোঝাতে চেষ্টা করেছে একটু, তারপর চুপ করে খানিক ভেবেছে কি। শেষে বলেছে, সন্ধ্যায় গাড়ি, সময়মত স্টেশনে আসবেন, আমি ব্যবস্থা করে রাখব।

ব্যবস্থায় কোনো কার্পণ্যই করে নি বটে সে।

দুজনার এক ফার্স্ট ক্লাস কুপেতে তাকে তোলা হল দেখে অবাক সে। প্রণব ঘোষ তাকে বোঝালো, যেভাবে যাচ্ছে এই ব্যবস্থাই নিরাপদ। কিন্তু গাড়ি ছাড়ার পরেও সে নামলো না দেখে অমিতা সরকার বিমূঢ়, ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হল, আপনি নামলেন না, গাড়ি যে ছেড়ে দিল!

জবাবে প্রণব ঘোষ বলেছে, একজন মহিলাকে এভাবে একা ছেড়ে দেওয়ার মত পাগল সে এখনো হয় নি। কলকাতা পৌঁছে দিয়ে ফিরবে।

অমিতা নির্বাক।

যত বাত হয়েছে তত অস্বস্তি বেড়েছে তার। যে অশান্তিতে ভিতর পুড়ছে তাই নিয়ে পর্যন্ত চিন্তাব অবকাশ নেই যেন তাব। এই লোকটার অস্তিত্ব এমন কবে অমিতা আব কখনো অনুভব করে নি বুঝি।

রাত তখন কত জানে না। অশান্তি আর ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তাও জানে না। স্বপ্ন দেখল, একটা ক্ষুধিত নেকড়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধবেছে, আব নিঃশেষে গ্রাস কবতে আসছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গিয়েও পাবে নি।...স্বপ্ন নয। আঁকড়ে ধরেছিল। গ্রাস কবেছিল।

পাচ বছব কেটেছে তাবপর। যেখানে থাকে সেটা ভদ্রলোকের বস্তি-বসতি বলা যেতে পারে। যাবা জানে তাকে, তাবা এইটুকুই জানে স্বামীর সঙ্গে কোনো কাবণে বিচ্ছেদ হযেছে, সেটা আব সহজে জোড়বার নয়। অনেকের অনেক রকম জটিল কুটিল দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে হয়। অমিতা এটুকু ভবিতব্য বলে মেনে নিযেছে।

এই পাঁচ বছরে রেডিও কারখানার প্যাকিং-বক্স ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় সহকাবিণী একশো তেতাল্লিশ টাকা মাইনের অমিতা সরকার তার বিগত জীবনের অনেক স্মৃতি মুছে দিতে পেরেছে। কিন্তু পাঁচ বছরের পাঁচ-পাঁচটা বর্ষা এড়াবে কেমন কবে? অমিতাব স্থিরজীবনে অস্থির চাঞ্চল্য যদি কখনো দেখা যায তো সে এই বর্ষাব সময।

কিন্তু পাচ বছব বাদে এই অস্থিবতাব পুজিও অকস্মাৎ নির্মূল একদিন।

শহব কলকাতা বুঝি ভেসে গেছে সেদিন। বেশির ভাগ পথ জলের তলায়। হাঁটুজল ভেঙে খুব মন্থর গতিতে টালিগঞ্জের বস্তি-ঘবের দিকে চলেছিল অমিতা। সর্বাঙ্গ সপসপে ভিজে। আশপাশে আবো অনেকে জল ভেঙে চলেছে—দু'পাশের দোকানের ধারে ধারে জলের মধ্যেই দাঁড়িযে আছে অনেকে। দাঁড়িয়ে অমিতাও ছিল, কারণ অত জলে হাঁটা শক্ত। কিন্তু এত ভিজেছে যে বহুজনেব জোড়া-জোড়া অনাবৃত দৃষ্টি ক্রমাগত তাব সর্বাঙ্গে বিঁধছিল। তাই জল ভেঙেই চলেছে সে—আব, ও চলেছে বলেই অনেকে সপ-সপ পা ফেলে মনের আনন্দে সঙ্গ নিয়েছে। ঘরে না পৌঁছানো পর্যন্ত ওদের এই দৃষ্টিভোজ থেকে অব্যাহতি নেই।

হঠাৎ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল অমিতা। বাস্তার মাঝের আরো গভীব জল ভেঙে ঝকঝকে একটা মস্ত দামী গাড়ি ঠেলে নিয়ে চলেছে এক দঙ্গল ছেলে-ছোকরা। দেখলে চোখ জুড়োয এমন দামী গাড়ি—জলে এঞ্জিন ডুবু-ডুবু বলেই হয়ত ঠেলে

নিয়ে যেতে হচ্ছে। আর সেই গাড়ির পিছনের গদীতে গা ডুবিয়ে বসে আছে সমর সরকাব।

অমিতার জলে-ভেজা দেহে বুঝি বিদ্যুৎ খেলে গেল একপ্রস্থ। সে সত্যি দেখছে কি স্বপ্ন দেখছে ভেবে পাচ্ছে না। সমর তাকে দেখেছে। দু'চোখ তার মুখের ওপর চোখেব ওপব থমকেছে একপ্রস্থ।

অমিতা নিস্পন্দ, বোবা।

গাড়ি যারা ঠেলছে তাদের কি হুকুম করে সমর সরকার পিছনের কুশনে গা এলিয়ে দিল।

গাড়িটা অমিতার চোখের ওপর দিয়ে ধীবে ধীরে এগিয়ে গেল।

আসুরিক আনন্দে হৃৎপিণ্ডটা এত লাফালাফি কবছে সমব সরকারের যে গাড়িটা এগিযে যেতেই স্থিব হযে বসতে পারছে না আব। এমন আনন্দেব ব্যাপার জীবনে আর কি ঘটেছে?

...স্টুডিওতে ঢুকলেই শূন্য গাড়ি দেখে ছবিব মেজাজী প্রযোজক মারতে আসবে হয়ত। রাগ করেই নিজেব গাডি ছেড়ে দিয়েছিল এক্সট্রা যোগানদার সমর সরকারকে। ছবির জন্যে ভিড়ের মেযে যোগাড় হয নি বলে মাথায় আগুন চড়েছিল তার। হুকুম করেছিল, বৃষ্টি-ফিষ্টি জানি না, যে করে হোক সাত-আটটা মেয়ে অন্তত যোগাড় করে আনতে হবে—ছবির শট কামাই যেতে পাববে না। যোগাড় যদি না হয় তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন, আগে কেন হুঁশ ছিল না?

সাত-আটটা ছেড়ে এই বৃষ্টিতে দুটো বয়েসকালের মেয়েও একত্র করতে পারে নি এক্সট্রা যোগানদার সমর সরকার। প্রযোজকের মেজাজ ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা না হয়ে থাকলে চাকবি পর্যন্ত চলে যেতে পারে তার।

যাক। সমর সরকার পরোয়া করে না আর। প্রাপ্তি যা হয়েছে তা শুধু সে-ই জানে।

জলেব মধ্যে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে অমিতা সবকাব। তার ভিজে শরীরের আনাচে-কানাচে কত জোড়া চোখ বিঁধছে এখন, হুঁশ নেই।

এক বর্ষায় অমিতার পাওয়াটা সম্পূর্ণ হযেছিল।

আর এক বর্ষায় তার হাবানো সম্পূর্ণ হল।

জনক

সিনেমার শেষ শো শেষ না হওয়া পর্যন্ত দোকানটা আধখানা খোলা থাকে। সিনেমার শেষ শো ভাঙে সাধারণত রাত এগারোটা কুড়ি থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। তার পবেও বিশ-পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করে কার্তিক শীল। তেমন রইস খদ্দের জুটে গেলে

তিন-পো ঘন্টা একঘন্টাও দেরি হয়ে যায়। সেদিন আর বাস মেলে না। পকেটে ছোট-মাঝারি বা বড় নোটের আমদানী বেশি হলে আড়াই মাইল পথ পায়ে হেঁটে ডেরায় ফিরতেও খুব ক্লান্তি লাগে না। তা ধৈর্য থাকলে পকেটে আসেও মন্দ না। রাতে অপেক্ষা করার সুফলটা সে চার বছর ধরে পাচ্ছে। এখন তো অপেক্ষা করাটা প্রায় নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাল চিনি আটা তেল নুনের দাম দিনকে-দিন যে-রকম সোনার দাম হয়ে উঠছে তাতে ঘুমের ঘোরেও দুশ্চিন্তায় আঁতকে ওঠার কথা। এর মধ্যে সোজা রাস্তায চলো, সোজা রাস্তায় চলো—বলে যারা গলা ফাটাচ্ছে, হয তাদের ভীমরতি ধরেছে, নয়ত চোখ বুজে নতুন জীবনেব স্বপ্ন দেখছে তারা। তার থেকে যদি বলত, সার বেঁধে সব ওই দশ-তলা বাড়ির ছাদে গিয়ে ওঠো, তারপব সেখান থেকে মাটিতে লাফিয়ে জীবন থেকে টুপ টুপ করে খসে পড়ো সব—ওই কার্তিক শীলদের কাছে সেটা অনেক সহজবোধ্য হত।

বিগত জীবনের অনেক সৎকর্মের জন্য আজ মনস্তাপী সে। যে অনুশোচনা এই তিরিশ বছব পরেও মনেব তলায় সব থেকে বেশি গুমবে ওঠে থেকে থেকে—সেটাই তো তাব সব থেকে বড় নির্বুদ্ধিতার নজির। পাঁচ-সাত বছব আগেও তার এ বকম মনে হত না। এখন অহরহ মনে হয়। এই দিন আসবে বলেই ওপবঅলা অনুগ্রহ করেছিল তাকে। অনুগ্রহ করে যুগের যোগ্য দূত পাঠিযেছিল তার ঘরে। কিন্তু সে-দান কার্তিক শীল পায়ে করে দুমড়েছে। তার কপাল এ-রকম হবে না তো কার হবে।

তার বস্তিঘরের মানুষগুলোর একটাকেও জীবন্ত মনে হয় না। ছেলে তিনটের হাড় আর নীল নীল শিরা-বার-কবা শুটকো মূর্তি। ওদের বউ আর ছেলেগুলোরও তেমনি ছিরি। কার্তিক শীলকে বলতে হয় না কিছু, সারাক্ষণ নিজেরাই ওরা অপরাধী ভাবে নিজেদেব। বেঁচে যে আছে, বেঁচে যে থাকতে চায়, সেই অপবাধ। ওদের মধ্যে এতটুকু তেজ, জীবনের এতটুকু অশান্ত আগুন দেখলেও হয়ত কার্তিক শীলের এর থেকে বেশি ভাল লাগত। আর সব থেকে বেশি রাগ হয় নিজের গিন্নির দিকে চোখ পড়লে। মাথার চুলের চোদ্দ আনা শাদা, তারও আবার সাত আনা উঠে গেছে। তার মাঝখান দিয়ে ড্যাবডেবে সিঁদুরের সড়ক চলে গেছে যেন একটা। সাবাক্ষণ পুজো-আর্চা দেব-দেবীর ছবি নিয়েই আছে। যেন তারই পুণ্যের ফলে সংসারটা কোনোরকমে টিঁকে আছে, আর মানুষগুলো টিঁকে আছে। মুখে বলার সাহস নেই কিন্তু মনে মনে ওইরকম ভাবে।

কি কবে যে ক'বছর ধরে এই সংসারের কাঠামোটা দাঁড় করিয়ে বেখেছে কার্তিক শীল তা শুধু সে-ই জানে।

এই অভিশপ্ত যুগে যোগ্য প্রাণ এ সংসারে একটাই এসেছিল। কিন্তু তখন কার্তিক শীলের মত অন্ধও আর কেউ ছিল না বোধহয়...।

ফুটপাতের দেয়াল-দোকান, তেমন কোনো বাধা বা আইনের আওতায় পড়ে না। বেশি রাত পর্যন্ত খোলা রাখলে কেউ চোখ রাঙাতে আসে না। যে পাহারাদাররা টহল দেয, তাবা চেনা-মুখ। এসে দাঁড়ালে কার্তিক শীল একগাল হেসে তাদের আদর-আপ্যায়ন

করে। নিজের দোকান থেকে সিগারেট খাওয়ায়, পাশের দোকান থেকে পান এনে দেয়। বেশি চেনামুখ যাদের, তাদের গুষ্টিসুদ্ধ লোকের কুশল প্রশ্ন করে।

চৌরঙ্গী এলাকার অভিজাত রাস্তার মুখে এই দোকান। মুখে ঠিক নয় অবশ্য, গজ-বিশেক ভিতরে ঢুকে। সেই কারণেই এত সুবিধে, ঠিক মুখের ওপর বা সকলের চোখের ওপর হলে এত সুবিধে হত না বোধ হয়। বেশি রাতে এখানে খাস ভেতো-বাঙালীর যাতায়াত কম। তার চোখের ওপর জোড়ায় জোড়ায় যারা রাতের অভিসারে বেরোয় তাদের মধ্যেও বাঙালীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে না আছে এমন নয়। থাকলেও রাতের রসিকদের সব একরকমই চেহারা।

কার্তিক শীল দোকান করেছিল রাস্তার পাশের এক বিলিতি রেস্তোরাঁর পিছন দিকের দেয়ালের গায়ে ছ' ফুট বাই তিন ফুট একটা খুপরি নিয়ে। তখন বেসাতির সামগ্রী ছিল শুধু সৌখীন টর্চ, চকচকে ফোটো অ্যালবাম, ফোটো স্ট্যাণ্ড—এমনি গুটিকতক সখের বস্তু।

কিন্তু এ ক'বছরে দোকানের আয়তন বেড়েছে তিন গুণ, আর সেই অনুপাতে চটকও বেড়েছে। পাশের তিন-তিনটে খুপরি দেয়াল-দোকান উঠে গেছে। উঠে যে যাবে সেই গন্ধ কার্তিক শীল আগেই পেয়েছিল। আগে থেকেই কবকবে কিছু টাকা খরচ করে ওই জায়গাগুলো নিজের দখলে আনার ব্যবস্থা করে রেখেছিল সে।

এ দোকানের চেহারাই আলাদা এখন। দূরে দূরে এ রকম দোকান আরো দুই-একটা আছে। তাদের মালিকেরা এখন ঈর্ষার চোখে তাকায় শীলের দোকানের দিকে। ভাবে ছেষট্টি বছরের বুড়োটা কেরামতি দেখালে বটে। তবে বরাতের জোরও আছে। তিরিশ গজের মধ্যে ইংরেজী সিনেমা হল। অবাঙালী রসিক-রসিকার ভিড় লেগেই আছে। তাদের যাতায়াতের পথে প্রথমেই ওই দোকান—তাই ভিড় বেশি। তার ওপর যেমন রসিক বুড়োটা, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার। ছেলেমেয়েগুলো ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে ঠিক আটকে যায়। তাদের দোকানের দর পছন্দ হল না, কিন্তু উনিশ-বিশ ওই জিনিসই ওর ওখান থেকে বেশি দাম দিয়ে নিয়ে যায়, এমনও হামেশা দেখা যাচ্ছে।

রাস্তার শেষ মাথার দোকানের মালিক শিবলালের সঙ্গে ভাবসাব আছে কার্তিক শীলের। সে এসে সখেদে বলে, এই দোকান করে আর পেট চলে না দাদু, কিন্তু তোমার দিনকে-দিন চেকনাই বাড়ছে...

কার্তিক শীল হাসে। বলে, সব নসীব রে ভাই নসীব, ডবকা ছুঁড়ীগুলো সব বুড়োর এই সাদা চুল দেখে আঠার মত আটকে যায়, ছোড়াগুলো তখন আর করে কি, প্রাণের দায়ে পয়সা ছিটোয়—বাড়ির বুড়ী জানতে পারলে রোজ গঙ্গাচান করিয়ে তবে ঘরে ঢুকতে দিত।

মনে মনে ভাবে আর মনে মনে হাসে কার্তিক শীল। কথাটা মিথ্যে বলে নি খুব। বোকা বুড়ী যদি তার পয়সা রোজগারের সব খেলা টের পেত তাহলে তাকে গঙ্গাস্নান না করাক, ওই কোশাকুশি নিজের কপালে ঠুকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিত হয়ত।

এই বিষাক্ত যুগের বাতাস চিনেছে কার্তিক শীল। এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে

শিখেছে। শিখেছে বলেই গুষ্টিসুদ্ধ বেঁচে আছে আজও।

...হ্যাঁ, তাব দোকানের ঝকঝকে তকতকে জিনিসগুলো দেখলে পথের সৌখীন মেয়ে পুরুষগুলো দাঁড়ায় এখন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়—। ওরকম কত জোড়া দয়িত দয়িতার সঙ্গে যে মুখ-চেনা হয়েছে, ঠিক নেই। কিছু না কিনলেও ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে তারা হাসে, আর তাদের দ্বিগুণ হাসে কার্তিক শীল। যে জুটির পকেটের পয়সার খরচ রাখে, তাদের দেখলে টক করে সস্তার একটা ছবিটবি তুলে নিয়ে একগাল হেসে দোকান ছেড়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়ায়। পুরুষের হাতে সেটা গুঁজে দিয়ে বলে, টেক ইট বাবু, নো প্রাইস, ইওর লাভ উইল গ্রো, ম্যাডাম উইল বি মোর বিউটিফুল।

দোকান ফেলে আসার ব্যস্ততায় তক্ষুনি ছুটে চলে আসে আবার। রসিক বুড়োর কাণ্ড দেখে ওরা হাসতে হাসতে চলে যায়। পরে যখন আসে, দরকাবেব জিনিসের সঙ্গে অদরকারের জিনিসও কিছু না কিনে যাবে কোথায?

হাসে কার্তিক শীল। পদ্মা-পারে ক্লাস টেন পর্যন্ত পডা ইংরেজি বিদ্যা যে এমন কাজে লাগবে কে জানত। দোকান করার দৌলতে তো বাংলার থেকে ইংরেজিই বেশি বলতে হয়। এখন হিন্দী বললেও চলে, কিন্তু তাহলে ওদের দোকানের সঙ্গে আর তফাতটা থাকল কোথায়?

সব থেকে বড আপত্তি, খদ্দের কোনো একটা জিনিস চাইলে নেই বলতে। একটা 'নেই' বলতে হলে দোকানেব আধখানা জলুস মাটি যেন। না থাকলেও খুঁজে দেখার ভান করে, যেন খানিক আগেও ছিল। তারপর একটার বদলে সগোত্রীয পাঁচটা অন্য জিনিস চলে আসে। তার কথার চটকে পড়ে আইভরি ফিনিশড রাইটিং প্যাড কিনতে এসে আইভরি ফিনিশড ফোটো অ্যালবাম কিনে নিয়ে গেছে, এ রকম নজিরও বিরল নয়।

...কিন্তু শুধু জিনিসের চটকে আর কথার চটকে কাজ হলে ওই শিবলালেরাও দোকান তুলে দেবার কথা ভাবত না।

এ যুগের চাহিদার সুপটু যোগানদাবী চাই। আর সব চাহিদাই যে প্রকাশ্য চাহিদা হবে এমনও কথা নেই।

দোকানের সাজানো সামগ্রী এখন চোখ টানে, সেটা কার্তিক শীলও জানে। তার দেয়াল-দোকানে যা সাজানো থাকে, এখানকাব অন্য দোকানেও তার অভাব খুব নেই। টর্চ, অ্যালবাম, ফোটো স্যাণ্ড, ছোট ক্যামেরা, ফিল্ম-এর বিল, সিগার বক্স, নানা দেশের সিগারেটের প্যাকেট, টোবাকো, পাউচ, সিগারেট পাইপ, লাইটার, ফ্যান্সি কার্ড, পাঁচ মিশালি ছবির প্যাকেট, ঝকঝকে-তকতকে মলাট-বাহারের রোমাঞ্চকব ইংরেজি বই। এক দোকানে এত সব না থাক, এর অনেক কিছুই থাকে অন্য দোকানেও।

...খদ্দেরের ভিড তবু কার্তিক শীলের দোকানেই সব থেকে বেশি।

অপ্রকাশ্যে আরো কিছু রাখে কার্তিক শীল। সে সব অপ্রকাশ্য চাহিদার সামগ্রী, অপ্রকাশ্যেই রাখতে হয়। সে-খবর শুধু যে কেনে সে রাখে, আব যে বিক্রি করে, অর্থাৎ কার্তিক শীল রাখে।

এ সব পণ্যের খদ্দের বেশির ভাগই নৈশ অভিসারী-অভিসারিকার দল। তাদের ভদ্র ফিটফাট পোশাকের আড়ালে আর হাসিমুখের নিভৃতে যে চাহিদার আগুন জ্বলে, তার ইন্ধন যোগায় কার্তিক শীল। দামের পরোয়া করে না কেউ তখন, যে দাম চায় সেই দাম মেলে। বাড়তি কৃতজ্ঞতাও মেলে। ক্রেতার সঙ্গে বন্ধনযোগ দৃঢ় হয়।

চাহিদাব এই বৈচিত্র্যেবও কত রকমফেব, ঠিক নেই। ফিল্ম রীল কিনতে এসে এমন তৈরি ফিল্ম খোঁজে কেউ, গোপনতা ভিন্ন যাব অন্য দোসর নেই। কার্তিক শীল 'নেই' বলতে জানে না। ঘাড় নাড়ে। আছে। ফেলো কড়ি, তারপর যা দেব চুপিসারে পকেটে গোঁজো। পাঁচ-মিশালি ছবির প্যাকেট ঘাঁটতে-ঘাঁটতে খদ্দেব এমন চোখে তাকায় তাব দিকে, যাব অর্থ একমাত্র কার্তিক শীলই বোঝে। হাসি চেপে মুখখানা গম্ভীর করে তুলতে চেষ্টা করে সে। আছে সে রকম ছবিও। অনেক মেহেনত করে সংগ্রহ করতে হয়। অতএব ফেলো কড়ি, নিয়ে যাও। চটকদার বই ওলটাতে ওলটাতে অস্ফুট স্বরে এমন বইয়েব কথা জিজ্ঞাসা কবে যা প্রকাশ্যে রাখাব নয়।

...আছে বই কি। ফেলো কড়ি, পাবে।

সিগার-সিগারেট টোবাকোর নেশাই যে সব লোক করবে তার কি মানে? আরো অনেক...অনেক কড়া, অনেক মজাদার ধোঁয়ার নেশার অভাব নাকি দুনিয়ায়?

খদ্দের জানে সে অভাব মোচন কার্তিক শীলের দোকানে এলে হতে পারে।

...ফেলো কড়ি, কুড়োও যা চাও!

বিলিতি ছবি দেখে বেরিয়ে তৃষ্ণায় ছাতি শুকোয় কতজনার। সাদা জলের তৃষ্ণা নয়, রাঙা জলের তৃষ্ণা। কিন্তু ওই রাতে কে আর তৃষ্ণার সামগ্রী যোগাবার জন্য দোকান খুলে বসে থাকে? আইন গলা টিপে ধরবে না? কিন্তু তৃষ্ণায় ছাতি জুড়োবো কি করে ভালো মানুষগুলোর? তাবা আসবে হাসি হাসি মুখে, তাকাবে কার্তিক শীলের দিকে। তারপর চোখেব সামান্য একটু ইশারা করবে উল্টোদিকের পান সোডা লিমনেডের দোকানের দিকে।

মুচকি হেসে কার্তিক শীল হাত বাড়াবে। কড়ি গুনে নেবে। তারপব পানের দোকানের বিহারীকে হুকুম করবে 'সাবকে' ঠাণ্ডা লিমনেড বা ঠাণ্ডা সোডা দিতে।

এই বুদ্ধিটা কার্তিক শীলেব পবে মাথায় এসেছে। ইদানীং এরই থেকে লাভ বোধ হয় সব থেকে বেশি হচ্ছে। বিহারী পানঅলা মুনাফাব পরিমাণ দেখে এখন তদগত ভক্ত হয়ে উঠেছে কার্তিক শীলের।

আরো আছে। সময়েব সহজ প্রাপ্য অথচ অসময়ের দুষ্প্রাপ্য অনেক কিছুই রাখতে হয় তাকে। নৈশ অভিসারী-অভিসারিকার ভোগের স্থূল সরঞ্জাম কেবল যে সময়েই দরকার হবে তাব কি মানে? তাবা এসে দাঁড়ালে অস্ফুট বক্তব্য শোনার আগেই কার্তিক শীল বুঝতে পারে কি চাই। করকরে কড়ি গুনে কাঠের বাক্সে তোলে, জিনিস দেয়।

কিছুই 'নেই' বলতে প্রস্তুত নয় কার্তিক শীল। সব আছে, শুধু দরাজ হাতে কড়ি ফেলো। খদ্দেরকে নেই বলতে নেই।

দিনেব থেকে রাতেই তার বিপণীব আসর জমে ভাল। বিলিতি সিনেমার শেষ শো ভাঙা পর্যন্ত তাই মনেব আনন্দেই বসে থাকে সে। একটা দিনও আগে ঘরে

ফেবাব ইচ্ছে হয না। ঘবেব কথা মনে পডলে ববং মন-মেজাজ বিগডয তাব। ঘব ছেডে এখানেই থাকাব ব্যবস্থাটা কবে নিতে পাবলে মেজাজ এব থেকে অনেক ঠাণ্ডা থাকত। যে যুগটাকে এখনো আঁকডে আছে বাডিব মানুষগুলো, দেখলে মাথায বক্ত ওঠাব দাখিল হয তাব। যতক্ষণ দোকান নিযে থাকে ততক্ষণ শান্তি।

শেষ শো ভাঙল। কার্তিক শীল সোজা হযে বসল। সৌখীন মানুষেব সংখ্যা তেমন বেশি নয। বিকেলে কি একটা গণ্ডগোল হযে গেছে মযদানেব দিকে। হযত তাবই জেব। এই এক ঘণ্টাব ব্যাপাব লেগেই আছে—গণ্ডগোল কবে দুনিযা উদ্ধাব কববে সব।

অস্ফুট একটা কটূক্তি কবে উঠল কার্তিক শীল।

কযেক প্যাকেট সিগাবেট বিক্রি হল শুধু। ভিতবটা অসহিষ্ণু হযে উঠেছে। বাতেব এই খদ্দেবদেব ঠিক খদ্দেব বলে ধবে না কার্তিক শীল।

একটু বাদে বাস্তা ফাকা। আজ আব কিছু হলই না তা হলে।

হঠাৎ সচকিত হযে উঠল সে। চলন দেখে মন বুঝতে পাবে কার্তিক শীল। হাতে-হাতে শিকলি বেধে একটি জোডা আসছে এদিকে। মেযেটাকে দব থেকেই চিনতে পাবল। ফিবিঙ্গী মেযে। শুধু চেনা নয, অন্তবঙ্গভাবে চেনা। এযাবৎ অনেক দিন অনেক নতুন নতুন খদ্দেব ধবে নিযে এসেছে।

আবো এগিযে এলো কার্তিক শীল হাসি-হাসি মুখ কবে দেখছে। অভ্যর্থনাব জন্যে প্রস্তুত। ছেলেটা বেশ মদ গিলেছে, পা দুটো টলছে। সঙ্গিনীব হাতে হাত জডিযে একটা বিচ্ছিবি শিস দিতে দিতে দোকানেব সামনে এসে দাডাল।

কিন্তু—

কিন্তু অকস্মাৎ এ কি হল , দুনিযাব তামাম আলো কার্তিক শীলেব চোখেব সামনে হঠাৎ এমন দপ কবে জ্বলে উঠল কেন? সব জ্বলে যাবে, না সব অন্ধকাব হযে যাবে?

তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে দেখে নিতে চেষ্টা কবল কার্তিক শীল। কি চায তাবা, দোকানেব দিকে চেযে কি দেখছে তাবা, হাসি হাসি মুখে পিছনেব পান সোডাব দোকান দেখিযে সঙ্গিনী কি বলছে লোকটাকে—কার্তিক শীল জানে না। সে শুধু মানুষটাকেই দেখছে। থুতনিব কাছটা কাটা, কপালে একটা কাটা দাগ, গোল চোখ, কোকডা চুল, আধমযলা গাযেব বঙ, বছব চব্বিশ বযেস

কযেক মুহূর্তেব মধ্যে কযেক নিমেষেব মধ্যে একটা জীবনেব মিছিল বুঝি পাব হযে গেল কার্তিক শীলেব চোখেব সামনে দিযে।

পদ্মা-পাবে তেবো বছবেব একটা ছেলে, থুতনি কাটা, ওই বকম কপাল কাটা, আধমযলা বঙ, গোল চোখ, কোকডা চুল দুর্দান্ত দুবন্ত ছেলে, কুসঙ্গে মিশেছে 'পযসা চুবি কবে, পডাব বই-পত্র বেচে মিছে কথায দিনকে বাত বানায—লোকেব নালিশে অতিষ্ঠ হযে কতদিন ওই ঘুমন্ত ছেলেকে টেনে তুলেও মেবে আধমবা কবেছে কার্তিক শীল। ওব মা পর্যন্ত দিনেব মধ্যে কতবাব মবতে বলে ওকে ঠিক নেই। তেব বছবেব

সেই ছেলে পাশেব বাড়িব ন'বছবেব একটা মেয়েকে ভব-সন্ধ্যায ছলে-বলে টেনে নিযে গেছ্ল পুকুব পাবেব ঝোপেব ধাবে। মেয়েটাব ভীত চেচামেচিতে ধবাও পড়েছিল। ..আব খুন চেপেছিল কার্তিক শীলেব মাথায। সর্বাঙ্গে বক্ত মেখে আর্তনাদ কবতে কবতে মবণ-ছোটা ছুটেছিল ছেলেটা।

আব ফেবে নি।

দীর্ঘকাল কার্তিক শীল তাকে খোঁজেও নি।

কিন্তু মনে মনে খুঁজেছিল কালেব অভিশাপে জীবন নিঃশেষেব মুখে এসে দাড়াতে। তখন অনুশোচনা হযেছে। সেই অনুশোচনা মনেব তলায লেগেই আছে। সে ভুল কবেছে। এমন ভুল কেউ কবে না। যুগেব যোগ্য সন্তান এসেছিল তাব ঘবে। এ দুযোগে হাল ধবাব যোগ্যতা নিযে এসেছিল। কিন্তু কার্তিক শীল তখন চেনে নি, তখন বোঝে নি। এই অভিশপ্ত দিনেব খেযা শুধু সে ই পাবত পাব কবে দিতে। তাকে আবাব পাওযাব কল্পনায কতবাব দু'হাত বাড়িযেছে সে. পেলে আগলে বাখবে—নিজেব অন্যায আব নির্বুদ্ধিতা স্বীকাব কববে।

ঘোবালো পাবালো চোখে কার্তিক শীল তাকালো সঙ্গিনীব বাহুলগ্ন পুরুষেব দিকে। ভিতবেব স্নাযুগুলোতে সব হঠাৎ কি কাণ্ড শুরু হযেছে বুঝে উঠছে না। কি চাইছে তাবা. কি খুঁজছে, কি বলছে. কিছুই কানে ঢুকছে না। লোকটাকে মেযেটা লালা বলে ডাকল, তাও না। শুধু অনুভূতিব দুটো জ্বলজ্বলে চোখ মেলে দেখছে তাকে কার্তিক শীল।

. কেমন হত সে ই ছেলে আজ ফিবে এলে। মিল কতটা আছে. চোখে পড়ছে না। ঠিক এই হত, ঠিক এইবকমই হত। যা হত তাই দেখছে, হবত তাকেই যেন দেখছে কার্তিক শীল। সামনে বুঝি সে ই এসে দাড়িযেছে।

লোকটা অশ্লীল গালাগাল কবে উঠল একটা। বিবক্ত হযে ইশাবা ছেড়ে মেযেটা স্পষ্ট কবেই জানালো কি চাই। জিজ্ঞাসা কবল, আছে?

বিক্ষিপ্ত স্নাযুগুলো একত্র কবাব তাড়নায দোকান ছেড়ে নেমে দাড়াল কার্তিক শীল। চোখ দুটো শলাব মত লোকটাব মুখে বিধে আছে। হাটু দুটো কাপছে, বক্ত উঠছে মাথাব দিকে

—নেই।

এবকম জবাব আশা কবে নি মেযেটা। ওই জাতীয আব একটি সামগ্রীব নাম কবল।—আছে?

—নেই।

বিবক্ত হযে লোকটা এবাবে পিছন ফিবে পানেব দোকানটা দেখল এবাব। সঙ্গিনীব কাছে ও-দিকেব সামগ্রীব আশ্বাসও পেযেছিল বোধহয। চটুল ইশাবায এবাবে সে জিজ্ঞাসা কবল—আছে?·

—নেই নেই নেই। কিছু নেই। নাথিং। গেট আউট। গেট আউট। বদ ছেলে কোথাকাব—মেবে তোমাব আমি হাড গুঁড়িযে দেব—নিকালো হিযাসে—গেট আউট, গেট আউট।

তারস্বরের সেই ক্ষিপ্ত গর্জন শুনে নেশা চটে গেল লোকটার। সঙ্গিনীর হাত ধরে দশ হাত দূরে ছিটকে সরে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। আর সেই নৈশ-চিৎকারে চকিত হয়ে ওধারের দোকান থেকে শিবলাল ছুটে এলো, বিহারী দোকান ছেড়ে এগিয়ে এলো, মোড়ের কাছ থেকে কয়েকজন অচেনা লোকও এদিকে দৌড়লো।

চোখের সামনে চাপ চাপ অন্ধকার, দোকান ধরে সামলাতে চেষ্টা করেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না কার্তিক শীল। ফুটপাতের উপরেই বসে পড়ল, তারপর শুয়ে পড়ল।

...কারা তাকে ধরে আছে, ঠাওর করতে পারছে না কার্তিক শীল। দু' চোখের সমস্ত আকৃতি ঢেলে সে তাদের কিছু বোঝাতে চাইছে।

...হাড়-বার-করা আধমরা তিন-তিনটে ছেলে জীবন-যুদ্ধে ধুঁকছে যেখানে, আর, সাত-আনা চুল-ওঠা মাথায় সিঁদুর লেপে চিলতে খুপরিতে এক বুড়ী বসে তার ঠাকুরের পায়ে মাথা খুঁড়ছে যেখানে—সেখানে—আড়াই মাইল দূরের সেই এক বস্তি-ঘরে ফিরে যেতে চায় সে—তার বোবা চোখে শুধু সেই আকৃতি।

কার্তিক শীল আর একবার শুধু সেখানেই ফিরে যেতে চায়। এ জীবনে আর কিছুই চায় না সে।

শিকার

অন্ধকারে বিহারীলালের চোখও বিড়ালের মতই জ্বলে। যারা দেখেছে তারা বলে। যারা দেখে নি তারাও বলে। সামনে বা আড়ালে বিহারীলালকে নিয়ে কম বলাবলি হয় না।

বড়বাবুর পরেই পদমর্যাদা। বড়বাবু অর্থাৎ থানার ও. সি. বা ইনসপেক্টর। বিহারীলাল সব-ইনসপেক্টর। ছিল কি? প্রথমে লিটারারি কনস্টেবল, তারপর অ্যাসিসট্যান্ট সব-ইনসপেক্টর, আর তারপরে দেখতে দেখতে এই। আরো দুজন সব-ইনসপেক্টর আছেন থানায়। তাঁরা বয়সে প্রবীণ এবং চাকুরিতে সিনিয়র হলেও মনে মনে শঙ্কিত। যে রেট-এ টপকে আসছে, খুব নিশ্চিন্ত থাকার কারণ নেই।

বড়বাবুর মাথার তিনভাগ চুল সাদা। তার তেমন ভয় নেই। তবু হালকা টিপ্পনী কাটেন মাঝে মাঝে, মুখখানা দেখো একবার, যেন দুনিয়াসুদ্ধ লোক অপরাধী—এই এলাকার সবগুলো লোককে থানায় এনে পুরতে পারলে বোধ হয় বিহারীলালের সব থেকে বেশি আনন্দ, কি বলো?

বিহারীলাল বলে না কিছু। হাসে একটু, বা চেষ্টা করে হাসতে। তারপর দিনগত রিপোর্ট লিখতে বসে যায়।

প্রৌঢ় সহকর্মী দুজনও ঠাট্টার ছলে নিজেদের জ্বালা জুড়োন একটু। একে অন্যকে লক্ষ্য করে বলেন, গোঁড়া হিন্দু জাত খোয়ালে কি হয়? পরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, ওই—! অর্থাৎ বিহারীলাল হয়। অর্থাৎ অমনি মায়া-দয়াশূন্য হয়।

আরো মন দিয়ে রিপোর্ট লেখে বিহারীলাল। আর আড়ালে যা বলেন তারা, স্বকর্ণে

না শুনুক, কানে আসে। বলেন, এই করেই কয়লার কালি উঠবে ভেবেছে, নিজে কোন আস্তাকুড়ে ছিলি মনে নেই।

সব ক'টা শ্লেষের পিছনেই একটু ইতিহাস আছে।

বিহারীলাল বাঙালী নয়। কিন্তু এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলার বাইরে কখনো পা ফেলেছে বলেও মনে পড়ে না। কোথা থেকে কেমন করে একদিন শহরের সেই নারকীয় আশ্রয়ে ভেসে এসেছিল জানে না। কেমন করেই বা সেই নিদারুণ অভাব অনটন অনাচারের মধ্যে পাচ থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত নির্বিকারে একটানা কাটিয়ে দিল, সেও এক বিস্ময়। আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল যখন বি-এ পড়ে। স্কুলে থাকতেই ছেলে পড়িয়ে পড়া চালাত। নিজের মাইনে লাগত না। যা পেত প্রতিষ্ঠান কর্তাদের হাতে তুলে দিত। নইলে তারা পড়তেই বা দেবে কেন, খেতেই বা দেবে কেন? কঠোর বিধিব্যবস্থার মধ্যে সেখানে পড়াশুনা শুরু করতে হত সকল শিশুকেই। কিন্তু সে অধ্যায় আবার শেষও হত দু'চার বছরের মধ্যেই। বিহারীলালের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছিল। কেন, নিজেও জানে না। চেষ্টা? অধ্যবসায়? কিছু না, কিচ্ছু না। যে কোনোদিন শেষ হতে পারত। হয় নি এই পর্যন্ত...।

সেই আশ্রয়ের স্মৃতি কিছু মনে নেই বিহারীলালের? আছে বই কি। তার অনেক সতীর্থ আজ ওরই কর্মতৎপরতায় জেল খাটছে। প্রতিষ্ঠান-কর্তাদেরও দুই-একজনকে টেনে এনেছে। অসহায় বিস্ময়ে তারা একদা তাদেরই আশ্রিত এই পাথর মূর্তিটি দেখেছে চেয়ে চেয়ে।

সুখস্মৃতি কিছু? না। ওখানে সুখও ছিল না কিছু, দুঃখও না। সুখ-দুঃখ বোধের বালাই নিয়ে ও-জায়গায় কারো টেঁকা সম্ভব নয়। তবু এরই মধ্যে এক বুড়ীকে ধোঁয়া-ধোয়া মনে পড়ে বিহারীলালের। স্কুলের উঁচু ক্লাসেই পড়ত তখন। খুব অসুখ হয়েছিল। বেদম জ্বর। ওই বুড়ী আসত। জলবাতাস করত। ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বসত। একদিন তার কোলে মুখ গুজে কেঁদেওছিল বিহারীলাল, মনে আছে। থাকবেই বা না কেন, কান্নাকাটি আবার করে করেছে তারা? সেই বুড়ীও তারই মত আশ্রিত। কিন্তু ভাল হয়ে আর খুব বেশিদিন দেখে নি তাকে।

বিহারীলালের আশ্রয়চ্যুতির কারণ এমন কিছু নয়। ইচ্ছেমত প্রতিষ্ঠানের হিসেবপত্র মিলানো চলছিল তাকে দিয়ে। সেই থেকেই অমিল। বিহারীলাল মুখে তেমন প্রতিবাদ কখনো করে নি। তবু কেমন করে যেন বুঝেছিল কর্তাবাবুরা, নিজেদের নিরাপত্তার কারণে ওকে সরানো দরকার। বিহারীলাল নির্বিবাদেই চলে এসেছিল।

তারপর চাকরির অধ্যায়। সেও আজ দশ বছর হয়ে গেল...।

চুপচাপ বসে থাকে যখন, অনেকে ফিসফিস করে। বলে, এই রেট-এ এগোলে কবে পর্যন্ত কমিশনার হবে ভাবছে। কখনো বলে, তা নয়, নতুন কিছু জাল ফেলার মতলব আঁটছে। কিছুদিন আগে বড়বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে একবার এই নিয়ে বেশ খানিকটা হাসি-ঠাট্টার খোরাক জুগিয়েছে বিহারীলাল। পথের ধারের একটা গাছতলায় দুটি ভিখারীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নাকি। তাদের বয়েস? বড়বাবুর মতে ষাটের কম নয়। স্ত্রীলোকটি মাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল, আর পুরুষটি বিশ্রাম করছিল

তাব কোলে শুযে। স্ত্রীলোকটি পাকা চুল তুলছিল পুরুষটিব মাথা থেকে আব দুজনেই হাসাহাসি কবছিল। বডবাবু বলেন, তাই দেখেই পা-দুটো একেবাবে মাটিব সঙ্গে আটকে গিযেছিল বিহাবীলালেব। ঘডি ধবে পুবো দশ মিনিট তিনি দূবে দাডিযে অপেক্ষা কবেছেন, কিন্তু বিহাবীলালেব হুঁশ নেই। শেষে কাছে এসে বলেছেন, চোখেব মধ্যে তো আব এক্সবেব ব্যবস্থা বসানো নেই তোমাব, শুধু ওটুকু দিতেই কার্পণ্য কবেছেন ভগবান। কতক্ষণ আব দাডিযে থাকবে, ও দুটোকে নিযে হাজতে পুবে একেবাবে নিশ্চিন্ত হযে এসো, আমি না হয দাডাই ততক্ষণ।

এ হেন বিহাবীলালকে দেখে সকলেই সেদিন আচ কবলে, নতুন শিকাবেব সন্ধান পেযেছে।

মিথ্যে নয, পেযেছে।

থানাব থেকে বেশ খানিকটা দূবে হলেও থানা এলাকাব মধ্যে পডে বস্তিটা। বস্তিব মাতব্বব কানাই দাসেব সঙ্গে কি কবে যোগাযোগ ঘটেছিল বিহাবীলালেব তাবাই জানে দুখানা বিকশ'ব মালিক কানাই দাস। লোক বেখে বিকশ খাটায সকাল দুপুব বিকেল বাত্তিব। ইচ্ছে কবলে কানাই দাস পাকা বাডিতে থাকতে পাবে এখন। অন্তত তাই ধাবণা বস্তিবাসীদেব। কিন্তু এতকাল এখানেই কাটিযেছে এখানেই কাটাচ্ছে। বছব চল্লিশ বযেস, দিব্বি হৃষ্টপুষ্ট। বস্তিব সকলে ওকে মাতব্বব মানে এমন নয। বড ঘব, বহু বাসিন্দা, যে যাব নিজেব মতে থাকে। তবু এবই মধ্যে যতটা সম্ভব নিজেকে জাহিব কবে চলে কানাই দাস। মনে মনে সেটা খুব পছন্দ না কবলেও সামনাসামনি কেউ লাগতে আসে না বড। আপদেবিপদে দু'পাচ টাকা ধাবধোব পাওযা যায, তাছাডা লোকটাব হাতে দু'চাবটে ষণ্ডামাকা চেলাচামুণ্ডা আছে বলে গুজব। অতএব বস্তিতে তাব প্রতিপত্তি মন্দ নয।

কানাই দাসেব কেন এত বাগ বিনোদিনাব ওপব সঠিক কেউ জানে না। তবে মনে মনে আচ কবে অনেকে। আডালে আবডালে বসালো আলোচনাও কবে। কানাই দাসেব মত মক্কেলকেও বিনোদিনী আমল দেয নি যখন, তাহলে দিযেছে যাকে সে লোকটা বড বেশি শাসালো না জানি। কিন্তু বস্তিব ভালমন্দে কানাই দাসেব দাযিত্ব আছে একটা। তাই দুই একজন ঋণানুগ্রহীতকে নিযে খোলাখুলি সে বিনোদিনীকে সমঝে দিতে এসেছিল একবাব। চুপ-চাপ দাডিযে বিনোদিনী প্রথমে তাদেব বক্তব্য বা অভিযোগ শুনেছিল। বেশ দেখাচ্ছিল তখন তাকে যাবা এসেছিল তাবাও অস্বীকাব কবতে পাববে না। তিবিশেব ওধাবে হলে হবে কি, ঝি-গিবি কি আব সাধে ছেডেছে। নিজেব দব বুঝেই ছেডেছে। আগে বুঝলে আবো অনেক আগে ছাডত। যাই হোক, কানাই দাসেব নীতিকথা শেষ হতে না হতে তাব মুখ খুলল যখন সে এক ভিন্ন মূর্তি। স সঙ্গী সমুখ থেকে পালিযে বেচেছিল কানাই দাস।

অভিযোগ বিহাবীলালেব কানে সে-ই তুলেছিল। বস্তিবাসীবা গবীব হলেও নীতি মানে—কিন্তু চোখেব ওপব এমন দুর্নীতি চললে ছেলেপুলে নিযে সকলে ঘব কবে কি কবে? বস্তিব হাওযা বিষিযে দিচ্ছে ওই—

একটা অশ্লীল শব্দ ঠোটে এনেও গিলে ফেলেছিল কানাই দাস।

বিহাবীলাল সবিস্তাবে শুনেছে। কানাই দাসেব ভেতবটা দেখতে পায নি বা তাব ক্ষোভেব হেতু আঁচ কবে নি, ভাবলে ভুল হবে। কিন্তু তাতে কিছু যায আসে না। বিহাবীলালেব মুখভাব নির্বিকাব। কাঁটা দিযে কাটা তোলাব বীতি আছে সকল শাস্ত্রে। খববটা কে দিচ্ছে সে প্রশ্ন অবাস্তব। আপাতত খববটা পাকা হলেই হল।

কানাই দাসেব উৎসাহ বাডে। পাকা বলে পাকা, একেবাবে তালপাকা খবব। প্রায প্রত্যেক শনি-ববিবাবেই আসে ওই লোকটা, কাডি কাডি টাকা দিযে যায, নইলে ওই মাগি—মানে—ইযে—মেযেলোকটাব অমন পটেব বিবিটিব মত বসে চলে কি কবে বুঝছেনই তো স্যাব।

বিহাবীলাল ঘাড নেডে জানায, বুঝেছে আব সতর্ক কবে দেয, প্রতিকাব কিছু চায তো আপাতত মুখ একেবাবে সেলাই কবে থাকে যেন।

—তা আব বলতে স্যাব, কাক-পক্ষীও জানবে না, এ কি আব ঢাক পিটোনাব জিনিস। কানাই দাস বিনযাপ্লুত।

সেই শনিবাবই সাদা পোশাকে তিনজন সঙ্গী নিযে বস্তিতে গিযে হানা দিল বিহাবীলাল। একেবাবে সবাসবি নয। খানিক দূবে বিপবীত দিকেব একটা দোকানেব দাওযায বসে বস্তিব লোকদেব আনাগোনা লক্ষ্য কবল প্রায ঘন্টাখানেক ধবে। সঙ্গীবা কিছু দূবে মোডেব আডালে ট্যাকে বসে। আজ আবাব কোন বেচাবাব অমোঘ দুর্ভাগ্যেব লিখন পডেছে কপালে, বিবস বদনে সেই আলোচনা কবছিল তাবা দুটো পযসা বোজগাব কবে চলে আসবে, এব সঙ্গে কেবলে তো সেই আশায ছাই।

বিহাবীলাল একেব পব এক সিগাবেট খাচ্ছে আব দেখছে কিন্তু দেখবেই বা কি আব বুঝবেই বা কি। মুখ তো চেনে না। নামটা শুনেছিল কানাই দাসেব মুখে। কানাই দাস নাম জানলে কি হবে চেনে না প্রাণেব দাযে চেনে থাকবে। কিন্তু বিহাবীলাল আশা কবছিল মুখ দেখলে চিনবে মুখ দেখে চেনা অভ্যাস আছে তাব। ধোপদুবস্ত দু'পাঁচজন ঢুকেছে বটে কিন্তু বাতেব ঘোলাটে আলোয ঠাওব কবা যায নি ঠিক।

ভিতবে ভিতবে একটু অসহিষ্ণু হযে উঠেছে বিহাবীলাল। শেষে সিগাবেটটা ছুঁডে ফেলে ঘডি দেখল। বাত ন'টা বেজে গেছে শিকাবে এসে তোলা হাতে ফিবে যাওযা কোষ্ঠীতে লেখে নি পা ঝেডে উঠে দাডাল। এগিযে গিযে সঙ্গীদেব ডাকল ইশাবায। তাবপব গট গট কবে ঢুকে পডল বস্তিব মধ্যে

বস্তিবাসীবা সচকিত, বিমূঢ। অস্ফুট গুঞ্জন উঠল একটা বস্তিময। খোজ কবাব আগেই কানাই দাস হন্তদন্ত হযে এগিযে দু'হাত জুডে ফিসফিস কবে আপ্যাযন জানালো, গুড নাইট স্যাব। আপনি এসে গেছেন, এক মিনিট স্যাব জাস্ট ওযান মিনিট।

চট কবে আডাল হযে গেল। ফিবে এলো তক্ষুনি। উত্তেজিত, উদ্ভাসিত। বলল, ঘবেব দবজা বন্ধ স্যাব। ভালো দিনে এসেছেন মনে হচ্ছে, নিশ্চয শা—মানে—ওই শালিকবাবু এসে গেছে, একেবাবে হাতে-নাতে ধবা যাবে, আসুন স্যাব—।

সে অগ্রসব হল। স-সঙ্গী বিহাবীলাল অনুসবণ কবল। আবছা অন্ধকাব, উঠোনে ছেলে বুডো মেযে পুরুষ ভীতত্রস্ত।

উঠোন পেরিয়ে দেড় হাত চওড়া একটুখানি গলি হাতড়ে ঘরের প্রবেশপথ। কানাই দাস বিহারীলালের একখানা হাত ধরে অন্য দিকে আকর্ষণ করল। চাপা গলায় বলল, ওরা ওদিক দিয়ে দরজা ধাক্কাবে'খন, আপনি এদিকে আসুন স্যার।

ইশারায় সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়ে বিহারীলাল কানাই দাসের সঙ্গে ঘরের অন্যদিকের দেওয়ালের অন্ধকারে মিশে গেল। মাটির দেওয়ালের কোণের দিকে বাঁশের বাতা সরানো রন্ধ্র একটা। চালা থেকে খড় ঝুলে পড়ায় বাইরে থেকে এমন কি ভিতর থেকেও হয়তো চোখে পড়ে না সেটা। ওটা আপনি হয় নি বোঝা যায়।

কানাই দাসই রন্ধ্রপথে চোখ লাগাল প্রথম। তাবপরেই হতাশ বিস্ময়। অস্ফুট কটূক্তি সামলে উঠতে পারল না এবারে।—এঃ, শালা আজ আসে নি দেখছি।

ওকে ঠেলে সরিয়ে বিহারীলাল ততক্ষণে রন্ধ্রপথে চোখ দিয়েছে।

কাঁধ উঁচু একটা থালায ডাল দিয়ে এক কাঁড়ি ভাত মেখে তরকারী সহযোগে বিনোদিনী নিজের হাতে দুটি ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছে। একজনেব বয়েস বছর দশ, আর একজনের বারো-তেরো। ছেলে দুটি খুশী মেজাজে খাচ্ছে, আর বিনোদিনী খুশী মেজাজে খাইয়ে দিচ্ছে।

দেখছে বিহারীলাল।—পবনে ময়লা শাড়ি, একটু মোটাব দিক ঘেঁষা আঁটসাঁট গডন, মুখশ্রী মন্দ নয় বটে। গরাস গবাস ভাত চালান দিচ্ছে একবার এব মুখে আব একবার ওর মুখে। আর প্রসন্ন বদনে অনর্গল বলে চলেছে কি। ঠিক কানে আসছে না বিহারীলালের, চেষ্টাও কবছে না।

তার এই দেখার একাগ্রতা দেখে অন্ধকারে মুখ টিপে হাসছে কানাই দাস।

ওদিকের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল খটখট করে।

রন্ধ্রপথে চোখ রেখে বিহারীলাল ভুরু কোঁচকালো। ছেলেদের খাওয়ায আর বিনোদিনীর খাওয়ানোয় ছেদ পড়ে গেল। ছেলে দুটি ভাতের গরাস মুখে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দরজার দিকে। বিনোদিনীও।...ঈষৎ বিস্ময়, ভ্রূদ্বয়ে কুঞ্চন রেখা।—কে?

জবাবে আবার খটাখট কড়া নাড়াব শব্দ।

একটা ত্রস্তভাব ঘরের মধ্যে। বড বড় ক'টা ভাতের গরাস বিনোদিনী প্রায় জোর করেই গুঁজে দিল ছেলে দুটোর মুখে। থমকে গেল এব পরেই। থালায় অনেকটা অবশিষ্ট এখনো।

ঠক ঠক ঠক ঠক!

খুলছি—।

বিহারীলাল দেখছে, মিষ্টি গলায় জবাব পাঠিয়ে খপ করে ভাতের কাঁসারিটা তুলে বড় ছেলেটার হাতে দিল বিনোদিনী। পাশের ঘটি থেকে উচ্ছিষ্ট জায়গায় একটু জল ছিটিয়ে হাতে করে মুছে নিল জায়গাটা। পরে ঘটিটা ছোট ছেলেটার হাতে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি পিছনের দিকের দরজার শিকল খুলে দিল। কাঁসারি হাতে এবং ঘটি হাতে যেন তস্করের তৎপরতায় নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ছেলে দুটো। বিনোদিনী দরজা বন্ধ করল আবার।

এবারে আরো জোরে নড়ে উঠল দরজার কড়া।

খুলছি, খুলছি!

কণ্ঠস্বরে সস্নেহ অনুযোগ ঝরল যেন, যার অর্থ, থামো না বাপু, দু' মিনিট আর সবুর সয় না?

ঊর্ধ্বাঙ্গে বসন ছিল না, তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা টেনে পরে নিল। ক্ষিপ্র হাতে বদলে নিল ময়লা শাড়িটাও। দেওয়ালের আয়নার তাক থেকে চট কবে স্নো-পাউডার ঘষে নিল একটু। মাথায় চিরুনি বুলিয়ে দিল দুই একবাব। এক মুহূর্ত থেমে আয়নায় প্রসাধনটুকু পরীক্ষা কবে নিযে ঠোঁটে হাসির আভাস এনে এগিয়ে গেল দরজা খুলতে।

রন্ধ্র থেকে চোখ তুলে নিল বিহাবীলাল। কানাই দাস সবে দাঁড়াল। বিহারীলাল এগিয়ে এলো।

উঠোনে একগাদা মেয়ে-পুরুষের রুদ্ধ ও সশঙ্ক প্রতীক্ষা।

দবজা খুলেই একেবারে হকচকিযে গেল বিনোদিনী। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বইল শুধু। মুখে রক্ত নেই যেন। সঙ্গীদেব ঠেলে বিহারীলাল এগিযে এলো মুখোমুখি। দেখল নিরীক্ষণ কবে। নির্বিকাব, নিবাসক্ত।

তোমাব নাম বিনোদিনী?

বোবা মুখে ঘাড় নাড়ল।

একজনেব নাম কবে আবার একটা পরুষ প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হল, ওই নামেব কেউ আসে এখানে?

জবাব নেই।

আসে—?

কণ্ঠস্বব যেন গুরু-গুরু মেঘের ডাক।

ঘাড় নাড়ল, আসে।

কতকাল চলছে এই ব্যবসা?

জবাব নেই।

ওই ছেলে দুটো কে?

না বুঝে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বইল বিনোদিনী।

ঘরে ভাত খাচ্ছিল ছেলে দুটি কে?

অস্ফুট জবাব দিল, একজন ছেলে।

অন্য জন?

ভাগ্নে।

দু'চার মুহূর্ত। চেয়ে আছে বিহারীলাল। খর বিশ্লেষণী দুই চোখ।—একবার আসতে হবে সঙ্গে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরতে পারবে।

শিকার-সহ উঠোনে এসে দাঁড়াতেই উঠোন ফাঁকা হয়ে গেল প্রায়। মেয়ে-পুরুষেরা জড়সড় হয়ে মাটির ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মিশে গেল। বিনোদিনীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো তারা। বিহারীলাল থমকে দাঁড়াল একটু। ইঙ্গিতে ওকে ট্রাকে তুলতে বলে ভেতরে ঢুকল আবার।

বস্তির সমস্ত মেয়ে পুরুষ ততক্ষণে আবার উঠোনে ভেঙে পড়েছে। কলকোলাহল

উঠেছে একটা। বিহারীলালকে দেখেই হকচকিয়ে থেমে গেল। বিগলিত-বদন কানাই দাস সামনে এগিয়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে। খুশীতে উপচে উঠেছে।—খুঁজছেন স্যার?

বিহারীলাল ঘাড় নাড়ল। পরে আচমকা প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল গালে। তিন হাত ছিটকে গিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল কানাই দাস। গটগট করে বিহারীলাল বেরিয়ে গেল আবার।

ট্রাক চলেছে থানার দিকে। ভয়ার্ত নারীমূর্তি ট্রাকের এক কোণে মিশে আছে।

চাপা আনন্দে বিহ্বল হয়ে সিগারেট টানছে বিহারীলাল। চোখমুখ ঝকঝক করছে। একটা অন্তর্মুখী আনন্দে বিভোর যেন।

দেখে সঙ্গীরা গা-টেপাটেপি করছে নিঃশব্দে। অর্থাৎ কি এমন শিকার ধরেছে রে বাবা! নিয়ে গিয়েই তো খালাস দিতে বাধ্য—অথচ মুখখানা করেছে যেন থানায় যেতে না যেতে রাজভোগের মত মস্ত একটা প্রমোশন মুখের সামনে এগিয়ে আসবে। বড়বাবু বলেন মিথ্যে নয়, দেশসুদ্ধ লোককে গারদে এনে পুরতে পারলেই খুশীতে ডগমগ, আর কিছু চায় না।

তন্ময় আনন্দে নতুন সিগারেট ধরালো বিহারীলাল। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে বিবর্ণ পাংশু নারীমূর্তির দিকে। খুশীতে জ্বলজ্বল করছে গোটা মুখ। ওই ছেলে দুটোকে ভাত খাওয়ানোর দৃশ্যটা চোখে ভাসছে আর আত্মতুষ্টিতে বিভোর হয়ে উঠেছে। যেমন বিভোর হয় বাল্যের রোগশয্যায় সেই বুড়ীর কথা মনে হলে, যেমন হয়েছিল গাছতলার সেই বুড়োবুড়ীকে দেখে।

মনের আনন্দে ভাবছে বিহারীলাল, শুধু এদেশেই সম্ভবত একদিন আর জেলখানা থাকবে না একটাও

নির্বাচন

ছোট বাড়ি। বাড়িতে ছোট বড় অনেকগুলো ঘড়ি। বড় ঘড়িগুলো বাজে। ছোট ঘড়ি ক'টা শুধু টিকটিক করে। কিন্তু বাজুক আর টিকটিক করুক—সবক'টা ঘড়িতে সময়ের একই সংকেত মিলবে। তারতম্য ঘটলে ঘড়ির মালিকের চোখ এড়াবে না। তক্ষুনি সেটা টেনে নিয়ে তিনি তার অস্ত্রতন্ত্র খুলে বসবেন।

সকাল সাতটা বেজে সতের। সামনের দেয়ালঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বিরক্ত মুখে নারায়ণ দিক্ষিত আবার ঘড়ির ক্যাটালগ ওলটাতে লাগলেন।

সিঁড়িতে ব্যস্তসমস্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। নারায়ণ দিক্ষিতের ভুরুর মাঝে গোটাকয়েক কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। দ্বিধান্বিত পায়ে যে লোকটি আগে আগে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি হেড কাবিগর শিবনাথ পণ্ডিত। আধময়লা জামা কাপড়, একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মুখখানা অপরাধী-অপরাধী। তাঁর পিছনে তার মেয়ে কমলা। তারও আটপৌরে বেশবাস, তবে পরিচ্ছন্ন। বছর উনিশ কুড়ি বয়েস, রূপসী কিছু নয়, মুখখানা কমনীয়। আর স্বাস্থ্যটিও ভাল।

বাপ মেয়ে দুজনেরই বিব্রত মুখ, দুজনেরই দৃষ্টি আগে দেয়ালঘড়ির ওপর গিয়ে পড়ল। নারায়ণ দিক্ষিত মুখ তুললেন, তাদের দিকে নয়, ঘড়ির দিকে।

মুখ কাঁচুমাচু করে শিবনাথ পণ্ডিত বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল, বাসের ভিড়—

কমলা এগিয়ে এসে ততক্ষণে পায়ের ধুলো নিয়েছে। সে আশা নিয়ে এসেছে কিন্তু মুখে আশঙ্কার ছাপ।

বোসো। ক্যাটালগ একধারে সরিয়ে রাখলেন নারায়ণ দিক্ষিত। মেয়েটির দিকেই তাকালেন, পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে দিলেন একবার। শিবু পণ্ডিতের মনে হল অনেকটা এমনিধারা সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়েই যেন কর্তা ঘড়ির কলকবজা পরীক্ষা করে থাকেন। পাছে গলদ কিছু চোখে পড়ে সেই আশঙ্কায় প্রভুর দৃষ্টি দিয়েই কন্যাকে দেখতে চেষ্টা করলেন তিনিও।

নারায়ণ দিক্ষিত বললেন, বাসের ভিড়ের জন্য তাহলে পরীক্ষার হলেও সতের মিনিট পরে পৌঁছুনো চলতে পারে?

বাপ মেয়ে দুজনেরই মুখ শুকলো। শিবু পণ্ডিত আমতা আমতা করে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মনিবের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে ভরসা করে কিছু বলে উঠতে পারলেন না।

নারায়ণ দিক্ষিত মেয়েটির দিকে হাত বাড়ালেন। কমলার হাতে লম্বা খাম একটা, ভয়ে ভয়ে সে সেটা তাঁর হাতে দিল। এবারই যেন আসল পরীক্ষা।

খামের মধ্যে রিপোর্ট একটা। বি. এ-র টেস্ট পরীক্ষার রিপোর্ট। কলেজ থেকে দেয় না, প্রিন্সিপালকে ধরে কমলাকে এটা সংগ্রহ করতে হয়। আই. এ. পরীক্ষার আগেও করতে হয়েছিল।

নারায়ণ দিক্ষিত রিপোর্টটা খুটিয়ে দেখতে লাগলেন। নম্বর দেখে খুশী হলেন না। বললেন, ফাইন্যালের ফীস দিয়ে লাভ কি, পাস করতে পারবে? ইংরেজী আর হিন্দী দুয়েতেই তো খাসা নম্বর দেখছি। এরকম হল কেন?

মেয়ের হয়ে বাপই জবাব দিতে চেষ্টা করলেন, বললেন, দেখাবার শোনাবার লোক নেই, তার ওপর সংসারের এই খাটুনি—

তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি?

শিবু পণ্ডিত চুপ। মনিবের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আবার মেয়ের দিকে। মেয়েও মাথা নীচু করে রইল, পরীক্ষা কেন খারাপ হয়েছে কোনো কৈফিয়ত দিল না।

এই বিব্রত নীরবতাই পছন্দ করলেন নারায়ণ দিক্ষিত। উঠে দেরাজ খুলে দুটো একশ টাকার নোট বার করলেন। নোট দুটো বাপের হাতে দিয়ে বললেন, ফীস যা লাগে দিয়ে দিও, আর বাকি টাকায় পরীক্ষার আগে ওকে একটু ভালো করে খাওয়াও টাওয়াও, রোগা হয়ে যাচ্ছে।

বিগলিত শিবু পণ্ডিত মেয়ের আগে নিজেই পায়ের ধুলো নিয়ে বসলেন মনিবের। স্কুল ফাইন্যাল থেকে মেয়ের ফীস প্রতিবার মনিবই দিয়ে আসছেন। কিন্তু এত খুশী আর কখনো হন নি তিনি। কড়া মনিবের কাছ থেকে এবারে শুধু ফীসের টাকাই পাওয়া যাবে কি না ভেবে উতলা ছিলেন তিনি।

নারায়ণ দিক্ষিত বললেন, পরীক্ষার এ ক'মাস ওকে আমার কাছেই রাখব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখানে এলে ও পড়াশুনা ছেড়ে আমার দিকেই বেশী মন দেয়, সেই জন্য বললাম না। মেয়ের দিকে তাকালেন, পাসটা অন্তত করা দরকার মনে রেখো।

শিবু পণ্ডিত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আপনার সেবা করতে পাওয়া তো ওর ভাগ্যি, যদি বলেন—

না। আগে পাসটা করা দরকার বললাম তো।

পাসটা কেন করা দরকার মেয়ে বা মেয়ের বাপের ধারণাও নেই। তাদের অনুমান, ফেল করা ভাল নয় বলেই পাস করা দরকার।

তারা চলে যেতে নারায়ণ দিক্ষিতের গম্ভীর মুখে হাসির আভাস দেখা দিল একটু। তিনি ঘড়ির কারিগর। খুব ছোট থেকে বড় হয়েছেন। নিজের ঘড়ির ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছে। নতুন ঘড়ি বিক্রি করেন, পুরনো ঘড়ি মেরামত করেন। এই শেষের কাজেই সুনাম তাঁর। খদ্দেররা বিশ্বাস করে, চোখ বুজে দামী ঘড়ি রেখে যায় মেরামতের জন্য। ঘড়ি খুলে একনজর দেখে তিনি বলে দিতে পারেন কোথায় কোন কল বিগড়ল। পুরনো পার্টস জুড়ে নিজের হাতে এমন ঘড়ি তৈরি করেছেন যা অনেক মার্কামারা ঘড়ির থেকেও ভাল টাইম দেয়। মানুষের সম্পর্কেও অনেকটা একই রকমের ধারণা তাঁর। তারও নিভৃতে অনেক কলকবজা, অনেক সূক্ষ্ম কাণ্ডকারখানা। দেখেশুনে এগুলোর ঠিকমত বিন্যাস করতে পারলে বা প্রয়োজনে মেরামত করতে পারলে তার ব্যবহারও ভাল ঘড়ির মত নিখুঁত হয় বলেই বিশ্বাস। ঘড়ির কাঁচের ওপর সামান্য ধুলো পড়লে সেটুকুও যত্ন করে মোছা হয়, কিন্তু নিজের নিভৃতের কল-কবজাগুলোর ওপর মানুষ যে না জেনে না বুঝে কত ধুলোবালি বরদাস্ত করে ঠিক নেই। টনক যখন নড়ে, প্রায়ই তখন আর সময় থাকে না।

সকালের ডাকে আসা খামখানা আর একবার খুললেন নারায়ণ দিক্ষিত। ছোট চিঠি। শেষের দিকের একটা জায়গাই আবার পড়লেন তিনি।—তোমার ছেলের মাথা আমি শিগগীরই ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি, তুমি কিছু ভেবো না। আপাতত সে খুব ফুর্তিতেই আছে এবং ভাল আছে।

চিঠি দুর্গাবতীর। যার প্রসঙ্গে লিখেছেন, সে ছেলে নয় নারায়ণ দিক্ষিতের ভাইপো। নাম মনোহর দিক্ষিত। এই ভাইপোই তাঁর সব। নিজে বিয়ে-থা করেন নি। করেন নি তার একটা কারণ গোড়ার জীবনে অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিল না। সেই অসচ্ছলতার মধ্যেই বাপ-মা-মরা সাত বছরের ভাইপো মনোহর তাঁর কাছে এসেছিল। আর দ্বিতীয় কারণ সম্ভবতঃ দুর্গাবতী। দুর্গাবতী মনোহরের নিজের মাসি নন, দূর সম্পর্কের মাসি। অল্প বয়সে বিধবা। কিছু লেখাপড়া শিখেছেন, নার্সিং ট্রেনিং নিয়েছেন, তারপর সংস্থানের আশায় ভগ্নীপতির কাছে এসেছেন। সেই নতুন বয়সে দুর্গাবতীকে ভাল লেগেছিল নারায়ণ দিক্ষিতের। কিন্তু রক্ষণশীল দাদা বউদির তা ভাল লাগা দূরে থাকুক, তাঁরা প্রমাদ গুনেছিলেন। ফলে দুজনের ওপরেই কিছুটা নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তাঁরা। নারায়ণকে ভর্ৎসনা করেছেন। আর দুর্গাবতীকে ঠাণ্ডা বিদায় দিয়েছেন।

দুর্গাবতী মেজাজী মেয়ে। আর কখনো এই পরিবারের মুখাপেক্ষী হতে আসেন

নি। কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি তা বলে। নারায়ণ দিক্ষিতের জন্যই হয় নি। পরস্পরকে ভাল লাগাটা কোনো দিন কোনো নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে গড়াবে এমন ভরসা আগেও দুজনের কারোই ছিল না। দুর্গাবতী নারায়ণ দিক্ষিতের প্রতি সত্যিকারের সদয় হয়েছিলেন বোন-ভগ্নীপতি পর পর চোখ বোজার পরে। দুটি বছর শিশু মনোহরকে তিনি নাড়াচাড়া করেছিলেন, তার প্রতি মায়াও পড়েছিল। ভেবেছিলেন ছেলেটা একেবারে জলে পড়ল। তাকে তিনি নিতেও চেয়েছিলেন। নারায়ণ দিক্ষিত দেন নি। যে-ভাবে এই ছেলেকে মানুষ করা হয়েছে দুর্গাবতী জানেন। বেশির ভাগই তাঁর বাইরে বাইরে কাজ নিয়ে কেটেছে। তার মধ্যেও বছরে দু'বছরে এক-আধবার এসেছেন। এইখানেই থেকেছেন, নারায়ণ দিক্ষিতের ছেলে মানুষ করা দেখেছেন। অনেক সময় ঠাট্টা করেছেন, ছেলেটা আর একটু বড় হলে কি সন্ন্যাস-টন্ন্যাস নেওয়াবে নাকি? কিন্তু মুখে যাই বলুন, মনে মনে শ্রদ্ধা করেছেন তিনি।

মনোহরের স্কুলের পড়া শেষ হল যখন, দুর্গাবতী তখন দিল্লীতে। বড় হাসপাতালের উঁচু গ্রেডের নার্স, নিজের দু'ঘরেব কোয়ার্টার। জলপানি-পাওয়া ভাইপোর জন্য কানপুরের কোনো কলেজ পছন্দ নয় নারায়ণ দিক্ষিতের। দুর্গাবতী লিখলেন, আমার কাছে পাঠাও, এখানে দিল্লীতে পড়বে, ওর যে ভিত তুমি করে দিয়েছ সেটা নেহাত কাঁচা না হলে অমানুষ হবে না আশা করি। আর একটা ছেলে কাছে থাকলে আমারও উপকার হবে।

ভাইপোকে দিল্লীতে পাঠালেন নারায়ণ দিক্ষিত। মাসির কাছে প্রায় দু'বছর ছিল মনোহর। এই দু'বছর দুর্গাবতী তার কোনো অভ্যাসেব পরিবর্তন বরদাস্ত করেন নি। সেই হাঁটু-ছোঁয়া লম্বা কোট পরিয়েছেন, মোটা কাপড়ের পাজামা পরিয়েছেন, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটিয়েছেন।

ফলে পরেও এই বেশবাসই ভাল লেগেছে মনোহরের। হাঁটু-ছোঁয়া কোটই তার বেশবাসের বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটির ফলে চাকরি ছেড়ে দুর্গাবতীকে আবার অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। মনোহর দিল্লীতেই থেকে গেছে। সেখান থেকেই বি. এ., এম. এ. পাস করেছে। শুধু পাস করেছে বললে তাকে ছোট করা হবে। বি. এ.তে বা এম. এ.তে কয়েক বছরের মধ্যে তার মত অত নম্বর পেয়ে ফার্স্ট ক্লাস কেউ পায়নি। সেখানকার শিক্ষাবিদরা উঁচু আশা পোষণ করেন তার সম্বন্ধে। সম্প্রতি সে ডক্টরেট হয়েছে, তার থীসিস প্রত্যাশিত প্রশংসালাভ করেছে।

দিল্লীর য়ুনির্ভাসিটিতেই চাকরি করছে. কিন্তু কাকাকে প্রায়ই লেখে পড়ানোর চাকরি ভাল লাগছে না, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ঢোকার ইচ্ছা—সেই চেষ্টা করছে। ফরেন সার্ভিস পেলে আরো ভাল, দুই একটা বিদেশী ভাষাও শিখছে, সপ্তাহে দুই সন্ধ্যা এক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতার মহড়া দিতেও যায়। মোট কথা নিজের বিস্তৃত ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে সে প্রায় নিঃসংশয়।

এদিকে নারায়ণ দিক্ষিত তখন ভাইপোর বিয়ের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবছেন না। তাঁর ইচ্ছে সে এবারে সংসারে স্থিত হোক। তিনি সে ইচ্ছেটাই জ্ঞাপন করলেন।

মনোহব খুশী হল। এতদিন এ ব্যাপাবে তেমন গুরুত্ব দেয নি সে। সুযোগ্যা ভার্যা যে কর্মক্ষেত্রও অনেকটা প্রসাবিত কবে দিতে পাবে তেমন নজিব দিল্লীতে বড কম নেই। স্ত্রী রূপসী হবে, বহু গুণেব অধিকাবিণী হবে, নিপুণা গৃহিণী হবে, বাইবে লোভনীয সহচবী হবে, সকলে প্রশংসা কববে আবাব ভিতবে ভিতবে এক-আধটা ঈর্ষাতুব দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলবে—এমন স্ত্রী একটু দুর্লভ বটে, কিন্তু এমন স্ত্রী ছাড়া তাব মনও উঠবে না।

কাকাকে লিখল, বিযে কবতে আপত্তি নেই, কিন্তু এই ব্যাপ্যাবটা তাব হাতে ছেড়ে দেওযাই ভাল। লিখল, আমি তোমাব আদর্শে মানুষ, আশা ছবি নির্বাচনে ভুল হবে না এবং তুমি খুশী হবে। এই এক বিষযে আমাব নিজেব ওপব সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

চিঠি পড়ে কাকা অস্বস্তি বোধ কবলেন। ভাবলেন তিনি সংসাবী নন বলেই ভাইপোব অনাস্থা। মন্তব্য কবলেন, ছোকবাব কল বিগড়েছে। জবাব লিখলেন, তথাস্তু।

অবসব সমযে মনোহব দিক্ষিত হৃষ্ট উদ্দীপনায যোগ্য সহধর্মিণী খুজে বেড়াতে লাগল। বিযেতে মন হযেছে জেনে এমন সব গণ্যমান্য ব্যক্তিবা এগিযে আসতে লাগলেন যে মনোহব দিক্ষিতেব নিজেব কাছে নিজেব মর্যাদা দিনে দিনে স্ফীত হযে উঠতে লাগল। কিন্তু ছেলে যে সত্যিই কাচা নয। তাব একটা চোখ নিজেব, আব একটা চোখ কাকাব। নিজেব চোখে দেখে যাকে কিছুটা মনে ধবে, কাকাব চোখ দিযে দেখে আব একদিন তাকে বাতিল কবে দেয। ভাল লাগলেই কাকাকে জানায, লেখে হযত ওখানেই বিযে কববে। কিছুদিন না যেতে আবাব লেখে, তেমন মনে হচ্ছে না, অতএব ।

তাব কল্পনাব আদর্শ স্ত্রীব সন্ধান সে কোথাও পাচ্ছে না। তাব ওপব আবাব কাকাকে তাক লাগিযে দেবাব সংকল্পটাও অটুট। কাকা যাতে কোনোদিন না ভাবেন নিজে সর্দাবি কবে ছেলেটা বোকাব মত কিছু কবে বসল। গত সাত আট মাসে কম কবে তিবিশ চল্লিশটি মেযে দেখেছে সে, পনেব বিশটি মেযেব অন্তবঙ্গ সান্নিধ্যেও এসেছে—কিন্তু কাবো মধ্যেই শেষ পর্যন্ত আদর্শ ভার্যাব হদিস মেলে নি।

বেগতিক দেখে নাবাযণ দিক্ষিত শেষে দুর্গাবতীব কাছে সমস্যাটা নিবেদন কবলেন। ভাইপোব সাম্প্রতিক মতিগতিও জানালেন। তাব সকল উদ্দীপনা এখন যে শুধু স্ত্রী খোজাব কাজে কেন্দ্রীভূত হযেছে সেটা তাব দুশ্চিন্তাব কাবণ। অথচ ভাইপোব জন্য মনেব মত বউ তিনি অনেকদিন ধবেই ঠিক কবে বেখেছেন। তাব বিশ্বাস, এই মেযে বিযে কবলে সে সুখী হবে।

প্রৌঢ়া দুর্গাবতী তখন বম্বেতে থাকেন। এক অর্ধপঙ্গু বিবাট অবস্থাপন্ন বৃদ্ধেব বাড়িতে গভর্নেস হযে আছেন। মোটা টাকা মাইনে পান। বৃদ্ধ কন্যাব মত স্নেহ কবেন তাকে। দুর্গাবতী অনেকদিন ধবেই সমমর্যাদায প্রতিষ্ঠিত সেখানে। বৃদ্ধেব নাতি-নাতিনী-পবিবৃত সংসাবেব সঙ্গে অনেকটাই যুক্ত হযে গেছেন তিনি। তাব পুত্রবধূ মাবা যাবাব পব থেকে বলতে গেলে তিনিই কর্ত্রী সেখানকাব। বৃদ্ধেব বযস্ক নাতি-নাতনীরাও অসম্মান কবে না তাকে।

নাবাযণ দিক্ষিতেব চিঠি পেযে দুর্গাবতী মনোহবকে একবাব বোম্বাই শহবে বেড়িযে

যাবার আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন।

মনোহর এলো। আর এসে প্রথম দিনেই তার মনে হল আরো আগে কেন আসে নি। তার কল্পনার রমণী যে এই বাড়িতেই বাস করছে সে কেমন করে জানবে! প্রথম সন্দর্শনেই তার মনে ধারণা হয়ে গেল, মাসি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তাকে এত আগ্রহে এখানে আমন্ত্রণ করে এনেছেন।

কন্যা শীলা রানে। বৃদ্ধের বড় নাতনী। রূপসী, স্বাস্থ্যবতী, উচ্চশিক্ষিতা, সুরসিকা, সুচতুরা, সদা হাসিখুশী। মনোহরের ধারণা বুড়োর নাতিদের অনেক বন্ধুবান্ধব যে হামেশা এই বাড়িতে হানা দেয়, তার প্রধান কারণ শীলা রানে। অবশ্য এদের কেউ যে জ্ঞানে গুণে মর্যাদায় মনোহরের সমতুল্য নয়, মাসির কাছে সেই খোঁজও সে নিতে ভুল করে নি।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের পার্টি হৈ-চৈ আনন্দ ফুর্তি লেগেই আছে। এরই মধ্যে মনোহর দিক্ষিত পরম সম্মানিত অতিথি।

এদিকে বুদ্ধি করে দুর্গাবতী আগেই বাড়ির সকলের কাছে মনোহরের প্রসঙ্গে একটা মস্ত উঁচুদরের চিত্র এঁকে রেখেছিলেন। বোনপো বিদ্যের জাহাজ, বিলেতের মস্ত মস্ত পণ্ডিতদের সঙ্গে পর্যন্ত বিদ্যের ব্যাপারে তার লেনদেন, দিল্লীতে ওই বয়সের এত বিদ্বান ছেলে আর দ্বিতীয় নেই, শিগগিরই বড় চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফলে বাড়ির শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা মার্জিত বিনয়ে তাকে গ্রহণ করল, মান্যগণ্য অতিথির মতই সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

মনোহর সাত দিনের জন্য এসেছিল, সে জায়গায় পনের দিন কেটে গেল। আর দুর্গাবতী নারায়ণ দিক্ষিতকে ওই চিঠি লিখলেন।

দিল্লীতে অনেক মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার দরুন মনোহরের সদা-সপ্রতিভ ভাবটা আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল। মন স্থির হলে লক্ষ্যের দিকে এগোতে তার দ্বিধা করার কথা নয়, দ্বিধা করলও না। শীলা রানের সঙ্গে খুব সহজভাবেই মিশল, তাকে সঙ্গে করে বোম্বাই শহর দেখে বেড়ালো কয়েকটা দিন। তাকে ভাল করে দেখার পর মনটা সামান্য একটু খুঁতখুত করল, চোখ দুটো সামান্য কটা না হয়ে ঘন কালো হলে বোধ করি অনিন্দ্যসুন্দর হত, আর ধপধপে ফরসা রঙের বাহুর ওপর আর কানের পাশের ঘন কেশ আর সামান্য একটু কম চোখে পড়লেই দৃষ্টি একেবারে ভরপুর হতে পারত। কিন্তু তার সঙ্গে ভাল করে মেশার পর ওই সামান্য ত্রুটি আর ধর্তব্যের মধ্যেই মনে হয় নি। শুধু মনে হয়েছে, এই কন্যার তুলনা নেই, এতদিন ধরে যেন শুধু এই একজনেরই প্রতীক্ষায় ছিল সে।

এর আগেই মাসির কাছে খোঁজ নিয়েছে, কতদূর পড়েছে?

এম. এ. পাস।

বাঃ! বয়েস কত হবে?

মাসি হিসেব করে বলেছেন, বছর তিনেক ছোট হবে তোর থেকে—গেল বছর

পাস করেছে। কেন?

বিয়ে করবে না?

করবে নিশ্চয়। কত ছেলেই তো আসছে যাচ্ছে কেন, তোর মনে ধরেছে?

মনোহর মুচকি হেসেছে।

পনের দিনের মাথায় মনে ধরার কথাটা সে নিজেই প্রকারান্তরে শীলাকে জানিয়েছে। সমুদ্রের ধারে বসে গল্প করতে করতে একসময় সপ্রতিভ মুখে বলে বসেছে, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।

শীলা ম্লানেও হেসেছে।—খুব ভাগ্য, তোমার মাসি আমাদেরও মাসির মতই, তার ওপর তুমি মাননীয় অতিথি, কোনোরকম ত্রুটি ঘটে থাকলে দোষ নেবে না আশা করি।

ত্রুটি! ঠিক এই উক্তি আশা করে নি মনোহর, তোমাদের এখানে না এলে তো আমার সর্বস্ব লোকসান হত।

শীলা ম্লানে হেসে সারা।—তুমি বেশ সুন্দর কথা বলো, তোমার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে।

এই কথা সেদিন অনেকদূর গড়াতে পারত। যাতে গড়ায় সেই জন্য প্রস্তুতও হচ্ছিল মনোহর। কিন্তু শীলার বন্ধু এবং বান্ধবীর সংখ্যা কম নয়—একদঙ্গল পরিচিত মেয়ে-পুরুষের আবির্ভাবে এই আলাপে ছেদ পড়ল।

রাত্রিতে মনে হল, শীলাকে ভাল কিছু প্রেজেণ্ট দেওয়া দরকার। শয্যা ছেড়ে উঠে তক্ষুনি কাকাকে একটা চিঠি লিখে ফেলল, খুব ভাল একটা লেডীস ঘড়ি পাঠাও। আর শিগগিরই তোমাকে একটা সুখবর দিতে পারব আশা করছি—এবারে সত্যিকাবেব সুখবর।

ঘড়ি এলো। কিন্তু মনোহর নিজের হাতে সেটা শীলাকে পরিযে দেবার মত নিরিবিলি অবকাশ পেয়ে উঠল না। আবার তার সমুদ্রের ধারে যাবার ইচ্ছে ছিল। যাই হোক ঘড়ি পেয়ে শীলা ভারী খুশী, বলল, ওয়াণ্ডারফুল।

ঘড়িটা সত্যিই সুন্দর।

পরদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কোথায় প্রোগ্রাম ছিল শীলার। এ-রকম প্রোগ্রাম প্রায়ই থাকে তার—তাকে ছাড়া বন্ধু-বান্ধবীদের আনন্দের হাট জমে না। মনোহরও আমন্ত্রণ পেয়েছিল, কিন্তু মাসিব সঙ্গে দুটো কথাবার্তা বলার আগ্রহে সে যাবে না স্থির করেছে। শীলা বলেছে, তুমি অতিথি মানুষ বাড়িতে থাকবে, তাহলে আমি যাই কি করে!

মনোহর রসিকতা করে বলেছে, এই অতিথি পুলিস নয় যে সর্বদা আসামী আগলে থাকতে চাইবে।

শীলার চোখের কোণে এক-একসময় যেন চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলে। ছদ্ম বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, আমি আসামী।

পরদিন সকাল থেকে অতক্ষণের বিচ্ছেদের কথা ভেবে এই রাত্রিটাই নীরস লাগছিল মনোহরের। রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবছিল, সকালে সে-ও ওদের সঙ্গ নেবে

কি না। দুর্গাবতী আলো দেখে ঘরে ঢুকলেন, কি রে, ঘুমোস নি এখনো?

মনোহর সোৎসাহে উঠে বসল, এসো মাসি বোসো—তোমাদের এখানকার সকলে বড় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

দুর্গাবতী শয্যার ধারে বসলেন, বললেন, সমস্ত দিন যা হৈ-চৈ করে কাটায় সব, ঘুমুবে না তো কি!

মনোহর কাজের কথায় এগোল। হাসিমুখে বলল, আমার তো যাবার সময় হয়ে এলো, সাত দিনের জায়গায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল...কিন্তু এদিকে কাজের কথা তো কিছুই হল না।

সে নিঃসংশয়, মাসি শীলাকে দেখাবার জন্যই অত করে তাকে এখানে এনেছেন।

তাই বটে। কিন্তু তাঁর যে আরো একটু বেশী কিছু দেখাবার সংকল্প, মনোহর তা জানত না। দুর্গাবতী নির্লিপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কথা?

বিয়ের কথা।

শীলাকে বিয়ে করতে চাস?

মনোহর উৎফুল্ল মুখে ফিরে হালকা প্রশ্ন করল, কেন, তোমার আপত্তি আছে?

দুর্গাবতী জবাব দিলেন, আমি আপত্তি না করলেই তো হয়ে যাবে না। ভাবলেন একটু, তারপর বললেন, বোস একটু, আমি আসছি—

উঠে চলে গেলেন। মাসির এই নির্লিপ্ত হাবভাব কেমন বিসদৃশ লাগল মনোহরের। মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে এলেন তিনি, ছোট্ট সুন্দর একটা ডায়েরি হাতে দিয়ে বললেন, চুপি চুপি নিয়ে এলাম, দেখ এটা—

দুর্বোধ্য লাগছে মনোহরের, কি আছে এতে?

শীলার...দেখ না কি আছে!

মনোহর দেখতে লাগল। ডায়েরির ছোট পাতার মাথায় একটা করে নাম। পুরুষের নাম। তারপর তার সম্পর্কে দু'তিন পাতা করে লেখা। ছোট লেখাও আছে। চেহারা বয়েস বেশবাস কথাবার্তা পেশা চালচলন ইত্যাদি খুব সংক্ষেপের ওপর খুঁটিয়ে লেখা —আর তার পরে কাটা দাগ একটা—ক্রস চিহ্ন। এ-রকম আট-দশটা নামের তালিকা উলটে গেল মনোহর—সব ক'টারই শেষে সেই কাটা দাগ, অর্থাৎ বাতিল চিহ্ন।

শেষে মনোহর দিক্ষিতের নাম। প্রথমেই তলার কাটা দাগটার দিকে আগে চোখ গেল মনোহরের। একটা বড় রকমের ধাক্কা সামলে মনোহর লেখাটুকু পড়ল। এই লেখাটা আরো ছোট ঃ

ঘড়িওলার ভাইপো। খুব বিদ্বান নাকি। কিন্তু চেহারা বোকা-বোকা। বেঁটেখাটো। সব থেকে বিদঘুটে তার ওই লম্বা কোট। কথাবার্তা হাবভাবে নিজেকে চালাক মনে করানোর চেষ্টা। পাঁচ-ছ'শ টাকা হয়ত মাইনে পায়, কিন্তু নিজেকে মস্ত একজন ভাবে। ঘড়ি প্রেজেন্ট করেছে, সেটা অবশ্যই সুন্দর...। x

ডায়েরিটা নিয়ে মাসি উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন একটু, বললেন, পাঁচ বছর ধরে এমনি ওজন করে আসছে, নইলে বিয়ে করেই হয়ে যেত।

মনোহর নির্বাক। মাসি চলে যাবার পরেও কতক্ষণ তেমনি বসে ছিল ঠিক নেই।

দিল্লীতে ফিরেই কাকাকে লিখল, তোমাকে সুখবর দেব বলেছিলাম তাই লিখছি। আমার বিয়েটা তুমিই ঠিক করতে পারো।

তারপরে এক মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেছে মনোহরের। হয়েছে কমলার সঙ্গে। মনোহর শেষ পর্যন্ত আপত্তি করে নি বটে, কিন্তু কোথায় বিয়ে শুনেই মস্ত একটা ধাক্কা খেয়েছিল সে। কাকা কিনা শেষে তাঁর কারিগরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করল! যে মেয়েকে সে ফ্রক-পরা থেকে দেখেছে, আর যাদের অনুকম্পার পাত্র ছাড়া আর কিছু ভাবে নি!

কমলা বি. এ.টা পাস কবেছে শুনে তবু একটু আশ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পর প্রতিপদে বি.এ. পাসের বিদ্যে দেখে সে শুধু হতাশই হয়েছিল। একে একে দশটা বছর কেটেছে তারপব, কিন্তু কাকার এই নির্বাচনের তারিফ সে কখনো কবতে পাবে নি। কমলা এক সাংসারিক বিষয় ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে পাঁচটা কথাও বলতে পারে না, তর্ক করতে পারে না, উঁচু সার্কেলে তাকে নিয়ে যাওয়া তো ছাড়তেই হয়েছে, যা বলা হয় তাকে তক্ষুনি তা পালন করে, আদর কবলে খুশী হয়, রাগ করলে ভয়ে ভযে থাকে আব তাকে খুশী করার ফিকির খোঁজে। এই একান্ত নির্ভবশীলা মেয়ের জন্যে মায়া হতে পারে, কিন্তু তাকে যোগ্য সঙ্গিনী ভাবা মনোহবেব পক্ষে অন্ততঃ সম্ভব নয়। কাকার একমাত্র এই অবিচারে মনে মনে আজও সে ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু এই কাকাও আর নেই। কল মেরামতেব ব্যাপারে এমন সুপটু মানুষটার নিজের হৃদযন্ত্র হঠাৎ বিকল হয়ে যেতে পারে কেউ ভাবে নি। ব্যবসা এখন শ্বশুরই চালাচ্ছেন, মনোহর তাঁকে অর্ধেক লেখাপড়া করে দিয়েছিল, আব মনে মনে নিঃসংশয় ছিল, শ্বশুর শেষ পর্যন্ত তাকে কলা দেখাবেন। কিন্তু গত সাত বছর ধবে দেখা যাচ্ছে, লাভের চুলচেরা হিসেব দিয়ে শ্বশুর ফি-বছর জামাইয়ের নামে মোটা টাকা পাঠাচ্ছেন। ফলে কাকার বিশ্বস্ত কর্মী নির্বাচনের ওপব অবশ্য মনোহরের আস্থা ফিরেছে।

শীতকাল। সন্ধ্যায় কনট প্লেসের ধারে হঠাৎ দুর্গাবতীর সঙ্গে দেখা মনোহরের। দোকান থেকে কি সওদা করে ফুটপাথে নেমেছেন।

কি আশ্চর্য! তুমি!

মাসিও খুশী।—তোর কথাই ভাবছিলাম। ওই মেয়ের পাল্লায় পড়ে হঠাৎ এসে গেলাম ক'দিনের জন্য, আয়—

মনোহর ঘাড় ফিবিয়ে দেখে, ফুটপাথের ধাবে ট্যাক্সিতে শীলা বসে। তার দিকে চেয়ে হাসছে মিটিমিটি। এই দশ বছর বাদেও তাকে চিনেছে তাহলে।

পাযে পায়ে এগিয়ে এলো। দুর্গাবতী খুশী মুখে ট্যাক্সির দরজা খুলে দিল, বলল, কোনো কথা নয়, ওঠ আগে—

মনোহর গাড়িতে উঠল। মাসিও। ট্যাক্সি চলল। শীলা সেই দশ বছর আগের মতই হাসিখুশী। অনর্গল কথা বলছে, তুমি এখানে আছ জানি, দুই-একদিনের মধ্যেই দেখা করতাম, মস্ত গণ্যমান্য অধ্যাপক হয়েছ, চিনবে কি না ভয় ছিল। তার খবরও নিল, কতদিন বিয়ে করেছে, ক'টি ছেলেপুলে ইত্যাদি। হাত বাড়িয়ে দেখাল, সেই ঘড়ি। হেসে বলল, এটা চিনতে পারো—এটাই শুধু ঠিক ঠিক চলছে, আর কিছু চলছে না।

সন্তর্পণে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল মনোহর। শীলাকে আজও সে ভোলে নি একেবারে। ভুলতে পারে নি। নিভৃত অবকাশে এখনো অনেক সময় মনে পড়ে তাকে। মাসি একবার লিখেছিলেন, কলেজে চাকরি নিয়েছে শীলা। কিন্তু কলেজের শিক্ষয়িত্রীর মত লাগছে না তাকে। দেখছে মাঝে মাঝে। পরনে ঝকমকে শাড়ি, পাতলা সিল্কের টেপ-ব্লাউজ—আগের থেকে মোটা হয়েছে একটু। মুখে প্রসাধনের পুরু প্রলেপ—কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বয়সে বয়স ঢাকা পড়ার কথা নয়।

যে হোটেলে উঠেছে শীলা সেই হোটেলেই নিয়ে গেল তাকে। রাত্রি প্রায় ন'টা পর্যন্ত তিনজনে গল্পগুজব চলল। তারপর শীলা চলে গেল কোথায় নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। যাবার আগে মনোহরের আবার আসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গেল।

তারপর আরো ঘণ্টা দুই মনোহর ছিল মাসির কাছে। মাসি তার ঘরসংসারের খবর নিয়েছেন, কাকার কথা বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন, আর শেষে জীবনের এই শেষ ক'টা দিন যে এই এক অদ্ভুত মেয়েকে নিয়েই কাটাতে হবে সেই খেদ প্রকাশ করেছেন।

মনোহর জিজ্ঞাসা করল, ও আর বিয়েই করল না তাহলে...

মাসি জবাব দিলেন, করবে না কেন, বিয়ে একবার ছেড়ে দু'বার করেছে—

মনোহর বিমূঢ় হঠাৎ।

মাসি বললেন, বিয়ের আর দাম কি আজকাল—দু'জায়গায়ই ডাইভোর্স হয়ে গেছে। আবার যদি বিয়ে করে আবারও তাই হবে।

মনোহর নির্বাক খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে আবার জিজ্ঞাসা করল, শীলা বম্বেতে করে কি এখন?

কি আর করবে, মাসির কণ্ঠস্বরে বিরক্তি, বাড়িতে থাকলে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দেয় নয়ত বই পড়ে, কথায় কথায় চাকর-বাকর খানসামাকে বকে, বরখাস্ত করে, কথা নেই বার্তা নেই কারণ নেই রাতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে এক-একদিন, ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়—আবার সকাল হলে পরিপাটি সাজসজ্জা আর প্রসাধন করে কলেজে পড়াতে চলে যায়।

মনোহর বাড়ি ফিরল রাত্রি সাড়ে এগারোটার পরে। ছোট ছেলেকে বুকের কাছে নিয়ে কমলা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। লেপটা ঘুমের ঘোরে একটু সরে গেছে। একখানা হাতে ছেলেকে জড়িয়ে আছে। ওধারের ছোট খাটে বড় ছেলে ঘুমুচ্ছে। মাঝের দরজা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে সামনের ঘরেও মনোহরের পরিপাটি শয্যা দেখা যাচ্ছে। বাথরুমে ঢুকলেই হাত-মুখ ধোবার গরম জল পাবে জানে। ডাইনিং টেবিলে ঢাকা খাবারও গরম পাবে। এ-সব ঠিকঠাক করে রেখে তবে কমলা ছেলে ঘুম পাড়াতে আসে। জেগে থাকার ইচ্ছে কিন্তু ছেলে ঘুম পাড়াতে গিয়ে প্রায়ই নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমকাতুরে বলে মনোহর আগে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপও করত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আজ ঘুমন্ত স্ত্রীকেই দেখছে মনোহর। গত দশ বছরেও যেন ঠিক... দেখা হয় নি কমলাকে। আজ নির্নিমেষে দেখছে।

হাত বাড়িয়ে লেপটা আস্তে আস্তে টেনে ঠিক করে দিল। তারপর এ-ঘরে এসে দাঁড়াল।

দেয়ালে টাঙানো কাকার প্রমাণ সাইজের বড় ছবি একটা। কাকা তার দিকেই চেয়ে আছে। মনোহরও চেয়ে আছে।

দশ বছর বাদে দুই হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কাকাকে প্রণাম করল মনোহর দিক্ষিত।

শ্রীমতী রূপাবতী

বিকেলে দরকারের সময়েও গাড়ি মেলে নি শ্রীমতীর, তবু খুশী মেজাজেই বেরিয়েছিল। একটা গাড়ি মেরামতিতে গেছে, দ্বিতীয় গাড়ি নিয়ে সুবিনয় নিখোঁজ, কোথায় হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছে কে জানে। দেখা হলেই সতের কাজের ফিরিস্তি দেবে, যার অর্থ একটা মিনিটও সে অপচয় করার পাত্র নয়। তার ফেরার আশায় বসে থাকলে হয়ত বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা গড়াবে।

তাই একটা ট্যাক্সি ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল শ্রীমতী চৌধুরী। তারপর তপতী আর অমিতাভর সঙ্গে দিব্বি হাসি-খুশীর মধ্যে ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গেছে। খবরটা শুনেই তপতী লাফিয়ে উঠবে জানা কথা। লাফিয়ে উঠেছিল। আর উৎফুল্ল মুখে অমিতাভও অনেক চাটুক্তি নিক্ষেপ করেছে। বলেছে, শ্রীমতী তোমার তুলনা নেই, তুমি একটি জিনিয়াস, তুমি মুক্তহস্তা কমলা স্বরূপিণী, তুমি আমাদের কল্পতরু মহামায়া।. সুবিনয় ব্যাটাচ্ছেলের অনেক তপস্যার ফলে সে ছেড়ে আমরাও এই রমণী-রত্নের অন্তরঙ্গ করুণার পাত্র হয়ে ধন্য হবার সুযোগ পেয়েছি।

শ্রীমতী কোপ দেখিয়েছে বটে, কিন্তু অখুশী হয় নি।

তপতী শ্রীমতীর বাল্যবন্ধু, আর সুরসিক অমিতাভও তার অন্তরঙ্গ এবং প্রীতিভাজন।

হৈ-চৈ আনন্দের মধ্যে সিদ্ধান্তটা সবে কাল পাকা হয়েছিল। শ্রীমতী সে-খবরটাই তপতী আর অমিতাভকে দিতে এসেছিল। রাতে কাল বন্ধু সমাগম হয নি বাড়িতে। সুবিনয়ের মুখে খবরটা পেয়েই সকলে সাগ্রহে এসে উপস্থিত হয়েছিল। সস্ত্রীক নিরঞ্জন এসেছিল, সস্ত্রীক দীপক ঘোষাল এসেছিল, বিপত্নীক উমানাথ এসেছিল, ব্যাচিলর সেনও বাদ যায় নি। বায়নাটা প্রায় জুলুমের মত করে তুলেছিল উমানাথ আর ব্যাচিলর সেন —কথা না দিলে ও তো এসে আঁচল ধরবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। আর তার ঘরের লোক সুবিনয় হাসছিল মিটিমিটি।

ব্যাপার আর কিছু নয়, এ-রকম একটা সৌভাগ্য শ্রীমতীর শ্রীহস্তে সেধে এলো যখন, তাদের এত বাঞ্ছিত আর এত প্রতীক্ষিত জিনিসটির এবারে পত্তন হবে কি না।

ওদের এই প্রত্যাশায় প্রস্তাবটা একদা শ্রীমতীই দিয়েছিল। ক'বছরে পরপর দল বেঁধে সকলে মিলে ভারতের নানা জায়গায় বেড়িয়ে বেড়ানোর রস ষোল কলায় আস্বাদন

করেছে। কিন্তু রোজগার সকলের সমান নয় বলেই এক-একবার কেউ না কেউ পিছিয়ে যায়। তখন শ্রীমতী প্রস্তাব করেছিল, একটা টুরিং ক্লাব করলে কেমন হয়, প্রথমে ষাট সত্তর হাজার টাকার ফাণ্ড যদি একটা সে-ই করে দেয়, তারপর যে যা পারে ওই ফাণ্ডে জমা দেবে—না পারলে না দেবে। মোট কথা বেড়াতে যখন বেরুনো হবে ওই ফাণ্ড থেকেই টাকা তুলে নিয়ে সকলে মিলে বেরুবে, তখন আর কারো ব্যক্তিগত ফাণ্ডের প্রশ্ন উঠবে না।

শুনে সকলে তারস্বরে আহা মরি করে উঠেছে। বিপত্নীক উমানাথ আর ব্যাচিলর সেন তো পায়ের ধুলো নেবার জন্যেই ধাওয়া করেছিল তাকে। কিন্তু হবে হবে করেও এ পর্যন্ত সেটা হয়ে ওঠে নি। শ্রীমতীর কেমন যেন উৎসাহ মিইয়ে এসেছিল এর পরে। সবাই জানে নরম-গরম কিছু করিয়ে ফেলতে পারলে শ্রীমতীকে দিয়ে অনেক কিছু হয়, কিন্তু ঝোঁক কেটে গেলেই গড়িমসি।

সুখের ঘরে সোনা ঝরে, তাই যেন হল হঠাৎ। বলা নেই কওয়া নেই কোথায় শ্রীমতীর এক দূর সম্পর্কের নিঃসন্তান কাকা চোখ বুজলে, আর শ্রীমতীর অ্যাটর্নীর কাছে চিঠি এলো, তার লাখ দেড়েক টাকার এখন একমাত্র মালিক শ্রীমতী চৌধুরী। অ্যাটর্নী গাড়ি হাঁকিয়ে বাড়িতে এসে শ্রীমতীকে সেই খবরটা দিয়ে গেলেন আর তারপর শ্রীমতীর হয়ে বিধিবদ্ধভাবে টাকার দখল নেবার জন্য তৎপর হলেন তিনি।

ব্যস, সকলে খবর পেয়ে গত সন্ধ্যায় বাড়িতে হানা দিল। তাদের দাবী, টুরিং ক্লাব হবে কিনা, এবারে সাফ কথা বলে দাও—প্রতীক্ষার যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। বিপত্নীক উমানাথ গর্জে উঠল, হবে না বললে আমি আর ব্যাচিলর সেন দু'দিক থেকে দু'পা ধরব বলে দিলাম।

জবাব দেবার আগে শ্রীমতী হাসিমুখেই সুবিনয়ের দিকে সকোপ দৃষ্টি হেনেছে একটা। অর্থাৎ এই হামলার আসল পাণ্ডা যে ঘরের লোক স্বয়ং এটা সে জানে তাই বুঝিয়ে দিল। বাইরে বেরুনোর জন্য তারই পা সর্বদা সুড়সুড় করে—তারই পায়ের তলায় সরষে।

নিরুপায় শ্রীমতী বলেছে, হবে বাবা হবে, এবারে থামুন আপনারা।

পায়ের বদলে হৈ-হৈ করে সকলে মিলে শ্রীমতীকে প্রায় মাথায় তুলে নিতে চেয়েছে।

সকলে চলে যাবার পর সুবিনয়ও তাকে তোয়াজ করেছে।—তুমি ভাবছ আমি ওদের লাগিয়েছি?

—নাঃ, তুমি ননীগোপাল একেবারে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না, তোমাকে আর আমি চিনি না!

চেনানোর ছলে দুষ্টুমি করে সুবিনয় কাছে আনতে চেষ্টা করেছিল, আর তেমনি ছদ্ম কোপে শ্রীমতী তাকে ঠেলে সরিয়েছিল।

রাতের শয্যায় শুয়ে একটা দৃশ্য—মজার দৃশ্যই—শ্রীমতীর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।...গেলবারে সাঁওতাল পরগণায় বেড়াতে বেরিয়েছিল তারা। একটা পাহাড়ী গাঁয়ের ধারে কয়েকটা মেয়ে পুরুষ নেচে কুঁদে উৎসব করছিল। তাদের মধ্যে একটা

মেয়ে, পরে খাতির হতে নাম জেনেছে ফুলতারা, সকলের চোখে পড়েছিল। কালো পাথরে কোঁদা মেয়ে যেন একটা। নাক থ্যাবড়া, কপাল উঁচু, কিন্তু স্বাস্থ্য যেন স্বল্প-বাস ছিঁড়ে-খুঁড়ে উঁকিঝুঁকি দিতে চাইছে। আর সপুলকে তারপর আরো যে নীরব নাটকটা লক্ষ্য করছিল তা যেন ভোলবার নয়। তার সঙ্গী ভদ্র পুরুষগুলোর চোখের তারায় উদগ্র চাপা লোভের ছটা দেখেছিল সে। সকলের—অমিতাভর, উমানাথের, ব্যাচিলর সেনের, এমন কি নির্ভুল দেখেছে শ্রীমতী—সুবিনয়েরও।

শ্রীমতী কি রাগ করেছিল? একটুও না। বরং আরো আগ্রহ নিয়ে, আরো বেশী উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করছিল সে। ওই নিটোল-স্বাস্থ্য মেয়েটার দিকে চেয়ে কোথায় যেন একটা নির্ভরতার উৎস খুজে পেয়েছিল সে।

অতি বড় বিশ্ব চাটুকারও রূপের ছিটেফোটা আবিষ্কার করতে পারবে না শ্রীমতীর মধ্যে। তার গায়ের রং, নাক, মুখ, চোখ—সবই ওই সাওতাল মেয়েটার সগোত্র যেন আর স্বাস্থ্যও। কিন্তু সব ছাড়িয়ে ওই স্বাস্থ্য যে এ ভাবে লোকের চোখে পড়ে সেটা যেন এই প্রথম জানল। নাক মুখ চোখ গায়ের রং লেখাপড়া—এইসব ছাড়িয়ে এই সম্পদ যে পুরুষ এমন লালায়িত চোখে দেখে, তা যেন বিয়ের পরেও শ্রীমতী জানত না। বড়লোক ব্যবসায়ী বাপের একমাত্র কন্যা—শুধু সেই গুণেই তার শিক্ষিত অনুগত বর জুটেছে, এই ধারণাটাই বদ্ধমূল ছিল। ব্যবসা নিজের হাতে পেয়ে সুবিনয় ফাক পেলেই তাকে অনেক ভাবে তোয়াজ করে তবু নিভৃতে ধারণাটা বদলায় নি একেবারে। কিন্তু এই ধারণা থেকে যেন মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল শ্রীমতী সেদিন। আনন্দের সেই উদ্বেল অনুভূতিটা শ্রীমতীর মনের তলায় লেগেই ছিল।

কলেজে পড়তে তো নিজের নামটার ওপরেই সব থেকে বেশী বিরূপ ছিল সে। আয়নার সামনে দাড়ালে শ্রীমতী নাম নিজের কাছেই বিচ্ছিরি একটা বিদ্রূপের মত মনে হত।

ওই স্বল্প-বসনা পরিপুষ্ট সাওতাল মেয়ে তাকে যেন জীবনের অজ্ঞাত সার্থকতার সন্ধান দিয়ে গেছেন একটা। তাই ফিরে এসেই সকলের কাছে ট্রুবিং ক্লাবের প্রস্তাব দিয়ে বসেছিল।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, ওপতীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ দাড়িয়েও একটা ট্যাক্সি ধরা গেল না বাসগুলোতে ভিড়। ভিড়ের পরোয়া করে না, কলেজে পড়তে ভিড় ঠেলে ট্রামে-বাসে উঠতে একটুও খারাপ লাগত না তার। বাড়িতে দু'দুটো গাড়ি, ট্রাম-বাসে উঠত বলে বাবার কাছে বকুনি খেতে হত।

আগের মতই ঠেলেঠুলে একটা দোতলা বাসে উঠে পড়ল শ্রীমতী। এক নজর তাকিয়ে দেখল একতলার লেডীস সীটগুলো সব লেডীদের দখলে। সোজা দোতলায় উঠে গেল সে। সামনে লেডীস সীটটায় দুজন ভদ্রলোক বসে। তাকে দেখে বিরক্ত মুখভঙ্গী করে উঠে দাড়াল তারা। শ্রীমতী বসল। পাশের জায়গাটা খালি।

সীট ছেড়ে উঠে যারা দাড়িয়ে ছিল, তারা পিছনে সরে গেছে, খালি সীটটার পাশে এসে দাড়িয়েছে একটি তরুণ। অস্ফুট স্বরে শ্রীমতী বলল, বসুন।

ছেলেটা কৃতার্থ হয়ে বসল। তারপর সন্তর্পণে একবার মুখ ফেরাল তার দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীব মনে হল, তার চোখে চোখ পড়া মাত্র ছেলেটা যেন নিস্পৃহ হয়ে গেল।

সামনের একটা পুরুষ সীট খালি হল। ছেলেটা টক করে উঠে গিয়ে সেই খালি সীটটা দখল করল। শ্রীমতীর পাশের সীট আবার খালি।

—বসতে পারি?

জবাব না দিয়ে শ্রীমতী একটু সরে বসল, অর্থাৎ পারে।

এবারে পাশে বসল ট্রাউজার আর টেরিলিন পরা একটি লোক। বসেই ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো একবার। আব তার পরেই তেমনি নির্লিপ্ত বিবস মুখ। অন্তত শ্রীমতীর তাই মনে হল।

বাস স্টপ। সামনেব দু'দুটো পুরুষের সীট একসঙ্গে খালি হল। এই লোকটাও চট কবে উঠে গিযে তাব একটা দখল করল, পিছনেব আর একজন আব একটা।

এবারে শ্রীমতীব পাশে তৃতীয় ব্যক্তি। বসা লোক উঠে গেছে দেখে সে অনুমতি না নিয়েই বসল পাশে। এই লোকটার বয়েস হয়েছে কিছু, তবু চোখে চোখ পড়তে শ্রীমতীব মনে হল লোকটার যেন আশাভঙ্গ হবার মত মুখ।

বাস স্টপ। সামনেব আসন খালি। এই লোকটাও উঠে গেল সেখানে।

শ্রীমতীর পাশে চতুর্থ লোক।

শ্রীমতীর কালো মুখখানা কেন যেন শক্ত কঠিন হযে উঠেছে। ইচ্ছে হল এ-লোকটাকে আগেই উঠে দাঁড়াতে বলে। কিন্তু সত্যিই বলা যায না।

আবার বাস স্টপ। আবার তারপরে আবার।

শ্রীমতীব সীট সক্কলের পিছনে। প্রতি স্টপেই সামনের একটা দুটো সীট খালি হচ্ছে, আর তার নির্লিপ্ত পাশেব লোক সবার আগে উঠে গিয়ে সেটা অথবা আর একটা দখল করছে। আব তার পাশে নতুন মুখ এসে বসছে। ফিরে তাকাচ্ছে একবার। আর তাবপবেই সেই মুখে নিস্পৃহতার এমন কি বিরক্তিব ছাযাও পড়ছে।

এসপ্ল্যানেডে আসা পর্যন্ত সপ্তম বা অষ্টম লোক পাশ থেকে উঠে গেল যখন, শ্রীমতীব মুখেব চেহারাই বদলে গেছে। পাশে বসার সময় বেশিব ভাগ লোকেরই আগ্রহ দেখেছে, কিন্তু ওব মুখের দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের অশোভন নিস্পৃহতাব অপমান যেন চাবুকের মত ওকে আঘাত করে সামনের জাযগা পাবার জন্য উন্মুখ হযেছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোবিয়ালে আসা পর্যন্ত নবম দশম একাদশ লোকও একইভাবে পাশ থেকে উঠে সামনে জায়গা নিল। তার পাশে দ্বাদশ লোক। চোখে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখে সেই একই বিরক্তি-মিশেল গাম্ভীর্যের আবরণ।

শ্রীমতীর চাপা-নাক কালো মুখ কতখানি কুৎসিত দেখাচ্ছে এখন সে নিজেই অনুমান করতে পারে। মাথায় আগুন জ্বলছে তার, চোখে খরখরে জ্বালা।

কি একটা দৃশ্য যেন চোখের সামনে এগিয়ে এলো হঠাৎ।...সাঁওতাল পরগণার অর্ধনগ্ন কতগুলো মেয়ে-পুরুষ উৎসবে মেতেছে। তার মধ্যে স্বল্প-বাস, প্রায়

বুক-খোলা, নিটোল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য একটা কুচকুচে কালো মেয়ে—তার নাক চাপা, চোখ ইঁদুরের মত কুতকুতে ছোট—তারই ওপর কতগুলো ভদ্র শিক্ষিত পুরুষের নগ্নলোলুপ দৃষ্টি। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ে, দামী বেশ-বাসে-ঢাকা শ্রীমতীর সঙ্গে ওই সাঁওতাল রমণীর অনেক তফাত—কোথায় তফাত কেন তফাত শ্রীমতী জানে না।

জগুবাবুর বাজারের স্টপেজে সামনের সীট খালি, এবং পাশের দ্বাদশ লোকের গাত্রোত্থান, যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল ওঠার জন্য।

শ্রীমতীর পাশে ত্রয়োদশ ব্যক্তি। ধুতি পাঞ্জাবি পরা সুশ্রী একটি লোক।

...তের সংখ্যাটা কি অশুভ, শ্রীমতী কি বাসসুদ্ধ লোক হাসাবার মতই একটা কিছু কাণ্ড করে বসবে? প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করেছে সে।

কালীঘাট। সামনে তিন-চারটে আসন খালি একসঙ্গে। শ্রীমতীর পাশের লোকটা সেদিকে তাকালো একবার, উঠবে কি উঠবে না পলকের দ্বিধা—ঘাড় ফিরিয়ে শ্রীমতীর দিকে তাকালো একবার। শ্রীমতীর কালো মুখের কালো দুটো চোখ তার মুখের ওপর জ্বলছে ধক ধক করে।

কি ভেবে লোকটা উঠল না। চুপচাপ সামনের দিকে মুখ করে বসেই থাকল। এই ব্যতিক্রম দেখে শ্রীমতী হতভম্ব হতে গিয়েও হল না। মনে হল, লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য যেন হাসির আভাস একটু।

আর সেই মুহূর্তে শ্রীমতীর বুকেব আগুন এবারে বুঝি সত্তা সুদ্ধু জ্বালিয়ে দিল। দয়া দয়া—এই লোকটা দয়া করল তাকে, অনুগ্রহ দেখালো—পিছনে দাঁড়িয়ে এই সীটে লোকের বসা আর ওঠা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে খানিকক্ষণ ধরে, আর ওর প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়—তাই দয়া কবে উঠে গেল না, তাই অনুগ্রহ দেখালো।

আব মাথা সোজা রাখতে পারল না শ্রীমতী, মাথাটা পাশের জানলা আশ্রয় করল।

বাড়ি।

মাথাটা এখন আরো বেশি টলছে শ্রীমতীর। তাকে হেঁটে আসতে দেখে ঝি-চাকর তটস্থ। কারো দিকে না চেয়ে শ্রীমতী সটান ভিতরের দিকে এগুলো। পাশের বসাব ঘরে হৈ-হল্লা হচ্ছে—সুবিনয়ের বন্ধুরা এসেছে, কেউ কেউ নিশ্চয় সস্ত্রীক এসেছে—আর হয়ত তারা তারই প্রতীক্ষায় আছে। সকলের ওপর দিয়ে সুবিনযেব গলা শোনা যাচ্ছে।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এলো শ্রীমতী, তারপর সোজা নিজের ঘরে।

কিন্তু ঢুকতে না ঢুকতে হন্তদন্ত হয়ে দোরগোড়ায় সুবিনয় এসে দাঁড়াল। অবাক মুখ, একি, তুমি ওপরে চলে এলে যে!

এক ঝটকায় শ্রীমতী তার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। সুবিনয় হকচকিয়ে গেল। —ইয়ে, হেঁটে বাড়িতে ঢুকলে শুনলাম, তুমি বেরুবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ি নিয়ে ফিরেছিলাম—

সব থেকে কঠিন পরীক্ষা যেন এখনই—কথা বলতে হবে শ্রীমতীকে। বলল, ঠিক আছে, তুমি যাও এখন, আমার শরীর খারাপ—

সুবিনয় ঘাবড়েই গেল, এই চোখ মুখ দেখেও বিশেষ কিছুই হয়েছে মনে হল তার।—কি হয়েছে, একজন ডাক্তার-টাক্তার—

—তুমি যাবে এখন এখান থেকে, এই মুহূর্তে যাবে?

মুখের ওপর এক পলক আগুনের ঝাপটা খেয়ে সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল সুবিনয়। আর তার মুখের ওপর দরজা দুটো সশব্দে বন্ধ করে দিল শ্রীমতী।

কোনো রকমে চেয়ারটায় বসল ধুপ করে! মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে।...বন্ধুরা অনেকেই এসেছে হয়ত, আর সকলে তারই অপেক্ষা করছে। আসলে মনে মনে ওরা বাসের লোকগুলোর মতই ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে। শ্রীমতীর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে আকর্ষণের এতটুকু ছিটে-ফোঁটাও কোথাও নেই। তার মধ্যে কোনো রূপ কেউ কোনোদিন দেখে নি।...সুবিনয়ও না। তবু সকলে কাছে আসে, তোয়াজ তোষামোদ করে। তার কারণ, রূপবতী না হোক, শ্রীমতী রূপাবতী। শুধু সেই জন্যে। শুধু সেই জন্যেই।

কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আক্রোশে ছোঁ মেরে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। অ্যাটর্নীকে হুকুম দেবে, হঠাৎ পাওয়া টাকাটার পাইপয়সা পর্যন্ত কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেবে।

কিন্তু অ্যাটর্নীর পরিচিত নম্বরটা ঘুলিয়ে গেল। কত? আঃ!

অপরিসীম বিরক্তিতে ফোন-গাইডটা টেনে নিল। পাতা ওলটানোর অসহিষ্ণুতায় পাতা ছেঁড়ার দাখিল।

ওদিকে সামনের ছাপা অক্ষরগুলো ঝাপসা দেখছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে ছোট চোখ থ্যাবড়া নাক স্বল্প-বাস যৌবন-প্রাচুর্যে উচ্ছল একটা সাঁওতাল মেয়ের মুখ, আর তাকে ঘিরে ভদ্রলোকদের লোভাতুর জোড়া জোড়া চোখ।

...কিন্তু সেও পরিপূর্ণ, তার সঙ্গে এই তিন-মহল প্রাসাদ-বাড়ির শ্রীমতীর অনেক তফাত।

আরো অসহ্য, অসহিষ্ণু বিরক্তিতে গাইডে অ্যাটার্নীর নাম খুঁজছে শ্রীমতী চৌধুরী।

বিকেল সাড়ে চারটার পটভূমি

মহাদেব সান্যাল দিল্লী গেছলেন। ফেরার পথে এখানে নামার কথা একবারও ভাবেন নি। এমন কি স্টেশনে আসার দু'ঘণ্টা আগেও ভাবেন নি।

কলকাতা যত কাছে এগিয়ে আসছিল তত মনে হচ্ছিল, আর কটা দিন পরে গেলে কি হয়?...একেবারে সেই দিন সকালে গিয়ে উপস্থিত হন যদি?

...সেই দিনের আরো চারটে দিন বাকি মাঝে।

এই ক'টা দিন তিনি না থাকলেও কিছু আটকাবে না। ব্যবস্থাপত্র সব করাই আছে। দু পক্ষের সম্মতিক্রমে এই ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থা। তাঁরই দুই উকিল কেস বুঝে নিয়েছে। তারা দুজন দুজনের হয়ে আইনগত বিচ্ছেদ চাইবে। ব্যবসায়ের কাজে তিনি দিল্লী

রওনা হবার আগেই দুজনের বোঝাপড়া সইসাবুদ হয়ে গেছে। এখন ওই দিনে তিনি উপস্থিত না থাকলেও কিছু আটকাবে না। তবে অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছেও তাঁর নেই।

যা ঘটতে যাচ্ছে, গোড়ায় গোড়ায় তাতে তাঁর সায় ছিল না। প্রতিভাকে বরং অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই তেতাল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রীটি তাঁর আর কারো ঘরণী হবে সেটা একবারও মনে হয় নি। তাঁর আটচল্লিশ পেরুতে চলল, স্ত্রীর তেতাল্লিশ হবে। বয়েস ছাড়া অন্য বাস্তব দিকও আছে। তিনটি ছেলেমেয়ে, তাদের প্রতি স্ত্রীর দবদ নেই একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তারা মা-অন্ত-প্রাণ। তা ছাড়া স্ত্রীটিকে তিনি নির্বোধ মনে করেন না, তার স্তাবক-সংখ্যা যতই হোক, আর উঁচু সামাজিক মহলে তার যত সমাদর থাক—সব কিছুর মূলেই যে স্বামীর অঢেল বিত্ত, এটা তাব না বোঝার কথা নয়।

আসলে এটা রাগ আব গোঁ। তাঁব উপর আক্রোশ। মহাদেববাবু তাই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, আমরা যেমন আছি তেমন থাকতে দোষ কি? কেউ কাবো ব্যাপারে কোনোরকম বাধাসৃষ্টি না কবলেই হল।

গাড়িব দোলানিতে চোখ বুজে যেন প্রতিভার সেই মুখখানাই দেখছিলেন মহাদেববাবু। চোখের সামনে হাসি মুখও যেন দুলছিল। প্রতিভার এই আশ্চর্য গুণটাই লক্ষ্য কবেছিলেন তিনি। তার যত বাগ হয়, চোখেব কোণে আর ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক তত বেশি লুকোচুরি খেলে।

হ্যা, প্রতিভা ঠিক তেমনি করেই হেসেছিল আর দেখেছিল আর বলেছিল। বলেছিল, তোমাব আপত্তি কেন? তুমি উঁচু মহলের মাথায় বসে আছ, তোমাকে নিয়ে লোকে আলোচনা করবে, কানাকানি করবে, তোমার সম্ভ্রম নষ্ট হবে—সেই জন্য?

মহাদেববাবু অস্বীকার কবেন নি। বলেছিলেন, তাও সত্যি। তাছাড়া ছেলেমেয়ে আছে—

ছেলেমেযের কথা ছাড়ো, তারা তোমাকে আমাকে দুজনকেই দেখছে। তোমার যে সমস্যাটা সেটা দু'দিনের, লোকে চিরকাল কি; পরের কথা নিয়ে থাকে না। তাছাড়া তোমার মণিমালা আছে, ভাবনা কি, দেখতে দেখতে মন ভাল হয়ে যাবে।

গম্ভীর মুখে পাল্টা খোঁটা দিয়েছিলেন মহা দববাবু, একজন ছেড়ে তোমাবও মন ভাল কবার মত পাঁচ সাত জনের নাম আমি করতে পারি।

পারো? প্রতিভার সেই হাসি প্রায় নির্লজ্জ মনে হয়েছিল—তাহলে আর আমাদেব সমস্যাই বা কি বাধাই বা কি?

না, প্রতিভাকে বুঝিয়ে নিরস্ত করা যায় নি। ফলে মহাদেববাবুকে ভাবতে হয়েছে। আব যত ভেবেছেন ভাবনাটা তত যেন ফিকে হয়ে এসেছে। একটা সহজাত সংস্কার বশেই ধাক্কা খেয়েছিলেন প্রথম। নইলে এমন কি চিন্তাচ্ছন্ন হবার মত ব্যাপার। এ বকম হামেশাই হচ্ছে। ক্রমশ উল্টো ধরনের স্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

তাঁর এত টাকা, এত ঐশ্বর্য, এত প্রতিপত্তি, কিন্তু ভিতরটা যেন মনের মতন স্বাধীন নয়। প্রতিভা তাঁর খবরও রাখে না, তার নিজের আচরণই এমন কিছু গঙ্গা জলে ধোয়া নয়—তবু মহাদেববাবুর কেমন মনে হত, স্ত্রীর চোখ যেন সদা পাহারা

দিযে চলেছে। তাই নিজেদেব অগোচবে দুর্নীবিক্ষ এক অস্বস্তিব হাওযা ভিতবে ভিতবে জমাট বেঁধে উঠছিল কেমন।

সেটা হালকা হযে যাচ্ছে। অস্বস্তি কমছে। এক ধবনেব নতুন স্বাধীনতাব স্বাদ পাচ্ছেন তিনি। মুক্তিব স্বাদ পাচ্ছেন।

তিনি বাজী হযেছেন। বাজী হবাব পব আবো হাল্কা লেগেছে।

না, কাউকে তিনি বঞ্চিত কবলেন না। ছেলেমেযে কোনো অভাব টেব পাবে না। কলকাতাব অতবড বাডিটা তো স্ত্রীব নামেই লেখা। ছেলেমেযেব নামেও তিনখানা বাডি লিখে দেবেন কথা ছিল। তাই দেবেন। আব টাকাও দেবেন। আব প্রতিভা যদি হাস্যকব কিছু না কবে বসে তো তাবও কিছুব অভাব বাখবেন না তিনি। সে আশ্বাস তাকে দিযেই বেখেছেন।

আব নিজে তিনি কি কববেন? এই আটচল্লিশ বছব বযসে মণিমালাকে নিযে ঘব বাধবেন আবাব? না, তা তিনি কববেন না। মণিমালা অতটা প্রত্যাশাও কবে না। প্রতিভাব মত সে তাব জীবনটাকে সুদ্ধু দখল কবে বসতে চায নি। অন্ধ পিপাসায তিনি যখন ছুটে যান তাব কাছে, প্রসন্ন উদাবতায মণিমালা কৃতজ্ঞতাব ঋণ শোধ কবে। সে স্কুল মাস্টাবি কবত। সেই স্কুলেব মানী সেক্রেটাবী হিসাবে সামান্য পবিচয ছিল মহাদেববাবুব সঙ্গে। মাকডসাব জালেব মত এক চক্রেব মধ্যে জীবন বিপন্ন হতে চলেছিল তাব। দেশেব ক্ষতিকব কাজে লিপ্ত বলে সেই চক্র বাজদ্বাবে অভিযুক্ত। পবদেশীব সঙ্গে বেআইনী সংযোগ তাদেব। শিক্ষিতা উচ্চাভিলাষী সুরূপা বমণীব প্রযোজন হযেছিল তাদেব। সেই জটিল প্রযোজনেব বলি হতে চলেছিল মণিমালা।

এখন তাব জেলে থাকাব কথা। নযত তাব আগেই ভযে এসে নিজেব জীবনেব ওপব শেষ কিছু একটা কবে বসে থাকাব কথা। তাই কবত, যদি না মহাদেব সান্যালেব অভয পেত। মণিমালা তাব কাছে এসে ভেঙে পডেছিল, তাব আশ্রয ভিক্ষা কবেছিল। নিজেকে তাব পাযে সমর্পণ কবেছিল।

ভযাবহ এক অনিবার্য বিপদ থেকে এত সহজে মুক্ত হযেছিল যে নিজেই অবাক মণিমালা। যাবা তাকে আইনেব কাঠগোডায এনে দাড কবানোব জন্য খোজাখুজি কবছিল, তাদেবই দণ্ডমুণ্ডেব মুরুব্বিবা তাকে খাতিব কবেছে, তাব অন্তবঙ্গ হযে উঠেছে। মহাদেব সান্যালেব নিভৃত জীবন যে বমণীব সঙ্গে যুক্ত, সে তাদেব খাতিবেব পাত্রী, সমাদবেব পাত্রী। আব যে চক্রেব কালো ছাযা পডেছিল তাব ওপব? সেটা ছাযাই। একটা ভুলেব ব্যাপাব মাত্র। ভুল বুঝলে কে আব তা নিযে মাথা ঘামায?

সেই মণিমালা ইচ্ছে কবলে এখন মহাদেববাবুকেও জীবন থেকে ছেটে দিতে পাবে। মহাদেববাবুব চেষ্টাতেই সে অভিনেত্রী জীবনে প্রবেশেব পথ পেযেছিল। এখন সে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। বোজগাব ভাল কবে, অপচয নেই। তাব গুণমুগ্ধেব সংখ্যা বাডছে ক্রমশ। তাব সংযত অভিনযেব সমালোচনায সমালোচক উদাব।

কিন্তু এখনো তাব প্রীতিব অন্দবমহলে প্রবেশেব পথ একমাত্র মহাদেব সান্যালেব জন্যেই খোলা। সেখানে দ্বিতীয আগন্তুকেব সম্ভাবনা দেখা দেয নি। তাব যাবতীয ব্যযভাব মহাদেব সান্যাল বহন কবেন। প্রশ্রয পেলে সে ভাব বহনে অনেকেই সাগ্রহে এগিযে

আসবে এখন। কিন্তু সে রকম প্রশ্রয় পায় না কেউ।

দিল্লী রওনা হবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের খবরটা মণিমালাকে জানিয়েছিলেন মহাদেববাবু। শুনে মণিমালা দুঃখিত হয়েছিল। আর সেই জন্যেই এত ভাল লেগেছিল মহাদেববাবুর।

সব শুনে সে চুপ করে বসেছিল খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার জন্যে?

মহাদেববাবু মাথা নেড়েছেন।—না, তুমি উপলক্ষ মাত্র। এ হতই, আমার জীবনের ওপর সে মাস্টারি করতে পারল না বলেই এ রকম হল। সেটা বরদাস্ত করার ধাত নয় আমার।

তারপর একটু যেন ভয়ে-ভয়েই মহাদেববাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এর পর আমরা কি করব, বিয়ে?

মণিমালা জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি বলো?

...ভাবছি। এই বয়সে আবার একটা হৈ-চৈয়ের মধ্যে ঢুকব?

মণিমালা আশ্বস্ত করেছে তক্ষুনি, কি দরকার, বেশ তো আছি...।

মহাদেব সান্যাল নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যবসার কাজে দিল্লী গেছেন। সেখানে অবসর সময়ে প্রতিভার কথা নয়, মণিমালার কথাই ভেবেছেন। যত ভেবেছেন তত তাঁর ভাল লেগেছে। মনে মনে কলকাতায় ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন শুধু তার টানেই। এমন কি দু'ঘণ্টা আগেও তিনি তার কথাই ভাবছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল।

বিকেল তখন ঠিক সাড়ে চারটা। মহাদেববাবু দেখছেন।

শরীরটা কেমন অস্থির করতে লাগল। হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী তিনি। একটা মানসিক ভয়ে প্লেনে চলাফেরা করেন না—ট্রেনেই যাতায়াত করেন। রিজার্ভ কুপেতে একা যাত্রী তিনি। ভাবলেন প্রেসারটা বেড়েছে, তাই অসুস্থ বোধ করছেন।

কিন্তু অস্থিরতা ক্রমে বাড়তে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাকে মনে পড়ল তাঁর। শরীর একটু অসুস্থ হলে আগে সে কি কাণ্ডই না করত। একেবারে সেরে না ওঠা পর্যন্ত সমস্তক্ষণ কড়া পাহারায় রাখত তাঁকে, ডাক্তারের নির্দেশ এক চুল নড়চড় হতে দিত না।—হাজার জরুরী কাজ থাকলেও তার শাসনে পড়ে সব সিকেয় তুলে রাখতে হত।

না, প্রতিভার চিন্তা থাক। তাড়াতাড়ি অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ফলে তার কথাই বেশি মনে হতে লাগল।...সেবারে মুসৌরিতে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এখন তাঁর জীবনে মণিমালা এসে গেছে। মানসিক সমাচার দুজনের একজনেরও কুশল নয়।

কিন্তু সত্যিই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে প্রতিভা এক সময় তাঁর শয্যার পাশে এসে বসল। আর তারপর ক'টা দিন দুজনেই যেন সেই আগের দিনে ফিরে গেল। মহাদেববাবু এ-কথা অস্বীকার করতে পারেন না, অসুখ হয়ে পড়লে প্রতিভার থেকে বেশি নির্ভর আর কারো ওপর করা যায় না। অসুখ হলে তাঁর পুরনো ডাক্তার ঠাট্টা

করত, আপনার স্ত্রী এসে বিছানার পাশে বসুন, পালাতে কতক্ষণ।

যা ভাবতে চান না তাই ভাবছেন বলেই নিজের ওপর বিরক্ত মহাদেব সান্যাল। কিন্তু আশ্চর্য, ভাবতে না চাইলেই অসুস্থতা বাড়ছে, কি রকম যেন একটা অস্বস্তি। উঠে আয়নায় মুখ দেখলেন। না, মুখ তেমন লাল হয় নি। প্রেসার বেশি বেড়ে গেলে মুখ লাল হয় তাঁর। উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। কিন্তু তেমন কষ্টও হচ্ছে না। অথচ কি রকম যেন ফাঁপর-ফাঁপর লাগছে।

উঠে পাখাটা পুরোদমে খুলে দিলেন। তবু যতটা বাতাস পেলে ভাল হয়, ততটা বাতাস নেই যেন।

কলকাতায পৌঁছেই সোজা মণিমালাব ওখানে চলে যাবেন স্থির কবেছিলেন। কিন্তু অসুস্থ বোধ কবাব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার চিন্তাটা যেন মণিমালাব চিন্তাটাকে ঠেলে সরিযে দিল। তিনি অসুস্থ আর প্রতিভা তাব সামনে আছে ভাবতে চেষ্টা করলেই আব অতটা খাবাপ লাগে না, ভিতবেব অস্বস্তিকব চাপ ভাবটা কমে আসে।

তাজ্জব ব্যাপাব—অসুস্থ বোধ কবা মাত্র প্রতিভা যেন তাঁব কাছে এসে গেছে। আত্মস্থ হতে চেষ্টা কবলেন মহাদেব সান্যাল, ছাড়াছাড়ি হবেই যখন, এ-বকম মানসিক দুর্বলতাব প্রশ্রয় দেওযা উচিত নয।

কিন্তু মনেব খবব কে বাখে। এই স্টেশনটা আসার আধ ঘন্টা আগেই শবীরের কথা ভুলে গেলেন মহাদেব সান্যাল। নিজেব সঙ্গে খানিক যুঝে হঠাৎ স্থির করে ফেললেন, এখানে নামবেন তিনি। ক'টা দিন থেকে যাবেন। অসুবিধে কিছু হবে না, তাঁর নিজের বাড়ি এখানে—মস্ত কম্পাউণ্ড ঘেবা বাড়ি, দুটো চাকর আর দুটো মালী আছে। আগে বছবেব মধ্যে কতবাব যে বিনা নোটিসে প্রতিভাকে নিয়ে হুট করে চলে আসতেন এখানে, ঠিক নেই। চাকব আব মালিরা জানে মনিব তাদের যে কোনো সময়ে এসে হাজির হতে পাবে। কেউ আসুক বা না আসুক, একটা সংসাবেব যাবতীয সরঞ্জাম নিয়ে তারা সর্বদা প্রস্তুত।

সাঁওতাল পবগণার এই স্বাস্থ্যকব জাযগায শুধু স্বাস্থ্যবক্ষাব তাগিদেই এত বড বাড়ি কিনে বসেন নি মহাদেব সান্যাল। এই জাযগাটাব সঙ্গে তার জীবনেব একটা বড স্মৃতিব যোগ। শুধু তাব জীবনেই না, প্রতিভাব জীবনেরও। এইখানেই প্রথম দেখা দুজনেব। প্রথম আলাপ, প্রথম পবিচয। সেই দেখা সেই আলাপ সেই পবিচযেব এই পবিণাম কল্পনারও অগম্য ছিল সেদিন। নির্জন জায়গায অতবড একটা বাড়ি মহাদেববাবুই জোব করে কিনেছিলেন। প্রতিভা বলেছিল, আমার এখানে থাকতে ভয় করবে।

কিন্তু বাড়ি যখন কেনা হলই, তার মনেব মত করেই সে সাজিয়েছিল বাড়িটাকে। দেখার মত বাগান করেছিল। গোটা বাংলোটাকে তকতকে করে তুলেছিল। মহাদেববাবু তাকে নিয়ে যখনই আসতেন, সঙ্গে বাড়তি কয়েকজন লোক আর বন্দুক দুটো নিয়ে আসতেন। বন্দুক ছাড়া এই নির্জনতা খুব নিরপাদ নয়। পাঁচ-সাতবার আসার পর ভয় কমে গেছল, তবু বন্দুক থাকতই সঙ্গে।

এখানে না নেমে পারলেনই না মহাদেববাবু। পুরনো স্মৃতি যেন তাকে টেনে

নামালো। না নামার কথা যতক্ষণ ভাবছিলেন, ততক্ষণই শারীরিক অস্থিরতা আর অসুস্থতা বুঝি চারগুণ হয়ে বুকে চেপে বসছিল। নামবেন স্থির করতেই ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হল, সুস্থ হল। তারপর অসুখের কথা মনেও থাকল না। তিনি নেমে পড়লেন।

ঘোড়ার গাড়িতে যখন বাড়ির ফটকে এসে পৌঁছুলেন তখন সবে সন্ধ্যা। হাওয়া নেই বেশি। চারদিকের গাছপালাগুলো যেন রাত্রির অভ্যর্থনায় মৌন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। গাড়োয়ান ভাড়া নিয়ে চলে গেল। অদূরের পাহাড়টা আকাশের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

মহাদেববাবু বিস্মিত একটু। সামনের ফটক হাঁ-করা খোলা, আরো বিস্মিত বাংলোব দিকে চেয়ে। সব ক'টা ঘরে, বারান্দায়, জোরালো আলোগুলো জ্বলছে। আরো আশ্চর্য, যে-ঘরেব দরজা-জানলা বন্ধ থাকবার কথা, সেগুলোও খোলা মনে হচ্ছে। তিনি আসছেন জানা থাকলে যেমন হয় তেমনি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন তিনি। তক্ষুনি যে হঠাৎ কেন বন্দুকের কথা মনে হল তাঁব, কে জানে। বন্দুক আনা হয় নি। অবশ্য বন্দুকের চিন্তা বাতিল কবে দিলেন। চারটে বিশ্বস্ত লোক থাকে, ভয়ের কি আছে।

...রাতে গবম হবে খুব মনে হয়। এক ফোঁটা হাওয়া নেই। ঘষা স্লেট-রঙা আকাশের চামড়াব নীচে অনেকটা জায়গা জুড়ে আগুন লেগেছে যেন। মহাদেববাবু দাঁড়িয়ে দেখলেন একটু, তাবপর বাংলোয় উঠলেন।

এদিক ওদিক চেয়ে হতভম্ব তিনি। সত্যিই সব ঘরদোর খোলা। অথচ চাকব বা মালী কারো দেখা নেই। রাগে বিরক্তিতে সমস্ত মুখ চোখ অন্য রকম হয়ে গেল তাঁর। সব কটাকে একসঙ্গে বরখাস্ত করবেন বোধ হয়। এইভাবে তারা বাড়ি বক্ষা করে, তিনি ভাবতেও পারেন না।

কিন্তু অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে। কি রকম যেন ঝিমুনি আসছে। নিজে যে ঘবে থাকেন সেই ঘবে ঢুকলেন। শুয়ে পড়বেন।

ঢুকেই হতভম্ব। নিজের দুটো চোখকে যেন বিশ্বাস কবতে পারছেন না। প্রসাধন শেষ করে তাঁর দিকে হাসি মুখে ফিরে দাঁড়াল প্রতিভা। বলল, এসো, মালী আর চাকবের ওপব রেগে আগুন হয়েছ তো? ওদের আমি আজকের রাতেব মত ছুটি দিয়েছি।

মুখে তবু কথা সরে না মহাদেববাবুর। এই জন্যেই কি হঠাৎ এখানে আসার এমন আকর্ষণ অনুভব করছিলেন তিনি। প্রতিভা এখানে এসেছে বলে। মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে নির্গত হল—তুমি!

প্রতিভা হাসছে। ঘরের জোরালো আলোর দরুন কিনা বলা যায় না, হাসিটা উজ্জ্বল মনে হচ্ছে মহাদেববাবুর। বলল, এত অবাক হচ্ছ কেন, এখনো তো কোর্টে কেস পর্যন্ত ওঠে নি, স্ত্রী যে সেটা এখনো অস্বীকার করতে পারো না।

মহাদেববাবু শয্যায় বসলেন। খাটের উপর বিছানাটা বেশ পরিচ্ছন্নভাবে পাতা। বসাব সঙ্গে সঙ্গে মহাদেববাবুর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। গরম লাগছিল, জামাটা খুলে ফেললেন। গম্ভীর মুখে বললেন, অস্বীকার তুমিই করতে চেয়েছ। এখানে একা এসে গেলে, চাকরবাকরগুলোকে পর্যন্ত ছুটি দিলে—আমার তো আসার কিছুই ঠিক

ছিল না, হঠাৎ এরকম একলা থাকার দুঃসাহস হল কেন?

মুখ টিপে হাসছে প্রতিভা। আর মহাদেববাবু অস্বস্তি বোধ করেছেন, কারণ হাসিটা সুন্দর লাগছে তাঁর। শুধু সুন্দর নয়, ধারালোও। বলল, একা কোথায়, তুমি তো এলে।

—বললাম তো, আমি আসব সেটা আমি নিজেই জানতাম না।

প্রতিভা তেমনি লঘু জবাব দিল, মনের কথা কে জানে বলো, কে যে কখন আসে।

মহাদেববাবুর মনে হল, প্রতিভার এরকম হালকা মেজাজ অনেক দিন দেখেন নি। অবশ্য দেখাসাক্ষাৎ হয়ও না তেমন। হঠাৎ তাঁকে দেখে প্রতিভার একটা আপস কবাব ইচ্ছে কিনা বুঝলেন না। কিন্তু মহাদেববাবু আব তা চান না, ব্যাপার এখন অনেক দূর গড়িয়েছে।

তবু ভিতরে ভিতবে মন একটু নির্ভরশীল হয়ে উঠতে চাইছে যেন। শরীরটা খাবাপ বলেই বোধ হয়। বলেও ফেললেন সে কথা।—শবীরটা ভাল লাগছে না, একটু ঘুমুতে পারলে হত।

আগে তাঁর শরীর খারাপ শুনলেই প্রতিভা সচকিত হত। এখন শুধু চেয়ে আছে তাব দিকে। এই চাউনিটাও কেমন ধাবালো মনে হচ্ছে তার। প্রতিভা আট দশ হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে তেমনি।

একটু চুপ করে থেকে মহাদেববাবু আবার বললেন, বাতটা থেকে কাল সকালের গাড়িতেই চলে যাব ভাবছি, তুমি কি সত্যিই এখানে একা থাকবে নাকি।

জবাব দেবার আগে প্রতিভা তেমনি চেয়ে রইল খানিক। তার এই নির্নিমেষ চাউনিটাই কেমন যেন সহ্য করে উঠতে পারছেন না মহাদেববাবু। তারপর বলল, না, একা থাকব না, তুমিও থাকবে। আব একা থাকার ইচ্ছে আমাব নেই।

মহাদেববাবু সচকিত। ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল।—তার মানে?

প্রতিভা হেসে উঠল খিলখিল করে। সেই হাসি একটা অস্বস্তি হয়ে তাঁর বুকের ভিতরে ছড়াচ্ছে। তেতাল্লিশ বছরেব প্রতিভা এখনো এমন ছেলেমানুষের মত হাসতে পারে তা যেন ভুলেই গেছলেন।

এই সহজ কথাটাব মানে বুঝতেও এত কষ্ট হচ্ছে তোমার?

একটু হচ্ছে। মহাদেববাবু জবাব দিলেন, আমার সঙ্গে থাকার পাট তো তুমি চুকিয়ে ফেলেছ।

এখনো ফেলি নি। তুমি কোন আশায় আছ—পাট চুকলেই পাকাপাকি ভাবে তোমার মণিমালার শরণাপন্ন হবে? আমি অনেক ভেবে দেখলাম—

মহাদেববাবু মুখ গোঁজ করে বললেন, কিন্তু একটু আগে ভাবলে ভাল হত না কি?

তরল কণ্ঠে প্রতিভা জবাব দিল, এমন আর কি দেরি হয়েছে, তোমার ভুল শোধরানো আমার কর্তব্য।

ভুল তোমার হয় নি?

· তোমার জন্যেই হয়েছে। তুমি যত বড়লোক হয়েছ তত বাঁকা রাস্তায় চলেছ।

মহাদেববাবু তক্ষুনি জবাব দিলেন, বাঁকা রাস্তায় তুমি চলো নি? দশজনকে পিছনে নিয়ে ঘোরো নি? আমি তোমার স্বাধীনতায় হাত দিতে গেছি?

আবার সেই হাসি, যে হাসি দেখে বার বার বিচলিত হয়ে পড়েছেন মহাদেববাবু। হাসি থামিয়ে প্রতিভা বলল, আমি বাঁকা রাস্তায় চলেছি তোমার জন্যে, ঈর্ষা জাগিয়েও তোমার চোখ দুটো যদি আমার দিকে ফেরাতে পারি সেই আশায়। কি ছেলেমানুষী না করেছি। তোমার টাকা রোজগারের নেশাটা যে এমন এক পাহাড়ের মত অনড় ব্যাপার—সেটা চোখে দেখেও একমাত্র সত্যি বলে বিশ্বাস করতে মন চায় নি।

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে প্রতিভার হাসি মিলিয়ে গেল—দু'চোখ করকরে হয়ে উঠতে চাইল।

মহাদেববাবুর বসে থাকতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। বালিশ উঁচু কবে ঠেস দিলেন। বললেন, শরীরটা আমার কি রকম লাগছে সেই ট্রেন থেকে, নিজের দোষ-গুণের হিসেব নিয়ে বসতে এখন ভাল লাগছে না—তুমি সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছ কেন, বোসো।

প্রতিভা বসল না। এবারে চোখ দুটো হাসলে যেন। বলল, বসে কি করব, সেবা করব? আমি কাছে বসলে কি তোমার আর ভাল লাগবে?

চোখ টান করে প্রতিভাকে দেখলেন মহাদেববাবু। বলতে পারলে বলতেন, হ্যাঁ ভাল লাগবে। বলতেন, মাথায় আগের মত একটু হাত বুলিয়ে দিলে আরো ভাল লাগবে। প্রতিভাকে কতদিন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেন নি তিনি। তার বয়েস দিন দিন কমছে না ঠাওর করা শক্ত। নীলাম্বরি শাড়ি পরেছে, গায়ে সাদা সিল্কের ব্লাউজ, তাতে নীল স্ট্রাইপ।

সচকিত হলেন মহাদেববাবু, প্রতিভাব এই বেশই তিনি একদিন পছন্দ করতেন বটে। হয় লাল শাড়ি আর সাদা সিল্কের ওপর লাল স্ট্রাইপ, নয়ত নীল শাড়ি আব নীল স্ট্রাইপ। এই বয়েস বলেই প্রতিভা লাল আর পরে নি হয়ত, নীল পরেছে।

প্রতিভার সবই সুন্দর লাগছে আজ। মহাদেববাবুর চোখে, মনের তলায় কি এক অজ্ঞাত অনুশোচনাও যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। শুধু মাঝে মাঝে অস্বস্তি বোধ করছেন ওই সুন্দব মুখের ধাবালো ভাবটা দেখে—তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে এক একবার ভিতব দেখে নিচ্ছে সে।

বললেন, না, সেবার আশা আর রাখিনে। যাক, দেখা যখন এখানে এইভাবেই হয়েই গেল, তিক্ততার দিকটা দুজনেরই বাদ দিয়ে চলতে চেষ্টা করা ভাল নয় কি। তাছাড়া একটু আগে ওসব কথাই তো কি বলছিলে—সত্যিই এখন কি চাও তুমি?

প্রতিভা সাগ্রহে এগিয়ে এলো দু'পা। তার এবারের কণ্ঠস্বরে চাপা উদ্দীপনা। —আমি যা চাই তা শুনবে? আমি যা করতে বলি তা করবে? পাপ স্বীকার করবে?

আগ্রহ উদ্দীপনায় ওই জ্বলজ্বলে চোখে চোখ রাখতে পারছেন না মহাদেববাবু। ভিতরে ভিতরে কেমন শক্তিহীন হয়ে পড়ছেন তিনি। প্রতিভার গলার স্বরটা বুঝি একটা মাদকতা ছড়ানো নেশার বস্তুর মত কানের ভিতর দিয়ে নিভৃতের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে। মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না, অথচ হাত বাড়িয়ে

তাকে কাছে টেনে আনতে ইচ্ছে করছে, আর তার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

অস্ফুট স্বরে বললেন, কি পাপ...

কি পাপ জানো না? প্রতিভার মুখ চাপা ক্ষোভে ঝলসে উঠল আবার। তোমার লক্ষ লক্ষ টাকার গায়ে রক্তের দাগ দেখতে পাও না? আজ তুমি আমাকে ছাড়তে চাও ভয়ে, আমি বরাবর সেই দাগ দেখে আসছি বলে—মণিমালাকে তুমি একটুও ভালবাসা না, তুমি তাকে চাও শুধু তার কাছে নিজেকে নিরাপদ ভাবো বলে। কোথা থেকে তোমার এত টাকা, যে হিসেব সে কোনোদিন নিতে চাইবে না বলে। কিন্তু আজ এখানে শুধু তুমি আর আমি। তোমার পাপ স্বীকার করতে বাধা কি? যে টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছ, সে সব কত মাযেব কত শিশুব কত স্বামীর কত স্ত্রীর রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে আছে সেটা একবাব চোখ চেয়ে দেখতে বাধা কি? দেখেও দেখো না, চোখ বুজে দেখো, দেখবে।

শরীরটা অদ্ভুত অবশ লাগছে মহাদেববাবুর। চোখেও যেন ঠিক দেখতে পারেন না। প্রতিভার চাপা উত্তেজনা ভরা কণ্ঠস্বর যেন দেহের বাঁধনগুলো কেমন ঢিলে ঢিলে করে দিয়ে গেল। নিজেব অজ্ঞাতেই হাত বাড়ালেন তিনি, বললেন, প্রতিভা তুমি কাছে এসো।

আসব, খুব আসব। কিন্তু আজ আমাদেব সব ভোলা দরকার, যত কালো যত কুৎসিত সব এই এক রাতেব জন্য ঝেঁটিয়ে দূর কবা দরকার। বলেই দ্রুত ওধারে গিয়ে কি যেন নিয়ে এলো সে। চোখ টান করে মহাদেববাবু দেখলেন, কাগজ আর কলম। বলল, এই নাও লেখো, ভয় কি, আমি তোমার খুব কাছে আসব যত কাছে চাও। কিন্তু তার আগে লেখো, কত টাকা তোমার লেখো, একটা করে অঙ্ক লেখো আর দেখো ঠিক ততগুলি করে জীবন হাহাকার কবছে, লেখো আর দেখো, লেখো!

কলম তুলে নিলেন মহাদেববাবু, না নিয়ে যেন উপায় নেই। প্রতিভা কি করে যেন তার সমস্ত শক্তি হাতেব মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। তাকে কাছে আনা দরকার, তাকে কাছে পাওয়া দবকাব, তাকে বুকে টেনে নিতে না পাবলে তিনি যেন আর দম পাচ্ছেন না। যত তাড়াতাড়ি লিখতে পাবেন তত যেন মঙ্গল, তত তাড়াতাড়ি বুঝি আশ্রয় মিলবে তাব।

কাগজেব ওপর কলম থমকে গেল তবু। চোখ টান কবে দেখতে চেষ্টা করলেন প্রতিভাকে। বাব বার চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। আগ্রহ উত্তেজনা উদ্দীপনা প্রতিভাব সমস্ত চোখে, আবো চাপা গলায় হিস হিস করে বলছে সে। লেখো লেখো, টাকার অঙ্ক বসাও আর জীবনের হাহাকাব শোনো, দেখছ না, আজ আমরা দুজনে কিছু একটা কবব বলে ঘরের বাতাস সুদ্ধ থেমে আছে, আলোগুলো চেয়ে আছে। এই তো আমি কাছে এসেছি, ভয় কি, লেখো লেখো—

আচ্ছন্নেব ঘোরে মন্ত্রমুগ্ধেব মত টাকার অঙ্ক বসাতে লাগলেন মহাদেববাবু।

দশ হাজার...বিশ হাজার...পঞ্চাশ হাজার...এক লক্ষ...এক লক্ষ বিশ...দেড় লক্ষ...দু'লক্ষ...

কানের কাছে হিস হিস করছে প্রতিভার কণ্ঠস্বর। লেখো, থেমো না, লেখো আর মৃত্যু দেখো—কত মৃত্যু টাকার তলায় চাপা পড়ে আছে, দেখো!

...আড়াই লক্ষ...তিন লক্ষ...পাঁচ লক্ষ...দশ লক্ষ...

লেখো! লেখো! আমি আরো কাছে এসেছি, আরো অনেক কাছে আসব, লেখো! বারো লক্ষ...চোদ্দ লক্ষ...সতের লক্ষ...বিশ লক্ষ...পঁচিশ লক্ষ...

লক্ষ লক্ষ লোকের আর্ত চিৎকারে কানে তালা লাগছে মহাদেববাবুর, হৃৎপিণ্ড থেমে যেতে চাইছে। ব্যাকুল নেত্রে প্রায় পার্শ্বলগ্ন নির্মম রমণীর দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেন তিনি।

লেখো লেখো লেখো!

...তিরিশ লক্ষ...চল্লিশ লক্ষ...পঞ্চাশ লক্ষ...

আর পারছেন না মহাদেববাবু, আর পারছেন না এই আকাশ কাঁপানো লক্ষ লক্ষ লোকের আর্ত হাহাকাব সহ্য করতে। ওই আর্ত রোলে সমস্ত পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে নাকি!

লেখো লেখো। লেখো আর শোনো। এই দেখো আমি কত কাছে এসেছি, কত —কত কাছে এসেছি দেখো। লেখো লেখো লেখো লেখো!

ষাট লক্ষ...সত্তর লক্ষ...আশী লক্ষ...

আর পারলেন না মহাদেববাবু, বিভ্রান্ত দু'চোখ মেলে তাকালেন শুধু একবার। —হ্যাঁ, প্রতিভা তাঁর কাছে—খুব কাছেই বটে। তার হাতের স্পর্শ পাচ্ছেন, ওই দুটো এবাবে আশ্রয় দেবে তাঁকে।

কলম পড়ে গেল। মাথাটা বিছানায় ঢলে পড়ল।

পরদিন দুটো মৃত্যুর খবর বেরুলো কাগজে।

"দক্ষিণ কলকাতার জনপ্রিয় সুপরিচিত ব্যবসায়ী মহাদেব সান্যালের শিক্ষিতা এবং সুন্দরী স্ত্রী প্রতিভা সান্যাল গতকাল বিকেল, আনুমানিক সাড়ে চারটেয়, তাদের কলকাতার বাসভবনে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত। আব ওই দিনই সন্ধ্যায় সাঁওতাল পরগণার নিজগৃহে শ্রীমহাদেব সান্যালের মৃত্যু অস্বাভাবিক না হলেও যোগাযোগেব দিক থেকে বিচিত্র এবং বেদনাদায়ক। সন্ধ্যার পর, অনুমান সাতটার সময় পরিচাবকবৃন্দ শ্রীসান্যালকে তাঁর শয্যায় মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে অবতরণ করে তাদের অগোচরেই তিনি সেখানে এসেছিলেন। তার শযনঘরের চাবিও তাঁর কাছেই ছিল। মৃত্যুর আগে তিনি সম্ভবত কোনো বৈষয়িক হিসাবে মগ্ন ছিলেন। কারণ শয্যায় তাঁর লেখা লক্ষ লক্ষ টাকার অঙ্ক বসানো একটি দুর্বোধ্য হিসেবের কাগজ পাওয়া যায়। ডাক্তারের মতে শ্রীসান্যালের মৃত্যু অকস্মাৎ রক্তচাপবৃদ্ধিজনিত।"

অধরা

হাসির মত হাসি দেখলে চোখ যার জুড়ায় না, সেই মানুষের মগজ মনস্তত্ত্ববিদের গবেষণার বস্তু শুনি। আর সে যদি বয়েসকালের সুশ্রী রমণীর হাসি হয়, তাহলে নাকি সাহারার বুকেও সবুজের শিহরণ লাগতে পারে। বিনতার বাড়ির লোকেরা বলত, সারাক্ষণ ওই হাসি দেখলে গা জ্বলে। জীবনে ও সীরিয়াস হতে পারল না। আর তার খুড়তুতো বড় বোন বলত ওর ভেতবে কোথাও একটা হাসির মেসিন বসানো আছে। বিনতা বা বেণুর সামনেই বলত।

আমি সাগ্রহেই জিজ্ঞাসা কবতাম, ভিতরটা একবার খুঁজে দেখব নাকি?

এই খুডতুতো বড বোনটির সাথে একটু সম্পর্ক আছে। ঘর আর ঘরণীর সম্পর্ক। ফলে বেণুর সঙ্গে সম্পর্কটা কাবণে অকারণে রসোত্তীর্ণ করে তোলার সুযোগ মিলত। আমি স্পষ্টই স্বীকার করতাম, তোমরা যে-যাই বলো ওই হাসি দেখলে আমার শুধু মুণ্ডু ঘোরে। এত ঘোরে যে অনেক সময় না দেখলেও বেশ একটা ঘোরার আমেজের মধ্যে থাকি।

এই মুণ্ডু আরো বেশি কবে ঘোরাবাব জন্যেই যেন বেণু সরমেব বালাই ঘুচিয়ে দিযে আমার ইজিচেয়ারেব হাতলের ওপব এসে বসত, মুখের কাছেই ঝুঁকে বলত, মুখখানা দেখি!

বড়লোকের আদুরে মেয়ের এই আচরণ তার খুডতুতো দিদিটিব কেমন লাগত জানি না। তবে আমি দু'হাতে নিজেরই বুক চেপে ধবতাম অনেক সময়। চোখ বুজে গেছি-গেছি আর্তনাদ করে উঠতাম।

ওই রকম হেসে বেণু একদিন প্রস্তাব করেছিল, মুণ্ডু ঘোবার গল্প লিখবে? হাফ-ফী দাও তো ডজন তিনেক বলতে পাবি।

আমি সখেদে জবাব দিযেছিলাম, অর্ধেক দান সারা, আর অর্ধেকটুকুই তো অবশিষ্ট আছে, সেটুকু নাও যদি বিনা শর্তে দিযে দেব—সেজন্য তোমাকে আর কষ্ট করে গল্প বলতে হবে না।

জবাবে বেণু চুলের কাঁটা বা তেমনি কিছু আমার হাটুব উপবের দিকে আচমকা বিদ্ধ করেছে, যার ফলে আমাকে আবার অকৃত্রিম গেছি-গেছি রব ছাডতে হয়েছে।

ওব খুড়তুতো বোনকে ঘরে আনার অনেক আগে থেকে বেণু আমাকে নামের সঙ্গে দাদা যুক্ত করে ডাকত। বিয়েব পরে হঠাৎ জামাইবাবু বলা শুরু করল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আধুনিকা কলাবতীর এ আবার কি সম্বোধন!

ও হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, এই সেকেলে ডাকের মধ্যে অনেক রস।

ওর দিদি টিপ্পনী কেটেছিল, এত রস-রস করিসনে বাপু, একটু-আধটু জমা রাখ, দাবিদার আসবে।

আর একদিন যে-কথা বলেছিল শুনে তো ওর দিদির চক্ষুস্থির। বছরখানেক হল এম. এ. পাস করেছে তখন, আর সঞ্জয় চাটুয্যে ওর ইচ্ছে অমান্য করেই ভবিষ্যতের সিঁড়ি খাড়া উপরের দিকে তোলাব আশাতে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছে। সেই সময়ে

নির্ভেজাল হাসিমুখেই বিনতা বলেছিল, সত্যি জামাইবাবু, তোমার মত একটা লোক পেলে কবে চোখ-কান বুজে বিয়ে করে ফেলতাম। আমার মুখ চেয়ে ওই শোভাদি পটল তুললেও হাপুস নয়নে কান্নাকাটি সেরে তারপর ঠিক এসে তার জায়গা জুড়ে বসতে পারি।

আমি সত্রাসে ঘরণীর মুখশ্রীর প্রতি মনোযোগ দিয়েছিলাম। সেখানে বিস্ময়ের কারুকার্য। গালে হাত দিয়ে বলে উঠল, হল কি তোর, লজ্জা-সরমের মাথা একেবারে খেয়ে বসলি!

হেসে ফেলে বিনতা বলেছে, তোর অত ঘাবড়াবার কি হল, আমি চাইলেই তুই মরবি?

ওর দাদারা ভাবত, কোনোদিন ও হায়ার সেকেণ্ডাবিব বেড়া টপকাতে পাববে না। এত হাসলে তাব মগজে কিছু থাকে, না মগজে কিছু থাকলে অত কেউ হাসে?

কিন্তু তাদের নিরাশ করে বিনতা হায়ার সেকেণ্ডারির বেড়া ডিঙিয়েছে, অনার্স নিয়ে হেসে-খেলে বি. এ. পাস করেছে, আর এম. এ-তে তো রীতিমত ভাল রেজাল্ট করেছে। ওর দাদারা তখন বলেছে, ও বাংলা আবার একটা সাবজেক্ট, তার আবার ভাল-মন্দ!

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পবীক্ষকরা পক্ষপাতিত্ব করেছে নাকি গো?

বিনতা তক্ষুনি মাথা নেড়েছে—করেছে। বলেছে, তোমার চরিত্রের পরীক্ষকও কিছু নেই বললে সত্যের অপলাপ কবা হবে। পবীক্ষার আগে আগে অল্পবয়সী মাস্টারদেব বাড়িতে পড়তে যেতাম যে গো—পরীক্ষার সময় তারা খাতা দেখেই চিনেছে কার হাতের লেখা।

আমার লেখার সব থেকে অকরুণ সমালোচক আর সব থেকে সীরিয়াস পাঠক বিনতা গাঙ্গুলি। আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ি এসে ছাপাব আগেই অনেক গল্প পড়ে ফেলত। প্রেমের গল্প পড়ে হেসে অস্থির হত। বলত, জামাইবাবু, দিনকে-দিন যে কাঁচা রোমান্স সৃষ্টি করছ, কলেজের ছেলেরাও তোমাকে ছেলেমানুষ বলবে এর পর।

একবার এক মিলনান্তক গল্পকে সমালোচনার আঘাতে আঘাতে বিয়োগান্তেব উচিত পরিণতিব দিকে নিয়ে গেল। আমি মন দিযে শুনে রেখে পরে হুবহু ঠিক সেইরকমই করে দিলাম। তারপর আবার ওকে সেটা পড়তে দিলাম। পড়ল। পড়ে গোটা লেখাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল। তারপর বলল, কাঁচা হাতে কাঁচা রোমান্সই তবু যা-হোক খোলে, এ একেবারে অখাদ্য।

বেণুর দাদাদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমার ধারণা, ওর মধ্যে ভারী নিজস্ব কিছু আছে বলেই জীবন-বাস্তবের প্রতি পদক্ষেপে ও অসংগতি দেখে আব হাসে। ক্রমশ আরো ধারণা হয়েছে, ভিতরে ভিতরে ওর চাওযার বিশেষ একটা রূপ আছে। সেই রূপটা আমি অনেক সময় ধরতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঠাওর করতে পারি নি।

জীবনের মর্মান্তিক সমস্যার মুখেও ওকে হাসতে দেখেছি। হেসে পাশ কাটাতে দেখেছি। ওর সেই হাসি অনেকের চোখে তখন বিকৃত ঠেকেছে, নিজের ঘরেব মানুষরাও তখন খুব সদয় চোখে দেখে নি ওকে। কিন্তু আমি কেবল ভেবেছি, ঠিক

কি ও চেয়েছিল আর কি ও পেল না। যত দিন গেছে, অনেকে ওকে নির্দয় খেয়ালী ভেবেছে। তখনো আমি চিন্তা করেছি, কি হতে পারে, এ-রকম একটা মেয়ের জীবন কেন এই রাস্তায় গড়ালো!

পরিজনবর্গ প্রথম অবাক হয়েছিল সঞ্জয় চাটুয্যের সঙ্গে তার ব্যবহার দেখে। ওই ছেলেটাও আমার ভক্ত। একসময় গল্প লেখার নেশা ছিল। কর্মবাস্তবে নেমে সেটা গেছে। চৌকস চটপটে ছেলে, এ-যুগে যারা পিছনের সারিতে পড়ে থাকার পাত্র নয়, তাদের একজন। অতএব ওর সঙ্গে বেণুর নিকটতম সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনাটা সকলেই প্রশ্রয়ের চোখে দেখেছে। আমার বিশ্বাস সেই সম্ভাবনাটা বেশ দ্রুততালে এগোচ্ছিল। এ নিয়ে বেণুব উদ্দেশে আমি ঠাট্টা-ইশারার শর কম নিক্ষেপ করি নি। ও সে-সব মাথা পেতে নিয়েও হাসিমুখে মন্তব্য করেছে, তোমার মত হল না।

সঞ্জয় তখন এক এনজিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করে। নিজে এনজিনিয়ার সে। মাইনে পায় মাত্র ছ'শ না কত। এ টাকায় সংসার কি করে করা যায়, সেই ভাবনায় বিচলিত। হঠাৎ সুযোগ এলো নি-খরচায় আমেরিকা থেকে বাড়তি যোগ্যতার ছাড়পত্র নিযে আসার। তিনটি বছরের ব্যাপার মাত্র। তারপরেই ভাগ্যের অবধারিত খাড়া সিঁড়ি।

কিন্তু এতবড় আনন্দের পরেও হঠাৎ দেখি সঞ্জয়ের মুখ শুকনো। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার হে, আসল ছাড়পত্র মিলল না নাকি?

বিব্রতমুখে সঞ্জয় জবাব দিয়েছে, মিলেছে, তবে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। এখনো ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

শুনলাম, এমন সৌভাগ্যের বারতা শোনামাত্র বিনতা বলেছে, যেতে হবে না।

সঞ্জয় প্রথমে ঠাট্টা ভেবেছিল। পরে প্রমাদ গুনেছে। বলেছে, তিনটে তো বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

—কেটে তো যাবেই, কিন্তু তোমার গিয়ে কাজ নেই। পবে দুজনে একসঙ্গে যাবার অনেক সুযোগ পাব।

—তা তো পাব, কিন্তু এ তো একেবারে আলাদা ব্যাপাব। চাকরির ভবিষ্যৎ বুঝছ না?

অনেক বুঝিযেছে সঞ্জয় তাকে, শেষে প্রায় ভেঙে পড়েই বলেছে, মাত্র তিনটে বছর, একবার ঘুরে এলে ভাগ্য ফিরে যাবে—তুমি বাধা দেবে?

শেষ পর্যন্ত বাধা দেয় নি বিনতা, বলেছে, আচ্ছা যাও তাহলে, ভাগ্য ফেরাও।

যে ভাবে বলেছে, সঞ্জয় খুব নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। বিপন্নমুখ করেই রওনা হয়ে গেছে।

বিনতা হেসেছে।

আমি চোখ রাঙিয়েছি, তিনটে বছরের বিচ্ছেদ সইল না!

—দিব্বি সয়েছে তো।

—ঘোড়ার ডিম সয়েছে, পুরুষের এমন সুযোগ ক'টা আসে?

বিনতা অস্বীকার করে নি। বলেছে, আসে না।

আমি বলেছি, তোমার জন্যেই তো গেল, তোমাকে ভাল রাখবে বলেই।

বিনতা হেসে জবাব দিল, তুমি বুদ্ধির ঢেঁকি! শেষপ্রশ্নে পড়ো নি, কমল বলছে, সাজাহান শিল্পী, মমতাজ না মরলেও তার শিল্পানুরাগেই তাজমহল সৃষ্টি হত। ও গেছে তার বড় হবার নেশায়, আমার জন্য নয়।

আমি হতভম্ব, মাস চারেক বাদে যখন শুনলাম, মস্ত এক বিত্তবানের সঙ্গে বিনতার বিয়ে। একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হতে ছুটলাম ওদের বাড়ি। হতভম্ব শুধু আমি নই, ওদের বাড়ির লোকেরাও বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না।

দেখা গেল খবর মিথ্যে নয়। ওর থেকে বছর দশেকের বড় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে। এ যোগাযোগের রহস্য আমি জানি না। বিনতা আমাকে বলল, অত অবাক হবার কি আছে, কোথাও না গিয়ে আমি তো এখানে বসেই ভাগ্যের সিঁড়ি পেয়ে গেলাম।

আমি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, এটা ছেলেখেলা নয়।

ও হেসে বলেছে, ছেলেখেলা নয় বলেই এই সিদ্ধান্ত।

বিয়ে হয়ে গেছে।

তার পর থেকেই বিনতার সঙ্গে যোগাযোগের আগ্রহ আমার কমে গেছল। বড়লোক, বড় ঘব পেয়ে বিনতা এই কাণ্ড করতে পারে এ যেন বিশ্বাস হয় না। অল্প-স্বল্প নয়, মস্ত বড়লোকের ঘরণীই বটে সে এখন। মাঝে-সাজে আগের মতই ও আমার বাড়ি আসত। কিন্তু আগেব সে উত্তাপ আর আমার ছিল না। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সত্যি এ-কাজ করলে কেন?

ও খুশী মেজাজে জবাব দিযেছিল, ভদ্রলোকের আবেদন গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল, তাই।

চিঠি লিখে খবরটা আমি সঞ্জয়কে না জানিয়ে পারি নি। তার বিস্ময় ক্ষোভ আর খেদের কথা বিনতাকে আর বলি নি।

আমি চমকে উঠলাম ঠিক দু'বছর বাদে। শুনলাম বিনতার সঙ্গে তার বড়লোক স্বামীর বনিবনা হয় নি। বিযেব বছরখানেক পব থেকে গণ্ডগোল চলছিল। কিছুদিন হল সে বাপের বাড়ি চলে এসেছে, এসেই ডাইভোর্স-স্যুট ফাইল করেছে। এবপব বিবাহ-বিচ্ছেদ অবধারিত।

শুনে আমাব স্ত্রী ক্রুদ্ধ বিনতার ওপর, আমিও খুশী নই। ওকে এ-রকম পলকা স্বভাবের মেযে ভাবতে আমার কষ্ট হয়। ওর ওই স্বামীর সম্পর্কে কিছু উড়ো খবর আমার কানেও এসেছিল। বড়লোকের সহজাত দোষ বা গুণ কোনোটারই বাইরে নয় সে। তবু এত সহজে বিয়েটা ভেঙে দেবাব সঙ্কল্প করতে পারল কি করে বিনতা, ভেবে পাই না।

দেখা হতে তেমনিই হাসিমুখ দেখেছি ওর। যেন কিছুই হয় নি। কথায় কথায় ওর স্বামীর প্রসঙ্গ আমিই তুলেছি। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের সম্পর্কে একটাও নিন্দার কথা বলে নি বিনতা। উল্টে যেন প্রশংসাই করল। বলল, সে যা তাই—মুখোশ পরে থাকে না, মানুষটাকে চেনা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তাহলে?

—তাহলে আবার কি, আমার পোষালো না, ফুরিয়ে গেল।

আমি রাগ করেই চলে এসেছি। এ নিয়ে আর মাথা না ঘামাতেই চেষ্টা করেছি।

সঞ্জয় ফিরল প্রায় আড়াই বছর বাদে। বিনতাদের বিচ্ছেদের মামলার তখন ছ'মাস কেটে গেছে। সমাচার শুনে সঞ্জয় যেন খুশী হল। সব খেদ ভুলে বিনতার কাছে আবার সে যাতায়াত শুরু করল। ওকে আমার নিষেধ করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মোহগ্রস্ত মন নিষেধে ফেরে না। আড়াই বছর বাদে দেখে বিনতার মাধুর্যের জালে যেন দ্বিগুণ জড়িয়ে পড়ল ও।

মাস তিনেকের মধ্যে বোঝা গেল, নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে ওদের। আইনগত বাধার অবসান হলেই ওরা বিয়ে করবে। বাইরে থেকে ঘুরে এসে সঞ্জয় আরো উদার হয়েছে। ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল, সেটা যখন শুধরোবার সুযোগ পাওয়া গেছে, শুধরে নেবে না কেন?

বেণুর প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হলে এ কাহিনী লেখার তাগিদ বোধ করতাম না। কিন্তু ঘটনার আয়নায় আরো কিছু দেখা গেল।

বিচ্ছেদের রায় বেরুতে আর দিনসাতেক মাত্র বাকি। বিচ্ছেদ স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু পরম আইনকার অদৃশ্য থেকে যে কৌতুকের জাল বুনে রেখেছেন, তার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। বিচ্ছেদের রায় বেরুবার সাত দিন আগে বিনতার স্বামী অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরল। সেই রাতেই স্ট্রোক—পরদিন সব শেষ।

বিচ্ছেদের মামলার সেইখানেই ইতি। মৃতের সঙ্গে আর আইনগত বিচ্ছেদ হয় কি করে। বিনতার স্বামীর কোনো উইলও ছিল না, অতএব তার বিপুল অর্থ আর সম্পত্তির মালিক বিনতা। সাত দিন আগে আর সাত দিন পরে মারা যাবার মধ্যে এমন পার্থক্য দেখে বিনতা নিজেই অবাক। বিমূঢ় মুখে সে মৃত স্বামীর বাড়িতে চলে গেছে।

এর দিনকতক বাদে সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা। ঠাট্টা করে বললাম, তোমাদের তো একাদশে বৃহস্পতি এখন। রাজকন্যার সঙ্গে প্রায় আস্ত একখানা রাজত্ব লাভ।

সঞ্জয়ের মুখে লাজুক হাসি। ভাগ্যের এত বড় প্রসাদ কে আর কল্পনা করতে পারে?

কিন্তু দিন পচিশেক বাদে আবার যখন সে এলো, তার মুখ দেখে আমি অবাক। শুকনো বিবর্ণ, সেই সপ্রতিভ ভাবটুকু পর্যন্ত আর নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার হে?

বিমর্ষ মুখে সঞ্জয় জানালো, বিয়ে হচ্ছে না, বেণু সেটা ওকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে।

আমি হাঁ।—কেন, কেন? হঠাৎ হল কি?

বিরস কণ্ঠে ও জবাব দিল, কে জানে, অগাধ টাকার মালিক এখন, বোধ হয় সেই জন্যেই।

এতটা বরদাস্ত করা সম্ভব হল না আমার পক্ষে। বিপুল বিত্তের মালিক বিনতাকে স্বচক্ষে একবার দেখবার সাধ। আর সম্ভব হলে কিছু শোনাবারও।

সেদিন গেলাম ওর বাড়ি। আগেও এসেছি। বড় বাড়ির দোতলায় উঠে গেলাম সোজা।

ওর ঘরের পরদা তোলা। একটা এমব্রয়ডারি না কি নিয়ে বিছানায় বসেছিল। ও-দিক ফিরে আছে, পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকালো।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমি অবাক। বেণুর চোখে জল, গালেও জলের দাগ।

শশব্যস্তে শাড়ির আঁচলে চোখ মেজে নিয়ে বেণু উঠে এলো। মুখে হাসি ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি আশ্চর্য, এই ভরদুপুরে জামাইবাবু তুমি! এসো এসো—

আমি বললাম, বেলা চারটে, তোমার কাছে ভরদুপুর কি করে জানব!

—ওমা, তাই নাকি! বোসো।

বসলাম। বেণুর চোখে জল দেখে আমিই হকচকিয়ে গেছি কেমন। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, এই নিদাঘে শ্রীমতীর চোখে জল কেন?

হাসতে হাসতে বিনতা বলল, এই সাতাশ বছরের জীবনে এত হেসেছি যে মাঝে মাঝে একটু কাঁদতে এখন খারাপ লাগে না। তুমি দেখে ফেললে বলে লজ্জায় আবার কান্না পাচ্ছে। যাক, তুমি কিছু জানার লোভে ছুটে এসেছ মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। সঞ্জয় বাতিল কেন?

খানিক চুপ করে থেকে বেণু জবাব দিল, একজন তার ঐশ্বর্যের জোরে ক্রমাগত আমাকে ছোট করে চলেছিল, সেই ঐশ্বর্যের জোর দেখেই আবার আর একজন ক্রমাগত আমাকে বড় করে দেখবে—এর কোনোটাই আমি চাই নি।

খানিকক্ষণ পর্যন্ত মুখে কথা সরল না আমার। দ্বিধাগ্রস্তের মত বললাম, বড় করে দেখবেই যে বুঝলে কি করে?

বেণু হাসতে লাগল। শেষে বলল, জামাইবাবু, বরাবর তুমি আমাকে ছেলেমানুষই ভেবে এলে, অবশ্য এই জন্যেই তোমাকে এত ভাল লাগে আমার।...চোখে জল কেন দেখলে, এ-কি তোমাকে সত্যিই বলে দিতে হবে?

আমি আব কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। শুধু চেয়েছিলাম তার দিকে।...আগে অনেক দিন মনে হয়েছে, ভিতরে ভিতরে ওর চাওয়ার বিশেষ একটা রূপ আছে, যা আমি চেষ্টা কবেও ধরতে পারি নি।

আজ এতদিনে সেই রূপটাই যেন বড় স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার চোখের সামনে।

শুভচক্র

রাগে দুঃখে শোকে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে শোভনা বলে উঠলেন, ওদের রক্তে আছে পালাবার নেশা, ঘরে থাকবে কেমন করে—একটা গেছে, আর একটাও যাবে।

তাঁর সামনে পাংশুমূর্তি রথীন্দ্রবাবু দাঁড়িয়ে। তাঁর মাথার উপর দিয়ে বড় রকমের কায়িক ঝড় গেছে একটা। কিন্তু মানসিক ঝড়টা গেছে শোভনার ওপর দিয়ে। দুই ঝড়েরই অবসান এখন। রথীন্দ্রবাবুর ছোটাছুটির শেষ, শোভনাদেবীরও সংশয় আর

ছটফটানির ইতি। তবু নিজের কথাগুলো নিজের কানে ঢোকা-মাত্র স্তব্ধ বিবর্ণ একেবারে। এত দিনের এত যত্নে আর সন্তর্পণে গড়া আশার প্রত্যয়ের বাধটাকে এই এক উক্তির বজ্রাঘাতে যেন ভেঙে চৌচির করে দিয়ে বসলেন নিজেই তিনি।

কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবার পরে নির্বাক, নিস্পন্দ একেবারে।

এই যুগটার দিকে তাকালে একেবারে অসম্ভব অঘটন কিছু ঘটে নি। বরং যারা শুনবে তারা কিছু বসেরই খোরাক পাবে, আর প্রকাশ্যে ঠোঁট উল্টে মন্তব্য করবে, এ আর এমন কি, হামেশাই হচ্ছে।

রথীন্দ্রবাবু আর শোভনাদেবীর পিঠোপিঠি দুই মেয়ে। মাত্র দেড় বছরের ছোট-বড়। বড় বন্দনা—বি এ ফেল, আর ছোট চন্দনা এম এ পড়ছে। এই দুটিই সন্তান তাদের—আর নেই কেন সেটা একদা তাদের কাছেও বিস্ময় ছিল। দেড় বছরের মধ্যে পর পর দুটো মেয়ে এলো, তারপর আর এলোই না। শোভনাদেবীর অন্তত অনেকদিন পর্যন্ত মনে মনে একটা ছেলের আশা ছিল, তা সে আশায় অনেক বছর হল মরচে পড়ে গেছে। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্তমানে একটাই বাসনার আধারে পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল। মেয়ে দুটো ভাল ঘরে পড়বে এ ছাড়া আর বোধহয় তার চাইবার কিছু ছিল না।

এ আকাঙ্ক্ষার মূলে বড় রকমের আঘাত পড়েছে একটা।

বড় মেয়ে বন্দনা বে পাড়ার কোন একটা ছেলের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। যে ভয়টা তারা সদাসর্বদা ছোট মেয়ে চন্দনাকে দিয়ে করছিলেন, সেই দুর্মতি বড় মেয়ের কাধে চেপে বসেছে। বড় মেয়ের চাল চলনও যে সবদা খুব ভাল ঠেকত শোভনার কাছে এমন নয়, তবু চন্দনার থেকে ঢের ঢের ভাল। বন্দনা এ কাজ করতে পারে এ আশঙ্কা তার মনে ঠাঁইও পায় নি—পায় নি ওই চন্দনার জন্য সর্বক্ষণের একটা দুর্ভাবনা বুক জুড়ে থাকত বলে। দুই মেয়ে একই সঙ্গে বি এ পরীক্ষা দিয়েছিল —বন্দনার বদলে চন্দনা যদি ফেল করে ঘরে বসে থাকত, তাহলে তিনি ঢের বেশি খুশী হতেন, ঢের বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন।

তার বদলে ফেল করে বসল বন্দনা। আর তারপর তার পড়ার আগ্রহও চলে গেল। শোভনা এত করে আবার পড়ার কথা বলেছিলেন তাকে, মেয়ে গ্র্যাজুয়েট হল না বলে নয়—বাইরে ওই ছোটটাকে চোখে-চোখে রাখার কেউ থাকল না বলে। এরপর কোথায় কোন ছেলের সঙ্গে হ্যা-হ্যা করে বেড়াবে আর কি কেলেঙ্কারী বাধাবে ঠিক কি।

বন্দনা আর পড়বেই না ঘোষণা করতে শোভনা রায় দিয়েছিলেন, চন্দনারও আর পড়ে কাজ নেই তাহলে। বি এ পাস তো হল, আর পড়ে কি হবে।

জবাবে চন্দনা সাতখানা হয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, আ-হা, নিজের মেয়ে ফেল করল যখন সতীনের মেয়ের পড়া কেন—তার থেকে বাড়ি বসে ঘুটে দিক আর উঠতে বসতে তোমার বচন শুনে কান জুড়োক!

এই মুখরা মেয়ের কথা শুনলে শোভনাদেবী থ-মেরে যান এক-এক সময়। এর আগে একদিন ও তার মুখের ওপরেই বলে বসেছিল, 'দিদি মায়ের নিজের মেয়ে

আব ও নিজে হল গিযে তাব সতীনেব মেযে।'

ওব এম এ. পড়া ঠিক বন্ধ কবতেন শোভনাদেবী, যদি না ওদেব বাবা-মেযেব মেজাজ দেখে এত ঘাবড়ে যেতেন। বাপকে ও গিযে বলে এসেছিল, পড়া বন্ধ কবলে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, আব চাকবি কবে হোক বা টিউশনি কবে হোক নিজেব খবচ আব পড়াব খবচ চালাবে। তাব বাবা ওমনি ভয পেযে মাথা চুলকে মেযেব হযে উমেদাবী কবে পড়াব ব্যবস্থাই পাকা কবলেন।

কিন্তু বন্দনা শেষ পর্যন্ত এই কববে, এ-কি কোনোদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলেন তাঁবা? নিজেব মাথাব চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে কবছে শোভনাব। বুদ্ধি থাকলে সন্দেহ তাব হওযা উচিত ছিল।

পড়া ছাড়তে বন্দনাব বিযেব জন্য ব্যস্ত হযে পড়েছিলেন শোভনা। মেযেবা কপসী না হোক, সুশ্রী বেশ। ওই চন্দনা মুখপুড়ীব তো চেহাবাব মধ্যে বেশ চটকই আছে একটা, যা দেখে অন্য লোকে প্রশংসা কবে আব শোভনাব বুকেব ভিতবটা গুড়গুড় কবে। যাক, চেহাবা মোটামুটি দুজনেবই ভাল, তাব ওপব টাকা-পযসাব অসচ্ছলতাও কিছু নেই—চেষ্টা কবলে মেযেদেব বিযে দিতে বেগ পেতে হবে, এ-বকম দুশ্চিন্তা তাব কখনো হয নি। কিন্তু বিযেব কথা উঠতেই বন্দনা বেঁকে বসেছিল। তাব কাছে এসে বলেছিল, এখন তাব বিযেব ভাবনা ভাবতে হবে না।

শোভনাদেবী অবাক।—পড়বি না, বিযেব চেষ্টাও কবব না, তাহলে তুই কবিবি কি?

বন্দনা বাগ কবে জবাব দিযেছিল, কেন, আমাব গান কি ফেলা গেল নাকি —কি কবছি দেখছ না।

বড় মেযেব অবুঝপনা দেখে শোভনাদেবী শুধু বিবক্তই হযেছিলেন, সন্দেহ কিছু কবেন নি। ছোট মেযে হলে সন্দেহ হত, বড় মেযে বলেই হয নি। দিদিব কথা শুনে চন্দনা খিলখিল কবে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, এক কাজ কব দিদি, গানে তো নাম টাম একটু হযেইছে চেষ্টা-চবিত্র কবে দেখ সিনেমায নেমে যেতে পাবিস কিনা—টাকা তোব পাযে এসে গড়াগড়ি খাবে।

শোভনাদেবী সেদিন ওকে যাচ্ছেতাই কবে গালাগাল কবে উঠেছিলেন, আব সেদিনও মনে মনে দুর্ভাবনায কণ্টকিত হযেছিলেন ওই ছোট মেযেব কথা ভেবেই —বড় মেযেব জন্যে নয।

.ক'দিনেবই বা কথা, বন্দনা গেছে গান শিখতে, আব চন্দনা সবে যুনিভার্সিটি থেকে ফিবেছে—সেই দিন পিসী-শাশুড়ীব আমলেব পণ্ডিতমশায হঠাৎ বাড়িতে এসে হাজিব তাঁকে দেখামাত্র শোভনাব মনে হযেছিল, ভিতবে ভিতবে এবকম একজনকেই যেন খুঁজছিলেন তিনি। পিসী-শাশুড়ীব মতে হাত দেখায পণ্ডিতমশাযেব জুড়ি নেই। তাঁব আব বথীন্দ্রবাবুব হাত যে কতবাব দেখানো হযেছে তাঁকে দিযে ঠিক নেই। তাব কতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয নি সে-হিসেব বাখতে ভুলে গেছেন—ফলেছে যেগুলো সেগুলোই স্মৃতিব পাতায জ্বলজ্বল কবছে। অতএব পণ্ডিতমশাইকে এতকাল বাদে দেখে যতটা সম্ভব খাতিব-যত্ন কবেছেন, আব তাবপব ছোট মেযেকে টেনে এনেছেন

তাঁর কাছে। হাতটা ভাল করে দেখতে অনুরোধ করেছেন।

ভাল করেই দেখেছিলেন পণ্ডিতমশায়, তারপর সানন্দে বলেছেন, মেয়ের হাতে তোমার বেস্পতির শুভচক্র আছে মা-লক্ষ্মী—এই মেয়ের জন্যে ভাবনা কি।

বড় মেয়ে সেদিন বাড়ি ছিল না বলে ভিতরটা শোভনাদেবীর খুঁতখুত করেছিল, কিন্তু সমস্ত দুর্ভাবনাই তো তখনো তার এই ছোট মেয়েটাকে নিয়েই। ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল যেন তার।

কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের মন্তব্য শুনে ওই ফিচলে মেয়ে কি ঠাণ্ডা থাকে। লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, বলে বসেছিল, আমার স্বভাবচরিত্র কেমন সেটাই আপনি মাকে শোনান আগে, মা আর কিছু জানতে চায় না।

পণ্ডিতমশাই হেসেই জবাব দিয়েছিলেন, হাতে শুভচক্র থাকলে স্বভাবচরিত্র আর বাঁকা রাস্তায় যাবে কেমন করে গো দিদিমণি। বরং অন্যের বাঁকা স্বভাব ঝেটিয়ে সোজা করবে তুমি।

দু'চোখ কপালে তুলে পাজী মেয়ে বলে উঠেছিল, বরাতে তাহলে বাঁকা লোকই জুটবে বলছেন?

পণ্ডিতমশাইও নাতনী সম্পর্কজ্ঞানে রসিকতার সুরেই জবাব দিয়েছিলেন, এইদিনে সোজা লোক আর কটা চোখে পড়ে বল—আর সোজা লোক পছন্দই বা করে কটা মেয়ে।

সেই শুনেই আবার বুকের ভেতরটা দুরু-দুরু করে উঠেছিল শোভনাদেবীর। রাত্রিতে রথীন্দ্রবাবুকে বলেছিলেন, কি কাণ্ড করে বসবে তোমার ওই ছোট মেয়ে কে জানে, নইলে পণ্ডিতমশাই এরকম কথা বলে যাবেন কেন?

স্ত্রীর কথায় চিন্তিত একটু রথীন্দ্রবাবুও যে হয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আগেই কিনা বড় মেয়ের কাছ থেকে এই আঘাত।

রক্তে পালানোর নেশা সম্পর্কে যে ক্ষিপ্ত উক্তি করে বলেছিলেন শোভনাদেবী, তার ইতিবৃত্ত আছে একটু।

আর মেয়েদের নিয়ে, বিশেষ করে ছোট মেয়েকে নিয়ে তার এত দুর্ভাবনারও মূলে যথার্থ কারণ আছে একটা।

একদা বাবা মা ভাই বোনের আশ্রয় ছেড়ে, ঘর-বাড়ি ছেড়ে, একজনের হাত ধরে সোজা অন্ধকারেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন শোভনাদেবী। যার সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন, অর্থাৎ এই রথীন্দ্রবাবুর হাত ধরেই। আজ না-হয় রথীন্দ্রবাবু মস্ত নামী প্রোফেসর, ডক্টরেট, তাঁর লেখা বই বহু কলেজের পাঠ্য এখন, কিন্তু সেদিন এই লোকটার পরিচয় ছোট ভাইবোনের গৃহশিক্ষক ছাড়া আর কিছু নয়। শোভনাদেবীর বাবা পশ্চিমের বাসিন্দা, বড় ব্যবসা আর জমি জমার মালিক। আর মেজাজখানাও তেমনি—ধরতে পারলে মেয়ে-জামাই দুজনকেই বোধহয় খুন করে বসতেন তিনি। কিন্তু এঁরা সে সুযোগ দেন নি, চুপিসাড়ে এরোপ্লেনের টিকিট কেটে বাতাস সাঁতরে সোজা কলকাতায় পিসীর কাছে এসে হাঁপ ফেলেছিলেন। এরোপ্লেনের সেই ভাড়াও শোভনা জুটিয়েছিলেন।

পরবর্তী জীবন-স্রোতে ওই পিসী ভাইপোরই আশ্রিত ছিলেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি, শোভনা নিজের শাশুড়ীরই মর্যাদা দিয়ে রেখেছিলেন তাঁকে।

কিন্তু মেয়েরা বড় হয়ে উঠতে তাদের সঙ্গে তাঁর ঠাট্টা-তামাশাগুলো একটুও ভাল লাগত না। কারণ মেয়েদের নিয়ে একটা অহেতুক দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে বাসা করে বসছিল তাঁর। আর সেই দুশ্চিন্তার খানিকটা রথীন্দ্রবাবুর উপরেও এসে চেপেছিল।

...মেয়েরা একটু বড় হয়ে উঠতে লোক-পরম্পরায় বাবার ক্রুদ্ধ মন্তব্য কানে এসেছিল শোভনাদেবীর, তিনি নাকি বলেছিলেন, যে মা, মেয়ে দুটোই ক'দিন ঘরে থাকে দেখ, তারাও ওই পথই ধরবে। বাবার গুরুদেব নাকি বলেছেন, মেয়ের পাপমুখ ভুলে যাও, ওই বংশেরও কারো শুভ হবে না।

বিয়ের পরে বাড়ি বয়ে এসে দূর-সম্পর্কীয় পিতৃদরদীরা এ-সব শুনিয়ে গেছে। তখন উল্টো মেজাজ দেখিয়েছেন শোভনা, কিন্তু মেয়েরা একটু বড় হয়ে উঠতে বুকেব তলায় ক্রমে এই ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। পাড়া-পড়শীর অপ্রিয় উক্তিও কানে আসে, অমুক বাড়ির মেয়ে দুটো ডানা-কাটা পরীর মত উড়ে বেড়ায় কেন, ওই ছোট মেয়েটা পাড়ার বখাটে ছেলেগুলোর সঙ্গে সমান-তালে ইয়ারকি ফাজলামো করে কেন, ইত্যাদি।

সেই বয়সে সামান্য দোষেও মেয়েদের, বিশেষ করে ছোট মেয়েকে কত কঠিন শাস্তি দিয়েছেন, তা শুধু তিনিই জানেন। আর মনে মনে অষ্টপ্রহব জপ করেছেন, শুভ হবে, শুভ হবে, নিশ্চয়ই শুভ হবে—অশুভ কিছু হতে পারে না। অশুভ হলে স্বামীর এত উন্নতি হয় কি করে। হবেই শুভ।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে এই শুভা-শুভ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন। আর দুজনে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন, শুভ হবে —হবেই শুভ। প্রতিটি খুঁটিনাটি থেকে এই শুভ লক্ষণ আবিষ্কার করার চেষ্টাটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু সব শুভ বড় মেয়ে বন্দনা বুঝি দিল নির্মূল করে। এর পরের ছ'মাস রথীন্দ্রবাবু বইয়ের আড়ালে আশ্রয় নিলেন। আর শোভনাদেবীর মুখ মৃতেব মুখ।

রথীন্দ্রবাবু বন্দনার দেখা পেলেন ছ'মাস বাদে। কলেজে আসা চিঠির ঠিকানা মিলিয়ে নোংরা গলিব মধ্যে একটা বস্তীঘরে এসে সন্ধান পেলেন তার। যে দুরবস্থার মধ্যে দেখলেন, এর থেকে তাঁর মেয়ে মরে গেছে জানলেও খুশী হতেন।

জিজ্ঞাসা কিছু করলেন না, যা বোঝার বুঝে নিলেন। পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার চিত্রটা তাঁর জানা ছিল, কিন্তু সে-যে এমন নিষ্ঠুর ভাবতেও পারেন নি।...মেয়ে মাকে ভয় করে, তাই বাপকেই চিঠি লিখে বসেছে। কিন্তু তিনিই বা কি করতে পারেন, ভেবে পেলেন না।

মেয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। আর নিরুপায়ের মত বসে তিনি গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।...কলেজের পাঠ্য-বই লেখার দৌলতে টাকা আছে, কিন্তু ব্যবস্থা কি করা যেতে পারে ভেবে পাচ্ছেন না।

মাসখানেক ধরে শোভনা তাঁকে বেশ ব্যস্ত আর চিন্তাচ্ছন্ন দেখলেন। কিন্তু বুকের

যে জায়গাটায় তাঁর ভাঙন ধরেছে, নিজের ভিতরেই মুহূর্তের শান্তি নেই। চন্দনা বাড়ি থেকে বেরুলে বা য়ুনিভার্সিটি গেলে, না ফেরা পর্যন্ত কাঁপতে থাকেন। আর ফিরতে একটু দেরি হলে কি-যে অবস্থা হয় তিনিই জানেন।

এরপর হঠাৎ একদিন আশায় আনন্দে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হবার দাখিল তাঁর। এক মুখ হেসে রথীন্দ্রবাবু সেদিন বাড়ি ঢুকেই বললেন, ওগো শুনছ, অশুভ কিছু হয় নি, বন্দনা খুব ভাল আছে...ছেলেটাও চমৎকার।

তারপর যা শুনলেন শোভনাদেবী, হাসবেন না কাঁদবেন জানেন না। ছেলে এক বিলিতি ফার্মে বড় চাকরি করে, বছর দেড়েকের জন্যে কি ট্রেনিং নেবার ব্যাপারে তাকে য়ুবোপে পাঠানো হয়েছে। সাহেবপাড়ায় দু'ঘরেব এক ফ্ল্যাটে থাকে তারা —এখন অবশ্য মেয়ে একাই আছে, সঙ্গে অবাঙালী বিশ্বস্ত আয়া আছে একজন। ট্যাক্সি করে যাচ্ছি কোথায়, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। বাবাকে আদব করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, কাঁদলও। কিন্তু বেশ ভাল আছে, ওস্তাদ রেখে বাড়িতে গান-বাজনা শিখছে, আবার গান গেযেও রোজগার ভাল করছে।

রাগে আর উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করে উঠলেন শোভনা, মুখপুড়ী মেয়ে আমাদের মনের দিকে একবার তাকালো না কেন—ছেলেটা বাইরে গেছে, একা আছে তবু একটা খবর পর্যন্ত দিল না? ও মেয়ে না শত্রু?

রথীন্দ্রবাবু জানালেন, বাইরে যাবার আগে ছোকরা ওকে গা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে, ও ফেরাব আগে বাপের বাড়ি আসবে না—ও ফিরে এলে একসঙ্গে দুজনে আসবে। ছেলেমানুষি কাণ্ড আর কি...

একদিনের মধ্যেই শোভনাদেবীর বুকের আগুন কত যে জুড়লো তিনিই জানেন। আবার তিনি আশা করতে লাগলেন শুভ হবে—সব শুভ, অশুভ কিছু নেই, অশুভ কিছু হয় নি, হতে পারে না—নিজেদের জীবন দিয়েই তো দেখছেন।

মায়ের মুখ থেকেই চন্দনা শুনল সব। প্রথমে অবাক, তারপর মায়ের মতই খুশী সেও।

পরদিনই রথীন্দ্রবাবুর সঙ্গে বন্দনাকে দেখতে গেলেন শোভনাদেবী। মেয়ে না হয একা আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে, তাঁব তো যেতে বাধা নেই। চন্দনাকেও নিয়ে গেলেন।

কিন্তু দু'তিন ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে ফিরলেন কেমন একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি নিয়ে। ...মেয়ে চোখের দিকে তাকাতে পারে না, হাসিটাও কিরকম যেন, চেহারা তো আধখানা হয়ে গেছে। এদিকে ঘর দুখানা সাজানো-গোছানো শৌখিনই বটে। আর গান-বাজনার সরঞ্জামও সাজানো, মেয়ের গায়েও গয়নাপত্র মন্দ নেই। তবুও কেন যে রাজ্যের অস্বস্তি নিয়ে ফিরলেন তিনি, নিজেও জানেন না।

এরপর দিনতিনেক একা এলেন বড় মেয়ের বাড়িতে। সংগোপনে, বাড়ির কাউকে না জানিয়ে। মায়ের চোখে মেয়ে ধুলো দিতে পারল না। জেরায় কোণ-ঠাসা হয়ে বন্দনা সেদিন মায়ের দু'পা জড়িয়ে কান্না শুরু করে দিল। জেরা করে করে শোভনাদেবী হঠাৎ সেদিন ওই ছেলেটার ফোটো, তারপর তার বিলেত থেকে লেখা চিঠি, আর

সব শেষে তার বিলেতের ঠিকানা চেয়ে বসেছিলেন। এখানে কোন ফার্মে কাজ করত তার আগে সেটাও মেয়ে বলতে পারে নি। শেষে ধরা পড়তে পা ধরে কান্না।

শোভনা পাষাণ হয়ে গেলেন যেন। অনেকক্ষণ বাদে কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, এ-সব খরচপত্র চলছে কি করে?

মেয়ের সব থেকে বড় সংকট এইবারই। বাবা বলে দিয়েছে, মা যদি জানতে পারে তাঁর ছলনার কথা, তাহলে সেখানেই সব শেষ। বাবাকে এ ব্যাপার থেকে আলাদাই রাখতে চাইল সে। বলল, গান করে, দুটো সিনেমায় অনেকগুলো গান গেয়েছে সে, সেই টাকায় চলছে। তাছাড়া দুটো বড়ঘরের মেয়েকে গান শেখায়ও। পাছে মায়েব সন্দেহ হয় তাই তাড়াতাড়ি জানালো, এভাবে আব বেশিদিন চলবে না, যদি না আবার কোনো সিনেমায় গান গাইতে পায়।

শোভনাদেবী অনেকক্ষণ স্থিব কঠিন, পাষাণ। তারপর দু'চোখে আগুন ছড়িয়ে চাপা হিস হিস শব্দ করে উঠলেন যেন। বললেন, চলবে। টাকা যা লাগে আমি দেব, কিন্তু তোর বাবা যা জেনেছে তাই জানবে—সে যদি কোনোদিন টেব পায় সব মিথ্যে, তাহলে তোকে আমি দুখানা করে কেটে ফেলব বলে দিলাম।

মাসতিনেক চলেছিল এইভাবে।

বন্দনার হাতে দু'তরফের টাকা আসছিল। তার ঘরের সমৃদ্ধি বাড়ছিল। বাড়িয়ে দিচ্ছিল তার বাবা মা-ই। নিজেরা জিনিস কিনে এনে এনে দিতেন তারা। আর মেযে যে ভাগ্যবতী হয়েছে, অশুভ যে কিছুই হয নি, দুজনেব আলোচনায এই সানন্দ-সারটুকুই বড় হয়ে ওঠে।

হঠাৎ একদিন সবকিছুর ছেদ পড়ে গেল।

কলেজ-ফেবত সেদিন রথীন্দ্রবাবু এসেছিলেন বন্দনাকে একবাব দেখে যেতে। ঘরে ঢুকেই ধাক্কা খেলেন। ঘর দুটো একেবারে ফাঁকা। কিছু বোঝবার আগে অবাঙালী আয়া তার হাতে একখানা চিঠি দিল। খামের উপর শোভনাব নাম। তাড়াতাড়ি খামটা না খুলে পাবলেন না তিনি। বন্দনা লিখেছে, ছলনার পাপ আর বাড়াবো না, এবাবে সত্যি চললাম। বাবার জন্যে ভেবো না, বস্তী থেকে তিনিই এ-বাড়িতে আমাকে এনে তুলেছিলেন। চন্দনাকে বোলো, ও যেন ভাল থাকে।

কতক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসেছিলেন রথীন্দ্রবাবু জানেন না, পায়ের শব্দে চমকে ফিরলেন।

শোভনা।

ঘরে পা দিয়ে শোভনাদেবীও হতভম্ব। দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে আছেন।

স্বামীর হাতের খামটা চোখে পড়তে সংবিত ফিরল যেন শোভনার। খামটা টেনে নিলেন তিনি।

পড়লেন।

তারপর বিবর্ণ নিষ্প্রভ মুখে দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে রইলেন আবার।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার ছায়া নামল। হঠাৎ আবাব চমকে উঠলেন শোভনাদেবী, চন্দনা একলা আছে বাড়িতে...বন্দনা আবার ওর কথা লিখে গেল কেন?

—চলো বাড়ি চলো, শিগগিব এসো।

হন হন কবে আগে নীচে নেমে এলেন তিনি।

বাড়িব দোবে ট্যাক্সি থামল। নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে দোতলায উঠে এলেন শোভনাদেবী।

তাবপবেই স্তব্ধ। এ-ঘব ও-ঘব কোনো ঘবেই চন্দনা নেই। ঘাবড়ে গিযে বথীন্দ্রবাবু ছুটে আবাব নীচে এলেন—নীচেও নেই কোথাও। অথচ ঝি বলল, বিকেলেও বাড়িতে ছিল, কিন্তু কি-বকম যেন দেখেছে ছোট দিদিমণিকে।

তিনতলায শোভনাদেবীব ছোট ঠাকুবঘব। কাঁপতে কাঁপতে ঠাকুবেব পাযে শবণ নিতে ছুটলেন—হযত কোথাও বেবিযেছে, কিন্তু এই ত্রাস সহ্য কবতে পাবছেন না তিনি।

দিশেহাবাব মত বথীন্দ্রবাবুও অনুসবণ কবলেন তাকে।

ঠাকুবঘবে ঢুকে দুজনেই স্তব্ধ।

মাটিতে মাথা গুঁজে চন্দনা ফুঁপিযে কাঁদছে। সাড়া পেযেই মুখ তুলল। আব সঙ্গে সঙ্গে সেই কান্নাব মধ্যেই গর্জে উঠল, দিদি চলে গেছো তো? বেশ হযেছে। আমিই ওাকে তাড়িযেছি, আমি—আমি, বুঝলে? আমি তাকে বলেছি তোমাদেব মত বাবা-মাযেব সঙ্গে আব কত ছলনা কববে—আব কত নবকে ডুববে? আমি তাকে শাসিযেছি তোমাদেব সঙ্গে এ ছলনা আব আমি সহ্য কবব না—বুঝলে?

বথীন্দ্রবাবু আব শোভনাদেবী নিশ্চল, নির্বাক।

হাতে নয, ছোট মেযেব মুখে যেন একখানা শুভচক্র জ্বলজ্বল কবতে দেখছেন শোভনাদেবী।

মরূদ্যান

বিকেল।

ইজি-চেযাবটা জানলাব ধাবে টেনে এনে বসল ললিতা বসু। এ সমযটা বোজ ঠিক ওইখানটাতে দেখা যাবে তাকে। হাতে বোনাব সবঞ্জাম। কিন্তু বোনা বড় একটা হয না। বাস্তাব ওধাবে ছোট চিলড্রেনস কর্ণাব, চোখ দুটো সেখানেই আটকে থাকে। হাত চলছে কি চলছে না নিজেবই খেযাল থাকে না।

ললিতা বসু চেযে চেযে দেখে। বাচ্চা ছেলেমেযেগুলো আসে। তাদেব দেখে। সঙ্গে ঝি নযত চাকব আসে, তাদেব দেখে। লোহাব বেলিং ঘেবা আঙিনাব মধ্যে ওদেব ছেড়ে দিতে পাবলেই ওদেব যেন দাযিত্ব ফুবালো। নিশ্চিন্ত মনে জটলায বসে যায। ওদিকে ছেলেমেযেগুলো দৌড়ঝাঁপ হুটোপুটি শুরু কবে দেয। ঝগড়া বাধে। মাবামাবিও লেগে যায একসময।

এদিকে দোতলা জানলাব পাশে ইজি-চেযাবে বসে ললিতা বসু শঙ্কিত হযে ওঠে। মাবামাবিব ফলে যে ছেলেটা বা মেযেটা দুর্বল, সে জোবে কেঁদে ককিযে উঠলে তবে ওই ঝি-চাকবগুলোব হুশ ফেবে। তখন দৌড়ে এসে যে যাব শিশুকে আগলায।

বাড়িতে বকুনি খাবার ভয়ে ভাল করে গা হাত পা ঝেড়ে দেয়, কান্না সামলায়।

জানলার ধারে বসে ললিতা বসুর রাগ চড়তে থাকে। নিজের ঝি চাকর হলে রক্ষে রাখত না।

বাচ্চাগুলোর কাণ্ড দেখে হাসিও কম পায় না। ওদের ক্ষুদ্র জগৎটাকে ওরা অন্তত ছোট ভাবে না। এই ভাব করছে, এই আড়ি করছে, এই রাগ আবার এই হাসি। একটু আগেই এক কাণ্ড দেখে হেসে উঠেছিল ললিতা বসু। ওদের মধ্যে বেশ একটা শক্ত-সমর্থ ছেলে তেমনি ছোট একটা মেয়েকে হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল। মেয়েটা গম্ভীর মুখে চেয়ে ছিল তার দিকে। এদিক ওদিক চেয়ে মেয়েটার সঙ্গের চাকরটাকে খুঁজছিল ললিতা বসু। তবে ভয় ধরেছিল, ওই ঝগড়াটে দুষ্টু ছেলেটা মেয়েটাকে ধরে এক্ষুনি মারবে। কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে কোন ঝি-চাকর আসে, তাও প্রায় চেনা হয়ে গেছে ললিতা বসুর।

কিন্তু উল্টো কাণ্ড। মেয়েটা হঠাৎ ছোট ছোট দুই হাত বাড়িয়ে ছেলেটার ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে ঝুলে পড়ল।

এরকম আক্রমণের জন্য ছেলেটা একটুও প্রস্তুত ছিল না। টান সামলাতে না পেরে মাটিতে গড়াগড়ি, তার ওপর মেয়েটা, কারণ চুলের মুঠি সে তখনো ছাড়ে নি।

আক্রমণের দাপটে ছেলেটা বিলক্ষণ হকচকিয়ে গেছে। কোনো রকমে নিজের চুলের গোছা ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, তারপর প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে ডাগর চোখে আক্রমণকারিণীকে দেখছে। কিন্তু মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে মেয়েটাই ভ্যা-ভ্যা করে কান্না জুড়ে দিল। বেগতিক দেখে ছেলেটা পায়ে পায়ে সরে পড়ল।

যতক্ষণ না দিনের আলো ডোবে, সামনের ওই সবুজ তৃণখণ্ড থেকে ললিতা বসু চোখ ফেরাতে পারে না। সমরেন্দ্র আগে বাড়ি না ফিরলে এই দেখায় ছেদ পড়ে না। সন্ধ্যার আগে আজকাল বাড়ি ফেরেও না বড় একটা। তার পড়ার বাতিক। পড়ানো শেষ করে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢোকে। কি একটা নতুন বই লিখতে শুরু করবে শুনছে, তাই পড়াশুনায় বাড়তি মনোযোগ। কিন্তু এক-একসময় সন্দেহ হয়, মানুষটা হয়ত ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে ফেরে আজকাল, পাছে ললিতার এই বৈকালিক তন্ময়তায় ছেদ পড়ে, এই ভেবে।

আগে ফিরলে গাড়িটা দরজার কাছে দাঁড় করাবার আগেই সমরেন্দ্র দোতলার এই জানলার দিকে তাকাবে। আর ললিতাকে সেখানে বসে থাকতে দেখবেই। কয়েকদিন জোরে জোরে আচমকা হর্ন বাজিয়ে সচকিত করেছে তাকে। লজ্জা দিয়েছে। সে আগে বাড়ি ফিরলে এই দেখার নিবিষ্টতায় ছেদ পড়েই। সুহাসিনীকে চা-জলখাবারের তাগিদ দিতে হয়, দু'চারটে কথা বলতে হয়। তা ছাড়া একজন মানুষ ঘরে থাকলে জানলার ধারে সে এমন চুপচাপ বসে থাকে কি করে। তখনই সব থেকে বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ললিতা বসু। বিমনা চোখ দুটো বার বার এই জানলা দিয়ে বাইরের ওই সবুজের দিকে ছোটে। ঘুরে ফিরে নিজের অগোচরেই বার বার ওই জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ায়।

তুখোড় বুদ্ধিমান মানুষ। লক্ষ্য করেছে। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কি দেখো?

সেই একটা সাধারণ প্রশ্নে ললিতার সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠার দাখিল, হেসেই জবাব দিয়েছে, কি কাণ্ড যে করে ওই বাচ্চাগুলো, হেসে বাঁচি না!

সমরেন্দ্র আর কখনো কিছু বলে নি। মনে মনে ঠিকই বুঝেছে কি দেখে, কোন্ তন্ময়তায় বিভোর হয়। সেও নিশ্চয় খুশী হয়, বর্তমানে স্ত্রীর মনের এই আকর্ষণটুকুই কাম্য। কি মনে হতে ললিতার কানের কাছটা লাল হয়ে ওঠে আবার। বিকেল না হতে তার এই জানলার পাশে বসার খবরটা ঠোঁট-কাটা অনিমেষ গাঙ্গুলিকেও নিশ্চয় জানিয়েছে লোকটা। গাঙ্গুলি এ নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কিছু করে নি। সে ডাক্তার, বিলেত ফেরত গাইনোকলজিস্ট। যতই হাসি মসকরা করুক, তার দায়িত্বজ্ঞান সজাগ সর্বদা, এ ব্যাপারে সে-ই হয়ত বন্ধুকে উল্টে সমঝে দিয়েছে, কলেজ থেকে দেরিতে ফেরার পরামর্শটাও সে-ই দিয়ে থাকতে পারে।

অতএব বিকেলটা এখন এই জানলার ধারে বসে-বসেই কাটে ললিতা বসুর। কি করে যে কেটে যায় টেরও পায় না। ওই পার্কটার ওপরে অন্ধকারের পর্দা একটু একটু করে যখন ঘন হয়ে ওঠে, তখন হুঁশ ফেরে। ঝি-চাকরেরা তখন নিজেদের কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েগুলোকে ঘরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ছোট মাঠটা ফাঁকা হতে থাকে।

কেবল এক বাড়ির একটা অল্পবয়সী চাকর আর অন্য কোনো বাড়ির তেমনি অল্পবয়সী ঝিয়ের ফেরার তাগিদ কম। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা আসেও প্রায় সকলের আগে। ফেরে সকলের পরে। এসেই নিরিবিলি একটা কোণ বেছে নিয়ে বসে দুজনে। তাদের সঙ্গের ছেলেমেয়ে দুটো পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও টনক নড়বে না বোধহয়। এখানে এই জানলার ধারে বসে ললিতা নিজের মনেই হাসে কত সময়। আবার রাগও হয়। অন্ধকার হয়ে গেল, সামনে থেকে সামনেও আর চোখ চলে না, কিন্তু ওদের ওঠার তাড়া নেই। এদিকে ঠাণ্ডা লাগতে পারে কচি শিশু দুটোর সে খেয়ালও নেই।

ওরা উঠলে তবে স্বস্তি। কিন্তু তখন আবার ললিতা বসুর বুকের তলায় একটা কালো ছায়া গুটিসুটি এগিয়ে আসতে চায়। সেটা ঠেলে সরায় অবশ্য তক্ষুণি। নিজের হাতের দিকে চোখ পড়তে বিব্রত বোধ করে। বোনা যেমন ছিল তেমনি আছে। তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের আলোটা জ্বালে। তারপর তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে যতটুকু পারে তুলে রাখে। এই বোনার হিসেব নেবার লোক আছে—অনিমেষ গাঙ্গুলি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলেই কান খাড়া করে শোনে একজোড়া পায়ের আওয়াজ, কি দু'জোড়া। যত জোড়াই হোক, পায়ের শব্দ শুনলেই হাতের বোনা চটপট সরিয়ে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

ললিতা বসু অবাক হয়ে ভাবে এক-এক সময়, তার জীবনে কিছুই বুঝি সহজ স্বাভাবিক ভাবে ঘটবার নয়। এক বিয়ের ব্যাপারেই কি কম বিভ্রাট হয়েছিল। বাবা মায়ের সঙ্গে থাকত ইউ. পি-তে। সেখানেই পড়াশুনা করেছে, সেখান থেকে এম. এ. পাশ করেছে। যে বছর এম. এ. পরীক্ষা দিল সে-বছরই বিয়ে হবার কথা।

দিল্লীর এক আই. এ. এস. ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও পাকা হয়ে এসেছিল। ছেলের গুণাগুণ শুনে ললিতার মোটামুটি ভালই লেগেছিল। ভিতরটা খুঁতখুঁত করছিল কেবল দাবি-দাওয়ার ফিরিস্তি শুনে। কিন্তু তার বাবা ছিলেন দিলখোলা বেপরোয়া মানুষ। বলেছিলেন, দেব, সব দেব—যা চায়, তার থেকে বেশিই দেব, কেবল মুখ ফুটে না চাইলেই পারত বোকার মত।

ললিতার বাবার অবস্থা রীতিমত ভাল তখন। সে বছরেই ইন্সিওরেন্স সংস্থার আঞ্চলিক সর্বেসর্বা হয়ে বসেছেন। তাই মনমেজাজ অতিমাত্রায় প্রসন্ন। কিন্তু পাত্রপক্ষের চাওয়ার বহর দেখে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন ললিতাব মা। চাব-চারটে মেয়ে তাঁর —এই প্রথম কাজ। তার ওপর ছেলেও আছে তিনটে। এক মেয়ের বিয়েতে এ-রকম খরচা হলে তাঁর চিন্তিত হবারই কথা। কিন্তু তিনি কিছু বললেই ললিতার বাবা তাঁকে সাবধান করেন চুপচাপ, মেয়ে যেন না শোনে।

কিন্তু মেয়ের কানে আসতই।

সেই বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করার আগেই ললিতার বাবাব দিন বড় আকস্মিক ভাবে ঘনিয়ে এল। প্রথমবারের স্ট্রোক অনেকেই সামলে ওঠে—তিনি পারলেন না সামলাতে।

অরক্ষণীয়া মেয়ের বিয়েব ব্যাপারে মহাঅশৌচে বাধা নেই। কিন্তু অবস্থাপন্ন ঘরে অন্তত এই দিনে দেরিতে বিয়ে হলেও মেয়েকে অরক্ষণীয়া, গলার কাটা কেউ ভাবে না। দু'তরফের অনুমোদনে বিয়ে এক বছর স্থগিত থাকল।

কিন্তু আবার যখন অগ্রসর হবার সময় উপস্থিত, তখনই আঘাত। সমস্ত পাওনার ব্যাপারে এক কথায় রাজী হয়ে কাজে এগিয়েছিলেন যে মানুষ, তিনি নেই। অন্য ছেলেপুলের ব্যাপারে বড় নির্ভরতার আশ্রয়ও তেমন নেই আব। ললিতার দুই দাদা অবশ্য ইন্সিওরেন্সে মোটামুটি ভাল চাকরি করে তখন, কিন্তু দিলখোলা মেজাজের সংসারে তারা আর কতটা ঘাটতি পূরণ করতে পারবে। তিন-তিনটে বোন আর একটা ভাই স্কুল-কলেজে পড়ছে তখনো। ললিতার সব থেকে দুঃখ হয়েছিল, দাদারা যখন বাবার প্রিয় গাড়িটা বেচে দিল। বাবাব কেন, তারও কম প্রিয় ছিল না ওই গাড়িটা। নিজেও ড্রাইভিং-এ হাত পাকিয়েছিল—ফাঁক পেলেই বাবার গাড়ি হাঁকাতো ললিতা। কোথায় কত দূরে চলে যেত ঠিক নেই। আর মা বাবা দাদাদের নিষেধ না শুনে চালাতোও খুব জোরে। এ ব্যাপারে বাপের মেজাজের সঙ্গে তার অনেকটা মিল। জোরে গাড়ি হাঁকানোটা একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার।

দাদাদের বলে মা-ই সেই গাড়ি বেচে দিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে বিয়েতে দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপাবটা নতুন করে ভাবার বিষয় বটে। কিন্তু মানুষ যে এমন স্বার্থপর হতে পারে, ললিতার ধারণা ছিল না। পাত্রপক্ষের সাফ কথা, প্রতিশ্রুতি যা দেওয়া হয়েছে তার হেরফের হতে পারে না। সে-রকম করাটা দান প্রত্যাহারের সামিল। তাছাড়া এই মেয়ের বিয়ের যাবতীয় খরচ-খরচা তো ভদ্রলোক রেখেই গেছেন।

ললিতার মা এ-রকম অবুঝ কথা শুনে সত্যিকারের বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন।

দাদারা মাকে বলেছিল, বাবা যা ঠিক করে গেছেন তাই-ই দিয়ে দাও। নিরুপায় মা-ও রাজীই হতেন, কিন্তু বেঁকে বসল ললিতা। মাকে আর দাদাদের সে সাফ জানিয়ে দিল, ওখানে বিয়ে হবে না। বোঝাতে এসে দাদারা বোনের কথা শুনে ফিরে গেল। ললিতা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারছ না কি-রকম সংসারে পাঠাতে যাচ্ছ তোমরা আমাকে। এ বিয়ে হলেই বরং বাবা উপর থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবেন।

বিয়ের প্রসঙ্গ সেখানেই শেষ তখনকার মত। একটা আপিসে চাকরিও নিয়েছিল ললিতা। মেয়ে কলেজে চাকরি অনায়াসেই পেতে পারত। কিন্তু একসময়ের গাড়ি হাঁকানো মেয়ের কলেজের চাকরি পছন্দ নয়। যে বিয়ে হল না তার জন্য কোনো সময় তার এতটুকু দুঃখ হয় নি। ববং গাড়িটার জন্য প্রায়ই মনখারাপ হত। টাকার প্রতি টান তার বিশেষ ছিল না, কিন্তু একখানা গাড়ি কেনার মত টাকা তার থাকলে ভালই লাগত।

সমরেন্দ্র বসুর সঙ্গে বিয়েটাও সাধারণ যোগাযোগের বিয়ে। ইউ. পি-তে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সেই আত্মীয়ের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ললিতাদের। মেয়ের বিয়ের জন্য ললিতার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ওই বাড়ির গৃহিণী সেটা জানতেন। ছেলেব কাছে তিনি মেয়ের অজস্র প্রশংসা করেছিলেন, আর মেয়ের বাড়িতে এসেও ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন।

অতএব ললিতার মায়ের আগ্রহ হয়েছিল। এক ফাঁকে সেই মহিলার বাড়ি গিয়ে ছেলেটিকে দেখেও এসেছিলেন তিনি। ভালই লেগেছিল। প্রস্তাবটা বাড়িতে এসে বলতে ললিতা মুখে কোনো আপত্তির কথা বলে নি বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতবে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিল সত্যি কথা। একে কলেজের প্রোফেসার, তায় ডক্টরেট। অর্থনীতির ভারি কৃতী ছাত্র নাকি। কেমন জানি কাট-খোট্টা গোমরামুখো মানুষ হবে হয়ত।

সেই পরিচিতা মহিলাই পরিচয় করিয়ে দেবার ছলে আত্মীয়টিকে তাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন একদিন। দেখে আব তারপর আলাপ করে অবশ্য ললিতার খারাপ লাগে নি। মোটামুটি ভালভাবে এম. এ. পাশ করেছে শুনে সমরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেছিল, কলেজে চাকরি না করে আপিসে চাকরি কবছে কেন?

বিব্রত বোধ করলেও ললিতা হাসিমুখেই জবাব দিয়েছিল, মাস্টারি করতে ভয় করে।

চেহারাপত্র বেশ সুশ্রী ললিতার, স্বাস্থ্যও ভাল। বরাবর বাইরে থাকার ফলে কথাবার্তায় আচরণে সপ্রতিভ তাজা ভাব আছে একটা। অবিবাহিত পুরুষের অপছন্দ হবার কথা নয। অপছন্দ হয়ও নি। সেই পরিচিতা মহিলাই বিয়েটা ঘটাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন তখন।

মা মতামত জিজ্ঞাসা করতে ললিতা বলেছিল, বুঝে নাও এই সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের আশাও আছে কিনা আবার। সেই বিকেলেই ছোট বোন এসে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, না রে দিদি, ভদ্রলোকের শুধু রাজকন্যার আশা, রাজত্ব-টাজত্বের ধার ধারে না।

কিন্তু এই বিয়েও নির্বিঘ্নে হয় নি। বিয়ে হবে কি হবে না সেই সঙ্কটে পড়তে

হয়েছিল পাত্রীপক্ষকে। বিয়ের দিন যে গাড়িতে কলকাতা থেকে সমরেন্দ্র বসুর এসে পৌঁছনোর কথা, সেই গাড়িতে তার দেখা নেই। পরের গাড়ি সন্ধ্যায় এসে পৌঁছয়, তাতেও বরের পাত্তা নেই।

সকলের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল সেই এক সন্ধ্যায়। আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের বেশির ভাগই এসে গেছে। তাদেরও বিমূঢ় অবস্থা।

রাত্রি আটটার পরে সামনের এক নামকরা হোটেল থেকে খবর এলো, কলকাতার ডক্টর বসুর বাড়ি থেকে একটা সংবাদ এখানে পৌঁছে দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ এসেছে।...এক বিশেষ বিভ্রাটের দরুন ডক্টর বসু রওনা হতে পারেন নি, তিনি আগামী কাল সকালের প্লেনে এসে পৌঁছুবেন।

দ্বিতীয় প্রস্থ হতভম্ব সকলে। পরদিন এসে পৌঁছলেই বা বিয়েটা হবে কি করে কারো মাথায় এলো না। দুশ্চিন্তায় ললিতার মায়ের তো মাথাই খারাপ হবার দাখিল। ফাল্গুনে আর বিয়ের তারিখ নেই, সামনে চৈত্র মাস।

যাই হোক, বরের কোনো অঘটন হয় নি বা সে বিগড়ে যায় নি, এটুকুই যা সান্ত্বনা। বিয়েবাড়ির খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান কিছু বাদ গেল না, বিয়েটাই শুধু হল না। এ-রকম বিয়ের নেমন্তন্ন কেউ কোনদিন খেয়েছে কিনা ললিতা জানে না।

পরদিন সকালে দশটা নাগাদ একটি মাত্র বন্ধু নিয়ে বর এসে পৌঁছল। সেই বন্ধু অনিমেষ গাঙ্গুলি। কিন্তু বরের হাব-ভাব দেখে অবাক সকলে। বিয়ে পণ্ড হতে পারে এ-রকম কোনো বিভ্রাটের হদিস পেল না কেউ। জেরার ফলে বিব্রত এবং বিপন্ন মুখভাব। শুধু বলল, একটা পুলিসের গণ্ডগোলে পড়ে গাড়ি ধরা গেল না।

ফলে মেয়ের পক্ষ ভিতরে ভিতরে আরো বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ললিতার দুই দাদাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বন্ধু, ডাক্তার অনিমেষ গাঙ্গুলি জানালো গাড়ি ধরতে না পারার মত বিভ্রাটটা কি।

প্রথমেই বন্ধুর একপ্রস্থ সুখ্যাতি করে নিল সে। সাদাসিধে ভালমানুষ, কারো সাতে-পাঁচে নেই। যাকে বলে বেশ নিরীহ। কিন্তু এই লোকটাই রেগে গেলে কি-যে গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে ঠিক নেই। যেদিন তাদের রওনা হবার কথা সেদিনই ছোটখাটো একটা বিপাকে পড়েছিল তারা। দিনদুপুরে রাস্তায় এক ভদ্রলোক একজন ভদ্রমহিলাকে অপমান করে বসেছিল। তখন দুপুর, রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই। মহিলার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল লোকটি। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে বেশ বিপন্ন মনে হয়েছিল সমরেন্দ্রর। মুখ তুলে মহিলা তাকে দেখে তাড়াতাড়ি হাত তুলে ডেকেছিল। সে যেন এই লোকটার কবল থেকে উদ্ধার পেতে চায়।

সমরেন্দ্রর এমনিতেই নীতিজ্ঞান একটু বেশি। সে দৌড়ে নেমে এসেছিল। ততক্ষণে পাড়ার আরো দুই-একজন এসে জুটেছে।

মহিলার অভিযোগ, লোকটা আজ ক'দিন ধরে তার পিছনে লেগে আছে। মিথ্যে অজুহাতে তার স্বামীকে থানায় টেনে নিয়ে তাকে আঁটকে রেখেছে।

লোকটার বক্তব্য, তার স্বামী জুয়াড়ী, চোরাকারবারী। এই মহিলার যোগসাজস

আছে তার সঙ্গে। বিশেষ প্রয়োজনেই সে এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে—অতএব এ নিয়ে কারো মাথা ঘামানো দরকার নেই।

রাগে ক্ষোভে মহিলার চোখ ফেটে জল এসেছিল, বলে উঠেছিল, মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে, ওই দেখুন ওর পকেটে সোনার গয়না আছে, আমাকে দেবে বলে ঘুরছে—বাড়িতে একটা ছেলে আছে আমার, ছোট ননদ আছে, তাদের সামনেই নির্লজ্জ বেহায়ার মত রাতদুপুরে এসে হাজির হয়, যা-তা বলে, বেশি গণ্ডগোল করলে পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে বলে শাসায়। দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন এইভাবে পিছনে লেগে আছে।

অতএব সমরেন্দ্র কৈফিয়ত চেয়েছিল তার কাছে। লোকটা তখন চোখ পাকিয়ে অপমান করেছিল তাকে। তর্ক-বিতর্কের শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়েছিল। গাল বাড়িয়ে প্রথম চড়টা তাকে সমরেন্দ্রই মেরে বসেছিল। পাড়ার লোকেরাও ছেড়ে দেয় নি তারপর।

লোকটাকে ধরে থানায় নিয়ে যাবার কথা উঠতে দেখা গেল, গণ্ডগোলের ফাঁকে মহিলা কখন সরে পড়েছে। মার-খাওয়া লোকটা আহত সাপের মত গজরাচ্ছে তখন, সমরেন্দ্রকে বলেছে এর ফল কি হবে টের পাবে, ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

লোকটাকে দেখে অবস্থাপন্ন ঘরের লোফার-টোফার ভেবেছিল সমরেন্দ্র। তার পকেট থেকে একজোড়া সরু বালাও বেরিয়েছে। অতএব এই কথার পর সমরেন্দ্র সোজা আরো দু-ঘা বসিয়ে দিয়েছে তাকে। ধরে থানায় নিয়েই যেত, আজ বিকেলের গাড়ি ধরবে, থানায় গেলে আবার কি ফ্যাসাদে আটকে যায় কে জানে, তাই থানায় না গিয়ে ভাল-রকম শাসিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

এক ঘণ্টার মধ্যে বিপত্তি।

ট্রেনে সঙ্গে যারা বরযাত্রী যাবে তারা এসে গেছে। অনিমেষ গাঙ্গুলিও এসেছে। কিন্তু রওনা দেবার তোড়জোড়ের আগেই বাড়ির দোরে ট্রাকভরতি পুলিস। সঙ্গে পুলিস অফিসার, আর পুলিসের ইউনিফর্ম পরা সেই মারা-খাওয়া লোকটাও।

সমরেন্দ্রর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কর্তব্যরত পুলিসের কাজে বাধা দিয়েছে, তাকে মারধোর করেছে। অতএব এই মুহূর্তে তাকে থানায় যেতে হবে।

অফিসারটিকে আড়ালে ডেকে অনিমেষ আর অন্য সকলে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল, বিয়ের কথা বলল। কিন্তু কোনো কথা অফিসারের কানে ঢুকল না। উল্টে অভদ্রের মত ব্যঙ্গ করল, এও তো শ্বশুরবাড়িরই ব্যাপার, সেখানেও আদর-আপ্যায়ন ভালই হবে।

অনিমেষ গাঙ্গুলি বেগতিক দেখে তাদের একটু বসতে বলল। প্রথমে যা মাথায় এলো তাই করল সে। সমরেন্দ্রর কলেজে টেলিফোন করে ব্যাপারটা প্রিন্সিপ্যালকে জানাতে বলল। কাছেই কলেজ। বিয়ে করতে যাবে বলে সমরেন্দ্র ছুটি নিয়েছে।

অফিসার অপেক্ষা করতে রাজী নয়। অতএব অনিমেষ আর বরযাত্রীদের অনেকে বরের সঙ্গে থানায় এলো। হাতে পেয়ে কি নির্যাতন করে সেই ভয় সকলের। ভয় শুধু সমরেন্দ্রই পায় নি, বরং রাগেব ঝোঁকে পুলিস অফিসারকে যাচ্ছেতাই বলেছে,

আর তাদের তৎকালীন সরকারকেও ছেড়ে কথা কয় নি।

থানায় আসার আধ-ঘণ্টার মধ্যে সমরেন্দ্রর কলেজের ছাত্রের দল থানা ছেয়ে ফেলেছে। ফোন যাকে করা হয়েছিল, সে শুধু প্রিন্সিপ্যালকে খবর দেয় নি, তক্ষুনি ছাত্রদের কানেও গেছে কথাটা। ডক্টর বসু প্রিয় অধ্যাপক তাদের, অতএব কলেজের হাজারখানেক ছাত্র থানা চড়াও করেছে। প্রিন্সিপ্যাল আর মাস্টারবাও অনেকেই এসেছেন।

একটা লোককে থানায় এনে এরকম বিপাকে থানা অফিসারটি বোধ হয় আর পড়েন নি। এই মানুষটির কাছ থেকে অন্তত ভদ্র ব্যবহার পাওয়া গেল। অনিমেষ গাঙ্গুলিকে তিনি আশ্বাস দিলেন, ডক্টর বসুর সম্মানের হানি হতে পারে এমন কিছু তাবা কখনোই করবেন না—কিন্তু বিয়ে থাক আর যা-ই থাক, ওপবওয়ালাব হুকুম ভিন্ন তিনি তাঁকে ছেড়ে দিতে পারেন না—কারণ তার উপর সীরিয়স চার্জ। আর সত্যি যদি তাঁর সংশ্লিষ্ট কর্মচাবী অপবাধী হয়ে থাকে, তাব শাস্তিও সে পাবে।

অতএব ওপরওয়ালাব হুকুমের চেষ্টায় ছোটাছুটি করতে হল অনিমেষ গাঙ্গুলিকে। এক বড কাগজেব মুরুব্বি তাব অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেই মুরুব্বির সঙ্গে মিনিস্টারদের অনেকের দহরম-মহরম। কিন্তু দিন বুঝে মিনিস্টারবাও নি-পাত্তা সব। যাই হোক, সেই শাখা-প্রশাখা ধরে যখন খালাস কবে আনা গেল সমরেন্দ্রকে, তখন বাত গিয়ে পবদিন প্রায় দুপুর গড়িয়েছে।

সমস্ত বাত ছেলেরা পালা কবে থানা পাহারা দিয়েছে। আর অনেক রাত পর্যন্ত সমরেন্দ্রকে বেরিয়ে এসে এসে তাদেব নিশ্চিন্ত করতে হয়েছে, তাব ওপর কোনোরকম অভদ্র ব্যবহাব কবা হয নি। তাদের বাড়ি যেতে অনুবোধ করা সত্ত্বেও তাবা শোনে নি।

শ্বশুরবাড়ির লোকের চোখে ববের এই পুরুষোচিত মেজাজ গুণাবলীর মধ্যেই পড়েছে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে কি করে?

উৎকণ্ঠাশূন্য মুখে সমরেন্দ্র বলেছে, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হোক। তার জন্যে তো আব দিনক্ষণেব দরকার নেই। কলেজে টেলিগ্রাম কবে সে ছুটি বাড়িয়ে নিচ্ছে।

অগত্যা সেই ব্যাপারই হয়েছে। পরে, অর্থাৎ পরেব বৈশাখে মেয়েজামাইকে ধরে এনে একটা আনুষ্ঠানিক বিয়েও দিয়ে ছেড়েছেন ললিতার মা।

প্রথমবার বউ নিয়ে ফেরাব সময় ট্রেনে ললিতাকে, ললিতা সখী বলে সম্বোধন কবেছিল অনিমেষ গাঙ্গুলি। পবে ললিতা অবশ্য অনেকদিন ছদ্ম-কোপে বলেছে, ললিতা সখী তো ব্যাটাছেলে শুনেছি!

একদিনের পাল্টা জবাবে অনিমেষ মুখ বন্ধ করেছে তার। সমরেন্দ্রকে দেখিয়ে বলেছে, সে দুর্ভাবনা তো ওর, আমার কি!

নতুন ঘর, নতুন সংসার, সবই পছন্দ হয়েছিল ললিতার। মানুষটা ভদ্র, রুচিবান। সংসারেরও ঝামেলা নেই। একটি মাত্র দেওর আর একটি ননদ। ননদের বিয়ে আগেই হয়ে গেছে। দেওরটি পাকাপোক্ত লণ্ডন-বাসী। সেখানে চাকরি করে। পার্কের ধারে

নিজেদেব এই পৈতৃক ছোট বাড়ি। বাড়িটা পুবনো বটে, কিন্তু বেশ ছিমছাম। একতলায ভাড়াটে থাকে একঘব, তাবাও বেশ ভদ্র।

সবই ভাল, কিন্তু ভদ্রলোকেব মেজাজ চড়লে একটু মুশকিল। সর্বদা যে খিটখিট কবে তা আদৌ নয, মেজাজ ঠিক না থাকলে ববং আবো বেশি চুপ মেবে যায। কিন্তু তাব মেজাজ বুঝতে বেশ সময লেগেছে ললিতাব। সব ব্যাপাবে গোছালো মানুষ। জাযগাবটা জাযগায না পেলে বিবক্ত হয, সমযেব কাজ সমযে হওযাই চাই। স্ত্রীব একটা গাড়িব শখেব কথা সে টেব পেযেছিল। বিযেব দু'বছবেব মধ্যে একটা ফোর্ড প্রিফেক্ট কেনা হযেছে। পুবনো গাড়ি হলেও ভাল হাতে ছিল—ঝবঝবে হযে যায নি। তাব লেখা অর্থনীতিব বইযেব চাহিদা হঠাৎ চাবগুণ বেড়ে গেছল। ফলে হাতে মোটা টাকা এসেছিল। বন্ধুব সঙ্গে পবামর্শ চাইছিল তলায তলায, একদিন একেবাবে গাড়ি নিযে এসে অবাক কবেছে তাকে।

কিন্তু ললিতাব গাড়ি চালানো নিযেই ক্রমশ অশান্তি আব বিবক্তি বেড়েছে তাব। ধীবেসুস্থে চালাতেই পাবে না। বাস্তা একটু ফাঁকা পেল তো অমনি হুড়মুড় কবে ছুটল। আব ভিড়েব বাস্তাব মধ্যেও যে স্পীডে চালায, সমবেন্দ্রব একটুও পছন্দ নয। একটু পবে-পবেই সতর্ক কবা দবকাব হয। ললিতা হাসে, অনিমেষ হাসে।

সমবেন্দ্র বেগে গিযে বলে, তুমি আনন্দ কবে গাড়ি চালাচ্ছ, চাকাব নীচে দুই একটা মাথাই যদি না পড়ল তাহলে কি আব আনন্দ, কেমন?

বাগ কবে ললিতা তখন গাড়িব গতি এত কমিযে দেয যে অনিমেষেব তাতেও বাগ হযে যায।

মোট কথা, অর্থনীতিব এই মানুষটা জীবনেব সর্বক্ষেত্রে এমন মিতাচাব বপ্ত কবেছে, যাব হেবফেব হলে অস্বস্তি ভোগ কবে, আব বিবক্তও হয।

তবু দিন বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল ললিতাব। ভাবত, বেশ সুখেই আছে। সেই আই এ এস-এব ঘবেব কথা মনে হলে নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবত সে। এই নির্লোভ নিবহঙ্কাব মানুষটা সেই অ-দেখা আই এ এস-এব থেকে শতগুণ বেশি মর্যাদা পেযেছে।

মেযেদেব সব সুখ আব আকাঙ্ক্ষাব খবব তখনো জানা ছিল না ললিতাব।

ললিতা প্রথম সন্তানসম্ভবা হযেছে বিযেব আড়াই বছব বাদে। সেই অনুভূতিব স্বাদে ভেতবটা আবো কত যে ভবপুব হযে উঠেছিল, সে-ই জানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যেব সূচনা যে সেটাই, তা সে জানত না।

মা তাকে নিযে যেতে চেযেছিলেন। কিন্তু ললিতা নিজেই যেতে চায নি। তাব কেমন ভয-ভয কবছে। এখানে অনিমেষ বযেছে আপনাব জন। বিলেতফেবত নামী ডাক্তাব সে। নিজেব নার্সিংহোম বযেছে। এত বড় ভবসা আব কোথায পাবে। মা যেতে লিখেছেন শুনেই অনিমেষ গাঙ্গুলি মাথা নেড়ে বলেছে, নির্ভাবনায এখানে আমাদেব হাতেই থেকে যাও ললিতা সখী।

বেশি বযসেব প্রথম সন্তানসম্ভাবনা বলেই সমবেন্দ্রবও দুশ্চিন্তা একটু। অনিমেষ

তাকেও আশ্বাস দিয়েছে, আমার নার্সিংহোমে এসে দেখে যাও, শতকরা নব্বুইভাগই আজকাল বেশি বয়সের ব্যাপার, কে আর এখন ষোল বছরের মেয়ে ঘরে আনে।

তবু একটা অনিশ্চিত ভাবনা ললিতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। অনিমেষ ঠাট্টা করেছে, কলকাতা শহরে পাকা হাতে গাড়ি চালানো মেয়ে এ রকম নার্ভাস হয়, কি কাণ্ড।

ছায়া পূর্বগামী। তাই বোধহয় সর্বদাই কি রকম অজানা আশঙ্কায় ভুগত ললিতা। ডাক্তার অনিমেষ গাঙ্গুলি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। নিজের নার্সিংহোমেই আরো বড় ডাক্তার এনেছিল সে। কিন্তু দুর্যোগ এড়াতে পারে নি।

বাচ্চা বেশী বড় হয়ে গেছিল, মাতৃজঠরের অক্সিজেনে ঘাটতি পড়েছিল। ললিতার শারীরিক অবস্থা তখন শোচনীয়। তারই ওপর কাঁটা-ছেঁড়া করে মৃত শিশুকে বার করে আনতে হয়েছে।

ললিতার সমস্ত মানসিক দিকটা বিপর্যস্ত হয়ে গেছে এরপর। অনিমেষ গাঙ্গুলির চিকিৎসায় আর সমরেন্দ্রর যত্নে শরীর সেরেছে বটে, কিন্তু মনের ভিতরে একটা ক্ষত থেকেই গেছে। অনেক চেষ্টা করেও এই ক্ষতটা নির্মূল করতে পারে নি সে। হামেশা এ-বকম দুর্ঘটনা কত হয় তার নজির দেখিয়েছে অনিমেষ—পরে একাধিক সন্তানের মা হয়েছে সেই সব মেয়েরা। কিন্তু ললিতার কি যেন অজ্ঞাত ত্রাস একটা।

দেড় বছর ঘুরে যায়, আবার ছেলেপুলে হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে অনিমেষ গাঙ্গুলি আড়ালে বকেছে বন্ধুকে। ললিতাকেও কম ঠাট্টা-ইশারা করে নি। তার মতে সুস্থ সবল একটা সন্তান অচিরে আসা দরকার। তাহলেই মনের দিক থেকে ললিতা মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়বারের এই সন্তানসম্ভাবনা দেখা দিয়েছে প্রায় তিন বছর বাদে। আর তখন থেকেই ভিতরের অনুভূতিগুলো বড় বিচিত্র খাতে বইছে ললিতার। সময় যত এগিয়ে আসছে, দেহের অভ্যন্তরে তত একটা অস্বস্তিকর গ্লানি। তার থেকেও বেশি, দুশ্চিন্তা। এ যেন এক রোগের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার। চিকিৎসক হিসেবে অনিমেষ গাঙ্গুলি এক এক সময় ধমক-ধামক পর্যন্ত করে তাকে। কিন্তু মনে মনে সে আর সমরেন্দ্র দুজনেই চিন্তিত।

তখন থেকেই মানসিক প্রস্তুতির মহড়ার কথা মনে হয়েছে অনিমেষ গাঙ্গুলিব। গোপনে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করেই এই মহড়ার ব্যবস্থা করেছে অনিমেষ। একদিন ছোট একটা ভারী শৌখিন প্যারামবুলেটব বাড়িতে এনে হাজির সে। দেখেই ললিতার মুখ লাল। অনিমেষ গাঙ্গুলি হেসে কৈফিযত দিয়েছে, কিনতে হয় নি, নতুন কোম্পানি পাবলিসিটি-স্যাম্পল পাঠিয়েছে। জিনিসটা সুন্দর দেখে নিয়ে এলাম, লাগবেই তো।

বড় বড় এক-একটা ডল হাতে করেও উপস্থিত হয়েছে। বলেছে, আগন্তুকের অভ্যর্থনার জন্য সব প্রস্তুত রাখো ললিতা সখী—একটা নতুন জীবন আসছে ঘরে, এ কি চারটিখানি কথা নাকি।

সহজ হতে চেষ্টা করে ললিতা ঠাট্টা করেছে, এও কি স্যাম্পল নাকি?

ঠাট্টা কানে তোলে নি অনিমেষ গাঙ্গুলি, একে একে জিনিসপত্র আমদানী করে

সন্তান আবির্ভাবের আবহাওয়াটি পাকাপোক্ত করে তুলতে চেয়েছে। ললিতা বিব্রত বোধ করেছে, এক-একসময় বিরক্ত হয়েছে, আবার হেসেও ফেলেছে। বলেছে, তোমাদের এই বিলিতি আদবকায়দা ছাড়ো তো—লোকে দেখলে কি বলবে!

অনিমেষ গাঙ্গুলি তক্ষুনি ছদ্মকোপে চোখ পাকিয়েছে। কিছু বললে লোকের চোখ কানা করে দেব আমি।

ললিতা মুখে যাই বলুক, মনের তলায় আবহাওযা রচনা হচ্ছে একটু একটু। খারাপ লাগে না, আবার ভয়ও যায় না। অনিমেষ গাঙ্গুলি দস্তুরমত শাসিয়েছে তাকে, বলেছে, তোমার মাথাখারাপ হয়েছে, কিন্তু একে আর বেশি প্রশ্রয় দেবে তো তোমার মত পেসেন্ট আমি বাতিল করে দেব।

তারই সর্বশেষ হুকুম এই বোনাটা। সামনে ভরা শীত আসছে। কে আব তার ছেলের জন্য অর্ডার মাফিক জিনিস তৈরি করে বসে আছে। অতএব নিজেই একরাশ উল আর কাঁটা এনে দিয়েছে। বোনো বসে বসে, যে কটা পারো তৈবি করে রাখো, বেশি হবে না—নার্সিংহোমের কত শিশুর আমদানী হয় যাদের দরকার অথচ পায় না।

এমনি আবোলতাবোল কথায় অনেক ঝকাঝকি করে শেষে বুনতে বসিয়ে ছেড়েছে তাকে। দু'দিন একদিন পর-পরই এসে দেখে যায়, বোনা এগুচ্ছে না, ফাঁকি দেওযা হচ্ছে।

তার অনুপস্থিতিতে আধা-রাগে আর আধা-কৌতুকে সমরেন্দ্রকে ললিতা বলেছে, ছেলে বা মেয়ে যে-ই আসুক, নাম-টামগুলোও ঠিক করে রেখে দাও, শেষে দেরি হয়ে যাবে না!

সমরেন্দ্র তখন জবাব দেয় নি, পরে অনিমেষের সামনেই ফাঁস করে দিয়েছে। হাসি মুখেই অনিমেষ মন্তব্য করেছে, সমরেন্দ্রর ছেলেব নাম হওয়া উচিত গণ্ডগোলেন্দ্র —যা একখানা দেখাচ্ছ তোমরা—এই দেশেই কিনা পপুলেশান প্রোবলেম!

আস্তে আস্তে বোনাতেও মন এসেছে ললিতার। কেবল ওই বিকেলের সময়টুকু ছাড়া। জানলার ধারে চেযার টেনে চিলড্রেনস পার্কের দিকে মুখ করে বসলে কিছু আর মনে থাকে না। দু'চোখ ভরে দেখে ললিতা। দেখে আর একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা একেবারে যেন ফল ধবে চোখের সামনে এগিয়ে আসে। ডাক্তার অনিমেষ গাঙ্গুলি যা চেয়েছিল, ললিতার মনের তলায় সেই বিশ্বাসটুকুই ক্রমে দানা বেঁধে উঠেছে। ভয়ের ছায়া এখনো পড়ে, কিন্তু এখন তো নিজেই সেটা ঝেড়ে ফেলে সহজ হতে চেষ্টা করে।

কিন্তু এবারে যে বিভ্রাট ঘটে গেল তার জের সামলাতে ললিতা বসুর প্রাণসংশয়। কৃতী ডাক্তার অনিমেষ গাঙ্গুলিরও গলদঘর্ম অবস্থা।

শেষের দু'মাসের মাথায় হঠাৎ অঘটন দেখা দিল একদিন। ডাক্তারী ভাষায় যার নাম কনসিলড অ্যাক্সিডেন্টাল হেমারেজ। পেশীর অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ। সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নার্সিংহোমে সরানো হল তাকে। রোগিণী বাঁচানোর একমাত্র পথ—অপারেশন। সহজ অপারেশন নয়। যে অপারেশনের ফলে ভবিষ্যতে সন্তানধারণের সমস্ত ভাবনা

নির্মূল। আর যে আসতে পারত, এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেও গেছে।

কিন্তু রোগিণী বাঁচানোই প্রধান সমস্যা তখন। ভাবার অবকাশ নেই। বন্ধুর দুই হাত ধরে সমরেন্দ্র বলেছিল, যেমন করে হোক ললিতাকে বাচাও ভাই, আমি আর কিছু চাইনে।

অপারেশন হয়ে গেল। ললিতা বাচল। কিন্তু এই বাচা সে বাচতে চেয়েছিল কিনা তা সে জানে না।

তার মনের দিক থেকে এবারে যে বিপর্যয় ঘটে গেছে, সেটা সে সামলাবে কি করে, অনিমেষ গাঙ্গুলিও ভেবে পায় না।

তবু ললিতাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, সন্তান হয় না এ-রকম তো কত পরিবার আছে। এ নিয়ে আর ভেবে মন খারাপ করে কি লাভ।

ললিতা হাসতেই চেষ্টা করেছে। বলেছে, মনখারাপ তো তোমাদেরই বেশি হয়েছে, আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বেচেছি।

টানা দু'মাসের আগে নার্সিংহোম থেকে তাকে ছাড়তে রাজী হয় নি অনিমেষ গাঙ্গুলি। ছেড়েছে যখন, ললিতার শারীরিক দিকটা মোটামুটি সুস্থ।

বিকেলের দিকে বাড়িতে আসার কথা ছিল তার। কলেজ-ফেরত সমরেন্দ্রই তাকে নিয়ে আসবে। কিন্তু কলেজে সে টেলিফোন পেল, ললিতা এখনই বাড়ি ফেরবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, শনিবারের বার-বেলায় যাবে না, অতএব অনিমেষ তাকে নিয়ে রওনা হচ্ছে।

কলেজ ফেলে সমরেন্দ্র বাড়ির দিকে ছুটল। দোতলায় পা দিয়েই তার মেজাজ বিগড়লো। দেখে, ললিতা শোবার ঘরের ইজিচেয়ারে শ্রান্ত দেহ এলিয়ে বসে আছে। তার সামনের একটা চেয়ারে অনিমেষ বসে। আর ওদের চোখের সামনে দিয়েই পরিচারিকা সুহাসিনী সেই সব বড় বড় পুতুল, প্যারামবুলেটার, বোনার সরঞ্জাম ইত্যাদি সরাচ্ছে।

বেচারী সুহাসিনীর দোষ নেই। দাদাবাবু তাকে বলে রেখেছিল, বিকেলে বউদি আসছে—তার মধ্যে ওই সব জিনিসপত্র একেবারে চোখের আড়াল করে সরিয়ে রেখে যেন ঘর পরিষ্কার করে রাখা হয়। সুহাসিনী ভেবে রেখেছিল, দিনের কাজ-কর্ম সেরে দুপুরের নিরিবিলিতে নির্দেশমত ঘর গুছিয়ে রাখবে। এই সকালের দিকেই চলে আসবে হঠাৎ, কে ভেবেছিল?

ইজিচেয়ারে বসে তার উদ্দেশে চাপা গর্জন শুনল ললিতা। সকালে যা করতে বলা হয়েছিল, কেন তক্ষুনি তা করে রাখা হয় নি। ঠিক শোনা না গেলেও ব্যাপারটা বুঝল ললিতা। বলল, এ নিয়ে তোমাকে এখন রাগারাগি করতে হবে না, ভিতরে এসো।

সমরেন্দ্র ভিতরে এসে দাড়াল। বিব্রত মুখ। এই দেখে উল্টে তারই মায়া হল কেমন। পিছনে ভয়ে জড়সড় সুহাসিনী এসে দাড়িয়েছে। ঘর থেকে আরো কিছু নেবার আছে।

ললিতা তাকে বলল, এখন আর কিছু নাড়াচাড়া করতে হবে না, তুমি যাও। সুহাসিনী চলে যেতে আবার বলল, ওগুলো যেখানে সেখানে গুদোম করে না রেখে

তোমাব বন্ধুব নার্সিংহোমে পাঠিযে দিও—যে পাবে সে খুশী হযে নিযে যাবে।

সমবেন্দ্র চুপ। অনিমেষ গাঙ্গুলিও চুপ।

দিন মাস বছব ঘুবে গেল। ললিতাব স্বাস্থ্য ফিবেছে। বাইবেব চেহাবাটা আগেব থেকে আবো বেশি উজ্জ্বল হযেছে। অনিমেষ এসে আগেব মতই ললিতা সখী বলে হাক দেয। হাসি ঠাট্টা কবে, টিকা-টিপ্পনী কাটে। কিন্তু ভুলেও কখনো বাচ্চা-কাচ্চা বা ছেলে-পুলে সম্পর্কে একটি কথাও বলে না।

ললিতা আগেব মতই গাড়ি হাঁকায, সমবেন্দ্র আগেব মতই বকাবকি কবে তাকে, সতর্ক কবে। সবই আগেব মত চলছে। কিন্তু একমাত্র ললিতাই অনুভব কবে, তাব জীবনেব একটা অধ্যাযেব সমাপ্তি ঘটে গেছে। একটা নিশ্চিত পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে তাতে। এখন সেই 'আগেব মতটুকু'ই সব—তাই নিযেই থাকতে হবে তাকে। পবেব আশা কিছু নেই, আশ্বাস কিছু নেই। তাই সহজ হবাব তাড়নায সে সম্পূর্ণ আগেব মত হযে উঠতে চেযেছে।

পেবেছে। সমবেন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ কবেছে। ক্রমে দুর্ভাবনা কমে এসেছে অনিমেষ গাঙ্গুলিব।

কিন্তু ব্যতিক্রম হঠাৎ এক সময টেব পায পবিচাবিকা সুহাসিনী। তাব ধাবণা, বউদি কেমন অন্যমনস্ক হযে পড়ে যখন একলা থাকে। এক কথা বলতে এসে আব এক কথা বলে। ডেকে পাঠিযে ভুলে যায কি জন্য ডাকল। তাবপব নিজেই অপ্রস্তুত হয কেমন। তা ছাড়া আব একটা ব্যাপাবও লক্ষ্য কবেছে সুহাসিনী। বিকেলে বাড়ি থাকলে জানলাব ধাবে আব ইজিচেযাব টেনে বসে না বৌদি। সজ্ঞানে সেখানে দাড়াযও না, পার্কে ছেলেপুলেগুলোব হুটোপুটি দেখে না। কিন্তু নিজেব অজ্ঞাতে যেন কখনো-সখনো ওই জানলাব ধাবে এসে দাড়িযে যায। তখন এক অদ্ভুত অন্যমনস্ক মূর্তি বউদিব। তখন মনে হয, পার্কেব ওই বাচ্চাগুলো বুঝি বউদিব উপব দিযে দুপ-দাপ কবে খেলে বেড়াচ্ছে, আব বউদি নিঃশব্দে একটা যাতনা সহ্য কবে চলেছে।

এ-সব সুহাসিনী নিজেই দেখে আব নিজেই সাতপাচ ভাবে—কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পাবে না।

একে একে আবো দুটো বছব কেটে গেল। ললিতা তিবিশেব ওধাবে পা দিযেছে। কিন্তু বযসেব পদক্ষেপ এখনো ভাল বকমই ঠেকিযে বাখতে পাবছে সে। অনিমেষ গাঙ্গুলি লাগামছাড়া বসিকতা কবে বসে এক-এক সময। সেদিন চোখ পাকিযে বন্ধুকে বলছিল, ওহে মিতাচাবী, শুকনো অর্থনীতি ঘেটে যে কি সুখ পাও তুমিই জানো —ঘবে যে ওদিকে তনু-শাসনেব বাধ উপছে উঠচে সেদিকে চোখ আছে, না কি?

আত্মীয পবিজন বা সঙ্গিনীদেব সঙ্গে দেখা হলে তাবা বলে, ঝাড়া হাত-পাযে বেশ সুখে আছো ভাই—আমবা সংসাবপঙ্কে ডুবেই গেলাম।

ললিতা হাসে। মুখে বলেও হযত কিছু। কিন্তু বুকেব তলায কোথায যেন বাতাসেব অভাব বোধ কবে। নিজে দেখতে পায না সব-সময, অপবে তো পাযই না।

কিন্তু আবো কিছু বাকি ছিল। পাযেব তলাব মাটি সবে যাবাব মতই ঘটনা বা দুর্ঘটনা একটা।

সেটা ছিল বিয়ের তারিখ আবার অন্নপ্রাশনেরও দিন। এক কথায় শুভদিন। কিন্তু ললিতার জীবনের সব থেকে দুর্বিপাকের দিন বোধ হয় সেটাই।

অনিমেষ গাঙ্গুলির একটি বোনের বিয়ে। সে আগে থাকতেই বলে রেখেছে, এ বিয়ের কন্যা-কর্তা কেউ নেই, কন্যা-কর্ত্রী আছে—সে ললিতা সখী। অতএব দু'দিন আগে থাকতে তার বাড়ি গিয়ে থাকলে ভাল হয়। ললিতাকে ক'দিন ধরেই বিয়েবাড়িতে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। অনিমেষের স্ত্রী আর অন্য সকলেও নিতান্ত আপনার জন তাদের। কিন্তু বিয়ের আগের দিন বেশ মুশকিলের ব্যাপার হল একটা। চন্দননগর থেকে মাসি-শাশুড়ী এসে হাজির। বোনপো'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন ভদ্রমহিলা। সময়ে অসময়ে খোঁজখবর করেন, বছরে দু'চার দিন অন্তত জোর করেই ললিতাকে ধরে এনে নিজের বাড়িতে রাখেন। যথেষ্ট আদরযত্নও করেন।

এবারে তার আসার হেতুও এক নেমন্তন্নের ব্যাপার। মাসি-শাশুড়ীর তিন মেয়ে। তাদের মধ্যে ছোট মেয়ের প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন। যেদিন অনিমেষ গাঙ্গুলির বোনের বিয়ে, সেই দিনই। কিন্তু মহিলাকে বোঝানো দায়। বন্ধুর বোনের বিয়েটা নিজেদের ঘরের কাজের থেকেও বড় করে দেখার মত কোনো যুক্তি মানার কারণ নেই তাঁর। ইচ্ছে, বোনপো না পারুক, ললিতা তাঁর সঙ্গে আজই যাবে এবং দিনকতক থেকে আসবে। তিনি না-ছোড়।

অগত্যা ফয়সালা করতেই হল একটা। স্থির হল, পরদিন ললিতা একাই যাবে, কিন্তু বিকেলের মধ্যেই ফিরতে হবে তাকে। আর, সমরেন্দ্রর ঘাড়ে বিয়েবাড়ির এত দায়িত্ব যে তার নড়ার উপায় নেই। মাসি ক্ষুণ্ণ হলেন, কিন্তু অগত্যা এই ব্যবস্থাতেই রাজী।

ললিতার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না একটুও, কিন্তু নিরুপায় হয়ে পরদিন সকালে গাড়ি নিয়ে বেরুতে হল। সমরেন্দ্র বার বার বলে দিয়েছে, বিকেলের মধ্যে যেন অবশ্য চলে আসে, এসে সোজা বিয়েবাড়িতে চলে যায় যেন। ললিতা তাকে নিশ্চিন্ত করেই বেরিয়েছে। যেতে এক ঘণ্টা আসতে এক ঘণ্টা, বিকেলের মধ্যে ফিরতে না পারার কোনো কারণ নেই। সম্ভব হলে অনেক আগেই ফিরবে। আর বাড়ি হয়েই তারপর বিয়েবাড়ি যাবে। এই সকালের জামা-কাপড় না বদলে যায় কি করে? তার থেকে বাড়ি এসে তৈরি-টৈরি হয়ে সুহাসিনীকে নিয়ে বিয়েবাড়িতে চলে যাবে। বলে গেল, সুহাসিনী যেন বাড়িতে থাকে।

বাইরে ফুর্তির অভাব নেই ললিতার। কিন্তু কেন যেন মাসি-শাশুড়ীর বাড়ির উৎসব খুব ভাল লাগল না ললিতার। মাসি-শাশুড়ীর আদরযত্নের ত্রুটি নেই, অনেকে বরং তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবু না। কেবলই মনে হয়েছে, কতক্ষণে আবার বেরুতে পারবে সে!

বাড়িতে বাচ্চা-কাচ্চা ভরতি। মাসি-শাশুড়ীর বড় দুই মেয়ের তিনটে চারটে করে ছেলে মেয়ে। মেজ মেয়ের ছোট বাচ্চাটার আট ন'মাস মাত্র বয়েস। এ ছাড়া মাসি শাশুড়ীর দেওরদের ঘরের শিশু-বাহিনীটিও ছোট নয়। তাদের দাপটে আর দৌরাত্ম্যে ললিতার মাথাটা ঝিমঝিম করছে সেই থেকে। কেন যে তার পালাতে ইচ্ছে করছে, নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই পালানো যায় না। খাওয়াদাওয়া সারা হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর মাসি-শাশুড়ী বিশ্রাম না করে যেতে দিলেন না। এদিকে বিকেলের আগেই বাড়িতে আরো অতিথি-অভ্যাগত এসেছে। সকলে সেদিকে ব্যস্ত।

হঠাৎ কোণের দিকের একটা ঘরে তারস্বরে শিশুর কান্না শুনে সচকিত হল ললিতা। কিন্তু সকলে এত ব্যস্ত যে সেদিকে কারো কান নেই। ললিতা সেই ঘরে ঢুকে দেখে মাসি-শাশুড়ীর মেজ মেয়েব সেই আট-ন'মাসের ছোট ছেলেটা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। ঘুমচ্ছিল—ঘুম ভাঙতে এই চিৎকার। নিজের চিৎকারে নিজেরই দম বন্ধ হওয়ার দাখিল।

ললিতা তাড়াতাড়ি ডাকতে এলো কাউকে। ওর মায়েরই দেখা পেল। কিন্তু কিছু একটা করছে, তার দু'হাত জোড়া। বলল, কাদবেই তো, ওর খিদে পেয়েছে—তুমি একটু ধরো না গিয়ে, হাতের কাজটা সেরে আমি আসছি।

ঘরে এসে ললিতা দেখে কান্নার দাপটে শিশুটা একেবারে নীলবর্ণ। তাড়াতাড়ি তুলে নিল। কিন্তু কান্না থামানো দায়। ঝাঁকিয়ে দুলিয়েও থামানো গেল না। শেষে বুকের কাছে চেপে ধরে পিঠ চাপড়াতে লাগল।

আর তখুনি রোমাঞ্চকর বিভ্রাট একটা। কান্না থামিয়ে ব্যগ্র শিশু তার বুকে মুখ গুঁজে কি যেন খুঁজতে লাগল।...বুকের মধ্যে বার বাব মাথাটা গুঁজে গুঁজে সে তার রসদ খুঁজছে আর মুখ দিয়ে অস্ফুট মুম-মাম শব্দ বার কবছে।

কি-যে ঘটে যেতে লাগল বুকের ভিতরে ললিতা জানে না। শিশুটা বুঝি তার অবশ হাত থেকে মাটিতে পড়ে যাবে, সেই ভয়েই আঁকড়ে ধরে আছে তাকে। আর শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি সিরসির সিরসির করে পা বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

...মাম-মাম...মাম-মাম...। আরো রেগে গিয়ে শিশুটা তার বুকের মধ্যে আরো বেশি মুখ ঘষছে আর মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছে।

কি-যে হচ্ছে কে জানে, ললিতা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কিছু একটা বুঝি ঘটেই যাবে এক্ষুনি। অবশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনোরকমে সক্রিয় করে তুলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বাইরে এলো ললিতা, তারপর ওর কর্মরত মায়ের কোলেই শিশুটাকে ফেলে দিল ধুপ করে। অস্ফুট স্বরে বলল, আমি পারছি না, তুমি ধরো ভাই।

ললিতার মুখের দিকে চেয়েই ওই শিশুর মা অবাক।

গাড়ি কলকাতার পথে ছুটেছে। সামনের কাঁটায় কত স্পীড উঠেছে সেদিকে চোখ নেই। ললিতার সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ।

...মাম...মাম...মাম্...মাম...মাম...মাম।

কান দুটো কি ঝালাপালা হয়ে যাবে ললিতার? আর বুকের মধ্যেও একটা স্পর্শ যেন আকুলি-বিকুলি করছে। অসহ্য যাতনায় ললিতার মনে হচ্ছে, এই বুক ভেঙে প্রাণটাই বুঝি বেরিয়ে যাবে এক্ষুনি। তাই ছোটার তাড়না, পালাবার তাড়না।

...মাম...মাম...মাম্...মাম...মাম...মাম্...

প্রাণপণে অকস্মাৎ ব্রেক কষল ললিতা। আগেই দেখেছে একটা বাচ্চা ছেলে

হঠাৎ এক দৌড়ে রাস্তা পার হতে চেষ্টা করল। চোখ বুজে ফেলে সমস্ত শক্তি দিয়েই ব্রেক কষেছিল ললিতা। তবু রক্ষা করা গেল না—বেশ জোরেই ধাক্কা খেয়ে সাত-আট হাত দূবে ছিটকে পড়ল ছেলেটা। আর—আর অত জোরে ব্রেক কষার দরুন গাড়িটা চাকা ঘষ্টে প্রচণ্ড শব্দ করে রাস্তা ছাড়িয়ে এবড়ো-খেবড়ো মাটির ওপর দাঁড়িয়ে গেল।

দিশেহারা ত্রাসে ললিতা গাড়ি থেকে নেমে ছুটল ছেলেটার দিকে। মাথা ফেটে রক্ত ছুটেছে। তুলে নেবার জন্য ললিতা ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। দু'চোখ টান করে ছেলেটা একবার দেখল তাকে, তারপর জ্ঞান হারালো।

এদিকে প্রায় বিশ-তিবিশটি মূর্তি ছুটে এসেছে ততক্ষণে। কতগুলো বাচ্চা-কাচ্চা, আশ-পাশের বস্তির আট-দশটা মেয়েছেলে, আর পাঁচ-সাত জন পুরুষ। চেচামিচি, আর্তনাদ, হট্টগোল।

তাদের মধ্যে একজন, চাষারে কঠিন চেহারার লোক একটা, চোখ পাকিয়ে এগিযে এলো ললিতার দিকে। চোখ দিয়ে আগুন ছুটছে যেন তার। বলে উঠল, মেমসাহেব বনে গেছেন একেবারে, কেমন গরিবের মাথা থেঁতলে দিয়ে গাড়ি হাকাতে খুব ভাল লাগে, অ্যাঁ?

ললিতা নিস্পন্দ কাঠ। অস্ফুটস্বরে বলতে চেষ্টা করল, ছেলেটাকে এক্ষুনি হাসপাতালে...

—থাক, থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না, তোমাদের মত গাড়ি-হাঁকানো নচ্ছাড চরিত্রের মেয়েছেলে আমি অনেক দেখেছি—

ওদিক থেকে একটা মেয়েলোক চেঁচিযে উঠল, ও বলাইদা, মিঠুকে তোলো শিগগির, ওখানে কবছ কি, গেল যে!

দু'চোখ আর এক প্রস্থ আগুন ছড়িয়ে লোকটা বলল, রোসো, দেখাচ্ছি মজা—

বলতে বলতে তাড়াতাড়ি আহত ছেলেটাব কাছে গেল। দু'হাতে রক্তাক্ত ছেলেটাকে তুলে নিয়ে রাস্তা ছাড়িয়ে গজ বিশেক দূরের চালাঘরের দিকে ছুটল সে। অশিক্ষিত লোকেব ব্যাপার, বড় পুরুষ ক'জন আর মেয়েছেলেবাও উদগ্রীব মুখে পিছু নিল তার। বাচ্চা ছেলেগুলোরও কেউ কেউ ওদিকে এগিয়েছে, কেউবা হাঁ করে ললিতাকে দেখছে।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। ত্রাসে সর্বাঙ্গ কাপছে ললিতাব। কিন্তু চোখের সামনে যেন নিজের মৃত্যু দেখছে সে। চোখের পলকে গাড়িতে উঠে বসল সে। তারপর চোখকান বুজে সবেগে গাড়ি চালিয়ে দিল আবাব।

ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা থেকে মাত্র মাইল বারো দূরে। বাড়ি পৌছুতে আধ ঘণ্টাও লাগল না ললিতার।

তার মুখের দিকে চেয়ে সুহাসিনী আঁতকে উঠল—তোমাব শরীর খারাপ হয়েছে নাকি বউদি, এ-রকম দেখাচ্ছে কেন?

—না, খানিকক্ষণের মধ্যেই তৈরী হয়ে নাও, আমি আসছি।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। নিস্পন্দের মত বস রইল খানিক,

কিন্তু ভিতরটা কাঁপছে থর-থর করে।

...এ-কি করল সে? আহত ছেলেটার সেই কচি কোমল মুখ, আর তার মুখের উপর সেই একটা চাউনি—যে চাউনি দিয়ে তার আঘাতকারিণীকে একবার মাত্র দেখে নিয়েছিল—সে-সব যেন বুকের মধ্যে কেটে কেটে বসছে এখন। সে পালিয়ে এলো, ছেলেটা যে রক্তপাত হয়েই মরে যাবে! কিন্তু পালাতে পারে নি, ভাবতেও কাঁপুনি। ওই নির্দয়—মূর্তি লোকটা কি করত, কি প্রতিশোধ নিত কে জানে। অমন ভয় না পাইয়ে দিলে ললিতা তো ছেলেটাকে হাসপাতালেই নিয়ে আসত।

সর্বাঙ্গ অবশ, মৃতের মত ঠাণ্ডা হাত পা। তবু বাথরুমে ঢুকে চান করল অনেকক্ষণ ধরে। বেরিয়ে এসে প্রসাধন করল, বিয়েবাড়ি যাবার মত সাজ-পোশাক করল—কিন্তু তার চোখের সামনে থেকে-থেকে তামাম দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে বুঝি।

বিয়েবাড়িতে সমরেন্দ্রও এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে কি-রকম যেন দেখাচ্ছে, শরীর ভালো তো?

ললিতা বলল, না, ভয়ানক ক্লান্ত।

একাই বাড়ি চলে এলো তাড়াতাড়ি। শরীর খারাপ হয়েছে ভেবে অনিমেষও আপত্তি না করে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিল তাকে।

সমরেন্দ্র ফিরল অনেক রাতে। ললিতা জেগে তখনো। কিন্তু মরার মত পড়ে রইল। ভয় ধরেছে তার। এ ভয় থেকে আর বুঝি মুক্তি নেই। সমরেন্দ্রকেও ভয় তার। জোরে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে কতবার নিষেধ করেছে, কতবার সতর্ক করেছে, ঠিক নেই। সেই সবও শুধু ভয়ের আকারে ছেঁকে ধরছে তাকে। ভোরের দিকে তন্দ্রা এসেছিল, ঘুম নয়।

...মাম...মাম...মাম...মাম...মাম...মাম...

...রক্তাক্ত কচিছেলের মুখ একটা—শেষ চাউনির মত চাউনি একটা...

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসেছে ললিতা বসু। ঘামছে দর-দর করে।

সমরেন্দ্রর বকাবকির চোটে কাছে না এসে পারল না ললিতা। বকুনি আর বিরক্তি সুহাসিনীর উদ্দেশে। জানে কি ঘটতে পারে, শুধু ললিতাই জানে। তবু জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

তিক্ত মুখ করে সমরেন্দ্র বলে উঠল, কি আব হবে, এই সব ঝি-চাকবগুলো যা হয়েছে আজকালকার! কাগজের মাঝের সিটটা নেই, খুঁজতে বললাম, তাও এসে বলছে পাওয়া যাচ্ছে না—আজকের কাগজ উড়ে গেল একেবারে!

ললিতা দ্বিগুণ বিরক্ত হঠাৎ।—তোমার একটুতেই এত রাগ কেন, এক সিট কাগজ পাচ্ছ না বলে বাড়ি একেবারে মাথায় করে তোলার কি আছে! এক ঘণ্টা ধরে খবরের কাগজ পড়ে রোজই তো উদ্ধার করছ সবকিছু!

কি ব্যাপারে কি কথা! সমরেন্দ্র অবাক। স্ত্রীর এ-রকম মেজাজ শিগগিরও দেখে নি। একটু লক্ষ্য করেই মনে হল, মুখখানা বিবর্ণ পাংশু। একদিনের মধ্যে যেন বিরাট কিছু একটা ধকল গেছে তার ওপর দিয়ে।

বার কয়েক জিজ্ঞাসা করেছে এর পর, কি হয়েছে, শরীর ভাল আছে কিনা, ললিতা তাতেও বিরক্ত।

আজ আর কলেজে যাবে না ভেবেছিল। কিন্তু সময় হতে আর বাড়িতেও ভাল লাগল না। খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেল।

দুপুরটা ছটফট করে কাটালো ললিতা। বার কয়েক টেলিফোনের সামনে গিয়েও ফিরে এলো। বিকেল চারটে না বাজতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সুহাসিনীকে বলে গেল, দাদাবাবু ফিরলে যেন বলা হয় একটা কাজে বেরিয়েছে।

একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা অনিমেষের নার্সিং হোমে চলে এলো। এসে দেখে সে-ও এক কেস নিয়ে ব্যস্ত। তবু দেখা হতে জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার?

ললিতা জানালো—খুব দরকারী কথা আছে, সময় লাগবে।

অনিমেষ অবাক। মুখ দেখেই মনে হয়েছে বিশেষ কিছু ঘটেছে। চটপটে জবাব দিল, আচ্ছা, আধঘণ্টাখানেক বোসো, হাতের কাজটা সেরে নিই।

ললিতা বসে আছে। আধঘণ্টা সময় ক্লান্তিকর রকমের দীর্ঘ মনে হচ্ছে তার। কিন্তু এ সময়টুকু নির্বিঘ্নে কাটল না। চমকেই উঠল ললিতা। ঘরে ঢুকেছে সমরেন্দ্র। তাকে দেখে অবাক।

—তুমি এ-সময়ে?

সামলে নিতে চেষ্টা করল ললিতা, হেসেই ফিবে জিজ্ঞাসা করল, তুমিই বা এ-সময়ে কেন?

সমরেন্দ্র বলল, কালকের কিছু হিসেব-পত্র ওকে বুঝিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু তোমার কি হয়েছে?

—কিছু হয়েছে বোধহয়, সেটা ডাক্তারের বিবেচনাসাপেক্ষ।

বলতে বলতে চোখ পড়ল টেবিলের ওপরের খবরের কাগজটার ওপর। সমরেন্দ্র কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে ললিতা সেটা টেনে নিল, ওটা দেখার ছলে মুখও আড়াল করা গেল খানিকটা। এ-সময়ে ঘরের লোককে দেখে তার মনে হয়েছে তার অপবাধের সব থেকে কঠিন দণ্ডদাতা তার সামনে উপস্থিত যেন।

সমরেন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠল, আমি কালই বুঝেছি কিছু হয়েছে, আমাকে বলছ না কেন?

—লাফালাফি আর চেঁচামিচি করবে বলে।

—আঃ, কি কষ্ট হচ্ছে তাই বলো না?

—জীবনটা আর বইতে ইচ্ছে করছে না। হল?

বলার ভঙ্গিটা কেমন যেন ধার-ধার। সমরেন্দ্র আর জিজ্ঞাসাবাদ করল না।

দুজনকে দেখে অনিমেষ কি একটা হাল্কা ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আড়াআড়ি ঘর থেকে বেরিয়েছে বলে খবরের কাগজের আড়ালে ললিতার মুখখানা শুধু সে-ই দেখতে পেল। পায়ের শব্দ শুনে সামনে কাগজটা ধরে রেখেই সে-ও তার দিকে ফিরে তাকিয়েছে। তার দুই চোখে কি-যেন করুণ মিনতি।

বুদ্ধিমান মানুষ, এক-মুহূর্তে গলার সুর পাল্টে ফেলল। চিকিৎসক-সুলভ হাল্কা

ব্যস্ততায় বলল, আচ্ছা এসো ম্যাডাম, দেখি, কি গণ্ডগোল বাধালে আবার! সমরেন্দ্রর দিকে ফিরে তাকাল, কি হে, এক-ঘন্টাও সবুর সইল না, ওমনি পিছনে পিছনে এসে হাজির!

সমরেন্দ্র জবাব দিল, না, আমি কলেজ-ফেরত এসেছিলাম কালকের হিসেবগুলো বুঝিয়ে দিতে, এসে দেখি এখানে বসে আছে। কি হয়েছে বলো তো?

এই সামান্য প্রশ্নেও ললিতার বিরক্তি, খবরের কাগজটা হাতে করে উঠে দাঁড়াল, সবেতে এত ব্যস্ত হও কেন তুমি, এই জন্যেই তো কিছু বলি না—না দেখে বলবে কি করে কি হয়েছে? হিসেব পরে দাখিল কোরো, এখন বাড়ি যাও, আমি তোমার বন্ধুর বাড়ি হয়ে তবে ফিরব, কাল তাড়াহুড়ো করে চলে এলাম, আজ একবার যাবার জন্য সুমিতা বার বার করে বলে দিয়েছিল।

আর না দাঁড়িয়ে কাগজ হাতে ললিতা ভিতরের চেম্বারে ঢুকে গেল। এবারে সমরেন্দ্র প্রায় অস্ফুট ইশারার মত করে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

ভিতরে ভিতরে চিন্তিত অনিমেষও কম নয়। সুমিতা তার স্ত্রী—তার বাড়িতে যাবার কথাটা যে-ভাবে বলল, তাতে সে বরং বেশি অবাক হয়েছে। গোপন করার মত কি এমন থাকতে পারে ললিতার, ভেবে পেল না। জবাব দিল, অস্বস্তি কিছু একটা হচ্ছে, আবার মেন্টাল রিঅ্যাকশনও কিছু হতে পারে—দেখি পরীক্ষা করে। ও-সব হিসেব-নিকেশ পরে হবে, তোমাকে যা বলল তাই করো এখন, বাড়ি পালাও —আমার ওখান থেকে সুমিতা ওকে না খাইয়ে দাইয়ে ছাড়বে না, আমি পৌঁছে দেব'খন।

চিন্তাচ্ছন্ন মুখেই সমরেন্দ্র বিদায় নিল।

ঘরে ঢুকেই অনিমেষের মনে হল সামনে মৃত মুখ দেখছে একটা। টেবিলে দুই কনুইয়ের ওপর ভর রেখে ললিতা কোনো রকমে বসে আছে। তাকে দেখে অস্ফুট ত্রাসে জিজ্ঞাসা করল, চলে গেছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ হল কি?

ললিতা চুপচাপ খানিক চেয়ে রইল তার দিকে। চোখের জল সামলাতে পারল না। কেঁদেই ফেলল। শেষে টেবিলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অনিমেষ হতভম্ব। সে ডাক্তার। গণ্ডগোল মানসিক মনে হতে কান্নায় বাধা দিল না কিছুক্ষণ পর্যন্ত। শেষে ব্যস্ত মুখেই বলে উঠল, কি কাণ্ড, কি হয়েছে বলবে তো আমাকে!

কেঁদে একটু যেন হালকা হতে পেরেছে ললিতা। শাড়ির আঁচলেই চোখমুখ মুছে নিল। তারপর হাত-ব্যাগ খুলে তার ভেতর থেকে ভাঁজ-করা খবরের কাগজের সিট বার করল একটা। ভাঁজ খুলে নিঃশব্দে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল অনিমেষকে।

খবরটা পড়ে দু'চোখ বিস্ফারিত অনিমেষের। কাগজে লিখেছে, গতকাল বিকেলে ওমুক পথে এক মহিলা সবেগে গাড়ি চালিয়ে দরিদ্র ঘরের একটি সাত-আট বছরের ছেলেকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। স্থানীয় অশিক্ষিত লোকেরা যখন গুরুতর আহত ছেলেটিকে নিয়ে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে মহিলাটি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে পালিয়ে গেছে। কাগজের টিপ্পনী, চাপা দেবার পর মুমূর্ষ ছেলেটাকে হাসপাতালে পৌঁছে

দেবার দায়িত্ব-বোধটুকু পর্যন্ত ওই মহিলা এড়াতে চেয়েছে।

অনিমেষ গাঙ্গুলি স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুমি সত্যি ওভাবে পালিয়ে এসেছ?

ললিতা সবই বলল আস্তে আস্তে। কিছুই গোপন করল না। গোপন না করার মত হৃদ্যতা এই একজনের সঙ্গে বরাবরই ছিল—এখন তো সে-ই যেন একমাত্র আশ্রয় তার। মনের কোন অবস্থা নিয়ে সে মাসি-শাশুড়ীর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, নিজের অজ্ঞাতে গাড়ি কেন জোরে চালাচ্ছিল, ছেলেটা হঠাৎ কি-ভাবে গাড়ির মুখে এসে পড়েছিল, আর সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে কি ভাবে সে তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল—একে একে সবই বলল। আর শেষ পর্যন্ত পালিযে কেন এলো, তাও।

সব শোনার পরেও অনিমেষ গাঙ্গুলি নির্বাক অনেকক্ষণ। তারপব সান্ত্বনাব সুবে বলল, এ অবস্থায় সবাই এই করত। কিন্তু কালই তুমি ব্যাপারটা জানালে না কেন, তাছাড়া সকলের আগে সমরকেই তো বলা উচিত, তাকে লুকোচ্ছ কেন?

সঙ্গে সঙ্গে বিকারগ্রস্তের মত আঁতকে উঠল ললিতা।—না না না। এখন না, এরপব সে আমাকে কক্ষনো ক্ষমা করবে না। আমার সব সুখ শান্তি গেছে, সে আমি খুব ভাল করে জানি। বলতে তো হবেই, কিন্তু এখন না। তাব আগে তুমি শুধু আমাকে খবর এনে দাও—ওই ছেলেটার কি হল, যাই হয়ে থাক, আমাকে খববটা এনে দাও, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

তার মানসিক অবস্থা অনিমেষ ভালই অনুভব কবতে পারে। গোপনতাব ফলেই যে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে সেটা এখন বোঝাতে চেষ্টা করে লাভ নেই। কাল জানলে নিজেরাই থানায় গিয়ে স্টেটমেন্ট দিয়ে আসতে পারত, গাড়ি আর লোকজন নিয়ে যেতেও পারত। ভেবে দেখল, সমরেন্দ্রকে এখন বললে তার মেজাজ উগ্র হয়ে উঠবেই, এমনিতেই যে রগ-চটা মানুষ। এ অবস্থায় সামান্য আঘাতে ললিতাব যে ক্ষতি হতে পারে তার জের সামলানো হয়ত সব থেকে কঠিন হযে পড়বে।

আশ্বাসের সুরে জবাব দিল, সে খবর তুমি কালকেব মধ্যেই পেয়ে যাবে, কিন্তু মাথা ঠা না রাখলে কিছুই পাবে না। মোট কথা, এ-রকম উতলা হবার মত সাঙ্ঘাতিক অন্যায তুমি কিছু করো নি।

ব্যথা-ভরা কৃতজ্ঞ চোখে ললিতা চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর হঠাৎ ব্যগ্র মুখে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ছেলেটা বেঁচে না থাকলে তো কাগজে বেরুতো?

—এই তো, বেশ বুঝতে পারছ—নিশ্চয় বেঁচে আছে।

—কিন্তু যে-রক্ত পড়েছে, মা-গো! দৃশ্যটা চোখে পডতে শিউরে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ললিতা।

সমরেন্দ্র তখন কলেজে, পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ অনিমেষ খবর নিয়ে এলো, ছেলেটা বেঁচে আছে এবং ভাল আছে, আঘাত একটু বেশিই লেগেছে বটে কিন্তু প্রাণের কোনো আশঙ্কা নেই।

ললিতার বুকের তলা থেকে ত্রাসের একটা জমাট পাহাড় হালকা হতে লাগল

যেন।—সত্যি বলছ?

—সত্যি। ইচ্ছে হলে ওমুক হাসপাতালে গিয়ে দেখে আসতে পারো, কিন্তু দেখতে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা হাসপাতাল থেকে পুলিসের কাছে গেছে, পুলিসের কাছ থেকে খবরের কাগজের অফিসে।

ললিতা সভয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। অনিমেষ জানালো, ওই ছেলেটার সম্বন্ধে অনেক খববও সংগ্রহ কবেছে সে। যেখানে থাকে সেই বস্তি এলাকায়ও ঘুরে এসেছে সে। বলাই মিস্তিব, অর্থাৎ ছেলেটার গার্জেন তখন সেখানে ছিল না, আশ-পাশের সকলে অনিমেষকে বড়-সড় একজন পুলিস অফিসার ভেবে নিয়েছে।

ললিতা শোনাব আশায় উদগ্রীব। আব যে খবব সংগ্রহ করেছে অনিমেষ তার সারমর্ম, যতদূব বোঝা গেছে, বলাই মিস্তির ঝানু পাজী লোক একটা। চৌদ্দ-পনেরটা বাপ-মা-হাবা অনাথ ছেলেমেয়ের গার্জেন সে। কোথা থেকে এই সব ছেলেমেয়েগুলোকে সংগ্রহ করেছে সে-ই জানে। বস্তির আশ-পাশেব লোকেরা রীতিমত ভয় কবে তাকে। তাদেব ধারণা, খেতে পায় না এমন যে ছেলেমেয়েগুলোর মা নেই, আর বাপও নেই বা থেকেও নেই—এই-বকম একটু সুশ্রী গোছেব ছেলেমেযেদের প্রতিপালনের ভার নেয বলাই মিস্তিব। পরোপকাব কবে। কিন্তু সেটা কেমন পবোপকার সকলেই জানে। ছেলেমেয়েগুলো যমেব মত ডরায তাদেব প্রতিপালককে। মার খেয়ে ছেলেমেয়েগুলো যখন আর্তনাদ কবতে থাকে, কানে আঙুল দিতে হয।

ওই সব কচি শিশুগুলোকে উদযাস্ত খাটায সে। ক্ষেতেব কাজ করায়, মেয়েগুলোকে ঝুপড়ি-টুপড়ি বানিয়ে দূরের হাটে-বাজাবে পাঠায়। ভদ্রলোকদের বাড়িতেও পাঠায়। খেতে পাচ্ছে না বলে কান্নাকাটি করে যারা তারাই বেশি দামে বিক্রী কবে সেগুলো। আর ছেলেগুলোকে দিযে চোবাই চালান ফেঁদে বসেছে। কোঁচড় ভরতি চাল নিযে বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে তাবা শহবে আসে। বেশি দামে বিক্রী করে আবাব তারা বিনা টিকিটে ফেরে। এর মধ্যে ধবা পডে চাল খোয়া গেলে বলাই মিস্তির তাদের আধমবা করে ছাড়ে—খেতেও দেয না। এ-সব কথা সেখানকাব লোকগুলো সহজে বলতে চায় নি, বা এতটা স্পষ্ট কবেও বলে নি। পুলিসেব ভয়ে, আর সম্পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে যেটুকু বলেছে তার থেকে মোটামুটি এই রকমই বোঝা গেছে।

...মিঠু হল বলাই মিস্তিবের সব থেকে পছন্দের ছেলে। বয়েস মাত্র আট হলেও, ছেলেটা যেমন চালাকচতুর তেমনি মিষ্টি মুখ। পছন্দমত কাজ না হলে সেও প্রচণ্ড মার-ধর খায় বটে, কিন্তু তার চাল বা পয়সা কমই খোয়া যায়। ধরা পড়লেও মিষ্টি মুখ দেখে লোকের মায়া হয় বোধহয়।

ওই ছেলে গাড়িচাপা পড়তে বলাই মিস্তির নাকি ক্ষেপে আছে। ছেলেটাকে সেই রাতে পাঁচ মাইল দূরের হাসপাতালে দিয়ে এসে হন্যে হয়ে এখন সেই গাড়ি হাঁকানো মেয়েকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় আছে। কয়েকজন পুলিস কনস্টেবল-এর সঙ্গে যোগসাজস আছে তার, তাদের কাছেই ঘোরাঘুরি করছে। অনিমেষ গাঙ্গুলির ছেলেটার সন্ধান পেতে মোটেই বেগ পেতে হয় নি। ঘটনাস্থলের নিকটতম হাসপাতালে খোঁজ

করতেই তার সন্ধান মিলেছে। তাকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে সে।

সব শোনার পর ললিতা দ্বিগুণ ব্যাকুল।—কেমন হাসপাতাল? কেমন চিকিৎসা হচ্ছে?

কেমন হাসপাতাল বা এ-সব অনাথ লোকের কি রকম চিকিৎসা হয়, অনিমেষ ভালই জানে। বলল, চিকিৎসা যাতে ভাল হয় সে-ব্যবস্থা করা যাবে'খন, ভেবো না।

কিন্তু ললিতা এ-কথায় নিশ্চিন্ত হতে রাজী নয়।—ব্যবস্থা করে এলে না কেন, যত টাকা লাগে আমি দেব, আমার নিজের যত গয়না আছে সব দেব, তার বেশি লাগলেও দিতে পারব—তুমি আজই গিয়ে ব্যবস্থা করো—ছেলেটা ভাল না হলে আমি বাঁচবই না।

অতএব তাকে বাঁচানোর তাগিদেই ছোটাছুটি করতে হল অনিমেষকে। ওদিকে সমরেন্দ্রকেও সে-ই সামলাচ্ছে। সাবধান করে রেখেছে—আগেব সব বিভ্রাট আর অপারেশন-টপারেশনের রি-অ্যাকশন দেখা যাচ্ছে ললিতার, এ-সময়ে যেন কোনো ব্যাপারে তাকে জেরা না করা হয়, যতটা সম্ভব তোয়াজে রাখা উচিত, একটা উগ্র বা কটু আচরণে বিশেষ ক্ষতি হতে পারে।

বেচারা তাই বিলক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছে এখন। বিরক্ত হবে মনে হলে ললিতার কাছেও আসে না।

দু'দিন বাদে ললিতা খবর পেল, ছেলেটার প্রাণের সঙ্কট কেটেছে বটে, কিন্তু মাথায় চোট পেয়ে আর বহু রক্তপাতের ফলে স্বাভাবিক বুদ্ধি-সুদ্ধি আর ফিরে পাবে বলে মনে হয় না। ভাল করে কথাও বলতে পারে না।

যাতনায় ললিতার ভিতরটা কুঁকড়ে উঠতে লাগল। রক্তাক্ত ছোট দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল যখন, তার সেই বিস্ফারিত বোবা চাউনি ও ভুলতে পারে না।

অনিমেষকে বার বার অনুরোধ করে শেষে কলকাতার বড় হাসপাতালে সরিয়ে আনা হল তাকে। যে হাসপাতালের সঙ্গে শিক্ষকতার ব্যাপারে অনিমেষ গাঙ্গুলি যুক্ত, সেই হাসপাতালে। যেখানে ছিল, সেখান থেকেও তারা ছাড়তে আপত্তি করে নি। অনাথ রোগীকে কেউ যদি টেস্ট-কেস-এর জন্য বড় হাসপাতালে নিয়ে যায় তো রোগীর ভাগ্য।

বড় হাসপাতালের একটা ভাল ক্যাবিনে রাখা হয়েছে ছেলেটাকে। অনিমেষের চেষ্টায় বিশেষজ্ঞ বড় বড় ডাক্তারও দেখছে তাকে। কথা যদিও বা বলতে পারছে —মানুষ চিনতে পারে না।

সমরেন্দ্র কলেজে বেরুলেই ললিতা তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ে। দু'তিন ঘণ্টা ছেলেটার শয্যায় বসে কাটায়। মিঠু হাসে তাকে দেখলেই। ভারী ভাব হয়ে গেছে ললিতার সঙ্গে তার। ললিতার চেষ্টায় আধো আধো কথা বলতে চেষ্টা করে বেশি করে। কিন্তু তাকে একদিনের জন্যেও চিনতে পারে নি। যে-চেনাটা হয়েছে সেটা নতুন চেনা—তারই গাড়ির ধাক্কায় যে এত কাণ্ড সেটা তার স্মৃতির মধ্যে নেই।

বিকেলের আগেই ললিতা বাড়ি চলে আসে আবার।

সে-দিনটা আবার এক দুর্যোগেরই দিন বুঝি।

মিঠুর ক্যাবিনে ললিতা ছিল আর অনিমেষ ছিল। হঠাৎ দরজার দিকে ফিরে তাকিয়েই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ললিতা। সবিস্ময়ে অনিমেষও ফিরে তাকালো।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলাই মিত্তির। নির্মম ভাবলেশশূন্য কঠিন একখানা মুখ।

অনিমেষ তক্ষুনি বুঝল, লোকটা কে হতে পারে। তবু এগিয়ে এসে রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? এখানে কি চাই?

লোকটা গম্ভীর বিনয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে আমার নাম বলাই মিত্তির।...আমাকে না জানিয়ে হাতপাতাল থেকে আমার ছেলে সরিয়ে এনেছেন, তাই দেখতে এলাম এত দরদ কার!

বলে ঠাণ্ডা দুটো চোখ সে রাখল ললিতার মুখের ওপর।

ললিতা কাঠ।

অনিমেষ গাঙ্গুলিব তিবিক্ষি মেজাজ।—তোমাব ছেলে কি-বকম! ওই হাসপাতালে লেখা আছে বাপ-মা নেই; অনাথ ছেলে!

—আমার নামও লেখা আছে। আমার কাছে থাকে, আমি ওর গার্জেন, তাও লেখা আছে।

মুহূর্তে কি ভেবে নিল অনিমেষ গাঙ্গুলি। বলল, আচ্ছা, ভেতরে এসো।

বলাই মিত্তির ভেতবে এসে দাঁড়াল। মিঠুকে দেখিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, দেখো তো, চিনতে পাবো?

—পারি বই কি।

—আর তোমাকে চিনতে পারে কিনা দেখো!

বলাই মিত্তির মিঠুর কাছে এগিয়ে গেল। যতটা সম্ভব কোমল গলাতেই জিজ্ঞাসা করল, কিরে মিঠু, কেমন আছিস?

ছেলেটা নির্বাক। বোবা চাউনি। এবকম একটা লোককে পছন্দ করছে না, তাও বোঝা যাচ্ছে।

বলাই মিত্তির তাদের দিকে ফিরল, বলল, চিনতে পারছে না, তাতে কি হল?

অনিমেষ বলল, আমরা একে ভাল করে তুলতে চেষ্টা করছি—ইনি ওকে ভাল করে তোলার জন্য কত কি করছেন—এ সময় তুমি বিরক্ত করতে এসেছ কেন?

—আমার অনেক ক্ষতি হয়েছে, তাই।

রাগে জ্বলে উঠল অনিমেষ গাঙ্গুলি।

—তোমার ক্ষতি হয়েছে, কেমন? তুমি কেমন লোক আমি জানি না? তোমাকে পুলিসে দিতে পারি, জানো?

বলাই মিত্তিরের পুরু ঠোঁটে ঠাণ্ডা হাসির আভাস চিকিয়ে গেল। জবাব দিল, ভয়-ডর আমার একটু কম বাবু, পুলিসে ধরে নিয়ে গেলেও তো নিশ্চিন্তে খেতে পরতে পাব—আমার ওখানকার বাকি ছেলেমেয়েগুলো অবশ্য উপোস করে মরবে। তা যাক, ওদের জন্য ভদ্রলোকদের দরদ কত আমার জানা আছে—আমাকে পুলিসে দিয়ে আপনারা নিষ্কৃতি পান যদি, তাই দিয়ে দ্যান।...কিন্তু পুলিস তো হুজুর এই দিদি ঠাকরুনকেও খুঁজছে!

—শাট আপ! রাগের চোটে অনিমেষ প্রায় মারতেই এলো তাকে। ললিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাধা দিল। তাকে হতভম্ব শিশুটার দিকে ঠেলে দিয়ে বলাই মিত্তিরকে বাইরে ডেকে নিয়ে এলো। আকুল উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, তুমি এ-রকম ছেলেকে নিয়ে কি করবে, আমরা ওকে ভাল করে তুলব, আমার কাছে রাখব, মানুষ করে তুলব!

বলাই মিত্তির জবাব দিল, আপনার অসীম দয়া, কিন্তু তাতে আমার ক্ষতিপূরণ হবে না।

—কি, কি চাও তুমি? টাকা?

—তাই দিয়ে দ্যান কিছু।

বরাতক্রমে হাত-ব্যাগটা হাতেই ছিল ললিতাব। সেটা খুলে গুটি তিরিশেক টাকা পেল। সবটাই বার করে তার হাতে দিয়ে দিল।

নোট কটা নিয়ে বলাই মিত্তিব নির্লিপ্ত মুখে তাকালো তার দিকে।—এতে কি হবে?

ললিতা থতমত খেল।—আর তো নেই।

—তাহলে কাল আবার আমি আসব, কাল নিয়ে আসবেন।

ধীরেসুস্থে প্রস্থান করল বলাই মিত্তির। ললিতা ফিবে আসতেই উত্তেজিত অনিমেষ বলে উঠল, টাকা দিলে বুঝি? কত টাকা?

—বেশি না। ললিতার বুকের ভিতব কাঁপছে তখনো।

অনিমেষ বলল, এই কবে শয়তানটার কাছ থেকে পার পাবে না দেখো, ও আবাব ঠিক আসবে দেখো।

পরদিন চুপি চুপি একশটা টাকা নিয়ে এলো ললিতা। বলাই মিত্তির আসামাত্র সেই টাকা তার হাতে দিয়ে বলল এই নাও, আর এসো না, শিগগির যাও—ওই ডাক্তারবাবু এসে গেলে মুশকিল হবে।

দাঁত বার করে একটু হাসল বলাই মিত্তির। বলল, আপনি নিজেব মুশকিলের কথা ভাবুন দিদি, এই সামান্য টাকায় তো আমার হবে না, আবার তো আমাকে আসতেই হবে।

দু'তিন দিন পরে পরে এসে অন্তত পাঁচ সাত দফা টাকা নিয়ে গেল বলাই মিত্তির। ললিতার আবাব নতুন ত্রাস। তার নিজেব পাসবইয়ের টাকার অঙ্ক কমছে, কিন্তু একেবারে শূন্য হয়ে গেলেও যে বেহাই পাবে না সেটা বেশ ভাল করেই বুঝেছে।

সঙ্কটের ব্যাপারটা অনিমেষকেই জানালো আবার। সে-ও প্রথমে ক্ষিপ্ত, পরে চিন্তিত।

সমরেন্দ্রকে জানানোর ব্যাপারে ললিতাকে বাজী করানো গেল। ললিতার রাজী হবার আরো কারণ, মিঠু এ-দিক থেকে ভাল আছে এখন তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। পরে সবল সুস্থ হয়ে উঠলে মাথায় অস্ত্রোপচার প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যাবে।

সব শোনার পর সমরেন্দ্র রাগ করার ফুরসত পেল না। যে আবহাওয়া রচনা করে অনিমেষ আদ্যোপান্ত জানালো তাকে, তাতে সে ঘাবড়েই গেল। ললিতার মানসিক অবস্থা চিন্তা করে উতলা হয়ে পড়ল সে।

কিন্তু ছেলেটাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবার ব্যাপারে তার আপত্তি। শেষ পর্যন্ত

সে আপত্তিও টিকল না।

মিঠুকে বাড়ি আনার পরে ভারী একটা পরিবর্তন দেখা গেল ললিতার। সত্যিই যেন ছেলেটার মা হয়ে বসেছে সে। ওই এক ছেলের কারণে সর্বদা ব্যস্ত, সর্বদা চঞ্চল। এই ব্যস্ততা আর চাঞ্চল্যের মধ্যে সর্বদা একটা খুশীর ছোঁয়া লেগে আছে। লাজলজ্জা ছেড়ে ছেলেটাকে মা ডাকতে শিখিয়েছে সে। এখন ও খুব ভাল করেই মা চিনেছে। কিন্তু সমরেন্দ্রর বাবা হতে আপত্তি। তাই নিয়ে হাসাহাসি।

কিন্তু এ আনন্দের ওপর কালো ছায়া নেমে এলো দু'দিন না যেতে। দুপুরে সেদিন কে একজন দেখা করতে চায় শুনে ওপরে ডেকে পাঠালো।

তারপরেই ত্রাস। বলাই মিত্তির। নিজেই বলল, অনেক চেষ্টা করে বাড়ির সন্ধান পেয়েছে।

সেই থেকে দু'সপ্তাহের মধ্যে চারবার টাকা দিয়ে বিদায় করেছে তাকে। আবার মাথাখারাপ হবার উপক্রম ললিতার। লোকটা তাকে অব্যাহতি দেবেই না। অগত্যা ব্যাপারটা সে সমরেন্দ্র আর অনিমেষকে জানালো। তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল প্রথম, কিন্তু ঠাণ্ডামাথায় ভেবে দেখল পরিস্থিতি জটিলই বটে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আবার এক অতর্কিত বিভ্রাট। মিঠুর জ্বর হয়েছে। একশ দুই-আড়াই জ্বর—তাগিদ দিয়ে ইতিমধ্যে আরো একজন ডাক্তার আনিয়েছে ললিতা। সেও অভয় দিয়েছে, কিন্তু ললিতা নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

দুপুরের দিকে ঘুমন্ত ছেলে হঠাৎ একবার কাতরে উঠতে ললিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে এক বিচিত্র কাণ্ড। কি দেখে ছেলেটা আঁতকে উঠল হঠাৎ, তারপরেই কাঁপুনি আর গোঁ-গোঁ শব্দ। নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই সে যেন দু'হাতে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করল ললিতাকে।

ললিতা হতভম্ব একেবারে। সভয়ে তিন হাত পিছিয়েই এলো সে। নিজের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, কি দেখে ছেলে এমন আঁতকে উঠল। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। ঝুঁকে ছিল যখন, ওর মুখের সামনে গলার নেকলেসটা শুধু দুলছিল তখন।

পরক্ষণে চেয়ে দেখে, ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ব্যস্ত হয়ে জলের জন্য বেরুতে গিয়েই পা-দুটো যেন স্থাণুর মত মাটির সঙ্গে আটকে গেল। বারান্দায় বলাই মিত্তির দাঁড়িয়ে। ললিতা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বলে উঠল, আর এক পয়সাও হবে না, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ছেলেটা মরবে কি বাঁচবে ঠিক নেই—তুমি মানুষ না পশু?

বলাই মিত্তির জবাব দিল, মানুষ ছিলাম দিদিমণি, এখন পশু হয়ে গেছি। কিছু হবে না তাহলে?

—না, এক পয়সাও হবে না, তুমি বেরোও এখান থেকে।

বলাই মিত্তির চলে গেল।

জল-বাতাস করে ললিতা ছেলেটাকে সুস্থ করল। চোখ মেলে ছেলে এবারে আর আঁতকে উঠল না। কিন্তু ললিতার বুকের কাঁপুনি থামে না।

সব শুনে অনিমেষ চট কবে ভেবে পেল না, কি দেখে ছেলেটা অমন কাণ্ড কবতে পাবে। শুধু মনে হল, একটা কিছু দেখে তাব পুবনো স্মৃতিতে ধাক্কা লেগেছে।

ওদিকে বলাই মিত্তিবেব ব্যাপাবেও আব চুপ কবে বসে থাকা চলে না। দুই বন্ধুতে মিলে ছুটল এক পবিচিত অ্যাডভোকেটেব কাছে। তাঁব পবামর্শ, সমস্ত ঘটনা এই মুহূর্তে পুলিসকে জানানো উচিত। তাবা যা কবছে ছেলেটাব জন্য, শাস্তি এমন আব কি হবে। কিছুই হবে না, বড জোব আবো সামান্য কিছু খেসাবত দিতে হতে পাবে।

অ্যাডভোকেটেব পবামর্শটা বড সমযে শুনেছিল তাবা। কাবণ তাদেব স্বীকৃতিব পবেব দিনই বলাই মিত্তিব নালিশ রুজু কবেছে।

অ্যাডভোকেটেব তৎপবতায কোর্টে কেস উঠতে সময লাগে নি।

ইতিমধ্যে সেই এক ব্যাপাব আবাব। দেওযালে ঘডিব পেণ্ডুলামটাব দিকে চেযে থাকতে থাকতে ছেলেটা আবাব একদিন গো গো শব্দে আর্তনাদ কবে উঠল। ললিতা ছুটে এলো। ভযে সিটিযে ছেলেটা আঙুল তুলে ঘডিটা দেখালো একবাব—কিন্তু কি দেখাচ্ছে ললিতা কিছুই বুঝল না। তেমনি গোঁ-গো কবতে কবতে ছেলে আবাব অজ্ঞান।

সমবেন্দ্র বাডি ছিল। টেলিফোনে অনিমেষকে খবব দিতে সে ছুটে এলো। মিঠুব সবে জ্ঞান হযেছে তখন, ললিতা তাব মুখেব ওপব ঝুকে পডতেই, আচমকা সেই এক ব্যাপাব আবাব। চোখেব সামনে নেকলেসটা দুলতে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা প্রাণভযে ঠেলে সবাতে চেষ্টা কবল তাকে। এবাবে আব অজ্ঞান হল না বটে, কিন্তু হলেই বোধহয ভাল ছিল। ললিতাকে দেখেও চিৎকাব।

এ-ধাবে সবে এসে কিছু না ভেবেই প্রায দিশেহাবাব মতই নিজেব গলাব নেকলেসটা খুলে আনল। একটু বাদে অনিমেষ তাকে জিজ্ঞাসা কবল, অ্যাক্সিডেন্টেব দিন তোমাব গলায ওই নেকলেসটা ছিল?

—ছিল।

—অ্যাক্সিডেন্টেব পব তুমি ওব ওপব ঝুকে পডেছিলে?

—হ্যাঁ।

অনিমেষ আব কিছু বলল না। পবদিন দেযালঘডিটাও সবানো হল। কিন্তু মিঠু এবপব বেশিবকম অসুস্থ হযে পডল। আবাব তাকে হাসপাতালে সবানো হল। বিশেষজ্ঞেব মত, আব দেবি না কবে অপাবেশন কবা দবকাব।

অপাবেশন হযে গেল। ললিতা দিবাবাত্র অদৃশ্য দেবতাব পাযে মাথা খোঁডে, আব হাসপাতালে পডে থাকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক আবাব তাকে সেই নেকলেস পবেই কাছে আসতে বলেছিলেন, সেই ভাবেই মুখেব ওপব ঝুকে দাডাতে নির্দেশ দিযেছেন।

মিঠু চিনেছে তাকে, ভয পেযেছে, কিন্তু আব অত আতঙ্কে ওঠে নি। বা অজ্ঞান হয নি। যত সুস্থ হযে উঠছে, তত যেন আডষ্ট।

কিন্তু বিষাদেব একটা দুঃসহ বোঝা চেপে আছে ললিতাব বুকে। কোর্টেব সদয নির্দেশ, মিঠুকে নিজ খবচায আবোগ্য কবে তোলাব দাযিত্ব ললিতা বসুব। সে সেবে উঠলে বলাই মিত্তিব তাকে নিযে যাবে।

ললিতা বসু বজ্রাহত যেন। তাব মনেব অবস্থা অনুমান কবতে পাবে সমবেন্দ্র

আর অনিমেষ। বলাই মিস্ত্রিরকে তারা টাকা দিয়ে বশ করতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি। কারণ ললিতা বসুর মানসিক অবস্থাটা সেও অনুমান করতে পারে। দিনের পর দিন সে হাসপাতালে এসে দূরে দাড়িয়ে সবই লক্ষ্য করেছে। ছেলে তার, তাকে আটকাবে কে? যত দেখেছে, ওত যেন ক্রুর আনন্দ তার। মিঠুর ঘরে যখন ওই পুরুষ দুটো থাকে না, বাইরে থেকে গলা বাড়িয়ে অনেক দিন ভিতরের দৃশ্যও দেখেছে। সত্যিকারের মা-ছেলের জড়াজড়ি যেন। তাই অনেক—অনেক বেশি প্রাপ্তির আশা বলাই মিস্ত্রিরের। সে সবুর করতে জানে।

শেষে সেই দিন এলো, হাসপাতাল থেকে যেদিন মিঠুকে ছেড়ে দেবে। বিবর্ণ মৃত মুখ যেন ললিতার। মিঠু খুশী, সে জানে মায়ের সঙ্গে বাড়ি যাবে। ঘরে অনিমেষ আর সমরেন্দ্রও আছে। তারা গম্ভীর। শেষ চেষ্টা করেও বলাই মিস্ত্রিরকে রাজী করাতে পারে নি। সে বলেছে, ভদ্র সমাজের রীতি জানিনে বাবু, দু'চার হাজারে তারা ছেলে ছেড়ে দেয়?

আসার আগে তারা নীচে বলাই মিস্ত্রিরকে দেখে এসেছে।

এই প্রথম ঘরের মধ্যে এসে দাড়াল বলাই মিস্ত্রির। ললিতা বসু তাড়াতাড়ি ওদিক ফিরে দাড়ালো। তাকে দেখে ছেলেটা নির্বাক, স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত, ওর চোখে-মুখে বোবা ত্রাস, বোবা আতঙ্ক।

বলাই মিস্ত্রির হাত বাড়ালো, চল বাড়ি চল—

হঠাৎ সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল ছেলেটা। দৌড়ে গিয়ে দু'হাতে ললিতাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, মা আমি যাব না, আমি যাব না, আমাকে ছেড়ে দিও না মা।

দু'হাতে কান চেপে ললিতা ঘর ছেড়ে সোজা বারান্দায় এসে দাড়ালো। পাগলের মত সকলের দিকে চেয়ে যেন আশ্রয় খুজল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই বলাই মিস্ত্রিরের চোখে চোখ পড়ল।

বিবর্ণ মুখ নির্বাক, শান্ত পরমুহূর্তে।

আর অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছে বলাই মিস্ত্রির। নতুন করে কিছু দেখছে যেন।

এগিয়ে এসে মিঠুর হাত ধরলে। তারপরেও দেখল খানিক। বলির পশুর মতই নির্বাক শিশুটা যেন নিজেকে সপে দিয়েছে তার হাতে, আর এতটুকু আপত্তি করার শক্তি নেই।

হাত ধরে থেকে ওর মুখের দিকে তেমনি চেয়ে থেকে কি যেন একটা ভাবল বলাই মিস্ত্রির। তারপরে হাত ধরেই বাইরে নিয়ে এলো ওকে। কলের পুতুলের মতই ছেলেটা এলো তার সঙ্গে।

নিজেদের অগোচরে সমরেন্দ্র আর অনিমেষও বেরিয়ে এসেছে।

বারান্দায় এসে বলাই মিস্ত্রির থামল। তারপর ঘুরে তাকালো। লম্বা বারান্দার গজ দশেক দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঠের মূর্তির মত দাড়িয়ে আছে ললিতা বসু।

কয়েক নিমেষ থমকে মিঠুর হাত ধরে সেদিকে এগিয়ে গেল বলাই মিস্ত্রির। কাছাকাছি এসে দাড়ালো আবার। স্তব্ধ, নির্বাক মুহূর্ত কয়েকটা।

মিঠুর হাত ছেড়ে দিয়ে বলাই মিস্ত্রির বলল, যা, মায়ের কাছে যা।

ফিবল। সমবেন্দ্রব পাশ কাটিযে অনিমেষেব পাশ কাটিযে শিথিল চবণে বলাই মিত্তিব লম্বা বারান্দাটা পেবিযে যেতে লাগল।

মিঠুকে দু'হাতে জডিযে ধবে ললিতা বসু অবাক বিস্মযে বলাই মিত্তিবেব প্রস্থানবত মূর্তিটা দেখছে।

দেখছে সমবেন্দ্র বসু আব অনিমেষ গাঙ্গুলিও।

রোশনাই

দোতলাব বাবান্দাব কোণে মিটসেফেব সামনে দাডিযে ভিজে কাপগুলো মুছে বাখছিল বাসন্তী। এক নজব তাকিযেই সুধীব দেখল, জামা-কাপড বদলে তৈবি হওযা দবে থাক, এখনো বৈকালিক পা-হাতই ধোযা হযনি তাব। তক্ষুনি বুঝে নিল সমাচাব কুশল নয। ইশাবায জিজ্ঞাসা কবল, কি হল।

ইশাবায কাবণ, আধা-আধি দবজা ভেজানো সামনেব ঘবে কর্তাব অবস্থান সম্বন্ধে নিঃসংশয সে।

হাসি চেপে বাসন্তী গম্ভীব মুখে মাথা নাডল। তাবপব তেমনি ইশাবায বাবাব ঘবটা দেখিযে কল্পিত কলম দিযে শন্য বাতাসে লিখল কিছু। অর্থাৎ হবে না। ওঘবে হিসেব কষা চলছে—

সুধীব বুঝল। বুঝে বিবস বদনে পা টিপে শেষেব ঘবে ঢুকে হাত পা ছডিযে চৌকিব ওপব বসে পডল। ছুটিব দিন। দুজনে সিনেমায যাওযাব কথা ছিল। হযে গেল। না, টিকিট কিনে আনেনি। টিকিট আব আগে থেকে কেনে না। কর্তাব ওই হিসেবেব ধাক্কায অনেকবাব অনেক টিকিট নষ্ট হযেছে। আজকাল আব সুধীব এ সব নিযে বাগ কবে না। বাসু, অর্থাৎ বাসন্তীকে ববং একসময জিজ্ঞাসা কবে, কতাব খাবাবেব সঙ্গে কিছু কববেজেব বডি আব মাথাব তেলেব সঙ্গে কিছু কববেজি তেল মিশিযে বাখলে কি হয।

বাসু কখনো হাসে, কখনো জবাব দেয, মাথা আব একটু ঠাণ্ডা হয তাহলে, হিসেবটা আবো একটু ভালো খোলে।

বাবা। থাক থাক—

সকাল সন্ধ্যায বা ছুটিব দিনে খুঁটিনাটি হিসেবেব ব্যাপাব এ বাডিতে লেগেই আছে। কিন্তু কর্তা শম্ভুবাবু ঘবেব দবজা আবজে হিসেবে বসেন যখন বাডিব হাওযা অন্যবকম। বাসুব দুবন্ত ছোট ভাই-বোনগুলোও তখন একটা অদৃশ্য হিসেবেব ছকে আটক পডে যায। সকলকেই তখন হিসেব কবে চলতে হয, হিসেব কবে কথা কইতে হয, হিসেব কবে হাসতে হয। তখন কোন কিছুব আধিক্য হিসেবেব গণ্ডী ছাডিযে বাডতি খবচ কবে ফেলাব মতই অশোভন।

বাসুব ধাবণা, এই হিসেবেব ধকলটা সব থেকে বেশি যায তাব উপব দিযেই। কখন মৃদু গম্ভীব ডাক আসে সেই ভযে সদা সন্ত্রস্ত। বাবাব হাতে কাগজ পেন্সিল

দেখলেই বুক দুরুদুরু। ডাক তো হামেশাই আসে। ওকে ছাড়া বাবা ডাকবেনই বা কাকে। কোন ব্যাপারে কত খরচ হল না হল জিজ্ঞাসা করেন। সে তবু একরকম জবাব দেওয়া যায়, কারণ খরচ তো হয়েই গেছে। খরচ বেশি হয়েছে শুনলেও বাবা মুখের ওপর খুব যে রাগ করেন বা কটু কথা বলেন তা নয়। গলা ফাটিয়ে রাগারাগি চেঁচামেচি মায়ের সঙ্গে করতেন। ওকে শুধু বলেন, একটু বুঝেশুনে চলিস, অফিসের কাজ তো হয়ে এলো, কটা দিন আর—

কিন্তু বাসুর সব থেকে বিপদ, বাবা যখন জিজ্ঞাসা করেন, কোন ব্যাপারে কত লাগবে বা লাগতে পারে। কিচ্ছু লাগবে না, এমনিতেই সব হয়ে যাবে, বলতে পারলে বোধ হয় সব থেকে খুশি হত বাসু। বাবা চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেন না। ঠাণ্ডা সুর, ঠাণ্ডা প্রতীক্ষা। কিন্তু তাতেই সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে যাবার উপক্রম বাসুর। থতমত খেয়ে এক-এক সময় এমন একটা শীর্ণ অঙ্ক বলে বসে যে বাবাও হেসেই ফেলেন। কিন্তু অখুশি হন না বোঝা যায়। বলেন, তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকত—নে, এই টাকা রাখ, এর মধ্যে চালিয়ে নিস—

যা চাওয়া হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি দেবার তৃপ্তি লাভ করেন শম্ভুবাবু। কিন্তু বাসুর সব থেকে মুশকিল হয়, এই বেশি অঙ্কটাও যখন নির্ধারিত সময়ের আগেই শূন্যে মিলিয়ে যায়। তখন নিজে আর সামনে আসে না বড়। ভাই বোন কারো মারফৎ আবেদন পেশ করে, টাকা ফুরিয়ে গেছে, আরো কিছু লাগবে। বাবা টাকা দেন, কিন্তু তার পরেই ভয়ানক গম্ভীর। বাসু প্রাণপণ চেষ্টা করে বাবা যা দেন তার থেকে কিছু বাঁচাতে। কিন্তু তার হাতে এলে টাকাগুলোর যেন পাখা গজায়। কোথায় দিয়ে কি হয় হদিসই পায় না। তার ওপর বাবা আবার এক সময় ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, খরচটা বেশি হল কিসে। বাসু বোবা তখন।

মায়ের ওপরেই ভারি রাগ হয় বাসুর, অভিমান হয়। ওকে জব্দ করবার জন্যেই যেন মা অসময়ে দুনিয়া পাড়ি দিয়েছে। মা মারা যাবার পর চার-চারটে বছর কি করে কাটল সে-ই জানে। কবরেজের তেল খানিকটা বাবার বদলে ওর মাথায় পড়লে ঠিক হয়। তাও তো চলছে এখনো, ছ'মাস বাদে কি হবে ভাবতে গেলে এখন থেকেই বাসুরও মাথা গরম হয়ে যায়।...ছ'মাস বাদে বাবার চাকরি শেষ। এখনই যা, তখন কি আর মুখের দিকে তাকানো যাবে।

...অবশ্য আরো ছ'মাস হয়ত বাসু এ-বাড়ির কর্তৃত্ব নিয়ে থাকবে না। ওদিকে তো এখন থেকেই হাঁ করে দিন গুনছে একজন। বাসুর পরের ভাইটা সবে কলেজে ঢুকেছে। ওটার অবস্থাই কাহিল হবে আর কি। বাবা বাসুকে আজকাল ধমক-ধামক না করলেও ভাইবোনগুলোকে ছাড়েন না।

যাই হোক, খরচের সমস্যায় পড়লে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে টাকা ফুরোলে বিড়ম্বনাটা বাসুর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সুধীর অন্তত বোঝে। ফি মাসে দু'একদিন আগে অন্তত টাকা ফুরোবেই। তার জেরায় পড়ে সমস্যাটা ফাঁস হয়ে যায়। গোপনে সদাই-পত্র করে সুধীরই তখন চালিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম সঙ্কোচ হত বাসুর, আপত্তি করত। সুধীর উল্টে চোখ রাঙাতো, মাসের মধ্যে যে কুড়িদিন রাতে খাই

এখানে তার খরচা ধরলে কত হয়? কম পড়বেই তো, সে-টাকা তো আর কর্তা হিসেব করে ধরে দেন না তোমাকে! বাসুর রাগ দেখে হাসে কখনো, বলে, দুদিন বাদে তো নির্বিবাদে পকেট ফাঁক করবে—এখন থেকেই অভ্যেস হোক।

অভ্যেস হয়েছিল। মাসের শেষে সুধীর নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করত, কি অবস্থা?

বাসু জবাব দিত, অবস্থা ভালো না, ডাক্তার লাগবে।

কিন্তু একবার ধরা পড়ে গেল। আর ধরা পড়ে দুজনেরই অবস্থা কাহিল। সেবারে কর্তা বেশ কিছু কমই দিয়েছিলেন মেয়ের হাতে। শেষের দিকে অফিস থেকে বাড়তি টাকা পাবেন কিছু। ভেবে রেখেছিলেন, টাকাটা পেলে বাকিটা দিয়ে দেবেন, কিন্তু খেয়াল করে সেটা আর বলেননি মেয়েকে।

তৃতীয় সপ্তাহ শেষ না হতে মেয়ের চক্ষুস্থির। ট্রাঙ্কের তবিলের দিকে চেয়ে কান্না পাচ্ছিল তার। কি দিযে কি হযে গেল টাকাগুলো মাথা খুঁড়েও ঠাওর করতে পারল না। সমাচার অবগত হয়ে সুধীর আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল, আছে গৌরী সেন, তোমার ভাবনা কি!

বাসুর মেজাজ খারাপ।—যাও ভালো লাগে না, বাবা এমনিতেই দুজনকে সমান উড়ন-চণ্ডী ভাবেন আমাদের।

সুধীর প্রতিবাদ করল।—কথাটা ঠিক হল না,...আমাকে উড়নশিব ভাবেন বোধহয়, আর তোমাকে উড়ন-চণ্ডী।

ঠিক দুদিন বাদেই বাবার ঘরে ডাক পড়ল বাসন্তীর। জিজ্ঞাসা করলেন, হাতে কি আছে রে, আর কত লাগবে?

একটু অবাক হলেও সুবোধ মেয়ের মত বাসু বলল, আর লাগবে না বাবা, কুলিয়ে যাবে—

কিন্তু শুনে বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।—কুলিয়ে যাবে কিরে, মাস চলে যাবে!

বাসু ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল।

ফলে হাতে যা আছে এনে দেখাতে হল তাঁকে, এ-পর্যন্ত কত খরচ করেছে না করেছে সব দাখিল করতে হল। কারণ এ-রকম সুবাঞ্ছিত অঘটনই বা শম্ভুবাবু বিশ্বাস করবেন কি করে। বলা বাহুল্য, মেয়ের হিসেবের সঙ্গে টাকার অঙ্ক আদৌ মিলল না। বাসুর প্রাণান্ত সঙ্কট।

শেষে বিরক্ত হয়ে মেয়ের মুখের দিকে ভালো করে তাকাতেই শম্ভুবাবুর চকিতে একটা সন্দেহের ছায়া পড়ল মনে। সুধীরকে অনেকদিন এটা-সেটা হাতে করে নিয়ে আসতে দেখেন, শখ করে রাতের বাজারও যে এক-একদিন করে নিয়ে আসে তাও দেখেন। শম্ভুবাবু এসব তেমন পছন্দ করেন না, কিন্তু দুঃখ পাবে ভেবে কিছু বলেন না।

সুধীরের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিস?

মেয়ের মনে হচ্ছিল মাটি দুফাঁক হলে তার মধ্যে ঢুকে বাঁচে।

শম্ভুবাবু হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন, খানিকক্ষণ। তারপর যথার্থই রেগে গেলেন। —আর কত বেশি দিলে তোর চলবে? তুই এভাবে অপমান করিস আমাকে?

ভাবী জামাইয়ের কাছ থেকে কত নেওয়া হয়েছে জেনে নিয়ে টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

কিন্তু হিসেব করা বন্ধ হল না। ছ'মাস বাদে রিটায়ার করবেন, দিনের পর দিন হিসেবের জটিলতা বাড়তেই থাকল।

সম্ভাব্য তহবিলের আয়তনটা টানলে বাড়বে না, সেটা মোটামুটি নির্দিষ্ট। অতএব ব্যয়ের খসড়াটাই সূক্ষ্মতর বিস্তার লাভ করছে ক্রমশ।...একুশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স আটাশ হাজারে দাঁড়াবে। সরকার হাতে না নিলে তিরিশ হাজারই হত, তা ওনারা তো যাতে হাত দিয়েছেন তাই ঝাঁঝরা। গ্র্যাচুইটি পাবেন চৌদ্দ হাজার—হল বিয়াল্লিশ। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমেছে বাইশ হাজার—মোট চৌষট্টি। ব্যাঙ্কে হাজার দেড়েক আছে, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়—বুড়ো বয়সের অসুখ-বিসুখ আছে, অনেক কিছু আছে। সর্বসাকুল্যে শেষ সম্বল ওই চৌষট্টি—এ ছাড়া পেনশন বলতে এক পয়সাও নেই।

আগের দিন হলে শম্ভুবাবুর আর ভাবনার কি ছিল। টাকার দাম তো দিনকে দিন নয়াপয়সার দিকে গড়াচ্ছে।...পাঁচটি সন্তানের মধ্যে সবার ছোট দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে নমো-নমো করে সারতে হলেও আট হাজার করে লাগবে। তিনি থাকুন আর না-ই থাকুন টাকা তো লাগবেই। সেই দিনের বাজারটা অনুমান করতে পারছেন না বলেই মোটামুটি আট হাজার করে ষোল হাজার ধরে রেখেছেন। তার ওপর বি. এ. পর্যন্ত পাস করিয়ে তুলতেও খুব কম করে আরো দু' হাজার দু' হাজার চার হাজার। লেখাপড়া না শেখালে ভালো বিয়ের আশায় ছাই আজকাল, বড় মেয়েকেও দু' বছর হল বি. এ. পাস করিয়ে ছেড়েছেন তিনি। গেল কুড়ি। ছোট দুই মেয়ের ওপরে দুই ছেলে। একটি আই. এ পড়ছে, আর একটি ইস্কুলের মাঝামাঝি। আগে তাদের পড়াশুনার ব্যয় বাবদ একটা মোটামুটি হিসেব ধরেছিলেন। সম্প্রতি বছর গুনে খরচের ছক কেটেছেন। তাতেও দেখা গেছে একজনের তিন হাজার আর তার ওপরের জনের দু' হাজার লাগবে—ছেলেদের মোটামুটি ভালো করেই মানুষ করার ইচ্ছে তাঁর। গেল পঁচিশ। বড় মেয়ের বিয়ের খরচটা একটু বিশ্লেষণসাপেক্ষ—তবে তাতেও পাঁচ ধরেছেন। হল তিরিশ। তারপর মফঃস্বলের আদ্যিকালের পুরনো ভাড়াটে বাড়িতে আছেন বলেই এই ভাড়ায় থাকতে পারছেন। তাও প্রতিমাসে বাড়িওয়ালা ভাড়া নেবার সময় খোঁজ নেয়, কবে পর্যন্ত বাড়িটা ছাড়া পাওয়া সম্ভব।

ধারেকাছে জমি একটা দেখেই রেখেছেন শম্ভুবাবু—টাকাগুলো হাতে পেলেই ওটা কিনবেন। তারপর মাথা গোঁজবার জায়গাও করবেন একটা। কিন্তু যে বাজার, কিছু না কিছু না করেও হিসেব করে দেখেছেন বাইশ হাজার লাগবে জমি আর বাড়িতে। তাও যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করতে পারেন। তিরিশ আর বাইশে বাহান্ন। হাতে থাকলো বারো। এই বারো হাজারে ছেলে দুটো মানুষ না হওয়া পর্যন্ত সংসার নির্বাহ, জামা-কাপড়, ডাক্তার, ওষুধ—সব। শম্ভুবাবুর চোখে বারো হাজার টাকা বারো হাজার নয়া পয়সার মতো প্রায়। অনেক হিসেব করেও বারো হাজারকে তের হাজারে টেনে তুলতে পারছেন না তিনি, বরং মনে মনে জানেন, ওর থেকে আরো কমই থাকবে হাতে। তাছাড়া টেনেটুনে (ছেলেমেয়ের লেখা-পড়ার খরচ বাদে—সেটা আগেই ধরা

আছে) মাসে আড়াইশয় সংসার চালালেও চার মাসে হাজার টাকা—চার বছরে বারো হাজার খতম।

তারপর? তারপর কি হবে?

যত দিন যায়, এই তারপরের চিন্তায় মাথা গরম শম্ভুবাবুর।

এবারে বড় মেয়ের বিয়ের হিসেবের প্রসঙ্গ। সেটা একেবারে সমূহ বলেই ফর্দ করে টাকার অঙ্ক ফেলতে পেরেছেন তিনি। তবে তারও অদল-বদল হয়েছে এবং হচ্ছে।

বিয়ে আরো ছ'সাত মাস আগেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এ-বাড়িতে সুধীরের যাতায়াত কলেজে পড়তে। তার বাবা আর শম্ভুবাবু বাল্যবন্ধু ছিলেন। ছেলেটাকে পথে ভাসিয়ে বন্ধু অকালে চোখ বুজেছিলেন। সুধীর পড়াশুনায় ভালো বলে কলেজে বিনেপয়সায় পড়তে পেরেছিল। শম্ভুবাবুর নির্দেশে রোজ সন্ধ্যায় সুধীর তখন এ-বাড়িতে এক চৌকি ছেলেমেয়ে পড়াত। বাসুরও পড়ার কথা তার কাছে, কিন্তু পরীক্ষা না এলে সে বিশেষ পড়ত না—কারণ তাকে পড়াতে গেলেই শেষ পর্যন্ত ঝগড়াঝাঁটি হয়ে বসত। তবে পরীক্ষা এলে, বিশেষ করে উঁচুর দিকের পরীক্ষার সময়, বাসুই আবার সুধীরকে একটু তোয়াজ করে চলত। যাই হোক ছেলেময়ের পড়ানোর বিনিময়ে শম্ভুবাবু সুধীর আর তার বিধবা মায়ের খরচটা এক রকম চালিয়ে দিতেন। অবশ্য বেশি লাগতও না তখন।

এম. এ'তে খুব ভালো রেজাল্ট হওয়ার দরুণ সুধীর মফঃস্বলের এই সরকারী কলেজে সহজেই লেকচারারের কাজ পেয়েছিল। বরাতজোরে অবার এবই মধ্যে প্রমোশন পেয়ে প্রফেসারও হয়ে বসেছে। শম্ভুবাবু বাসুর সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাবটা তার মায়ের কাছে আগেই করে রেখেছিলেন। সুধীরের মা আনন্দে কেঁদেছিলেন সেদিন। মাঝে ভাদ্র আশ্বিন না পড়লে বিয়েটা হয়ে যেত। কিন্তু ছেলের বিয়ে দেখা কপালে ছিলই না ভদ্রমহিলার। শরীর বরাবরই রুগ্ন—আচমকা সাত দিনের জ্বরে চোখ বুজলেন তিনি। গুরুদশার দরুন এক বছরের মত বিয়ে পিছিয়ে গেল।

সুধীর কলেজ হস্টেলে একটা ঘর নিয়ে থাকে এখন। চারটি ভাবী শালা-শালীকে পড়াবার অছিলায় এখনো প্রতি সন্ধ্যায় হাজিরা দেয়। পড়াতে বসেও। কিন্তু পড়ানো যা হয় সেটা সকলেই জানে। শম্ভুবাবুও জানেন। গল্প-গুজব করে, সিনেমা দেখে, নয়ত বেড়িয়ে আর প্রায়ই রাতের আহারটা এখানেই সেরে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে হস্টেলে ফেরে সে।

শম্ভুবাবুর গোড়ার ফর্দে মেয়ের বিয়ের খরচের অঙ্কটা ছ'হাজারে উঠেছিল। কিছুদিন আগে কাট-ছাঁট করে সেটা সাড়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি এক আঁচড়ে সেটা পাঁচে নেমেছে। খরচ বাবদ সুধীরের হাতে তিনি দেড় হাজার নগদ দেবেন ধরে রেখেছিলেন। সেটা কেটে এক করেছেন। ফলে পাঁচশ টাকা কমেছে। দেড় হাজারই দিতেন, কিন্তু সুধীরের হাতে টাকা দেওয়া আর টাকা জলে ফেলা এই দুইয়ের মধ্যে খুব তফাৎ দেখেন না তিনি। মাইনে-কড়ি আজকাল কম পায় না, কিন্তু ক'টা পয়সা হাতে রাখে সন্দেহ আছে শম্ভুবাবুর। প্রফেসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটা টাকার একটা ইন্সিওরেন্স করিয়ে দিয়েছিলেন। সুধীর তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল,

কিছু কম করলে হত, মাসে অতগুলো টাকা প্রিমিয়াম দেওয়া...

শম্ভুবাবু কমাননি, কিছু বলেনও নি। কিন্তু অবাক হয়েছিলেন। ছেলেটা টাকাগুলো নিয়ে করে কি!

বাবাব অনুপস্থিতিতে ঘর গোছাতে এসে প্রায় সব হিসেবই বাসুর চোখে পড়ে। উল্টেপাল্টে দেখে আবার রেখে দেয়। নিজের বিয়ের খরচের ফর্দটাও সে অনেকবার দেখেছে। প্রত্যেকটা হিসেবের তালিকায় সুধীরের খরচ বাবাদ দেড় হাজার ধরা দেখেছে। এই শেষের তালিকায় সেটা কেটে হাজার করাটা তার চোখ এড়ালো না।

রাতে হাসতে হাসতে সুধীরকে জানালো খবরটা। বলল, আগের সব লিস্ট-এ বিয়ের খরচ বাবদ তোমার নামে দেড় হাজার টাকা ধরা ছিল, নতুন লিস্টে দেখলাম সেটা কাটা গিয়ে হাজার হয়েছে।

খরচ বাবদ হাত পেতে এক পয়সাও নেবে না সেটা সুধীরই জানে শুধু। আর মনে মনে বাসুও জানে হয়ত। কিন্তু শুনে সুধীর ছদ্ম-চিন্তাব ছায়া টেনে আনল মুখে। বলল, বিয়ের দিন পর্যন্ত উল্টে হাজার টাকা চাইবেন না তো শেষে? তারপর হাসতে হাসতে বলল, ওই হাজারটা তুমি বরং কেটে দিয়ে এসো—হাজার টাকার হিসেব দিতে গিয়ে মাথার চুল শাদা করবে কে?

ভাবী জামাইয়ের খবচের হাত দেখে শম্ভুবাবু অনেক সময় ভিতরে-ভিতবে গজগজ কবেন। মেয়েটাও হয়েছে তেমনি, কোথায় একটু রাশ টেনে চলার পরামর্শ দেবে তা না উল্টে এক কাঠি ওপর দিয়ে চলে। কিন্তু এ নিয়ে সরাসরি সুধীবকে এ পর্যন্ত তেমন কিছু বলেন নি।

সেদিন বলতে হল। বলা দরকার বিবেচনা করলেন শম্ভুবাবু।

এ-বাজাবে অফিস-ফেরত রান্নাঘরের চৌকাঠের ওধারে রূপোর তালেব মত চকচকে প্রায়-গোল মস্ত একজোড়া গঙ্গার ইলিশ দেখলে খুশিতে কার না ভিতবটা উপচে ওঠে? কিন্তু শম্ভুবাবু আঁতকে উঠলেন একেবারে। ট্রেন থেকে নেমে খেয়াঘাট পর্যন্ত আসার পথে শস্তা তরি-তরকারী পেলে মাঝে মাঝে কিনে নিয়ে আসেন তিনি। পরদিনের বাজারের অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। সেদিন একটা গাড়ি আগেই ফিরেছিলেন আর হাতে করে নিয়েও এসেছিলেন কিছু। থলেটা রান্নাঘরে মেয়ের হাতে দিতে গিয়ে এই দৃশ্য।

বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাসুর অবস্থা কাহিল। এই দুর্মূল্যের বাজারে একজোড়া এতবড় মাছ আনার জন্যে ও নিজেই সুধীরকে বকাবকি করেছে। তারপর বাবা ফেরার আগেই কেটে-কুটে কিছু রেঁধে আর কিছু সাঁতলে রাখবে ভেবেছিল। তাহলে ক'টা মাছ এসেছে আর কতবড় মাছ তা অন্তত গোপন করা সম্ভব হত।

একেবারে বমাল সমেত ধরা-পড়া-গোছ মুখখানা হল বাসুর।

শম্ভুবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন খানিক। এ মাছ কে এনেছে জিজ্ঞাসা করার দরকার হল না। দামও তিনি সহজেই অনুমান করতে পারেন।...একজোড়া চোদ্দ-পনের টাকার কম নয়। কেনা দূরের কথা, কেনার ইচ্ছেটা কেমন করে হয় তাই আশ্চর্য।

—কত হয়েছে এ দুটো?

বাবার মুখের অবস্থা দেখেই বাসুর মুখ শুকনো। কণ্ঠস্বর শুনে প্রমাদ গুনল। মাথা নাড়তে চেষ্টা করল একটু, অর্থাৎ সঠিক জানে না।

জানারও দরকার মনে করিস না তাহলে? ওব টাকা-পয়সা আজকাল খুব বেশি হয়ে গেছে, কেমন?

এরপর মাছ পাতে দিতে গেলে বাবা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কিনা বাসুব সেই ত্রাস। তাড়াতাড়ি দুদিক বজায় রাখতে চেষ্টা করল সে। —আমি মন্দ বলেছি। বলল, পরীক্ষার খাতা দেখার অনেকগুলো টাকা পেয়ে গেল হাতে, তাই...

—ক'লক্ষ টাকা পেয়েছে পরীক্ষার খাতা দেখে?

বাসু নিরুত্তর। শুকনো জিবে করে শুকনো ঠোঁট দুটো একবার ঘষে নিল শুধু।

শম্ভুবাবু ওপরে উঠে গেলেন। খানিক বাদে সুধীরের ডাক পড়ল তাঁর ঘবে। বাসু ভয়ে ভয়ে তাকে ইশারা করল, যা বলেন চুপচাপ শুনে এসো লক্ষ্মীটি, বাবার মেজাজ খুব খারাপ—

মুখখানা যথাসম্ভব করুণ করে ভাবী শ্বশুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুধীর। এদিকে বাসুই বা নিশ্চিন্ত থাকে কি করে? তাড়াতাড়ি সে-ও দোতলায় উঠে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। বাবার নির্দেশ কানে এলো, বোসো—

সুধীর বসল।

শম্ভুবাবু বললেন, তোমার বাবা নেই, থাকলে তিনি যা বলতেন আমি তাই বলছি ভেবো।...এখন থেকে তুমি যদি একটু বুঝেশুনে চলতে না শেখো আর শিখবে কবে? দু'দিন বাদে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছ, এ-সব কথা তোমাকে আমার বলে দিতে হবে কেন?

জবাব নেই। জবাব চানও না। বললেন, এ-বয়সে একটু-আধটু খবচ করাব ইচ্ছে সকলেরই হয়, তা' বলে হাতে টাকা এলে পাগলের মত খরচ করতে হবে? মাছ কেনার ইচ্ছে হয়েছিল, একটা কিনতে পারতে, আরো ছোট কিনতে পারতে—চোখের নেশাকে এত প্রশ্রয় দেওয়ার দরকার কি!

থামলেন একটু, একেবারে নয়। রোজ বলা যাবে না যখন, একদিনেই ভালো করে সমঝে দেওয়া দরকার।—মাছেব জন্যে নয়, কথাটা তোমাকে আমি অনেক দিনই বলব ভেবেছি। তুমি এভাবে খরচ করবে কেন? অভাব কাকে বলে তুমি খুব ভালো করেই জানো, দুর্দিনে পড়লে ক'জন পাশে এসে দাঁড়ায় তাও দেখেছ—তোমাব অন্ততঃ একটু ভেবে-চিন্তে চলা দরকার।...আচ্ছা যাও, খারাপ কথা কিছু বলিনি, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার বোঝা উচিত।

বুদ্ধিমান ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তার মুখের দিকে চেয়ে বাসুর মুখে কথা নেই, চোখেও ভাষা নেই। সুধীর নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল। বাসুর হঠাৎ বাবাব ওপরেই রাগ হয়ে গেল। বাবার সবেতে বাড়াবাড়ি। তারপর এই লোকটার ওপরেও রাগ হল, সব জেনে-শুনেও যা করার করবেই, বেশ হয়েছে!

শম্ভুবাবু সকালে খেয়ে যান। ফেরেন সন্ধ্যেয়। মাঝে সামান্যই টিফিন করেন। কাজেই রাতের রান্না হলেই বাসু সবার আগে তাঁর খাবারটা গুছিয়ে ওপরে দিয়ে আসে। সেদিনও দিয়ে এলো। তিনি খেতে বসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একদিক হল, এরপর

আর এক দিক সামলানো আছে।...সেই থেকে বিনুর পড়ার ঘরে মুখ গোঁজ করে বসে আছে, দেখেছে।

বাবার খাওয়া শেষ হয়ে আসতে নীচে এসে ভাই-বোনদের আগে বসিয়ে দিল। এও চুক্তিবদ্ধ নিয়ম একটা। সুধীর যে-দিন খেয়ে যায়—সকলের খাওয়া হয়ে গেলে ওরা একসঙ্গে বসে দুজনে। ভাই-বোনদের খাওয়া হতে বাসুর ইঙ্গিতে পরের বোনটা গিয়ে তাড়া দিল, সুধীরদা চটপট, দিদি ভাত বেড়ে রেডি—

সুধীর উঠে এলো।

—বোসো। বাসু ভাতের থালা রাখল।

মুখ কালো করে সুধীর মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বসবে না।

—খাবে না? বাসুর মুখ লাল হয়ে উঠছে।

সুধীর মাথা নাড়ল। না।

বাসু ঝাঁঝিয়ে উঠল, দেখো ভালো হবে না বলছি, সব ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে দেব আমি।

সুধীর তবু গম্ভীর মুখে দাড়িয়ে।

—বসবে না?

—বসতে পারি...এক শর্তে।

শর্তটা অনুমান করছে বাসু। বলবে ইলিশ মাছ খাবে না। জবাব না দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে রইল শুধু।

সুধীর বলল, জামাইকে কোনো শ্বশুর এভাবে বকে না। তাও জামাই হইনি এখনো—আরো বেশি আদর পাবার কথা। তার বদলে অপমান। গুনে গুনে মোটা-মোটা ছ'টুকরো মাছ দাও যদি তবে বসব—তার কমে রাগ যাবে না।

বাসু হেসে ফেলল। এতক্ষণের গুমোট এক মুহূর্তে তরল। বলল, আচ্ছা, বোসো—

সুধীর গম্ভীর মুখে গ্যাঁট হয়ে পিঁড়িতে বসল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ের দোতলার খবরটি তারা কেউ জানে না। সুধীর খেতে বসছে টের পেয়ে শম্ভুবাবু দোতলা থেকে নীচে নেমে আসছিলেন। তিনি চটি পরেন না। ছেলেটাকে কটু কথা বলা হয়েছে, তাই একটু অনুতাপ হয়েছিল বোধহয়। খাবার সময় সামনে গিয়ে দাঁড়ালে খুশি হবে, স্নেহ বুঝবে। কিন্তু নীচের কথা-বার্তা কানে আসতে সিঁড়ির বাঁকে থমকে দাড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাকে। খাবে না শুনে ভুরু কুচকে গিয়েছিল। শর্ত শুনে সোজা আবার ওপরে উঠে গেছেন। তাঁর সমঝে দেওয়াটা যে এমন নিষ্ফল হতে পারে, ভাবেন নি।

ঘরে বসে চুপচাপ দুর্যোগের ছায়া দেখছেন তিনি। অসময়ে চোখ বুজলে ওই জামাই-ই ভরসা।...সে-ই দেখাশুনা করবে, ছেলে-মেয়েগুলো ভেসে যাবে না। কিন্তু আজই প্রথম মনে হল, এর হাতে দেখাশুনার ভার পড়লে সেই অঘটন আরো অনেক আগেই ঘটে যাবে। নিজেরা সুদ্ধু সদলবলে ভাসবে।

শম্ভুবাবু ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চাকুরে। কলকাতায় অফিস। ডেলি-প্যাসেঞ্জারি

করেন। আগে খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হতে হয়। এপারের খেয়াঘাটের লাগোয়া বাসা তাঁর। এদিকের লাইনে সোজা ট্রেনেও কলকাতায় যাওয়া যায়। কিন্তু তাহলে দশ মিনিট হেঁটে বাস ধরতে হয়, তারপর তিন মাইল ঠেঙিয়ে স্টেশন। বেশি বর্ষায় বা দুর্যোগে তাই করেন। নইলে বারো-মাস খেযা পারাপারটাই পছন্দ। ও-পার থেকে অবশ্য সাত-আট মিনিট হাঁটলে স্টেশন। তবু এদিকে হাঁটা আর বাস ঠেঙানো থেকে অনেক ভালো।

জানা না থাকলে তাঁর বেশবাস দেখে নৌকোর যাত্রীরা কেউ বুঝবে না প্রায় হাজার টাকা মাইনের চাকুবে তিনি। পুরনো কোটের এক পকেটে থলেটা টোপলা হয়ে থাকে। অন্য পকেটে হলদে ছোপ-লাগা টিফিন-বাক্সটার মাথা উঁচিয়ে থাকে। পান চিবুতে চিবুতে খেয়ানৌকোয় উঠে বসেন। বেশির ভাগ দিনই গঙ্গুর নৌকোয় ওঠেন। প্রায় প্রত্যহ। তাঁব যাওযা আসার সময ধরেই গঙ্গু মাঝি তার পারাপাবের সময় ঠিক করে নিয়েছে। গঙ্গু আর শম্ভুবাবু ছেলেবেলার বন্ধু। একেবাবে সেই ছেলেবেলার। একসঙ্গে খেলা হত, মাছ ধরা হত, পাখিব বাসা পাড়া হত, ফল চুরি করা হত। গঙ্গুর বাবাও মাঝি ছিল। নতুন বয়সেব গোডা থেকে গঙ্গু বাপের পেশায় হাত পাকিয়েছে।

গঙ্গু আগে নাম ধরে আর তুই কবে ডাকত। এখন তুমি বলে আর শম্ভুবাবু বলে। শম্ভুবাবু কত বড় চাকুরে আর কেমন গণ্যমান্য ব্যক্তি সেটা সে জানে। আব পাঁচজন যাত্রীর কাছে গল্পও করে। দিনান্তে খেযা পারাপার তো আর কমবার করতে হয় না তাকে। শম্ভুবাবুর এতবড় ভক্ত আর কেউ না।

শম্ভুবাবু আজও মনে মনে পছন্দই করেন লোকটাকে। হেলাফেলা করে না। যাত্রীর ভিড না থাকলে গল্পগুজব করেন। গল্পটা ফেরার সমযেই জমে ভালো। তবে লোকটার পয়সার খাঁইটা তেমন পছন্দ নয় শম্ভুবাবুর। তিনি নৌকোয় উঠলেই অন্য যাত্রী থাক না থাক গঙ্গু জিজ্ঞাসা করে, নৌকোটা ছাড়ি শম্ভুবাবু, কি বলো?

অর্থাৎ দুই-একটা পয়সা বাড়তি দিলেই আর অন্য যাত্রীব প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে না। রিজার্ভ যাত্রীর মতই নিয়ে যাবে। কিন্তু বলার উদ্দেশ্যটা অনুক্ত থাকে। হাঁ বলা মানেই বাড়তি পয়সা বাব করা। শম্ভুবাবু প্রায়ই জবাব দেন, হাতে সময় আছে, তাড়া নেই কিছু—একটু দেখ, দু'চারজন এসে পডবে। আবার সপ্তাহে দুই-একবার দেনও পয়সা। এটুকু বাদ দিলে অসমপর্যায়ের এই দুটি মানুষের মধ্যে অদৃশ্য একটু হৃদ্যতা আছেই।

গঙ্গু মাঝি শম্ভুবাবুর ঘরের খবর রাখে, আর নিজের ঘরের খবরও তাঁকে বলে। হাজার টাকার মাইনের চাকুরের সঙ্গে কোন মাঝি এত গল্প করার সুযোগ পায়? শম্ভুবাবুর মুখখানা ইদানীং বেশ শুকনো সেটা সে-ও লক্ষ্য করেছে। কথায় কথায় কারণও বুঝে নিয়েছে। ফলে তারও মন খারাপ। এতকালের এত বছরের দেখা-সাক্ষাতে ছেদ পড়ে যাবে। অবসর নিলে শম্ভুবাবু ছ'মাসে একবার কলকাতা যাবেন কিনা সন্দেহ।

রিটায়ারমেন্টের আর মাস দুই বাকি।

মাঝে একটু আশার আলো দেখা দিয়েছিল। কাজের চাপের দরুন পুরনো পদস্থ

অফিসারদের আরো একবছর করে চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হবে শুনেছিলেন। ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠান সরকারের কবলে গিয়ে না পড়লে সেই রেওয়াজ তো ছিলই। দু'চার ছ'বছরও এক্সটেনশন পাওয়া যেত।

জনকয়েক অফিসারের চাকরির আয়ু ছ'মাস বা এক বছরের জন্য বাড়ল ঠিকই। কিন্তু শম্ভুবাবুর কিছু হল না। কারণ শম্ভুবাবু হৈ-চৈ করে নিজের কাজের গুরুত্ব জাহির করতে জানেন না, কোট-প্যান্ট-টাই ঝুলিয়ে গট-গটিয়ে চলাফেরা করেন না, অল্পবয়সী ওপরওয়ালাদের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেন না।

অন্ধকারে হঠাৎ একটু আলো ঝলসে আবার নিভে গেলে অন্ধকারটা আরো বেশি লাগে। শম্ভুবাবুরও সেই রকমই লাগছে। শুভার্থীজনেরা তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন, আর কেন মিছিমিছি খেটে মরা, এই দুটো মাস ছুটি নিয়ে নিলেই তো হয়—তাঁর ছুটি তো সব হেজে-পচে গেল। শম্ভুবাবু জবাব দেন না, এই নিরবচ্ছিন্ন ছুটির শূন্যতাই যে তাঁর বুকে চেপে বসে আছে সে আর কাকে বলবেন তিনি।

শরীর মন ভাল ছিল না সেদিন। কোন দিনও থাকে না। মাথাটা ভার-ভার, কপালটির রগদুটো টিপটিপ করছে। ট্রেনটারও যেন ঝিমুনি ধরেছে। এখনো আধ ঘণ্টার ধাক্কা। বিরিক্তির একশেষ।

স্টেশনটা দেখে নিয়ে চোখ বুজে আবার জালনায় ঠেস দিলেন। কিন্তু চোখ বুজলেই যত বাজ্যের হিসেব কিলবিলিয়ে ওঠে মগজের মধ্যে। এই ক'মাসে হিসেব যেন তাঁকে আরো পেয়ে বসেছে। নাওয়া-খাওয়া এমন কি ঘুমের মধ্যেও অদৃশ্য একটা হিসেবের হিজিবিজি কাটা-ছেঁড়া চলতে থাকে। এ-ধকল আর যেন সহ্য হয় না। সর্বদা ক্লান্তি একটা, আর সেই ক্লান্তির তলায়-তলায় হিসেব। শম্ভুবাবু এখন ক'টা দিনের জন্যে অন্তত হিসেব ভুলতে চান।

যাক, স্টেশন এলো। শম্ভুবাবু নামলেন। বাইরে এলেন। সন্ধ্যা গিয়ে প্রায় রাত তখন। ফাঁকা রাস্তায় একটু হাঁটলেই মাথাটা ছাড়বে ভেবেছিলেন। খেয়াঘাট পর্যন্ত হাটা-পথটা একেবারে কম নয়।

কিন্তু রাস্তার অবস্থা দেখেই শম্ভুবাবু বিরক্তিতে অস্ফুট কটূক্তি করে উঠলেন। বিয়ের মিছিল চলেছে একটা। বাঙালীর নয়। যতদূর চোখ চলে ঠাসাঠাসি ভিড়। গোটা রাস্তাটা আলোয়-আলোয় একাকার। এরই মধ্যে আবার গাড়ি-ঘোড়া, বাদ্য-বাজনা, ব্যাণ্ড-পার্টি। দু'ধারে সারি সারি আলোর ত্রিভুজ, মাঝে বড় বড় আলোর ঝাড়।

দম-বন্ধ ভিড়ের মধ্যে ভাসতে ভাসতে শম্ভুবাবু এক সময় খেয়াঘাটে এসে দাড়ালেন।

ঘাটের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সাগ্রহে মিছিল দেখছিল গঙ্গু মাঝি। শম্ভুবাবু তার গা ঘেঁষে নেমে গেলেন তাও খেয়াল করল না। অতএব শম্ভুবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা বিরক্তিতে ডাকলেন, যাবে নাকি হে?

নৌকোয় উঠে বসলেন শম্ভুবাবু। আর দ্বিতীয় যাত্রী নেই। আরো স্বল্পক্ষণ মিছিল দেখে গঙ্গু নৌকোয় আসতেই শম্ভুবাবু বললেন, ছাড়তে বলো, আর ভালো লাগে না—

নৌকো ছাড়া হল। খানিকটা এগিয়ে গঙ্গু পাল খাটিয়ে দিল। জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ, ফুরফুরে বাতাস। গঙ্গুর জোয়ান সাকরেদদের হাতে হাল। নৌকো কোণাকুনি স্রোতের

মুখে আপনিই গাঙ পাড়ি দিচ্ছে। শম্ভুবাবু বাইরের পাটাতনে বসেছিলেন। তামাকেব কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে গঙ্গু কাছেই এসে বসল। শম্ভুবাবু ভিতবে ভিতরে বিরক্ত আবারও, এক্ষুনি বকরবকর শুরু হবে।

হল। গঙ্গু বলল, মিছিলটা দেখলে শম্ভুবাবু, জবব আলো দিয়েছে, না?

শম্ভুবাবু নিরুত্তর।

কবে কোথায় এর থেকেও ঢের ঢের বড় আলোর মিছিল দেখেছিল, গঙ্গু সেই গল্প ফেঁদে বসল। নৌকো তখন মাঝ-নদীতে।

খানিক আপনমনে তামাক টেনে গঙ্গু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ও-রকম আলো দিয়ে সাজাতে ওদের কতা টাকা আন্দাজ লেগেছে?

—জানি না।

গঙ্গু একটু কাছে ঝুঁকে সাগ্রহে চাপা গলায় বলল, ছেলেটার বিয়েতে আমারও ওমনি একটু করার ইচ্ছে আছে, বুঝলে?...অতটা না হোক, একটু কিছু কবা—কিন্তু ছোঁড়াটাকে বদ মতলব দিচ্ছে তার ইয়ার বন্ধুরা, আমি যেখানে বলি সেখানে বিযে করতে নারাজ। আমার কথা না শুনলে কিচ্ছু করব না। তবে শোনে যদি, দেখ'খন...

অর্থাৎ সকলের দেখাব মতই একটা কিছু করবে গঙ্গু মাঝি। সেই সম্ভাবনাব আনন্দে তার কালো মুখ হাসিহাসি দেখাচ্ছে।

ভুরু কুঁচকে শম্ভুবাবু আর একদিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, ওর সিকি করতেও বহু খরচ।

মনের মত একজনের কাছে যে-ভাবে মনের কথা ব্যক্ত কবা চলে সেইভাবেই চাপা আনন্দে বলল গঙ্গু মাঝি, সেকি আর জানি না। আছে—

শম্ভুবাবু সবিস্ময়ে ঘাড ফেরালেন এবার। যে-ভাবে আছে বলল, তাতে দুনিয়ার যত টাকা সব তার হাতে আছে মনে হয়। জিজ্ঞাসা কবলেন, কি আছে? ও-বকম মিছিল বাব করার মত টাকা আছে?

জ্যোৎস্নায় আর কল্কের আলোয় গঙ্গু মাঝির কালো মুখ বহস্যময় দেখাচ্ছে। কিন্তু ভিতবেব আনন্দটা ভাগ কবে দিতে না পাবলে ভালো লাগে না। গলাব স্বর আরো খাটো কবে গঙ্গু বলল, ও-রকম কেন, ইচ্ছে করলে একটা দিন অন্তত এই গোটা শহবটাই আলোব রোশনাইয়ে শাদা কবে দিতে পারি—রেখেছি কিছু, তুমি বোলো না যেন আবাব কাউকে।

শম্ভুবাবু তাজ্জব। লোকটার মাথার ঠিক আছে কিনা বুঝছেন না।—কি রেখেছ? কি আছে তোমার?

গঙ্গু মাঝি হাসছে মিটিমিটি। সত্যিই যেন গুপ্তধনের ভাণ্ডার আছে কিছু তার আয়ত্তে। শম্ভুবাবুব মত আপনজনেব কাছেও সেটা ফাঁস করতে লজ্জা। বলল, কিছু না থাকলে কি আব এই বয়সে এত নিশ্চিন্দি হয়ে নৌকো চালাচ্ছি, ভগমানের আশীব্বাদে ভালই কেটে যাবে গো। অপব্যয় কবা উচিত কাজ নয় বলে, নইলে একটা রাত অন্তত ওদেব দেখিয়ে দিতে পাবি রোশনাই কাকে বলে—

কালোমুখে এত তৃপ্তি আর এমন আনন্দের ছটা দেখে শম্ভুবাবু ভুলেই গেলেন

কার সঙ্গে কথা বলছেন। অধীর আগ্রহে নিজেও চাপা গলাতেই বলে উঠলেন, আঃ, কি আছে তাই বলো না—কি করে পারো?

কিন্তু শম্ভুবাবু ঠিক শুনছেন কি? আরো কাছে সরে এসে উদ্দীপনায় ভরপুর গঙ্গু মাঝি ফিসফিসিয়ে যা বলছে, ঠিক শুনছেন কি তা!...ঠিকই তো শুনছেন। আটশ টা-কা আছে গঙ্গুমাঝির, কড়কড়ে থোক আটশ—দু'পয়সা চারপয়সা করে জমিয়ে জমিয়েই হয়েছে ওই টাকাটা—হবে না কেন, কখনো অপব্যয়ও করেনি পরিশ্রমেও পিছপা হয়নি—কেউ জানে না, ছেলে পর্যন্ত না, ছেলের মা-ও না—শম্ভুবাবু এই প্রথম জানলেন, শম্ভুবাবুকে আর বলতে বাধা কি! কিন্তু শম্ভুবাবু যেন কাউকে না বলেন, কারো কাছে গল্প না করে ফেলেন—

শম্ভুবাবু স্থাণুর মত বসে। কতক্ষণ ঠিক নেই। এক সময় খেয়াল হতে দেখলেন, গঙ্গু মাঝি উঠে নৌকোর পাল খুলছে। নৌকো তীরের দিকে এসে গেছে। জ্যোৎস্না ছাওয়া আকাশটার দিকে তাকালেন শম্ভুবাবু।...এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়...দূর! ক'টা তারা আবার গোনা যায়? হঠাৎ নতুন ধরনের একটা হিসেব উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে শম্ভুবাবুর মগজে। কিন্তু এই হিসেবে যাতনার লেশমাত্র নেই।...কত টাকা থাকলে পাঁচটি সন্তানের আর নিজের ভবিষ্যৎ নিরঙ্কুশ ভাবতে পারেন তিনি?

এক লক্ষ, দু'লক্ষ, পাঁচ লক্ষ...কিন্তু সব অঙ্কের পরেও একটা করে অঙ্ক কাছে ভিড়তে চায়। না শেষ নেই। যে পারে না, সে আট লক্ষ থাকলেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না, আর যে পারে সে আটশ ছেড়ে আট টাকাতেও পারে হয়ত। নিশ্চিন্ত থাকার সঙ্গে হিসেবের কোনো যোগ নেই নাকি?...সেই রকমই যেন লাগছে। হিসেব জিনিসটা আলাদা। ওটা একটা ব্যাধির মত।

মাথাটা কখন ছেড়ে গেছে শম্ভুবাবু টের পাননি। অদ্ভুত হালকা লাগছে। কতকালেব কত বছরের একটা হিসেবের নাগপাশ থেকে যেন মুক্তি পেয়ে গেছেন তিনি। ভিতর থেকে কতগুলো স্নায়ু টেনে-ধরা-বাঁধন যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কোটের পকেট থেকে দু'আনা পয়সা গঙ্গু মাঝির হাতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন শম্ভুবাবু। গঙ্গুর বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে চান না। কিন্তু সিঁড়ি ধরে উঠতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। ওই কোণের দিকটায় কতগুলো লোক হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গার ইলিশ কেনা-বেচা হচ্ছে। মাছের দর নয় তো সোনার দর, চিরাচরিত অভ্যস্ততায় ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও পারলেন না শম্ভুবাবু। পা-দুটো ওদিকেই টানছে। আস্তে আস্তে সেখানে এসে পা উঁচিয়ে সকলের কাঁধের উপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তিনি।

সুধীর সেই থেকে রান্নাঘরে খুনসুড়ি করছে বাসুর সঙ্গে। বাসু ধমকাচ্ছে তাকে, ওদের পড়াতে এসে থাকলে ও-ঘরে গিয়ে পড়াও গে যাও না, এখানে কি—

সুধীর পাল্টা চোখ রাঙাচ্ছে, স্বামীকে, বিশেষ করে ভাবী স্বামীকে এভাবে ঘর থেকে তাড়ানোর কোনো নজির নেই—

হঠাৎ সন্ত্রস্ত দুজনেই। তারপরেই অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব একেবারে।

সুধীরকে একেবারে রান্নাঘরে দেখবেন ভাবেন নি শম্ভুবাবু। তিনিও লজ্জা পেলেন

কেমন একটু। তাঁর হাতে একজোড়া ইলিশ, নেহাৎ ছোট নয় একেবারে।

মেয়ের সামনে মাছ-জোড়া রেখে বিব্রত মুখে প্রায় কৈফিয়ত দেবার মত করে বললেন, পেয়ে গেলাম...। ভালো করে রেঁধে সুধীরকে দিস বেশি করে।

দু'জোড়া বিমূঢ় দৃষ্টি এড়ানোর জন্যেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে প্রস্থান করলেন তিনি।

ওরা দুজনে দুজনের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। মাঝখানের মাটিতে রূপোর তালের মত চকচকে জোড়া ইলিশ।

মডেল

জয়ন্তী তার চেনা-জানা সক্কলকে এই একবার অন্তত অবাক করে দিতে পেরেছে। জয়ন্তী মধুকর জয়ন্তী গোমেজ হয়েছে।

এ বয়েস পর্যন্ত অনেক হোঁচট খেয়ে নিজে সে অনেক অবাক হয়েছে। মানুষেব হৃদয় আর প্রবৃত্তি আর মনের কারিগুরির তল-কূল পায়নি কতবার। এবারে কিন্তু সে-ই হতভম্ব করেছে সকলকে। ওর বুকেব ওধারে হৃদয বস্তুটাব রহস্য খুঁজছে সকলে।

জয়ন্তী গোমেজ! জয়ন্তী প্যাটেল নয়? কি কাণ্ড, কি কাণ্ড! কিন্তু কেন? প্যাটেল হতে আর বাকি কতটুকু ছিল? আর রামচন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে বিনায়ক গোমেজেব তুলনা? রামের সঙ্গে রাক্ষসের তফাতের মতই। দিনেব সঙ্গে রাতের তফাতের মত। আর জয়ন্তীর পাশে গোমেজ! চাঁদের বুকে রাহুর মত ছাড়া আর কোন উপমা মনে আসে?

পরিচিতজনেবা ধরে নিল, মেয়েটা রাহুগ্রস্তই হয়েছে জানি কেমন করে। স্টুডিও টেকনিসিয়ানরা গোমেজকে চেনে সকলেই। কিন্তু তাকে আমল কেউ দেয় না। ও-মূর্তি কাছে এলেই বরং এড়িয়ে চলতে ইচ্ছে করে। কালোকুলো ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা, চোখে মুখে একটা আলগা তোষামোদের ভাব সর্বদা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোকটা স্থূল, কর্কশ। পিপে পিপে মদ গিলতে পারে। ছোট চোখ-জোড়া সর্বদা অত লাল দেখে অনেকের সন্দেহ, মদ ছাড়া আরো কিছু চলে। ঠোঁট দুটো লালচে, যাকে বলে সেনস্যুয়াল। মেয়েদের ব্যাপারেও নৈতিক দিকটা ঝাঝরা বলেই বিশ্বাস সকলের। রঙ কালো, তবু ভালো করে চোখের দিকে তাকালে অপচয়ের কালি চোখে পড়তে পারে। চিত্র প্রযোজকদেব সহকারী ম্যানেজার হোক আর যাই হোক, আসলে স্টুডিওর দালাল লোকটা। মেয়ে জোটানোর দালাল। ছেলে জোটাতে হয় না, তারা নিজেরাই হামেশা স্টুডিও চত্বরে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। কিন্তু এক-একটা ছবির ঝড়তি-পড়তি ভূমিকার জন্য কম 'এক্সট্রা' মেয়ে দবকাব হয় না এক-একসময়! আর মেয়েদের ভিড়-টিড়ের দৃশ্য থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু দরকার হলে দু'দশজন ছেড়ে একসঙ্গে দু'পাঁচশ মেয়েও অবলীলাক্রমে সংগ্রহ করে আনতে পারে বিনায়ক গোমেজ। মেয়েদের কলেজ, মেয়েদের হস্টেল, মেয়েদের সমিতি, মেয়েদের একজিবিশন, হাসপাতালের নার্স, অভিজাত হোটেল রেস্তরাঁয় যুগ্ম দয়িতের দৃশ্য—এ-সবের কোনটা না কোনটা ছাড়া

কটা ছবিই বা হয় আজকাল? অতএব কাজের বেলায় গোমেজের কদর আছে।

কিন্তু লোকটা যে দুদিকে কাটে তাও সকলেরই জানা আছে। প্রযোজকের কাছ থেকে সহকারী ম্যানেজারের মাইনে নেয়। মেয়ে সংগ্রহ করা, খোঁজখবর করা, আর তাদের একত্র করে স্টুডিওতে জুটিয়ে আনার খরচবাবদ-যা নেয়, সেই টাকার অঙ্কটাও একত্র করলে কম দাঁড়ায় না। তার খরচের বিল ওলটালে দেখা যাবে বোম্বাই শহরটার এ-মাথা ও-মাথা চষে ট্যাক্সি করে ওই সব মেয়েদের নিয়ে আসে সে। ট্যাক্সিতে এইসব মেয়েদের নিয়ে আসা আর জায়গায় জায়গায় পৌঁছে দেওয়াব বিলটা ছোটখাট হবে কেমন করে?

আসলে যে কি করে সে সেটা সকলেই জানে। কিন্তু জেনেও কেউ কিছু বলে না। দশ বিশ লাখ টাকার কারবার যেখানে, পাঁচ-সাত শ'র ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করতে চান না প্রযোজকরা। কাজের সময় কাজ হওয়াটাই বড় কথা। যা চাই তা হাতের কাছে পাওয়াটাই বড কথা। তাছাড়া জিজ্ঞাসা করলেও কোনো একটা মেয়ে বেফাঁস কিছু বলবে না, যা থেকে গোমেজের ওপর চোখ গরম করার মত কোনো হদিস মিলতে পারে।

গোমেজের দুদিক কাটার এটা একটা দিক। আব একটা দিক হল ওই মেয়েদেব উপার্জনে ভাগ বসানো—যে মেয়েদের সে নিযে আসে, উপার্জনের রাস্তা করে দেয়। দিনে দশ টাকা বা বিশ টাকা যে পাবে সে তাকে দু'টাকা বা পাঁচ টাকা দেবে না কেন? খুশি হযে দেবে। খুশি হযে দেয়। ভবিষ্যতের আশায় দেয। শুধু টাকা কেন, অনেকে অনেকবকম অন্তরঙ্গ যোগাযোগও রেখে চলে তার সঙ্গে।

কাজের বেলায় প্রায় প্রযোজকরাই গোমেজকে সহকারী ম্যানেজারের পদে বহাল করে থাকেন তাব কারণ লোকটা অসুরের মত খাটতে পারে। ম্যানেজার হিসেবে নিলে কখন কতবড পুঁজি ধবে টান দেবে বিশ্বাস নেই বলেই পাকাপোক্ত সহকারী ম্যানেজার সে। কিন্তু দুর্লভতম কোনো সামগ্রী সংগ্রহেব ব্যাপারে সে পাকা ওস্তাদ। কাজ যতক্ষণ কববে, কাজে ফাঁকি দেবে না। আট ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় করবে। দু'ঘণ্টাব সাশ্রয় এ রাজ্যে টাকাব অঙ্কে যাচাই করলে নিতান্ত কম নয়।

জয়ন্তী মধুকরকেও বিনায়ক গোমেজই নিয়ে এসেছিল। নিয়ে এসেছিল সুদূর মাদ্রাজ থেকে। বলা বাহুল্য, দলবলের মধ্যে হেজিপেঁজি ভূমিকায় ঠেলে দেবার জন্যে নিয়ে আসেনি তাকে। তাকে নিয়ে আসার মত মাঝামাঝি বড়দরের যোগাযোগও ঘটেছিল একটা। এই যোগাযোগেব অনেক আগে থেকেই চিনতো জয়ন্তী মধুকরকে। চেনাটা আরো গভীরতর করে তুলতে গিয়ে আট-ন'বছর আগেই সে বাতিল হয়ে মাদ্রাজ ছেড়েছিল। তারপর বছর দুই আগে দেখা। তারপর এই নতুন যোগাযোগ। এর পিছনে জয়ন্তী মধুকরের মোটামুটি মোটা মুনাফায় ভাগ বসানোটাই আসল প্রত্যাশা নয়। কিন্তু চার মাসে ছবিটা শেষ হওয়ার ফাঁকে তার আসল প্রত্যাশায় ছাই পড়তে রাগ করে ভাগ বসাতে অবশ্য ছাড়েনি সে। তার প্রাপ্য বখরা সে আদায় করে নিয়েছিল। কিন্তু একেবারে নিরাশ হতে পারেনি বলে ঠাণ্ডা মাথায় আবার তা ফেরত দিতেও গিয়েছিল। জয়ন্তী মধুকর সেটা ফেরত আর নেয়নি।

যে-সব বাড়তি মেয়ের দঙ্গল গোমেজ নিয়ে আসে, তারা তাকে যে কারণে ভয় করে আর সমীহ্ করে চলে—জয়ন্তী মধুকরের বেলায় সেই কারণটা ঢিলে হয়ে গেল। কারণ, চার মাসে নিজের রাস্তা সে নিজেই করে নিয়েছিল। ভালো অভিনয় করেছিল ছবিটাতে। সকলেই তার তারিফ করেছিল। ফলে গোমেজ তাকে ছেঁটে দিয়ে শায়েস্তা করার হুমকি দিতে গেলেও কর্তারাই তাকে ডেকে নেবে। নিচ্ছে। ছবিতে খাস বিলিতি মেয়ে, ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মেয়ে, বা বিদেশী টাইপ-মেয়ের চরিত্র থাকলে তারই আগে ডাক পড়ে। আর এই টুকটাক অভিনয় করেই জয়ন্তী মধুকর রোজগার বিনায়ক গোমেজের থেকে অনেক বেশি ছাড়া কম করে না।

অতএব দয়া করে বঁড়শী না গিললে বিনায়ক গোমেজের জয়ন্তী লাভ নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। বিশেষ করে রামচন্দ্র প্যাটেল যাকে বিয়ে করার জন্যে হাত বাড়িয়েই আছে। তার সঙ্গেই বিয়েটা অবধারিত ভবিতব্য বলে ধরে নিয়েছিল সকলে।

বিস্মিত রামচন্দ্রও। অন্তরঙ্গজনেরা এসে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করে, কি হে, কি ব্যাপার? হঠাৎ এ কি কাণ্ড?

রামচন্দ্র বলে, জানি না!

তারা বিশ্বাস করে না। ভাবে, ভিতরে ভিতরে সেই রকমই একটা চিড় খেয়েছে। কিন্তু সেটাই আরো আশ্চর্য। স্টুডিও টেকনিসিয়ানরা আর্ট ডাইরেক্টর রামচন্দ্রকে শুধু শ্রদ্ধা করে না, ভালও বাসে। সুশ্রী, শিক্ষিত, মার্জিত, এক কথায় মিষ্টি মানুষ বামচন্দ্র। কারো কোনো দলাদলির মধ্যে নেই, নিজের কাজের গুণে দাঁড়িয়ে আছে। কথা কম বলে, হাসে অল্প অল্প। ইচ্ছে করলে কোনো কোনো নামজাদা অভিনেত্রীকেও বিয়ে কবতে পারত সে। কিন্তু সে-রকম ইচ্ছের ধার-কাছ দিয়েও কখনো ঘেঁষতে দেখা যায়নি তাকে। তাই জয়ন্তী মধুকরের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতাব পর্বটা হাল্কা করে দেখেনি কেউ, ঠুনকো ভাবেনি।

কিন্তু রামচন্দ্র সত্যিই কিছু জানে না। সে হয়ত হতভম্ব হয়েছে সব থেকে বেশি। অনেক ভেবেছে, অনেক মাথা খুঁড়েছে—কি হল, কি হতে পারে। একবার ভেবেছিল, জয়ন্তীকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু একেবারে বিয়েটা হয়ে যাবাব পব খবব জেনেছে।...কি হবে আর গিয়ে। আব কেউ হলে সরাসরি কৈফিয়ৎ তলব করতে যেত হয়ত, কিন্তু রামচন্দ্র যেতে পারেনি। নিজের মর্যাদা আর ক্ষুণ্ণ করতে রাজি নয় সে।

...তবু কি হতে পারে? কেন এ-রকম হল? জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনে এতবড়ই ভুল করতে যাচ্ছিল রামচন্দ্র, সেটা এখনো সে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না।...জয়ন্তীব কথা-বার্তা আচরণে সেদিন একটু ব্যতিক্রম দেখেছিল মনে পড়ছে। এক মাসেরও আগে সেই একদিন, রামচন্দ্র যেদিন তাকে বসার ঘরে না বসিয়ে অন্দরমহলে নিয়ে এসেছিল। সেখানেও তার একারই রাজত্ব, তবু ভিতরে কাউকে সে ডাকে না কখনো। কিন্তু দুদিন বাদে যে মেয়ে ঘরণী হবে তাকে ডাকতে আর বাধা কি। বরং অন্তরঙ্গ নিভৃতে শুভ দিন-ক্ষণটা সেদিনই পাকা করে ফেলবে ভেবেছিল। জয়ন্তীও সেটা অনুমান করেছিল বোধহয়। তাকে খুশিও দেখাচ্ছিল খুব। তার চাকরের হাতে সাজানো গৃহস্থালীর টুকিটাকি দেখে খুব হেসেছিল।

কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে একসময় গম্ভীর হয়ে পড়েছিল জয়ন্তী। নিজের আনন্দের ঝোঁকে ছিল রামচন্দ্র, অনর্গল কথা বলছিল—অনেকক্ষণ পর্যন্ত খেয়াল করেনি সে। জয়ন্তীকে একেবারে নির্বাক দেখে খেয়াল করল একসময়ে! জয়ন্তীর মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত উবে গেছে মনে হয়েছিল তার। হঠাৎ ঘাবড়েই গিয়েছিল রামচন্দ্র। জিজ্ঞাসা করতে সে অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিল, শরীর ভালো লাগছে না—বাড়ি যাবে। রামচন্দ্র ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল, জয়ন্তী বাধা দিয়েছে। চাকরকে দিয়ে তক্ষুণি একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে চলে গেছে সে। রামচন্দ্র পৌঁছে দিতে চেয়েছিল, জয়ন্তী তাতেও আপত্তি করেছে, বলেছে, লক্ষ্মীটি আজ আর এসো না—।

রামচন্দ্র জোর করারও অবকাশ পায়নি। তার বিস্ময়েব ফাঁকে ট্যাক্সি চলে গেছে। তাব পবেও অনেকবার দেখা হয়েছে, অনেক কথা হয়েছে—কিন্তু ঠিক যেন আগের মত মনে হয়নি জয়ন্তীকে। ভিতরে ভিতরে কিছু একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করেছে রামচন্দ্র, জিজ্ঞাসা করেছে, কি হয়েছে ·তোমার বলো তো?

জযন্তী হেসেছে। আগের মতই হাসতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, কি আবার হবে!

সেদিন বেফাস কিছু বলিনি তো?

জয়ন্তী চোখ পাকিয়েছে, তুমি বেফাঁস বলার লোক?

তারপর একমাস বাদে দুম করে এই বিয়ে। বলা নেই, কওয়া নেই, কোনো পূর্ববাগের প্রকাশ্য আভাস পর্যন্ত নেই, জয়ন্তী মধুকর জয়ন্তী গোমেজ হয়ে গেল।

না, জয়ন্তী হঠাৎ কিছু করেনি, ঝোঁকের বশে বিয়েটা করে বসেনি। সেই রাতে রামচন্দ্রেব বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে চলে এসেছিল। সমস্ত বাত ছটফট করে কাটিয়েছে। তারপর পব পর তিনটে দিন ভেবেছে। খুব ঠাণ্ডা মাথায়, খুব সংযত চিত্তে। তারপর স্টুডিওতে গোমেজকে এক ফাঁকে বলেছে, সন্ধ্যার পর আমার ওখানে এসো একবার, কথা আছে—।

জয়ন্তীর আশা গোমেজ অনেকদিন আগেই গোটাগুটি ছেড়েছিল। এখন তাকে দেখলে তাব ছোট ছোট লালচে চোখদুটো নিঃশব্দে ক্রূর অভিলাষে চকচকিয়ে ওঠে শুধু।...গোমেজ জানে, সর্বত্র শুধু কথা থাকলেই ডাক পড়ে তার। কথা থাকলে বা সমস্যায় পড়লে। কিন্তু জয়ন্তীর কি কথা থাকতে পাবে গোমেজ ভেবে পায়নি। সন্ধ্যার পর ফ্ল্যাটে আসতে বলেছে তাও আশ্চর্য। আর কেউ থাকবে?...বোধ হয় থাকবে। নইলে জয়ন্তী যত অবজ্ঞাই করুক, এতটা দুঃসাহস হবার কথা নয়।

গোমেজ এসেছিল। এসে অবাকও হয়েছিল। আর কেউ নেই, জযন্তী একাই। তাকে বসতে বলেছে। গোমেজ বসেছে।

জয়ন্তীও কাছাকাছি বসেছে। অল্প হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, কথা কানে যাবে তো, নাকি কিছু গিলেটিলে এসেছ?

গোমেজ মাথা নেড়েছে। গিলে আসেনি কিছু। তবে এখানে এসে নীরব চোখদুটো যে গিলছে কিছু তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিনা ভণিতায় জয়ন্তী বলেছে, আমাদের বিয়ে হবে, নোটিস-টোটিস যা দেবার দিয়ে দাও, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করো—

গোমেজ হঠাৎই বিমূঢ় একেবারে। সত্যিই কিছু গিলে এসেছে কিনা নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে। আমাদের বলতে একজন যে ও নিজেই সেটা মাথায় ঢুকছে না।

জয়ন্তী বলেছে, হাঁ করে চেয়ে আছ কি, পছন্দ হবে কিনা দেখে নিচ্ছ?

অতঃপর মাথায় ঢুকেছে গোমেজের। কিন্তু ভরসা করে বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।—মানে...আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?

জয়ন্তী হেসে ফেলে মাথা নেড়েছিল।—না, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

পরদিন রেজেস্ট্রি অফিসে চলে গেছে। একমাস বাদে বিয়ে। কিন্তু এই একটা মাস আহার-নিদ্রা ঘোচার উপক্রম গোমেজের। বিয়েটা সত্যিই না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত একেবারে নিঃসংশয় হতে পারেনি সে। রোজ সন্ধ্যায় জয়ন্তীর ফ্ল্যাটে এসেছে। এক ফোঁটা তরল বস্তু গলাধঃকরণ না করেই এসেছে। একটা দিনও আর আগেব মত তাকে হেলাফেলা করেনি জয়ন্তী। বরং উল্টো একেবারে। তার হাসিতে খুশিতে কথায় ভ্রূকুটিতে দুজনের প্রতি সন্ধ্যার প্রগলভ সান্নিধ্য নিবিড় হয়েছে।

তারপর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের পরেও জয়ন্তীর পরিবর্তন হয়নি একটুও। গোমেজকে হেফাফেলা করেনি। ববং মানুষটাকে মনের মত করে তোলার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা আছে তার। গোমেজকে বলেছে, একবারে না পারো, মদের মাত্রা আস্তে আস্তে কমাও, চোখ দুটো তোমাব অত লাল কেন সব সময়, গাঁজাটাজা খাও নাকি? আর কি কি গুণ আছে তোমার—একটা লিস্ট করে আমাকে দিও। আর ওই সব 'এক্সট্রা' মেয়ের দঙ্গল জোটানোর লোভনীয় দায়িত্বটা আর কারো ঘাড়ে চাপিযে দাও—দুজনে যা রোজগার করছি, বেশ চলে যাবে। মোটকথা, বেশ বুঝেশুনে চোলো—কাগজের বিয়ে ছিড়তে সময় লাগে না বলে দিলাম বাপু।

বলার দরকার ছিল না। ওসবের থেকে অনেক বড় নেশার ইন্ধন জয়ন্তী নিজেই যোগাতে জানে। যোগাতে কার্পণ্যও কবেনি। তার সর্বাঙ্গ ঘিরে সেই নেশার আমন্ত্রণ। আপাতত সেই নেশাতেই হাবুডুবু খেযে গোমেজের ইন্দ্রিয়াসক্ত স্থূল মাথাটি বিলক্ষণ ঘুরে গেছে।

অতএব খেয়াল বা ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসেনি জয়ন্তী। যা করেছে, তাব জন্যে একটুও অনুতপ্ত নয সে। কেউ যদি বলে, মাঝের এই দেড়টা মাস একেবারে মিথ্যে, অলীক স্বপ্ন—কি করবে ভেবে নাও। জয়ন্তী আবারও যা করেছে তাই করে। তাই করবে। গোমেজকে বিয়ে করবে, রামচন্দ্রকে নয়।

কেন, সেইটুকুই কাহিনী।

জয়ন্তীর বাবা ছিলেন গুজরাটী, মা শ্বেতাঙ্গিনী। মা খাস মেমসাহেব নন, কলকাতার মেমসাহেব। রঙটা কটকটে শাদাই ছিল, আর দেখতেও সুশ্রীই ছিলেন। তাঁদের বিয়েটা হয়েছিল ভিজেগাপটমে। গুজরাট নন্দনের প্রতি মোহ ছুটতে বছর চারেক লেগেছিল মেমসাহেবের। মেয়ে অর্থাৎ জয়ন্তী মধুকর তখন বছর তিনেকের। স্বামীর হেপাজতে তাকে রেখে বন্দরের স্বগোত্রীয় প্রেমিকের সঙ্গ ধরে বিনা নোটিসে তিনি সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা মিস্টার মধুকরের বুকে কতটা লেগেছিল বা আদৌ লেগেছিল কিনা

কেউ বলতে পারবে না। তবে সেখানকার কাজকর্ম গুটিয়ে তিনি মাদ্রাজের শহরের ওপরে ব্যবসা ফেঁদে বসে ছিলেন, সেটা অনেকেই জানে। কিন্তু ব্যবসার বাইরের জাঁকজমক যত ছিল, মূলধন যে তত ছিল না সেটা একমাত্র মধুকরই জানতেন। কারণ তাঁর মেমসাহেবটি একেবারে রিক্তহস্তে সাগর পাড়ি দেননি। ভিজেগাপটমের ব্যবসারও সহকর্মিণী ছিলেন তিনি, ব্যাঙ্ক থেকে চেকে টাকা তোলার ক্ষমতাটা তাঁরও ছিল। তাঁকে ক্ষমতা দিয়ে ধরে রাখার একটা নিশ্চিন্ত ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন মধুকর।

যাই হোক, মাদ্রাজের ব্যবসা জমে উঠতে পারেনি। বরং ধারদেনায় ক্রমশ মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠছিল ভদ্রলোকের। কিন্তু সকলকে আচমকা নির্বিঘ্নে ফাঁকি দিলেন তিনিও। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ তাঁর ডাক এলো এমন জায়গা থেকে যে, দেনা পরিশোধের জন্য মরজগতের কোনো আদালতে তাঁকে ফিরিয়ে আনার মামলা চলে না।

জয়ন্তী মধুকর মিশনারীর আশ্রয়ে এসেছিল ছ'বছর বয়সে, আর সেই আশ্রয় হারিয়েছিল ষোল বছর বয়সে। জন্মাবধি বাবা-মায়ের স্নেহ পায়নি বলেই হয়ত ওই অনুভূতিটির প্রতি ভিতরে ভিতরে একটা অপরিসীম লোভ ছিল তার। কেউ দুটো ভালো কথা বললে, দরদের কথা বললে জয়ন্তী মনে মনে তার কেনা হয়ে থাকত।

কিন্তু ছ'বছরের ভালো কথা দরদের কথার সঙ্গে ষোল বছরের ভালো কথা দরদের কথার কিছু তফাত হওয়াই স্বাভাবিক। আর সে-রকম কথা শোনানোর লোকও বদলাতে পারে। বিশেষ করে শুনবে যে, সে যদি মেয়ে হয় আর তার যদি রূপ থাকে। কিন্তু নিজের রূপ সম্বন্ধে খানিকটা সচেতন হলেও তখন পর্যন্ত তেমন সজাগ নয় জয়ন্তী মধুকর। অল্প বয়সের ছেলেগুলোর তাকে ভালো লাগে, সেটুকুই উপলব্ধি করত সে। আর তাতে তার আনন্দই হত। বিনায়ক গোমেজ এই ছেলের দলেরই একজন। কিন্তু তাকে আবার জয়ন্তীর তেমন ভালো লাগত না। তাকে আবার বড় বেশি স্থূল, বড় বেশি লোলুপ মনে হত। অন্য ছেলেগুলোর তুলনায় তার বয়েস একটু বেশি, গায়ের জোরও। জয়ন্তীর জন্য তাদের সঙ্গে সে মারামারিও করত। গোমেজকে পছন্দ না করলেও এ নালিশ শুনেও তার কেন জানি আনন্দই হত।

কিন্তু মিশনারী কর্ত্রীদের একটুও আনন্দ হত না। অনেকবার তাঁরা এ নিয়ে বিরস ভ্রূকুটি করেছেন, মৃদু অনুশাসন করেছেন। কিন্তু ভ্রূকুটি বা অনুশাসন ব্যর্থ। কোনো ছেলে যদি অনুরাগভরে তাকে কাছে টেনে নেয়, নিভৃত মুহূর্তে কেউ যদি সেই অনুরাগের চিহ্ন তার দুই ঠোঁটে এঁকে দিতে চায়, কারো কোনো ভ্রূকুটি বা অনুশাসনের কথা তখন অত মনে থাকে না জয়ন্তীর।

কিন্তু তাকে নিয়ে বোকা ছেলেগুলোই একটা কাড়াকাড়ি গণ্ডগোল পাকিয়ে তুললে। ফলে তার আশ্রয়টি গেল। যাদের জন্যে গেল, তাদের স্থূল উদ্দেশ্যটাই জয়ন্তীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল—আশ্রয় দেবার মুরোদ তাদের কারো নেই। আর জয়ন্তী অবাক হয়ে আবিষ্কার করলে, সে-রকম ইচ্ছে বা দরদও নেই কারো।

ফলে আবারও সে ক্ষমা চেয়ে মিশনারীতে ফিরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু সেখানকার দরজা বরাবরকার মতই বন্ধ হয়েছে। জয়ন্তী তখনো ভেবে পেত না

মিশনারীর কর্ত্রীরা তার প্রতি এত নির্মম কেন। সে বঞ্চিত হয়েছে, ছেলেগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে—ক্ষত তো ওরই, ওর তো উল্টে বরং সহানুভূতি পাবার কথা।

কিন্তু এর থেকেও অনেক নির্মম, অনেক রূঢ় বাস্তব মুখব্যাদান করে আছে সামনে। সামনের ওই অকূল সমুদ্রের বুকে পলকা খেলনাব নৌকো ভাসালে যেমন হয়, তেমনি এক সমুদ্র পরিমাণ অনিশ্চয়তাব বুকে ভাসছে সে। কোন দিকে তল-কূল নেই। জয়ন্তী কি করবে? সেই ছেলেগুলোর কাছেই ফিবে যাবে? ছেলেগুলোর মুখগুলো ভাবতে গিয়ে এক-একটা হাঙরের মুখ চোখে ভাসছে তার। সাময়িক আশ্রয় মিলবে, জঠরের সাময়িক ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে—তার বিনিময়ে মূল্য দিতে হবে। না হয় দিল, কিন্তু তাবপর? তাবপর কি হবে?

কি হবে ভাবতে গিয়ে জয়ন্তী মধুকব দিশেহারা। সেই অবস্থায় এমনও মনে হয়েছে এক এক সময়, আদৌ যদি জন্ম না হত তাব, এই পৃথিবীতে আসতে না হত—বেশ হত।

সেই বিপর্যয়ের মুখে একজনের সঙ্গে দেখা। পরিচিতা মেয়ে একটি, জয়ন্তীব থেকে ছ'সাত বছবেব বড। দূরে শহরের উপকণ্ঠে কোথায় চাকরি করে। কি চাকবি বা কোথায় চাকরি জানত না। জলমগ্ন মৃত্যুত্রাসে খডকুটো আঁকড়ে ধবাব মত জযন্তী সেই মেয়েটিকেই আঁকড়ে ধরল একেবারে।

মেয়েটি শুনল সব। ভাবল, খুঁটিয়ে খুঁটিযে দেখল ওকে। কি যে দেখল জয়ন্তীব দুর্বোধ্য। তারপব জিজ্ঞাসা করল, চাকবি করবে?

জয়ন্তী তক্ষুনি মাথা ঝাঁকালো। কিন্তু কি চাকরি কবতে পারে সে? কি জানে?

—কিছু কবতে হবে না, শুধু বসে থাকতে হবে চুপচাপ, বা দাঁডিয়ে থাকতে হবে—ওকে দেখে দেখে ছবি আঁকা হবে, মাটির মূর্তি গড়া হবে।

—মডেল?

—মডেল।

—কিন্তু...। জয়ন্তীকে ঢোক গিলতে হল, এইভাবেই ছবি আঁকা হবে মূর্তি গডা হবে, না কি...

মেয়েটি আশ্বাস দিল তাকে, এইভাবেই—কিচ্ছু ভাবনা নেই। সে অভিজ্ঞ, একদিন এই লজ্জা এই সঙ্কোচ তাবও ছিল। সে জানে আজ যা ধাক্কা লাগাব মত কঠিন, কাল সেটা নিতান্ত সহজ। সবই অভ্যাসের ব্যাপাব মাত্র।

তারই সঙ্গ ধরে শহরের উপকণ্ঠে বেশ বড় একটা শিল্প-কলা প্রতিষ্ঠানে হাজিব হল সে। অভিজ্ঞা মেয়েটির হিসেব ভুল হয়নি। কর্মকর্তাবা বাতিল করলেন না জয়ন্তীকে।

তাঁরাও বেশ করে দেখে নিলেন ওকে। জয়ন্তী ভেবে পেল না কি দেখছেন। প্রথমে ভাবল রূপ। তারপর মনে হল রূপ নয়, আর কিছু দেখছেন তাঁরা। বোধ হয় গঠন দেখলেন।

প্রথম দু'মাস ঠিকা মডেল হিসেবে কাজ পেল জয়ন্তী। দিনে আড়াই টাকা রোজগার। একশ টাকা মাইনেয় ছ'মাসের চুক্তি হল তারপর।

প্রথম প্রথম কাজের নমুনা দেখে হাসিই পেত জয়ন্তীর। নতুন মূর্তির আবির্ভাব দেখে গোড়ায় অল্পবয়সী ছেলে-ছোকরাগুলো চনমনিয়ে উঠেছিল একটু। বেশ উৎসাহ বোধ করেছিল। এক ঘর ছেলের মধ্যে একটা টুল পেতে তাকে বসতে দেওয়া হত। ছেলেগুলোও তাদের কাগজ পেন্সিল রঙ তুলি নিয়ে বসে যেত। যে যেখান থেকে যে রকমটি দেখছে, সে সেই রকম আঁকবে।

প্রতি সিটিংয়ে আট দশ মিনিট বসে থাকাব কথা। তারপর আট দশ মিনিট বিশ্রাম। তারপর আবার বসা। এমনি চলত সমস্ত দিন। এক ব্যাচের মিয়াদ ফুরালে নতুন ব্যাচ আসবে। কিন্তু আট দশ মিনিট একনাগাড়ে টুলে বসে থাকা খুব সহজ কথা নয়। নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু। শিরদাড়া ধবে যেত জযন্তীর, হাড়গুলো টনটনিয়ে উঠত। কিন্তু মোটামুটি শান্ত হয়ে বসে থাকাটা কিছুদিনের মধ্যেই অভ্যাস হয়ে গেল।

ছেলেদের সঙ্গে ভাব হতে বেশি সময় লাগল না। সকলের হাতের কাগজে রঙে তুলিতে ওরই চেহারাটা গড়ে উঠছে—ভাবতেও ভালো লাগত। এক-একটা সিটিং হয়ে গেলেই ঘুরে ঘুরে দেখত কোন ছেলে কি করছে।

কিন্তু একটা ব্যাপার ভারী অদ্ভুত লাগল জয়ন্তীর। কাজের সময় ছেলেগুলো যেন অন্য মানুষ। একটা জ্যান্ত মেয়ের প্রতিকৃতি আঁকছে না কোনো মূর্তি থেকে আঁকছে, তাই যেন ভুলে যেত তারা। সে শুধু 'অবজেক্ট'—লক্ষ্যবস্তু একটা। সেই লক্ষ্যবস্তুকে ওই শুকনো কাগজে জীবন্ত করে তোলার নিবিষ্টতা সকলের চোখে-মুখে। তারা নির্নিমেষে দেখে ওকে, খুঁটিয়ে দেখে, কাছ থেকে দেখে, দুর থেকে দেখে—কিন্তু ঠিক ওকে দেখে না যেন।

ছ'মাস যেতে নতুন চুক্তি। মাইনে কিছু বাড়ল। প্রতিষ্ঠানে তার কদর বেড়েছে একটু, জয়ন্তী তাও উপলব্ধি করতে পারে। কাজের ধারা একটু সয়ে যেতে অপেক্ষাকৃত পাকা-হাতের উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেদের দখলে রাখতে চায় ওকে—যারা অয়েল পেন্টিং করে, মাটির কাজ করে। সেখানে টুলে বসে থাকা নয়, বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে দাঁড়ানো, বসা, শোয়া। কখনো বিস্রস্ত-বসনা, কখনো বা প্রায়-বিবসনা। প্রথম প্রথম লজ্জা পেত জযন্তী, সঙ্কোচ হত, মৃদু আপত্তি করতো। কিন্তু লজ্জা সঙ্কোচ কাকে? এবা সব কি দেখে? কি আবিষ্কার করতে চায়? ওকে—

জয়ন্তী প্রায় অবাক এক এক সময়। ওকে দেখে না, ওকে আবিষ্কার করে না তারা। নারীতনুর রেখায় রেখায় অভিযান তাদের, শ্যেনদৃষ্টিতে তাই দেখে, তাই আবিষ্কার করে, তার কোনো যৌবনরেখা কোনোভাবে না দৃষ্টি এড়ায়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি তাদের। ওর দিকে নয়, ও শুধু লক্ষ্যবস্তু, অবজেক্ট। সেই লক্ষ্যবস্তুটাই রঙে রসে রূপে যৌবনে জীবন্ত করে তোলার সাধনা—ও জীবন্ত কিনা কাজের সময় সেদিকে হুঁশ পর্যন্ত নেই কারো। একজনের সঙ্গে আর একজন পাল্লা দিয়ে ক্যানভাসে প্রাণসঞ্চারে রেখাসঞ্চারে ব্যস্ত। জয়ন্তী ইচ্ছে করেই এদের নিবিড় একাগ্রতার মুহূর্তেই নড়েচড়ে ওঠে একটু। ওদের তন্ময়তায় ছেদ পড়ে, কেউ ভুরু কোঁচকায়, কেউ বা স্পষ্টই বিরক্ত হয়।

দ্বিতীয় বছরে আরো অগ্রবর্তী শিল্পীদের মাটির কাজে ডাক পড়ল জয়ন্তীর। মাইনে আরো বেড়েছে, কদরও বেড়েছে। এরকম মডেল পেলে ছেলেদের কাজের উৎসাহ

বাড়ে সেটা অন্য মডেলদের দিকে এক নজর চেয়েই জয়ন্তী উপলব্ধি করতে পারে। তাকে নিয়ে কাজ করার জন্যে প্রতিষ্ঠানসুদ্ধু লোকেরা উন্মুখ।

মাটির কাজে এসে জয়ন্তীর বসন ক্রমশ সবটাই বিচ্যুত করে সিটিং দিতে হয়েছে। এতেও লজ্জা পেয়েছে প্রথম, সঙ্কোচ হয়েছে—কিন্তু ক'টা দিন না যেতেই আবারও সয়ে গেছে। দশ মিনিট করে টুলে বসে থাকা, বা একভাবে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা। দশ মিনিটের বদলে পনের মিনিটও অনায়াসেই পারে জয়ন্তী। একটুও নড়বে না, তন্ময়তায় একটুও ছেদ পড়বে না কারো। নগ্ন প্রকৃতির মতই বিবস্ত্রা রমণী কখনো বসে থাকে, কখনো দাঁড়িয়ে থাকে। হাতে হাতে তার ছাঁচ গড়ে ওঠে। তার অঙ্গের প্রতিটি রেখা বিন্যস্ত হতে থাকে। জয়ন্তী যেন আর একখানা মূর্তি। সেই মূর্তির আনাচ-কানাচে দৃষ্টিপথে সূক্ষ্মতম বিচরণ ওদের। জয়ন্তী অবজেক্ট, ফর্ম, একটা আকার, একটা গঠন। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তাকে নেবার সময় কি দেখেছিলেন, জয়ন্তী এখন তা বুঝতে পারে। তাঁরাও ফর্ম দেখেছিলেন, গঠন দেখেছিলেন।

জয়ন্তীর হাঁপ ধরে যায় এক এক সময়। নিজেরই ভুল হয়ে যায়, সত্যিই সে একটা মূর্তি ছাড়া আর কিছু কিনা। ধড়মড়িয়ে নড়েচড়ে উঠে সকলেব নিবিষ্টতা তছনছও করে দেয় এক-একদিন। কেউ কিছু বললে উল্টে ভ্রূকুটি করে, কতক্ষণ বসে আছি ঘড়ি দেখুন না!

বিশ্রামের সময়টা ইচ্ছে করলেই নীল পর্দার ওধারে চলে যেতে পারে। পুরুষের দৃষ্টির আড়াল হতে পারে। কিন্তু জয়ন্তী তারও দরকার বোধ করত না। ওদের পরখ করার জন্যেই হয়ত সেখানেই বসে থাকত, হাসিঠাট্টা হালকা গল্পগুজব করত। সর্বাঙ্গের কোথাও এতটুকু আবরণ পর্যন্ত থাকত না। মডেলরা এইভাবেই অভ্যস্ত হয়ে যায় অবশ্য। কিন্তু জয়ন্তী সেই অভ্যস্ততার কারণে বসে থাকে না। সে ওদের চোখ দিয়ে নিজেকেই যাচাই করে নিতে চায়, সে সত্যি শুধু অবজেক্ট কিনা, শুধু ফর্ম কিনা, শুধু একটা আকার আর গঠনের স্তূপ কিনা।

অবকাশ সময়ে চোখের দৃষ্টি বদলায় অনেকের। প্রাকৃতিক বিধানের বাইরে তো কেউ নয়। কিন্তু সেটা এত সাময়িক যে জয়ন্তীর যাচাই করা হয়ে ওঠে না নিজেকে। আবার সিটিংয়ের সময় হয়, আবাব ওদের চোখ বদলে যায়। আবার সে অবজেক্ট, ফর্ম, আকার, হাড় মাংস চামড়ার একটা গঠন শুধু।

প্রতিষ্ঠান-আঙ্গিনার বাইরে নিভৃত সাহচর্য লাভের চেষ্টা কারো নেই এমনও নয়। আভাসে ইঙ্গিতে দুই একটা আবেদন নিবেদন বা প্রস্তাবও আসে। কিন্তু সেও সাময়িক ব্যাপার, স্নায়ুর ব্যাপার। হৃদয়ের ব্যাপার নয়। হৃদয়ের স্পর্শমাত্র নেই কোথাও। মিশনে থাকতে ছেলেগুলোর যেটুকু তাপ ছিল, মোহ ছিল, কৌতূহল ছিল—এদের তার একাংশও নেই। ওর দেহ, দেহের সকল রহস্য আলাদা আলাদা করে দেখে নিয়েছে তারা—মোহ আসবে কোথা থেকে? প্রস্তাব বা আবেদন যাদের কাছ থেকে আসে, সিটিংয়ের সময় তাদেরই বিশেষ করে লক্ষ্য করে জয়ন্তী। আর পাঁচজনের সঙ্গে কোনো তফাত নেই—মাটি জুড়ে জুড়ে ওর আকার বিন্যাসের মধ্য দিয়ে শুধু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখে ওরাও—নারীর ফর্ম দেখে, গঠন দেখে, নারী দেখে না।

দুই একটা প্রস্তাব লোভনীয়ও বইকি। জয়ন্তী না হয়ে আর কোনো মডেল হলে ভাগ্য মানত। দুই একজন সেরা শিল্পীর কর্ম-সঙ্গিনী হওয়ার আমন্ত্রণ। সে-আমন্ত্রণে শিল্পীর অনুরাগের প্রলেপ ছিল, যুগ্ম প্রচেষ্টায় সার্থক ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল। শুধু জয়ন্তীরই মডেল গড়া হবে, চিত্র আঁকা হবে। নানা রূপে, নানা মূর্তিতে, নানা অভিব্যক্তিতে রূপ-রসিকের দরবারে শিল্পী পৌঁছে দেবে তাকে।

কিন্তু জয়ন্তীর ভাবতেও বিতৃষ্ণা। ও কর্ম-সঙ্গিনী হবে, জীবন-সঙ্গিনী নয়। মডেল হবে—মডেল। ওকে পাওয়ার স্বপ্ন কেউ দেখে না, মডেল পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। ওর আকার গঠন অভিব্যক্তিটাই বড় পণ্য ও লক্ষ্যবস্তু—অবজেক্ট।

তবু এরই মধ্যে আশার হাওয়ায় হৃদয়েব পর্দাটা দুলে উঠেছিল একবার। জীবনে হতাশ হতে কে চায়? ভিতরের তাড়নায় ছোট আশাকে বরং বড় করে দেখতে ইচ্ছে করে। জয়ন্তীর তখন এই প্রতিষ্ঠানে চতুর্থ বছর চলছে। মাইনে বেশ ভালই পায় এখন। দুটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলের সঙ্গে একটু হৃদ্যতাই হয়েছিল তার। প্রতিষ্ঠানের কাজের পরে তার সিটিং পিছু আলাদা দক্ষিণা দিয়ে ওকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের বারোয়ারী সিটিংএ তাদের মনোমত কাজ হয়ে উঠছিল না। এ প্রস্তাবও দু'জনে একসঙ্গে কবেনি। আলাদা আলাদা। দুজনকেই একঘণ্টা করে সিটিং দিতে হবে। রীতিমত তোয়াজের ফলে জয়ন্তী রাজি হয়েছিল। রাজি হয়েছিল দুটো কারণে। এক, দুজনেব থেকে যা পাবে সেই টাকার অঙ্কটা অবহেলার নয় খুব। দ্বিতীয়, অন্তরঙ্গতার ফলে নিরবচ্ছিন্ন নিভৃতে ওদের মডেল গড়ার ঝোঁকটাই একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ধরে নেয়নি জয়ন্তী। সেটাই বরং উলপক্ষ মনে হয়েছিল তার। হৃদয়ের কারবারের সূচনা ভেবেছিল।

কিন্তু ভুল ভেবেছিল। নিভৃতের এই শিল্প-সাধনায় দুজনেরই আরো উগ্র নিবিষ্টতা লক্ষ্য করেছিল জয়ন্তী। ওর থেকে নারীর প্রকাশের সব কিছু নিঙড়ে নিয়ে আকারে আর গঠনে বন্দী করার যেন একটা বিশেষ অধিকার লাভ করেছিল তারা। হাস্যে লাস্যে তনুমাধুর্যে যতটা সম্ভব নিজেকে প্রকাশ করেও ছিল জয়ন্তী। ওদের হাতের ওই মাটির আকাবে, রেখার আকারে বন্দিনী হবাব আগ্রহে নয়, ওদের সৃষ্টি ভোলাবার জন্য, কাজ ভোলাবার জন্য, শিল্পকারু ভোলাবার জন্য। ওদের ভোলাবাব জন্য। একে একে দুজনকেই।

তাবপর ডাক ছেড়ে কাদতে ইচ্ছে করেছে জয়ন্তীর। না, ওরাও শুধু ফর্মই আবিষ্কাব করেছে, মাটির গঠন আরো লোভনীয় আরো জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছে। নতুন অভিব্যক্তি আবিষ্কার করেছে। সেই আবিষ্কারের নিশ্চল নিষ্প্রাণ গহ্বরে স্থাণুর মত অবস্থান জয়ন্তীর। কখনো হাসির কাঠামোয়, কখনো বিষাদের কাঠামোয়, কখনো ব্রীড়াময়ীর কাঠামোয়, কখনো বা নগ্ন কুটিল শক্তিময়ীর কাঠামোয়। প্রতিটি কাঠামোয় সে শুধু একটা ফর্ম, একটা অভিব্যক্তি, একটা অবজেক্ট—তার বেশি কিছু না। কিছুই না।

এই কাঠামোর মধ্যে পড়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম জয়ন্তীর। কটা করে বছর যাচ্ছে, আর সে যেন যন্ত্রের মত হয়ে পড়ছে। কেবলই মনে হয়, এখানে যৌবনকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে যৌবন খুইয়ে বসছে সে। দিনে দিনে দেউলে হয়ে পড়ছে। আরো তিনটে বছর কাটল এই করে, সাত বছর পূর্ণ হল এখানে। এর মধ্যে তিনবার

চাকরি ছাড়ার নোটিস দিয়েছে সে, কিন্তু ফি বছরই প্রতিষ্ঠান-কর্তারা মোটা ইনক্রিমেন্টের ফাঁদে ফেলে আটকে রেখেছে তাকে। মাইনে সে এখন এখানকার মডেলদের দ্বিগুণ পায়। টাকাও কম জমায়নি জয়ন্তী, এখানে খরচই বা কি। তার সৌভাগ্য অন্যান্য মডেলদের ঈর্ষার কারণ। তারা ওর বুকের তলার খবর রাখে না।

এবারে জয়ন্তী যাবেই ঠিক করেছিল। আর না। তাকে বাঁচতে হবে। আবরণের আশ্রয়ে বাঁচতে হবে, পুরুষের চোখের রহস্যের আশ্রয়ে বাঁচতে হবে।

সমুদ্রের ধারে হঠাৎই গোমেজের সঙ্গে দেখা একদিন। বম্বে থেকে দিনকয়েকের জন্যে মাদ্রাজ বেড়াতে এসেছিল। মাদ্রাজেই ঘর-বাড়ি তার। জয়ন্তীকে এখানে দেখে গোমেজ আকাশ থেকে পড়ল একেবারে। তার আনন্দ ধরে না। হাসিখুশি কথাবার্তা। জয়ন্তীর সেই ষোল বছরের সঙ্গে এই চব্বিশ বছরের তফাতটা উপলব্ধির চেষ্টায় তার বিস্মিত দুই চোখ ওর সর্বাঙ্গে সাঁতার কেটে বেড়াতে লাগল। শেষে বলল, তুমি অনেক বদলেছ দেখছি—

জয়ন্তীর আগে কোনদিন ভালো লাগেনি একে—সেই ভালো লাগার বয়েসেও না। কিন্তু আজ খুব খারাপ লাগছে না। পুরুষের যে কৌতূহল আর রহস্যসন্ধানী আবেগের কথা ভাবছিল তা যেন এর চোখে আছে। জয়ন্তী হেসে জবাব দিল, তুমি তেমন বদলাওনি দেখছি।

কথায় কথায় সে কোথায় থাকে, কি করে, জয়ন্তী জেনে নিল, আর নিজেব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল।—বোম্বাইয়ের স্টুডিওর তুমি কর্তাব্যক্তি একজন? খুব ভালো কথা তো!...আমার কিছু সুবিধে-টুবিধে করতে পাবো কিনা দেখ না, এখানে আর একদিনও ভালো লাগছে না।

প্রস্তাবটা গোমেজ উপেক্ষা করল না একটুও। সমবেত চরিত্র ভূমিকায় মেয়েব দঙ্গলকে যে ভাবে ঢোকায়—সে রকম গোছের সুবিধের কোনো প্রত্যাশা নয় সেটা জয়ন্তীকে দেখেই বুঝেছে। অতএব তার প্রত্যক্ষ হাতও কিছু নেই। কিন্তু ঠিক এ রকম একটা মেয়ে সেখানে গিয়ে পড়লে সুযোগ-সুবিধে হবে না, গোমেজের তাও মনে হল না। অভিনেত্রী মনের মত হলে কর্তারা তাদেব জন্য ভূমিকা সৃষ্টি কবিয়ে নেন পর্যন্ত।

—তুমি সত্যি যাবে? অভিনয় করতে পারবে?

—কি পারব না পারব জানি না, তবে যেতে রাজি আছি।

যাবার আগে গোমেজ বলে গেল প্রস্তাবটা তার মনে থাকবে। মনে যে তার ছিল সেটা বোঝা গেল চার মাস পরের হঠাৎএক সকালে। জয়ন্তীই বরং ভুলে গিয়েছিল। বোম্বাই থেকে জয়ন্তীর নামে গোমেজের টেলিগ্রাম আর আকাশে ওড়ার জন্য টেলিগ্রাম মানিঅর্ডার দুই-ই একসঙ্গে এসে হাজির। অবিলম্বে রওনা হতে হবে, বিশেষ লোভনীয় সুযোগের সম্ভাবনা এক।

আর কেউ হলে এই সম্ভাবনার অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত কিনা সন্দেহ। কিন্তু জয়ন্তী পড়ল। কিছু যদি না-ই হয়, ফিরে আসবে আবার। যাবার খরচ পর্যন্ত যখন পাঠিয়েছে যেতে আপত্তি কি। সেই সকালেই ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে সোজা শহরে

রওনা হল জয়ন্তী; সেখান থেকে প্লেনে বোম্বাই।

গোমেজ তার প্রযোজকটিকে বলে-কয়েই রেখেছিল বোঝা গেল। আর এমনভাবেই বলেছিল যে প্রযোজকটি তার বান্ধবীকে মাদ্রাজ থেকে একবারে সশরীরে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। বোম্বাইতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোমেজ জয়ন্তীকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে প্রযোজকের কাছে উপস্থিত। পথে বারকতক জয়ন্তীকে সে শুধু বলল, আর যাই করো, ঘাবড়ে যেও না শুধু, যা জিজ্ঞাসা করবে, সাফ সাফ জবাব দেবে।

জয়ন্তী হাসছিল। শেষে না বলে পারেনি।—তা তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন?

চেহারা দেখে অন্তত প্রযোজক খুশি, পরিচালকও। ছবির নায়িকা নয়, নায়িকার পরেই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ একটা টাইপ-রোলের জন্য পছন্দসই নতুন মুখ খুঁজছিলেন। তাঁরা। এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের ভূমিকা। কোনো ভারতীয় ছেলেকে ভালবেসেছে সে—সেই ভালবাসার অকৃত্রিম আবেগ আর বিষণ্ণ-গম্ভীর আত্মত্যাগের অধ্যায়।

পরদিনই ক্যামেরা টেস্ট, ভয়েস টেস্ট হয়ে গেল। মাদ্রাজে সেই আট বছরের জীবনযাত্রার সুফল এই বোম্বাইয়ে এসে মিলল। অভিনয়ে, নিজেরই এতদিনের চাপা আবেগের উৎসটায় নাড়া পড়ল যখন সে-ও দেখাব মত হল। আবার বিষণ্ণ-গাম্ভীর্যের ভূমিকায়ও সেই আট বছর সিটিংয়ে বসার অভ্যস্ত শান্ত সহিষ্ণু সংযম সকলের বাহবা কুড়োলো।

জয়ন্তী মধুকরের নতুন জীবনের পথ প্রশস্ত।

আলাপ ক্রমশ অনেকের সঙ্গে হয়েছে। আর্ট ডাইরেক্টর রামচন্দ্রর সঙ্গেও হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপটা দিনে দিনে একটা বিশেষ খাতে গড়ানোর পিছনে আকস্মিক বা নাটকীয় ঘটনা কিছু নেই। রামচন্দ্রর কেন ভালো লেগেছে সেটা সেও ঠিক বলতে পারবে না। শুধু রূপের কারণে নয়, এখানকার আবহাওয়ায় রূপ অন্তত অনেক দেখেছে সে। মনে হয়, জয়ন্তী মধুকরের হিসেবে ভুল হয়নি। মাদ্রাজে পুরুষের চোখের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে দিয়ে সে যা খুইয়েছিল, এখানে বেশবাস আচার আচরণে নিজেকে ঘন সংযত আবরমের মধ্যে রেখে তার দ্বিগুণ পাচ্ছে। আবরণের আশ্রয় পেয়েছে আর পুরুষের চোখের রহস্যময় আশ্রয় পেয়েছে। এই পরিবেশে এটুকুই আবার বিশেষ ব্যতিক্রম, বিশেষ আকর্ষণ। রামচন্দ্র প্যাটেলের শিক্ষিত মার্জিত রুচি নিরিবিলি সান্নিধ্যেও একটা দিনের জন্যে ঘা খাযনি। তার ভালো লেগেছে। একদিন দু'দিনে হঠাৎ ভালো লাগা নয়, অনেক নীরব দেখা আর নীরব যাচাইয়ের পরে।

ভালো জয়ন্তীরও লেগেছিল। এই স্টুডিওতে অন্তত ভালো লাগার মত লোক এই একজনই। শিক্ষার রুচিতে ব্যবহারে চালচলনে। চেহারাটি মিষ্টি, হাসি হাসি—অথচ প্রগলভ নয়, বরং গম্ভীর একটু। জয়ন্তীর এক-একদিন মনে হয়েছে, নিজের অগোচরে সে এমন একজনেরই প্রতীক্ষায় ছিল এতকাল। এটা সত্যি হলে প্রতীক্ষা সার্থক।

অন্তরঙ্গতার মাঝামাঝি পর্যায়ে সে হঠাৎই একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি আর্ট ডাইরেক্টর...ছবি-টবি আঁকেন নাকি?

রামচন্দ্র হেসে মাথা নেড়েছিল। বলেছিল, কোনো এককালে আঁকতুম হয়ত, সে-সব কবে ভুলে-টুলে গেছি—এখন আমি গোটাগুটি টেকনিক্যাল ম্যান।

মনে মনে মস্ত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল জয়ন্তী।

আর একদিন কথায় কথায় বলেছিল, আমার সম্বন্ধে কিছুই তো জান না তুমি, জানা দরকার বোধ হয়—।

রামচন্দ্র নির্লিপ্ত প্রশ্ন করেছিল, কি জানা দরকার?

—আমার একটা অতীত আছে, সেটা সুখের নয়...।

লোকটাকে জানার পর কোনো গোপনতা আড়াল করে ঘর বাঁধবার কথা ভাবতে পারেনি জয়ন্তী। সেই জন্যই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। আর তার বিশ্বাস, সব শুনলেও এই লোক অশ্রদ্ধা করবে না তাকে। এত বড় ভরসা না থাকলে এত অসঙ্কোচে কথাটা বলতে পরতো না বোধ হয়।

কিন্তু বলার আর দরকারই হল না। রামচন্দ্র হেসে জবাব দিয়েছিল, এ-লাইনে অতীত নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ, তুমি আজ যা সেটুকুই সব—অতীতটা যদি সুখের না হয় সেটা বরং চোখ কান বুজে ভুলতে চেষ্টা করো তুমি। আমার শুনে কাজ নেই।

জয়ন্তীর সেদিন দুহাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধবতে ইচ্ছে করছিল রামচন্দ্রেব। কিন্তু সেটা করেনি। জয়ন্তী কিছুই করেনি। এ উচ্ছ্বাসও অনেকটা নিজেকে অনাবৃত করে দেওযাব মত হবে। জয়ন্তী অসময়ে আব তা করবে না। সে আবরণের মর্যাদা জেনেছে।

কিন্তু এরই মধ্যে রামচন্দ্রেব চাউনিটা মাঝে মাঝে জয়ন্তীর কেমন যেন লাগত। রামচন্দ্র হয়ত তাকেই দেখছে চেয়ে চেয়ে, অথচ দৃষ্টিটা কেমন অনুপস্থিত মনে হত। এ-ধরনের দৃষ্টি জয়ন্তীর প্রায় চেনা যেন। আবার নিজের মনেই হাসত সে, ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ডরায়। লোকটার হাব-ভাব দার্শনিক গোছের, ওর দিকে যে ওভাবে চেয়ে থাকে তা বোধ হয় খেয়ালও নেই। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করতে ছাড়ে না।

—কি দেখছ?

—তোমাকে। রামচন্দ্রর চমক ভাঙে।

—আমাকে দেখছ বলে তো মনে হয় না।

রামচন্দ্র মুচকি হাসে, বলে, না, তোমাকেই দেখছি।

এদিকে বিনায়ক গোমেজের সঙ্গে জয়ন্তীব ফয়েসলা অর্থাৎ বিচ্ছেদ অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। মুখ হাঁড়ি করে সে শেষ বোঝাপড়া করে নিতেই এসেছিল একদিন। লাল চোখ-জোড়া রমণী-দেহে বিঁধিয়ে দিতে চেয়েছে, তারপর বলেছে, উপকারের এই প্রতিদান শেষে?

জয়ন্তীর রাগ হলেও রাগ দেখায়নি। উপকার তো সত্যি করেছে। এতবড় উপকার ওরই হাত দিয়ে আসবে সে কি কোনোদিন ভেবেছিল? নরম করেই জবাব দিয়েছে, প্রতিদানের আশা নিয়ে উপকার করতে নেই, জানো না?

গোমেজ ঝাঁঝালো জবাব দিয়েছে, জানি, তোমার বেলায় অন্যরকম হবে ভেবেছিলাম।...মেয়ে জাতের তফাত নেই দেখছি।

জয়ন্তীর গোটা মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে করলে লোক ডেকে ঘাড় ধড়ে বার করে দিতে পারত। ইচ্ছে করলে স্টুডিও মালিকের কাছে নালিশ করে শিক্ষা দিতে পারত। কিন্তু লোকটা উপকার যে করেছে তা ভুলবে কেমন করে? রাগ করতে বরং মায়া হয়েছে তার, এই লোক মাঝে না থাকলে রামচন্দ্র-দর্শন ঘটত না...।

বলল, কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে গিলে এসেছ কিছু!

—হ্যাঁ এসেছি, গোমেজের তপ্ত জবাব, নিজের পয়সায় গিলেছি, অন্যের পয়সায় নয়, গেলে না কোন শা—

জয়ন্তীর ঠাণ্ডা চোখে চোখ পড়তে থামতে হয়েছে। মুখটা কুৎসিত দেখিয়েছে আরো। জয়ন্তী বলেছে, তাহলে ওঠো এখন।

—তার আগে আমার কথার জবাব দাও—

—কি জবাব? প্রতিদান চাও? তোমার মারফৎ কাজ পেলে তুমি কমিশন নাও শুনেছি, তাই নেবে?

গোমেজ সোজা হাত বাড়াল, তিক্ত কণ্ঠে বলল, তাই দাও। সবদিকে লোকসান হয় কেন...

জয়ন্তী উঠে খসখসিয়ে মোটা অঙ্কের চেক লিখে দিল একটা। প্রথম ছবির প্রাপ্তির বেশ বড় অংশই সেটা। টাকা দিয়ে জয়ন্তী হালকা বোধ করল বেশ। এ-লোকের কাছে অন্তত ঋণী থাকতে ইচ্ছে করে না।

চেক পকেটে পুরে গোমেজ গটগটিয়ে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যাতেই আবার এলো সে। চেকটা ফেরত দিতে গেল, কিন্তু টাকা দিয়ে ফেরত নেবার ইচ্ছে নেই জয়ন্তীর। হাত গুটিয়ে চুপচাপ তার দিকে চেয়ে বসে রইলো। গোমেজের থেকে আজ তার দৃষ্টিটা বেশি তপ্ত।

গোমেজ আবারও বলল, আজ আমি নির্জলাই এসেছি, নেশার ঝোঁকে নয়—ধরো এটা।

জয়ন্তী হাত বাড়াল না। ঈষৎ রূঢ় গম্ভীর জবাব দিল, তাও আমার দরকার ছিল না।

—কেন?

জয়ন্তী বলল, তুমি শত উপকার করলেও তোমাকে দেখলে যে আমার ঘৃণা হয় সেটা শুনলে খুশি হবে?

গোমেজ জবাব দিল, তোমার একার নয়, সকলেরই হয়। তোমাদের ঘৃণাই আমাকে আরো বেশি করে ঘৃণার রাস্তায় গড়িয়ে দিয়েছে।...আচ্ছা, নেবে না যখন এটা থাক আমার কাছে, মদের ঝোঁকে না ভাঙালে তোমাদের বিয়ের দিন এটাই না হয় উপহার দেওয়া যাবে। বিনায়ক গোমেজকে সেদিনও সকলেই মাতালই ভাববে অবশ্য—মাতাল ভাববে আর ঘৃণা করবে।

চেক পকেটে পুরে চলে গেছে। জয়ন্তীর ভিতরটা কিছুক্ষণের জন্য অন্তত নাড়া

খেয়েছিল সেই সন্ধ্যায়। এই লোকটা এ ধরনের কথাও বলত পারে ভাবেনি।

তারপর সেই একটা রাত্রি।

যে রাতে রামচন্দ্র সাগ্রহে জয়ন্তীকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল, বাড়ি-ঘর বুঝে নিতে বলেছিল। যে-রাতে আসন্ন প্রত্যাশার মুহূর্তগুলি দুজনেরই বুকের তলায় নিবিড় হয়ে উঠেছিল পলে পলে। যে-রাতে আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল জয়ন্তী, যে-রাতে খুশি উপচে উঠছিল তার চোখে-মুখে!

ঘব দেখছিল, ব্যবস্থাপত্র দেখছিল, আর সবকিছুরই খুঁটিনাটি পর্যন্ত ভালো লাগছিল তার। এরপর ওরা বসবে মুখোমুখি, দিনক্ষণ ঠিক করবে, ব্যবস্থাপত্রের কথা বলবে রামচন্দ্র—আরো কিছু বলবে বোধ হয়। জয়ন্তীর মনে হচ্ছিল সে হেসে না গড়ায়। খুশির বিড়ম্বনা এমনও হয় কে জানত!

ও-ধারেব একটা ঘব বন্ধ। বাইবে থেকে শেকল তোলা। জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করল, ওটা কিসের ঘর?

রামচন্দ্র হাসছে মৃদু মৃদু। ঘবের শেকল খুলতে খুলতে বলল, দেখবে এসো—এ-ঘরে বাইরেব কেউ কখনো ঢোকেনি, আজ তুমিই প্রথম আসছ।

ঘরটা অন্ধকাব। বামচন্দ্র আলো জ্বালল।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণান্তকব একটা ধাক্কা খেয়ে বোবাব মতো দাঁড়িযে গেল জয়ন্তী। নিমেষে নিঃসাড় পাণ্ডুব সমস্ত মুখ।

রামচন্দ্র লক্ষ্য কবল না, নিজের খুশিতে বিহ্বল সেও। বলল, অনেক দিন তুমি ঘর-কুণো বলেছ আমায়, অনুযোগ করেছ অবসব সময়ে কি কবি—দেখো কি করি। আঁকা-উঁকি অনেক কাল গেছে, এখন সময় পেলে এই সব হাতের কাজ কবি বসে, কোথা দিয়ে সময় কেটে যায় টেরও পাই না।

জয়ন্তী চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িযে। তার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত যেন। ঘবের মধ্যে হাতে গড়া ছোট-বড় নানান মূর্তি। পাখি, জন্তু, রবি ঠাকুরের আবক্ষ মূর্তি, প্রমাণ আকারের নারীমূর্তিও গোটা দুই। রামচন্দ্র পকেট থেকে রুমাল বার কবে সযত্নে মূর্তিগুলো ঝাড়া-মোছা করতে লেগে গেল।

জয়ন্তী নিজেব অগোচরে পায়ে পায়ে অর্ধ-নগ্ন নারীমূর্তি দুটোর দিকে এগোলে। দেখছে সেই রেখাবিন্যাসেব অপটু চেষ্টা, সেই গঠন আব ফর্ম আবিষ্কারের চেষ্টা, নারীব যৌবনকে সেই আকাব আর অভিব্যক্তিব কাঠামোয় বন্দী করার চেষ্টা। তড়িৎস্পৃষ্টের মত হঠাৎই কি মনে পড়ল জয়ন্তীব। রামচন্দ্র অন্যমনস্কের মত মাঝে মাঝে কি দেখত তার দিকে চেয়ে? কি খুঁজত? তাব সে চাউনি চেনা মনে হত কেন তার?

রামচন্দ্র এগিয়ে এলো। জয়ন্তীকে নির্নিমেষে নারীমূর্তিব দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সলজ্জ হেসে বলল, কিছুই হয়নি, মন থেকে গড়েছি, হবে কেমন করে। আমি আর মডেল পাব কোথায় বলো—

হাসি মুখেই জয়ন্তীর দিকে চেয়েছিল রামচন্দ্র। ভেবেছিল, তার হাতের কাজ দেখেই জয়ন্তী অমন বিস্ময়ে নির্বাক বুঝি। কিন্তু জয়ন্তীর মনে হয়েছিল এ চাউনিটাও প্রায় সেই চাউনিই, প্রায় সেই রকমই। তার মধ্যে মডেলের আভাস দেখেছে সে।

আজ পুরোপুরি না দেখুক, কাল দেখবে—আর একদিন দেখবে। দেখবেই। অনাবৃত করে দেখবে, সব রোমাঞ্চ খুইয়ে দেখবে, শেষে রেখায় আর আকারে বন্দী করবে ওকে।

ঘরের মধ্যে যেন দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম জয়ন্তীর। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দাঁড়াতেও পারছে না, পা দুটো কাঁপছে থরথরিয়ে। বসে পড়ল।

এতক্ষণে খেয়াল হল রামচন্দ্রের, কিছু একটা ঘটেছে। ঘাবড়েই গেল, তারপর ডাক্তার ডাকতে চাইল। তার বদলে জয়ন্তী ট্যাক্সি ডাকতে বলল। বিমূঢ় রামচন্দ্রকে কিছু বোঝবার অবকাশ না দিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে চলে গেল।

ট্যাক্সি ছুটেছে।

রূপসী আরোহিণীর ঈষৎ অসহিষ্ণু নরম তাগিদে যতটা সম্ভব বেগে ট্যাক্সি ছুটিয়েছে ট্যাক্সিওয়ালা। কিন্তু জয়ন্তীর তাতেও মন উঠছিল না। ভিতরটা তার বাঁচার তাগিদে ছুটছে।...সে ফর্ম নয়, সে অনাবৃত যৌবনের কতকগুলো রেখা নয়, সে আকার আর গঠনের স্তূপ নয় একটা—নিষ্প্রাণ অবজেক্ট নয়।

নয় যে, মনেপ্রাণে সেটা অনুভব করার জন্যেই এত ছোটার তাড়া জয়ন্তীর।

যযাতি

তেমাথার মস্ত দোতলা বাড়িটা তিনটে রাস্তারই অনেক দূর দূর থেকে দেখা যায়।

তবে চিন্তাহরণ মুখুজ্যের মত রোজই প্রায় অতক্ষণ ধরে বাড়িটা আর কেউ দেখে না হয়ত। চিন্তাহরণবাবুও আগে দেখতেন না। কিছুকাল যাবৎ দেখছেন। রাতের অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি নির্জনে নিজের ভাঙা একতলা বাড়ির সামনের বালি-চটা এবড়োখেবড়ো ফালি-বারান্দায় বসে অন্যমনস্কের মত এক একদিন কতক্ষণ যে নিষ্পলক চেয়ে থাকেন দূরের ওই বাড়িটার দিকে, নিজেরই হুঁশ থাকে না। হুঁশ হয়, যখন ছানিকাটা চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করে।

মোড়ের মাথায় অর্থাৎ ওই বাড়িটার গায়ে সমস্ত রাত করপোরেশনের জোরালো আলো জ্বলে একটা। রাতে তাই টকটকে লাল বাড়িটা তকতকে দেখায় আরো। তার জলুস বাড়ে। চিন্তাহরণবাবুর অতদূর চোখ চলে না। তিনি যে ঠিক চোখ দিয়ে দেখেন তাও নয়। কতকাল আছেন এখানে সেটা এখন হিসেবের ব্যাপার। এদিকে তাকালেই সব কিছু গোটাগুটি চোখে পড়ে তাঁর।

বাড়ির গায়ে সকাল-সন্ধ্যা সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে উৎসব বুঝি কিছু। উৎসব নয়, রোজই ওইরকম গাড়ির ভিড় লেগে আছে। এক-একদিন তো কাছাকাছি গাড়ি ভিড়ানো যায় না।...ভাগ্যদেবীর শ্রীমুখখানি বোধ হয় দ্রৌপদীর বস্ত্রের ওড়নায় ঢাকা। যত খোলো যত টানো আবরণ পড়েই আছে। হাজার দেখলেও দেখা হয়ে ওঠে না, না-দেখার যাতনা যায় না, শঙ্কা সরে না। কিন্তু একজন পারেন সেই আবরণ সরাতে। সরিয়ে দেখতে। যে সেখানে আছে সক্কলের হয়ে দেখতে। এই লাল বাড়ির মালিক গোলক জ্যোতির্বাগীশ পারেন। কুসারী ছিলেন।

এখন কুসারী বললে কেউ চিনবে না। ওই জ্যোতির্বাগীশ পারেন আবরণ সরাতে। তাঁর হিসেব-নিকেশ বিচার-বিশ্লেষণ আঁকি-বুকির ছকের মুখে পড়লে ভাগ্যাঙ্গনার অবগুণ্ঠন খসে। তিনি দেখেন। দেখে বলে দেন। যে যেমন মাশুল গোনে তার হয়ে তেমন করে দেখেন, তেমন করে বলেন। বিশ্বাস ব্যাপারটা ছোঁয়াচে। একের বিশ্বাস তিনে বিস্তার। বিস্তারের পরিধিটা বাড়ছেই। লোকে দিশেহারার মত ছুটে আসে, সশঙ্কে আসে, আশার তাড়নায় আসে। বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী—বিদেশীও আসে।

লোকের ওই ভাগ্যান্বেষী বিশ্বাসটুকুই মূলধন।

সে মূলধনের জোর কত ওই বাড়িটাই নজির তার। ওখানে গোরু-মোষের খাটাল ছিল এককালে। চিন্তাহরণবাবুর চোখে ভাসে এখনো। খাটাল গিয়ে সেখানে পাকা-ভিতের ঘর উঠেছিল একসারি। তারই দুখানা ঘর নিয়ে সপরিবারে থাকতেন গোলকভূষণ কুসারী। কত দিনের কথা আর...চল্লিশ বছরও নয়। কিন্তু তখনই নিজের ললাট-লিপিটি যেন আদ্যোপান্ত পাঠ করে রেখেছিলেন তিনি। স্থিব বিশ্বাসে বলতেন—এ-রকম দিন থাকবে না, দেখে নিও।

থাকে নি। দুখানা ঘরের সঙ্গে আরো দুখানা ঘব নিজস্ব হয়েছে জ্যোতির্বাগীশের। তাবপর সেই চারখানা ঘরের জায়গায় একতলা পাকা দালান উঠেছে। তাবপব আশপাশের সবটা জায়গার মলিকানা হাতে এসেছে। তারপব আবার সবকিছু ভেঙেচুবে সবটা জায়গা জুড়ে এই নতুন দালান উঠেছে।

চিন্তাহরণবাবু ঈর্ষা করেন না। শিক্ষিত মানুষ, সরকারী পেনসন পাচ্ছেন। ঈর্ষা করতে ঘৃণা কবেন। তাছাড়া গোলক কুসারী তাঁর বাল্যবন্ধু, সহপাঠী। টাকায় হোক বা বয়সের দরুন হোক মেজাজ একটু খিটখিটে হয়ে উঠলেও লোকটার একটুও নিন্দা করতে পারেন না চিন্তাহরণবাবু। আর যে দেমাকই থাক, টাকার দেমাক অন্তত নেই। এখনো প্রায় আগের মতই বন্ধুবৎসল। পুরনো বন্ধুদের কাউকে হেলাফেলা করেন না। রাত সাড়ে আটটার পর তামাক সহযোগে মহাভারতের আড্ডাটা টাকার লোভে ঘুচিয়ে দেননি এখনো। সাড়ে আটটার পর নিযমিত সেই আড্ডা আজও বসে। দপ্তর বদলেছে, দপ্তরের সাজ-সরঞ্জামের অনেক উন্নতি হয়েছে—আড্ডা বদলায়নি, আড্ডাব লোকগুলো বদলায়নি, সের সের তামাক বদলে সিগারেট আসেনি।

সাড়ে আটটার পরে কাগজে আব একটাও ছক আঁকেন না জ্যোতির্বাগীশ, একটাও কোষ্ঠী ওলটান না। বাইবের লোক থাকলে পরের দিনের প্রত্যাশা নিয়ে উঠে যেতে হয় তাঁকে। দপ্তরে বিপুলাকার মহাভারত আছে একখানা। তকতকে আলমারী থেকে সেটা বার করে আনা হয়। বন্ধুদের দু'তিনজন পালা করে পড়েন। পালা কবে আর সুর করে। আজ যে পর্যন্ত পড়া হল কাল তার পর থেকে। দরজার কাছে একটা চাকর মোতায়েন—সে মুহুর্মুহু তামাক সাজে। তামাক পোড়ে আর মহাভারত চলে। চলে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত। কোনো অংশ নিয়ে আলোচনা উঠলে পড়া অবশ্য বেশিদূর এগোয় না। আলোচনাটাই সরগরম হয়ে উঠে। অর্ধ-শ্রান্ত জ্যোতির্বাগীশ কথা বেশি বলেন না। মেজাজ অপ্রসন্ন থাকলে ফরফর করে তামাক টানেন, আর শোনেন। প্রসন্ন থাকলে গুড়গুড়িয়ে তামাক টানেন, মিমিমিটি হাসেন আর শোনেন। দশটার বেশ আগে থেকেই অবশ্য একজন একজন করে ওঠা শুরু হয়। যে দুচারজন রাতের আহার

সেরে আসেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত থাকেন। আসর ভাঙলে ওপরে উঠে জ্যোতির্বাগীশ ঠাকুরঘরে মিনিট দশ-পনের জপতপ করেন বসে। হাত মুখ ধোয়ার কাজটা মহাভারত-পর্বের ফাঁকেই সেরে রাখেন। জপ শেষ হলে একবাটি দুধ আর একটা সন্দেশ খেয়ে শুয়ে পড়েন। এতেই শরীর এই বয়সেও সক্কলের থেকে মজবুত তাঁর।

ঈর্ষা নয়। চিন্তাহরণবাবু ঈর্ষা একটুও করেন না।...ওই লাল বাড়িটা চিন্তাহরণবাবুর শান্তি হরণ করেছে। চোখের ঘুম কেড়েছে। সেটা কেউ জানে না। এমন কি জ্যোতির্বাগীশ নিজেও না।

চিন্তাহরণবাবুর বয়েস আটষট্টি এখন। আটষট্টির গোড়ার দিক। চেষ্টাচরিত্র করে ঊনসত্তরের গোড়ার দিকটা পর্যন্ত দেখতে পান তিনি। তারপর সব শূন্য, সব ঝাপসা, সব কালো, সব অন্ধকার। মাথা খুঁড়েও চিন্তাহরণবাবু আর তার পরের হদিস পান না কিছু। তাঁর বাড়ির পাশের বড় রাস্তাটা ধরে খানিক এগোলে শ্মশান। সমস্ত দিনে কম শব যায় না দুদিকের দুই রাস্তা ধরে। হরিবোলধ্বনি কান-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। রাতে ঘুম ভাঙা দূরে থাক, জেগে থাকলেও সব সময় কানে যেত না। আজকাল ঘুম ভাঙে, কানে যায়। শ্মশানটা কাছে মনে হয়। দাহ-ধোয়ার গন্ধও যেন থেকে থেকে নাকে আসে। মাঝখানের চল্লিশটা বছর তার নিজের চোখেই ধুলো দিয়ে বড় বেশি তাড়াতাড়ি কেটে গেল মনে হয়।

এতদিনের কথা, জ্যোতির্বাগীশের মনেও নেই নিশ্চয়। মনে থাকার কথাও নয়। চিন্তাহরণবাবু নিজেও তো ভুলে গিয়েছিলেন।

চল্লিশ বছর আগে হাত বা কোষ্ঠী গছাতে হত না গোলক কুসারীকে। নিজে থেকেই সাগ্রহে দেখতেন। তার দেখেছিলেন। কি বলেছিলেন না বলেছিলেন সব মনে নেই। কতটা মিলেছে কতটা মেলেনি তাও মনে নেই। পরে আরো কতবার আপদে বিপদে হাত দেখেছেন, কোষ্ঠী দেখেছেন—এটাসেটা বলে দিয়েছেন। কিন্তু সব ছেড়ে প্রথমবারের একটা হালকা প্রসঙ্গ মনের তলায় এভাবে খোদাই হয়ে থাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবেননি চিন্তাহরণবাবু।

চল্লিশ বছর আগের সেইদিন সব দেখা হতে চিন্তাহরণবাবু ঠাট্টার সুরেই বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ তো একেবারে ঝরঝরে করে দিলে দেখি, এখন আয়ুটা কেমন দেখো তো।

গোলক কুসারী মনোনিবেশ সহকারে চোখে ঠুলি-কাচ লাগিয়ে আবারও হাত দেখেছিলেন, তারপর কোষ্ঠীর ছক খুলে হিসেবপত্র করে বলেছিলেন, ঊনসত্তরের মাঝামাঝি।

চিন্তাহরণবাবুর মনে চিন্তার একটা রেখাও পড়েনি সেদিন, হাসিমুখে হিসেব করেছিলেন বরং—একচল্লিশ বছর আরো। হালকা মন্তব্য করেছিলেন, অনেককালের ভোগান্তি দেখছি।

আটষট্টির শুরুতেই এতকাল আগের ভবিষ্যদ্বাণীটা মনে পড়ে গেল। প্রথম প্রথম আমল দিতে চাননি। মনে পড়লে অস্বস্তি কেমন। তাই মন থেকে ঠেলে দিতেই চেয়েছেন। কিন্তু ঘুরে ফিরে মনে পড়তেই লাগল। মনের ভিতরে কেটে কেটে বসতে

লাগল। যত দিন যায়, ঘুম কমছে। আহারে রুচি কমে যাচ্ছে—আগে বেশ খেতে পারতেন, এখন ভিতরে ভিতরে তার অষ্টপ্রহর একটা হিসেবনিকেশ চলছে। একজনের ভুল ধরার হিসেব। ভুল স্মরণ করার চেষ্টা। সামনা-সামনি তা নিয়ে কিছু বলার সাহস নেই। কারণ গোলক আর কুসারী নয়, নামজাদা জ্যোতির্বাগীশ। তারাও এখন জ্যোতির্বাগীশ বলেই ডাকেন। আর বলতে যাওয়ার দরকারই বা কি। তিনি জব্দ করতে চান না, ভুল ধরে বা ভুল স্মরণ করে নিশ্চিন্ত বোধ করতে চান। কিন্তু ভুলগুলো কমই মনে পড়ে। মনে পড়েই না। সে চেষ্টা করতে গেলে উল্টে লোকটার অগুনতি ফলিত-কেরামতিগুলোই চোখের সামনে ভিড় করে আসে।

বলো হরি হরিবোল—

শব্দটা পাড়ার দিক থেকে এলেই টুকটুক করে চিন্তাহরণবাবু বাইরের বারান্দায় এসে দাড়াবেন। মাঝরাতে হোক বা দিন দুপুরে হোক। চেনা লোক দেখলেই জিজ্ঞাসা করবেন, কে গেল?

এতকালের নিবাস, গোটা এলাকায় কটাই বা অচেনা বাড়ি আছে? আর এলাকার বয়স্কদের মধ্যে ক'জনই বা জ্যোতির্বাগীশকে হাত আর কোষ্ঠী দেখানোর লোভ সংবরণ করতে পেরেছে? অবশ্য গোলক জ্যোতির্বাগীশ সেই চল্লিশ বছর আগের মত ভয়ের ব্যাপারগুলো অমন ঠাসঠাস করে মুখের ওপর বলে দেন না এখন। লোকে ঘাবড়ে গেলে পসারের ক্ষতি তবে রাগলে বলেন। কেউ স্থূলভাবে অবিশ্বাস করছে দেখলে বলেন। তার জ্যোতিষী নিয়ে কারো কোনো সংশয় সহ্য হয় না।

শব-বাহকদের কেউ জবাব দেয়, ওমুক বাড়ির ওমুকে গেলেন—

এলাকার লোক হলে ওমুক বাড়ির ওমুককে নিয়ে মহাভারত পর্বের আগে খানিকটা ছেদ পড়ে সেদিন। তাকে নিয়ে একটু আধটু আলোচনা হয়। আলোচনার সূত্রপাতটা চিন্তাহরণবাবুই করেন। প্রায়ই দেখা যায় ওমুক বাড়ির ওমুকের এই সময়টা যে খারাপ জ্যোতির্বাগীশ তা বহুদিন আগেই বলে দিয়েছিলেন। আলমারিতে খেরোয় বাধানো মোটা মোটা খাতা আছে কতগুলো বেশি কথা উঠলে তারই একখানা টেনে নিয়ে ওমুক বাড়ির ওমুকের নামধামও দেখিয়ে দেন তিনি। খারাপ সময়ের নিশানা দেখান।

কিছুদিন আগেও এমনি একটা ব্যাপার ঘটেছিল। পাড়ারই একজন সুপরিচিত বৃদ্ধ চোখ বুজেছিলেন। জ্যোতির্বাগীশ একটা নতুন লাল খাতা টেনে নিয়ে তার খারাপ সময়ের লালদাগ কাটা ইঙ্গিতটাসুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

কি জানি হয়েছিল চিন্তাহরণবাবুর সেদিন বলে বসেছিলেন, তোমার নিজের কোষ্ঠীটা ভালো করে বিচার-টিচার করে রেখেছ তো হে?

সকলে হেসেছিলেন। গড়গড়ার নল মুখে জ্যোতির্বাগীশও মুখ টিপে হাসছিলেন। —কি মনে হয়, দেখিনি?

না, ওই পরমায়ু দেখে রাখার কথাটা বলছিলাম—। চিন্তাহরণবাবুর হাল্কা উক্তির মধ্যে চাপা ব্যঙ্গের ধার ছিল, অসহিষ্ণুতা ছিল। কিন্তু সে-শুধু তিনিই জানেন।

জ্যোতিষী প্রসঙ্গ উঠলে অনেক সময়ে অনেক অদ্ভুত উপমা দেন জ্যোতির্বাগীশ। দিয়ে মুখবন্ধ করেন সকলের। চুপচাপ খানিক গুড়গুড় করে তামাক টেনে ফস করে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, এই যে তুমি আমাকে দেখছ, এদের দেখছ, রাস্তার এত

লোক দেখছ—সকলের নাক চোখ মুখ কান আলাদা করে দেখো?

চিন্তাহরণবাবু সঠিক না বুঝেই মাথা নেড়েছেন, আলাদা করে দেখেন না, গোটাগুটি দেখেন।

কারো ওগুলোর একটা না থাকলে বা তেমন খুঁত থাকলে তোমার আপনিই সেটা চোখে পড়ে, না পড়ে না?

চিন্তাহরণবাবু আবারও মাথা নেড়েছেন, পড়ে—।

তবে?

অর্থাৎ নিজের পরমায়ুতে খুঁত থাকলে আপনিই সেটা চোখে পড়বে। খুঁত নেই।

সেই রাতে ঘুম এক-রকম হয়-ই নি চিন্তাহরণবাবুর। একজন তাঁর নিখুঁত লম্বা পরমায়ুর জোরে নিশ্চিন্ত। আর তার সামনে ক'টা মাসের ওধারে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কল্পান্ত...। একটা করে দিন যায়, শ্মশানটা যেন কাছে এগিয়ে আসে, চিতার ধোঁয়া আরো বেশি নাকে এসে লাগে।

গোপনে একদিন খানিকটা দুশ্চিন্তা প্রকাশই করে ফেলেছিলেন জ্যোতির্বাগীশের কাছে।—শরীরটা বড় ভালো যাচ্ছে না হে, এখনো ওই পেনসনটুকুই বাড়ির অর্ধেক ভরসা, নইলে নিজের জন্যে আর ভাবনা কি ছিল—

বন্ধু আশ্বাস দিয়েছিলেন, এসো একদিন, দেখে দেব—

কিন্তু চিন্তাহরণবাবু সে-ভাবে যেতে পারেন নি। গেলে বন্ধুবৎসল লোকটা দেখে দেবে, আশ্বাস দেবে, সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু চিন্তাহরণবাবু আশ্বাস চান না, সান্ত্বনা চান না, এমন কি পরমায়ুও চান না হয়ত। সত্যি যা তাই শুধু নিঃসংশয়ে জেনে নিতে চান, নিশ্চিন্ত হতে চান—শান্তি চান। কিন্তু সেই সত্যি কথাটাই গোলক আর কিছুতে বলবে না।...বলবে, তিনি চোখ বুজলে...বলবে মহাভারতপর্বের আর সকলের কাছে। গুড়গুড় করে তামাক টানবে, তারপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করবে, এটা তার জানাই ছিল।

কিন্তু ওই লাল বাড়িটা ঘিরে এমন এক মানসিক আলোড়নের সূচনা হবে কেউ ভাবেন নি। চিন্তাহরণবাবু না, বন্ধুরাও না। সন্ধ্যের মধ্যে বার দুই বাড়িটার কাছাকাছি এসে ঘুরে গেছেন চিন্তাহরণবাবু। বাইরে থেকে দেখলে কোনো ব্যতিক্রম চোখে পড়বে না। সেই চিরাচরিত গাড়ির ভিড়, লোকের ভিড়। জ্যোতির্বাগীশ তেমনি ঠাণ্ডা মুখে আজও হাত দেখছেন, কোষ্ঠী দেখছেন হয়ত। চিন্তাহরণবাবু খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সেই থেকে এদিকেই চেয়ে আছেন। শরীর ভালো না, মহাভারতের আসর প্রায়ই কামাই যাচ্ছে আজকাল। গতকাল এসেছিলেন—জ্যোতির্বাগীশের মেয়ের সনির্বন্ধ আকূতি ঠেলতে পারেননি বলে। আজ নিজে থেকেই এসে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'চোখ জ্বালা জ্বালা করছে।...ওই দুধের শিশুর সত্যি অঘটন যদি হয়ে বসে কিছু, জ্যোতির্বাগিশী বার করবেন তিনি—বন্ধু বলে ছেড়ে কথা কইবেন না।

ওই বাড়িতে একটা শিশুর ঘোরালো অসুখ। জ্যোতির্বাগীশের মেয়ের তিনবছরের ছেলেটার। টাইফয়েড, সঙ্গে আরো কি। আজ আঠের দিন হল ভুগছে। সময়ে সুচিকিৎসা হয়নি। টাকার অভাবে নয়—টাকা মেয়েরও আছে, মেয়ের বাপেরও আছে। হয়নি গাফিলতির দরুন। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার নিশ্চিন্ত আশ্বাসের ফলে। বাপের কথায় তাঁর

ছেলেমেয়ের অন্ধ বিশ্বাস। মেয়ের বাবা অনেক আগেই নাতির কোষ্ঠী বিচার করে বলে রেখেছিলেন, দীর্ঘায়ু, বিত্তবান, কৃতী হবে নাতিটি তাঁর। গত সপ্তাহে অসুখটা ঘোরালো হয়ে পড়তে আবারও তার ছক নিয়ে কোষ্ঠী নিয়ে বসেছিলেন তিনি। দেখে মেয়েকে অভয় দিয়েছেন, কিছু ভাবিস না, সেরে যাবে—কিছু হতেই পারে না। বাপ বলেছে হতে পারে না, হবে কেমন করে? অবশ্য ডাক্তার দেখেছে, এখন তো বড় বড় ডাক্তারেরই আনাগোনা চলছে। কিন্তু সময়ে যতটা হওয়া উচিত ছিল—হয়নি। হয়নি যে সে অনুশোচনা সক্কলের, এমন কি আসরের বন্ধুদেরও। অনুশোচনা নেই শুধু জ্যোতির্বাণীশের। তিনি নিশ্চিন্ত, কিচ্ছু হবে না। সত্যি নিশ্চিন্ত কিনা চিন্তাহরণবাবুরা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেন না।

চিন্তাহরণবাবু চমকে উঠলেন হঠাৎ। ছানিকাটা চোখ দুটো নিজেরই অন্দরমহলে ফেলে দিয়ে অসহিষ্ণুতায় হাতড়ে বেড়াচ্ছেন কি। কী? সেখানে কেউ চাইছে না তো অঘটন ঘটুক? জ্যোতির্বাণীশের ভুল হোক—একটা বড় নিশ্চিন্ততার কারণ ঘটুক? রাস্তার কোণে দাঁড়িয়েই সবেগে মাথা নাড়লেন চিন্তাহরণবাবু। না, কক্ষনো না। কেউ তা চাইছে না। মেয়েটার আকুতিতে কাল তিনি ওই শিশুর কল্যাণে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করে এসেছেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি, নিষ্ঠাসহকারেই কাজ করেছেন। কাল সকালে ছেলেটা চোখ উল্টে দিয়েছিল। বাপের 'কিচ্ছু হবে না' শুনেও মেয়ের মন—মায়ের মন ঠাণ্ডা হয়নি। ডাক্তারদের গম্ভীর মুখ তার আতঙ্কের কারণ হয়েছে। ছেলের কাছ থেকে আড়ালে সরে গিয়ে কেঁদে কেঁদে এসেছে। তাকে দেখে পা জড়িয়ে ধরেছে, কাকাবাবু, কিছু করুন—।

কিছু করেছেন

সাধ্যমতই করেছেন তিনি কেউ বলবে না মনের কোণেও কোনো ফাঁকি ছিল চিন্তাহরণবাবুর। কোন ক্রুর অভিলাষ ছিল। মেয়েটাকে ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করতেন তিনি। সেই যখন ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যেত তখন থেকে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। মেয়েটা যখন একগাদা বই বুকে করে কলেজে যেত—পাড়ার অনেক ভালো ভালো ঘরের ছেলেছোকরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরুতো, নিস্পৃহ চরণে দূর থেকে সঙ্গ নিত। কিছুই নজর এড়াতো না চিন্তাহরণবাবুর। নিজের ছেলের আচরণও না। তাকেও ওই ঘড়িধরা সময়ে উসখুস করতে দেখা যেত, ফাক পেলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত। তার ছেলে তখন সরকারী অফিসের কেরানী। অবস্থার দিক বিচার করতে গেলে বামনের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর মত। কিন্তু অন্য বিচারও আছে। কুলীন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তিনি, বংশমর্যাদা কম নয়, তার ওপর মেয়ের বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কেরানী ছেলের জন্যে মুখ ফুটে মেয়েটিকে চেয়েই বসেছিলেন তিনি। অবশ্য খুব হালকা করেই বলেছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েটাকে আমার ঘরে দেবে নাকি হে?

গড়গড়ার নল মুখে অল্প অল্প হেসেছিলেন জ্যোতির্বাণীশ। তারপর বলেছিলেন, ওর ভবিতব্য অন্যরকম যে হে—দেখে রেখেছি।

চিন্তাহরণবাবু একটুও ক্ষুব্ধ হননি। তখনকার মত একটু দুঃখিত হলেও সে দুঃখ আর নেই। মেয়ের ভবিতব্য অন্যরকম যে, নিজের চোখেই তা দেখেছেন। মস্ত ঘরের পাসকরা ডাক্তার জামাই এসেছে। জাকজমক করে বিয়ে হয়েছে। গেল বছর জামাই

বিলেত গেল আরো বড় কিছু হয়ে আসতে। এই একটা বছর মেয়ে বাপের কাছেই আছে বেশির ভাগ। মেয়েটার লক্ষ্মীশ্রী। চিন্তাহরণবাবু আজও মনে মনে স্নেহ করেন তাকে। এমন সর্বনাশা চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই দিতে পারেন তিনি? কখখনো না। কথাটা মনে এলো বলেই নিজের ওপর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ তিনি।

সাড়ে আটটা বাজে বোধ হয়। গাড়িগুলো কখন একে একে চলে গেছে। বাইরের লোকও আর নেই মনে হয়। পায়ে পায়ে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি।

মহাভারত পড়া শুরু হয়ে গেছে। গড়গড়ার নলটা জ্যোতির্বাণীশের হাতে। গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। ঈষৎ অন্যমনস্কও। চিন্তাহরণবাবু ইশারায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন?

একরকমই। সংক্ষিপ্ত বিরক্তিসূচক জবাব দিয়ে মহাভারত শ্রবণে মন দিলেন তিনি। ফর্সা মুখ লালচে দেখাচ্ছে।

কিন্তু মহাভারতে মন বসছে না কারো। যিনি পড়ছেন তারও না, যারা শুনছেন তাঁদেরও না। ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তি থিতিয়ে আছে।

চিন্তাহরণবাবু বলেই বসলেন, আজ থাক না, বাড়িতে এ রকম

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বাণীশের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যেন। অস্বাভাবিক রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, বলছি তো কিচ্ছু হবে না—কিছু হতে পারে না। কেন তোমরা এ-নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ? কেন বাড়াবাড়ি করছ?

পড়া চলল। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। জ্যোতির্বাণীশ নিজেই অন্যমনস্ক। সকলেই সেটা উপলব্ধি করছেন। গড়াগড়ার নলটা ঠোঁটে ঠেকছে না। ভিতরে ভিতরে কিছু একটা হিসেবনিকেশ চলেছে। ফর্সা মুখ থেকে থেকে আরো লাল হয়ে উঠছে।

বন্ধুরা এক একটা অছিলায় অনেক আগেই বিদায় নিলেন। চিন্তাহরণবাবু জ্যোতির্বাণীশের পিছন পিছন ওপরে উঠলেন। সমস্ত দোতলাটা থমথমে। কোণের একটা ঘরে নীল আলো জ্বলছে। সেই ঘরে রোগী। বারান্দায় একটা চেয়ারে ডাক্তার বসে। বড় ডাক্তারের একজন আস্থাভাজন সহকারী ডাক্তার গতকাল থেকে এখানেই আছেন।

জ্যোতির্বাণীশ শানিত দৃষ্টি মেলে স্তব্ধ পরিবেশটা দেখে নিলেন। তারপর পজোর ঘরে নিয়মিত রাতের জপ করতে ঢুকলেন।

চিন্তাহরণবাবু পায়ে পায়ে নেমে এলেন আবার

বলো হরি হরিবোল।

ধড়মড়িয়ে শয্যায় উঠে বসলেন চিন্তাহরণবাবু। বহুক্ষণের ছটফটানির পর এই মাত্র চোখ দুটো লেগে এসেছিল মনে হল। কিন্তু না, পূবের আকাশে প্রায় ভোরের আভাস। হরিধ্বনিটা পাড়ার দিক থেকেই যেন ।

তাই। হন্তদন্ত হয়ে দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন চিন্তাহরণবাবু সর্বাঙ্গে কাঁপুনি। কারা আসছে? লালবাড়ির দিক থেকেই তো। তবে কি হয়ে গেল। ছানিকাটা চোখের সমস্ত জ্যোতি দিয়ে আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তিনি। ওই তো মুকুন্দ আসছে আগে আগে হনহনিয়ে। পাড়ার এক চেটিয়া শ্মশান-বন্ধু মুকুন্দ।

কে গেল মুকুন্দ?

জ্যোতির্বাগীশ মশাই।

জবাবটা দিয়ে মুকুন্দ সামনে এসে দাড়াল।—ওর মেয়ে বার বার আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন, একবার নামাতে বলি।

দেহ নিয়ে যারা আসছে তখনো তারা দূরে খানিকটা। মুকুন্দ তাকে ডাকার জন্যেই আগে আগে আসছিল। চিন্তাহরণবাবু চিত্রার্পিতের মত দাড়িয়ে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন শুধু। মুকুন্দ ভুল করছে কিনা, বুঝছেন না।

মুকুন্দ বলল, একেই বলে ভাগ্যবানের মৃত্যু। জপে বসেছিলেন, প্রণাম করার জন্য মাথা নামিয়েছিলেন—আর মাথা তোলেননি। সব শেষ। রাত সাড়ে ন'টায় গেছেন, বাসী করতে নেই বলে একটু রাত থাকতে বেরুনো—

দেহ নামানো হল। হরিধ্বনি দিয়ে আবার তুলে নিয়ে চলে গেল ওরা। চিন্তাহরণবাবুর হুশ নেই।

হুশ ফিরল। দাড়াতে কষ্ট হচ্ছে। রাজ্যের ঘুম যেন তাড়া করছে তাকে। চিন্তাহরণবাবু ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালেন। তাকে একটা আয়না ছিল, তার সামনে গিয়ে দাড়ালেন চোখ টান করে তাকালেন। নাক মুখ চোখ কান আলাদা করে দেখেন না কিছু, কোনো একটা না থাকলে বা খুঁত থাকলে জ্যোতির্বাগীশের ও ঠিক তেমনি চোখে পড়ে। কিন্তু চোখে পড়েনি। জ্যোতির্বাগীশের ভুল হয়েছিল। ভুলও হয়।

চোখ দুটো আর খোলা রাখতে পারছেন না চিন্তাহরণবাবু। আশ্চয। আলোটা নিবিয়ে দিলেন। বিছানায় গা ছেড়ে না দিয়ে পারলেন না। আধবোজা অবস্থাতেই কান খাড়া করতে চেষ্টা করলেন। হরিধ্বনি তো আর কানে আসছে না। দূরে চলে গেছে বোধহয়। একেবারে খুব কাছে তো নয় শ্মশান। ভোরের দিকের বাতাসটা মিষ্টি তরতাজা লাগছে। গোলক বাল্যবন্ধু সহপাঠী এভাবে চলে গেল বুকটা ফেটে যাবার কথা যাচ্ছেও হয়ত ঘুম ঠেলে কিছুই।

শেষবারের মত ঘুম ঠেলে নিজেকে চোখ রাঙিয়ে আচমকা শোকটা অনুভব করতে চেষ্টা করলেন চিন্তাহরণবাবু।

পরক্ষণে ঘুমিয়ে পড়লেন। অঘোরে ঘুমুতে লাগলেন।

সঙ

সেদিন আর ভজন শোনা হল না। আমি ভক্ত না হলেও এত বড় পাষণ্ড নই যে, আশ্রমের এমন এক সমাহিত পরিবেশের মধ্যে বসেও ভক্তি রস না হোক গানের রসের ছিটেফোটাও বুকের কোথাও এসে লাগবে না। গান শুনতেই আসা, শোনার মত গান হয় শুনে আসা। না কলকাতা থেকে ন'শ মাইল ছাড়িয়ে হরিদ্বারের এই আশ্রমে বসে এই মুহূর্তে অন্তত আমি কোন জাগতিক চিন্তার মধ্যে ডুবে যাই নি। আমি অর্থচিন্তা করেছিলাম না, ঘর-সংসার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথাও ভাবছিলাম না।

আশ্রমের পিতা মহারাজ আমায় সকালে এসে সমবেত ভজন শোনার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি গান শুনতেই এসেছিলাম, শুনছিলামও বেশ।

কিন্তু একটু বাদেই গণ্ডগোল হয়ে গেল কেমন।

আমার কি এত ভুল হচ্ছে চোখের। স্মরণ-শক্তি এত ঘুলিয়ে গেল।

লোকটিও দেখেছে আমাকে। আর সকলে যেমন দেখেছে তেমনি। তার দিকে চেয়ে আছি দেখে পরে নিরাসক্ত মুখে দুই-একবার তাকিয়েছে মাত্র। তার পর ভজনের সমবেত সুরে গলা মিশিয়েছে।

তবু চেয়েই আছি হতভম্বের মত। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, খাটো গেরুয়া বসন লুঙ্গির মত জড়ানো, গায়ে হাতকাটা খাটো ফতুয়া, গলায় কণ্ঠি, কপালে বড়সড় শাদা চন্দনের ফোটা একটা, মাথায় চুল আগাগোড়া সমান করে কাটা। এত ছোট করে যে চিরুনি চলে না। বয়স ষাটের কাছাকাছি।

চেয়ে আছি বটে, কিন্তু আসল দৃষ্টিটা আমার এই আশ্রম ছাড়িয়ে, এই হরিদ্বার ছাড়িয়ে, বহু দূরে উধাও। কলকাতায়। জনাকীর্ণ বড়বাজারের সরু রাস্তার ওপর আলো-হাওয়া বন্ধ ছোট একটা গুদোমঘরের মত ঘরের মধ্যে। মশলার আড়ত। লঙ্কা হলুদ ধনে জিরে দারচিনি ছোটএলাচ গোলমরিচ—যাবতীয় কিছু। ঘর ঠাসা। নমুনা দেখানো আর টাকা পয়সা লেনদেন-এর আড়ত এটা। গোলাঘর অন্যত্র।

মশলাপাতি আর কর্মচারী আর পাইকিরি খদ্দেরের ভিড়ে ঠাসাঠাসি। ঘরের মাঝামাঝি দেয়াল ঘেঁষা তুলোর গদি আর ফরাস বিছানো ছোট চৌকি একটা। তার ওপর হাত-দেড়েক লম্বা আর হাতটাক চওড়া কাঠের হাতবাক্স। এক পাশে টকটকে খেরো কাপড়ে বাঁধাই মোটা লাল খাতা গোটাকতক, অন্য দিকে টুলের ওপর পাশাপাশি দুটো টেলিফোন। হাতবাক্সের সামনে গদির চৌকিতে সমাসীন যে মানুষটা, তার নাম পান্না দাম।

এই মুহূর্তে তাকেই দেখছি আমি।

হরিদ্বারে, আশ্রমের শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশে, সকালের এই ভজন-সাধনের আসরে বসে কলকাতার বড়বাজারী আড়তদার পান্না দামকে দেখছি। সেই ঘর দেখছি, সেই গদি দেখছি, সেই কাঠের হাতবাক্স দেখছি, আর সেই লোকটাকে দেখছি।

তফাত বই কি, অনেক তফাত। সেই পান্না দামের ঝকঝকে মোটরটা ফুটপাথ ঘেঁষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত—এই লোকটাকে ভেতর থেকে খড়ম খটখটিয়ে আসতে দেখেছি। এই লোকটার গেরুয়া পরনে, সেই পান্না দাম কোঁচানো কাচি ধুতি পরত। এই লোকটার গায়ে কাপ-বারকরা লালচে ফতুয়া, পান্না দাম পরত গিলে-করা ধপধপে সাদা চুড়িদার পাঞ্জাবি, নীচে দামী নেটের গেঞ্জির প্রতিটা ছিদ্র দেখা যেত। এই লোকটার গলায় কণ্ঠি, পান্না দামের মোটা গলায় চিকচিক করত মোটা একছড়া হার। এই লোকটার কদম ছাটের তলা দিয়ে মাথার চামড়া দেখা যায় প্রায়, আর পান্না দামের মাথায় ছিল পাট-করা মিশ-কালো একরাশ চুল।

তবু। সব বদলালেও কতটা বদলায়? কতটা বদলানো সম্ভব?

অনেক দিনের কথা, আমার ভুল হল? আর, সেই যোগাযোগও মাত্র দিনকতকের,

বিশ-পঁচিশ দিনেরও নয়। আমি সদ্য-নিযুক্ত পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পাইস মারচেন্ট দামজীর। আমাকে ছাড়া আরও দুজন প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল। যে-কদিন ছিলাম, দিনে দু-পাঁচখানা চিঠিপত্র লেখা আর মালিকের সঙ্গে তার গাড়িতে ঘোরা ছাড়া আমাকে আর কিছু করতে হয় নি।

মাইনে খারাপ ছিল না, তা ছাড়া দামজীর মাথায় নতুন কিছু করার পরিকল্পনা ছিল শুনেছি। কিন্তু তবু টিকতে পারব বলে মনে হয় নি। তার একমাত্র কারণ দামজীর রুক্ষ মেজাজ। লোকটাকে ভয়ানক দাম্ভিক মনে হত আমার। আতে ঘা দিয়ে মুখের ওপর যা খুশি বলে বসতে বাধত না। আমি নতুন বলেই হোক বা সযোগে স্বভাবেই হোক, আমার ওপর মেজাজ ফলায় নি তখন পর্যন্ত। কিন্তু অন্যের বেলায় যা দেখতাম, চোখে-কানে লাগার মত তাই যথেষ্ট।

আর অল্প কদিন দেখলেও মনে হত, লোকটার ভিতরে কি একটা চাপা অশান্তি ধিকিধিকি জ্বলছে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও একেবারে গুম হয়ে যেত মাঝে মাঝে। তার পর হঠাৎ আবার সচেতন হয়ে এক অশান্ত তাড়নায় নিজেকে যেন চারকে ছোটাছুটি করিয়ে বেড়াত। কর্মচারীদেরও নাজেহাল অবস্থা হত তখনই।

কিন্তু চাকরি আমাকে ছাড়তে হয় নি, আপনা থেকেই গেছে। ওই পনেরো-বিশ দিনের মধ্যেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। আর তার ফলে রীতিমত শোরগোল পড়ে গিয়েছিল।

ঘটনার সাত-আট দিন আগে খুব ঘটা করে দামজীর মেয়ের বিয়ে গেছে। অনেক টাকা খরচ করে বিলেত-ফেরত ডাক্তার জামাই এনেছিল দামজী। পার্সোনাল অ্যাসিস্টান্টের তখন বাড়ির কাজেও ডাক পড়েছিল। উৎসবটা যেন কর্মচারীদেরও উৎসব। দামজীর স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলকেই দেখেছিলাম তখন। অঢেল পয়সাওলা লোকের ঘরে যেমন হয়—সুখের ঘরে রূপের বাসা। ছেলে উচ্চশিক্ষিত, সুশ্রী, যাকে বলে স্মার্ট। মেয়ে মিশনারী কলেজের ছাত্রী, চালচলন মার্জিত, কথাবার্তা মিষ্টি। বিত্তের সঙ্গে এগুলো যোগ হলে মাঝারি রূপসীকেও তিলোত্তমা-সদৃশা মনে হয়। দামজীর স্ত্রীটিও বেশ—স্বল্পভাষিণী, সুরুচিসম্পন্না। হাসি হাসি মুখখানা দেখলে সম্ভ্রম জাগে। মনে হয় ছেলে মেয়ের ওপর ওই মায়ের প্রভাবই বেশি। তবে দামজীকে ছেলে মেয়ে এমন কি তাদের মাও যে মান্যগণ্য করে খুব, সেটা নিজের চোখেই দেখেছি বিয়ের উৎসবটাও গৃহস্বামীর কথা, তার ইঙ্গিতেই সুসম্পন্ন হতে দেখলাম। লোকটাকে এত বড় ভাগ্যবান মনে হয়েছিল, শুধু বাইরে মনিব নয়, ঘরেও মনিব

বিয়ের পরদিন তার সঙ্গে মোটরে কোথায় যেতে যেতে জামাইয়ের প্রশংসা করেছিলাম আমি। জামাই খুব ভাল হয়েছে। শুনে দামজী হেসেছিল। ভেবেছিলাম খুশির হাসি। তার পরেই মন্তব্য শুনে অবাক আমি। বলেছিল, অনেক টাকায় জামাই কেনা হয়েছে, ভাল হওয়ারই কথা।

সাত-আট দিন বাদেই সেই ঘটনা। সেই সাত-আট দিন একেবারে শান্ত হয়ে কাটাতে দেখেছি তাকে। কাউকে বকে নি, কাউকে একটি কটু কথাও বলে নি। সবাই ভেবেছিল, মেয়ে বিয়ে দিয়ে লোকটার মনে শান্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু কাছে থাকতাম বলে আমার কেমন মনে হত, বড় বেশি থমথমে শান্তি।

ন'দিনের মাথায় দামজী নিরুদ্দেশ হঠাৎ। এত বড় ব্যবসায়ের মালিক, লক্ষ লক্ষ টাকা, বাড়ি-গাড়ির মালিক পান্না দাম বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ যেন উবে গেল কোথায়। তন্ন তন্ন খোজাখুঁজি, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন, পুলিসের ছোটাছুটি—সব ব্যর্থ। দিন গেল, মাস গেল, বছর ঘুরল—পান্না দাম নিশ্চিহ্ন। সুযোগ্য ম্যানেজার রেখে ছেলে আর ছেলের মা ব্যবসায়ের হাল ধরল, বাড়তি লোক অনেক ছাঁটাই হয়ে গেল, নতুন মালিক আর ম্যানেজারের পছন্দমত অনেক নতুন লোক এল। আমাকে কেউ থাকতেও বলে নি যেতেও বলে নি। চুপচাপ বসিয়ে মাইনে দেওয়াটা যেতে বলারই নামান্তর। আমি বিনা আপত্তিতে সরেই এসেছি।

পুরনো কর্মচারীদের কারও কারও সঙ্গে দৈবাৎ ট্রামে বাসে এক-এক দিন দেখা হয়ে যায়। তিন-চার মাস আগেও শুনেছি পান্না দামের সন্ধান আর মেলে নি। চার-পাঁচ বছরেও যে-লোকের খোঁজ মেলে নি সে কি আর বেঁচে আছে?

গান শেষ হতে বাইরে এসে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওই লোকটার নাম কি?

কার কথা জিজ্ঞাসা করছি বুঝে নিয়ে সে নাম বলল, ত্যাগী মহারাজ।

আগে কি নাম ছিল?

সে বলতে পারল না। বলার নিয়ম নেই বোধ হয়।

এর তিন-চার দিন পরে বিকেলের দিকে গঙ্গার ধারে হঠাৎ দেখা। পায়চারি করছিল, দূরে আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল।

পায়ে পায়ে কাছে এসে দু হাত তুলে নমস্কার করলাম। জবাবে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, ভাল আছেন তো? হরিদ্বার কেমন লাগছে?

ভাল। দুই-এক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ভাল তো দামজী?

সঙ্গে সঙ্গে থমকাল একটু। তার পর সকৌতুকে নিরীক্ষণ করল দু-চার মুহূর্ত। প্রসন্ন কণ্ঠে জবাব দিল, দামজী কে চিনি না, ত্যাগী মহারাজ ভাল থাকতে চেষ্টা করছে।

হাসল আবারও। আগেও হাসতে দেখেছি, কিন্তু এই হাসি সুন্দর মনে হল।

বসো। আপনি ছেড়ে তুমি বলল আগের মত গঙ্গার পাড় ঘেঁষে নিজেই আগে বসল। সেদিন দেখা হবার পর ভাবছিলাম আবার দেখা হলে মন্দ হয় না, দেখা হয়ে গেল। একটু থেমে জিজ্ঞেসা করল, তুমি সেখানেই আছ না ছেড়ে দিয়েছ?

জানালাম অনেকদিনই ছেড়েছি।

থাকতে পারলে না বুঝি?

আমি নিরুত্তর।

কলকাতাতেই থাক তো?

হ্যাঁ।

আবারও চুপচাপ একটু।—সেখানে গিয়ে কারও শান্তি নষ্ট করো না যেন আবার।

অর্থাৎ তার পরিবারের কাউকে যেন খবর না দিই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন, ওরা কি খুব শান্তিতে আছেন মনে করেন? আজও ওরা শোকে ডুবে আছেন নিশ্চয়।

গঙ্গার দিকে চেযে অস্ফুট গলায গানেব সুব ভাঁজল দুই-এক মিনিট। মুখে হাসিব আভাস। মনে হল জবাবটা আব দেবে না। কিন্তু জবাব দিল। হাসিমুখেই ফিবে তাকালে আবাব।—এখন যে শোক দেখছ, সেটা ওদের শিক্ষা আব কালচাবেব জেব, জলজ্যান্ত লোকটা হাবিয়ে গেল, জাকজমক কবে শোকটুকু পর্যন্ত না কবলে কালচাবেব চাবুক খেতে হবে না? লোকেই বা বলবে কি? ওটা বুকেব শোক নয, বুকেব শোক হলে ওরা আমাকে খুঁজে বাব কবত।. আসলে ওবা যে শান্তিতে আছে নিজেবাও তা ভাল কবে জানে না বোধ হয—শোক-ঢাকা শান্তি।. খববাখবব দিযে তুমি আবাব ওদেব কর্তব্যেব মুখে ঠেলে দিও না।

আমাব মনে হচ্ছিল, সেই মানুষই বটে, কিন্তু সেই লোক আব নয। বডবাজাবেব স্পাইস মাবচেন্ট রুক্ষমেজাজী দাম্ভিক পান্না দাম হাবিযেই গেছে।

গঙ্গায সন্ধ্যাব ছাযা পডছে। গঙ্গাব জল কালচে দেখাচ্ছে। সেই বঙেব সঙ্গে আকাশেব বঙ আব আলোব বঙ এক হযে আসছে। সেই প্রদোষ মুহূর্তে খোলা আকাশেব নীচে গঙ্গা-পাডেব নিবিবিলি নির্জনে একখানি জীবনেব অর্গলবদ্ধ দবজা একটু একটু কবে আমাব চোখেব সামনে খুলে গিযেছিল। সেই দবজাব ওধাবে বিচবণ কবে আমি কি পেযেছিলাম জানি না।. হযতো বেদনাব বস্তুই, কিন্তু মনে হয, সঞ্চযেবও।

জীবনে অনেকবাব পেশা বদলেছে পান্না দাম। তাব পিতামহ বিদাযী কালেব কবিযাল ছিল। গান বাঁধত, ছডা বানাত। নতুন বযসেব কালে নতুন প্রেবণায পিতামহব সেই স্মৃতিব বাস্তা ধবে চলাব বাসনা ছিল খুব। পান্না দাম চেষ্টাও কবেছিল। ফলে বাপেব দাবডানি খেযেছে, সঙ্গী-সাথীবা হেসেছে। ওই বাস্তায বড হওযা যাবে না বুঝে পান্না দাম হাল ছেডে ক্ষেতেব হাল ধবেছিল কিছুকাল। শেষে বড হবাব উদ্দীপনায তাও ছেডে কলকাতায পাডি দিযেছে, ভাগ্যেব পাযে শেকল পবানো যায কিনা দেখতে।

বযস তখন আঠেবো-উনিশ।

মুটেগিবি কবেছে, লোকেব বাডিতে চাকবি কবেছে, বেস্টুবেন্টে বযেব কাজ কবেছে। কিন্তু সর্বত্রই ছোট মনে হযেছে নিজেকে। বড হবাব জন্যে যেখানেই রুখে দাডিযেছে, গঞ্জনা আব নির্যাতন জুটেছে।

তাব পব মনেব মত কাজ জুটেছিল একটা। এক সস্তা সিগাবেট কোম্পানিব সচল-বিজ্ঞাপনেব কাজ। প্রায দোতলা সমান উঁচু খুব হালকা ফ্রেম কবা একটা মানুষেব মুখোশে দেহ গলিযে শহবেব এ-মাথা ও-মাথা বিচবণ কবে বেডাতে হবে শুধু। সেই বিবাট কৃত্রিম অবযবেব সর্বত্র ওই সিগাবেটেব বিজ্ঞাপনেব বাহাব। মুখোশেব গলা থেকে পা পর্যন্ত মস্ত একটা আলখাল্লায ঢাকা। দেখলে মনে হবে, ওই সিগাবেট খেযে মনেব আনন্দে দৈত্যাকৃতি একটা মানুষ পথ চলেছে। দেখলে চোখে পডবেই, আশেপাশে লোক জডো হবেই। কৃত্রিম অবযবেব পেটেব কাছে পান্না দামেব মাথা। দুটো গোপন ছিদ্র দিযে সব দেখাব ব্যবস্থা। হেলেদুলে ঘুবে ফিবে যেদিকে খুশি তাকাও, যেদিকে খুশি যাও—ভিতবেব লোকটিকে চোখেও পডবে না, মনে হবে অতিকায মানুষটাই ওই ভাবে পথ চলেছে।

পান্না দাম খুশী। বিশালকায় সেই সঙ-সাজে সে যখন পথে বেরুত, তার মনে হত আর সে ছোট নয়। সে অনেক বড়, মাথা তার প্রায় দোতলা সমান উঁচু। রাস্তার লোকেরা হাঁ করে দেখত, অল্পবয়সী ছোকরারা পিছু নিত, দু'পাশের বাড়ির রেলিঙে ছেলেমেয়েরা ঝুঁকে পড়ত তাকে দেখার জন্যে। চিৎকার করে ডাকত, সঙ এসেছে, দেখবি আয—।

পান্না দামেব মালিকরাও খুশি। ওই কাঠামো বয়ে গোটা কলকাতা চষে বেড়াতে পারে—ছোঁড়াটাব তাকত আছে। এক-এক দিন এক-এক দিকে যেত পান্না দাম। ছোট রাস্তা বড় বাস্তা সর্বত্র।

কিন্তু এরই মধ্যে অপবিসর একটা বাস্তায় ঘন ঘন আসত সে। দেখলেই বোঝা যায়, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পাড়া—সিগাবেটের সমজদাব খুব বেশী না থাকাই সম্ভব। তবু আসা চাই। পারলে রোজ আসে পান্না দাম।

ছোট ভাঙা একটা দোতলা বাড়ির কাছাকাছি এসেই লম্বা পা ফেলত না আব। ধীবেসুস্থে এগোত। আব গোপন ছিদ্রেব মধ্যে দিয়ে সতৃষ্ণ চোখে দোতলার দিকে তাকাত। অনুসবণরত ছেলেগুলোর সঙ্গে মজা করাব অছিলায় ঠিক বাড়িটাব সামনেই কিছুক্ষণেব জন্যে দাড়াত। আব ছিদ্রের মধ্য দিযে অদৃশ্য চোখ দুটো দোতলার বারান্দার ভাঙা বেলিঙের ওপর আটকে থাকত।

পান্না দাম প্রেমে পড়েছিল।

একতরফা প্রেম হলেও জোরালো প্রেম।

সঙ যাচ্ছে টেব পেলেই মেযেটা দৌডে এসে দোতলাব ভাঙা রেলিঙ ধরে দাঁড়াত। ফুটফুটে মেয়ে, বছর চোদ্দ-পনেব বযস—ফ্রক ছেডে সবে শাড়ি ধরেছে বোধ হয়। প্রথম প্রথম বিস্ময়ে দু চোখ বড বড করে দেখত। তার পর ওর ঢং-ঢাং দেখে হাসত খিলখিল করে, ভাইবোনদের কোলে নিযে নিযে সঙ দেখাত।

পান্না দাম দোতলার ওই রেলিঙ সমান উঁচু ভাবত নিজেকে। ক্রমশ যেন নেশা ধবে গেল তাব—দু'দিন ওই পথে না এলে, দুটো দিন বাডিটার সামনে না দাঁড়ালে, দুটো দিন মেযেটাকে দেখতে না পেলে মনে হত কত কালের অদর্শন. নিজের মনেই ভালবাসাব প্রহসন জমিযে তুলতে লাগল সে। নিজের মনেই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলত, হাসত, আদব করত তাকে। আব ভাবত কেমন কবে কি উপাযে ওই মেয়ে ঘবে এনে তুলবে একদিন। তুলবেই যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেটা সম্ভব কিনা, জাত-বর্ণ মেলে কিনা, এসব ভাবনা একটু-আধটু উঁকিঝুঁকি দিলেও তা নিয়ে মাথা ঘামায না বড়। ওই নিযে ভাবতে বসলেই মন খাবাপ, শান্তি নষ্ট।

কিন্তু শান্তি এমনিতেই যেতে বসেচে। দুপুরবেলা সঙ সেজে ঘুরে বেড়াতে হয় না, সকালে একটু বেশি ঘুবলে বিকেলেও ছুটি। পান্না দাম তখন নিজস্ব সাজেই ওই রাস্তায়, ওই বাড়ির সামনে ঘুরঘুর শুরু করল। পান্না দামের ভাবতে বেশ মজা লাগত, এই মূর্তিতে কেউ তাকে চেনে না, উঁচু মানুষ দেখার জন্যে রেলিঙের ধারে দৌড়ে এসে দাঁড়ায় যে মেয়েটা—সেও না।

সামনের চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে বাড়িটার খবর-বার্তা সংগ্রহ করেছে

পান্না দাম। স-পাঁচ আনার পুজো দিয়েছে তারপর—একেবারে সমপর্যায়ের না হলেও বিয়ে দিলে বিয়ে হতে পারে। আরও আশার কথা, নেহাত দিন-আনা দিন-খাওয়া অবস্থা নাকি ও-বাড়ির। যাক, শুনে পান্না দামের বুক থেকে যেন পাথর নেমে গিয়েছিল।

মাঝে মাঝে বিশ্রামের অছিলায় ওই বাড়ির দাওয়ায় এসে বসত। দুপুরে অমন দুই-একজন দাওয়ায় বসে বিশ্রাম করেই। এক রবিবারের দুপুরে দেখেছিল, নিচে নেমে ফেরিওয়ালার সঙ্গে চুড়ি কাঁটা চুলের ফিতে দর করছে। পান্না দামের তক্ষুনি মনে হয়েছিল, সঙ্গে ওই ব্যবসাটা করলে কেমন হয়! আর এক দিন দেখেছিল ডাঁশা পেয়ারা কিনতে। সেই দিন পান্না দাম কথা বলেছিল। কথা বলা ঠিক নয়, জল চেয়েছিল। বলেছিল, খুকী, একটু জল খাওয়াবে?

খুকী বলতে চায় নি, কিন্তু কি-ই বা বলবে? চা-ওয়ালার কাছে অনেক খবর নিয়েছে কিন্তু মেয়েটার নাম জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে নি। খুকী বলাতেই কিনা কে জানে, মেয়েটা বড় বড় দুই চোখ ওর মুখের ওপর ফেলে দেখেছিল একটু। তার পর ভেতর থেকে জল এনে ওর হাতে ঢেলে দিয়েছিল। পান্না দাম অনেক জল খেয়েছিল সেদিন, প্রায় এক ঘটি জলই। আর ভারী ইচ্ছে হয়েছিল বলে, সে-ই উঁচু মানুষ সেজে প্রায়ই যায় এখান দিয়ে, যাকে দেখার জন্যে মেয়েটা রেলিঙের কাছে ছুটে আসে। কিন্তু বলতে পারে নি। বলার সুযোগ হয় নি। তৃষ্ণায় এক ঘটি জল খেতে মেয়েটা আর কাউকে দেখে নি বোধ হয়, অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়েছে আর এক বার, তার পর ঘটি নিয়ে ভিতরে চলে গেছে।

দুপুরে এদিকে আসাটা প্রায় নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল পান্না দামের। দুপুরে ঠিক নয়, বিকেলের দিকে। যে-সময় মেয়েটা বই বুকে করে ইস্কুল থেকে ফেরে। কাছাকাছি ইস্কুল, মিনিট দশেকের পথ, পান্না দাম দেখেছে। ছুটির আগে তার পা দুটো কে যেন টেনে নিয়ে আসে সেই স্কুলের দিকে। দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আর অপেক্ষা করে। তার পর একটু ব্যবধানে পিছনে পিছনে আসে। এক-একদিন ভারী দুঃখ হয় মেয়েটার পরনে আধময়লা শাড়ি দেখে। উপায় থাকলে সে তক্ষুনি আধডজন শাড়ি কিনে দিত।

দিনকতকের মধ্যেই মেয়েটাও কেমন করে যেন টের পেল, ওই একজন তার জন্যেই এই রাস্তায় ঘুরঘুর করে, ইস্কুলের কাছে অপেক্ষা করে, পিছন পিছন আসে। প্রথম প্রথম ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে তাকে, তার পর কোন দিকে না তাকিয়ে হনহন করে বাড়ি ফিরেছে।

এক দিন।

আচমকা কতগুলো পাড়ার ছেলে ছেঁকে ধরল পান্না দামকে। ওই বাড়িটার থেকেও একজন মারমুখী পুরুষমানুষ বেরিয়ে এল। চায়ের দোকানের মালিকও। হতভম্ব পান্না দাম দোতলার রেলিঙের দিকে চেয়ে দেখে মেয়েটাও দাঁড়িয়ে। তার পর আর কিছু দেখা হল না, আর কিছু বলা হল না, আর কিছু বোঝা হল না।

জ্ঞান হতে দেখে সে হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে আছে। সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা, কপালে ব্যাণ্ডেজ। দিনসাতেক ছিল হাসপাতালে।

আর এক দিন পান্না দাম এসেছিল ওই রাস্তায়, ওই বাড়িব সামনে। না, এমনি নয়, বিজ্ঞাপনেব উঁচু মানুষ সেজে। ছোট ছোট ছেলেমেযেগুলো তেমনি সকলববে পিছু নিযেছিল আব বেলিঙের ধাবে সেই মেযে এসে দাঁড়িযেছিল। পান্না দাম দেখেছিল, কিন্তু মাথাটা সেদিন আব ওই বেলিঙ সমান উঁচু মনে হয নি তার। অনেক ছোট, অনেক নীচু মনে হযেছিল। মাথাটা তাব মাটিব সঙ্গে মিশে গিযেছিল।

আব আসে নি। সঙেব চাকবি ছেড়েছিল। উঁচু হতে হবে, মাথা উঁচু কবে দাড়াতে হবে।

উঁচু হযেছে। আশাতীত, কল্পনাতীত উঁচু। এত উঁচু যে কুড়ি বছবেব সেই পান্না দামকে দেখতে হলে পঞ্চান্নব পান্না দামকে অনবীক্ষণ কাচ আটতে হবে চোখে।

যে স্ত্রী পেযেছে, অত উঁচুতে না উঠলে অমন স্ত্রী তাব ঘবে আসাব কথা নয। রূপসী, বিদষী। সব জেনেশুনেই আসা, তাই স্ত্রী অবজ্ঞা অবহেলা কবে নি কোনদিন। ববং তাব টাকা বোজগাবেব কেবামতি দেখে সমীহ কবেছে। কিন্তু ভিতবে ভিতবে তাব খেদ ছিল একটু, স্বামীব আব যাই থাক, কালচাবেব ছিটা নেই। সেই খেদ সে পুষিযে নিযেছে ছেলে মেযে দুটিকে মনেব মত মানুষ কবে। তাবাও অসম্মান কবে না বাবাকে, অমান্য কবে না। কিন্তু অন্য স্তবেব লোক ভাবে, নীচু স্তবেব নয, ভিন্ন স্তবেব। কখনও-সখনও এই নিযে পান্না দামেব মন খাবাপ হত একটু-আধটু, কিন্তু নিজেই বুঝত মা-ছেলেমেযেব আলোচনায বা তাদেব বন্ধু-বান্ধবেব পবিবেশে অথবা নিজেব শ্বশুবব‍াড়িব পবিবেশে ঠিক যেন খাপ খায না সে। তবু একটা অজ্ঞাত দুর্বলতায দিনকে-দিন কেমন যেন খিটখিটে হযে উঠছিল পান্না দাম।

মেযেব বিযেতে জামাই বাছাই কবে এনেছিল তাব স্ত্রী। ব্যবস্থা যা কবাব মাযেতে ছেলেতে কবেছে পান্না দামেব অর্থাৎ বাড়িব কর্তাব খোজ? বাড়িব কর্তা যে কত বড সে তো তাব বাড়িতে গাড়িতে আব টাকাতেই প্রমাণ। তাব কি তেমন ফুবসত আছে? না, বিযেব আগে জামাইকে একবাব চোখেব দেখাও দেখে নি পান্না দাম। জামাইযেব আত্মীয-পবিজন অবশ্য কথাবার্তা কইতে বাড়িতে এসেছে। পান্না দামেব সঙ্গেও আলাপ কবেছে। সম্ভ্রমভবা চোখে দেখেছে তাকে, আব বলেছে এমন ঘবে কাজ কবতে পাবা ভাগ্যেব কথা। যতক্ষণ সামনে ছিল সে, স্ত্রী আব ছেলেব চোখে শঙ্কাব ছাযা দেখেছে সে, ভেবেছে হযতো বা মশলাব গল্পই ফেঁদে বসবে সে ভাবী কুটুম্বদেব সঙ্গে।

বিযেব সময যাবতীয দেখাশুনা আব ব্যবস্থাব ভাব পান্না দামেব। সে-ভাব তাব ওপব ছেড়ে দিযে স্ত্রী বা ছেলে দুজনেই নিশ্চিন্ত। শুধু কুটুম্ব আব অতিথি-অভ্যাগতদেব আদব অভ্যর্থনা কবাব ভাব ছেলেব আব তাব মাযেব। সেই হাসিখুশিব পবিবেশে গিযে পড়ে ছেলে আব তাব মাযেব চাপা অস্বস্তি লক্ষ্য কবেছে পান্না দাম।

বিযের দিনসাতেক বাদে নতুন জামাই মস্ত পার্টি দিযেছে নিজেব বাড়িতে। সাহেবী কাযদায পার্টি। সেখানে সকলেব আমন্ত্রণেব কথা স্ত্রীই জানিযেছে। বলেছে, তুমি গিযে উঠতে পারবে না বলে দিলাম—বললাম, শবীবটা ভাল যাচ্ছে না, তাব ওপব খুব চাপ পড়েছে কাজেব...। পান্না দামকে চুপ কবে থাকতে দেখে সান্ত্বনাও দিযেছে, কি

দবকাব ওসবেব মধ্যে গিযে, কখনও তো যাও নি—তোমাব ভালও লাগত না।

ছেলেকে নিযে স্ত্রী গেছে নিমন্ত্রণ বক্ষা কবতে।

বিশ বছব বযসে পান্না দাম যে মাব খেযেছিল, পঞ্চান্নব এই মাবটা তাব দ্বিগুণ মনে হযেছিল সেদিন। সেই মাব খেযে পান্না দাম কিন্তু চেতনা হাবায নি, ববং চেতনা ফিবে পেযেছিল। হঠাৎই একটা আবিষ্কাব কবেছিল সে। আবিষ্কাব অনেকদিন আগেই কবাব কথা, কিন্তু সাহস কবে আগে তেমনভাবে চোখ মেলে নিজেব দিকে তাকায নি পান্না দাম।

সেদিন তাকাতে হযেছিল।

দেখেছিল, মাথা তাব একটুও উঁচু হয নি। সে যেমন ছিল তেমনি আছে। বিজ্ঞাপনেব উঁচু মানুষেব খোলসেব মতই সে শুধু মোটা টাকাব খোলস পবে সঙ সেজে বসে আছে। ভিতবেব মানুষটা কি, তাব স্ত্রী জানে, ছেলে জানে, মেযে জানে—সকলেই জানে হযতো। বিজ্ঞাপনেব সঙেব মতই এই টাকাব খোলস পবা সঙটাকে দেখে সকলে সমীহ কবে। সকলে—তাব স্ত্রী ছেলে সবাই।

সেই বাতেই নিরুদ্দেশ হযেছিল পান্না দাম।

কতক্ষণ বোবাব মত চুপচাপ বসেছিলাম জানি না। চাবদিকেব অন্ধকাব বেশ ঘন হযে উঠেছে। এক সময বললাম, এখন তো আপনি সত্যি অনেক উঁচুতে উঠেছেন দামজী—ত্যাগেব পথে ভক্তিব পথে চলে এসেছেন, আব বোধহয আপনাব মনে কোন খেদ নেই।

অন্ধকাবে বোঝা গেল না। কিন্তু মনে হল দামজী হাসছে। জবাব দেবাব আগে যাবাব জন্যে উঠে দাড়াল। তাব পব বলল, বিজ্ঞাপনেব আব টাকাব খোলসেব মত এও খোলস একটা—ভক্তিব খোলস আব ত্যাগেব খোলস। একটুও উঁচুতে উঠি নি, যেমন ছিলাম তেমনি আছি—এই সঙেব দুনিযায আব একটা নতুন সঙ সেজে বসে আছি।

একটু বাদে অন্ধকাবে মিশে গেল লোকটা। আমি আবও কতক্ষণ বসে ছিলাম ঠিক নেই। এক সময ভাবলাম লোকটা পাগল ।

ও-বকম না ভাবতে পাবা পর্যন্ত ভাবী অস্বস্তি লাগছিল।

রাবণ

সমালোচকেব মতে মেঘনাদবধ কাব্যে মাইকেল শ্রীবামচন্দ্রেব থেকে বাবণেব চিত্রটি সহানুভূতি আব পুরুষকাবেব দাক্ষিণ্যে বেশি জোবালো কবেছেন। কেউ সেই কবি-প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হযেছেন, কেউবা মনে কবেছেন খোদ বাল্মীকিব ওপব হামলা কবা হযেছে।

কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীব সদ্য বর্তমানে একটি বাম আব একটি বাবণেব মান যাচাইযেব জলজ্যান্ত এক নতুন নজিব উপস্থিত। ঘটনাটা শুনলে বিরূপ সমালোচকবা

কি বলবেন বা অমরলোকে বসে মাইকেল মুখ-টিপে হাসবেন কিনা বলা শক্ত।

জায়গার নাম অনুক্ত থাক। তবে সেটা অযোধ্যারই কাছাকাছি। তা ছাড়া ঘটনার আবর্ত থেকে সচেতন পাঠক রণক্ষেত্র বা রঙ্গক্ষেত্রটা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। বর্তমানের এই রাম-রাবণের খণ্ড-প্রলয়ের মধ্যেও সীতা একটি আছেই। আর, সত্যযুগের মতো ওই রমণীটিকে কেন্দ্র করেই যা কিছু। তবে বর্তমানে তার নাম সীতা নয়, জানকী। আর নায়ক দুটির নামও রাম বা রাবণ নয়, তাদের একজন ভুটাই মণ্ডল, অন্যজন মগনলাল।

এদের রাম-রাবণের ভূমিকাভুক্ত করাটা কোনো কল্পনার ব্যাপার নয়। কিন্তু এটা পরের প্রসঙ্গ। গোড়ায় জানকীর পরিচয় একটু স্পষ্ট হওয়া দরকার। সত্যযুগ কলিতে গড়ানোর ফাঁকে বেশ কয়েকটা বছর চলে গেছে। ফলে দিনকালেরও পরিবর্তন ঘটেছে কিছু। সীতা অন্যথায় বর্তমানের জানকীর স্বভাব বা আচার-আচরণও সেই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা উচিত। সত্যযুগে মনস্তত্ত্বের বালাই কিছু ছিল বলে শোনা যায় না। স্থূল সত্যটাই সব। কিন্তু এ-যুগে ওটা বাইরের দরজা, হৃদয়ের অন্দরমহলের এখন আরো অনেকগুলো দরজা আছে।

ওই বাইরের দরজা দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, জানকী কিছুকাল আগেও ভুটাই মণ্ডলের ঘরণী ছিল। ছিল বলতে, সে এখন বিধবা বা পরস্ত্রী নয়। ভুটাই মণ্ডল বহালতবিয়তে জীবিত। আর জানকী বিধিমতো বিয়ের সুতো ছিঁড়ে বাপের ঘরে আবার কুমারী জীবনযাপন করছে। যদিও তার এই জীবনযাত্রাটা একেবারে নির্ভেজাল ভাবে না সকলে। অন্তত ভুটাই মণ্ডল তো ভাবেই না। কারণ মগনলালকে বলতে গেলে রোজই ওই বাপের ডেরায় একসময় না একসময় দেখা যায়। পড়শীরা বলে দুজনের হাসিঠাট্টা গল্পগুজবও দিব্বি চলে। আর বাপ কলকে-সাধনায় মগ্ন হলে, আর কি চলে কে জানে। তা ছাড়া ভিখুর কথা বিশ্বাস করতে হলে মানতে হবে, মাঝে মাঝে ওই দুজনকে গোমতীর ধারে অথবা 'বোটাগারেন' (বোটানিকাল গার্ডেন)-এর নির্জনে হাওয়া খেতেও দেখা যায়।

ভিখু ভুটাইয়ের ভাগ্নে, ষোলবছরের মূর্তিমান বিভীষণ। মামার ঘরে থাকে, কিল লাথি চড় খেয়েও নড়ে না—কিন্তু ভিতরে ভিতরে মামীর (এখন মামী-থী'র) পরম ভক্ত।

যাই হোক, জানকীর নতুন জীবনের ভাগ্যবিড়ম্বনায় ওই রাবণ-সদৃশ ভুটাই মণ্ডলের ঘরেই আসতে হয়েছিল তাকে। অবশ্য রাবণের খোলসে অনেকবার দেখেছে তাকে, কিন্তু সেই নতুন বয়সের মায়ায় একবারও তখন রাবণ ভাবেনি লোকটাকে। তার ঘরে আসার কিছুদিন পর থেকেই রাবণ-আবিষ্কার শুরু।

এই আবিষ্কারটা জানকীর বাবা হরদেও আগেই করেছিল। এই ঘরে কন্যা-সম্প্রদানের ইচ্ছে তার একটুও ছিল না। তার মতে, অনেক ভালো পাত্র আর সুপাত্র মগনলাল। কিন্তু মগনলাল জানকীর জীবনে পরের আগন্তুক। তাকে বাপ যতটা চিনেছে, মেয়ে ততটা চেনার অবকাশ পায়নি তখন পর্যন্ত। জানকীকে দেখে ওর চোখের নেশাটা যত চট করে ধরছে, ওকে দেখে জানকীর ততো চট করে ধরবে কেন। বিশেষ করে নেশাটা যখন আর একজনকে কেন্দ্র করে বেশ ঘনীভূত।

হরদেও সজ্ঞানে বাধা দিত, কিন্তু অজ্ঞানে কাজ হাসিল করেছে লোকটা। লোকটা অর্থাৎ ভুটাই। আর তার পিছনে বোকা মেয়েটারও সাট ছিল। প্রাকসন্ধ্যার কলকের নেশাটা সবে তখন মাথার মধ্যে দানা বাধতে লেগেছে—লোকটা এসে করকরে দেড়শ টাকার কাঁচা নোট চোখের সামনে নাচিয়ে দিলে। দেড়শ টাকাই কন্যাপণ হেঁকেছিল হরদেও, আর সুস্থ অবস্থায় মগনলালকে সেই দেড়শটি টাকা ভুটাইয়ের আগে সংগ্রহ করতে পরামর্শ দিয়েছিল। এমনও বলেছিল, মগনলাল ছ'কুড়ি 'রূপইয়া' এনে দিলেই লোকের কাছে সে সাত-কুড়ি-দশ বলে চালিয়ে দেবে। বাকি এক-কুড়ি-দশ যেন সে ধীরেসুস্থে সংগ্রহ করে দেয়।

মগনলালের এখন শেঠজির দোকানে নতুন চাকরি। মস্ত এক শেঠের জমাদার সে। কিন্তু চাকরিটা যে নতুন, তার কাছে সাত-কুড়ি-দশ এমনকি ছ'কুড়িও প্রায় স্বপ্ন-গোচর অধরার মতোই। হরদেওর এক জমাটি নেশার মুহূর্তে সময়ের মিয়াদ বাড়ানোর জন্যে সে অনেক আকুতিমিনতি করেছিল। মনের সেই উদার অবস্থায় হরদেও তার প্রার্থনা মঞ্জুরও করেছিল। অর্থাৎ অঢেল সময় দিয়েছিল তাকে, আর ভুটাইয়ের উদ্দেশে বাপ-তুলে গাল দিয়েছিল।

কিন্তু আর এক নেশার মুহূর্তে সব ভণ্ডুল। ভুটাই টাকার সঙ্গে মাতব্বর সাক্ষীও নিয়ে এসেছিল চার-পাচজন। তারপর হরদেওর চোখের সামনে টাকা নাচিয়েছে। মিথ্যে করে বলেছে, যে টাকা এনে দেবে তাকেই নাকি কন্যা সমর্পণ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল হরদেও। এখন অস্বীকার করলে সেটা বেইমানী হবে।

বেইমানী! বোম-ভোলানাথ ভক্ত হরদেও করবে বেইমানী! মেজাজের ঝোঁকে প্রতিজ্ঞাটা সে সত্যিই করেছিল কিনা তা ভেবে দেখার ধৈর্য ছিল না হরদেওর। তার আগেই চোখের শিরা লাল হয়েছে। উঠে ভিতরে গিয়ে জানকীর হাত ধরে হিড়হিড় করে তাকে বাইরে টেনে এনেছে। তারপর ভুটাইয়ের দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে বলেছে, লে—!

অন্য হাতে টাকার তোড়া দখল করেছে। সেগুলো ঠিকমতো গুনতে গুনতে অকর্মণ্য মগনলালের বাপ তুলে গাল পেড়েছে।

মাতব্বর সাক্ষীরা বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে একসময় হা-হা করে উঠেছে। কারণ মেয়ে তখনো ভুটাইয়ের সঙ্গে চলে না গিয়ে, হা করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বাপের মাথায় রক্ত উঠেছিল আবার। সাক্ষীরা অনেক করে হরদেওকে বুঝিয়েছে, জানকীর ঠিক এক্ষুনি ভুটাইয়ের সঙ্গে চলে যাওয়া চলে না। তার আগে বিধিগত অনুষ্ঠান আছে কিছু। দিন-ক্ষণ দেখে সেটুকু হয়ে গেলেই জানকী তার চোখের সমুখ থেকে বিদায় হবে।

রাতে সেদিন হাসতে হাসতে বুক ফেটে যাবার দাখিল জানকীর। মরদটা এরই মধ্যে দেড়শ টাকা সংগ্রহ করল কি করে সেও এক বিস্ময়। যে-ভাবেই করুক, এর থেকে বড় অনুরাগের নজির জানকীর চোখে আর কিছু নয়। হরদেওর অবশ্য পরদিনই একটু মন-খারাপ হয়েছে। মগনলালকে মুখ দেখাতে পারেনি ক'টা দিন। হাতের দেড়শ টাকা নেড়েচেড়ে যতটুকু সান্ত্বনা।

যথাদিনে জানকী ভুটাইয়ের ঘরে এলো। প্রথম ক'টা দিন ভালোই কাটল। তারপরে দিনে দিনে রাবণ আবিষ্কার। লোকটার যে রুক্ষ হাব-ভাব আর বেপরোয়া আচরণগুলো

আগে গুণ বলে ভাবত, সেগুলোই দোষের পর্যায়ে পড়তে লাগল। সবথেকে বেশি ক্ষোভ জানকীর, লোকটা ওর কদর বুঝল না। দেড়শ টাকা বাপকে গুনে দিতে হয়েছে ওরই জন্য, তবু না। বরং দিতে হয়েছে বলেই যেন মেজাজ আগের থেকে আরো বেশি তিরিক্ষি। ফি মাসে তাকে ধার সুধতে হয় আর সুদ গুনতে হয় তাও প্রায়ই শোনায় ওকে। জানকীর দস্তুরমতো রাগ হয়, ধার করতে গেছলি কেন। তখন তো দেখলে পরেই জিভ দিয়ে জল গড়াতো।

ধার-দেনা শুধতে হচ্ছে সেই অছিলায় এ-পর্যন্ত নিজের হাতে ধরে ওকে একটা রুপোর গয়না পর্যন্ত দেয়নি। কাচের চুড়ি আর গালার চুড়ি সম্বল। তাও পছন্দমতো কিনে পরার সাধ্য নেই—খরচের নামে মাথায় খুন চাপে।

গয়না হয়তো না পরলেও চলে, দুটো বড় করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই গয়নার খেদ ভুলতে পারে জানকী। কিন্তু তা বলে ও নিজের স্বভাব বদলাবে কেমন করে? চিরকালই হাসিখুশি পরিহাস-প্রিয়—রঙ ঢং ভালবাসে। এই দেখেই মজেছিল মরদটা, এখন ঘরে এনে আটকানোর পর ওইগুলোই দোষের হল। বেশি হৈচৈ হাসাহাসি করলে বা সেজেগুজে পাড়া বেরিয়ে এলে বা মগনলালের সঙ্গে নির্দোষ একটু হাসিঠাট্টা করলেও সহ্য হবে না। এক-একদিন ওই লোহার মতো হাত-দুটো দিয়ে চুলের বোঝা উপড়ে তুলতে চায়, কখনো আবার যেখানে সেখানে বসিয়েও দেয় দু'চার ঘা।

আর হৈচৈ তো ঘরের মধ্যে লেগেই আছে। মরদটা সব দেখে না তাই রক্ষা। সকাল হলেই ঠেলা নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে তরকারি বেচতে যায়, ফেরে সেই দুপুরে—আবার বিকেলে বেরোয়, ফেরে রাত্তিরে। ঘরের হুড়োহুড়ি দেখবে কখন? জানকী মনের মতো বাইরে দৌড়ঝাপটা তেমন করে ওঠার সুযোগ পায় না বলে, ভাগ্নে ভিখুর সঙ্গেই চলে ঝাপাঝাপি মারামারিটা। মারামারি বইকি, এক-একসময় তো দস্তুরমতো ধস্তাধস্তি লেগে যায় দুজনে। ভিখুর তখন মাত্র এগারো বছর বয়স না হলে জানকীর ভাগ্নে-প্রীতিটা অনেকে হয়তো সন্দেহের চোখেই দেখত। এগারো বছরের ডানপিটে ষণ্ডাগুণ্ডা ছেলে, এইটুকু থেকে মা খুইয়ে মামার কাছে আছে। পেয়ারা শশা কুল বা ফুলের মতো তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মামী আর ভাগ্নেতে রীতিমতো দ্বন্দ্বযুদ্ধ লেগে যেত। ভাগ্নে মামীর দখলের লোভনীয় কিছুর দিকে হাত বাড়ালে মামী বলত, কেড়ে নে। জিনিসের থেকেও এই কাড়াকাড়ি হৈ-হুল্লোড়ের প্রতিই ভাগ্নের লোভ বেশি। আবার মেজাজ ভালো না থাকলে বা ভুটাইয়ের হাতে মার খেলে, এই ভাগ্নের ওপর দিয়েই ঝালটা ঝাড়ত জানকী। ধস্তাধস্তি করে তাকে নিচে ফেলে ঘা-কতক বসিয়ে দিত, নয়তো মেঝেতে মাথা ঠুকে দিত। আসলে নিজেরও অগোচরে তাগতটা জোরালো করে তোলার দিকেই হয়তো জানকীর ঝোঁক ছিল একটু। গায়ে সেরকম জোর না থাকলে কোন দিন মরদটা খুন করে বসত ওকে ঠিক নেই। কারণ রাগলে জানকীর মেজাজপত্রও ঠাণ্ডা নয় খুব, মারধরের একটু-আধটু জবাব সেও দিতে শুরু করেছিল। মরদের মার খেয়ে একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকত না—এবং অদূর ভবিষ্যতে দস্তুরমতো নিজেকে রক্ষা করার মতো প্রচ্ছন্ন একটু জেদও মাথায় চাপত তার।

ভাগ্নেটা বোকা ধরনের হলেও মামার সামনে অন্তত মামীর গায়ে হাত দেওয়া

চলবে না বা ধাক্কাধাক্কি কবা চলবে না সেটা সে ঠেকে আব ঠকে শিখেছিল। ঠেকে অর্থাৎ মামার হাতে বিষম প্রহাব খেয়ে, আব ঠকে অর্থাৎ মামাব সামনে মামীব ঠাণ্ডা মেয়েটির মতো গো-বেচাবী মুখ দেখে। তাবপব যত দিন গেছে, মামীব সঙ্গে এক-জোট হযে অনেক ব্যাপাবে সে ববং মামাব বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র কবেছে। মগনলাল ভিখুকে ঠাট্টা কবে আজও হনুমান ডাকে। হনুমান যেমন সীতা-ভক্ত, ভিখুও তেমনি মামী-ভক্ত।

ভুটাইকে সুশ্রী কেউ বলবে না। চোযাডে চেহাবা। কিন্তু বিযেব আগে তাব মধ্যেই অনেক শ্রী দেখত জানকী। সবল পুরুষেব ছাঁদ-ছিবি দেখত। কিন্তু এখন যত দেখছে তত কুৎসিত লাগছে। কান দুটো বড বড, চোখ দুটো আবাব তেমনি ছোট, নাকটা হঠাৎ যেন থুবডে থেমে গেছে—আনাজেব ঠেলা নিযে যখন বেবোয, জানকীব এক-একসময মনে হয, বিক্রি যে বেশি হয না তাবও কাবণ ওই চেহাবা। কত আনাজওযালা আছে, ওবকম কর্কশ মর্তিকে কাব ডাকতে সাধ? অথচ ও কিনা বাপেব সঙ্গে একবকম ছলনা কবেই এই ঘবে এলো। কি দেখে এলো? হঠাৎ ওব এবকম মতিচ্ছন্ন হল কেন? ওকে ঘবে আনতে না পাবলে লোকটা কাজকর্ম বেচা-কেনা বন্ধ কবে ঘবে উপোস কবে শুকিযে মববে বলেছিল বলে? এতবড বেইমান আব হয। এখন যে ও শুকিযে মবছে দেখে না পর্যন্ত। এখন এক মন্ত্র, ধাব শুধতে হবে, অথচ মুবোদ তো কত—আসল কমানো দূবে থাক, সুদ যোগাতে প্রাণান্ত। বস-কষ যেটুকুও বা ছিল, ওই ধাবেব ফাটলে সব চুপসে গেল। শুকনো নীবস ছিবডেব মতো এখন।

পাশাপাশি মগনলালেব দিন-কে-দিনই যেন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। ভাবি জুতো, মোটা মোজা, হাফ-প্যান্ট হাফ-শার্ট পবে, বেল্ট বেধে তকমা এটে যখন কাজে বেবোয বা কাজ থেকে ফিবে আসে—জানকী ভাবে পুরুষ একেই বলে। প্রাযই তো দেখে, প্রাযই দেখা হয। বাপেব ঘবেব কাছেই তাব ঘব। মেজাজ ভালো থাকে না বলে জানকী ঘন ঘন বাপেব ঘবে যাযও আজকাল। তাব নির্বুদ্ধিতাব দরুন বাপ তাকে এক-একসময গালাগাল কবে। জানকী সেটা প্রাপ্য ভাবে। ওদিকে মগনলালও তাব বাপেব কাছে আসাটা বাডিযেছে। তাব চোখেব ঘোব যে কাটেনি এখনো সেটা একনজব তাকালেই জানকী বুঝতে পাবে। বাপ হয়ত কিছু বলেও থাকবে তাকে। হযত বলেছে, মেযেটা জলে পডল। মগনলালেব হাব-ভাব কথাবার্তায সহানুভূতিব আভাস পাওযা যায।

জানকীব মনে হয়, সীতাব মতোই অবস্থা তাব। বাক্ষসটা তাকে মাযায় ভুলিযে ঘরে এনে আটকেছে। সীতা উদ্ধাব হযেছিল, কিন্তু তাব আব উদ্ধাবেব আশা নেই। তবু ধাব-দেনাব দরুন দিনেব মধ্যে চৌদ্দ ঘণ্টা বাইবে ঘুবে ঘুবে আনাজ বেচে বলে বক্ষা। অনেকদিন বহু দূবেও চলে যায শুনেছে। কিন্তু ধাব শোধ হযে গেলে বাক্ষসমূর্তিটা আবো ভালো কবে দেখতে পাবে জানকী—তখন একেবাবে খাবে ওকে। দিনান্তে তখন জানকী বাপেব ঘবেও একটিবাব আসতে পাবে কিনা সন্দেহ। এখনই জানলে কি আব আস্ত বাখত ওকে, তাব ওপব যদি শোনে মগনলালেব সঙ্গেও দেখা হয প্রাযই—বোধহয খুনই কবে ফেলবে ওকে।

রাগে দুঃখে নিজের গায়ের মাংস খুবলে নিতে ইচ্ছে করে জানকীর। সেটা পারে না বলে উষ্মা ঘরেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। তার ফলও যা স্বাভাবিক তাই হয়। এই ভাবেই একে একে তিন বছর কেটেছিল। চতুর্থ বছরে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

সংগ্রামের সূচনা জানকীর মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া নিয়ে। তার পনেরো দিন আগেও হাসপাতালের ডাক্তার জানকীকে পরীক্ষা করে অভয় দিয়েছিল সব ভালো আছে। কিন্তু মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে কী যে হল ভেবে না পেয়ে ডাক্তারও অবাক। জানকীকে পরে জেরাও করেছিল, কিন্তু সে কোনো জবাব দেয়নি। থমথমে গম্ভীর। শুধু মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ কিছু জানে না।

ওদিকে ভুটাইয়েব কর্কশ মুখটা দিনকতক বেশ শুকনো দেখা গেছে।

মাস-দুইয়ের মধ্যেই জানকী দিব্বি সুস্থ হয়ে উঠেছে। আগেব থেকেও বেশি তরতাজা দেখিয়েছে তাকে। কিন্তু ভুটাইয়ের কাছে-এগনো একটুও বরদাস্ত করতে পারত না সে। করতওনা। দু'হাতে ঠেলে সবিয়ে দিত। ফলে ওব ওপর ভুটাইযের পাল্টা আক্রোশও কম নয। তার ওপর জানকীব ঘন ঘন বাপেব ঘবে যাওয়াটা কেমন কবে যেন টেব পেয়েছে। মগনলালের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও। জানকীর ধারণা, ভিখুই কখনো বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে। এই ধারণা থেকেই ভিখুকে জানকী শিক-পেটা কবেছিল একদিন। তেমন ডানপিটে ছেলে না হলে অঘটন ঘটতে পাবত। ভুটাইয়েব হাতে ইদানীং কম নিগ্রহ হত না জানকীব। মারের চোটে এক-একদিন হাড়সুদ্ধ টনটনিযে উঠত। বলা বাহুল্য, যতটা সম্ভব জবাব সে-ও দিত, ফাঁক পেলে দু'হাতে বাববি-চুলেব ঝুঁটি ধরে ঝুলে পড়ত। গতব তারও কম নয। লটাপটি গড়াগড়ি কাণ্ড। তারপব তাকে আয়ত্তে এনে মার যখন শুরু হত, সেটা কমই বা হবে কেমন কবে?

আবাব এক-একদিন হাল ছেড়েছে ভুটাই। বলেছে, তুই ইচ্ছে করে মাব খাস কেন?

হাত ছাড়াতে পারলে জানকী জবাবটা হাতেই দিত, না পারলে দাঁত দিয়ে চেষ্টা কবত। ভিখু আড়াল থেকে দেখত, মামীব হয়ে লড়াইয়ে নামার জন্য তার সমস্ত রক্ত চনমনিয়ে উঠত। কিন্তু নির্বোধ বলে এত নির্বোধ নয় যে সত্যিই এগিযে যাবে।

এমনি একটা সামান্য ব্যাপার থেকেই সেদিন জীবনের মতো ছাড়াছাড়ি দুজনের। যে কারণেই হোক মেজাজ সেদিন চড়া ছিল ভুটাইযের। আর জানকীব মেজাজ তো চড়াই থাকে। সমস্ত দিন তেতেপুড়ে এসে খেতে বসে জানকীর রান্না মুখে রোচেনি। প্রায়ই বলে, জানকী আজকাল ছাইভস্ম রাঁধে। সেদিন একেবারে মারমুখো হয়ে বলেছিল। জবাবে জানকী বলেছিল, খেতে চাইলে সে এবারে একথালা ছাই-ই এনে ধরে দেবে, ভাত দেবে না। ঘরের কোণে কাঠ-চেরার ভোঁতা হাত-দা'টা পড়ে ছিল। ভুটাই খাওয়া ফেলে উঠে ওটা হাতে নিয়ে জানকীর কপালটা মাত্র ইঞ্চি-দুই ফাঁক করে দিয়েছিল। জানকী তাতেই আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল। তার জামা-কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। ভুটাই হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখেছিল।

আট-দশ মিনিটের মধ্যে জানকী উঠে বসেছে। তারপর দাঁড়িয়েছে। তারপর ঘরের

বাইরে এসেছে। তারপর কাপড়ে করে কপাল চেপে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। ছুটতে ছুটতে একেবারে বাপের ঘরে এসে থেমেছে। থামেনি, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

অনেকেই রক্তাক্ত অবস্থায় ছুটতে দেখেছে তাকে। ফলে দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেছে। মাতব্বরেরা এসেছে, মগনলালও এসেছে। দুপুরের ছুটিতে সে ঘরে খেতে আসে।

অনেকেই পরামর্শ দিল এই অবস্থায় জানকীকে থানায় নিয়ে যেতে। ভুটাইকে ভালো-হাতে শিক্ষা দিতে। তাকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য রক্তচক্ষু মগনলাল তক্ষুনি রিকশ ডেকে নিয়ে এলো একটা। কিন্তু বাপ হরদেও তখনো দ্বি-প্রাহরিক গাঁজার কলকে হাতে নেয়নি। তাই তার বিচাব-বিবেচনাও ঝিমিয়ে পড়েনি তখন পর্যন্ত। সে মাথা নাড়ল, থানা-পুলিস কবে কাজ নেই, তাতে ওদের জাতের নিন্দে। মাতব্বর পঞ্চাযেত থাকতে থানায় যাবেই বা কেন, তারাই বিচার-বিহিত করবে।

বলা বাহুল্য, মাতব্বরেরা খুশি। তাবা মাথা নাডল। ভুটাইয়ের অনুপস্থিতিতে বিকেলের মধ্যেই বিচাব-সভা বসল। বিচারটা জানকীর বাপের বাসনা-মতোই হল। বিয়ে নাকচ হয়ে গেল। মেয়ের তরফ থেকে বিয়ে নাকচ করতে হলে বরপক্ষকে পণের টাকা ফিরিযে দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু জানকীর বক্ত নিয়ে সেই টাকার দাবি হারিয়েছে ভুটাই। হরদেওর যুক্তি, মেযের যতটা বক্ত গেছে তাতে উল্টে আবো কিছু পাওনা হয়েছে তার। যাই হোক, পঞ্চায়েতেব রায়টাই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিল সে। একটা পয়সাও ফেরত দিতে হবে না, বক্ত দিয়ে মেয়ে পণের দেনা শুধে এসেছে।

সেই বিকেলেই লোক-মাবফত ভুটাইকে পঞ্চায়েতের বিচাবেব ফলাফল জানানো হয়েছে। যারা গিয়েছিল খবর দিতে তারা ফিরে এসে সানন্দে হরদেও আর মগনলালকে জানিয়েছে, লোকটা একেবারে বোবা মেরে গেছে।

সাত-আট মাস কেটে গেছে। জানকীর কপালের কাটা ঘা অনেকদিন শুকিয়েছে। দাগ মেলায়নি। ওটা থেকেই যাবে। জানকীব জ্বালা জুড়োযনি। ও মুক্তি পেযেছে বটে, কিন্তু লোকটাকে উচিত-মতো শিক্ষা দেওয়া হল না। বাপ আব মগনলালে মিলে শিক্ষা দেবার অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছে। জানকী সাগ্রহে অপেক্ষা কবেছে। কিন্তু জল্পনা-কল্পনাই সাব। আজ পর্যন্তও কিছুই করেনি ওবা।

অবশ্য মুক্তির আনন্দটাও কম নয়। জানকী সকলের নাকের ডগাব ওপর দিয়ে ঘোরে-ফেরে, যেখানে খুশি বেড়াতে যায়—নিজের অতীতটাকে যেন সরোষে দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে চলতে চায় সে। ভুটাইয়ের সঙ্গেও দুই-একদিন দেখা হয়ে গেছে। হয়ে যায়নি, জানকী ইচ্ছে করেই সামনে পড়েছে। ভুটাই ঘাড় গুজে ঠেলা নিযে পাশ কাটিয়ে গেছে। আব জানকী সদর্পে দাড়িয়ে দুই চোখে জ্যান্ত ভস্ম করেছে তাকে।

ভিখু লুকিয়ে আসে প্রায়ই। গোড়ায় গোড়ায় মামী-ই ডাকত। দু'তিন দিন ঘাড় ধরে ঘর থেকে ওকে বার করে দিতে মামী ডাকা ছেড়েছে। আসা ছাড়েনি। ছাড়তে পারেনি। জানকী এখন আর দুর্ব্যবহার করে না ওর সঙ্গে। সদয় ব্যবহারই করে বরং। ছলছল চোখে ভিখু যখন মামার অত্যাচারের কথা বলে, ওর জন্যে তখন মায়াই হয় জানকীর। ভিখু বলে, হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে অত্যাচারের ধকলটা দিনেব

পর দিন ওর ওপর দিয়েই যাচ্ছে এখন। মারতে মারতে আধমরা করে এক-একদিন।

জানকী শোনে আর জ্বলে। ভিখুকে আদর করে খেতে দেয়। এই আদরের লোভেই ভিখু অত্যাচারের ফিরিস্তিটা কতখানি বাড়িয়ে বলে সেই সন্দেহ জানকীর হয়নি কখনো। কারণ জানকী লোকটার ওপর জ্বলতেই চায়। ওই একজনকে কেউ শায়েস্তা করতে পারল না বলেই যত খেদ তার। বাপকে, এমনকি মগনলালকেও এই নিয়ে কথা শোনায় সে।

মগনলালের সঙ্গে এবারে জানকীর বিয়েটা শিগগীরই হবে সকলে আশা করছিল। এই ক'মাসে মেয়েটা যা হয়েছে, দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। অন্তত মগনলাল চোখ ফেরাতে পারে না। ওর কপালের ওই কাটা দাগটা পর্যন্ত সৌন্দর্যের অঙ্গ যেন। চাঁদের একটুখানি কলঙ্কের দাগের মতো। জানকী তার ভাবী রামচন্দ্রের সঙ্গে খোলাখুলিই মেশে এখন। বেশ ফষ্টি-নষ্টি করে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে তার সঙ্গে বেড়াতেও যায়, লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়। এসব খবর বাতাসে ছড়ায় জানে। ছড়িয়ে ওই লোকটার কানেও যায় নিশ্চয়। গেলে পরে কলজেটা কেমন জ্বলে কল্পনা করে জানকী আত্মপ্রসাদ লাভ করে। মগনলালও কম ইন্ধন যোগায় না তাতে, ভুটাইয়ের নামে বানিয়ে অনেককিছু বলে।

কিন্তু বিয়েটা হয়ে উঠছে না, কারণ জানকীর বাপ হরদেও আবারও চড়া পণ হেঁকেছে। ছাড়ুই মেয়ের জন্যে এত পণ চাওয়াটা রেওয়াজ নয়। কিন্তু ছাড়ুই হয়ে জানকীর যেন উল্টে কদর বেড়েছে আরো। হরদেও স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, দেড়শ টাকার একপয়সা কমে হবে না। ওই টাকায় তার মেয়ে নেবার জন্যে কত লোক নাকি হাঁ করে আছে।

হাঁ করে থাকা বিচিত্র নয়। মগনলাল অন্তত অবিশ্বাস করে না। তবে এবারে ভরসা, জানকী আর অন্য কারো ঘরে যাবে না। টাকাটা যোগাড় করে তার বাপকে দিলে তার ঘরেই আসবে সেরকম আশ্বাস দিয়েছে। আর যতদিন না সে-টাকা যোগাড় হয় ততদিন অপেক্ষা করবে—সেই আশ্বাসও। কিন্তু মগনলালের বিশ্বাস, জানকী একটু চেষ্টা করলেই বাপের খাঁইটা কমাতে পারে। গাঁজাখোর বাপ টাকার লোভে রীতিমতো তোয়াজ করে মেয়েকে। মগনলাল জানকীকে বলেছেও সে-কথা, বাপকে বলেকয়ে টাকার অঙ্কটা যদি কিছু কমিয়ে দেয়। কিন্তু জানকী কানে তোলে না। বেশি বললে, হাসে খিলখিল করে, ভ্রূকুটি করে বলে, আমার জন্য দেড়শ টাকাও দিতে চাস না, কেমন মরদ তুই? কখনো বা গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়ে, বাপ রাজি হবে না, সে ওই টাকা ক'টার আশায় বুক বেঁধে বসে আছে, টাকা পাবার আশা না থাকলে মেয়েকেই হয়তো কবে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিত।

· কিন্তু জানকীর বাবা হরদেওর কাছেও একটুখানি সুবিবেচনার আশায় একদিন গিয়েছিল মগনলাল। সে আবার অন্য কথা বলে। প্রায় তাজ্জব কথাই। মেয়ের অবুঝপনা দেখে হরদেও নিজেই বিস্মিত এবং বিরক্ত। জানকী নাকি তাকে বলেছে, দেড়শ টাকা থেকে একশ টাকা আগে নাকের ডগায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসতে হবে ওই লোকটার—ওই ভুটাইয়ের। তারপর সে বিয়েয় বসবে, তা না হলে নয়। ভুটাই তার

দেনার পঞ্চাশ টাকা শুধেছে, আর একশ টাকা বাকি—সেই টাকাটা তাকে ভিক্ষে দিয়ে জানকী দেখিয়ে দেবে সে কেমন মেয়ে। বউয়ের, বিশেষ করে জানকীর মতো বউয়ের যুগ্যি যে সে নয়, সেটা তাকে ভালো করেই আগে বুঝিয়ে দেবে। অতএব দেড়শ টাকা থেকে একশ টাকা চলে গেলে হরদেওর আর থাকল কি? মোটে পঞ্চাশটি টাকা, এর কমে সে পারে কি করে।

এতক্ষণে গোড়ার দিকের রাম-রাবণের প্রসঙ্গটা নিছক একটা ভাবপ্রবণ উপমা ভেবে পাঠক হয়তো বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু ওটা উপমা আদৌ নয়। পুথির রামায়ণ যেমন সত্যি, এও প্রায় তেমনি সত্যি।

প্রতিবছর পুজোর পর দশেরার দিন এই এলাকা থেকে মস্ত মিছিল বার করা হয় একটা। রামায়ণ মিছিল। মিছিল এই এলাকার বটে, কিন্তু সমস্ত শহর জুড়ে দর্শক তার। যে-পথ দিযে মিছিল যায় সেই পথে শহরের লোক ভেঙে পড়ে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ। এই মিছিলের জন্যে এলাকার নামও কম নয়।

জীবন্ত মিছিল। রাম লক্ষ্মণ সীতা, মুনি-ঋষি, জটায়ু, বানরকুল, রাক্ষস রাক্ষসী—সব জীবন্ত। কম করে দেড়শ লোকের ভূমিকা। ষাট-সত্তরটা ঠেলা সংগ্রহ করতে হয়, সেগুলোকে সাজাতে হয়—তারপর যথাযোগ্য সাজ-পোশাক পবে, রঙ আর চুন-কালি মেখে একজন দুজন বা চারজন করে ঠেলায় ওঠে। যেমন দরকার। মিছিলে রামায়ণের মূল কাহিনীটি অক্ষুণ্ণ রাখাব চেষ্টা হয়। সাজ-পোশাক অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যথাসম্ভব সিন-সিনারির ব্যবস্থাও থাকে।

মাতব্বরদের নির্দেশ অনুযায়ী মূক অথচ সচল অভিনেতারা ঠেলায় ওঠে। হাব-ভাব-ভঙ্গীতে তারা তখন রামায়ণেরই মানুষ। এদিকে ঠেলা ঠেলে নিয়ে যাওয়ার লোক প্রয়োজনেরও দ্বিগুণ জোটে। গোটা শহরটিকে একবার এই ভিড় ঠেলে চক্কর দিয়ে আসতে খুব কম হলেও চাব-পাঁচ ঘণ্টা লাগে। নিপুণ এবং অভিজ্ঞ মূক অভিনেতারা জায়গার ভিড় আর রাস্তা বুঝে হাত-পা ছুঁড়ে মুখ নেড়ে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করে। আব কচি-কাঁচারা প্রথম দু'তিন ঘণ্টার অদম্য উদ্দীপনার পরেই কাহিল হয়ে পড়ে।

মোট কথা, শহর জুড়ে বেশ একটা সরগরম ব্যাপার হয় সেদিন।

মিছিলে গত চারবছর ধরে রাবণ সেজে আসছে ভুটাই। রাবণ সাজা যার-তার কর্ম নয়, রীতিমতো তাগত চাই শরীরের। কারণ তার ওপর দিয়েই সাধারণত ধকলটা একটু বেশি যায়। আর গত দু'বছর ধরে রাম সাজছে মগনলাল। তাকে রাম সাজলে যেমন মানায়, ভুটাইকেও তেমনি রাবণ সাজলে মানায় বলে সকলের ধারণা। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলিও মাতব্বরেরাই বাছাই করে দেয়।

সেই পুজো এলো, সেই দশেরা এলো।

ক'দিন আগে থেকেই মিছিলের তোড়জোড় চলতে থাকে। মাতব্বরেরা সাতদিন আগে থাকতে বড় বড় দুতিনটে মিটিং পর্যন্ত করে নেয়।

এবারে সকলেরই সন্দেহ ছিল রাবণ-চরিত্রে ভুটাইকে পাওয়া যাবে কিনা। এমনকি জানকীরও সংশয় ছিল। কিন্তু দেখা গেল সে আপত্তি করল না। প্রতিবারের মতোই রাবণ সাজতে রাজি হল।

শুনে মগনলালকে জানকী বলেছিল, রাজি হবে না তো কি, সত্যিকারের রাক্ষসই তো। সাজার দরকার কি, ঠেলায় দাঁড়ালেই সকলে রাবণকে চিনে নেবে!

পারলে রামেব বদলে জানকী নিজের হাতেই রাবণ বধ করে।

মিছিলের আগের দিন মগনলাল চুপি চুপি জানকীকে জানালো, এবারে ভুটাইকে জন্মের শোধ জব্দ করার ব্যবস্থা হয়েছে। বাছাধন টেরটি পাবে এবারে—

শুনেই উল্লাসে নেচে উঠল জানকী, কি হবে? কি করা হবে?

দেখিস'খন, এখন চুপ একেবারে। কাউকে বলবি না, সব ভেস্তে যাবে তাহলে!

জব্দ হলে জানকী খুশী হয় সত্যি কথা, কিন্তু সত্যি সত্যি জব্দ করা যাবে সেরকম বিশ্বাস তার নেই। ওকে জব্দ করার কথা তো কতবারই শুনল এ-পর্যন্ত, কে কি করল—দিব্বি তো বুক ফুলিয়ে রাবণ সাজতে চলেছে!

জনারণ্যের মধ্যে দিয়ে পরদিন সন্ধ্যায় মিছিল শুরু হল। এক-একটা করে সাজানো বথ যায় আর সকলে হৈ-হৈ করে ওঠে। তাদের সামলাতে ভলাণ্টিয়ারদের প্রাণান্ত অবস্থা। বন্দিনী সীতাকে দেখে আ-হা আ-হা রব ওঠে, ভগ্ন-পাখা জটায়ুকে দেখেও। যুদ্ধসাজে বানরকুলকে যথার্থই উৎসাহিত করে তুলতে চেষ্টা করে জনতা, বাহবা দেয়। হনুমানকে দেখতে তো আনন্দেব হুল্লোড় পড়ে যায়। আবার রাক্ষসদের দেখে মুখ-ভেঙানো এবং কটূক্তি শুরু হয়ে যায়। রাম সীতা লক্ষ্মণ হনুমান প্রভৃতির রথ এলেই জনতাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে রথ ছুঁতে আসে তারা, রথের ধুলো মাথায় ঠেকায়।

ঠিক তেমনি বিপরীত প্রতিক্রিয়া রাবণের রথ দেখলে। শুধু গালাগাল আর মুখ-ভেঙচানো নয়, ছোলাভাজা, বাদামের খোসা, কাগজের মোড়ক ইত্যাদি ছুঁড়ে মারা হয়। ছোট ছোট ঢিলও পড়ে। রাবণের বেশি হম্বি-তম্বি দেখলে জনতা তার রথ ঘিরে ধরতে চায়। অথচ হম্বি-তম্বি না দেখালে রাবণ আর রাবণ কি হল! এইজনাই রাবণের ওপর দিয়ে ধকলটা যায় সবথেকে বেশি। জনতা বেশি এগোতে চাইলে, বিকট হুঙ্কার দিয়ে আর তরবারি নেড়ে সত্যি সত্যি সংহারের ভয় দেখিয়ে পিছু হঠাতে হয় তাঁদের। রেগে গেলে রাবণ-বেশী ভুটাই দুই-এক ঘা বসিয়েও দেয় কাউকে।

কিন্তু এবারে দেখা গেল রাবণের ওপর এক-দঙ্গল জনতার আক্রোশটা বড় বেশি। তারা সেই থেকে পিছু নিয়েছে। ফলে সাহস পেয়ে অন্য লোকেও জুটছে তাদের সঙ্গে। রাবণের ওপর রাগ তো সকলেরই। অল্পস্বল্প খোঁচাখোঁচি ইঁটপাটকেল খেতে ভুটাই অভ্যস্ত। মোটা আলখাল্লায় লাগেও না তেমন। কিন্তু এবারে লাগছে। ফলে ওর রাগ যত চড়ছে, জনতার আক্রোশও বাড়ছে তেমনি। এক জায়গায় তো ছোটখাটো মারামারিই হয়ে গেল একটা। সেটা ঠাণ্ডা হতে-না-হতে বেশ বড় ঢিল আর কড়া লাঠির ঘা পড়তে লাগল। ভলাণ্টিযাররা রাবণের ওপর হামলা ঠেকাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল।

তারপর ভুটাই হাঁটুতে বড়রকমের একটা চোঠ খেয়ে হঠাৎ রাবণের ভূমিকাই ভুলে গেল। কিংবা রাবণের ভূমিকাটাই হয়ত বা সত্যি বলে ভুল করল। ভোঁতা তরবারী হাতে হুঙ্কার দিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ল সে। মাথায় সত্যি সত্যি আগুন জ্বলছে। আবার যখন রথে অর্থাৎ ঠেলায় তুলে দেওয়া হল তাকে, মারের চোটে তখন ধুঁকছে সে। কপালের জায়গায় জায়গায় দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে গেছে। ঘাড়-পিঠ চটচট করছে—রক্ত বেরুচ্ছে টের পেল।

তবু দাঁড়াল উঠে। তারপর ফ্যালফ্যাল করে মারমুখি জনতার দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎই যেন মাথার আগুন নিবে গেছে তার। কিছু যেন উপলব্ধি করছে সে। আর সেই উপলব্ধির ধাক্কায় বিমূঢ়।

তারপরেও আঘাতের বিরাম নেই। সেই একদল জনতা যেন ক্ষিপ্ত তখন। কিন্তু রাবণ-বেশী ভুটাই ফিরে আব আঘাত দেবার চেষ্টা করছে না, রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে রাবণের পোশাক ফেলে দিয়ে পালিয়েও যাচ্ছে না। আঘাত সহ্য করতে লাগল, দু-পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ানো শক্ত হল যখন, তখন বসে পড়ল। আর রথ ঘুরে এসে থামল যখন, রাবণ তখন ঠেলা-রথে শুয়ে পড়েছে। অর্ধ অচেতন।

জানকী রাবণের হেনস্থা খানিকটা দেখেছে। জনতার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাদের দ্বিগুণ রাগে সেও জিভ ভেঙচেছে। কিন্তু পরে কি হয়েছে সেটা ঠিক সে ঠাওর করতে পারেনি। রথ তো আর এক জায়গায় থেমে থাকেনি—সচল মিছিল। তবে কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে শুনেছে। মারামারিও নাকি হয়েছে। কিন্তু ঠিক যে কী হয়েছে জানকী জানে না।

জানল পরদিন সকালে। বাপ আর মগনলাল সোল্লাসে আদ্যোপান্ত জানালো। মারের চোটে আধমবা করা হয়েছে লোকটাকে। এ-জম্মে আর রাবণ-সাজার শখ হবে না। হি-হি করে দুজনে অজস্র হাসছে তারা, আরো হাসছে ভুটাইয়েব বোকামিব কথা ভেবে। অত মার খেয়েও রথ ছেড়ে পালালো না, বোকার মতো মারই খেল একধাব থেকে।

মগনলাল হেসে আটখানা হয়ে বলল, তেল মরেছে এবারে, আর কারো গায়ে হাত তুলবে না।

জানকী এমন তাজ্জব যে, খুশি হতেও ভুলে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে সে একবার বাপের দিকে আর একবার মগনলালের দিকে তাকাচ্ছে। খানিক বাদে তার কথা শুনে অবাক ওরা দুজেন। জানকী বলল, এভাবে ঠকিয়ে মাবলি!...বুঝতেও দিলি না!

মেয়ের কথার ধরন-ধারণ হরদেও সবসময় বুঝে ওঠে না, বুঝতে চেষ্টাও করে না। ভুটাইয়ের নিগ্রহটা জানকীর সঙ্গে বসে আর একদফা উপভোগ করার বাসনা মগনলালের। সেটা বুঝেই হোক বা যেজন্যেই হোক, হরদেও উঠে ভিতরে চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিমান ভগ্নদূতের মতো ভিখু উপস্থিত সেখানে। মনে মনে তার উদ্দেশে একটা অশ্লীল গাল পেড়ে মগনলাল জিজ্ঞাসা করল, কি রে, তোর মামা আছে কেমন?

ভিখু ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, কি জানি—

কেন? কি করছে?

যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে।

একটু দূরে দাঁড়িয়েই জানকীর দিকে ঘুরে তাকালো ভিখু। তার হাব-ভাব আর চাউনি খুব স্বাভাবিক লাগছে না জানকীর। বেশি রাগ বা বেশি ঘৃণা হলে এভাবে তাকায় ছোঁড়াটা। জানকী খুব চেনে। তার ঘোরালো চোখ-দুটো ওর মুখের ওপর আটকে রইল।

কিন্তু মগনলাল অত লক্ষ্য করল না। ছোঁড়াটার জবাব শুনে খুশি। ওকেও নিজেদের লোকই ভাবে সে আর ভুটাইয়ের শত্রু ভাবে। সংবাদটা শুনে দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলল, আ-হা, খুব লেগেছে বুঝি!...সারাক্ষণ ধরে অমন হাঁদারামের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল কেন শুধিয়েছিস?

শুধোইনি। শুনিছি।—ভিখু নির্লিপ্ত।—বন্ধুদের বলছিল।

কি বলছিল? কি বলছিল? মগনলাল উদগ্রীব।

জানকী আরো গম্ভীর। তার দৃষ্টিটা আরো ধারালো।

মামা বন্ধুদের কি বলছিল ভিখু সাদা-সাপটা সেই ফিরিস্তি শোনালো তাদের। তার উক্তির সারমর্ম,—একটু আগে দুজন বন্ধু এসেছিল তার মামাকে দেখতে, আর শুধোচ্ছিল এমন মার খেল কেন, লোকে অত রেগে গেছে দেখেও রাবণের পোশাক আর মুখোশ খুলে ফেলল না কেন? ভুটাই তাদের বলেছে, তার সঙ্গে বেইমানী করা হয়েছে সেটা সে বুঝেছিল, কারণ কোনোবার ওরকম মারামারি হয় না। সেজন্য সে-ও উল্টে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু যখনই মনে হয়েছে এই বেইমানীর মধ্যে জানকীও আছে, তখন আর রুখতে চেষ্টা করেনি। জানকীকে অমন মার মেরেছিল বলেই মার খেয়ে দেখছিল কেমন লাগে। জানকী তার মারের শোধ নিচ্ছে বুঝতে পেরে মনের সাধে ওদের মারার সুযোগ দিয়েছে।

মগনলাল হাসছিল বটে, কিন্তু কেন জানি ভালো লাগছিল না শুনতে। বিবৃতি শেষ করে ভিখু আবার তেমনি করে তাকালো জানকীর দিকে।

জানকীর পাথরের মূর্তি, কিন্তু দুই চোখে আগুন। হঠাৎ সাঁ করে ঘরে ঢুকে গেল সে। পরমুহূর্তেই একটা চেলাকাঠ হাতে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে বেরিয়ে এসে ভিখুকে তাড়া করল। কিন্তু ভিখুও প্রস্তুতই ছিল যেন, একদৌড়ে উঠোন পেরিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল। তারপর পালিয়ে গেল।

মগনলাল হকচকিয়ে গেছে একেবারে। মেয়েকে চেলাকাঠ নিয়ে ছুটতে দেখে হতভম্ব হরদেও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। জানকী বড় করে দম নিল একটা। তার গলা দিয়ে অস্ফুট জ্বালা ঝরল,—আমি বরাবর জানি ও ওর দলে...

কী হয়ে গেল হঠাৎ বাকি দুজনের কারো মাথায় ঢোকেনি। মগনলাল শুধু এইটুকু বুঝেছে, ভিখুটা ভয়ানক বেয়াদপি কিছু করেছে। আজকালের মধ্যেই ছোঁড়াটাকে আধমরা করে ধরে নিয়ে আসবে প্রতিজ্ঞা করল। অনেক তোয়াজ করে তবে জানকীকে ঠাণ্ডা করা গেল।

বেলা দ্বিপ্রহরে আবার এসেছে মগনলাল।

একটা উষ্ণ প্রত্যাশায় কাজ কামাই করেছে আজ। সকালে হরদেওকে বাজারের সেরা মাল উপহার দিয়ে গিয়েছিল। সে এতক্ষণে গাঁজায় দম দিয়ে শিউজীর কাছাকাছি বিচরণ করছে সন্দেহ নেই।...জানকীর এতকালের জ্বালা দূর করেছে মগনলাল, আজ অন্তত নিবিড়তর কিছু প্রাপ্তির আশাটা দুরাশা নয় তার। দুপুরে আসবে ইঙ্গিতে সেই আভাস জানকীকে সকালেই দিয়ে গিয়েছিল। জানকী আপত্তি করেনি। নিবিড় সান্নিধ্যে ওকে পেলে পণের অঙ্কটাও হয়তো আজ অনেকটা নামানো যাবে।

খুপরি-ঘরে হরদেও বেঘোরে ঘুমুচ্ছে, যেমর্ন আশা করেছিল মগনলাল। কিন্তু ঘরে-বাইরে কোথাও জানকীর চিহ্নমাত্র নেই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ষষ্ঠ-চেতনা যেখানে ঠেলে নিয়ে এলো, সেখানে এসে মগনলালের সর্বাঙ্গ অসাড় একেবারে।

বাঁশের বাতার একটা ফাঁক দিয়ে ঘরের সবই দেখা যাচ্ছে। ভুটাই মণ্ডলের ঘর।

ভুটাইয়ের মাথাটা জানকীর কোলে। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে তার ঘাড়-কপাল-বাহুর ক্ষতস্থানগুলো ভালো করে মুছে দিচ্ছে জানকী। আব বেশ জোরেই বকছে, যেমন পাজী তুই তেমনি সাজা হয়েছে, আর বউয়ের গায়ে হাত তুলবি কক্ষনো? বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, আরো হলে আরো ভালো হত—

তার কোলে মাথা রেখে ঘাড় উঁচিয়ে জানকীর মুখের দিকে চেয়ে ভুটাই দাঁত বার করে হাসছে।

আর বাইরে, গতরাতের সব মারগুলো আজ শপাশপ মগনলালের ওপর এসে পড়ছে। তার গায়ের মাংস খুবলে নিচ্ছে।

একটি কোণের ঘর

বারান্দার রেলিংএ ভিজে শাড়ি মেলতে এসে প্রভাতী থমকালো একটু। জোড়াভুরু কুঁচকে গেল। রাস্তার ওধারেব বাড়িটার দোতলার কোণের ঘরেব অন্দরে সরাসবি দৃষ্টি চালিয়ে দাঁড়ালো একটু।...কি বেহায়া রে বাবা লোকটা! আরো যেন সুবিধে হল, হাঁ করে চেয়েই আছে।

ধীরেসুস্থে গম্ভীরমুখে প্রভাতী শাড়ি মেলে দিল। তাকে দেখে আলসের খুপরি থেকে শাদা-কালো পায়রা দুটো হাতের কাছে রেলিংএ এসে বসল। প্রচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতায় হাতের শাসনে প্রভাতী পায়রা দুটোকে উড়িয়ে দিল। চোখের সমুখ থেকে দূর করে দিল যেন। তারপর বক্র কটাক্ষে ওই কোণের ঘরটার দিকেই তাকালো আবার।

তাকালে ঘরটার ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়। খাট-পালঙ পর্যন্ত। বাড়িটা তিরিশ-চল্লিশ গজের মধ্যে হবে। কিন্তু দোতলার এই বারান্দা থেকে দোতলার ওই কোণের ঘরটা আরো কাছে মনে হয়।

প্রভাতীর বক্র কটাক্ষ আর বক্র থাকল না। সোজাসুজিই তাকালো আবার। সাহস দেখে গা জ্বলে।

লোকটা এদিকে চেয়ে হাসছে মিটমিট করে। প্রভাতী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, হাসছে।

ঘরের মধ্যে নিরঞ্জন বসে কাগজ পড়ছিল। প্রভাতীও সামনে এসে বসল। আজ বলবে কথাটা...।

পনের-বিশ দিন হয়ে গেল এই এক ব্যাপার লক্ষ্য করছে। বলতে গেলে ওই বাড়িটা দখল হবার পর থেকেই দেখছে। প্রথম দু'চার দিন খেয়াল করে নি। কারা এলো পাড়ায়, এত টাকা দিয়ে অমন একটা গোটা বাড়ি কে ভাড়া নিল, সেই মেয়েলী কৌতূহলই বরং বেশি ছিল। তিন-চার বন্ধু মিলে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে জেনে কৌতূহল গেছে। তেমন কেউ নয় তাহলে।

কিন্তু এই বিসদৃশ ব্যাপারটা লক্ষ্য করল পাঁচ-সাত দিন না যেতেই।

খাটের ওপর ছোট একটা জলচৌকি পেতে বসে লোকটা। সোজাসুজি এই বারান্দার দিকে মুখ করেই বসবে—রোজ, প্রত্যহ। হাতে কলম থাকে, জলচৌকিতে কাগজও থাকে। কিন্তু লিখতে বড় দেখে না। সারাক্ষণ এই দিকেই চেয়ে আছে। এই বাবান্দার দিকে। প্রভাতীর সঙ্গে অনেকদিন চোখোচোখি হয়েছে। কিন্তু একটু সংকোচ যদি থাকত লোকটার! চেয়ে আছে তো আছেই। একেবারে তন্ময় চাউনি।

দিনের মধ্যে কতবার যে এই বারান্দায় আসতে হয় প্রভাতীকে ঠিক নেই। নিজের জামা কাপড় রোদে দেওয়া, রোদ থেকে তোলা, খোকার জামা কাঁথা তোষক বালিশ ঘণ্টায় ঘণ্টায় শুকোতে দেওয়া আর তোলা, পায়রা দুটোকে তিন-চার দফায় যব-গম খেতে দেওয়া, এ-ছাড়া হাতে কাজ না থাকলে জিরোবার জন্যে বারান্দায় রেলিং ধরে একটু দাঁড়ানো, রাস্তা দেখা, লোক-চলাচল দেখা, বিকেলে গা ধুয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেওরদের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করা—বলতে গেলে একটা ঘরের থেকে এই একটা বারান্দায় আনাগোনা অনেক বেশি অপরিহার্য। কিন্তু আসতে যেতে চলতে ফিরতে সারাক্ষণ যদি একটা লোক হাঁ করে চেয়ে থাকে, কেমন লাগে।

তার ওপর আজ আবার হাসছিল। প্রভাতী নিজের চোখে দেখেছে, স্পষ্ট দেখেছে। পায়রা দুটোকে উড়িয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই হাসতে দেখেছে।

অভিযোগটা কি, সঠিক বুঝে উঠতেই নিরঞ্জনের সময় লাগল একটু। কাগজ ফেলে স্বচক্ষে উঠে এলো দেখতে। দেখল মিথ্যে নয়, এদিকেই চেয়ে আছে বটে লোকটা। চেয়েই আছে।

এরপর দিনে পাঁচ-সাতবার করে এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করল নিরঞ্জন। মনে মনে লোকটার ওপর বিরক্ত একটু হল হয়ত। মুখে প্রভাতীকে ঠাট্টা করল, এই জন্যেই দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার করে তোমার বাইরে এসে দাড়ানো!

প্রভাতী রাগ দেখিয়েছে, দাঁড়াও, এবার থেকে যতবার বারান্দায় যাব, একটা ঝাঁটা হাতে নেব।

নিরঞ্জনের ঠাট্টার দরুনই হোক, আর প্রভাতীর উষ্মার ফলেই হোক—ব্যাপারটা দেওররাও জানল এবং দেখল। তারা বরদাস্ত করতে চাইল না। নতুন বয়সের ছেলে সব, সহ্য হবেই বা কি করে! মেজাজের মাথায় তারা প্রথমে ঠিক করল, রাস্তায় একদিন ধরে বেশ গোটাকতক ঝাঁকুনি দিয়ে দেবে, কিন্তু নিরঞ্জনের তাতে বিশেষ আপত্তি। কোনো গণ্ডগোলের নামেই অস্বস্তি তার। নিজের ঘরে বসে যে যেদিকে খুশি

চেয়ে থাকবে, তাই নিয়ে হামলা করতে গেলে উল্টে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা।

দেওরদের অভিলাষে প্রভাতীরও আপত্তি। এসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে গেলেই পাঁচ কান হবে, পাচ বাড়ির ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা উঁকিঝুঁকি দেবে—লজ্জার ব্যাপার না? তাছাড়া লোকটা কি স্বীকার করবে নাকি যে নিজের ঘরে নিজের খাটে বসে অন্য বাড়ির একটি মহিলাকে দেখার জন্যে এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। সবাই ভাববে বাড়াবাড়ি। প্রভাতী সত্রাসে দেওরদের চোখ রাঙিয়েছে, কেউ কিছু বলতে গেছ কি আর রাখব না বলে দিলাম।

অতএব দেওররা শেষে নির্বাক দ্রষ্টা-ভক্তটিকে ছেড়ে প্রভাতীকে নিয়েই পড়ল। ঠাট্টা-তামাসার খোরাক পেল তারা। প্রভাতী বারান্দার দিকে পা বাড়ালেই তারা টিপ্পনী কাটে, এ-সময় আবার তোমার কি দরকার পড়ল ওখানে? কখনো বলে, লোকটা যে ঠায় হাঁ করে চেয়ে বসে আছে বউদি তখন থেকে—একবারটি এসো। কখনো বা বলে, লোকটা নিশ্চয় কবি, তোমাকে দেখে দেখে রোজ একটা করে কবিতা লেখে।

রাগ করুক আর যাই করুক, মনে মনে ওই কোণের ঘরের লোকটার প্রতি প্রভাতীরও কৌতূহল ছিল একটু। লোকটা কে? কি করে? কাগজ কলম নিয়ে বসে কেন? সত্যিই কবিটবি কিছু নাকি? কি করেই বা জানবে, কেউ তো বাড়ির বাইরে বেরুতে দেখেনি এই তিন সপ্তাহের মধ্যে। আসলে কিছুই করে না, কিছুই লেখে না—ভণ্ড একটি। লেখার ভান করে শুধু। চলে কি করে? বউও তো আছে একটা দেখা যায়, দেখতে-শুনতেও মন্দ নয়—তবু, চরিত্র দেখো লোকটার। বেশিক্ষণ ঘরে দেখা যায় না বউটাকে, কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকে বোধহয়, সোয়ামীর এই গুণপনা জানেও না হয়ত। বউটার সঙ্গে দিব্যি হেসে হেসে লোকটাকে কথাও বলতে দেখেছে প্রভাতী—কত যেন ভালো মানুষ। নির্লজ্জ কোথাকার—

কিন্তু ওই নির্লজ্জ লোকটাকে' কেন্দ্র করে নিজের স্বামী আর দেওরদের হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করছিল প্রভাতী। সেটুকু বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

প্রভাতীর বয়েস সাতাশ-আটাশ। বিয়ের সময় সুশ্রী ছেড়ে বেশ সুন্দরীই ছিল বলা যেতে পারে। লম্বা দোহারা চেহারা ছিল। বেশ ফর্সা। এখন মোটা হওয়ার দরুন আরো বেশি ফর্সা দেখায়। আর মুখখানা এখনো ভর-ভরতি মিষ্টি। কিন্তু প্রভাতীর মস্ত খেদ, নিজের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই সাত-আট বছরে সে দিব্বি মুটিয়ে গেছে। প্রথমে অত খেয়াল করে নি, ভালই ররং লাগছিল। কিন্তু খেয়াল করল যখন, তখন অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক ওষুধ খেয়েছে, চুপিচুপি অনেক উপোস করেছে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয় নি। তনু-তনিমা স্বেচ্ছাচারীর মত নিজের ইচ্ছায় স্ফীতিলাভ করেছে। প্রভাতী হাল ছেড়েছে শেষ পর্যন্ত। দেওররা এই নিয়েও অনেক ঠাট্টা-ইয়ারকি করেছে। নিরঞ্জন কখনো সেই ঠাট্টায় যোগ দিয়েছে, কখনো বা নিরিবিলিতে অনুযোগ করেছে, এমন হচ্ছে কেন—।

তারপর যথানিয়মে এই প্রসঙ্গ পুরনো হয়েছে একদিন।

ও-বাড়ির ওই কোণার ঘরের নির্বাক দর্শন-পর্ব থেকে এ-বাড়ির লোকেরা আবার

নতুন করে আবিষ্কার করল যেন প্রভাতীকে। ঠাট্টার ফাঁকে ফাঁকে দেওরদের মনে হল, তাদের বউদির মুখখানা মিষ্টিই বটে। এমন কি নিরঞ্জনও ওই কোণার ঘরের লোকটার চোখ দিয়েই দেখতে চেষ্টা করল প্রভাতীকে। চেষ্টাটা দুরূহ নয় এমন কিছু। তারও ভালো লাগল, মিষ্টি লাগল। মোটা হলেও এমন বে-খাপ্পা মোটা কিছু নয়—তারাই একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেছে। বাড়িসুদ্ধু লোকের এই পরিবর্তনটুকুই প্রভাতী উপলব্ধি করেছে। করছে।

কিন্তু সেদিন কোণাঘরের ওই হাঁ-করা লোকটার ওপর বিষম চটেছিল প্রভাতী।

বাড়িতে একটা উপদ্রব জুটেছে। একটা আকাশী রঙের পায়রা। পুরুষ-পায়রা। কোথা থেকে এসে জুটেছে কে জানে। বারান্দার আলসের পাকা-বাসিন্দা পায়রা দুটোর তাতে ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু আগন্তুক পায়রাটি নাছোড়বান্দা—এখানকার পুরুষ-পায়রাটার জায়গা দখলের মতলব। প্রভাতী সেদিন এই নতুন আপদটাকে তাড়াবে বলে বদ্ধপরিকর। আকাশী রঙের পায়রাটা বেহায়ার মত বেশ খানিক যুঝে শেষ পর্যন্ত গৃহকর্ত্রীর তাড়নায় হাল ছেড়ে আকাশে উড়তে বাধ্য হল।

পায়ারা তাড়িয়ে প্রভাতী এদিকপানে ফিবেই থমকে দাঁড়াল।

কোণাঘরের লোকটা এদিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে একেবারে।

প্রভাতীর ইচ্ছে হল বড় করে মুখ ভেঙচে হাসির জবাবটা দেয়। ওই বেহায়া পায়রাটাব মতই এই বেহায়া লোকটাকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছে করছিল তার।

কিছুই না করে ঘবে বসে ফুঁসতে লাগল। এমন নির্লজ্জও হয় পুরষগুলো।

দিন সাতেক পরে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে।

সব থেকে নামী সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রের একটা গল্প নিয়ে দেওরদের মধ্যে হাসিখুশির জটলা চেলেছে। গল্পের নাম কপোত-কপোতী। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রায় নবাগত। কিন্তু গল্পটির পাশে সাহিত্যিক-পরিচিতিতে গল্পটির অজস্র প্রশংসা করেছেন সম্পাদক। বাংলা-সাহিত্যে এমন গল্প বিরল নাকি। নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশেষ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ভিন্ন দুটি পায়রার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার এই গল্প রসোত্তীর্ণ করে তোলা দুরূহ বলেই তার অভিমত।

গল্পটিও পড়েছে দেওররা। ভালো লেগেছে। বিস্ময়ে পুলকে হতভম্ব তারা। কারণ লেখকটিকে তারা চিনেছে। গল্পটাও যে তাদের বারান্দার আলসের পায়রা দুটোর গল্প তাতে কোনো ভুল নেই। সরু আধ-হাত আলসেতে একটার পিছনে আর একটার ঘোরা ফেরা চলার ভিতর দিয়ে পায়রা দুটোর যে প্রেম-প্রীতি মান-অভিমান আবিষ্কার করেছেন লেখক—তা এমন সুন্দর, যেন দুটি মেয়ে-পুরুষকে নিয়েই লেখা। গল্পের মধ্যে প্রভাতীর উল্লেখও আছে, অবশ্য নামের উল্লেখ নয়—যার হাত থেকে পায়রা দুটো নিঃশঙ্কে এসে খাবার খায়, তার কথা। নতুন একটা পুরুষ-পায়রার দস্যুর মত এসে এই সুখের কপোত-নীড়ের ঘরণীটিকে দখলের প্রয়াস এবং সহৃদয়া গৃহকর্ত্রীর হাতে তার নির্যাতন ও বিতাড়নের চিত্তাকর্ষক প্রহসনে কাহিনীর সমাপ্তি। গল্পটা যত না অভিনব, তার থেকে অনেক বেশি মর্মগ্রাহী লেখকের সুপটু ব্যঞ্জনায় আর বিন্যাসে।

দেওররা বৌদিকেও ধরে এনে গল্পটা শুনিয়েছে। তারপর হাসাহাসি করেছে।—ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে লোকটা এই দেখত চেয়ে চেয়ে! আমরা হুট করে গিয়ে সত্যিই যদি পাঁচ কথা শুনিয়ে আসতাম, কি বিচ্ছিরি হত বলো তো!

প্রভাতীও তাদের সঙ্গে না হেসে পারে নি।

নিরঞ্জন বাড়ি ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই ভাইদের মুখে মজার খবরটা শুনল। এক ভাই সাপ্তাহিক পত্রটা এগিয়ে দিল। ভাইদের ঘরে দাঁড়িয়েই গল্পটা শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলল নিরঞ্জন। তারপর হাসতে লাগল সেও।

হাসতে হাসতেই নিজের ঘরে এলো।

ঘরের আলোটা নেভানো।

কিছু না ভেবেই আলোটা খট করে জ্বালল সে। তারপরেই থমকালো একটু।

বিছানায় প্রভাতী শুয়ে। বাহুতে মুখ ঢাকা। আলো জ্বালতে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে মুখ থেকে হাত সরালো।

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, মাথা ধরেছে নাকি?

স্ত্রীর মাথা-ধরা রোগ আছে।

হুঁ। বাহুখানা আবারও চোখের ওপর উঠে এলো প্রভাতীব।

কিন্তু স্ত্রীর এই মাথা-ধবাটা যে তুচ্ছ নয়, নিরঞ্জনের খেয়াল ছিল না। সহাস্যে বলল, কি কাণ্ড, পড়েছ' গল্পটা?

সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু রাগে যেন ফেটে পড়ল প্রভাতী। চোখ থেকে হাত নামিয়ে সে ঝাঁঝিয়ে উঠল, কাণ্ড রেখে তুমি আলোটা নেভাবে এখন?

হকচকিয়ে গিয়ে নিবঞ্জন তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিল।

কান্নার স্বাদ

বাসের সেই ঘটনার ঠিক চার দিনের মধ্যেই বিয়ের তাবিখ ছিল। শুভ কাজে আজ হলে কাল করতে নেই। তাছাড়া কলকাতা শহর, হাতে টাকা থাকলে রাতারাতি বিয়ের বর-কনে পর্যন্ত মেলে নাকি। এ তো শুধু বিয়েটা দেওয়া, তা হাতে চার-চারটে দিন সময়।

ওই দিনেই সুনির্বিঘ্নে বিয়েটা হয়ে গেল অরুণার। আর ঘটা করেই হল। বিয়েব খরচ-খরচা বাবদ বেশ মোটা টাকাই সরিয়ে রেখে গিয়েছিলেন অরুণার বাবা। ভায়েদের আমলেও সে টাকায় হাত পড়েনি। তাঁরা বরং সাধ্যমত আরো কিছু যোগ করেছেন তার সঙ্গে।

অতএব কোথাও কিছু ত্রুটি হয়নি। ছেলের বাড়ির লোকেরা খেয়েদেয়ে ঢেঁকুর তুলে মেয়ের বাড়ির অজস্র প্রশংসা করতে করতে বিদায় নিয়েছেন। আর দান-সামগ্রী দেখে মুখে না বললেও মনে মনে অন্তত মেয়ের বাড়ির বড় নজর স্বীকার করেছেন। চার দিনের নোটিসে বিয়ে—শুভ কর্মটি হাতধোয়া গোছেরই হবে ধরে নিয়েছিলেন

কেউ কেউ। সব দেখে শুনে তাঁরা আর টুঁ-শব্দটি করেন নি।

অফিসের বন্ধুরা বর-কনে দুই তরফেরই বন্ধু। তারা যথেষ্ট হৈ-চৈ করে অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়েছে। ছেলের বাড়ির উৎসবে, অর্থাৎ বউভাতে সমস্ত রাত ঘর ছেড়ে নড়বে না শাসিয়ে গেছে। অরুণা মুখটিপে হাসছিল আর আড়চোখে মাঝে মাঝে পাশের লোকটাকে দেখছিল। কিন্তু নারায়ণের অত হাসি তার ভালো লাগছিল না। হাসলেই ধপধপে ফর্সা মুখ গলা-গলা লাগে কেমন। গাল দুটো কুঁচকে যায়, তারপর লাল হতে থাকে। সেই লাল কান পর্যন্ত ছড়ায়। বেশি হাসলে সমস্ত মুখ ছেড়ে গলা পর্যন্ত টকটকে লাল হয়ে ওঠে। এই দিনেও অরুণা সন্তর্পণে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলেছিল কিনা একমাত্র সে-ই জানে।

বড়-বউ মেজ-বউ এত হৈ-চৈয়ের মধ্যেও স্ত্রী-আচাব সেরে ফেলেছিলেন। মেয়ে জামাইকেও খাইয়ে দিয়েছেন। বড় বউদি অরুণাকে ঘবের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, এবারে নিশ্চিন্ত মনে বুঝে নাও গে যাও, কাল আবার কালরাত্রি—।

মেজ বউদি দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিতে দিতে বললেন, ভিতব থেকে ছিটকিনিটা লাগিয়ে দিও, নইলে কে আবাব ঠেলবে ঠিক নেই।

কে ঠেলতে পারে অরুণাও জানে, তাবাও জানেন। মেজ বউদি কান পাতলেন। ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করার শব্দ কানে এলো। বড়-বউ তাড়া দিলেন, চল আব দাড়ায না, অনেক বাত হয়ে গেল—

রাতের মত ঝামেলা মিটতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল আবো। সামনের বারান্দার বড় আলোটা নেববার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল ও-ঘরে আলো জ্বলছে। ঘষা কাচেব জানালা, তার ওধারে ঘন নীল পরদা। তার ফাঁক দিয়ে আলোর আভাস দেখা যায়।

পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোলেন বড়-বউ। ঘরের দুধারে আবার দুফালি সরু বারান্দা। ও-দিকটা অন্ধকার। যা ভেবেছিলেন তাই। মেজ-বউয়ের অনেকক্ষণ সাড়া পাননি। কোণের দিকের বন্ধ জানালার সামান্য ফাঁকটুকুতে চোখ লাগিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন তিনি। হাতের চাপে ফাঁকটা চোখ চলার মত করে নিতে চেষ্টা করছেন। পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলেন।

হাসতে হাসতে এধাবে চলে এলেন দুজনেই। মেজ-বউ বললেন, বাবা। ঘাড় কাধ ধরে গেল, সেয়ানা মেয়ে সব দিক চেপেচুপে বন্ধ করেছে।...রসের তোড়-জোড় চলছে বোধহয, উবুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে হাসছে খুব মনে হল—

আর বর?

মেজবউয়ের মুখ আলগা, হাসিও আলগা। পাছে জোরে হেসে ফেলেন সেই ভয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললেন, সঙয়ের মত ঠায় বসে আছে সেই থেকে আর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে চেয়ে দেখছে— গায়ে পিঠে হাত দেবার লোভে এক এক বার একটু হাত বাড়াচ্ছে, আবার গুটিয়ে নিচ্ছে।

হুঁ, তোর যেমন কথা, গায়ে পিঠে হাত দিতে কত যে বাকি আছে এখনো!

অর্থাৎ বড়বউয়ের মতে পূর্বরাগের পর্ব অনেক আগেই সাঙ্গ হয়েছে।

আর একটা হাসির দমক সামলে মেজবউ বললেন, সত্যি বলছি দিদি এই করছে— কি বোকা-বোকা লাগছে বরটাকে।

হেসে ফেলেও বড়বউ ভুরু কোঁচকালেন, তোর অত ভাবনা কিসের, মেয়ে তো আর বোকা নয়—সেই বুঝে নেবে'খন, কাঁল সকালে ওঠার ইচ্ছে থাকে তো চল এখন, অনেক রাত হল।

তাঁকে সঙ্গে করে বড়বউ এধারের ঘরে চলে এল।

মেজবউয়ের রিপোর্টের শতকরা সবটাই ভুল নয়। বাইরে থেকে দেখলে বরং সবটাই ঠিক মনে হবে।

সদ্য-বিয়ের বর নারায়ণ সঙয়ের মতই বসেছিল। এখনো বসে আছে। গায়ে পিঠে হাত বুলোবার জন্যে বারকয়েক হাত বাড়িয়েছে তাও ঠিক—হাত গুটিয়ে নেওয়াটাও। আর অরুণা উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুজে আছে তা মিথ্যে নয়।

মেজবউয়ের অনুমানে শুধু একটু ভুল হয়েছিল।

অরুণা ফুলে ফুলে হাসছিল না। অরুণা ফুলে ফুলে কাঁদছিল... এখনো কাঁদছে।

উনিশ বছর বয়েস থেকে বিয়ের তোড়জোড় চলছিল অরুণার। বিয়েটা হল গিয়ে এই আটাশ বছর বয়সে। মেয়ের বিয়ের জন্যে প্রথমে উঠেপড়ে লেগেছিলেন অরুণার বাবা। তারপর দীর্ঘদিনের ছেদ। তাবপর বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ঘটালো অরুণা নিজে।

বাবা অনেকদিন গত হয়েছেন। অমন হঠাৎ ডাক পড়বে ভাবেননি। তবু মেয়ের বিয়েটা যে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন তার ভিন্ন কারণ। ছেলেমেয়েদের মধ্যে অরুণাই সকলের ছোট। ফলে সকলের থেকে বেশি আদরেরও। কিন্তু চেহারা-পত্রের বিচারে অন্য সকলের-থেকে সে-ই আবার বেশ খানিকটা পিছনে পড়ে। দাদা দিদিরা সকলেই অপূর্ব সুন্দর বা সুন্দরী না হোক, বেশ সুশ্রী। রঙ সকলেরই ফর্সা। কিন্তু অরুণার গায়ের রঙটা টেনেটুনে মাজা বলা চলে, সেও সেই নতুন বয়সের কালে—ছেলেবেলা থেকে স্নো-ক্রীম-পাউডারে মুখের আসল বঙটা ক্রমাগত চাপা দিয়ে দিয়ে। রঙের পরে নাক মুখ চোখ ছিবি-ছাঁদের বিচার—ওই বয়সের স্বাস্থ্যের জৌলুসে ছিরি-ছাঁদ অবশ্য মন্দ ছিল না। স্বাস্থ্যটা তার আজও বাড়ির সকলের থেকেই ভালো বোধ হয়। কিন্তু নাক মুখ চোখের আলাদা বিচারে নম্বরটা তিন দাগের ওধারে ওঠানো শক্ত।

ফ্রক-পরা বয়সে দাদুব ওপর ভয়ানক রাগ ছিল অরুণাব। কারণ পাঁচজনের সামনেই তিনি ঠাট্টা করতেন, এ বাড়িতে এ মেয়েটা কোথা থেকে এলো। অরুণা জিভ না ভেঙচে একটা কথাও বলত না তাঁর সঙ্গে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরার পর মায়ের দুশ্চিন্তার আভাস মাঝে-মধ্যে যেটুকু পেত, তাতেই মনখারাপ হয়ে যেত তার। বাবা খুব জোরালো আশ্বাস দিতেন মাকে, তুমি কি—চ্ছু ভেবো না, ওর খুব ভালো বিয়ে দেব আমি দেখে নিও। ওর মত স্বাস্থ্য ক'টা মেয়ের!

কিন্তু বাবার আগেই মা চোখ বুজেছিলেন। ফলে তাঁর দুশ্চিন্তার বোঝাটা

পরোক্ষভাবে খানিকটা বাবার মনেও চেপে বসেছিল হয়ত। তাই উনিশে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে সুপাত্রস্থ করবার ঝোঁক চেপেছিল তাঁর। এই মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নিজেকে স্ত্রীর কাছে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভাবতেন হয়ত তিনি। তাছাড়া ভদ্রলোক বিচক্ষণও ছিলেন। কাঁচা বয়সের তাজা ভাবটুকু থাকতে থাকতেই বিয়েটা দেওয়া দরকার বুঝেছিলেন।

সব বিবেচনাই ঠিক হয়েছিল তার, ভুল একটু হয়েছিল শুধু ছেলে বাছাইয়ের ব্যাপারে। নিজে বড় চাকরি করতেন, কিন্তু সেটা যে ছোট থেকে বড় হয়েছিল তা বোধহয় তেমন মনে ছিল না। তাই প্রথমেই একেবারে সম-পর্যায়ের অথবা তদূর্ধ্ব সম্ভাবনাময় পাত্র সংগ্রহের জন্য হাত বাড়ালেন তিনি। এমন কি সরকারী কলেজের তরুণ প্রোফেসারগোষ্ঠীও বাতিল। স্ত্রীর পছন্দ হত কিনা আর নিজের প্রতিশ্রুতিমত হচ্ছে কিনা—এই দুদিকে দুই চোখ রেখে পাত্র বাছাইয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি।

ফল যা হবার তাই হয়েছে। টাকার লোভে যারা এসেছে তাদের অনেকে মেয়েকে দেখে ফিরে গেছে। যারা ফেরেনি তারা আবার এমন মাশুল হেঁকেছে যে দরাজমনা মেয়ের বাবার চক্ষুও স্থির। তাছাড়া যাদের এত খাঁই সেখানে মেয়েসুখী হবে কিনা সেই চিন্তার কাঁটাও খচখচিয়ে উঠেছে।

নিজেকে দেখানোর ধকলে ওই বয়সেই অরুণা নাজেহাল। একের পর এক আসছে, দেখে যাচ্ছে—হচ্ছে না, বা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। একবার এক জায়গায় মোটামুটি ঠিক হয়েছিল, স-বন্ধু ছেলে নিজে এসে মেয়ে দেখে গিয়েছিল। সত্টুকু আভাস দিয়ে গিয়েছিল, পছন্দ বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তারপর কোথা থেকে ছেলের প্রবাসী বাপ আর জ্যাঠা এলেন মেয়ে দেখতে। ফিরে গিয়ে ভাল চিঠি লিখলেন, মেয়ের তুলনায় তাদের ছেলেটি বেশি রুগ্ন, অতএব

লজ্জায় ক্ষোভে অরুণা মাটির সঙ্গে মিশতে পারলে বাচে সেদিন। তার স্বাস্থ্য ভালো সে-ও যেন একটা খুঁত। এদিকে দাদুর ঠাট্টা আর ওর জিভ ভেঙচানোর পর্ব তখনো সমানতালে চলছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দাদুর তার ওপরেই সকলের থেকে বেশি টান আছে জানত। তিনি আবার ঠিকুজি কুষ্ঠি নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাটি আর গবেষণা শুরু করেছিলেন তখন। ছেলের সাহেবী মেজাজ দেখে নাতনীর কুষ্ঠিটি প্রকাশ্যে চড়াও করেন নি এতদিন। এবারে করলেন।

একটানা কম করে ঘণ্টা পাচেক গভীর বিচার বিবেচনা আঁক কষা ছক কষার পরে ছেলেকে বললেন, চেষ্টা করছ করো কিন্তু এখন তো তেমন যোগ দেখছি না .তবে কিছু ভেব না, মেয়ের ভালো বিয়েই হবে।

কিন্তু নাতনীকে ডেকে রীতিমত একটা জোরালো ঘোষণা করলেন তিনি। বাবা যেমন মাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, দস্তুরমত ভালো বিয়ে হবে রে তোর ছুঁড়ী, বলে দিলাম দেখে নিস। বিদ্বান বুদ্ধিমান পুরুষকারসম্পন্ন সবল-মনা হবে ছোঁড়াটা তা বলে দিলাম, যা—খবরদার, আর কখনো জিভ ভেঙাবি না, তাহলেই দেব তুকতাকে সব পণ্ড করে।

অরুণা সেদিন পালিয়েছিল। আরো দ্বিগুণ জিভ ভেঙিয়ে। কিন্তু দাদুর ভবিষ্যৎ

বচনটি মনে ধরেছিল তার। বিশ্বাসও করেছিল। আড়াল থেকে পরিহাসটুকু অরুণার বাবার কানেও গিয়েছিল। তিনিও বিশ্বাস করুন আর না করুন, মনে জোর পেয়েছিলেন। তাঁর বাবা সম্প্রতি বিয়ের যোগ না দেখলেও যোগ ঘটাবার জন্যে নতুন উদ্দীপনায় পাত্রানুসন্ধান শুরু করেছিলেন আবার। আর তাঁর ভবিষ্যৎ বচনে ভরসা পেয়ে ছেলের যোগ্যতাবিচারের দৃষ্টিটা খাটো করেননি একটুও।

কিন্তু অনুসন্ধান পর্বটা শেষ পর্যন্ত অসমাপ্তই রেখে যেতে হয়েছে তাঁকে। অরুণা তখন বি-এ পড়ে। প্রথমে দাদু গেলেন, তারপর বাবা গেলেন। সংসারের চাকাটাই বদলে গেল আস্তে আস্তে।

দাদারা অনেক বড়। সকলেই সংসারী। দুই দাদা এখানে থাকেন, এক দাদা বোম্বাইয়ে, আর এক দাদা বিলেতে। ছোড়দাটা মেম বিয়ে করেছে শুনেও আবার কয়েকটি সম্ভাব্য পাত্রপক্ষ পিছিয়ে গেছে। বউদিদের তাড়া খেয়ে বড়দা মেজদা নতুন করে আবার অরুণার বিয়ের চেষ্টায় লেগেছেন যখন, অরুণা তখন বি-এ পাশ করে ঘরে বসে। এম-এ পড়বে বলে য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু দু'চার মাস যেতেই আর ভালো লাগেনি।

বড়দা মেজদার চেষ্টার ধরনটা অরুণার আদৌ পছন্দ হয়নি। বাবা কখনো কন্যাদায় ভাবতেন না, দাদাবা ভগ্নিদায় ভাবছেন। নইলে বে-সরকারী কলেজের মাস্টারকে পর্যন্ত মেয়ে দেখাতে ধরে নিয়ে আসে। বাবা কোন পর্যায়েতে ছেলের সন্ধান কবতেন তা যেন তাঁরা ভুলেই গেছেন। কিন্তু অরুণা ভুলবে কেমন করে, অরুণা দাদুর আশ্বাসও ভোলেনি। দাদাদের বিচার বিবেচনা দেখে প্রথম প্রথম নিজের মনেই গজগজ করত। শেষে বউদিদের কাছে প্রকাশ্যেই একদিন ঘোষণা করল, দাদাদের তার বিয়েব জন্যে ভাবতে হবে না, সে আর সঙ সেজে কারো সামনে গিয়ে বসতে পারবে না—তার ভাবনা সে নিজেই ভাববে।

শুনে কোথাও কিছু জট পাকিয়েছে কিনা বউদিদের সেই সন্দেহ। কারণ ইতিমধ্যে কাজেব মেয়ে বলে পাড়ায় বেশ নাম হয়েছে অরুণার। পাড়ায় সংস্কৃতি সংঘ আছে একটা। সেখানে বিবাহিত এবং অবিবাহিত মহিলা সভ্যও আছে। অরুণা সভায় যোগ দেয়, কোমব বেঁধে চাঁদা আদায় করে, চ্যারিটি শো অর্গ্যানাইজ কবে। এই থেকেই তলায় তলায় কিছু ঘটছে কিনা জানাব জন্যে বউদিরা পীড়াপীড়ি করেন।

কিছুই ঘটেনি বা ঘটছে না। কিন্তু বউদিদের মনে খটকা লাগাতে পেরে অরুণার মন্দ লাগেনি। অন্তত বউদিদের চোখে ওর একটু দর বেড়েছে মনে হয়েছে। অরুণা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলেনি, তাঁদের রোমাঞ্চ মিশ্রিত শঙ্কার মধ্যে বেশ কিছুদিন ডুবিয়ে রেখেছিল শুধু।

তা বলে পাড়ায় তার গুণগ্রাহী একেবারে নেই এমন নয়। তরুণ মহলের কারো কারো বাড়িতেও আনাগোনা আছে। তাছাড়া অল্পবিস্তর দীর্ঘনিঃশ্বাস আর আবেদন নিবেদনে ভরা গোটাতিনেক পত্রলাভও ঘটেছে। বেচারীরা কেউ কেরানী, কেউ বেকার। অরুণা একটুও রাগ করেনি। বরং ওদের জন্যে দুঃখই হয়েছে। কিন্তু কারো দিকে মন পড়েনি। চিঠিগুলো অবশ্য সযত্নে রেখে দিয়েছে। তার নিরাসক্ত অনবধানে এর

একটা চিঠি বউদিরা দেখে ফেলেছিলেন এবং চিঠি যে আরো আছে বোকার মত রাগ দেখাতে গিয়ে অরুণা সেটাও তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সভা-সমিতি করে, সিনেমা দেখে, নাটক-নভেল পড়ে, শূন্যের মধ্যে আর কতকাল ভেসে বেড়ানো চলে? সাবালিকা হবার পর থেকে ওর নামের ব্যাঙ্কের পাস-বই বাবার ট্রাঙ্ক থেকে ওর ট্রাঙ্কে এসেছে। বাবার ট্রাঙ্ক বড়দার ঘরে ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে কি হিসেব-নিকেশ করিয়ে আনার জন্যে বড়দা পাশ-বই হাতে দিয়ে একবার অরুণাকেই পাঠিয়েছিলেন। সে পাস-বই অরুণা আর ফেরত দেয়নি। বউদিকে বলেছে, দুটো টাকা দরকার হলেও হাত পাততে হয়, আমার লজ্জা করে। ওটা থাক আমার কাছে। অরুণা বে-হিসেবী নয়। তাছাড়া টাকাটা কোন উপলক্ষে তোলা আছে তাও বহুদিন ধরেই জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ক'বছরে ওর থেকে মন্দ খরচা হয়ে গেল না। আসলে হাত পড়েনি অবশ্য, কিন্তু সুদে টান পড়ছে। সেটা তেমন জমছে না।

অরুণার মেজাজ বিগড়োতে লাগল। মেজাজ বিগড়োবার আরো একটা সূক্ষ্ম কারণ—আয়না। স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো তার। কিন্তু এখন যেন একটু মোটার দিকে ঘেঁষেছে। আঁট শাড়ির কুশল বিন্যাসে সেটা ধরা না গেলেও নিজের চোখ এড়ানো শক্ত। শেষ পুঁজিতে টান ধরার লক্ষণ দেখলে যেমন লাগে তেমনি লাগছিল অরুণার।

না, সে আর এত শুয়ে বসে থাকবে না, খাওয়া কমাবে, আর পায় যদি চাকরি করবে। এক মস্ত সরকারী অফিসেই চাকবি পেল। আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট।

সেখানেই নারায়ণ চ্যাটার্জীর সঙ্গে যোগাযোগ। সেও তাব মতই আপাব ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট তখন। অনেকদিনের পুরনো চাকুরে।

ছেলেটাকে একটুও ভালো লাগত না তার। তাব গায়ে-পড়া হাব-ভাব ভারী বিরক্তিকর লাগত। দ্বিতীয় বিরক্তির কারণ, এম-এ পাস হলে সেও তাব মতই কেরানী। আজীবন বিয়ে না করলেও অরুণা কেরানী ববণ করবে না। তৃতীয়ত, পুরুষের অত শাদা-ঘেঁষা ফর্সা রঙ দেখলেই তার মুখ ফিরিয়ে থাকতে ইচ্ছা কবে। সামনের টেবিলেই কাজ করে, একটু বেশি চোখোচোখি হলে বা ফাইল দেওয়া-নেওয়ার সময় হাতে হাত লাগলে মুখে এক-এক ঝলক কাঁচা রক্ত ওঠে যেন। আবো অনেক ত্রুটি আছে। প্রায় বোকার মত কথাবার্তা বলে বসে এক-এক সময়। পরে অরুণার রাগ দেখে পস্তায় অবশ্য, কিন্তু মনে যা হয় বলেই বসে। যেমন, অরুণা একদিন একটু বেশিই সাজ-গোজ করে এসেছিল। ছুটির পর তাকে নিরিবিলিতে পেয়ে নারায়ণ বলে বসল, আপনি অত ঝকমকে শাড়ি ব্লাউস পরে এলে ওরা সব হাসাহাসি কানাকানি করে...আর খুব ভালও দেখায় না, হালকার ওপর বেশ দেখায়।

অরুণা রেগে আগুন। আমি কি পরে আসি না আসি, তাতে কার কী?

নারায়ণ মাথা চুলকে অপরাধটা স্বীকাবই করে নিয়েছিল প্রায়। আর একদিন টিফিনের সময় অরুণার টিফিনের পয়সা দেওয়া নিয়েও এমনি বোকার মত কথা বলেছিল। অরুণা নিজের পয়সা নিজে বার করছে দেখে বলেছিল, ওরা জানে রোজ আমি আপনার পয়সা দিই—একটা দিন অন্তত আমাকে দিতে দিন।

অরুণা তাজ্জব। —আপনি ক'টাকা রোজগার করেন যে রোজ আপনি আমায় পয়সা দেন ভাবে ওরা!

নাবাযণ স্বীকাব কবেছে, বোজগাব সে বেশি কবে না বটে। এমনি বোকাব মত কথা আবো অনেক সময়েই শুনেছে অরুণা।

কিন্তু মুস্কিল এই যে, কাজেব ব্যাপাবে অরুণাকে নির্ভব কবতে হয ওব ওপব। ছ'মাসেও অরুণাব অফিসেব কাজ তেমন বপ্ত হযনি। ছ'বছবে হবে সে বকম বিশ্বাস নিজেবই নেই। কোন ধাবা অনুযাযী কোন বিল পাশ কববে আব কেন বিল আটকাবে সেটা আজও ভালো কবে মাথায ঢোকে না তাব। গোড়ায গোড়ায কি উল্টোপাল্টা কাজই না কবে বসত। বক্ষা কবেছে আব কবে আসছে ওই নাবাযণই। তাব আবাব সব আইন-কানুনেব ধাবা ঠোঁটেব ডগায যেন। সেকশনেব সুপাবিনটেনডেণ্ট ভদ্রলোক প্রবীণ। বস-কষ নেই, কাজ বোঝে শুধু। অরুণাব কাজে মোটেই খুশি নন তিনি, মেযে বলে মুখেব ওপব কড়া কবে কিছু না বললেও গুরু-গম্ভীব ভ্রূকুটি কবতে ছাড়েন না। ফাঁক মত নাবাযণই ইশাবায আশ্বস্ত কবে অরুণাকে, বলে, যা বলে শুনে যান, একবাবে বুঝে নেবাব ভাব দেখান—তাবপব আমি সব ঠিক কবে দেব।

দেযও। এক-একদিন প্রায দুজনেব কাজই তাকে একা কবতে হয। সেটা অন্য সহকর্মীদেব চোখ এড়ায না। বসালো টিকা টিপ্পনী কাটে। তাবা ধবেই নিযেছে, নাবাযণ চাটুজ্জে অরুণা গাঙ্গুলীব প্রেমে পড়ে গেছে। তাদেব বসালো ইঙ্গিতেব আভাস অরুণাও পায। লোকটাব গলা-গলা হাসিভবা লাল মুখ দেখে গা জ্বলে। তাব ওপব সেদিন বুদ্ধি আব কাণ্ডজ্ঞান দেখে অরুণা প্রায জ্যান্ত ভস্ম কবেছিল তাকে। বাড়ি ফেবাব পথে ট্রাম পর্যন্ত বোজই সঙ্গে আসে। সেদিন একমুখ হেসে চুপি চুপি বলল, ওবা আমাকে আব আপনাকে নিযে অনেক কিছু ভাবে।

কি ভাবে? সহ্যেব সীমা ছাড়াতে অরুণা ঝাঁপিযেই উঠেছিল।

নাবাযণ মুখ কাচু মাচু কবে বলেছিল, না, ভা—ভালো কথাই ভাবে।

বাড়ি এসে অরুণা বাগতে বাগতে শেষে হেসেই ফেলেছিল। বুঝে সুঝে দুটো কথাও যদি বলতে জানত।

বছব ঘুবল।

সেদিন ট্রাম থেকে নেমেই অরুণা দেখে, মূর্তিমান দাঁড়িযে। এতদিন শুধু যাবাব মুখে ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত সঙ্গ নিত। লালচে মুখ খুশিতে জবজব কবছে। অরুণা গম্ভীব সেটাও চোখে পড়েনি বোধহয। সবাব আগে অরুণাকেই একটা সুখবব দিতে এসেছে সে। অফিসে এসেই নোটিসবোর্ডে দেখেছে, সে এস এ-এস পবীক্ষাব পার্ট-ওযান পাস কবেছে। আনন্দ চাপতে না পেবে অফিস থেকে তক্ষুনি বেবিযে পড়েছে আবাব।

অরুণাব তখনো ধাবণা, পার্ট ওযান পাস কবা মানে পঁচিশ-তিবিশ টাকা বোজগাব বাড়া। মানে মাস ছয আগে সেকশনেব আব একজন পাশ কবেছিল বলে এইটুকু জানে, নইলে তাও জানত না। পার্ট-ওযানেব পবে পার্ট-ট্যু আছে—সেটা পাস কবলে কতটা ওঠা যায তা নিযে ও মাথা ঘামাযনি কখনো।

পার্ট ওযান পাস কবাটা যে কিছু নয, সেটা অরুণাব মুখেব দিকে চেযেই প্রথম অনুভব কবতে হযেছিল নাবাযণকে। ভাবল, পার্ট-ট্যু পাস কবা কত কঠিন জানা আছে বলেই অরুণা তাব আনন্দ দেখে মনে মনে হাসছে।

পার্ট-ট্যু-র জন্যে আদা-জল খেয়ে লাগল সে। আরারও বছর ঘুরতে চলল।

এদিকে অরুণার একঘেয়ে দিনগুলোতে রঙ ধরছিল একটু একটু করে। সেই রঙ দিনে দিনে ঘন হয়ে উঠছিল। অলক হাজরা অফিসের বড় অফিসারদের একজন। বয়েস তেমন বেশি নয়, সুপুরুষ। উঁচু-লম্বা জোরালো পুরুষ। ফাইনান্স পাসকরা অফিসার গোড়া থেকেই। ভবিষ্যতে এই অফিসের হোক আর দিল্লী অফিসেরই হোক, সর্বেসর্বা হবেন জানা কথা। তার সঙ্গে হৃদ্যতা হয়েছে অরুণার। আর সেটা হালকা গোছের হৃদ্যতা নয় বোধ হয়।

একদিন বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে দেখে হাজরা সাহেব তাকে লিফট দিয়েছিলেন। তারপর মাঝে মাঝে দিচ্ছিলেন। আজকাল প্রায়ই দেন। শুধু তাই নয়, তাদের দুজনকে একসঙ্গে বিলিতি সিনেমা হলএ দেখা গেছে, বড় রেস্তরায় দেখা গেছে—কেউ কেউ বলে গঙ্গার নিরিবিলি ধারেও দেখা গেছে। অবশ্য এতটা দশ দিনে হয়নি—যতটা সময় লাগা উচিত ততটাই লেগেছে। অফিসে কানাকানি চোখ-টেপাটিপি শুরু হয়েছে এই নিয়ে। কাজ মনোমত না পেলেও প্রবীণ সুপারিনটেনডেন্ট এর ভ্রুকুটি করা ঘুচে গেছে। কারণ অলক হাজরাকে বেশ ভয়ই করে সকলে। অধস্তন কর্মীদের ওপর সর্বদাই কড়া মেজাজ তার। কারো ত্রুটি পেলে নাজেহাল করতে ছাড়েন না।

এই নবানুরাগের কোনো নজির এ পর্যন্ত নারায়ণের নিজের চোখে অবশ্য পড়েনি। কারণ ছুটি হলে সে আর এখন অফিস থেকে বেরোয় না, লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢোকে তার পার্ট-ট্যু এসে গেল, আপাতত সেই বেড়া টপকানোই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অফিসেও ফাঁক পেলে ফাণ্ডামেন্টাল রুলস খুলে বসে। কিন্তু সহকর্মীদের সরস গঞ্জনা এড়াবে কি করে। যা না, তার চার গুণ করে রসিয়ে ফেনিয়ে তারা কানে ঢোকাবেই। আর কানে কিছু ঢুকলে সেটা বার করে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই নারায়ণের। একদিন বলল, হাজরা সাহেবকে নিয়ে ওরা কিন্তু পাঁচরকম বলাবলি করছে।

মাখন-মুখো লোকটার মুখে 'ওরা' কথাটা শুনলেই অরুণার পিত্তি জ্বলে যায়। তার ওপর যে বলছে সে লোকটাও দ্বিগুণ চক্ষুশূল আজকাল। আগের মত আর তার কাজ-কর্ম করে দেয় না। নিজের কাজ সারারই সময় হয় না নাকি—পরীক্ষা দিয়ে চতুর্বর্গ লাভ হবে একেবারে। ও প্রশ্রয় দিক না দিক, লোকটা যে ওর থেকেও পরীক্ষাটা বড় করে দেখছে তা অসহ্য। অরুণা প্রশ্রয় কোনদিনও দেয়নি, দেবেও না—তা বলে সে তার কাজ করে দিয়ে কৃতার্থ হবে না কেন।

গম্ভীর মুখে বলল, কারা বলাবলি করে নাম ক'টা আমাকে দেবেন।

পার্ট-ট্যু হয়ে গেল।

মনের মতই হল বোধ হয়। তারপর নারায়ণ চাটুজ্জের সেই পূর্ব-মূর্তি আবার। আগের মতই কাছে ভিড়তে চেষ্টা করল সে। আর তখন নিজের চোখেই পড়ল ব্যতিক্রমটা। স্বভাব যাবে কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে বোকার মত জিভের লাগাম আলগা।

আপনি ওই হাজরা সাহেবের সঙ্গে অত মেশেন কেন, লোকটা ঠিক সুবিধের নয়—

সম্ভব হলে অরুণা গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিত। কাজটা মুখে করল। বলল,

আপনার নাম করে কথাটা হাজরা সাহেবকে জানাই তাহলে?

না, তা করবেন কেন, তাহলে তো আমার ক্ষ—ক্ষতি হবে।

আপনার ক্ষতি হবে তাতে আমার কী?

মূর্তি দেখে নারায়ণ ঘাবড়েই গেল হয়ত। —ইয়ে মানে, ক্ষতি হলে কারো তো লাভ হয় না। ভদ্রলোক বিবাহিত, স্ত্রী আছে, তিন-তিনটে ছেলেপুলে আছে, সেই জন্যেই বলছিলাম আর কি...

অরুণা হঠাৎ বিমূঢ় একেবারে। আচমকা তার গালেই কে যেন চড় বসালো একটা। একটু বাদে তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠল, এ-সব কথা কোথা থেকে শুনেছেন আপনি, আমি তো দেখিনি কখনো?

অরুণা যে হাজবা সাহেবের বাড়ি এক-আধবার গেছে রাগের মাথায় সেটা প্রকাশ হয়ে গেল।

একসঙ্গে বেশি কথা বলতে হলে নারায়ণের ঘুলিয়ে যায় কেমন। বিশেষ করে এরকম পরিস্থিতিতে। তবু তালগোল পাকিয়ে যা বলল তার মর্ম, সে শোনেনি, সে তাদের স্ব-চক্ষে দেখেছে। আগে আগে কাজের চাপে ফাইল নিয়ে হাজরা সাহেবের বাড়ি যেতে হত তাকে। তখন দেখেছে, শুনেছে, স্ত্রীর সঙ্গে একটুও বনে না বলে ভদ্রমহিলা ছেলেপুলে নিয়ে অন্যত্র থাকেন এখন।

অরুণা আর একটি কথাও বলেনি। হনহনিয়ে চলে গেছে। নারায়ণ চাটুজ্জের মুখের ওপর তখন কোনো মনস্তত্ত্ববিদের চোখ থাকলে তিনি নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারতেন, নারায়ণের তাও ভালো লাগছে।

এর পরে ভিতরে ভিতরে কি ঘটল কেউ বলতে পারে না, কিন্তু অমন মেজাজী অফিসার হাজরা সাহেবের সঙ্গে অরুণা গাঙ্গুলীর একটা বিচ্ছেদ ক্রমশ সকলের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অর্থাৎ এই বিভাগেব ওপরে হাজরা সাহেবের আক্রোশ বাড়তে লাগল, কারণে অকারণে সুপারিনটেনডেন্ট ধমক খেতে লাগলেন। শেষে একদিন দেখা গেল, অরুণা গাঙ্গুলীকে এমন এক বিভাগে বদলি কবা হয়েছে যে বিভাগেব অবাঙ্গালী সুপারিনটেনডেন্টটি হাজরা সাহেবের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি।

এক মাসের মধ্যেই কাজের চাপে হিমসিম অবস্থা অরুণার। এ বিভাগেব সব কাজই এমন নিরেট, নীরস, যে এটাকে শাস্তির বিভাগ বলে কেরানীরা। তার ওপর বিভাগীয় প্রবীণটির কথায় কথায় দুর্ব্যবহার। এমন ব্যবহারের আড়ালে আর কারো ইঙ্গিত আছে তাও বোঝে অরুণা। এক-একদিন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার। অফিসের নামে গায়ে জ্বর আসে। কতদিন ভেবেছে চাকরি ছেড়ে দেবে। কিন্তু চাকরি ছেড়ে করবেই বা কি? কাটবে কেমন করে?...তাছাড়া মাস গেলে মাইনেটা মন্দ না।

তবু চাকরি হয়ত শেষে ছাড়তেই হত তাকে, যদি না ইতিমধ্যে নারায়ণ চাটুজ্জে পার্ট-ট্যু-ও পাস করত। যদি না সঙ্গে সঙ্গে সে একটা বিভাগের অস্থায়ী ভার পেত, যদি না তার কিছুদিনের মধ্যে আর একটা বিভাগের স্থায়ী সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে বসত। আর যদি না তলায় তলায় চেষ্টা-চরিত্র তদবির-তদারক করে অরুণাকে নিজের বিভাগে টেনে নিয়ে আসত। হাজরা সাহেব ততদিনে অন্য অফিসের অন্য সঙ্গিনী নিয়ে মোটরে

ঘুরছেন, কাজেই তাঁর রাগ মনে করে বসে থাকার সময় নেই।

অরুণা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ক্রমশ নিজের কর্তৃত্ব আর কর্ত্রীত্বে মন দিল সে। নিজে প্রায় কিছুই করে না, কিন্তু অন্যেরাও যে ফাঁকি দেয় সেটা চক্ষুশূল। লোকটার যদি গায়ে চামড়া বলে কিছু থাকত, কেউ মানে না, সমানতালে গলা ছেড়ে ঝগড়া করে, ইয়ারকি দেয়। বিভাগের কর্তা হয়ে নিজেই বসে গাঁধার খাটুনি খাটে। মেয়ের হদ্দ—খেটে মরুক!

ফাঁক পেলেই অরুণা গঞ্জনা দিতে ছাড়ে না। সে-বকম অবকাশ আজকাল হামেশাই হয়। একসঙ্গে টিফিন করা, ওর টিফিনের দাম দেওয়া বা ছুটির পরে একসঙ্গে ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত যাওয়া– এ-সবে আজকাল আর আপত্তি করে না সে। অরুণা তখন বলে, আপনি আবার মানুষ! মানুষ হলে সবাই একটু সামলে চলত। সেদিন বলল, পাস কবাব পরে আপনাকে সুপারিনটেনডেন্ট না করে বেয়ারা করে দেওয়া উচিত ছিল। কি ফাঁকিটা দেয় সকলে চোখ চেয়ে দেখেন? কিছু বললে কি আপনাকে ধরে ফাঁসি দেবে ওরা?

জবাব যা শুনল, সেদিনের মত কথা বন্ধ। লোকটার সেই কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত বোকা-বোকা কথা বলে বসা পর্যন্ত শুধরালো না।

নারায়ণ বলল, ওদের বলি কি করে, তোমাব কাজেরও তো বেশির ভাগ আমাকেই করে দিতে হয়, সেটা তো ওবা দেখে– ।

অরুণাকে নিজের বিভাগে নিয়ে আসার পরেই টুক করে ওকে তুমি বলা শুরু করেছিল। অরুণার তখন বলতে গেলে পুনর্জীবন লাভ। তুমি বলা ছেড়ে কাঁধে হাত দিলেও আপত্তি করত না। অরুণাও যে কোন দিন তুমি শুরু করতে পারত। কিন্তু ইচ্ছে করেই করেনি। আসলে নিজের সঙ্গেই দ্বন্দ্ব ঘোচেনি তার। দাদুর বচন এখানো একেবারে ভুলতে পারেনি সে।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস—এই লোকটাও যে আর বলে না কিছু! বললেই সানন্দে রাজি হবার মত কিছু নয়, বরং সব থেকে বেশি অসহ্য তাব ওই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ফসফস কথাগুলোই—তবু বলছে না যে সেটাই আশ্চর্য!

ছুটির দিনের এক সকালে তাব বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিল অরুণা। অনেক দিন বলেছে, অনেক দিন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছে। বাড়ির খবর সে আগেই সংগ্রহ করেছিল। বাড়িতে শুধু মা আছেন শুনেছে। বাড়ির হালচাল দেখতেই হোক বা মনমেজাজ ভালো ছিল না বলেই হোক, বলা নেই কওয়া নেই অরুণা সেই ছুটির সকালে গিয়ে উপস্থিত। কিন্তু না গেলেই বোধহয় ভালো ছিল। যা শুনল আর যা দেখল, তার চক্ষু স্থির।

তার মায়ের সঙ্গেই আলাপ পরিচয়, তাঁর সঙ্গেই কথাবার্তা। কারণ ছেলে তখন আহ্নিকে। ছুটির দিনে দেরিতে বসেছে, অতএব শীগগির ওঠার সম্ভাবনাও নেই নাকি। ছেলের প্রশংসায় মা পঞ্চমুখ। রোজ সকালে পুজো না সেরে এক ঢোক জল পর্যন্ত খায় না। মা-ই আদর-আপ্যায়ন করলেন অরুণাকে, ছেলে নাকি অনেক দিন বলেছে তাকে নিয়ে আসবে। আজ সে নিজেই চলে এসেছে বলে খুব খুশি তিনি।

কিন্তু অরুণা একটুও খুশি নয়। ঠাকুরঘরে একবার চুপি দিয়ে মেজাজ আরো বিগড়ালো। হাঁটু-ঝুল আধময়লা একটা এণ্ডির কাপড় পরনে, শির-দাঁড়া সোজা করে বসে বাবু পুজো করছেন। সামনে কোশাকুশি, গঙ্গাজল। মা ডাকতে একবার ঘুরে দেখল, হাসল, তারপর ইশারায় মাকে বলল, ও-ঘরে নিয়ে বসাতে। কথা বলাও চলবে না।

অন্য ঘরে এসে মা গল্প ফেঁদে বসেছিলেন। অরুণাদের ঘরের খবরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন। ছেলে বলতে মা অজ্ঞান একেবারে। দু'বছরেরটি নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন, তারপর কতকষ্টে মানুষ করেছেন সেই গল্পও বাদ গেল না। মানুষ যা করেছেন, অরুণা দেখতেই পাচ্ছে। রাতেও নাকি আর একপ্রস্থ জপ-তপ হয়। ঘণ্টাখানেক ছিল অরুণা, চা খেয়েছে, জলখাবার খেয়েছে—তারপরেও শুনেছে পুজো শেষ হতে দেরি আছে। সে যে এসে বসে আছে, সেই হুস পর্যন্ত নেই। কাজের অছিলায় অরুণা উঠে এসেছে। দিনকতক এরপর ভালো করে কথা পর্যন্ত বলেনি তার সঙ্গে।

নারায়ণের কোনো পরিবর্তন নেই—সেই রকমই হাব- ভাব, সেই রকমই কথাবার্তা। এই ভাবেই যেন দিন চলে যাবে। আসল কথাটা তুললে অরুণা তার পুজো-আর্চা, আর আলগা কথাবার্তা নিয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি একটা বোঝাপড়া করে নিত। কি চলবে আর কি চলবে না, সোজাসুজি তাকে বুঝিয়ে দিত। কিন্তু কথা না উঠলে সে কি করবে? লোকটাকে একেবারে ছেঁটে দিতে পারলে ঠিক হত। ছেঁটে না দেবার মত কিছু নয়। তবু একেবারে তা পারছে না বলেই যাতনা। যাতনা আর রাগ। রূপ তেমন না থাক, যা আছে তার দিকে পর্যন্ত যদি কোনো চোখ থাকত লোকটার। অফিসের ছেলে ছোকরাগুলোর বুকের খচ-খচানি যদি একটুও বুঝত। এই অরুণা গাঙ্গুলীর জন্যেই অমন জাঁদরেল অফিসার হাজরা সাহেব পাগল হয়ে ছিলেন, তাও ভুলে গেছে বোধ হয়।

নির্বোধকে সচেতন করার চেষ্টার ধকলও কম নয়। মাঝে মাঝে অরুণা অদ্ভুত ব্যবহারই করতে লাগল। নারায়ণকে একদিন নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িতে নারায়ণ আগেও এসেছে, কিন্তু সেটা অরুণার নিয়ে আসা নয়। কথায় কথায় একসময় ছেলেদের হ্যাংলামো নিয়ে ঝগড়া ফেঁদে বসল সে। নজির-স্বরূপ শেষে রাগ করেই যেন পাড়ার ছেলেদের লেখা সেই তিনখানা চিঠি ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

নারায়ণ চিঠি পড়ল। ঝগড়া ভুলে জিজ্ঞাসা করল, এরা সব কারা?

অরুণা রুক্ষ মুখ করে জানালো, একজন ডাক্তার, একজন প্রফেসার, আর একজন বাইরে কোথায় চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

আর একদিন অফিস-ফেরত নারায়ণের প্রস্তাব, চলো খানিকটা হাঁটি—

অরুণা তক্ষুনি জবাব দিল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, সিনেমায় যাবে; সেখানে হয়ত এতক্ষণে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে—

কে? নারায়ণ উৎসুক।

সে খোঁজে তোমার কাজ কী?

অফিসের ছেলে-ছোকরাদের ওপরে রাগটা তার ওপর দিয়েই ঝালিয়ে নিতে লাগল। যেভাবে চেয়ে থাকে, চোখগুলো সব গেলে দিতে ইচ্ছে করে তার। শুনে নারায়ণও হা করেই চেয়ে থাকে তার দিকে, কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত ফল কিছু হয় না।

অরুণা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। তার ওপর কানা-ঘুষায় শুনেছে, বাইরে কিছুদিনের জন্যে অস্থায়ী অফিসার পদে বহাল হতে পারে লোকটা। এখানে হলে খুশি হত, বাইরে শুনেই মেজাজ বিগড়েছে। নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করতে সে তেমনি ফসফসিয়ে জবাব দিয়েছে, হতে পারে—পাস করেছি যখন আজ হোক কাল হোক হবেই তো।

অরুণার ধৈর্য গেল। বাড়ির লোকেরা ভাবছে শুভ নির্বন্ধের সময় হল বোধ হয়। অফিসের লোকেরা তো কবে থেকেই সেটা অবধারিত জেনে বসে আছে। আর এদিকে এই অবস্থা। কাহাতক সয়। অরুণা নিজেই যা হোক একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য বদ্ধ পরিকর। এই বিড়ম্বনার শেষ হোক

নারায়ণকে সঙ্গে করে সেদিন সিনেমা গেছে। সারাক্ষণ একটি কথাও হয়নি। নারায়ণ দু'চারবার কথা বলতে চেষ্টা করে বিরক্ত দেখে থেমে গেছে। বাইরে বেরিয়েও অরুণার মুখ থমথমে গম্ভীর বাসে উঠল দুজনে। কি বলবে কোথায় যাবে, অরুণা জানে না। সিনেমায় এসেছিল বলে নিজের ওপর আরো বেশি রাগ হচ্ছে। বাজে বাজে অতখানি সময় নষ্ট করার কিছু দরকার ছিল না।

বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। ওরা দুজন দাঁড়িয়ে। আরো অনেকেই দাঁড়িয়ে। অরুণা বাসের রড ধরে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার পিছনে অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, তার পিছনে নারায়ণ। এই ঘেষাঘেষির মধ্যে পড়েও অরুণার বিরক্তির একশেষ। বাস ছুটেছে।

হঠাৎ কি হল, নারায়ণ হকচকিয়ে গেল একেবারে, বলা নেই কওয়া নেই অরুণা আচমকা পিছন ফিরে কড়া গলায় তার পিছনের অপরিচিত লোকটিকে ঝাঁঝিয়ে উঠল, ভদ্রলোকের মত দাঁড়াতে পারেন তো দাঁড়ান, নইলে নেমে যান বাস থেকে—

সকলে সচকিত। লোকটাও হতভম্ব মনে হল। কোনরকমে সামলে নিয়ে বলতে চেষ্টা করল, আমাকে—মানে আমি—

হ্যাঁ, আপনি। অরুণার অগ্নিমূর্তি, লজ্জা করে না আপনার কথা বলতে?

নারায়ণ হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি থামালো অরুণাকে, কিন্তু বাসের লোক থামল না। সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। কেউ বলল, ধরে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দাও, কেউ বললে, ভদ্রলোক সেজে বাসে ওঠা হয়েছে। কেউবা সেই ভিড়ে হাতের আস্তিন গুটিয়ে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল।

লোকটার আত্মসমর্থনের চেষ্টার ফল আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। চিৎকার, তর্জন-গর্জন বাড়ল। শেষে বাস থামিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে নামিয়েই দেওয়া হল লোকটাকে। বাস চলল। কিন্তু এই নিয়ে জটলা থামল না। সকলেই ফিরে ফিরে দেখছে অরুণাকে।

ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে নারায়ণের। দু'তিনটে স্টপেজ ছাড়িয়ে অরুণাকে ডাকল, এসো নামি এখানে—

জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগ না দিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অগত্যা অরুণাকেও নামতে হল। বাসটা চলে যেতেই নারাযণ বলে উঠল, কি যে করে বসো তুমি এক এক সময়, একটা সীন করলে—

সীন করলাম! অরুণা আগুন, তীক্ষ্ণ চাপা গলায় ঝলসে উঠল, আমার রূপ নেই বলে মান-অপমান জ্ঞান নেই—যে যা-ই করুক মুখ বুজে থাকব, কেমন? আর তোমরা মজা দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

রাগের জ্বালায় অরুণা এই প্রথম তুমি বলে ফেলল। নারাযণ আবার তাড়াতাড়ি সামলাতে চেষ্টা করল তাকে—কি কাণ্ড, চলো চলো—

হাত ধরে তাকে নিয়ে একটা বড় চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল সে। অরুণা ঠিকমত বাধা দেবারও অবকাশ পেল না। দু' পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিযে নারায়ণ কেবিনের পরদা টেনে বসল।

অরুণা বলল, আমি চা খাব না, আমার বাড়ি যাওয়া দরকার এক্ষুনি।

নারায়ণ বলল, বেশিক্ষণ লাগবে না, গরম চা খেলে মাথা ঠাণ্ডা হয়...।

কী? অরুণার ওঠার উপক্রম।

বোসো বোসো—। বে-ফাঁস বলে ফেলেছে মনে হতেই ব্যস্ত হযে ঢোঁক গিলতে হল তাকে। —আমার, মানে আমার বিশেষ কথা ছিল একটু—সেই থেকে বলি-বলি করছি—

অরুণা বসে আছে। দুই চোখে ভস্মকণা। বয় চা দিযে গেছে। নারায়ণের অর্ধেক পেয়ালা শেষ। কিন্তু অরুণা পেযালা ছোঁয়নি।

চা খেলে না?

কি কথা আছে? যে কোনো মুহূর্তে এক ঝটকায় উঠে চলে যেতে পারে সে।

ইয়ে—তোমার যা মেজাজ এখন, বলে আবার কি ফ্যাসাদ হবে—। নারায়ণ ঢোঁক গিলল। কবে বদলী করে দেবে, বলছিলাম কি, এ-ভাবে আব কতকাল অপেক্ষা করে বসে থাকব—তুমি যদি, মানে তোমার যদি—

বক্তব্যটা শেষ পর্যন্ত আর শেষই হল না। তার আগেই ফর্সা মুখ লাল।

অরুণার অনেক দিনের টান-ধরা স্নায়ুগুলো যেন হঠাৎ একসঙ্গে গা ছেড়ে দিয়েছে সব। কতদিনের একটা জমাট-বাঁধা বাষ্প যেন মুক্তি পেয়ে বাঁচছে। এমন শিথিল অবসাদের মুহূর্ত জীবনে তার বুঝি আসেনি। পাছে চোখে জল এসে পড়ে, তাড়াতাড়ি তাই চায়ের পেয়ালায় মুখ নামাতে হয়েছে। বাড়ি গিয়ে এখন ঘুমুতে পারলে বাঁচে।

কিন্তু সেই রাতটা অরুণার বিনিদ্র কেটেছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত। শুয়ে এপাশ ওপাশ করেছে। এত নিশ্চিন্ততার মধ্যেও দাদুর ভবিষদ্বাণী এক-একবার খচ-খচিয়ে উঠতে চেয়েছে। দাদু বলেছিল, পুরুষকারসম্পন্ন সবল-মনা লোক আসবে—গোনার বিশারদ একেবারে! নিষ্ফল উক্তিটা ঘুরেফিরে বার বার মনে আসছে বলে অন্ধকারে বহুদিন পরে পরলোকগত দাদুর উদ্দেশে বড় করে জিভ ভেঙালো অরুণা।

তারপর চার দিনের মধ্যে বিয়ে।

সামনে ভাদ্র মাস, তারপর আশ্বিন। শ্রাবণের এটাই শেষ তারিখ।

সেই বিয়ে হয়ে গেল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে অরুণা বিছানায় এসে বসল। ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে। যা ধকল গেল এ পর্যন্ত! আবার কাল সকালে উঠেই আছে একপ্রস্থ। রাত কম হয়নি। লোকটাকেও শ্রান্ত লাগছে, কিন্তু সেটা বুঝতে না দেবার চেষ্টা।

অরুণা বলল, আজ আর কোনো কথা নয়, সকাল হতে না হতে বউদিরা ঠেলে তুলে দেবে, বাকি রাতটুকু দুজনে দুদিক ফিরে সোজা ঘুম।

নারায়ণের খুব আপত্তি নেই যেন। গায়ের জামাটা খুলে খাটের বাজুতে রাখল। অরুণার গালে মুখে হাতদুটো বুলিয়ে দিল একটু। নিজের কপাল দিয়ে ওর কপালটা ঘষে দিল একটু। কপালে সিঁদুরের দাগ লেগে গেল। অরুণা হেসে উঠতে যাচ্ছিল, হাসা হল না।

নারায়ণ ওকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে চোখ বুজে বসল। মনে মনে ঘুমুবার আগেই ঠাকুরপ্রণাম বোধহয়। বিরস-মুখে তার দিকে চেয়ে অরুণা চুপচাপ বসে রইল। বেশিক্ষণ না, চার পাঁচ মিনিট। তারপর চোখ খুলল আবার।

বলেছে বলেই ঠাকুরপ্রণাম সেরে সুবোধ ছেলের মত পাশ ফিরে ঘুমুতে শুরু করবে এটা অরুণা সত্যি ভাবেনি। ঈষৎ ব্যঙ্গসুরে জিজ্ঞাসা করল, কি, প্রার্থনা করলে?

নারায়ণ শোয়ওনি, পাশও ফেরেনি—বসেই ছিল। মুখে দ্বিধাগ্রস্ত নরম নরম হাসি। বলল, প্রার্থনা নয়, একজনকে মনে পড়ে গেল—।

অরুণা অবাক, কাকে?

না থাক, শুনলে তুমি আবার রাগ করবে। সেই রকমই বিব্রত হাসি, যেমন অরুণা অনেক দেখেছে। কথা চাপার অভ্যেস নেই লোকটার। কিন্তু চাপতে হলে এই রকমই মুখ হয়। একটু জোর করলেই সেই আগের মতই ফসফসিয়ে বিবেচনাশূন্য কিছু বলে বসবে হয়ত। কিন্তু আজকের দিনটায় অন্তত তা সহ্য হবে অরুণার। জোর দিয়ে বলল, না, রাগ কবব না, বলো কার কথা ভাবছিলে?

নারায়ণ থমকালো একটু। কিন্তু তার দিকে চেয়ে সত্যিই ভরসা পেল যেন। বলল, বাসের সে-দিনের সেই লোকটার কথা।

অরুণা আরো অবাক।—বাসের কোন লোকটা?

সেই যে সে-দিন সকলে মিলে অপমান করে বাস থেকে নামিয়ে দিলে লোকটাকে!...সেদিনের কথা মনে হলে আমি মনে মনে তার কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিই।...আজও কেমন মনে পড়ে গেল।

অরুণা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে।

নারায়ণ হঠাৎ সাগ্রহে তার একখানা হাত ধরে একটু কাছে ঝুঁকে এসে বলল, সত্যি এ-বিয়েতে আমি খুব খুশী হয়েছি অরুণা...ওই লোকটার জন্যেই বোধহয় এত তাড়াতাড়ি হল বিয়েটা। এই দিনে তুমিও একবারটি মনে মনে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। লক্ষ্মীটি, এই একটা দিন। কি নাজেহালই না সেদিন হয়েছে বেচারা, সত্যিই তো কোনো দোষ করেনি—

অরুণা চিত্রার্পিতের মত চেয়ে ছিল নারায়ণের মুখের দিকে। তারপর বালিশে মুখ গুঁজেছিল। তারপর ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। সেই কান্না বুঝি এই রাতের মত আর থামবে না।

কিন্তু কাঁদতে কাঁদতেই এক সময় অনুভব করেছিল, এত কান্নার মধ্যেও কোথায় যেন একটু তৃপ্তির স্বাদ আছে। দাদুর ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে মিথ্যে হয়নি বোধ হয়।

রক্তাম্বরী

সভ্যতার আর এক অরণ্যের দিকে পা বাড়ালো শেফালি। আরো একটাবার সে হারিয়ে গেল। মৃত্যু থেকে জীবনটাকে প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে ছিনিয়ে ছিনিয়ে উদ্ধার করার মত আরো একবার এই হারানোর অতল থেকে টেনেহিঁচড়ে কোনো একটা ডাঙায় ওঠা যায় কিনা দেখতে চলল শেফালি। এখানে হল না, এখানে উদ্ধার করা গেল না। আর কোথাও হতে পারে, অন্য কোথাও। হয় ভালো, না হলে বেশি আর কি ক্ষতি। তবু আশা করতে ভালো লাগছে, নতুন অরণ্যে একটুখানি সূর্যচ্ছটার সম্ভাবনা ভাবতে ভালো লাগছে। কৃপণের ধনের মত ওই আশাটুকু বুকের তলায় আগলে নিয়ে ঢেউয়ের বুকে কুঠোর মত আরো একটা বার ভেসে গিয়ে কোনো এক মহাদিশারীর আশ্রয়ে এসে উঠবে একদিন, আজ সেই কথাও ভাবতে ভালো লাগছে। এখানকার আকাশ বাতাস বিষবাষ্পে ভরাট হয়ে গেছে। সেই বিষ গলায় আটকে অমৃত তুলবে এমন নীলকণ্ঠের খোঁজ কি মিলবে না কোনো দিন? মিলবে, মিলবে। না মিললে উপায় হবে কি? হঠাৎ এক উদ্ভট চিন্তা শেফালির, নীলকণ্ঠ কি মাতৃ-জঠরে জন্মেছিল?

ভাবনার বহর দেখে শেফালি চকিতে জিভ কাটল একবার। কিন্তু সেই সঙ্গে রুগ্ন ছেলেটাকে আরো একটু কোলের কাছে টেনে নিল। ওর মতই এক-দঙ্গল মেয়ে-পুরুষ পেটে পুরে ট্রেনটাও যেন ঢিমেতালে চলেছে। সহযাত্রী আর সহযাত্রিনীদের দিকে তাকালে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। প্রত্যেকের বোবা চোখের ভাষা যেন শঙ্কার কালী দিয়ে লেখা, আর সর্বাঙ্গে শুধু হতাশার উল্কি পরানো। ওদের দিকে ভালো করে তাকালে আশা করতে ভয় করে, আশা বিদ্রূপ মনে হয়। গঙ্গা বুড়ীর মুখখানা শুধু অন্যরকম। মনের আনন্দে একজনকে সে বোঝাচ্ছে, কত ভালো জায়গায় চলেছে তারা। যেখানে ছিল এতদিন, সেটা যেন ওর বয়সের মতই জরা-জীর্ণ, একঘেয়ে। খোলা জানালা দিয়ে শেফালি বাইরে দৃষ্টি মেলে দিল আবার।

কামরাটা দুলছে, গোটা ট্রেনটাই একটা দুর্বোধ্য ছন্দে দুলছে বোধ করি। শেফালিও দুলছে অল্প অল্প। নিজেই টের পাচ্ছে দুলছে। ওরা টের পাচ্ছে না কেন? শেফালির মত দুলতে দুলতে অমনি হারিয়ে যেতে পারছে না কেন? ও-তো হারিয়ে গেল। ও-তো পারল হারিয়ে যেতে। আবারও পারল।

নিজের অগোচরে শেফালি হাসছে মৃদু মৃদু। শহরের অঙ্গ থেকে একটা অন্তত রক্তাভ ঘা ছাটাই হয়ে গেছে। একটা লালের ধাক্কা অন্তত ঘুচেছে। সেই একটা লালের

শিখায় অন্তত পতঙ্গগুলো পুড়ে মরতে ছুটে আসবে না, সেই এক রক্ত-বসনার লোলুপ ইশারায় আর কারো বুকের রক্ত নাচবে না। শেফালি সেখান থেকে হারিয়ে গেল। সেখানকার সেই সব পরিচিত পথে, সেই সব নিষ্প্রভ লাইটপোস্টের ধারে ধারে আর সেই সব ভরা-ভরতি বাসগুলোয় আর কেউ তাকে কোনদিন দেখবে না।

শুক্লাও না। শেফালি আর একটু ঘুরে বসে আরো একটু বাইরের দিকে মুখ করে ভালো করেই হেসে নেয়। কামরার মধ্যে অনেকগুলো লোক অনেকবার তাকে লক্ষ্য করেছে—একা বসে হাসতে দেখলে এরপর পাগল-টাগল ভাববে।...প্যাকেটটা এতক্ষণে নিশ্চয় পৌঁছে গেছে শুক্লার কাছে। সকালেই পৌঁছানোর কথা। প্যাকেট পেয়ে ওর মুখখানা কেমন হয়েছিল দেখতে সাধ যাচ্ছে শেফালির। প্যাকেটের গায়ে যে পাঠালো তার নাম তো লেখাই ছিল। তারপর ? খোলার পর ? হয়ত আঁতকেই উঠেছিল মুখপুড়ি, আর চিঠিটা পড়ে তাজ্জব হয়েছে। তারপর, দিনের পর দিন ওকে না দেখে কি করবে ? হয়ত ওরা সেই ডেরাতেই এসে হাজির হবে একদিন। আর বাসে উঠেই এদিক ওদিক তাকাবে। খুঁজবে।

আজকের এই হারিয়ে যাওয়ার পালাটা ওই শহরচষা বাস থেকেই শুরু হয়েছিল একদিন।

সেই মেয়েটা বাসে উঠতেই শেফালি আর একদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

সপ্তাহে দিন দুই অন্তত দেখা হওয়াটা যেন নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েটাকে দেখলেই শেফালির ভিতরে ভিতরে একটা মন-গড়া অসহিষ্ণুতা ওঠা-নামা করতে থাকে। তার তলায় তলায় বেশ অস্বস্তি এক ধরনের। এই জীবনের মত শেফালির আর পরোয়া করার কিছু নেই, পরোয়া করার মত কেউ নেই। অদৃষ্টকার বলে যদি কারো অলক্ষ্য অস্তিত্ব থেকে থাকে কোথাও, দেখা পেলে যুক্তকরে নতি জানানোর বদলে নগ্ন নারীপাশে আটকে তারও মতিভ্রম ঘটানো সম্ভব কিনা দেখতে সাধ যায় তার। স্বর্গের অপ্সরারা যে-ভাবে যোগীদের যোগভ্রষ্ট করতে নেমে আসতো, ঠিক সেই ভাবে এক নিরাকার নিয়ামকের মর্ত্য-লিপি সাধনার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হতে ইচ্ছে করে তার—গিয়ে সব তচনচ করে দিতে ইচ্ছে করে। এহেন শেফালির অন্তত শহরের বারোয়ারি বাসে একটা পরিচিত মেয়ের মুখ দেখে একটুও অস্বস্তিবোধ করার কথা নয়।

কিন্তু করে। করে বলেই রাগ আর বিতৃষ্ণা। করে বলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আবার একভাবে মুখ ঘুরিয়ে বেশিক্ষণ থাকতেও পারে না। মাঝে মাঝে ফিরে তাকাতে হয়। তাকালে মেয়েটার সঙ্গে চোখোচোখি হয়, মেয়েটাও মাঝেসাঝে দেখে ওকে। আগে দেখলেও লক্ষ্য করত না। এখন দেখে আর শেফালির মনে হয়— লক্ষ্যও করে।

দেখে তো অনেকেই, লক্ষ্যও করে। এক বাস লোকের মধ্যে একজনের এই চোখ-ধাঁধানো লালের ধাক্কা চোখে ঘা না দিলে সেই চোখ কানা বলতে হবে। এই লালের মহিমা ভালই জানে শেফালি। গোটাগুটি লাল নয়, মাঝে মাঝে শাদা অথবা শাদাটে মিশেল একটু। যাতে করে লালের গ্রাস আরো স্পষ্ট আরো উগ্র হয়ে উঠতে পাবে।

শাদা জুতো, তারপরেই স্নায়ু-তাতানো লাল শাড়ির ঢেউ, মাঝে শাদাটে রিলিফ একটু। সে গোটাগুটি শাদা বা শাদাটে নয়, তাতেও পিঠ-ঘেরা মোটা একটা অথবা সরু গোটা কয়েক লালচে থাবা, আর সেই শৌখিন ফিনফিনে আবরণের নিচেও অরুণাভ অন্তর্বাসের উঁকিঝুঁকি। তারপর আবার লালের বিন্যাস। ঠোঁটে টকটকে লালের প্রলেপ, গালে হালকা লালের। কপালে জ্বলজ্বলে লালের টিপ, সিঁথিতে লাল লাল আঁচড়ের শিখা। মাঝে মাঝে বেশবিন্যাসের সেট-কে-সেট বদল হয়। গোলাপী ছাপ-মারা শাদা শিফনের শাড়ি গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, তার ওধারে কটকটে লাল ভেলভেটের ব্লাউস যেন গনগনিয়ে জ্বলে, গলায় লাল পাথরের মালা ঝকমকিয়ে দোলে। গোলাপী ছাপ-মারা শাদা শিফনের উত্তরপ্রান্তে আগুন লেগেছে মনে হয়। তবে শাদ-লাল সেট থেকে আগের লাল-শাদা সেটটাই বেশি পছন্দ। ময়লা কম চোখে পড়ে, ছোবলও জোরালো হয়।

দোকানে সেদিন এর থেকেও অনেক বেশি পছন্দসই একখানা লাল শাড়ি দেখে এসেছিল শেফালি। গাঢ় তাজা লাল, মনে হয় হাত ছোঁয়ালে সেই লাল হাতে উঠে আসবে—আঁচলার দিকটা ক্রমশ কালছে হয়ে মিশেছে, পরলে হঠাৎ একটা দিক নেই মনে হবে। দাম অনেক, কিন্তু হাতে কিছু টাকা এলেই শাড়িটা কিনবে শেফালি। শখের কেনা নয়, প্রয়োজনেই কিনবে। সেই লালের ধাক্কা স্নায়ুপথে গোপনতাব অন্তঃপুব পর্যন্ত হানা দিয়ে অনেক দ্বিধা ঘুচিয়ে দিতে পাবে মনে করে বলেই কিনবে।

সন্তর্পণে একটু ফিরে তাকালো শেফালি, তারপবেই একেবারে রাস্তার দিকে ঘুবে বসল। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টায় অভ্যস্ত নয় একটুও। লক্ষ্য কাম্য, তা'বলে কোনো রমণীর লক্ষ্য নয়। এই মেয়েটার তো নয়ই। বাসটাও আজ বিদিকিচ্ছিরি রকমের ফাঁকা, তায় আজ আবার একা উঠেছেন গরবিনী। প্রায়ই অল্পবয়সী দু'চারটি স্তাবক থাকে সঙ্গে। রূপসীর আচাব-আচাবণ ওঁদের বয়ঃজ্যেষ্ঠার মত হলেও শেফালি তাদেব স্তাবক ছাড়া আর কিছু ভাবে না। চোরাদৃষ্টিতে তাবা ওব দিকেও তাকায় মাঝে মাঝে আর ভক্তের মত মুখ করে দেবীব লেকচার শোনে। টুকটাক একটা দুটো কথা শেফালিরও কানে আসে। লেকচার ছাড়া আর কি, কাউকে কুঁড়েমির অপবাদ দিচ্ছে, কাউকে কাজ হচ্ছে না বলে চোখ বাঙাচ্ছে, কাউকে বাবুগিরির জন্য টিপ্পনী কাটছে, কখনো বা দল বেঁধে টাকা তোলার শলা-পবামর্শ আঁটছে। বিদ্রূপের আঁচে শেফালির অত যত্নের প্রসাধনে চিড় খাওয়ার দাখিল এক-একদিন। দেবী দেশ-সেবিকা হয়েছেন, দেশ আব দশের কাজ করছেন। গোটা দেশটা তো সেবার আশায় আর কাজের আশায় ওর মুখের দিকেই চেয়ে আছে। যত সব—

শেফালির খুব ভালো মনে নেই, কিন্তু যতটুকু ধূ-ধূ মনে পড়ে, ওর বাপ-ঠাকুরদারাও এমনি পাণ্ডাগিরি করে বেড়াতো। ঘরে নিশ্চিন্ত দিনযাপনের অঢেল রসদ থাকলে কত রকমেরই তো শখ হয় মানুষের। শখ ছাড়া আর কিছু ভাবে না শেফালি। শখ নয়তো কি, সবাই সব করেছে—করে করে তো এই হাল। কিন্তু অবস্থা তো মস্ত ছিল, এমন শাদা-মাঠা বেশবাস কেন? ইস্কুলে চাকরিই বা করে কেন? ওরা পদ্মা ডিঙিয়েছে শেফালিদের এক যুগেরও আগে, শেফালির চোখে যখন পদ্মা

পেরোনোটা প্রায় স্বপ্নের মত ছিল—তখন। তাহলে এমন হল কেন? পাণ্ডাগিরি করার রসদ পদ্মার ওপার থেকেই আসত না কি? ওদের মতই সব খুইয়েছে? সব বলতে—টাকা পয়সা বিষয়-আশয় শেফালিদের কোনোকালে ছিল না। কিন্তু যা খুইয়েছে দাঁড়িপাল্লায় রাখলে তার ভারে বিষয়-আশয়ের দিকটা কতখানি উঁচিয়ে উঠবে সে-শুধু সেই জানে। তবু সেদিন ওই মেয়েটার ওটুকু খোয়ানোর সম্ভাবনার কথা মনে হতে ভিতরে ভিতরে এক ধরনের হিংস্র আনন্দ অনুভব করেছে শেফালি। ও না হয় রঙ মেখে সং সেজে লালের তাপ ছড়িয়ে পতঙ্গ টানছে, আর একজন আরো সহজ রাস্তায় চোখে ধুলো দিয়ে ছেলেগুলোর মুণ্ডু চটকে বেড়াচ্ছে—দেখেশুনে শেষ-কালে পছন্দমত শুধু একজনের মুণ্ডু চিবুবে। তফাত এইটুকু। তফাত খুব নেই। লেখাপড়া জানা থাকলে ও-রকম অনেক সহজ রাস্তা সেও মাথা খাটিয়ে বার করতেল পারত।

সঙ্গে ওই স্তাবকেরা থাকলে শ্রীমতীর ওর দিকে তেমন লক্ষ্য করার ফুরসত হয় না। না থাকলে মাঝে মাঝে ফিরে তাকায়, দেখে। আজ একা উঠেছে, তায় আবার বাসটা ফাঁকা। শেফালি ঘাড় ফেরাতেই একেবারে চোখোচোখি হয়ে গেছে। বিরক্তির একশেষ, শেফালি তখুনি রাস্তার দিকে মুখ করে ঘুরে বসেছে।

এই দুনিয়াটা মস্ত বড় শোনা ছিল। এতবড় দুনিয়ায় কোনো চেনা মুখের আদলও কোনাদিন দেখবে না ভেবে একটু-আধটু স্বস্তিবোধ করত। কিন্তু তাও যেন হবার নয়। যেখানেই যায়, একটা দুটো চেনামুখ বেরিয়ে পড়ে। তারা না চিনলেও শেফালি চেনে। এমন কি কোনোদিন না দেখলেও অনেক মুখ চেনা-চেনা মনে হয়।

মুখ না ফিরিয়েও শেফালি কেমন করে জানি অনুভব করেছে মেয়েটা তার দিকেই চেয়ে আছে। ওকে দেখছে না আঠারো বছর আগের লাল ফ্রক-পরা কোনো এক ন'বছরের মেয়েকে আবিষ্কার করছে ওর মধ্যে? অস্বস্তিটা বাতিল করে দিতে চেষ্টা করল শেফালি। তা কখনো সম্ভব? আঠারোটা বছর কি একটা দুটো দিন না একটা দুটো বছর! মেয়েদের জীবনে এই আঠারো বছরের তফাত কুঁড়ির সঙ্গে গোটাগুটি একটা ফলের তফাতের মতই। ও নিজে কি করে ফল থেকে কুঁড়ি চিনল তা নিয়ে মাথা ঘামাল না।

নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করল। হঠাৎ হাসিও পেল কেমন। এই লালের সঙ্গে কি এক জন্মগত যোগ ওর। আঠারো বছরের বিস্মৃতির পরদা ঠেলে বেণী দোলানো একটা ন'বছরের মেয়ে ওর চোখে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সেই মেয়ে শেফালি নিজেই। পরনে গাঢ় লাল ফ্রক, নয়তো মাঝারি লাল, আর না হয় ফিকে লাল। লাল ছাড়া আর যে কিছু পরতো—মনেই পড়ে না। ঠাকুমা বুড়ীর লালের ওপর ঝোঁক ছিল খুব। আবার হাসিও পেল শেফালির, ওই বুড়ীর স্বভাবচরিত্তির কেমন ছিল—সে অমন লাল-পাগল ছিল কেন?

ইস্কুলের মেয়েরা নয় শুধু, পড়া না পারলে বা দুষ্টুমি করলে দিদিরা পর্যন্ত ওর লাল পরা নিয়ে খোঁটা দিত। আর শুক্লা বলত, দাদু তোর শেফালি নাম বদলে জবা রেখেছে। পাশাপাশি ঘর ছিল ওদের, হামেশা যাতায়াত ছিল। অবশ্য ঘর বলতে একরকমের ঘর নয়—প্রাসাদঘরের পাশে কুঁড়েঘরের মত ঘর। শুক্লার দাদু

নাম-বিকৃতি ঘটানোর ফলে শেফালি মুখে রাগ দেখালেও জবা নামটা ভালই লাগত, শুধু বুড়ী ঠাকুরমার দোষ দিলে কি হবে, লালের ওপর ওরও কেমন মোহ ছিল। সেই মোহ কাল হয়েছে।

ছয় থেকে নয়—এই তিন বছর শুক্লার সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছে। তারও আগে থেকে একসঙ্গে খেলাধুলো ঝাঁপাঝাঁপি করেছে, মারামারি ঝগড়া-ঝাঁটিও করেছে। তারপর সংসারটায় কি যে হল, শেফালির বাবা মাকে আর ওদের ভাইবোনকে নিয়ে দেশের বাড়িতে চলে গেল। যাবার ক'দিন আগে থেকেই গলা জড়াজড়ি করে দুটো ন'বছরের মেয়ে সে-কি কান্না। ওব আর শুক্লার সেই কান্না দেখে দু'বাড়ির লোকেবা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। ছাড়াছাড়ির প্রথম বছরে আঁকা-বাঁকা অক্ষরেব দুই একটা চিঠিপত্রেরও বিনিময় হযেছিল মনে আছে।

তারপরে একটানা বিস্মৃতিব ব্যবধান। তারও পরে, এ-পারে পূর্ব-বাংলা ও-পারে পশ্চিমবাংলা মধ্যিখানে পদ্মা। দেশ দুভাগ।

কিন্তু এবই মধ্যে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ বন্ধ থাকেনি। শেফালির বিযে হযেছে প্রায আঠারোয। ওই বয়সের অবিবাহিত মেযে গাঁয়ের চোখেব কাঁটা। তার ওপব সর্বত্র সেই লণ্ডভণ্ড ওলট-পালট ব্যাপার। মেয়ে ঘবে বাখা মানেই বিপদ ডেকে আনা। দিশেহারা আতঙ্কে শেফালির থেকে ষোল বছরের বড় এক বিপত্নীক ছেলের হাতে মেয়ে গছিয়েছেন তার বাবা। ছেলেব অবস্থা মোটামুটি ভালো, জমি-জমা আছে, নৌকো করে সুপুবি নারকেল চালান দিয়েও দু'পয়সা রোজগাব করে, আগেব পক্ষের ছেলেপুলেও নেই। সুখ কপালে থাকলে সুখেই থাকার কথা শেফালির। এতকাল বাদে বিয়ের সময আবাব শুক্লার কথা মনে হযেছিল ওর। কেন মনে হয়েছিল জানে না, মনে হয়েছিল মনে আছে।

বছর দুইয়ের মধ্যে ছেলে হয়েছে একটি। তার আগে শ্বশুব মাবা গেছেন। ওই এক বৃদ্ধের ভরসায আর মনেব জোরে মাটি কামড়ে পড়ে ছিল তারা। তিনি বলতেন, মরি সব এইখানেই মরব, একসঙ্গে মবব তবু নড়ব না। কিন্তু মরার বাড়াও বিপদ আছে চোখবোজার আগে সেটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যাবাব আগে সুযোগ সুবিধেমত তাদেব ওখান থেকে চলে যেতেই উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

ওদিকে ঘবের লোকটার মেরুদণ্ড আগেই ভেঙেছিল, বাপ চোখ বোজার পর সেটা যেন একেবাবে দুমড়ে গেল। চালানের কারবাব অনেকদিন বন্ধ হয়েছিল, পেটের ঘায়ে মাসে পনেব দিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হত। একটানা দুশ্চিন্তা আর ত্রাসের ফল। তাব বদলে শেফালির দেহে ভাঙন ধরলে বরং দুজনেই ওরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু উল্টো হল। স্বাস্থ্য আগেও মোটামুটি ভালই ছিল শেফালির। আর একজনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে দশভুজার মত একাই তাকে কবতে হত সব কাজ। ঢেঁকিতে ধানচিড়ে কোটা থেকে পুকুরের মাছ ধরা পর্যন্ত। জমি দখল হয়ে যাচ্ছে শুনলে স্বামীর পিছনে আধগলা ঘোমটা টেনে তাকেও এগোতে হত। এই কায়িক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যটি যেন শত্রুতা করেই সর্বাঙ্গ উপচে উঠতে লাগল আরো।

ব্যঙ্গ কটাক্ষ বা ছোটখাট অপমান অনেকদিন গায়ে মাখেনি। বাইরেব এক-একটা

উত্তেজনার বিষক্রিয়া গ্রাম-দেশেও ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। দখল নেবার জন্য যারা লালায়িত তারা শুধু জায়গাজমি ঘরবাড়ির ওপরেই দখল নেবে না, শেফালি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিল। ভিতরে ভিতরে অনেকদিন ধরেই ওরা সব ছেড়ে-ছুড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বলতে গেলে শ্বশুর মারা যাবার পর থেকেই। একটি অবধি পয়সা বাঁচিয়ে পুঁজি করেছে। জমি-জমা বেচার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এমনিতেই যারা সব পাবে বলে ধরে নিয়েছে তাবা পয়সা দিয়ে কিনতে যাবে কেন? বেশি চেষ্টা বা তোড়জোড় করতে গেলে জানাজানিব ভয়, অতর্কিত হামলার আশঙ্কা।

তবু শেষ আশাটুকু ছাড়তে পারেনি একেবারে। স্বামী-পুত্রের হাত ধরে বলতে পারেনি, চলো— একদিন বলতে হল। এক স্থানীয় বুড়ো গোপনে সাবধান করে দিয়ে গেল, আজই বিবি নিয়ে পালাও বাবুজী—নইলে এই রাতই হয়ত শেষ রাত। তোমাদের কি হবে না হবে জানি না, কিন্তু বিবিকে ওবা ছিনিয়ে নেবেই।

সেই রাতের অন্ধকারেই ছোট একটা পুঁটলি আর ছেলে বুকে নিয়ে স্বামীর হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল শেফালি। তারপর কেমন করে একদিন শহরে এসে পৌঁছেছিল তারা, কেমন করে আবার একদিন শহর ছেড়ে পদ্মাও পাড়ি দিয়েছিল!

তারপর এই শহর। নিশ্চিন্ত আশ্বাসেব মুখোস আঁটা এই শহর। পদ্মার ওধারে যে বুড়ো তাদের সতর্ক করে দিয়ে গিয়েছিল, অনেক দিন পর্যন্ত মনে মনে তাব ওপর কৃতজ্ঞ ছিল শেফালি। কিন্তু আজ সে কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নেই। কিছুই করার ছিল না ওদের, যা হবার তাই হত, এর থেকে খারাপ কিছু হত না। পদ্মার ওপারের বিপর্যয়ে এ-পারের একটি মানুষেরও নিশ্চিন্ত নিদ্রাব ব্যাঘাত ঘটেনি—উঁচু-নিচু কারো না। উল্টে এক-দঙ্গল হায়েনার উল্লাসের খোরাক জুগিয়েছে ওরা এসে।

ভদ্র সমাজ থেকে অনেক দূরের এক টিনের চালাব নিচে আশ্রয় জুটেছিল তাদের। কিন্তু এখানকার বাতের অন্ধকার আরো বেশি আতঙ্ক বেশি ত্রাস ছড়াত বুকের মধ্যে। সেই অন্ধকারে হামেশা ভদ্রলোকের দূত আসত, লোভেব হাতছানি আসত। কিন্তু সেই দূত আর সেই হাতছানি চিনতে একটু সময লেগেছিল শেফালির। কারণ তখনো তার ঘরে জীবিত মানুষ আছে একটা। জীবিত হলেও জীবন্মৃত। অনাহাব আর অপথ্যে পেটের ঘা দগদগিযে উঠেছে। মুখ বুজে সেই জ্বালা সহ্য করে বিকল দেহটাকে টেনে-হিঁচড়ে দিনের পর দিন একটুখানি সংস্থানের আশায় কোথায় কোথায় যে ঘুরেছে লোকটা শেফালি জানে না। তারপর একদিন বেরিযে আর ফেরেনি। অনেক আশ্বাস নিয়ে আনাগোনা করত যারা তারাও টের পেয়েছে একদিন। বলেছে, ওদের ফেলে লোকটা পালিয়েছে। কিন্তু শেফালির বদ্ধ ধারণা, লোকটা পালিয়েছে বটে, কিন্তু এমন জায়গায় পালিয়েছে যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফেরে না।

. ওকে সাহায্য করতে লোক ছুটে এসেছে। সাহায্যও করেছে বইকি। সেই সাহায্যে ছেলেটা বেঁচেছে আর ওর দেহটাও খাড়া আছে। কিন্তু সেই সাহায্যের বদলে সোল্লাসে দাম নিয়েছে তারা—সেটা এমন নির্মম নিষ্ঠুর দাম যে শেফালি নির্বাক, বিহ্বল। এক এক সময় নিজের দেহের অস্থি মজ্জা রক্ত মাংস সব আলাদা আলাদা করে দেখতে ইচ্ছে হত শেফালির কি আছে ওতে—এর প্রতি পুরুষের এত লোভ কেন!

দেখতে দেখতে ছ'টা বছর কেটে গেল। ছেলেটা সাতে পড়ল ওর বয়স সাতাশে পড়লো। এখন পুরুষের ওই লোভটুকুই একমাত্র পুঁজি তার। সেই পুঁজি অটুট রাখার তাড়নায় সর্বাঙ্গে স্নায়ু তাতানো লালের ইশারা। এই ছ'বছরে লালের মহিমা জেনেছে শেফালি। শুধু বিভ্রম ছড়ায় না, রাতের আঁধারেও চোখ টানে।...হাতে টাকা এলে দোকানের দেখা সেই লাল শাড়িটাও কিনবে শেফালি। শখের কেনা নয়, তার কেনা দরকার।

জনা দুই তিন লোক উঠেছে বাসে, দু'সারি আসনের মাঝমাঝি দাঁড়িয়েছে তারা—শেফালি আড়াল পেয়েছে। মেয়েটা আর ওকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎই সে নিস্পন্দ কাঠ একেবারে। মেয়েটা তার লেডিস সীট ছেড়ে দিয়ে সামনের ভদ্রলোক দুজনকে বসতে বলল, আর নিজে শেফালিব পাশের শূন্য আসনটিতে এসে বসল।

শেফালি কলের মূর্তির মত একটুখানি মুখ ফেবাল কি ফেরাল না, তারপর একেবারে জানলার গায়ে সরে গিয়ে নিস্পৃহ মুখে রাস্তা দেখতে লাগল। কিন্তু দেখছেও না কিছু, নিস্পৃহও নয় ভিতরটা। পার্শ্ববর্তিনীর দুটো চোখের আওতায় ও যেন ভালোহাতে আটকা পড়ে গেছে—আর অব্যাহতি নেই।

কিছু মনে করবেন না, অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে বিদ্যুৎস্পর্শের মতই কানে এসে লাগল, আপনার নাম কি শেফালি...?

শেফালি কলের মূর্তির মতই ফিরে তাকালো, প্রশ্নটা কার উদ্দেশে তাই যেন স্পষ্ট নয়। এবারে কি করবে? অপরিচিতার মতই দেখবে এক-নজর, নির্লিপ্ত মুখে মাথা নাড়াবে, তারপর আবার রাস্তা দেখবে।

কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে তার বদলে যা সে বলে ফেলল, সেটা নিজের কানেই লাগল খট করে। এই কথাটা মুখ দিয়ে বেরুবে একবারও ভাবেনি। বলল, চিনেছিস তাহলে...।

আঠারো বছর নয়, যেন একবছর দু'বছর দেখা হয়নি মাত্র। এই ক'টা মাত্র কথায় আঠারো বছরের প্রায় অবিচ্ছেদ্য পুরু পরদাটা এক নিমেষে ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার হয়ে গেল। বিস্ময়ে আনন্দে শুক্লা মিত্তির হতভম্ব বেশ কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই দুহাতে তার কাঁধ ধরে কাছে টেনে নিজের দিকে ফেরাতে চেষ্টা করল ওকে। নিজের বয়স ভুলে, কোথায় বসে আছে ভুলে, ছোট্ট মেয়ের মতই কলকলিয়ে উঠল একেবারে—তুই শেফালি, অ্যাঁ? তুই সেই শেফালি। কি আশ্চর্য! তুইও আমাকে চিনেছিস তাহলে—চিনেও অচেনার মত ছিলি! তুই সেই শেফালি তো রে?

শেফালি তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, লোকগুলোর দিকে চেয়ে দ্যাখ, ওদের জলতেষ্টা পাচ্ছে!

থতমত খেয়ে শুক্লা মিত্তির এদিক-ওদিক তাকালো, ওরা দু'জনেই বাসসুদ্ধু লোকের লক্ষ্য বটে। লজ্জা পেল, হেসেও ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান—ওঠ, নামব।

শেফালি বাধা দেবার অবকাশ পেল না। নামতে হল। নেমে আবার হাসতে হল। কিন্তু এক অজ্ঞাত বিরক্তির আঁচে ভিতরটা খরখরিয়ে উঠতে চাইছে। শুধু বিরক্তি নয়,

ঈর্ষাও বোধ করি। গায়ে গায়ে ঘেঁষে বাস থেকে নামার ফাঁকে প্রায় পুরুষের দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করেছে ওকে। বলিষ্ঠ প্রাণতারুণ্যে সর্বাঙ্গ ভরাট যেন— সাতাশ কেউ বলবে না। সুন্দর লাগছে, তাজা লাগছে, আর তার পাশে নিজেকে নিষ্প্রভ লাগছে। ওর অতি-পরিচ্ছন্ন অথচ সাদাসিধে বেশবাসের সামনে নিজের এই লালের বন্যা বিদ্রূপের মত লাগছে।...আঠারো বছর বাদে ও সেই হারানো বন্ধু পেয়েছে ভেবে আনন্দে মত্ত। কিন্তু শেফালি কি পেল? বাসের পয়সা কটাই জলাঞ্জলি, দিনটাও নিষ্ফলা যাবে বোধ হয়। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে শেফালির। যোগাযোগের সূত্রপাতে ও-রকম একটা জবাব না দিয়ে বসলে একটুখানি ব্যবধান রচনার অবকাশ হয়ত থাকত। কিন্তু ওই এক জবাবেই আঠারো বছরের ফাঁক ঘুচিয়ে বসল। অথচ ইচ্ছে করে বলেনি শেফালি, স্বভাবটাই ওই রকম দাঁড়িয়ে গেছে। আব কিছুতে না হোক ওর কথার জালে পড়লেও তৃষিতের তৃষ্ণা বাড়ে।

বাস থেকে নেমেই শুক্লা আবাব চড়াও কবেছে তাকে। প্রচুর হেসেছে, অনর্গল কথা বলেছে, বার বার জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে, তারপর বাস্তায়ও সুবিধে হল না দেখে একটা রেস্তরাঁয় টেনে এনেছে তাকে। দু'পেয়ালা চা নিয়ে ক্যাবিনের পবদা ফেলে মুখোমুখি বসেছে দুজনে। আর শেফালি যেন ফাপরে পড়েছে।

তুই আমাকে গোড়া থেকেই চিনেছিলি বলতে চাস? কি করে চিনলি?

শেফালি হেসে জবাব এড়ালো, তুই কি কবে চিনলি বল—।

সত্যি কথা বলতে কি গোড়ায় চিনিনি, উল্টে তোর ওই লাল পোশাক কটকটিয়ে চোখে লাগত।

শুক্লা হেসে উঠল, হাসিটাও তাজা, সুন্দব—সেটা আবার শেফালির চোখে কটকটিয়ে লাগছে। হাসি থামিয়ে শুক্লা চেনার ফিরিস্তি দিযেছে। একদিনে চেনেনি, একটু একটু করে চিনেছে। মুখের আদল কেমন চেনা-চেনা লেগেছে, তারপর হঠাৎ একদিন ইস্কুলের লাল-ফ্রক-পরা শেফালিকে মনে পড়েছে। লঘু কৌতুকে দু'চোখ ওর মুখের ওপর আটকালো।—তোর লালের ঝোঁক এখনো কাটেনি দেখছি—

শেফালি মাথা নাডল—না, বেড়েছে। কাটলে তোর চেনা হত না।

শুক্লা ইচ্ছে করেই এ-প্রসঙ্গ এড়িযে আবাব চোখ বাঙালো— কিন্তু আমি যদি ভরসা করে আজ তোর পাশে গিয়ে না বসতাম? তুই চিনেও একটা দিন এগোলি না যে বড়?

এবারে শেফালি মুখ টিপে হাসল। বলল, ভয়ে।

শুক্লা অবাক হল, ভয় কেন জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু শেফালি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মৃদু হাসল শুধু, জবাব দিল না। শুক্লা একের পর এক আরো অনেক খবরই জিজ্ঞাসা করল, দেশের খবর, আত্মীয়-পরিজনের খবব, বর্তমানের খবর। এতকাল পরের সাক্ষাতে এমন ছাড়া-ছাড়া নিরুত্তাপ নির্লিপ্ত জবাব আশা করেনি সে। ওর সমাচার শুভ নয় সেটুকু অবশ্য আঁচ করতে পেরেছে। ওর স্বামীর খবর জিজ্ঞাসা করে তো বড় রকমের একটা ধাক্কাই খেল। হাসিমুখেই শুধিয়েছিল, এবারে তোর ভদ্রলোকটির খবরবার্তা বল শুনি—

কিন্তু এও যেন শেফালির নিজের কথা নয়, আর কারো কথা, আর কারো প্রসঙ্গ। বলল, শোনাবার মত কিছু নেই। রোগে শোকে ত্রাসে আধমরা হয়ে কোনরকমে তবু পাল্লা পেরিয়ে এসেছিল—কিন্তু এখানকার এই শুকনো ডাঙায় এসে কোথায় যে ভেসে গেল আর খোঁজই পাওয়া গেল না। বোধ হয় বেঁচে নেই, পথেঘাটে কত লোকই তো পড়ছে, আর উঠছে না।

নিজের অগোচরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল শুক্লা—বলিস কি রে!...এখানে আর কে আছে তোর?

জবাবে শেফালিকে মুখ টিপে হাসতে দেখে একধরনের অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছে শুক্লা, জবাব শুনে সেটা বাড়ল আরো। শেফালি বলল—ছেলে আছে আর এখানকার একটা বুড়ী আছে সত্তর বছরের, গঙ্গা—ছেলে আগলায়।

এবপর নিজের প্রসঙ্গ ঝেড়ে ফেলে হাসিমুখে বান্ধবীব এই আঠাবো বছরের সমাচার সংগ্রহে মন দিয়েছে শেফালি। শুক্লা স্বস্তি বোধ কবেছে, একটু একটু করে নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে আবার। কথাবার্তার ফাঁকে আরো দু পেয়ালা চা নিঃশেষ হয়েছে। তারপর শেফালি বলেছে—এবারে ওঠা যাক, এতক্ষণ ঘব দখল কবে বসে থাকলে ওদের রেস্টুরেন্ট লাটে উঠবে।

শুক্লা জিজ্ঞাসা কবল—যাবি কোথায়? প্রায়ই এদিকে দেখি তোকে, কোথায যাস?

শেফালি হঠাৎ থমকালো, দু'চোখ ওব মুখের ওপর স্থির হল একটু, তারপব হাসির আভাস দেখা গেল। সূচনায যা পারবে না তা আব কোনদিন পারবে না, না পারলে এই পথে চলা-ফেবা বন্ধ করতে হবে। সঙ্কোচেব মর্যদা এখন আর এতবড নয় শেফালিব কাছে। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল,—টালিগঞ্জেব দিকে, স্টুডিওয়।

শুক্লা আবার হতভম্ব।—বলিস কি রে, সিনেমায় নেমেছিস নাকি?

বলার মত কবে নামলে তো দেখতেই পেতিস, নাকি তোব আবার ওসব দেখা-টেখার সময় হয় না?...ওখান থেকেও প্রায় বাতিল, লেগে থাকলে মাঝে-মধ্যে ছিটেফোঁটা কিছু জোটে। শেফালি হেসে উঠল, ওদেবই বা দোষ দেব কি, ক্যামেরায় গলা পর্যন্ত একরকম মন্দ ওঠে না, তার ওপরে গেলেই মুখখানা যা দেখতে হয় দেখলে নিজের গালে নিজেরই চড় বসাতে ইচ্ছা করে। ক্যামেরা আমার এক নম্বর শত্রু—

সব সত্যি না হলেও গোটাগুটি মিথ্যেও বলেনি শেফালি। উপকারীব মুখোশ পরে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে সিনেমা কোম্পানীর দালালও দুই একজন দেখেছে! তারা ওকে ভবিষ্যৎ-নায়িকাব স্বপ্ন দেখিয়েছিল, মাথায় স্বর্ণ-বৃষ্টির সম্ভাবনার নজির দেখিয়েছিল। তারপর অনেক হাত ঘুরে অনেকের চিত্তবিনোদনের রাস্তা দিয়ে শেষে চিত্রায়নের অন্তঃপুরে এসেও হোঁচট খেয়েছে। স্বাস্থ্য কথাবার্তা চলন-বলন সব সচল, মুখখানাই অচল শুধু—ক্যামেরা-ফেস নয়। ফলে নায়িকা হবার আশা ঘুচে গেছে, সহ-নায়িকা হবার আশাও—পরিচারিকা বা হাসপাতালের নার্স বা দলের মেয়ের ভূমিকা জুটলেই যথেষ্ট এখন। সেটুকু পেতেও অনেক মেহনত করতে হয়, অনেকের মন জুগিয়ে চলতে হয়। কিন্তু এই প্রত্যাশায় এখন আর যে খুব বসে নেই, ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করলেও অবশ্য কিছু রোজগার করা যায়—যেখানে নিছক ক্যামেরা-ফেস

থেকে ওর সচল গুণগুলোরই চাহিদা বেশি।

শুক্লা আবার বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে একটা। ওর হাসিটা আর তেমন সহজ তাজা লাগেনি শেফালির। লাগেনি বলেই খুশি। আদর্শবাদিনী যা বোঝবার বুঝে নিয়েছে, এবারে দেখা হলেও হয়ত মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকবে। কিন্তু একটু বাদে উল্টে শেফালিই মনে মনে অবাক হল। নোটবই বার করে শুক্লা একরকম জোর করেই ওর ঘরের হদিস লিখে রাখল, শেফালি এড়াবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও। আর নিজের বাড়ির ঠিকানা লিখে ওকে দিল। ছেলে নিয়ে একদিন আসতেও বার বার বলল।

শুক্লাকেই আগে বাসে তুলে দিয়েছে শেফালি, তারপর নিজে ফিরতি বাস ধরেছে। দিনটাই মাটি, আজ আর কেম জানি কিছুই ভালো লাগল না। মনে মনে বান্ধবীর উদ্দেশে অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ করল।...সুখের স্বপ্ন দেখছে, সুন্দরের স্বপ্ন দেখছে—আবার দেখা হলে আরো ভালো করে দেখিয়ে ছাড়বে শেফালিকে...বাড়িতে গাড়ি আছে তবু পাচজনের সঙ্গে বাসে চড়েন, পয়সাঅলা বাপ আর পয়সাঅলা বাপের বন্ধুদের লাগিয়ে প্রায় বিনে মাইনের গরীব মেয়েদের ইস্কুল করেছে। আরো কি কি করেছে বলছিল, ভালো করে শোনেওনি শেফালি। হাতি ঘোড়া সব করবে, গরীব মেয়েদের গতি শেফালির জানা আছে।

কম পথ নয়, বাস থেকে নামতে নামতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। বেশ খানিকটা হাঁটাপথ এবার। শেফালি এগিয়ে চলল। শহুরে ভদ্রলোকের বসতি কম এদিকটায়, আরো কিছুটা এগোলে সবটাই মেহনতী মানুষের এলাকা। বেশ রাত পর্যন্ত কিন্তু দু'পাঁচজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ মেলে তবু। কেন মেলে তা শেফালিরাই শুধু জানে। শেফালি তো আর একজন নয়।

এবার আদিকালের পুরনো কালো ব্রীজ পেরুতে হবে একটা। অনেকটা উঠতে হবে সিঁড়ি বেয়ে, হাঁটতে হবে, তারপর আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। নিচে দিয়ে ট্রেন যাতায়াত করে। এই ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে গোড়ায় গোড়ায় শেফালি অনেকদিন ভেবেছে, সব সমস্যার সমাধান করে দেবে কিনা। সময় বুঝে ওই রেললাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আর কোনো সমস্যা থাকে না। ছেলেটার কথা ভেবে পারেনি...। ছেলে তো নয়, শত্রু!

পুলটার ও-মাথায় পৌঁছে শেফালি ফিরে তাকালো একবার। না, কেউ আসছে না, কেউ অনুসরণ করছে না। এ দিনটা ব্যর্থই।

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে গঙ্গা বুড়ীর বকুনি শুরু। ও আজ এত শিগগীর ফেরায় বুড়ী খুশি, আবার চিন্তিতও। ছেলে মুখ তুলে একবার শুধু দেখল মাকে। পরেও দেখতে লাগল ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে। আগের মত আজকাল আর সে মা-মণি বলে দৌড়ে আসে না, এসে জাপটে ধরে না। মনে মনে খুব ভয় করে আজকাল মাকে—উঠতে বসতে আগে তো আর এমন পিটুনি খেতে হত না। কেন যে মার খায় সব সময় বোঝেও না ভালো করে, যখন একেবারেই বোঝে না তখন কাঁদেও না—ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। আটবছর মাত্র বয়েস, তবু এরই মধ্যে ছেলেটার দৌরাত্ম্য দিনকে দিন কমছে। বাড়বেই বা কেমন করে, সর্দি কাশি জ্বর লেগেই আছে,

একসঙ্গে তিনটে দিনও ভালো থাকে না।

গঙ্গা বুড়ী একটানা বকর বকর করে চলেছে। ছেলের কথাই বলছে বেশির ভাগ, ভালো করে একটু চিকিৎসা হওয়া দরকার ছেলেটার। মা হয়ে ছেলের ওপর এমন সৎমায়ের ব্যবহার আর সে দেখেনি, ইত্যাদি। তারপর আবার সেই পুরনো প্রস্তাব, সরকার থেকে সব খরচা দিয়ে দণ্ডকারণ্যে না কোথায় সব লোক পাঠানো হচ্ছে, সেখানে যারা যাবে তারা জমি-জমা পাবে, ঘর তোলার টাকা পাবে, গতর থাকলে কাজ পাবে। ভালো মানুষের মেয়ে একটু চেষ্টা করলে তারাও যেতে পারে, সব খোঁজখবর তো কবেই এনে দিয়েছে সে, কেবল একটু ধরা-পড়া করতে পারলেই একটা হিল্লে হয়ে যায়। ভালো মানুষের মেয়ের একটু চেষ্টাও যদি থাকত। কি সুখে যে পড়ে আছে এখানে সেই জানে।

শেফালি একটা কথাও বলেনি, পারলে দণ্ডকারণ্য ছেড়ে তক্ষুনি যমের বাড়ি পাঠায় বুড়ীকে। তবে ছেলেটার দিকে বারকয়েক তাকালো। বড্ডই রুগ্ন দেখাচ্ছে, অসুখটা আর ছাড়ছেই না। বুকে কিছু হল কিনা কে জানে। হলেই বা কি আর করতে পারে শেফালি, করার কিছু নেই। যা হবার হবে। চিন্তাভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল। না, ছেলের জন্যে আগের মত অত আর টান নেই তার। ছেলেটা অযত্ন অবহেলায় থাকলেও বেশ সুশ্রী, কোঁকড়ানো চুল, ফরসা রঙ, ডাগর চোখ। মেয়ে হলে আরো অনেক সুন্দর দেখাতো।...আর মেয়ে হলে মায়ের একটু আদরযত্নও হয়ত পেত। সেই মুখ ক্যামেরা-ফেস হলে শেফালির সমস্ত ভাবনাই হয়ত ঘুচতে পারত একদিন। এই সবই শেফালি সত্যি সত্যি ভেবেছে আর ছেলের ওপর বিরক্ত হয়েছে। এই ছেলে বড় হয়ে কি করবে? যে মায়ের ছেলে এই ছেলে...

ভাবতেও বিতৃষ্ণা। সমস্ত পুরুষের ওপরেই যেন একটা জাতক্রোধ তার।

দিনকয়েক বাদে আবার একদিন বাসেই দেখা শুক্লার সঙ্গে, তারপর আরো একদিন। এই দিকে না এলেও শেফালির চলে না—এ-পথে কিছু পয়সা আছে। শুক্লা আগের মতই হাসি-খুশি, তরুণ সঙ্গীদের বর্জন করে তার পাশে এসে বসেছে। ছেলের খবর নিয়েছে, সিনেমায় নতুন কিছু রোল পেল কিনা সে খোঁজও করেছে। আর বার বার করে তাদের বাড়িতে একদিন যেতে বলেছে।

তৃতীয় দিনের সাক্ষাতে শুক্লার মুখ গম্ভীর। মাঝে অনেকদিন দেখা হয়নি। দেখা হওয়ার সম্ভাবনা এড়িয়েই শেফালি বাসে উঠেছিল এ ক'দিন—তবু দেখা হল। শুক্লা সেদিন ওকে টেনে নামালো, বলল, বিশেষ কথা আছে, নাব...

বাস থেকে নেমে চুপচাপ ওকে দেখল খানিক, তারপর জিজ্ঞাসা করল, তুই সত্যি চলেছিস কোথায়?

শেফালি জবাব দিল না।

শুক্লা আবার বলল, ওরা তোর সম্বন্ধে বড় যা-তা বলছিল।

এবারে শেফালি হাসল একটু, পাল্টা প্রশ্ন করল, ওরা কারা?

ওই ছেলেগুলোর দুই একজন। কি ব্যাপার তোর, আমাকে সব খুলে বল দেখি!

ভিতরটা রাগে জ্বলছে শেফালির, তাই আরো বেশি হাসছে। বলল, সেদিন তো মোটামুটি খুলেই বলেছিলাম। আর কতটা খুলে বললে তুই সব বুঝবি?

শুক্লা থতমত খেল। তারপর জোর দিয়ে বলল, চল আমার বাড়ি—চল্।

শেফালি হাসছে, বাড়ি নিয়ে যাবি তো এখানে নামালি কেন?

শুক্লা রেগে গেল হঠাৎ। বেশ করেছি। তুই যাবি কিনা বল্। তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে—এর থেকে ভালো কিছু উপায় একটা নিশ্চয় হবে।

কথাগুলোর মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। তাছাড়া এই মেয়েটার মধ্যে সব সময়েই একটা জোরালো কিছু যেন উঁকিঝুঁকি দেয়। সেটা ওর মনের শুচিতা কিনা বোঝে না। বেশবাসেও কোনদিন আলগা আতিশয্য চোখে পড়েনি। মুখের দিকে চেয়ে রূঢ় কথা বলতে বাধে।

আজ না।

কবে?

দেখি।

আর একবারও অনুরোধ না করে শুক্লা হনহন করে হেঁটে চলল, ফিরেও তাকালো না। সেদিনও শেষ পর্যন্ত ফিরতি পথই ধরল শেফালি। ভাবছে অন্যমনস্কের মত, সব জেনে তো ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে থাকার কথা শুক্লার।...ওর মুখে রাগ দেখল বটে, কিন্তু ঘৃণার লেশমাত্রও দেখেনি। বরং বেদনা দেখেছে।

এর পরের দেখা উত্তর কলকাতায়, প্রায় দিন কুড়ি বাদে। ওর স্কুলের পথ দিয়ে বাসে যাতায়াত শেফালি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। গেলেও কম করে ঘণ্টাতিনেক আগে বেরুতো। কিন্তু এখানে দেখা হয়ে যেতে পারে একবারও ভাবেনি। এ দিকটা শেফালির ঘরের কাছেই বলতে গেলে। বাসে মিনিট দশেকের পথ। কাছে হোক দূরে হোক, নতুন পথ মাঝে মাঝে যাচাই করতেই হয়।

খপ করে হাত ধরে শুক্লা ওকে একটা নিরিবিলি জায়গায় টেনে আনল।—পালিয়ে বেড়াচ্ছিস যে?

শেফালি নিরুপায়। পালাব কেন, সেদিন তো তুইই রেগে চলে গেলি!

বেশ করেছি। আজ এদিকে যে?

এবারে হাসতেই চেষ্টা করল শেফালি, তুই এদিকে আসবি জানলে আসতুম না। তুই এদিকে কেন?

শুক্লা রাগ ভুলে হঠাৎই হেসে ফেলল। তারপর গলা খাটো করে বলল, আমিও তোর মতই একজনের খোঁজে এসেছিলাম। এসে দেখি ঘরে তালা। হাসি চেপে চট করেই গম্ভীর আবার। —সেইদিন থেকেই তোকে খুঁজছি, দুই একদিনরে মধ্যেই তোর বাড়ি যেতাম—তা তুই আসবি, না আমাকেই যেতে হবে?

কোথায়?

শুক্লা ভাবল একটু, তারপর বলল, আচ্ছা পরশু শনিবার আছে একেবারে কাজের জায়গায়ই আয়। আমিও থাকব সেখানে। যে-কদিন অন্য ব্যবস্থা না হচ্ছে, ওখানকার কাজ দেখাশুনা করলেও একরকম করে চলে যাবে। ঠিকানা লিখে দিল, জায়গাটা

বুঝিয়ে দিল, বলল, ঠিক আসবি তো? না যদি আসিস আমি তোর ওখানে গিয়ে হাজির হব কিন্তু—

শেফালি কথা দিয়েছে যাবে। গিয়েছিল। সব জেনেশুনে এভাবে কেউ ডাকলে যাবে না-ই বা কেন! গিয়ে দেখে নানা বয়সের বহু মেয়ের ভিড় সেখানে। চার-পাঁচটা ছোট ছোট ঘর নিয়ে পুরনো দালান একটা—নাম কটেজ। কোনো ঘরে মেয়েরা বসে সেলাই-ফোঁড়াই করছে, কেনো ঘরে মেয়েদের স্বাস্থ্য-বিধি শেখানো হচ্ছে, কোনো ঘরে বা নানা রকমেব মুখরোচক আচার চাটনি ইত্যাদি তৈরি করে শিশিতে পোরা হচ্ছে। এক নজব তাকালেই বোঝা যায় দুস্থ সকলেই—কেবল তদারকরত যে কটি মেয়ে তাদের অবস্থাই হয়ত একটু অন্যরকম।

ওকে দেখে শুক্লা দৌড়ে এলো। খুশিতে আনন্দে আটখানা একেবারে। সকলেই ফিরে ফিরে দেখছে শেফালিকে, যেন মস্ত গণ্যমান্য কেউ এসেছে। শুক্লা একে একে সব ক'টা ঘরে নিয়ে এলো তাকে, প্রত্যেকেব কাজ খুঁটিযে খুঁটিয়ে দেখালো। দাওযায দুটো মোড়া পেতে একটায় ওকে বসালো, আর একটায় নিজে বসল। তারপব ছোটখাট লেকচাবই দিয়ে ফেলল একটা। কি হচ্ছে এখানে, কি হতে পারে ভবিষ্যতে, কতজন শুভার্থী আছে এ কাজের পিছনে, ইত্যাদি। শেষে বায দিল, যে ক'দিন কিছু না জোটে, এখানকার কাজ দেখাশুনা করবে তুমি। মাইনে-কড়ি আমবা কাউকে দিতে পারিনে এখনো, তবে খাওয়া-পরাটা একবকম চলে যাবে। তাবপব শিগগীরই একটা কিছু যাতে হয় আমি দেখছি।

শেফালিব চমক ভাঙল হঠাৎ। এতক্ষণ কিছু শুনছিল কি শুক্লাকেই দেখছিল হুঁস নেই। না, এমন কথা সে কোনদিন শোনেনি, আর শুক্লাকেও এত সুন্দব আগে কখনো মনে হয়নি। কিন্তু ওর জন্যে আবাব কি দেখবে বলছে। আর কি হতে পারে ওর!

শুক্লা সেখান থেকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল ওকে। ওর বাবা-মাও খাতিরযত্ন করলেন। শুক্লা তাকে নিজের ঘরে এনে চোখ বাঙালো, অত মিইযে যাচ্ছিস কেন? কেউ কোন দিন কিছু জানবে না। তারপবেই হঠাৎ দু'হাতে জাপটে ধরল তাকে, তুই আমাকে আপন ভাবছিস না কেন? তুই না সেই শেফালি!

চোখের কোণ দুটো জ্বালা-জ্বালা করে জলে ভরে উঠতে চাইছে, শেফালি সামলে নিল। সহজ হয়ে উঠতে চেষ্টা করল। শুক্লার সব কথাই আজ কান পেতে শুনতে ইচ্ছা করছে তার। শুনছেও। কথায় কথায় হালকাও বোধ করছে বেশ। একসময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে করবি না?

শুক্লা ছদ্ম গাম্ভীর্যে ভুরু কোঁচকালো, করব না কেন? বয়েস হোক!!

হাসতে গিয়েও শেফালিব কি মনে পড়ল হঠাৎ। —সেদিন কার খোঁজে উত্তরে গিয়েছিলি বলছিলি, কে?

শুক্লা হাসতে লাগল, তারপর বলল, সে-ই।

সব ভুলে শেফালি কোথায় যেন ফিরে আসতে পেরেছে তারপর। আনন্দে কৌতুকে উসখুসিয়ে উঠল, বল না শুনি!

শুনবি কি, দাঁড়া দেখাই আগে। ড্রয়ার খুলে কি একটা বার করল, তারপর ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, দ্যাখ!

ফটো একটা। শেফালি সাগ্রহে দেখল। কিন্তু দেখে তেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারল না। অথচ বেশ সুশ্রী মূর্তি। নিরীহ ভালো মানুষ গোছেব আদল মুখের। কিন্তু দৃষ্টিটা চাপা, ঈষৎ তীক্ষ্ণ। এ-রকম চেহারা কেন জানি খুব পছন্দ নয় শেফালির।

নিজের উদ্দেশেই মনে মনে একটা কটূক্তি করে উঠল, ফটো দেখেই একজন অদেখা অচেনা ভদ্রলোককে যাচাই করতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। মুখে হাসি টেনে ফটো ফিরিযে দিল, বলল, বেশ। আসল ব্যাপাটা কবে?

দাঁড়া, সবে তো ছ'টা বছব ভোগালাম, আরো বছরখানেক যাক—। প্রতীক্ষার আসল কাবণটা বলতে লজ্জা পেলেও শুক্লা বলল শেষ পর্যন্ত।—ঠাকুবদা বুড়ো আচ্ছা জব্দ করে গেছে, মস্ত গণৎকার-ভক্ত হযে উঠেছিল শেষ বয়সে—বাবা-মাকে বলে গেছে আঠাশের আগে বিযে হলে বিযে সুখেব হবে না। বাবা-মা তাই ধরে বসে আছে, আর আমারও কেমন সাহসে কুলোচ্ছে না।

ভদ্রলোক কি বলেন?

বলবে আবার কি, শুক্লা ভুরু কোঁচকাতে গিযেও হেসে ফেলল, আমাকে কেমন ভয় করে দেখলে হেসে মরতিস।

ওর দাপটের কথা শুনেও শেফালি খুশি হতে পাবল না। শুক্লাব ভাবী স্বামী শুক্লাব থেকেও দ্বিগুণ পুরুষকারসম্পন্ন জানলে বরং খুশি হত। শুক্লা হাসিমুখেই বলে গেল, আমার সঙ্গে সর্ত হয়েছে, বিয়ের পর রোজগারেব সিকিভাগ আমাদের কটেজে দিতে হবে, আব বাবাব কাছ থেকে যা পাব সেদিকে চোখ দিয়েছে কি বিয়ে বাতিল। থামল একটু, এবাব আবো একটা সর্ত করতে হবে—সেটা তোর সম্বন্ধে!

শেফালির দুচোখ কপালে উঠল—বলিস কি! কি করেন ভদ্রলোক?

কারখানায মজুর চরায়, লেবার অফিসার। হাসতে লাগল, ঘাবড়ে গেলি নাকি?

না, শেফালি ঘাবড়ায়নি, কিন্তু কেন জানি ভালও লাগছিল না শুনতে।

জীবনের মস্ত একটা অর্থ খুজে পেয়েছে শেফালি। হঠাৎই একটা ভুঁইফোঁড় অবলম্বন তার হাতের মুঠোয এসেছে যেন। আর সমস্ত আকূতি দিয়ে সে ওটা আকড়ে ধরেছে।

সকাল দশটার মধ্যে খেয়েদেয়ে কটেজে চলে আসে, ফেরে সন্ধ্যায়। শুরুতে শুক্লা হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়েছিল, তারপব প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু দিচ্ছে। দিয়ে বলে, যা হোক করে চালা কিছুদিন, শিগগীরই একটা ব্যবস্থা হবে।

কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি শেফালি। শুক্লা বলেছে যখন হবে, হবেই। ওই কটি টাকা হাতে নিয়েই বাতাস সাঁতরে ঘরে ফিরেছে শেফালি। আগে এর থেকে অনেক বেশি টাকা এক-একবার হাতে পেয়েছে, কিন্তু এমন আনন্দ আগে আর কখনো হয়নি। ছেলেটাকেও যেন অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে। ওর জন্যে চিন্তা হয় এখন, যে ভোগা ভুগছে—ভালো ডাক্তার দেখানো দরকার। ও ঘুমিয়ে থাকলে বুকে টেনে নিতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু গঙ্গার জন্যে পেরে ওঠে না। সঙ্কোচ হয়। বুড়ীটা

এমনিতেই অবাকচোখে দেখে ওকে চেয়ে চেয়ে, পরিবর্তনটা যেন বুঝতে চেষ্টা করে। এই জায়গাটা ছেড়ে যাবার আশা সে ছাড়েনি এখনো। সরকারী ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কবে কোন দল চলে গেল, রোজ সেই ফিরিস্তি দেয় আর বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে।

তার কথা শেফালির কানে যায়ও না ভালো করে।...টাকা কিছু শুধু ছেলের চিকিৎসার জন্যেই দরকার নয়, শাড়িগুলোও বদলানো প্রয়োজন। লাল শাড়িগুলো ওর নিজের চোখেই কটকটিয়ে বেঁধে এখন।

পরের মাসের দিন দশেক না গড়াতে শুক্লা সুখবর দিল তাকে, সেই মাসের আর কুড়িটা দিন গড়ালে ওর চাকরি হবে। সব ব্যবস্থা পাকা, আজই খবর পেল।

অফিসের চাকরি শুনে শেফালি প্রথম আঁতকে উঠেছিল, পবে আশ্বস্ত হল। এ-কাজ অবশ্য সহজেই পারবে। কারখানায় মেয়েদের জন্যে এ-ধরনের কাজও আছে জানত না। শৌখিন দ্রব্য প্যাক করার কার্ড-বোর্ড বাক্স বানাতে হবে, আব সাবধানে খড় দিয়ে তুলো দিয়ে সেগুলো প্যাক করতে হবে। মাইনে গোড়ায় একশ চল্লিশ টাকা, বাড়তি কাজ দেখাতে পারলে বাড়তি পাওনা।

শুক্লা ওর থেকেও খুশি। বলল, এ সর্তটাও মানতে বাধ্য হয়েছে, বুঝলি ? তোকে নিয়ে এ পর্যন্ত এগারটা মেয়ে ঢোকালাম। ছুটির দিনে কিন্তু এখানে এসে কাজ করতে হবে।

আনন্দে বোবা শেফালি। থেকে থেকে দুচোখ ছলছলিয়ে উঠতে চাইছে। তাকে আড়ালে ডেকে শুক্লা একসঙ্গে সাতখানা দশটাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিল। বলল, কিছু কাপড়-জামা কিনে নে, আর ওই লাল শাড়ি-টাড়িগুলো ছাড় তো এবার! অত লাল ভালো লাগে না।

বলার দরকার ছিল না। কিন্তু বলল বলে একটুও রাগ হল না শেফালির। ও বলবে না তো কে বলবে !...কালই দু'প্রস্থ আটপৌরে শাড়ি ব্লাউস কিনবে। কেনা হলে ওর দেহ থেকে অনেকদিনের একটা গ্লানি নেমে যাবে।

কিন্তু পরদিন কেনা হল না। সকাল থেকেই ছেলেটার বেশ জ্বর আর কাশি। অল্প অল্প জ্বর অনেকদিন ধরেই চলছিল, বুকে সর্দিও বসেছে মনে হয়। গঙ্গা কোথা থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ এনে খাওয়াচ্ছে। সকালে কাপড় কেনার জন্য বেরুনো গেল না— দুপুরে সেই কটকটে লাল শাড়ি পরেই কটেজে আসতে হল। টাকা হাতে নেবার পর লাল শাড়ি আরো চক্ষুশূল হয়েছে। সেদিন শুক্লার সঙ্গে দেখা হবে না জেনে যা একটু স্বস্তিবোধ করছে।

ছেলের অসুখ সত্ত্বেও কাঠের পুলের কাছে আসতে আসতেই সন্ধ্যা। ছেলে ভালো থাকলে আবার বেরুবে ভাবছে। শাড়ি কিনবে, তারপর একজন ডাক্তার নিয়ে ফিরবে। ভালো থাকলেও দেখাবে। জামা-কাপড়ে এখন বেশি খরচ করবে না। পরে চাকরির টাকা পেলে ধীরেসুস্থে সব হবে। আগে ছেলেটার দিকে তাকানো দরকার।

কাঠের পুল ধরে ওপরে উঠতে লাগল শেফালি। পিছনেও কে উঠছে একজন, খেয়াল করল না। পুলের ওপর দিয়ে এগোতে লাগল, তারপর হঠাৎই পা দুটো থেমে গেল তার, কান দুটো উৎকর্ণ।

অদূরে পিছনে গলাখাঁকারি দিচ্ছে একজন। এই ইশারা শেফালি খুব ভালো করে চেনে। দিশা ফিরতে দ্রুত পা বাড়ালো। শুধু ছেলের চিকিৎসা করা নয়, শুধু শাড়ি বদলানো নয়, চাকরিতে ঢুকে এই পাড়াটাও ছাড়তে হবে তাকে। ফিরে না তাকিয়ে কাঠের পুলেব ওপর পিছনের লোকটার অস্তিত্ব অনুভব করছে। তার গলাখাঁকারি বাড়ছে। শেফালি ঘেমে উঠল, আগের পরিচিত কেউ হলে সহজে ছাড়বে না। অপরিচিত হলেও বিশ্বাস নেই। আমন্ত্রণের জ্বলজ্বলে স্বাক্ষর ওর সমস্ত অঙ্গে—পুলের ওপরের নিষ্প্রভ আলোয় সেই লাল শেফালির নিজের চোখেই হঠাৎ ভয়াবহ আগুনের মত লাগছে। পুল থেকে নেমে ওধারে ঘন অন্ধকার খানিকটা। সেই অন্ধকারের আড়াল পেলেই পিছনের লোকটা থামাবে তাকে, শেফালির একটুও সন্দেহ নেই। গোড়ায় গোড়ায় ও যখন অনেক কাঁচা ছিল, সাহস করে ফিরে তাকাতে পারত না—তখন এ-রকম হয়েছে।

পুলের ওপরেই আচমকা ঘুবে দাঁড়াল শেফালি। দুপদাপ পা ফেলে সামনে এগিয়ে এলো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, কি মতলব?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত ঝাঁকুনি খেল একটা। পরমুহূর্তে সর্বাঙ্গ একেবারে অবশ। এমন কি হৃৎযন্ত্রটাও যেন বুকের মধ্যে থেমে গেল হঠাৎ।...পরিচিত নয়, কখনো দেখেনি, কিন্তু এ কাকে দেখছে সে! কাকে? কাকে? নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে মনে করতে চেষ্টা করল কাকে দেখছে, দেখেও অবিশ্বাস করতে চেষ্টা করল কাকে দেখছে।

ভদ্রলোকই একজন। মেয়েটার উগ্র মূর্তির সামনে হকচকিয়ে গিয়েছিল, এই বোবা মূর্তি দেখে ভরসা পেলে একটু। হাসতে চেষ্টা করে মিনমিন করে বলল, অত রাগ কিসের...

শেফালি চেয়ে আছে। নির্বাক, চিত্রার্পিত। না, ভুল হয়নি। শুক্লার ড্রয়ারে সেই ফটো আর এই মূর্তিতে তফাত নেই একটুও। ঠোঁট দুটো নড়ল শুধু একসময়, অস্ফুট শব্দ নির্গত হল একটা—কি চান...?

লোকটা হাসল। এদিক ওদিক চেয়ে আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো। গায়ে হাত দিলেও শেফালির বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। যেখানে যেদিকে খুশি টেনে নিযে গেলেও গলা দিযে আর একটা শব্দও বার হবে না বুঝি। লোকটা বলল, এরকম কবছ কেন, তোমাদের আমি চিনি না ভেবেছ?

কিন্তু একটু একটু করে সম্বিত ফিরল শেফালির। শোনার সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপবীত ধাক্কায দেহের সব বক্ত যেন মাথার দিকে উঠে আসতে লাগল। হৃৎযন্ত্রটা দ্বিগুণ সবল হল। চোখের দৃষ্টি বদলাল।

ভালো কবে আর একবার নিরীক্ষণ কবল তাঁকে। তারপর মৃদু-কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, চেনেন! খুব ভালো করেই চেনেন দেখছি! কিন্তু আমিও শুক্লা মিত্তির বলে একজনকে চিনি। তাকে চেনেন?

লোকটা যেন আচমকা মরার বাড়া ঘা খেল একটা। একটু আগে শেফালির মুখের যে অবস্থা হয়েছিল, তার থেকেও করুণ দশা। বিবর্ণ পাণ্ডুব, নিজের অগোচরে পায়ে পায়ে পিছু হঠছে।

দাঁড়ান!

শেফালির ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর তার হাড়ে গিয়ে বিঁধল যেন। দাঁড়িয়ে পড়ল। শেফালি বলল, আজকের মত যান। কিন্তু এরপর আমাদের মত মেয়েদের চেনার অভ্যাসটা না ছাড়লে আপনাকে যাতে সে চেনে সেই ব্যবস্থা আমি করব।

শেফালি কাঠের পুল ধরে নেমে এধারে চলে এলো। কিন্তু অন্ধকারের গহ্বরের মধ্যে ঢুকেই পা থেমে গেল। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল লোকটির আর চিহ্নও নেই।

...এরপর কি হবে, চাকরি হবে শেফালির? হলেও কেমন চাকরি হবে সেটা? শেফালির বেদম হাসি পাচ্ছে, প্রেতিনীর মত হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক নেই, হয়ত আধঘণ্টারও বেশি। তারপর পা বাড়ালো আবার। না, বাড়ির দিকে নয়, সিঁড়ি বেয়ে পুলটার ওপরেই উঠতে লাগল সে। বাড়ি গিয়ে কি হবে? ছেলের অসুখ? তা শেফালি কি করবে? ওই ছেলে বড় হয়ে, সুস্থ হয়েই বা কি করবে? অনেকদিন বাদে পুরুষের ওপরে সেই বিজাতীয় বিতৃষ্ণাবোধটা গনগনিয়ে উঠল। শেফালির ছেলে কি হবে? যে-পুরুষ ও দেখে আসছে, তাদেরই একজন ছাড়া কি আর হবে?

পুল পেরুলো। হাঁটাপথ পেরিয়ে এলো লোকালয়ে। তারপর একটা চেনা কাপড়ের দোকানে। অনেকদিন আগের দেখা সেই লাল শাড়ির বাছাই করল একটা। বেশ শাড়ি। এ-ক'দিনে দাম আরো একটু বেড়েছে। বাড়ুকগে। শেফালির কেনা দরকার তাই কিনছে, শখ করে তো কিনছে না। শুক্লার দেওয়া সাতটা নোটের চারটে এক শাড়িতেই বেরিয়ে গেল। দাম মিটিয়ে শাড়ি হাতে বাইরে এলো শেফালি।

ক্লান্তি, ক্লান্তি, রাজ্যের ক্লান্তি। এত ক্লান্তি কিসের বুঝছে না। ঘরে ঢুকে জামা কাপড় না বদলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে গঙ্গা বুড়ীর কটর কটর শুরু হল। ছেলেটা জ্বরে বেহুঁস, সর্দিতে বুক ঢপঢপ করছে—দুপুর থেকে ব্যথায় কাতরাচ্ছে!

বুড়ীর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শেফালি পাশের খুপরিতে চলে এলো। জামা কাপড় না ছেড়ে নড়বড়ে চৌকিটায় বসে পড়ল। কাপড়ের প্যাকেটটা আর একবার খুলে দেখবে ভেবেছিল, কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করল না। ছেলেটার গোঙানি কানে আসছে সত্যি, জ্বরের ঘোরে তাকেও ডাকছে এক-একবার।

শুক্লার মুখখানা চোখের সামনে ভাসল হঠাৎ।...লোকটা কি শুধরোবে? ভাবতে ইচ্ছে করছে শুধরোবে। আর যদি শুধরোয়, ওর জন্যেই শুধরোবে।। হঠাৎ মনে হল, একটা মেয়ের বাঞ্ছিত জনকে নিজে গ্রাস না করে তাকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে ও। শেফালি দিয়েছে, শেফালি দিতে পেরেছে। সেই পারাটা কোনো পারার থেকেই কম মনে হচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত কোমলতা নেমে আসছে তার চোখে মুখে।

চমকে উঠল। ছেলে কাতরাচ্ছে। তাকেই খুঁজছে। উঠে এ-ঘরে এলো। গঙ্গা বুকে গরম তেল মালিশ করছে। শেফালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। বুকের ভেতরটা এমন করে কুরছে কেন বুঝছে না। ছেলেটার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে হু-হু করে

কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে কেন বুঝছে না। এক মানুষকে ফেরাতে পেরেছে বলে সব মানুষকেই ফেরাতে পারার আশা বুকের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কেন বুঝছে না! এ আবার কি উল্টোপাল্টা ভাবনা শেফালির!

ছেলের শিয়রের কাছে বসল। মুখের দিকে চেয়েও ওর মধ্যে আর সেই নগ্ন পুরুষকে দেখতে পাচ্ছে না তো শেফালি! যে পুরুষ নারীর সর্বস্ব লুঠ করে বেড়ায় সেও তো নারীরই সন্তান! শেফালির শুধু সন্তানের মা হতে বাধা কি! ঘৃণা যাদের করে, তারা মা পেয়েছিল কিনা ঠিক কি! শেফালির মত সেই মায়েরাও মুখ ফিরিয়েছিল কিনা ঠিক কি! এটা তারই প্রাকৃতিক প্রতিশোধ কিনা তাই বা কে জানে! মায়ের মত মা পেলে সকলেই মানুষ হতে পারে কিনা তাই বা কে বলবে?

হঠাৎ দিশেহারা আতঙ্কিত জননীর মত রুগ্ন ছেলেকে দু'হাতে আকড়ে তুলে নিল শেফালি। গঙ্গা হা করে দেখছে লক্ষ্য নেই। ছেলে চোখ মেলে তাকালো। তার মা-মণি ডাকটা অস্ফুট আকৃতির মত বিঁধল কানে। ছেলে আবার বলল, আমার কাছে থাকো মা-মণি, যেও না।

শেফালি বলতে পারল না যাবে না। তার বুকে মুখে নিজের মুখটা ঘষতে লাগল শুধু। ছেলে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। ঘুমিয়েও দু'হাতে আঁকড়ে ধরে থাকল তাকে।

পরপর কটা রাত জেগে কাটালো শেফালি। হাতের অবশিষ্ট টাকা ভেঙে ডাক্তার এনেছে, ওষুধ এনেছে। ছেলের জ্বর কমেছে, বুকের ব্যথাও কমের দিকে। তবু ঘুম নেই শেফালির চোখে। কি ভাবছে সেই জানে। গঙ্গা ছেলের কাছে বসে থাকে আর হাঁ করে দেখে ওকে। মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না। সকালে দু'ঘন্টার জন্যে বেরিয়ে কোথা থেকে ঘুরে আসছে গঙ্গা বুড়ী তাও জানে না।

আর একটা নিঝুম রাত্রি। এই রাত্রিটারই প্রতীক্ষায় ছিল শেফালি। ছেলে ঘুমুচ্ছে, ওধারের খুপরিতে গঙ্গা বুড়ীও। শেফালি সেই লাল শাড়ির প্যাকেটটা নিয়ে এলো। খুলে শাড়িটা দেখল একবার। আবার ভালো করে প্যাকেট করল। খানিকটা চট মুড়ে বেশ করে সেলাই করল ওটা। তারপর নিশ্চিন্ত মনে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল।

বেশি নয়, অল্প দু'চার কথা লিখেই শেষ করল। লিখল, তোর অত বিদ্যে ধুয়ে তুই জল খা এবার। কয়লার রঙ ধুলে ওঠে, না পুড়লে ওঠে? তোর কথা ভেবে আমার হাসিও পাচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। তোকে একটা উপহার পাঠালাম। বড্ড তোর শাদার দেমাক, অতটা ভালো নয় রে মুখপুড়ী। ফেলে দিস না, পরিস। দশজনের জন্য বলছি না, একজনের জন্যে অন্তত পরিস। আখেরে তাতে তোর ভালো ছাড়া মন্দ হবে না দেখে নিস।—

কামরা ভরতি মেয়ে-পুরুষদের কেউ ঝিমুচ্ছে কেউ ঘুমুচ্ছে। ট্রেনটা তেমনি ঢিমেতালে চলেছে। তার যেন তাড়া নেই কিছু। কামরার আলোটা শুধু আগের থেকে আর একটু জোরালো লাগছে। বাইরের অন্ধকার ঘন হয়েছে বলেই হয়ত। কোলের

কাছে নিশ্চিন্তে ছেলে ঘুমুচ্ছে। ভালো করে ঢেকেঢুকে আর একটু কাছে টেনে নিল তাকে। পায়ের কাছে গঙ্গা বুড়ীর নাক ডাকছে। তার চোখে আর এক অরণ্যের স্বপ্ন।

শেফালি বাইরের দিকেই চোখ ফেরাল আবার। তার নিজের চোখে কি সেটা সে দেখতে পাচ্ছে না।

ঠাকুমার ঝুলি

শেষ পর্যন্ত বুড়ীটা মরল।

বাড়ির সামনের দুটো মহলে ছোটাছুটি পড়ে গেল। নতুন বয়সেব ছেলেমেয়েবা দৌড়োদৌড়ি করে একজন আর একজনকে খবর দিলে, বুড় সত্যি সত্যি টেঁসে গেছে। বাড়ির একটা ছেলে ডাক্তারি পড়ে। পডাশুনা নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। পিসতুতো বোনের মুখে জ্বলজ্বলে উত্তেজনা দেখেও তার সংশয গেল না। জিজ্ঞাসা কবল, অক্সিজেনেব নল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বুড়ী এতক্ষণে স্বর্গের অক্সিজেন টানছে।

ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছে ?

পিসতুতো বোন অতশত জানে না। সেও আর একজনের মুখে শুনেই দৌড়ে এসেছে। তাই জোর দিয়ে বলতে হল, হ্যাঁঃ, সার্টিফিকেট লেখা না হলে যেন বুড়ী আবার নডেচড়ে উঠে বসবে!

নাতিব ঘরের দুই ছেলে এক মেয়ে আর নাতনীর ঘরের দুই মেয়ে শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে দোতলার এক মহলে হানা দিয়ে দুচোখ টান কবে দেখেছে, বুড়ীটার আর নড়েচড়ে উঠে বসার সম্ভাবনা নেই বটে। অনেকবার তাবা এই মৃত্যু দেখতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। ডাক্তারের বাঁচাবার গুরুগম্ভীর তোডজোড় দেখে মনে মনে মুখ বেঁকিয়েছে। ঘুরে-ফিবে বাব বার বুড়ীটাকে জীবনের দরজায় উপস্থিত দেখে মৃত্যুর ওপর তাদের আস্থা যেতে বসেছিল।

বুড়ীটা অকৃতজ্ঞও ছিল। যমের এক-একটা হ্যাঁচকা টানের ধকল সামলে উঠে খনখনে গলায় অজানা অচেনা কারো চতুর্দশ পুরুষের উদ্দেশে প্রায়-অশ্লীল কটুকাটব্য করেছে, ডাক্তারের উদ্দেশে গালিগালাজ করেছে, আর নাতি নাতবউ নাতনীকে রসনার ঝাঁটায় ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে। এমন কি উঠতে-বসতে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যমের পিঠেব উদ্দেশেও সম্মার্জনী ছুঁড়েছে। আর সবশেষে ঘরের আর এক ততোধিক স্থবির বৃদ্ধকে যেন নখ-দন্ত মেলে ফালা ফালা করে দিতে চেয়েছে। বলা বাহুল্য, নখ-দন্ত নেই —বিদারণ কার্যটিও রসনার সাহায্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সেই বাণী আর সেই বচনের বেশির ভাগ দাসদাসীদেরই শুনতে হয়। কারণ যার উদ্দেশ্যে বলা তার কানের ওপর দখল একরকম গেছেই।

এই মহলটা বলতে গেলে একটি পরিচারক আর একটি পরিচারিকার হেপাজতে।

নাতি নাতনী বা নাতবউ দিনের মধ্যে এক-আধবার খোঁজখবর করে যায়। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত এলে সামনের দরজাটা বন্ধ থাকে। দরজা বন্ধ থাকলে বুড়ীর কণ্ঠস্বর এধারে পৌঁছয় না। পৌঁছলে সকলের কান-মাথা কাটা যায়। কারণ সম্ভ্রান্ত ঘরের কেনো মহিলার কণ্ঠে এমন বিশুদ্ধ অশ্রাব্য সেকেলে গালাগাল একালের কানে গলানো সীসের মত লাগে। নাতির ঘরের ছেলেদুটো ভুলেও এ মহলের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। কখনো সখনো বুড়ীর চোখ কপালে উঠেছে শুনলে দেখতে আসে। কিন্তু এমনি চোখ উল্টে অনেকবার যমকে কলা দেখাতে দেখে হাল ছেড়ে এখন তাও দেখতে আসে না বড়। নাতির মেয়ে আর নাতনীব মেয়েদুটো মাঝেসাজে উঁকিঝুঁকি দেয়। এসে নিজের নিজেদের নাম বলতে হয়, নইলে বুড়ী সঠিক ঠাওর করতে পারে না কে এলো। নাম ভাঁড়িয়ে মেয়েরা ফষ্টিনষ্টি করে অনেক সময। আর একজনের নাম বলে দেয়।

কে রে কুমি এলি?

নাতনীর ঘরের বড় মেয়ে কমলা। ইস্কুল টপকে সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তলায় তলায় রসের কথা শোনার দিকে ঝোঁক। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সে-ই বেশি আসে। কলেজে-পড়া মেয়ে—নাম বিকৃতির দরুন ছ'আঙ্গুল পর্যন্ত জিভ ভেঙিয়েও কোনো সুফল পায়নি। বুড়ী কুমি ছাড়া আর কিছু বলবেই না। কমলা নামোচ্চারণের একটু বাধাও অবশ্য আছে। বুড়ী নিজেই গল্প করেছিল। বলেছিল, মিনসেটা তো সেই বযেসকাল থেকেই কত জ্বালিয়েছে ঠিক নেই, ভিটকিলেমি করে কতবার চোখ কপালে তুলেছে—সত্যি সত্যি যমে নজর দিল ভেবে বুড়ীর এক-একবার ভয় ধরেছে। তাই সোযামীর কল্যাণে ওই নামের ফলটি বাবা বিশ্বনাথের চরণে উৎসর্গ করেছিল একবার। ঘ্রাণে অর্ধভোজন হয়, কিন্তু বুড়ীর সেকেলে সংস্কারে নামেও সিকি ভোজন-টোজন হয়ে যায় বোধহয়, সেই জন্যই নাম বর্জন।

না, আমি নমি এলাম।

গলার স্বর একটু এদিক ওদিক করে দিলেই বুড়ীর ভুল।

আয় নমি আয়, বোস। কুমিটা আজকাল হাড়বজ্জাত হয়েছে, এদিকে আর আসেই না—মদ্দা কলেজে হুটহুটিয়ে পড়তে যায়, মা-টা তো নিজের দেমাকে জ্বলেছে সারাক্ষণ, ডবকা ছুঁড়ী ওদিকে কার সঙ্গে রস করে বেড়াচ্ছে কে জানে—

হ্যাঁ রে বুড়ী থুথুড়ি করছে রস—নাম-ভাঁড়ানোর কৌতুক মাথায় ওঠে কমলার, তোমার খ্যাংরা-কাঠি বুড়োর সঙ্গে দিনরাত রস করে বেড়াচ্ছে দেখতে পাও না!

বুড়ী নিজের ভুল বুঝতে পারে, দন্তশূন্য মুখগহ্বর হাসিতে ভরে ওঠে।—অ, তুই কুমি—তোরই তবু যা একটু টান আছে, মাঝে মধ্যে আসিস, আর কেউ তো ইদিক ভুলেও মাড়ায় না। আয় বোস—

তার বচন শোনার জন্যেই মেয়েরা মাঝে মধ্যে উসকে দেয় তাকে, জিজ্ঞাসা করে, তোমার শরীর কেমন গো?

বুড়ীর মুখে বিমর্ষ ছায়া পড়ে তক্ষুনি; হালছাড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আর শরীর—কালামুখোর একবার দেখা পেলে মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতাম, আঁশঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দিতাম—শেকড় কাটার জন্য কাঁচি হাতে যত-সব অকালের ঘরের আনাচ-কানাচে

ছোঁকছোকিয়ে বেড়াচ্ছে—ইদিক ঘেঁষার নাম নেই।

কালা-মুখো ব্যক্তিটি স্বয়ং যম। বুড়ীর প্রতি দেবতাটির এই অনাসক্তির অভিযোগ মেয়েরা জন্মাবধি শুনে আসছে। বুড়ীর খেদ পুরোপুরি শুনতে হলে এবারে কোন কথা বলতে হবে তাও তারা ভালই জানে। মুখ মচকে যমের হয়ে সওয়াল করে তারা, কালা-মুখো তোমার দিকে ঘেষবে কেন শুনি—দুশ্চরিত্রার মত এই বয়সেও একটা পুরুষমানুষ আঁকড়ে পড়ে আছ, বলতে লজ্জা করে না। শতেক বছর পুরিয়ে আক্কেল দিয়ে তবে যদি যম তাকায় তোমার দিকে।

বুড়ীর গলা খনখনিয়ে ওঠে, কি বললি লা আবাগীর বেটিরা, আমি ওই আদিখ্যাতা মিনসেকে আকড়ে আছি না ওই হাড়-হাবাতে বুড়ো লজ্জার মাথা খেয়ে আমার আচল ধরে বসে আছে, অ্যা?

মেয়েরা সায় দিলেও সেই রাকা সুরই ধরবে, বলবে, তা হলেও শুধুশুধু যমকে খোঁটা দাও কেন, যমেরও তো দয়ামায়া আছে, তোমাকে নিলে বুড়োটার কি দশা হবে, তোমার শোকে বুড়োটা যে কেঁদে কেঁদে মরবে।

তাই বল, তাই বল। বুড়ীর অসহায় খেদ প্রায় কান্নার মত শোনায়, তার পরেই পাশের ঘরের বুড়োর উদ্দেশে রাগে চিড়বিড়িয়ে ওঠে, সেই তাপে নিষ্প্রভ চোখদুটো আরো শাদাটে দেখায়।— তাই বল তোরা, ওই জন্যেই যমের অরুচি, সাত যুগ ধরে গায়ে লেপটে থেকেও হাড়হদ্দ বুড়োর রস যায় না,— কোথায় নিজের হাতে কপালে সিঁদুর লেপে বিদেয় দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে পরকালের চিন্তা করবে দুদণ্ড, তা না, কিছু হল তো ডাক ডাক্তার, ডাক বদ্যি—যেন কোন যোল বছরের রসবতী চোখে ধুলো দিয়ে পালাচ্ছে। আগুন আগুন—রসের নোলায় আগুন জ্বেলে দিতে হয়।

বুড়ীর এই রাজ্যছাড়া খেদ আর উত্তাপের কারণ ছেলেমেয়েরা বা তাদের বাপমায়েরা ছেড়ে বাড়ির দাসী চাকরেরাও জানে। কারণ বুড়ীর কোচকানো কপালের আর কেশ-শূন্য সিঁথির ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুর। ওগুলো শেষ পর্যন্ত টিকবে কি টিকবে না, ভিতরে ভিতরে বুড়ীর সেই দ্বন্দ্ব—সেই ত্রাস। একের পর এক ফাড়া কাটিয়ে উঠে তার কেমন ধারণা হয়েছে, আশৈশবের ওই সঙ্গীটিই নিতান্ত অবুঝ আর নিতান্ত স্বার্থপরের মত মায়ার আকর্ষণে তার উজ্জ্বল যাত্রাপথটি আগলে বসে আছে। ভিতরে ভিতরে এই নিয়েই বহুদিন ধরে একটা বড় রকমের রেষারিষি চলেছে দুজনার মধ্যে—কে আগে যাবে। বুড়ীর কিছু হলে বুড়ো প্রকাশ্যেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর বুড়োর কিছু হলে বা হবার সম্ভাবনা দেখলে বুড়ী তেতে ওঠে। অসুস্থতার কথাটা বুড়োর সর্বাগ্রে আবার তাকেই জানানো চাই। শোনামাত্র খনখনিয়ে উঠবেই বুড়ী, আমাকে কেন-—তোমার তুকপুক শোনার জন্য চেরটা কাল আমি বসে থাকব নাকি? যারা থেকে চিকিচ্ছে-বদ্যি করাবে তাদের ডেকে বললেই হয়।

অর্থাৎ বুড়ীর অগ্রগমন অনিবার্য, এ-সব ভাওতায় ভয় পাবার পাত্রী নয় সে। ভয় পাক না পাক, মেজাজ সারাক্ষণ চড়ে থাকে সেদিন। নাতি নাত-বৌ নাতনীকে ডেকে গালাগালি করে, দাসী-চাকরের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করে, মেয়েগুলোকেও রেহাই দেয় না। বুড়ীর বিবেচনায়, সে আর নেই এটাই ধরে নেওয়া সকলের কর্তব্য।

সেরকম ধরে নিলে তার সিঁদুরকপালে পাড়ি দেওয়াটা কিঞ্চিৎ সহজ হতে পারে বলে বিশ্বাস।

ধরে নিক না নিক বুড়োর আগেই গেল বটে বুড়ী।

দল বেঁধে দেখতে এসে ছেলেমেয়েগুলো হকচকিয়ে গেল কেমন। বহু আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর কোলে শয়ান বৃদ্ধাটিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল তারা। সুন্দরও নয় কুৎসিতও নয়, অথচ কি এক মহিমা যেন ঘিরে আছে তাকে। হঠাৎ বুড়োর দিকে চোখ পড়তে বেশ থতমতই খেয়ে গেল তারা। শ্যামসমান এই মৃত্যুর ভজনা তারা এত শুনেছে যে, যথার্থই একদিন তার পদার্পণ ঘটলে সাত যুগের সঙ্গী জীর্ণতর বৃদ্ধটির মুখখানা দেখতে কেমন হবে ভাবার অবকাশ হয়নি। শিরদাড়া দুমড়ে সামনে বসে আছে, বলিরেখায় হিজিবিজি মুখটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, বিবর্ণ ঘোলাটে দুই চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সরবে শোক করছে না কেউ, চোখের জলও বন্ধ হয়েছে। অথচ ঘরের বাতাসে একটা কান্না থিতিয়ে আছে। সবাই যেন এতদিনে নতুন করে বুড়োটাকে দেখছে। আর বুড়োটা বুড়ীকে দেখছে। এক অতিবৃদ্ধ কালবটের দুটো কাণ্ডর একটা ভেঙ্গে সামনে পড়ে আছে, বোবার মত অপর [illegible] দেখছে। অল্পবয়সের ছেলেমেয়ে কটি অন্তত এই দেখাটা বেশিক্ষণ বরদাস্ত কর[illegible] পারল না। তারা শোকাচ্ছন্ন নয়, কিন্তু বিচ্ছিরি রকমের অদ্ভুত লাগ[illegible] হল [illegible]

সামনে থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে এলো তারা।

জীবনের যে শিখাটি নিবল, সেটি একটানা ছিয়াশী বছর জ্বলেছিল। আর কালের বুকে যে বিদায়ী শিখাটি ধুকপুকিয়ে কাঁপছে এখনো তার বয়স তিরেনব্বুই। কিন্তু বাড়ির সকলের কাছেও তিরেনব্বুইয়ের আগে ওই ছিয়াশীর মহাযাত্রাই সবাঞ্ছিত ছিল। সেই প্রত্যাশার ব্যতিক্রম হয়নি, এই অনুভূতির রাজ্যে তেমন বড় রকমের কোন আলোড়নের কারণ ঘটেনি। তবু বুকের কাছাকাছি কি একটা অজ্ঞাত আবেগের ছোঁয়ায় ভারী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে নাতনী বিমলা। সেটা শোক নয় ঠিক। বুড়ী যত বুড়ীই হোক, এই চির-বিচ্ছিন্ন মুহূর্তে শোক করা স্বাভাবিক। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেও সেটা অস্বাভাবিক হত না। চিৎকার করে না হোক, ঠাকুমা শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিমলা কেঁদেছেও। ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ বুড়ীর নাতবউ সুরুচিও কেঁদেছে। কিন্তু বিমলার এই অনুভূতিটা ঠিক শোকের অনুভূতি নয়। কি যে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। ঠাকুমার শয্যা ছুঁয়ে সে-ই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। মেয়ে কমলা, অমলা বা ভাইপো-ভাইজিদের বোবা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েও সে কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। তারা মৃতাকে দেখছিল, আর বিমলার মনে হচ্ছিল মাঝে মাঝে ওরা তাকেও দেখছিল। ওরা চলে যেতে একটু স্বস্তিবোধ করেছে। আরো স্বস্তিবোধ করল দাদুর কথায় সুরুচি উঠে যেতে। দাদু বিড়বিড় করে বলেছে, সঙ্গে কি যাবে দিয়ে দাও—সবই দিয়ে দাও।

বিমলার মনে হয়েছে, এক সাগর পরিমাণ অভিমান তার থেকেও বড় এক কান্নার স্তব্ধতায় থমকে আছে। দাদুর দিকে সহজ দুই চোখ মেলেও কেন তাকাতে পারছে না বিমলার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব। দাদা অনুপম ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে উঠে

গেছে। সে এলেও বিমলার একটু ভালো লাগত হয়ত, তাকে শয্যায় বসিয়ে বা দাদুর কাছে থাকতে বলে সে কিছুক্ষণের জন্যে এই পরিবেশ ছেড়ে বাইরে থেকে ঘুরে আসতে পারত। কিন্তু তারও কোনো সাড়াশব্দ নেই। যোগাড়যন্ত্র করতে ব্যস্ত বোধহয়। মৃত্যুকে পুরোপুরি বিদায় দিতে সময় লাগে, ব্যবস্থা লাগে।

বউদি এঘর-ওঘর করে টুকিটাকি জিনিসগুলো হাতের কাছে দিয়ে যাচ্ছে। কিছু করতে হবে খেয়াল হতে বিমলা সেগুলো শয্যায় বিন্যস্ত করে রাখতে গেল, কিন্তু হাত গুটিয়ে নিতে চাইছে কেন বুঝতে পারছে না, লোকান্তরিতার জড়বস্তুগুলোর স্পর্শ সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দেবার মত এমন জীবন্ত লাগছে কেন বুঝছে না। এমন কখনো হয়নি। বিমলা আড়ে আড়ে দাদুকে দেখছে এক একবার। কিন্তু এই দেখাটা নিজের গোচরে নয়। আর দেখছে চির-নীরবতার কোলে শয়ান ছিয়াশী বছরের জীর্ণ বিকলপ্রায় নারীদেহের কাঠামোটাকে। অথচ কি দেখছে হুঁশ নেই—ঠাকুমাকে দেখেছে কি মৃত্যু দেখছে কি কপাল আর মাথার জ্বলজ্বলে সিঁদুর দেখছে বিমলা নিজেও জানে না বিমলার চোখদুটো অদরের ওই ঘাড় পিঠ দুমড়ানো বৃদ্ধটির দিকেই ঘুরেছে আবার। মৃত্যুর এধারে থেকে কি এক মহা সংগতির যোগ যেন জীবনের ওই তটে এসে থেমে আছে। উঠতে বসতে যে অসহায় জীবন ওদের সকলেরই করুণার পাত্র—তার।

নিজের অগোচরে বিমলা তাই দেখছে। এই বিয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যা কোনদিন সে দেখেনি। আজও মনেপ্রাণে এই দেখাটাকে বাতিলই করে দিতে চাইছে, কিন্তু একটা অজ্ঞাত অননুভূত উপলব্ধি যেন তার শ্বাসযন্ত্রটার ওপর চেপে বসছে।

বিধাতা আজকের এই নাটকের উপাদান রচনায় মগ্ন হয়েছিলেন বোধ করি প্রায় দুই যুগ আগে।

বংশের কৃতী পুরুষ বলতে বিমলা আর অনুপমের বাবা—মস্ত চাকরে ছিল তার সময়ের। এই তিনমহলা বাড়ি পৈতৃক সম্পত্তি নয়, নিজের উপার্জনে করে গড়ে। অনুপম বিমলার থেকে তিন বছরের বড়, কিন্তু বাপের আদর আর প্রশ্রয় বিমলা যত পেয়েছে ছেলে তত নয়। ঠাকুমা বলত বাপ সোহাগী মেয়ে বলত, তুই আসার পর থেকেই তোর বাপ কাজেকর্মে বেস্পতির মুখ দেখছে, তাই এত আদর তোর এই আদর নিয়ে দাদার সঙ্গে বিমলা দস্তুরমত কাড়াকাড়ি রেষারেষি করত, আর তার প্রতি বাবার পক্ষপাতিত্বের দরুন ডগমগিয়ে বেড়াতো।

বাবা বিয়ের আগেও তাকে চোখের আড়াল করতে পারেনি, বিয়ের পরেও না। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির পাঠায়নি, জামাই ঘরে এনেছে। বলা বাহুল্য, ছেলেটি বিত্তশালী ঘরের নয়, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে বি এ পাস করেছিল। সামান্য চাকরি করত দাদাদের সংসারে থাকত। ভাবী কমনীয় সুশ্রী চেহারাটি, শুধু এই গুণেই বাবার চোখে পড়েছিল বোধহয়।

বিয়ের সময় বিমলা আই-এ পড়ে। তার মতামতের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, আর বাবা ভালো করল কি মন্দ করল সে ভাবনাও মনে আসেনি। শুভদৃষ্টির সময় মুখখানা দেখে বিমলা মনে মনে খুশি হয়েছিল, ভালো লাগতে এক মুহূর্তও লাগেনি। রূপসী বিমলাও কম নয়, আজ এই বিয়াল্লিশেও শিক্ষিত, মার্জিত-রুচি সহকর্মী অধ্যাপকদের

অনেকের তার প্রতি এক ধরনের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ উপলব্ধি করতে পারে। বিমলা সেটা অন্যায় বা অশোভন মনে করে না—যে অর্ঘ্যে কামনার নগ্নতা নেই, তাতে অশুচিতাও কিছু নেই। আগের সেই বয়সে ঠাকুমা চোখ রাঙিয়ে বলত, ওই বুড়ো মিনসের কাছে যাবিনি খববদার, তোকে দেখলে যে আমাবই চটকাতে ইচ্ছে করে লা! জামাই দেখে ঠাকুমা আনন্দে আটখানা, বিয়ের রাতেই কানে মুখ লাগিযে বলেছিল, দেখলে যে চোখ ফেরানো যায় না লো, আমার কাছে একটু-আধটু আসতে-টাসতে দিস—রংটা একটু মাজা বলেই কেষ্ট ঠাকুরের মত রূপ যেন আরো খুলেছে। তাবপ জামাইয়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলেছে, তোমার বাধিকে দেখে নাও গো—না না, ও ছুঁড়ীকে নয়, এই আমাকে—ও ছুঁড়ী তো কুব্জা, রূপসী সেজে মায়ায় বশ করে তোমাকে মজাতে বসেছে।

আরো অনেক কথা বলত ঠাকুমা, যা শুনলে কানে আঙুল দিযে পালাতে হত। কিন্তু জামাইয়ের রঙ আর রূপের কদর পরবর্তী অধস্তনদেব চোখে খুব বেশিদিন টিকল না। বাবা কিছু একটা অসমাঞ্জস্য অনুভব করেই জামাই গড়তে মনোযোগী হয়েছিল। চাকরি ছেড়ে আরো পড়াশুনা করতে বলেছিল, এটা-ওটা পরীক্ষা দিতে বলেছিল, এমন কি নিজেব খবচে বিলেত পাঠাতে চেয়েছিল। জামাই শ্বশুবের মুখের ওপর হ্যাঁ-না কিছুই বলত না। মনে মনে শ্বশুরকে ভযই কবত। ভয় বলতে গেলে সে এ-বাড়িব প্রায সকলকেই করত। সে-যে বেখাপ্পা একটা লোক এখানে আছে তা নিজেই উপলব্ধি কবত। দাদাদেব সংসারে আশ্রিতেব মত ছিল, এখানেও তাই। কিন্তু সেই পরিবেশ তার পরিচিত ছিল, এটি তাও না।

শেষ পর্যন্ত বিলেত যেতেও অস্বীকাব কবায় বাবা চটেছিল, বিমলাও খুশি হয়নি। বাবা আর দাদা একটা অকর্মণ্য লোককে মুখ বুজে ববদাস্ত করতে পেবেছিল, কিন্তু বিমলা তা পারেনি। আরো পারেনি দাদাব বিয়েব পবে। বাবা বি-এ পাস-করা বউ এনেছিল, বিমলা হঠাৎ যেন তাব কাছেই কেমন ছোট হয়ে গিয়েছিল। সুরুচি কোনদিন কোনরকম কটাক্ষ করেনি, আজও এই ননদিনীটিকে মনে মনে সে বিলক্ষণ সমীহই করে, কিন্তু দাদাব বড চাকবি শিক্ষাদীক্ষা সবই বউদিব যেন একারই গর্বের কারণ। নিজের অগোচরে ক্রমশ বিমলার মেজাজ চড়েছে, এক দুর্বোধ্য বিরূপতায় ভিতবটা ভরে উঠেছে। দাদার পাশাপাশি ঘরের এই লোকটা গ্রাম্য পুরুতেব ছেলেব মত দুবেলা সন্ধ্যাআহ্নিক করে, গায়ত্রী জপ করে, লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্মেব বই পড়ে। লুকিয়ে পড়ে বিমলাব ভয়ে। মাঝে মধ্যে এক-আধ দিনের জন্য উধাও হয়ে যায়—কোথায় যায় বিমলা জানে। কোথায় কোনো সাধুসজ্জনের আবির্ভাবেব খবর পেলে নিঃশব্দে চোরের মতই পালিয়ে যাবে, তারপব একবেলা বা একদিন বা দুদিন বাদে আবার চোরের মতই ফিরে আসবে। সন্ধ্যাআহ্নিক দেখে বিমলা গোড়ায় গোড়ায় অনেক ঠাট্টাঠিসারা করেছে, অনেক রাগ-অভিমানও করেছে—এমন কি অপমানকর উক্তিও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেক সময়। কিন্তু বোবার শত্রুতা কত আর করতে পারে?

তবু বাবা যতদিন ছিল একরকম চলে যাচ্ছিল। বুড়ো-বুড়ীর চোখের সামনে বাবা-মা দুজনেই পর পর চোখ বুজল। তারা ছেলে, ছেলের বউ হারালো, কিন্তু বিমলা

কতখানি হারালো তা আর কারো পক্ষে অনুমান করাও শক্ত। বাড়ির আধখানা আর নগদ টাকার আধা-আধি বাবা বিমলার নামে লিখে দিয়ে গেছে। পৈতৃক সম্পত্তির ওপর ছেলেমেয়ের সমান দাবির যুগ নয় সেটা। ফলে এই প্রাপ্তিটুকুও বুকের ওপর করুণার বোঝার মত চেপে বসেছিল বিমলার। বাবা যেন দাদার প্রাপ্তির আধা-আধি ছিনিয়ে তাকে দিয়ে গেছে। শিক্ষিত মার্জিত দাদা-বউদির এ নিয়ে প্রকাশ্য অভিযোগ অন্তত কিছু ছিল না। বরং এক ধরনের উদার বিবেচনায় বাবার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে তারা, কিন্তু এই নিরাপত্তার ফলে নিরুপায় আক্রোশে বিমলা নিজেকে ছিন্নভিন্ন করেছে।

বাবা মা গত হবার পরেও ঘরের লোকটার একটুও পরিবর্তন হয়নি। উল্টে সে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে, নিশ্চিন্ত হয়ে নিষ্ক্রিয়তার স্রোতে আরো গা ভাসিয়েছে। উঠতে-বসতে বিমলা জ্বলে উঠেছে। গলা ছেড়ে ঝগড়া বা চেঁচামেচি করত না, কিন্তু অল্প কথায় যা বলত, গায়ে কেটে কেটে বসার কথা। কিন্তু একটু চক্ষুলজ্জা একটু আত্মসম্মানবোধও যদি থাকত। শ্বশুরের দয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর এই গঞ্জনাটুকুও যেন প্রাপ্য ধরে নিয়েছে—তার বেশি কিছু না। বাড়ি থেকে উধাও হওয়াটা ক্রমশ বাড়তে লাগল, অফিস কামাই করে এক একবার চার পাচ দিনের জন্যে ডুব। গোড়ায় গোড়ায় দাদা খোঁজখবর করত, বউদিও ভাবনাচিন্তা করাটা কর্তব্য ভাবত, আর রাগের মাথায় বিমলা এক-এক সময় তাদেরই ধমকে উঠত, দোহাই তোমাদের, আমাকে পাগল করে দিতে না চাও তো তার জন্যে আর তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।

লোকটা ফিরত যখন বিতৃষ্ণায় আর তার দিকে তাকাতে পর্যন্ত ইচ্ছে হত না বিমলার। সেই অবনতমূর্তি, অবনত মুখ—শত অপরাধের বোঝা যেন মাথায়। বিমলার মনে হত, এমন মেরুদণ্ডহীন মানুষ আর দেখেনি। কখনো জ্বলন্ত চোখে চেয়েই থাকত শুধু, কখনো বলত, ফিরলে কেন, যেখানে ছিলে থেকে গেলেই তো হত। অথবা বলত, এখানে তোমার ধর্মকর্মের অসুবিধে হচ্ছে, আর কোথাও ব্যবস্থা করতে পারো না?

বিমলার ধারণা, ব্যবস্থা আর কোথাও করেই নিত, বার বার ফিরে আসে শুধু আর এক বিপরীত আকর্ষণে। সেই আকর্ষণ বিমলা নিজে। এই মানুষের মধ্যেই সময় সময় প্রবল আসক্তি দেখেছে, চোখের কোণে নিবিড় তৃষ্ণা দেখেছে। কিন্তু বিমলার সেটা কাপুরুষের আসক্তি মনে হয়েছে, সেই নীরব তৃষ্ণার মুহূর্তে নিষ্ঠুর আঘাতে তাকে ফিরিয়ে দিতে একটুও বাধেনি। বিমলা করবেই বা কি, বড় মেয়ে কমলার বয়েস তখন আট, অমলার চার—এমন হবে জানলে এই মেয়ে দুটোই আসতে পেত কিনা সন্দেহ। এই দুটোকেই মানুষ করার ভাবনায় চোখে ঘুম নেই তার। প্রশ্রয় পেলে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাপুরুষের মত আরো বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে। দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে জপতপে বসবে, স্বর্গের সিঁড়ির লোভে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াবে। যে জোরে বিমলা লোকটাকে আরো খানিকটা অন্তত কাছে টেনে নিয়ে আসতে পারত, সেই জোরের ওপর তার এতটুকু লোভের আঁচও অসহ্য লাগত। এই নির্মম বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সামান্য আপসের ইঙ্গিতও সহ্য হত না।

কিন্তু এইভাবে দিন চলার মিয়াদও ফুরিয়ে এসেছিল।

একবার কমলা অমলা দুটো মেয়েরই ডিফথিরিয়া হল হঠাৎ। একজন সারার

আগেই আব একজনেব। বাড়িতে ত্রাস দেখা দিল। দাদা তাব ছেলেপুলে শ্বশুববাড়ি সবিযে দিল। ডাক্তাব ডেকে চিকিৎসাপত্রেব যাবতীয ব্যবস্থাও সেই কবল। সেই একবাব মাত্র ঘবেব লোকটাকে কটা দিন অফিস ভুলে আব পুজো-আর্চা বাতিল কবে ঘবেব কর্তব্য কবতে দেখা গির্যেছিল। দাদা সব ব্যবস্থা কবলেও ব্যস্ত মানুষ, সব সময তাব বাড়ি বসে থাকা সম্ভব নয। বাব বাব ডাক্তাবেব কাছে ছোটাছুটি কবা, ওষুধ আনা, শুশ্রূষা কবাব জন্য অষ্টপ্রহব লোক দবকাব। এ-লোকটা নির্বিবাদে কটা দিন কবেও ছিল। কিন্তু তাবপবেই বিমলা স্তব্ধ একেবাবে।

ছোট মেযেটাব তখনো বিপদ কাটেনি। বড মেযেটা তখনো পথ্য কবেনি। এবই মধ্যে লোকটা একেবাবে সাত দিনেব জন্যে নিখোজ। সব দাযিত্ব নিযে দাদা এগিযে না এলে ছোট মেযেটাব চোখ বোজাও বিচিত্র ছিল না।

যেমন গেবে তেমনি ফিবেছিল আবাব একদিন। দাদা বউদি এবাবে আব চুপ কবে থাকেনি। দাদা মৃদু-কঠিন ভৎসনাই কবেছে, বউদিও এবাবে মিষ্টি অনুযোগ কর্বেনি খুব। কিন্তু তাদেব কিছু বলাব দবকাব ছিল না আব।

ঠিক তাব পবদিনই বিমলা যেন চিবদিনেব মত প্রস্তুত হযেই সামনে এসে দাডিযেছিল। বলেছিল, শোনো, তুমি আব কোথাও থাকাব ব্যবস্থা কবে নাও। তুমি কাছে না থাকলে যে দটো এসেছে তাদেব মানুষ কবাব ভাবনা হযত আমি ভাবতে পাবব, নযত যা ওদেব অদৃষ্টে আছে তাই হবে। কিন্তু এ-ভাবে তুমি কাছে থাকলে সে চেষ্টাও কবা যাবে না, কোনদিন ওবা দাযিত্ব বুঝতে শিখবে না. আব কিছুদিন গেলে ওবাও তোমাকে অসম্মান কবতে শুরু কববে। তাতে তোমাব থেকেও ওদেব বেশি ক্ষতি। আজ অসুখে মবছিল, অমানুষ হযে সেই মবাই মববে শেষে।

পর্বাদন থেকে আব তাকে কেউ দেখেনি।

দিন দশেক বাদে দাদাব হুশ হযেছিল। তাব আগে অবশ্য বউদিব বক্রোক্তি কানে এর্সেছিল বিমলাব। বউদি অসহিষ্ণু মন্তব্য কবেছিল এই মানুষেব ঘব কবা কেন—এলে এবাবে ঠিক বলব আমি। বিমলা চুপ কবে ছিল, কাবণ লোকটা ক'দিনেব জন্যে গেছে সে সম্বন্ধে সে নিঃসংশয নয তখনো। আবো পাচ-সাত দিন বাদে দাদা অফিসে খোজ নিযে এসে বলল, চাকবিতে ইস্তফা দিযে সে কোথায চলে গেছে কেউ জানে না। অফিসেব প্রাপ্যগণ্ডা বিমলাব নামে পাঠাতে নির্দেশ দিযে গেছে।

বউদি ঘাবডে গিযে ছুটে এসেছিল। অনেক জেবা কবেও ফল হযনি। বিমলা শুধু বলেছিল, তোমাদেব খোজ কবাব দবকাব নেই। বললেও খোঁজাখুজি চলছিল জানে। অনেকদিন পর্যন্ত চলেছে। বিমলা এই প্রথম বোধহয নিজেব অগোচবে একটু মর্যাদা দিতে পেবেছিল লোকটাকে। আব দুর্বিষহ হলেও, নিভৃত সংগোপনে আশা কবছিল, এই মর্যাদাব সান্ত্বনাটুকুও অন্তত থাকে যেন। না, সেই অবনত মূর্তি আব অবনত চোখ আব সে দেখতে চায না। ফেবেই যদি, করুণাব আব অবহেলাব পাত্র হযে যেন না ফেবে।

সংবাদটা ঘুবে-ফিবে ঠাকুমাব কানেও পৌছুল। বুড়ী অতশত খুঁটিনাটি কিছু জানে না, নাত-জামাই গা-ঢাকা দিযেছে এটুকুই খবব তাব কাছে। কিন্তু একটুকুও চিন্তিত

বা উতলা হতে দেখা গেল না তাকে। ববং একালেব বউযেব আঁচল-ধবা পুরুষেব মধ্যে সে-কালেব পবিচিত পুরুষ-প্রবৃত্তি আবিষ্কাব কবল বুড়ী। হেসে নাতবউযেব সামনেই নাতনীকে খোঁটা দিল, ছোঁড়া গেবো খুলে পালায, তুই কেমন বড রূপসী লো। পবক্ষণেই নিজেই বিস্মিত, ভালো-মুখো ছেলেব পেটে পেটে এত। কোথায কোন ভৈতবী-টৈববীব পিছু নিযেছে দ্যাখ গে যা, নইলে এই বযসে এত ধর্মে বস কেন?

বুড়ীব কোঁচকানো মুখে দুশ্চিন্তাব চিহ্ন ছিল না, ববং ভালো-মুখো ছেলেটাব মধ্যে প্রশ্রয পাবাব মতই একটু পুরুষোচিত লক্ষণ দেখেছিল যেন। বিমলাকে কাছে টেনে খাটো গলায তবল আশ্বাস দিতে চেষ্টা কবেছিল, কিছু ভাবিস না, যে ঘাটেই জল খেযে বেড়াক, নাকে দড়িটা এখানেই বাধা, ঘুবে ফিবে এখানেই এসে হত্যে দিযে পড়তে হবে। এই হত্যে দেওযাব নজিব বুড়ীব স্মৃতিব সম্পদ যেন। বলত, আজ তোদেব দাদুকে এমনি জবুথবু ভালোমানুষ দেখছিস—এ বকম ছিল নাকি। কম হাড জ্বালিযেছে। পোষা ডাইনী ছিল একটা, কুলখাগী মেযেমানুষ—বুঝলি? জিজ্ঞেস কবে দেখগে যা, আব আমিও সেই বামনী ছিলাম, গঙ্গাচান না কবে এলে কাছে ঘেষতে দিতাম না, ফিবেও তাকাতাম না। তাকাব কেন লা, আমাব কপালে সাবিত্রী কৌটোব সিঁদুব—সোহাগ কবে নিজেই নিজেব বশ-বাণ হাতে তুলে দিযেছিল, আমাব ভযই বা কি ভাবনাই বা কি।

নাতনী আব নাতবউ এ গল্প অনেকবাব শুনেছে। বুড়ী সেদিনও বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিমলা বুড়ীকে সেদিন মনে মনে জ্বলন্ত চিতায তুলে দিযে সেখান থেকে চলে গেছে।

একে একে এবপব অনেগুলো দিন চলে যেতে বুড়ীবও কেমন খটকা বেধেছে। ব্যাপাবটা যেন ঠিক তাদেব কালেব নয। নাতবউকে ডেকে চুপি চুপি প্রাযই খবব নিযেছে, ভালো মুখো ছেলেব কোনো খোজ পাওযা গেল কিনা। আবাব মেজাজ চড়লে ভালো মুখো ছেলেব উদ্দেশ্যেই গলা ছেড়ে গাল পেড়েছে।

শীর্ণ দুই হাতে বিমলাকেও এবপব চড়াও কবেছিল একদিন। কোলেব কাছে টেনে বসিযেছিল। কানে মুখ লাগিযে বলেছে, তোব ভাবনাটা কি, বশ বাণ হাতে আছে না।

তাবপব আচলেব আড়াল থেকে সেই বশ বাণ বাব কবেছে। সাবিত্রী সিদুব কৌটো। বঙ-কবা কাঠেব কৌটোব ওপব সাবিত্রী লেখা। আগে এই সিদুবকৌটো নিযে ঠাকুমাব সঙ্গে অনেক বসিকতা কবেছে নাতনী নাতবউ। দাদুব নতুন বযসেব প্রণযোপহাব। দাদু কাশীধামে বেড়াতে গিযেছিল একবাব, সেখান থেকে এনে দিযেছিল। এই সাবিত্রী কৌটোব সিদুবেব জোবেই দাদুকে ঠাকুমা কতবাব যমেব মুখ থেকে আব কতবকমেব অনাচাব অঘটন থেকে নির্বিঘ্নে ফেবাতে পেবেছে ঠিক নেই। ঠাকুমাব সেসব গর্বেব কাহিনী বিমলা আব সুরুচি অজস্রবাব শুনেছে।

ধবে-বেঁধে সেদিন বিমলাকে কাছে বসিযে ঠাকুমা বলেছিল, এই কৌটোব সিদুব একবাব কপালে পব, সিথিতে দে—ভালো-মুখো ছেলেব পাযে বেড়ি পড়বে, দেখিস'খন, কোনো অকল্যাণ ঘেঁষবে না।

বিমলা এত ক্রুদ্ধ আব কখনো হযনি বোধহয। বাগে মুখ দিযে একটা কথাও বাব হযনি। বুড়ীকে ঠেলে এক ঝটকায উঠে দাড়িযেছে। বেশ দিনকতক আব কাছে

আসেনি পর্যন্ত, মেয়েদুটোকেও আসতে দেয়নি। বিমলা জানে আবেদনটা বুড়ী বউদির মারফতও করেছে, কিন্তু বউদি তাকে কিছু বলতে সাহস করেনি—

দিন গেছে, মাস গেছে, বছর গেছে, কিন্তু বিমলার এতটুকু খেদ এতটুকু পরিতাপ দেখেনি কেউ। তার চলন-বলন আরো ধীর স্থির হয়েছে। সমস্ত মুখে এক অনমনীয় সঙ্কল্পের ছাপ এটে বসেছে।

একে একে আই-এ পাস করেছে, বি-এ পাস করেছে, এম-এ পাস করেছে। মেয়ে-কলেজের শিক্ষয়িত্রী এখন। কপালের সিদুরের টিপ সম্পূর্ণই নিশ্চিহ্ন, কাছের থেকে লক্ষ্য করলে ঝাকড়া চুলের সিঁথির ফাঁকে সূক্ষ্ম শিখার মত একটুখানি সিদুর-রেখা চোখে পড়ে। বউদি সুরুচির ধারণা, ওটুকু শুধু পুরুষের সলোভ দৃষ্টি প্রতিহত করার জন্য, নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য। নইলে ওটুকুও ঘুচত।

দাদুও উঠে গেছে। নাতবউয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেও টুকিটাকি এটা ওটা এনে দিচ্ছে বিমলার হাতে। বিড় বিড় করে বলছে, সব দিয়ে দে—। হরি-ছাপের নামাবলী এনে দিয়েছে, জপের মালা দিয়েছে, এমন কি লাল কাপড়ে বাঁধানো হাত-পাখাটাও এনে দিয়েছে। বৈদ্যুতিক হাওয়া বরদাস্ত হত না ঠাকমার, গরমে শিথিল হাতে ওটাই নড়ত। নিষ্প্রভ চোখে দাদু এ ঘর ও ঘরের আনাচ কানাচ দেখছে—আর কি দেবে। এতকালের সঙ্গিনীর প্রতি অভিমানে তার গলা পর্যন্ত বুজে আছে। কাছে এসেও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকছে।

বউদি চাদর দোসুতি জামাকাপড় যা দিয়ে যাচ্ছে, আড়ষ্ট হাতে বিমলা সেগুলো তার শয্যার চারদিকে গুছিয়ে রাখছিল, কিন্তু দাদুর দেওয়া এই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি জিনিসগুলোর স্পর্শ বিচিত্র লাগছে তার। অস্বাভাবিক উষ্ণ অস্বাভাবিক জীবন্ত লাগছে। জীবনের এই আঁচের সঙ্গে কতকালের কোন সত্তার যোগ যেন কি এক অজ্ঞাত অনুভূতিতে বুকের ভিতরটা কেপে কেপে উঠছে বিমলার। মৃত্যুর প্রলেপ-মাখানো এই সমাহিত সামঞ্জস্যের মধ্যে দাড়িয়ে ঠিক তত বড়ই একটা অসংগতি বোধ নিজের অন্তস্তল ভেদ করে গুমরে গুমরে উঠতে চাইছে

ওধারের ঘরে দিদিমার কাঠের সিন্দুক খুলে বসেছে বউদি। দাদুর কথায় দেখতে গেছে মহাযাত্রিনীর সঙ্গে দেবার মত আর কি আছে। ঘাড় গুঁজে দাদু আবার এগিয়ে এলো, বিমলার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এটাও দিয়ে দে।

জিনিসটা হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিমলা বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত বিষম একটা ঝাকুনি খেল। সমস্ত সত্তা, সমগ্র অস্তিত্ব, সর্বাঙ্গের অণু-পরমাণু নাড়িয়ে দেবার মতই প্রচণ্ড ঝাকুনি। তারপরেই আড়ষ্ট কাঠ একেবারে

দিদিমার সাবিত্রী সিদুর কৌটো।

কৌটো হাতে দিয়ে দাদু চলে গেল। বিমলা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখল। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত, নিস্পন্দ, চিত্রার্পিত। এরই তলায় তলায় কিছু একটা বিচিত্র কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। কি ঘটছে বিমলা জানে না, কি করছে সে, তাও না।

কতক্ষণ গেছে হুশ নেই। বউদি সুরুচি ঘরে ঢুকে থমকে দাড়িয়ে গেছে। কিন্তু বিমলা তাকে দেখেছে কিনা সন্দেহ। দাদা অনুপম ফিরে এসেছে, হতচকিত বিস্ময়ে

নির্বাক সেও। বিমলা তাকেও দেখেছে কিনা সন্দেহ। দরজার ওধারে বিভ্রান্ত মূর্তির মত ছেলেমেয়েগুলো ভিড় করে আছে। বিমলা তাদেরও লক্ষ্য করেছে কিনা সন্দেহ।

বিমলার একটা হাত সিঁদুরে লালে লাল। সেই হাত নিজের শাড়িতে ঘষেছে কখন, শাড়িতে চাপটা চাপটা সিঁদুর। সেই হাত নিজের মুখে লেগেছে কখন, মুখে গালে সিঁদুর লেগে আছে। আব সেই হাত নিজের কপালে লেপেছে কখন, সমস্ত কপাল সিঁদুরে মাখামাখি।

অন্য হাতের চেতনাশূন্য শক্ত মুঠিতে কৌটোটা ধবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমলা।

এক ভৈরবী

বাইবে থেকে দেখলে শংকবনাথবাবুকে বেশ সুখী মানুষ মনে হবে। মোটামুটি বড় চাকরি করেন। তাছাড়া বাড়তি বোজগার কিছু আছে। বিজ্ঞান-দর্শনেব ওপব লেখা তাঁর খানকযেক বই বাজারে বেশ ভালো চলছে। দর্শনেব ছাত্র বা শিক্ষকদের কাছে নামটা সুপরিচিত। ভদ্রলোক সুরসিক, বড়রকমের কিছু বিরক্তিব কাবণ না ঘটলে ঠোঁটেব ফাঁকে একটু মিষ্টি হাসি সর্বদাই থাকে। বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, কিন্তু সমস্ত মাথা খুঁজলে পাচটা পাকা চুল বেরুবে না। শবীরের বাঁধুনিও বেশ মজবুত এখনো। দেখলে বড় জোর বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ মনে হবে। পৈতৃক বাড়িতে থাকেন, দুটি মেয়ে এক ছেলে এবং স্ত্রী—এই নিয়ে তাঁর সংসার। দোতলায় তাঁর বাস, নীচের তলা ভাড়া দিয়ে মাসে চারশ' টাকা আসে। নিজেব ছোট গাড়ি আছে একটা। মোট কথা, আকাশ-কুসুমের স্বপ্নে বিভোর ন্য হলে সর্বতোভাবে সুখী-মানুষ বলে গণ্য হবাবই ভাগ্য তাঁর।

কিন্তু শংকবনাথবাবু নিজে জানেন, আর তাঁর ঘনিষ্ঠ অন্তবঙ্গজনেবা জানে, বাইবেব এই পবিপূর্ণতার সবটুকুই নিষ্ফল। ভিতরে ভিতরে মানুষটা জ্বলছেন। যতক্ষণ আপিস আর কাজকর্ম নিয়ে থাকেন, একভাবে চলে যায়। কিন্তু নিঃসঙ্গ হওযা মাত্র যন্ত্রণা। স্ত্রীর দিকে তাকালে সেই যন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ হযে ওঠে। কারণ ওই পাঁচ বছব ধবে তার সঙ্গে জ্বলছেন তাঁর স্ত্রীও।

এই জ্বালা-যন্ত্রণাব কারণ তাঁদেব একটি মাত্র ছেলে। দুবারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে সে। ছোট ছেলে, এই ব্যাধিব সঠিক পরিণাম সম্পর্কে তাব জ্ঞান নেই, তবু কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে হয়তো। শংকবনাথবাবু চিকিৎসাব কোনো ত্রুটি বাখেন নি। তাঁর রোজগারের প্রায় আধাআধি এই জন্যেই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া থেকে এক্সপার্ট ওপিনিয়ান এনেছেন বহু টাকা খরচ করে। তারা জানিয়েছে এই রোগের কোন চিকিৎসা এখনো বেরোয় নি। দেশের বড় বড় ডাক্তার দেখানো বা তাদের মতামত নেওয়া আগেই সেরেছেন। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি থেকে সূর্যরশ্মির চিকিৎসা পর্যন্ত করিয়েছেন, কিন্তু সবই ব্যর্থ। খুব ধীরে ধীরে ছেলে অমোঘ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।

অলৌকিক কোনো ক্রিয়াকলাপে ঠিক যে বিশ্বাসী তিনি তাও নয়। কিন্তু ও-দিকটা নিজে জানেন না বলেই যে-যা পরামর্শ দিয়েছে, স্ত্রীর আকুলতা দেখে তাও করে গেছেন। যাগ-যজ্ঞ তন্ত্র-মন্ত্র দামী-দামী পাথর ধারণ করানো কিছুই বাকি রাখেন নি। এতেও বহু হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু জ্যোতিষীদের এখনো বদ্ধ ধারণা, কোনো অলৌকিক উপায়েই ছেলে রোগমুক্ত হবে। শংকরনাথবাবুর স্ত্রীরও এই ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর অটুট আস্থা।

নিজেকে কোনোদিন ভক্ত বলে জাহির করেন নি শংকরনাথবাবু আবার অবিশ্বাসের গর্বও প্রকাশ করেন নি। আসলে ভিতরে ভিতরে মানুষটা দুর্বল একটু, ছেলের কারণে আরও দুর্বল হয়েছেন। বিপন্ন বোধ করলে বরাবরই দুর্গা কালী শিব গণেশ প্রভৃতির যাঁকে কাছে পেতেন তাঁর উদ্দেশেই প্রণাম করতেন, আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ওই দেব-দেবীদের অস্তিত্ব আছে কি নেই তা নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। ভদ্রলোকের চিন্তা স্বচ্ছ ছিল, বিবেচনাশক্তিও প্রখর ছিল। কিন্তু এমন একটা দুর্বিপাকে পড়ে অনেক কাজ করে বসেছেন, অনেক অর্থব্যয় করেছেন, কিন্তু তার জন্য কোনো আক্ষেপ নেই—যা করেছেন সবই স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য। তিনি তো আর সর্বজ্ঞ নন, কোথা থেকে কি হয় বা হতে পারে, তিনি তার কতটুকু জানেন।

ভিতরে ভিতরে যে আশা একরকম ছেড়েই বসে আছেন তিনি, নিজের স্ত্রীকে তাও বুঝতে দেন নি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সত্যিই আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটল একটা। কোনো অপরিচিত ভদ্রলোক ছেলের অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কে এমন কতকগুলো কথা বলে দিলেন যে শংকরনাথবাবু আর স্ত্রী দু'জনেই স্তব্ধ। কারণ ওই ব্যাপারগুলো শুধু তাঁরা দু'জন ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ জানেন না। তাছাড়া ভদ্রলোক পেশাদার মানুষ নন, সাদাসিধে গৃহী। নিজে তিনি গোপালভক্ত। তার বিশেষ ক্ষমতার কথা শুনেই শংকরনাথবাবু স্ত্রীর তাগিদে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ভদ্রলোক প্রথমে কিছুতে স্বীকার করেন নি যে তিনি কিছু জানেন বা কিছু করতে পারেন। পরে বিপদের কথা শোনার পর চোখ বুজে ভেবেছেন খানিক। শেষে জিজ্ঞাসা করেছেন, ছেলের এইরকম এইরকম চেহারা কিনা, এবং ছেলের আর তার বাবা-মায়ের জীবনে এই এই সময়ে এই এই ঘটনা ঘটে গেছে কিনা।

সবই হুবহু মিলেছে।

আবার খানিক চুপ করে থেকে ভদ্রলোক যা জানালেন এবং নির্দেশ দিলেন তার সার কথা, তাঁর ধারণা ছেলে ভালো হয়ে যাবে। মা তাকে ভালো করবেন। কোন মা এবং কোন পীঠস্থানের মা তাও বলে দিলেন। অনুযোগ করলেন, মায়ের কাছে পৌঁছুবার জন্য এতকাল শুধু এজেন্ট ধরা হয়েছে—অর্থাৎ সাধুসন্ত মহামানবদের আনুকূল্য খোঁজা হয়েছে। কিন্তু তার কোনো দরকার নেই, মায়ের কাছে নিজেকেই যেতে হয়। শংকরনাথবাবুকে সেখানে যেতে বলে দিলেন তিনি। চার-পাঁচদিন শুধু জলাহার আর ফলাহারে থেকে এক মনে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাতে বললেন। জাঁকজমক করে কোনোরকম পূজা-আর্চা দিতে নিষেধ করলেন, কারো সঙ্গে এ নিয়ে কোনোরকম কথাবার্তাও বলতে বারণ করে দিলেন। এবং এও সতর্ক করে দিলেন

যে অনেক রকমের বিঘ্ন, ভয় বা প্রলোভনও আসতে পারে, সেই সবই মায়ের খেলা জেনে যেন নিঃশব্দে নিজের কাজ করে ফিরে আসেন।

স্ত্রীর তাগিদে তিন দিনের মধ্যেই শংকরনাথবাবু সেই পীঠস্থানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

ট্রেন থেকে নামলে সাত আট মাইল দূরে মায়ের স্থান। সাইকেল রিকশায় যেতে হয়। তাই চলেছেন। দু'দিকে ধানক্ষেত আর মাঠ, মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা। একটিমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে ওই অপরিচিত স্থানে যেতে যেতে শংকরনাথবাবু খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন না।

পথ শেষ হয়ে এলো প্রায়। ঘড়ি দেখলেন। বিকেল তখন চারটে। সামনে বাঁক নিয়ে ওই সেতুটা পার হলে অর্থাৎ শুকনো নদীর ওপারে গেলেই মায়ের এলাকা। নদীর ধারে বশিষ্ঠ-কালের সেই মহাশ্মশান।

সেতু পেরোবার মুখেই সাইকেল রিকশার চাকা ফেটে গেল। মনের এই অবস্থায় এও এক ধরনের বিঘ্ন মনে হল শংকরনাথবাবুর। ঝোলা কাঁধে হেঁটে চললেন।

সেতু পেরিয়ে খানিকটা এগোবার পর সরু কাঁচা রাস্তা। দু'দিকে সারি সারি কুঁড়েঘর, ছনের ঘর। ছোট ছোট ঝুপড়ির দোকান, সামনে কাঠের বেঞ্চ পাতা। মিঠাইয়ের দোকানের সামনে বসে কেউ কেউ মিষ্টি খাচ্ছে, চায়ের দোকানের সামনে বসে গেলাসে বা ভাঁড়ে চা খাচ্ছে। সেই সব দোকানের সামনে মাছি ভনভন করছে। সব রাস্তাটা নোংরা, পথে কুকুরে কিলবিল করছে। একটু বাদে-বাদেই দু'দিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল। আর সেগুলোর পাশে পাশে ছোট বড় নানা আকারের মন্দির।

কোথায় উঠবেন শংকরনাথবাবু সেই হদিস নিয়েই এসেছিলেন। একটাই পাকা দালান মায়ের মন্দিরের অদূরে। ধর্মশালা। সেটা দেখে মনে মনে তবু একটু স্বস্তি বোধ করলেন শংকরনাথবাবু। খটখটে পরিচ্ছন্ন দালান, ছোট ছোট বহু ঘর। যাত্রীর মরশুম নয় সেটা, অতএব একটা পৃথক ঘরই পেলেন তিনি। এই পরিবেশটুকুই যা আধুনিক, নইলে বাইরের চারদিকে তাকালে মনে হবে এখানকার সব-কিছুই যেন সুদূর ইতিহাসকালের মধ্যে আটকে আছে।

ঝোলা রেখে মুখ হাত ধুয়ে এবং পথের জামা-কাপড় বদলে মন্দিরের উদ্দেশে চললেন তিনি। আর কোনো ব্যবস্থার তাগিদ নেই। ফলাহার জলাহারের প্রচুর ফল তার ঝোলার মধ্যেই আছে। মন্দির থেকে ফেরার সময় একটা কুঁজো কিনতে হবে শুধু। মোমবাতি দিয়াশলাই এমন কি দু'বাণ্ডিল ধূপকাঠিও তাঁর সঙ্গেই আছে।

মন্দিরে এলে অবশ্য অন্যরকম। অনেকগুলো বিশাল সিঁড়ি ধরে ওপারে উঠে যেতে হয়। তারপর বিরাট বাঁধানো চত্বর, নাটমন্দির। তার সামনে মায়ের মন্দির—সেখানে মায়ের অধিষ্ঠান।

পায়ে পায়ে শংকরনাথবাবু মায়ের মন্দিরের সিঁড়ি ধরে উঠে মাতৃমূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালেন। আরো দর্শক কিছু আছে, কিন্তু ভিড় তেমন নেই।

এই সেই মূর্তি যার সম্পর্কে অনেক পড়েছেন, অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনেছেন। সোনার পাতে মোড়া এলোকেশী প্রস্তরাসনে সমাসীনা মায়ের মুখখানা হঠাৎ বড় অদ্ভুত লাগল শংকরনাথবাবুর। মা যেন তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন আর সেই হাসিতে এক অদ্ভুত স্নেহ গলে গলে পড়ছে।

"...তারিণী তরলা তন্বী
তরুণবল্লরী।
তীব্র রূপা তনুশ্যামা
তনক্ষীণপয়োধরা।।"

একজন ভক্ত যুক্তকরে সুন্দর স্পষ্ট গলায় দেবীর স্তবপাঠ করে চলেছে। শংকরনাথবাবুর অদ্ভুত ভালো লাগছে শুনতে।

"...তৃতীয়া তরলা
তীব্রগমনানিলবাহিনী।
উগ্রতারা জয়া চণ্ডী
শ্রীমদেজটা শিবা।।"

স্তবের সঙ্গে দেবীর এই বর্ণনা মিলছে না বটে কিন্তু মনের ভিতরে সেই নীলবাহিনীই যেন আকার নিচ্ছে। শংকরনাথবাবু আস্তে আস্তে সেই মেঝেতেই বসে পড়লেন। দু'হাত জোড় করে মাতৃমূর্তির দিকে চেয়ে রইলেন।

"...তরুণা শাম্ভবী ছিন্নভালা
চ ভদ্রতারিণী।।
উগ্রা উগ্রপ্রভা নীলা কৃষ্ণা
নীলসরস্বতী।।"

দু'হাত জোড় করে স্থির মূর্তির মতোই বসে আছেন শংকরনাথবাবু। চোখের কোণদুটো শিরশির করছে কেমন। আশপাশের লোকেরা লক্ষ্য করছে তাঁকে, কারণ বেশভূষায় বা চেহারায় তিনিই একমাত্র অভিজাত সেখানে। কিন্তু শংকরনাথবাবুর আর কোনোদিকেই চোখ নেই।

"...অট্টহাস্যা করালাস্যা
ররাস্যা দিতিপূজিতা।
সগুণা সগুণারাধ্যা হর-ইন্দ্র
দেবপূজিতা।।"

কথাগুলো অন্তস্তলের কোন গুহাগহ্বরে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে তিনি জানেন না। নিঃশব্দ একটা আলোড়ন অনুভব করছেন শুধু।

"...পদ্মমালা চ পদ্মাক্ষী
কামাখ্যা গিরিনন্দিনী।
দক্ষিণা চৈব দক্ষা চ দক্ষজা
দক্ষিণে রতা।।"

শংকরনাথবাবু নিজে কিছু বলছেন না, আপনা থেকেই একটা আকুল প্রার্থনা

উঠছে শুধু। মাগো আমি পূজা জানি না, স্তব জানি না, তোমার মহিমাও জানি না। কেন এসেছি তুমি জানো, তোমার কি ইচ্ছে তাও তুমিই জানো।

"...বজ্রপুষ্পপ্রিয়া রক্তপ্রিয়া
কুসুমভূষিতা।
মাহেশ্বরী মহাদেবপ্রিয়া
পদ্মবিভূষিতা।।"

কতক্ষণ এভাবে বসেছিলেন শংকরনাথবাবু জানেন না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন একসময়। তখনো অনেকে ফিরে ফিবে দেখছে তাঁকে। কিছু একটা বেদনা সমর্পণ করতে এসেছেন মায়ের কাছে, সেটা যেন তারা বুঝেছে। বেদনাটা কত গভীব সেটুকুই নীরবে বুঝে নেবার চেষ্টা।

নাটমন্দিরের পাশের সিঁড়ি ধরে নেমে আসার জন্য আস্তে আস্তে পা বাড়ালেন শংকরনাথবাবু। তাবপরেই আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে যেন পা-দুটো থেমে গেল।

নাটমন্দিরেব সামনের মোটা থামে ঠেস দিয়ে কম্বলেব আসনে বসে আছে এক ভৈরবী। আঁট করে পরা রক্তাম্বরী থান, গায়ে সেইরকমই লালে ছোপানো জামা। দুই বাহুতে কপালে গলায় পাতলা করে ভস্ম মাখা। কপালে চন্দনের ত্রিশূল, ভ্রূ-সন্ধি থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত চন্দনের প্রলেপ টানা আয়ত দুই চোখে সামান্য রক্তিমাভা। গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, দুই হাতে দুটো লোহার বালা। গায়ের রং কালো, মুখখানা কমনীয় কিন্তু আশ্চর্যরকম স্থিব, কঠিন। মেরুদণ্ড টান করে বসে আছে। পাশে একটা ঝকমকে লম্বা ত্রিশূল। নিটোল পরিপুষ্ট দেহ, বসে থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘাঙ্গী মনে হয়। পরনের রক্তাম্বরী হাঁটুর নীচে এসেই শেষ হয়েছে। পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশেব মতো বয়েস হতে পারে কিন্তু মুখের দিকে তাকালে বযসের প্রশ্নটা মনে আসে না।

শংকরনাথবাবু থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন ভৈরবীর আয়ত অপলক দুই কালো চোখের কি-যেন এক অব্যর্থ দৃষ্টির আঘাতে। চাউনি দেখেই বোঝা যায়, ওই দুটো রমণী-চক্ষু অনেকক্ষণ ধরেই তাঁর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। এখন চোখে চোখ পড়তে তাঁর সর্বাঙ্গ অবশ পঙ্গু হযে এল যেন হঠাৎ। এমন সত্তাবিদারী তীক্ষ্ণ অথচ স্থির চাউনি আব বুঝি তিনি দেখেন নি। ওই দুটো চোখ দিযে রমণী যে-কোনো লোককে যেন কাছে টেনে নিয়ে আসতে পারে, তারপর ধীরেসুস্থে পাশের ত্রিশূলটা তুলে বুকে বসিয়ে দিতে পারে।

শংকরনাথ বিমূঢ়ের মতো চেয়ে আছেন। অন্য দিকে মুখ ফেরাতে পারছেন না, নড়তে পারছেন না।

খুব আস্তে আস্তে রমণীব চোখের পলক পড়ল একবার। ডেকে বা ইশারায় নয়, ভৈরবী যেন শুধু চোখের পাতা ফেলেই কাছে আসতে বলল তাঁকে। আর একবার ওই চোখের পাতা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শংকরনাথবাবুর সংবিত ফিরল। চকিতে আত্মস্থ তিনি। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি কটা টপকেই হনহন করে চত্বর ধরে সিংহদরজার দিকে এগোলেন। ওই দরজা ছাড়ালে নীচে রাস্তায় নেমে আসার সেই বিশাল-বিস্তৃত সিঁড়ি।

সিংহদরজার বাইরে এসে হাঁফ ফেললেন শংকরনাথ। ভিতরটা এখনো ধড়ফড়

করছে কেমন। সেখান থেকে আস্তে আস্তে নাটমন্দিরের দিকে ফিরে তাকালেন।

তারপর আবারও সেইরকমই ঝাঁকুনি খেলেন একটা। ভৈরবী স্থিরনেত্রে এদিকেই চেয়ে আছে। সেই চাউনিতে রোষাভাস। যেখানে যান বা যতদূরেই যান, ইচ্ছে করলেই কিছু একটা সর্বনাশ ঘটিয়ে দিতে পারে যেন।

আর এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে তর-তর করে সিঁড়ি ধরে নীচের রাস্তায় নেমে এলেন শংকরনাথ। তারপর বড় করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। এ-রকম অভিজ্ঞতা জীবনে হয় নি। ওই ছেলের জন্য আরো তো বহু তীর্থক্ষেত্র ঘোরাঘুরি করেছেন, কিন্তু এ যেন এক বিচিত্র ব্যাপার।

কি মনে পড়তে হঠাৎ কাঁপুনি ধরল তাঁর। যাঁর প্রেরণায় এখানে আসা, তাঁর সতর্কবাণী আচমকা একটা চাবুকের ঘা বসিয়ে দিল। তিনি বলেই দিয়েছিলেন বিঘ্ন আসতে পারে, প্রলোভন আসতে পারে। আজই এখানে এসেছেন আর আজই এই কাণ্ড! এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম শুভর ছিটেফোটাও আছে বলে মনে হল না। ভিতরটা ভয়ানক দমে গেল শংকরনাথবাবুর।

সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে কাটালেন। অখণ্ড অবকাশ। ঘরে ধূপ-কাঠি জ্বালিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। ভিতরটা প্রার্থনামগ্ন। ছেলের কল্যাণকামনায় তন্ময় হয়ে উঠেছেন। সমস্ত রকমের ছায়াভয় আপাতত মন থেকে সরে গেছে।

কিন্তু সন্ধ্যার পর মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই অস্বস্তি। জোর করে সেটা ঠেলে সরিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। মন্দিরে তো যেতেই হবে।

সিংহদরজা পেরিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালেন। তারপর নিশ্চিন্ত। নাটমন্দিরের ও-জায়গাটা শূন্য। মন্দিরে আরতি হচ্ছে। বহু নারীপুরুষের সমাবেশ। কারো দিকে কারো চোখ নেই।

কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটল। ফলাহার জলাহারের দরুন নয়, আহারের চিন্তা বা অভিলাষ তাঁর অগোচর মনেও নেই। যতক্ষণ সজাগ ততক্ষণ প্রার্থনারত। কিন্তু ঘুমের ঘোরে বারকয়েক ওই ভৈরবী-মূর্তি দেখেছেন। আরো ক্ষমাশূন্য, ভয়ংকর যেন। একবার তো সন্ত্রাসে উঠেই বসেছিলেন তিনি।

পরদিন সকাল থেকে অনেকটা স্থিরচিত্ত শংকরনাথবাবু। মন্দিরের নাটমন্দিরে ভৈরবীকে দেখেও ভ্রূক্ষেপ করেন নি, একবার ফিরেও তাকান নি তার দিকে। দর্শন এবং প্রার্থনা সেরে চলে এসেছেন! এর পরের মনোনিবেশ যেখানে খুশি বসে হতে পারে—সবটাই তো মায়ের এলাকা।

দুপুরের দিকে মহাশ্মশানে ঢুকেছিলেন একবার। এখানে এলে মহাশ্মশানে বিচরণ বিশেষ বিধি একটা। প্রতিটি গাছের নীচে কংকাল করোটি হাড়গোড় ছড়ানো। মৃতের বালিশ-তোষকেরও ছড়াছড়ি। না, এই মহাশ্মশান কল্পনাও করতে পারেন নি শংকরনাথবাবু। তার দম বন্ধ হয়ে আসার দাখিল! বরং সহস্রমুণ্ডীর বাঁধানো চত্বরটুকু ভালো লেগেছে। ওখানে আসন নিয়ে কত যোগী সাধনা করে গেছেন সে-শুধু বইয়েই পড়েছেন। সকলে নাকি ওখানে বসতেও পারে না, মতি স্থির সংযত না হলে ওখানকার আসন সহ্য করাই কঠিন নাকি।

দিনরাতের আঠার ঘণ্টা ওখানে কাটান যে মানুষটি আর থেকে থেকে 'তারা তারা' বলে হুংকার ছাড়েন, তাঁর নাম ভোলারাম। এটা তাঁর আসল নাম কিনা কেউ জানে না। তন্ত্র-সাধক, পরনে টকটকে লাল থান। সমস্ত মুখখানা কুচকুচে কালো গোঁফদাড়িতে বোঝাই। ভদ্রলোক এমনিতে সদালাপী বেশ। নতুন মুখ দেখলেই নানারকম খোঁজখবর করেন। শংকরনাথের সঙ্গেও আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছিলেন, বিফল হয়ে শেষে আবার তারা-চিন্তায় মন দিয়েছেন।

বিকেলে মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙে উঠেই থমকে দাঁড়ালেন শংকরনাথ। সিংহদরজার মুখেই ত্রিশূল হাতে ভৈরবীর মুখোমুখি পড়ে গেলেন একেবারে। দীর্ঘাঙ্গী সবল চেহারা। গাম্ভীর্য সত্ত্বেও কালো মুখখানা কমনীয়। আগের দিনের মতো অত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নয় চোখের। তবু অপলক, কঠিন।

শংকরনাথ পাশ কাটাতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তার আগেই কণ্ঠস্বর শুনে দাড়িয়ে গেলেন। গলার নিটোল স্বরটুকুতে পর্যন্ত কি যেন একটা মোহিনী শক্তি আছে।

—পুণ্যি করতে আসা হয়েছে? নিজের অগোচরে মাথা ঘাড় নাড়লেন শংকরনাথ। অর্থাৎ না।

—তবে? তার থেকেও বেশি? মোক্ষলাভ?

আবারও মাথা নাড়লেন। তাও না।

ভৈরবী চেয়ে আছে। চাউনিটা ধারালো হয়ে উঠছে। আশপাশ দিয়ে লোক যাতায়াত করছে, তারা ফিরে ফিরে দেখছে।

হঠাৎই আত্মস্থ হয়ে শংকরনাথ দ্রুত এগিয়ে গেলেন। বুকের তলায় এ-রকম কাঁপুনি কিসের ঠিক বুঝে উঠছেন না।

ফেরার সময়ে দেখলেন ভৈরবী নেই।

রাত্রি।

ফলাহার সেরে শংকরনাথ বাইরে থেকে ঘর বন্ধ করে চুপচাপ বেরিয়ে এলেন। মাথায় কি-রকম একটা গোঁ চেপেছে তাঁর। ওই সহস্রমুণ্ডীর আসনে গিয়েই বসলেন। তাতে প্রাণ যায় যাক। স্থির হয়ে বসতে যদি পারেন, সেখান থেকেই ছেলের চিন্তা করবেন। মাকে ডাকবেন। না যদি পারেন, কি করবেন তখন দেখা যাবে।

কয়েকটা ধাপ ধরে মহাশ্মশানে নেমে এলেই ডাইনে সহস্রমুণ্ডীর চাতাল। চারদিক অন্ধকার। স্তব্ধ পরিবেশ। বাতাস-লাগা সড়সড় শব্দও চমকে ওঠার মতো।

চাতালে উঠে আসন নিয়ে বসলেন শংকরনাথ। না, কোনো ভয়-ডর নেই তাঁর। আরো জনা-দুই-তিন সাধক বসে। ভোলারামও আছেন। কিন্তু আবছা অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যায় না ভালো করে।

স্থির হয়ে বসার খানিকক্ষণের মধ্যেই শান্ত মন যেন নিজেই কোন অতল গভীরে ডুব দিল। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি, আশ্চর্য প্রশান্তি। নিঃশব্দ চরণে কেউ এসে বসছে, কেউ বা উঠে যাচ্ছে, শংকরনাথের তাও খেয়াল থাকল না। সমপর্ণের এক নতুন জোয়ারে বিভোর তিনি।

কতক্ষণ কেটেছে জানেন না। একঘণ্টাও হতে পারে, দু'তিন ঘণ্টাও হতে পারে।

খুব কাছ থেকে একটা বড় নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসতে আস্তে চোখ মেলে তাকালেন।

তার পরেই রোমে রোমে শিহরণ।

মাত্র দু'হাত দূরে দুটো জ্বলন্ত চোখ তার মুখের ওপর স্থিরনিবদ্ধ।

বাঘিনীর চোখ? শংকরনাথ শিউরে উঠলেন না, রমণীর চোখ। কখন এসেছে, কখন বসেছে একটুও টের পান নি। রমণীর সমস্ত দেহ নিশ্চল পাথর, চোখ দুটিই জ্বলছে শুধু। সহস্রমুণ্ডীর আসনে আর একটিও লোক নেই। এমন কি ভোলারামও নেই।

শংকরনাথের সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ, অবশ।

—তারা! তারা!

আসনের নীচে অদূরের একটা গাছতলা থেকে ভোলারামের জলদ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। আর সেই মুহূর্তেই যেন চমক ভাঙল শংকরনাথের। দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল একটা।

বসা থেকে সোজা উঠে দাঁড়ালেন শংকরনাথ। তারপর অন্ধকারে দ্রুত পদক্ষেপে নেমে এসে রাস্তার দিকে চললেন উর্ধ্বশ্বাসে। তিনি যেন পথ হারিয়েছিলেন, তারা নামের একটি চকিত আলোকে সেই পথ আবার দেখেছেন। এ সুযোগ হারালে নিজেই বুঝি চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবেন।

পরদিন

দুপুরে শ্মশানের দিক ছেড়ে দূরে নদীর ধারে ধারে হাঁটছিলেন শংকরনাথ এদিকটায় আলুর ক্ষেত আর আখের ক্ষেত। চাষীরা আল তুলছে, আখ ঝাড়ছে ক্ষেতগুলোর ও ধারে নদী। সেই নির্জন দিকটা ধরেই চলেছেন শংকরনাথ। সকাল থেকে চেষ্টা করতে করতে নিজের শক্তি আর সংকল্প সংহত করতে পেরেছেন মনে হয়।

কিন্তু এখানেও যে একটা বড় রকমের যোগাযোগ অপেক্ষা করছিল তার জন্য, এ কি কল্পনা করতে পেরেছেন!

সামনেই একটা ছোট অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে ভৈরবী বসে পাশে ত্রিশূলটা পড়ে আছে। সামনে ছোট বড় দু'টো মাটির ভাঁড়।

তার আগেই ভৈরবী তাকে দেখেছে। চোখে চোখ পড়তে সামান্য নড়ে চড়ে সোজা হয়ে আসন পিঁড়ি হয়ে বসল। আর অপলক চোখে চেয়েই রইল।

শংকরনাথও দাঁড়িয়ে গেছেন। মুহূর্তে একবার মনে হল ছুটে পালিয়ে যান, কিন্তু ওই দুটো চোখই যেন আটকে রাখল তাকে। সেই সঙ্গে একটা গোঁ ও চাপতে লাগল মাথায়। পালাবেন কেন? এই দিনমানে ওই রমণী তার কি করবে? পালাতে চেয়েছেন বলেই তাঁর ভয় বেড়েছে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে।

ভৈরবী চুপচাপ আরো খানিক চেয়ে থেকে একটা আঙুল তুলে কাছে ডাকল তাকে।

শংকরনাথ এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।

বোসো। ভৈরবী ঠাণ্ডা, গম্ভীর। চাউনিটা গভীর কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়।

হাততিনেক ফারাকে শংকরনাথ মাটির ওপরেই বসলেন।

মাটির ভাঁড়টা দেখিয়ে ভৈরবী জিজ্ঞাসা করল, চলবে?

—কি ওতে?

—কারণ।

শংকরনাথ মাথা নাড়লেন। চলবে না।

রমণীর ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য বিদ্রূপের রেখা পড়ল কিনা বোঝা গেল না। হাত বাড়িয়ে ছোট ভাড়টা তুলে নিল। ভাড়ের তরল পদার্থ আলতো করে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল। ঢোক গিলে সেটুকু উদরস্থ করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে যেন ঝংকার উঠল একটা। চোখ মুখ কুচকে সেই ঝংকারটুকু শেষ হতে দিল। রমণী-অঙ্গের সুপ্ত যৌবন যেন এক-প্রস্থ নাড়াচাড়া খেয়ে স্থির আবার।

—কাল রাতে আসন ছেড়ে ও-ভাবে পালিয়ে গেলে কেন?

ঠাণ্ডা মাথায় শংকরনাথ এবার পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি আমাকে সেই থেকে এ-ভাবে ভয় দেখাচ্ছ কেন?

গম্ভীর মুখে খুব সূক্ষ্ম হাসির আঁচড় পড়ল একটু। পুরুষকে যেন ওই দুটো চোখের আওতায় বেঁধে রেখেছে সে।

—তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?

—আমি কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, তাতে বিঘ্ন ঘটছে, তাই।

—কি উদ্দেশ্য?

শংকরনাথ নিরুত্তর।

জবাব না পেয়ে অপলক চোখ দুটো এবার তার মুখের ওপর পাক খেল একপ্রস্থ। —কি বিঘ্ন ঘটছে?

শংকরনাথ এবারও জবাব দিলেন না।

ছোট ভাড় আবার তুলে নিল। গলায় ঢালল। আবারও তেমনি ঝংকার উঠল একপ্রস্থ।

—তোমার বয়েস কতো?

শংকরনাথ এবারে জবাব দিলেন —পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে।

সত্যি কি মিথ্যে যাচাই করার জন্যেই যেন গম্ভীর দুই চোখ তার দেহের ওপর ওঠা নামা করল একপ্রস্থ।

—আমার সাতচল্লিশ ছাড়িয়েছে। এবারে তোমার ভয় কমল একটু?

গম্ভীর চোখে কৌতুকের ছটা। শংকরনাথ বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না যেন। বিশ্বাস করা আরো কঠিন, কারণ ছোট ভাড়টা আবারও গলায় উপুড় হয়ে শূন্য হয়ে গেল, সর্বাঙ্গে আবারও ঝংকার উঠল একটু। বয়েস যা-ই হোক, ভয় তার বাড়ল বই কমল না।

—থাকা হয় কোথায়?

ভিন্ন প্রশ্ন। ভিন্ন সুর

—কলকাতায়।

—বাড়িতে কে আছে?

—স্ত্রী, দুটি মেয়ে, এক ছেলে। সত্যি জবাবগুলো যেন আপনি এসে যাচ্ছে।

—অসুখ কার? ছেলের বোধহয়?

বিষম চমকে উঠলেন শংকরনাথ। কে এ? ডাকিনী? যোগিনী? ছেলের অসুখের কথা তিনি তো ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ করেন নি!

মাথা নাড়লেন। তাই।

—কি হয়েছে?

বললেন। কি এক অনুভূতিব আবেগে অকপটেই বললেন সব।

ভৈরবী স্থির বসে শুনল। নির্বাক, নিশ্চল তাবপর। তার দিকেই চেয়ে আছে। কিন্তু চাউনিটা হঠাৎ যেন অনেক দূরে সবে গেছে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, রক্ত চাই, তাজা বক্ত—মানত-টানত কবে বসো নি তো কিছু?

দুর্বোধ্য ঠেকল। জবাব দিলেন না।

—আমি করেছিলাম। আমার একটাই মেয়েব রক্তে কি-যেন হয়ে যেত, ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। আমি নিজের বুকের রক্ত মানত করেছিলাম। এই প্রথম স্পষ্টভাবেই হেসে উঠল ভৈরবী।—সে আজ অনেক কালের কথা, মানত রক্ষা হল না—অনেক পরে খবর পেয়েছি, সেই কবেই সব শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু রক্তের লোভে ও-বেটির জিভ এখনো লকলক করছে, ওকে দেখাচ্ছি মজা আমি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে এবার বড ভাড়টা মাটি থেকে ছিনিয়ে নিল যেন। অনেকটাই গলায় ঢেলে দিল। কিন্তু এবারে আর সে-রকম ঝংকার উঠল না।

শংকরনাথ স্তব্ধ হঠাৎ।

ভাঁড়টা নামিয়ে রাখল। হাতের উল্টোদিকে মুখ মুছতে মুছতে ভৈরবী তাকালো তাঁর দিকে। মুহূর্তের মধ্যেই চাউনি বদলে গেছে। দু'চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছে। চাপা গর্জন করে উঠল, দূর হও। দূর হও এখান থেকে! দূর হয়ে যাও!

হতভম্ব বিমূঢ় মুখে শংকরনাথ উঠে এলেন। বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত যেন।

মাঠের মাঝখান দিয়ে আসতে আসতে সংবিৎ ফিরল। অদূরে মাঠেব মধ্যেই ভোলারাম দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেছেন বোধহয়।

কাছে আসতে হেসে বললেন, ভৈরবী তো দিনের বেলাতেই কারণে জমতে শুরু করেছেন দেখলাম, তার সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?

শংকরনাথ জবাব দিয়ে উঠতে পারলেন না। তখনো ঘোর কাটে নি যেন।

ভোলারাম তাঁর সঙ্গ ধরে চলতে চলতে আবার বললেন, কাল রাতে ওকে আপনার কাছে দেখে একটা কথা মনে হল, কিছু মনে করবেন না—ওই ঠাকরোনটিকে একটু এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবেন, উনি এ-পর্যন্ত অনেকের অনেক কাজ আর সংকল্প পণ্ড করে দিয়েছেন শুনেছি।

এবারে শংকরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, উনি কোথা থেকে এসেছেন? নিজের মেয়ের রক্তের অসুখের কথা, রক্ত মানত করার কথা-টথা কি যেন বলছিলেন—

ভোলারাম মাথা নেড়ে সায় দিলেন। সেটা অবশ্য দুঃখের কথা। একটিমাত্র মেয়ের

দুরারোগ্য অসুখের জন্যেই কোন পীঠস্থানে ছুটে গেছল শুনেছি। সেখানে এক দুর্দান্ত তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে তার সর্বনাশ হয়ে গেল। সেই তান্ত্রিক তাকে মোহগ্রস্থ করে রেখেছিল। তারই ভৈরবী হয়ে ছিল অনেক বছর। পরে পালিয়ে এসেছে। সেই থেকে এই আক্রোশ তার, বিশেষ করে পুরুষের ওপর—পীঠস্থানের কোনো পুরুষ ভক্ত বা সাধক বা তেমন কারো ওপর একবার যদি শোধ নেবার সঙ্কল্প জাগে ওর, তাহলে তার আর সহজে অব্যাহতি নেই।

সেই রাতে কেন যেন আর ঘর ছেড়েই বেরুতে পারলেন না শংকরনাথ। মন্দিরেও গেলেন না, সহস্রমুণ্ডীর আসনের দিকেও না।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ ঘর বন্ধ করে রাস্তায় এলেন। মন্দিরে যাবার ইচ্ছে হল, কিন্তু রাস্তার লোকজনের মুখে কি রকম একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করলেন তিনি। দু'জন পাঁচজন করে একত্র হয়ে কি বলাবলি করছে, অনেকে হনহন করে আবার সহস্রমুণ্ডীর চাতালের দিকে সার বেঁধে চলেছে।

তেমনি একটা জটলার সামনে এসে ভৈরবীর নামটা কানে আসতে শংকরনাথ দাঁড়িয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

যা শুনলেন, একেবারে স্তব্ধ তিনি।

শুনলেন, এখানকার এক ভৈরবী নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে সহস্রমুণ্ডীর আসনে পড়েছিল। খানিক আগে একটা গাড়ি যোগাড় করে তাকে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—সহস্রমুণ্ডীর বাঁধানো বেদী এখনো রক্তে ভাসছে। জখম গুরুতর।

একটা তাড়া খেয়েই যেন শংকরনাথও সহস্রমুণ্ডীর দিকে দ্রুত চললেন।

চত্বরের সামনে বহু লোক। কারো মুখে কথা নেই বিশেষ। সকলের জোড়া জোড়া চোখ সহস্রমুণ্ডীর বিশাল বেদীটার ওপর।

শংকরনাথও পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সেখানে। বেদীর ওপর রক্তের ধারা শুকোয় নি এখনো

খানিক দূরে একটা ঝিরিঝিরি গাছের তলায় ভোলারাম দাঁড়িয়ে। তার দিকে চোখ পড়তে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

কাছে এসে দাঁড়াতে চাপা বিস্ময়ে ভোলারাম জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ছেলের কঠিন কিছু অসুখ নাকি মশাই?

শংকরনাথ চমকে উঠলেন—হ্যাঁ, কেন?

ভোলারাম বললেন, খুব ভোরে এসে দেখি ভৈরবী ওখানে পড়ে আছে, বুকে একটা ধারালো ছোরা বেঁধা, সমস্ত চাতাল রক্তে ভাসছে। কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। আমাকে দেখে বলল, অনেক রক্ত দেওয়া হয়েছে, কলকাতার বাবুকে বোলো তার ছেলে ভালো হয়ে যাবে।

শংকরনাথের শরীরের রক্ত যেন সিরসির করে পা বেয়ে নেমে আসছে।

একসময় খেয়াল হতে দেখেন মন্দিরের সেই প্রশস্ত সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

উঠতে লাগলেন। সিংহদ্বার পেরোলে বিশাল বাঁধানো চত্বর।

নাটমন্দিরের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। মায়ের মন্দিরে উঠে দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

সোনার পাতে মোড়া এলোকেশী প্রস্তরাসনে সমাসীনা। মা তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন, আর সেই হাসিতে এক অদ্ভুত স্নেহ গলে গলে পড়ছে।

কিন্তু বার বার চোখে ঝাপসা দেখছেন শংকরনাথ।

মায়ের মুখের সঙ্গে ভৈরবীর মুখখানা বার বার মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

পিক পয়েন্ট

ছোট গল্প প্রসঙ্গে এক বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ লেখকের মন্তব্য মনে পড়ল। তিনি বলতেন, বীজ হিসেবে যে কোনো একটা সত্যি ঘটনা নাও। তার আসল রং কিছু বাতিল করে কিছু নকল রঙ চড়াও। ঘটনার কিছুটা ব্যক্ত করো, কিছুটা অনুক্ত রাখো। যেটুকু অনুক্ত রাখলে পাঠক সেটুকু ধরার জন্য যেন হাসফাস করে। সেটাই ছোট গল্পের পিক পয়েন্ট।

আজ নিজের অভিজ্ঞতায় সবিনয়ে আমি তাকে বলতে পারি, নিছক সত্যও গল্পের থেকে অভিনব অনেক সময়। তার পিক পয়েন্টে আরোহণের জন্য নকল রঙ চড়ানো বা ঘটনার কিছু অনুক্ত রাখা নিষ্প্রয়োজন। ঘটনা যদি জীবনের হয় তো তার তাপটুকুই আসল লভ্য বস্তু।

এ-ক্ষেত্রে অবশ্য তাপ না বলে পরিতাপও বলা যেতে পারে।

ঘটনাটা শুনেছিলাম এক নামী অ্যাডভোকেট বন্ধুর মুখে। সে-ও কোনো রকম প্রস্তুতি নিয়ে শুনি নি। ছুটির দিনের বেশি বেলায় তার ফাকা দপ্তরে বসে গল্প করছিলাম। গেটের সামনে প্রকাণ্ড একটা ঝকঝকে গাড়ি এসে থামল। যে ভদ্রলোক নামলেন ওই গাড়িতে তাকে অন্তত মানায় না। পায়ে চটি, পরনে মোটা তাতের ফরসা ধুতি, গায়ে আর-ময়লা সিল্কের ফতুয়া, মাথায় কদমছাট চুল। দেখলে মনে হবে কোনো অবস্থাপন্ন ক্লায়েন্টের বয়স্ক এবং এক কালের শৌখিন মুহুরী প্রয়োজনে মালিকের গাড়ি নিয়ে এসেছেন।

কিন্তু অ্যাডভোকেট বন্ধুর মার্জিত ব্যস্ততা এবং অভ্যর্থনা দেখে মনে হল গাড়ির মালিক ইনিই হবেন। বসা থেকে উঠে দাড়িয়ে হাসি মুখে বন্ধু দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকালো—আসুন বীরেশ্বরবাবু আসুন, এত বেলায় সশরীরে নিজে চলে এলেন, একটা টেলিফোন করলেই তো হত। বসুন, বসুন—

অতএব আমিও ভাল করে লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোককে। বয়েস ষাটের কিছু নিচে হবে। উঁচু লম্বা সৌম্যকান্তি। কিন্তু বিষণ্ণ বদন।

ধীরেসুস্থে বসলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখলেন একপলক। আমি বসে

থাকব কি পাশের ঘরে উঠে যাব ঠিক করতে না পেরে বন্ধুর দিকে তাকালাম। বন্ধু সামান্য মাথা নাড়ল, অর্থাৎ ওঠার দরকার নেই জানাল, তারপর ভদ্রলোকের দিকে ফিরে বলল, আপনার সব কিছু রেডি, পার্টি সাড়ে তিন লাখ টাকাই হোয়াইট দিতে রাজি হয়েছে—আজ রবিবার, সামনের বুধবার সব লেন-দেন হয়ে যাবে, আপনি সেদিন ঠিক এগারোটায় রেজিস্ট্রি অফিসে আসুন, আমি তার আগেই ক্লায়েন্ট নিয়ে উপস্থিত থাকব।

জবাবে ভদ্রলোক সামান্য মাথা নাড়লেন। বন্ধু ড্রাফট এগ্রিমেন্টের ফাইলটা তার সামনে এগিয়ে দিল। কিন্তু উনি সেটা স্পর্শও করলেন না। অন্যমনস্কের মতো দুই এক মিনিট বসে থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন আস্তে আস্তে। একটু হাসতে চেষ্টা করে বললেন, আচ্ছা চলি, বুধবারে ঠিক সময়ে দেখা হবে।

বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল তাকে।

আমার ভিতরটা উৎসুক হয়ে উঠেছে, কারণ এই কালো বাজার আর কালো দিনেও ভদ্রলোক সাদা টাকা চান। সেও দু'দশ হাজার নয়, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

বন্ধু ফিরে আসতে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

—আর বল কেন, জলের দরে একটা সোনার খনি বিকিয়ে গেল, টাকা থাকলে নিজেই কিনে নিতাম।

—খনিটা কি?

—বার অ্যাণ্ড রেস্তোরা।

পান-ভোজের যে জমজমাট কেন্দ্রটির নাম শোনালো বন্ধু, বে-রসিক হলেও সেই নাম আমার অপরিচিত নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে না হতে হালফ্যাশানের সেই সুরালয়ের সামনে সার বেঁধে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে দেখেছি।

—এই ভদ্রলোক তার মালিক?

—হ্যা। বুধবার থেকে মালিকানা বদলে যাচ্ছে।—মাস গেলে ওই থেকে কম করে হাজার দশেক টাকা রোজগার ছিল ভদ্রলোকের।

—বেচে দিচ্ছেন কেন?

মুচকি হেসে বন্ধু জবাব দিল, সেটাই গল্প।

সংজ্ঞা অনুযায়ী গল্প হবে কিনা জানি না। ঘটনার অভিনব নজিরটুকুই শুধু তুলে ধরব।

বীরেশ্বর গাঙ্গুলি অনেকটা নিজের চেষ্টা আর পুরুষকারের জোরে সামান্য থেকে বড় অবস্থার দিকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তার সূচনা করে দিয়ে গেছলেন তার বাবা। মাঝবয়সে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা গাজা আর তাড়ির দোকানের লাইসেন্স যোগাড় করেছিলেন। কিন্তু ভালরকম সুখের মুখ দেখার আগেই তিনি চোখ বোজেন। বীরেশ্বর গাঙ্গুলি সে বছর আই-এসসি পাস করে বি-এসসিতে ভর্তি হয়েছেন। লেখা-পড়া সিকেয় তুলে দোকান চালানোর দায়িত্ব নিলেন তিনি। তার দৃষ্টি স্বচ্ছ, পয়সা রোজগারের সঙ্গে সঙ্গে চোখ কান খোলা রেখে ব্যবসার মোড় ঘোরাবার উদ্যমে লেগে গেলেন। সে উদ্যম সফল হল। গাঁজা আর তাড়ির দোকানের রূপান্তর ঘটল বিলিতি

আর দেশীয় অভিজাত সুরা বিপণীতে। সাদা কথা, ভাল মদের দোকান করে বসলেন একটা। নীচু শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘুচে গিয়ে উঁচু মহলের সংস্রবে এলেন।

টাকা আসতে লাগল। নিজের বাড়ি হল, গাডি হল। কিন্তু ব্যবসার চোখ কান সটান খোলা তখনো। অবসর সময়ে নামকরা বারগুলোয় ঘোরাফেরা, আবার নতুন রাস্তায় পাড়ি দেবার সঙ্কল্প আঁটলেন। বড়সড় একটা বার আব রেস্তোরাঁ জাঁকিয়ে তুলতে পারলে দোকানের দ্বিগুণ তিনগুণ লাভ। হাতে তখন অনেক টাকা—ঠিক ঠিক টোপ ফেলতে পারলে লাইসেন্স পেতে কতক্ষণ?

লাইসেন্স পেলেন। মধ্য কলকাতাব এক জমজমাট জায়গাতেই হালফ্যাশনের পান-ভোজনালয়ের পত্তন ঘটল। কমলা সুপ্রসন্ন। বছব তিনেকেব মধ্যে আর মদের দোকান বাখাব প্রয়োজন অনুভব করলেন না তিনি। মদেব দোকান বেচে দিয়ে পান-ভোজনালযের দিকেই লক্ষ্য স্থিব করলেন।

কমলার বিত্তবর্ষণ বাডতেই থাকল।

মানুষটা ভিতরে ভিতরে ব্যাধ উপনিষদেব ভক্ত ছিলেন হয়ত। নির্লিপ্ত চিত্তে মাংস কাটছেন, ভিতরেব ঋষিটি আত্মার বাণীতে সমাহিত। বীরেশ্বব গাঙ্গুলিও কর্মযোগে সেই গোছেবই একাগ্র, কিন্তু নির্লিপ্ত। এযাবৎ সুবা বস্তুটি কখনো ঠোঁটে ঠেকিযে দেখেন নি কি বকম খেতে। কর্মযোগেব ফলটুকু শুধু ব্যাঙ্কে জমা করেছেন আব বিষয়ে রূপান্তরিত করে চলেছেন।

বিয়ে করেছেন তিবিশ বছর বয়সে। সুরা বিপণী থেকে সুরালয়ে পা বাড়াবাব আগে। শিক্ষিতা মেয়ের প্রতি একটু ঝোঁক ছিল। বিয়ে আগেই হতে পারত। কিন্তু তাঁব বিত্তেব উৎস জানাব পর গোটাকযেক পছন্দসই শিক্ষিতা মেয়েব বাপ সরে গেছেন। কিন্তু টাকা থাকলে শিক্ষিতা মেয়ে জুটবেই এমন কোনো কথা নেই। সুনয়নীর বিয়ে দিযেছেন তাঁর মামাবা। ভাগ্নি সে বছব ইকনমিক্স-এ ভালো অর্নাস পেয়ে বি-এ পাস করেছেন। মেয়েও সুশ্রীই। কিন্তু বিয়ের বাজারে অনার্স আর শ্রী'ব জোরটুকুই যে সব নয় সে অভিজ্ঞতা মামাদের হযেছে। মামারা বীরেশ্বর গাঙ্গুলিব বিত্ত আর বিষয দেখেছেন, মোটামুটি খোজখবব নিযে জেনেছেন, স্বভাব-চবিত্রের অপবাদ নেই—তাবপর খুশি মনে নিখবচায় ভাগ্নিব বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

সুনয়নী দেবী গোড়ায় গোড়ায় বেশ সন্দেহের চোখে দেখেছেন স্বামীটিকে। সন্দেহ নিবসনের পরেও স্বামীর পেশাটিকে সুনজবে দেখেন নি। বিয়ের পরেও পড়াশুনা ছাড়েন নি তিনি। যথাসময়ে এম-এ পাসও ভালোভাবেই করেছেন। তার আগে মাসে সাড়ে তিন'শ টাকা মাইনে দিয়ে তাঁকে বাড়িতে পড়ানোর জন্য প্রোফেসর রেখে দিয়েছিলেন বীরেশ্বর গাঙ্গুলি। তার জন্য কৃতজ্ঞতার কোনো প্রশ্ন নেই। টাকা আছে বলেই দায়িত্ব পালন করা হয়েছে—এর বেশি কিছু নয়।

যত টাকাই থাক, ঘরে ভালো খেয়েদেয়ে আর আরামে ঘুমিয়ে মুটিয়ে যেতে আপত্তি সুনয়নী দেবীর। অতএব কলেজের চাকরিতে ঢুকেছিলেন তিনি। এখন তিনি রাশভারী অধ্যাপিকা সেই কলেজের। নিজের বিশাল গাড়িতে যাতায়াত করেন।

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর সহ অধ্যাপিকারা ঈর্ষার চোখে দেখেন তাঁকে! কিন্তু সুনয়নী দেবীর ধারণা, আড়ালে তাঁরা বিত্তের উৎস নিয়ে অর্থাৎ স্বামীর সুরালয়ের ব্যবসা নিয়ে আড়ালে-আবডালে টীকা-টিপ্পনী কেটে থাকেন।

বীরেশ্বর গাঙ্গুলি লক্ষ্য করেছেন, স্ত্রীটির তাঁর টাকা বাড়ি গাড়ি সবই পছন্দ—শুধু ওই ব্যবসাটি ছাড়া। ব্যবসা সম্পর্কে স্ত্রী শুধু নিরুৎসক নয়, ভিতরে ভিতরে বীতস্পৃহ বলেই ধারণা তাঁর।

পর পর তিনটি মেয়ে তাঁর। ছেলে নেই। বড় মেয়ে অমিতা এম-এ পড়ে। মেজো সুমিতা বি-এ পড়ে। আর ছোট মেয়ে নমিতা এবারে স্কুল ফাইন্যাল দেবে। মেজো আর ছোট মেয়ের মনোভাব ঠিক বোঝা যায় না, বড় মেযে অমিতাবও যে বাপের ব্যবসাটি খুব পছন্দ নয়, বীরেশ্বর গাঙ্গুলি সেটুকু অনুভব করতে পারেন। অথচ মেয়ে তিনটে তাঁর যেন বুকের হাড় তিনখানা। একটা ছেলের বাসনা ছিল। সেটা টের পেয়ে স্ত্রী নির্লিপ্ত মন্তব্য করেছেন, ছেলে নেই, ভালোই হয়েছে। বড় হয়ে সে তো তোমার ওই ব্যবসাই দেখত, স্বভাব-চরিত্র মতি-গতি কেমন হত কে জানে! সুখের থেকে সোয়াস্তি ভালো।

শুনে বীরেশ্বর গাঙ্গুলি মনে মনে আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে সেটা ব্যক্ত করেন নি।

প্রচ্ছন্ন আঘাত আরো পেয়েছেন। বড় মেয়ে অমিতার একটা ছেলের সঙ্গে গোপনে মেলা-মেশা ধরা পড়েছে। সুনয়নী একাধিক দিন নিজের চোখে দেখেছেন। তাঁর মাথায় আগুন জ্বলেছে। মেয়েরা বিষম ভয় করে তাদের রাশভারী মা-টিকে। অমিতা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ছেলেটা খুব ভালো ছেলে—গেলবারে খুব ভালো ভাবে এম-এ পাস করেছে। বলেছে, এর মধ্যে তো ইয়ে কিছু নেই—

কিন্তু কার কথা কে শোনে! মেয়েকে আচ্ছা করে ধমকেছেন সুনয়নী দেবী। অভিমানে মেয়ে নিজের কানে হাত দিয়ে বলেছে, ওই ছেলের সঙ্গে আর মিশবে না, মা নিশ্চিন্ত থাকুক। মা তাতেও ঠাণ্ডা হতে পাবেন নি। নির্বিলিক স্বামিটিকে দু'কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, কোন লোকের মেয়ে দেখতে হবে তো, এ বকম মতি-গতি হবে সে আর বেশি কি!

অভিযোগ শুনে ভদ্রলোক বিমূঢ়।

এরপর ঘটনাটা ঘটল বড় মেয়ে অমিতার বিয়ের সমস্যা নিয়েই। সুনয়নী মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আর তিনি ঘরে মেয়ে পুষতে রাজি নন। তাঁর গুরুগম্ভীর তাগিদের চোটে চোখে অন্ধকার দেখলেন বীরেশ্বর গাঙ্গুলি। তাঁর দ্বারা যেটুকু সম্ভব তাই করলেন। সমস্ত বড় কাগজে বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিলেন। বিজ্ঞাপনের ভাষায় লোভনীয় কিছু চটক ছিল, যার ফলে গাদা গাদা চিঠি আসতে লাগল। এত চিঠি থেকে যাচাই বাছাই করে সম্ভাব্য পাত্র বার করা এক দুরূহ ব্যাপার। তবু ঠাণ্ডা মাথায় সেই কাজটি করলেন সুনয়নী দেবী। কার ওপর নির্ভর করবেন?

এই ছাঁটাই বাছাই বীরেশ্বর গাঙ্গুলির খুব মনঃপূত হল না। কারণ স্ত্রীটি ব্যবসায়ী ছেলে মাত্রই বাতিল করে দিলেন। সব কটাই চাকুরে ছেলে বাছাই করলেন তিনি।

বড় চাকুরে অবশ্য, কেউ আই-এ-এস, কেউ আই-পি-এস। কিন্তু চাকুরে পাত্রের ওপর খুব একটা মোহ নেই বীরেশ্বর গাঙ্গুলির। যত বড় চাকরিই হোক, কত আর মাইনে?

এর মধ্যে একটা ছেলে তবু মন্দের ভালো। বিলেত-ফেরত এনজিনিয়ার। হাজার দুই টাকার মাইনের চাকরি। লিখেছে আনুকূল্য পেলে স্বাধীন ব্যবসা করার ইচ্ছে। সুনয়নী দেবীর এইটুকুই খারাপ লেগেছে। আর বীরেশ্বর গাঙ্গুলির এইটুকুই ভালো লেগেছে। তিনি ভাবছেন, এখানে বিয়ে হলে পরে না হয় লাখ দু'লাখ দিয়ে জামাইকে ব্যবসায়ে নামিয়ে দেবেন।

বরাতজোরে এই ছেলেটিকেই পছন্দ হয়ে গেল সব কটির মধ্যে। যেমন স্মার্ট তেমনি সুপুরুষ। বিলেতে বছর চারেক কাটিয়ে এসেছে। সেখানেও মোটা মাইনের চাকরি করত। তাই এখানকার চাকরিতে মন ওঠে নি।

মেয়ে দেখাদেখি এবং কথাবার্তা এগোতে থাকল। লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হয়ে আসতে লাগল। ছেলেটার চেহারা আচরণ কথাবার্তা যত ভাবছেন ততো বেশি ভালো লাগছে সুনয়নী দেবীর। যেটুকু খবর সংগ্রহ করা গেছে তাও ভালোই। লোকে জামাই দেখে প্রশংসা করবে। না, তার আপত্তি নেই। খবর পেয়েছেন, ছেলের পক্ষই নাকি মেয়ের বাপের কি ব্যবসা শোনার পর একটু খুঁতখুত করেছে। সেটা খুবই স্বাভাবিক ভেবেছেন সুনয়নী দেবী। যত ভালোই হোক, মদের দোকানের কোনো মালিকের ছেলের সঙ্গে তিনি কি মেয়ের বিয়ে দিতেন? সেদিক থেকে ছেলে খুবই উদার বলতে হবে। ছেলে দু'কথায় তার বাবা-মায়ের খুঁতখুঁতুনি নস্যাৎ করে দিয়েছে, ব্যবসা করেন বলেই যে ভদ্রলোক নিজেও মদ গেলেন তোমাদের কে বলেছে?

এ-পর্যায়ে আসার পর বীরেশ্বর গাঙ্গুলির চিন্তাস্রোত জটিল খাতে বইতে লাগল। মেয়েরা তাঁর চোখের মণি, বিশেষ করে বড় মেয়ে তো সব থেকে আদরের। চিন্তা ভাবনা স্বাভাবিক। ছেলেটা কেমন, তার ভিতরের চরিত্রই বা কি—তার কতটুকু জানতে পেরেছেন তিনি? এই এক ব্যবসায়ে নামার পর মানব-চরিত্র বিশেষ করে তরুণ চরিত্রের ওঠা-পড়া তিনি যেমন দেখেছেন তেমন আর কে দেখেছে?

রোজ সন্ধ্যা হতে না হতে যারা তার বার-এ ভিড় করে আসে তাদের বেশির ভাগই তরুণ, অর্থাৎ বাইশের থেকে পঁযতিরিশের মধ্যে বয়েস। অনেক চেনা মুখ ভালো ছেলের অধঃপতন দেখেছে তার এই দুটো চোখ। তখন তিনি নিস্পৃহ। কিন্তু এখন আর অতটা নিস্পৃহ হতে পারছেন না। এক একটি অতি শিক্ষিত ভদ্র ছেলে বার-এ এসে ওই তরল বস্তু অঢেল জঠরে চালান করার পর যে মূর্তি ধরে তাও অতি নিস্পৃহ চোখে দেখে অভ্যস্ত তিনি। তাঁর বার-এ ভাবী জামাইয়ের মুখখানা কখনো দেখেছেন কিনা আঁতিপাঁতি করে মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি। ঠিক মনে পড়ল না। কিন্তু ওইরকম স্মার্ট ছেলে হামেশাই আসে—এই মিলটুকুই তাঁকে আচ্ছন্ন করছে, চিন্তিত করে তুলেছে। দেখেছেন কখনো? দেখেন নি? দেখেছেন?

এই চিন্তাই ক্রমশ পেয়ে বসতে লাগল। জানা দরকার, খুব ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার, যে দিনকাল, আর ছেলেছোকরাদের যা মতিগতি—মেয়েটা শেষে চিরকাল চোখের জল ফেলবে?

এর ওপর কাগজে সেদিন আবার একটা খবর পড়ে দুশ্চিন্তা চতুর্গুণ পেয়ে বসল মাথায়। হিসেব করে দেখা গেছে আধুনিক কালের শতকরা সত্তরটি উচ্চশিক্ষিত অবস্থাপন্ন ছেলে সুরাসক্ত। শতকরা সত্তর! না, খুব অবিশ্বাস করেন না বীরেশ্বর গাঙ্গুলি। অসম্ভব নয়, তাঁর ওখানেই তো লাইন করে খদ্দের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে এখন। ভিড় বাড়ছেই। শতকরা সত্তর জন হলে সুরাসক্ত নয় কে সেটা বাছাই শক্ত। ও-দিকে ভাবী জামাইটিও উচ্চশিক্ষিত, আব দু'হাজার টাকা মাইনে যখন অবস্থাপন্নও বটে। ওই ছেলেও ভিতরে ভিতরে কি, সেটা জানা যাচ্ছে কি করে? নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিশ্চিন্ত হবেন কি করে?

চিন্তায় চিন্তায় রাতের ঘুম গেল বীরেশ্বর গাঙ্গুলির।

ভেবেচিন্তে যাচাইয়ের একটা পথ বার করলেন তিনি। এতকাল ব্যবসা করার পব সুরাসক্তদের রীতিনীতি কিছুটা জানা আছে তাঁর। যে যার কাজের এলাকাব বার অথবা বাড়ির কাছাকাছির (খুব কাছাকাছির নয় তা বলে) বার-এ হানা দিয়ে থাকে। এবং যে যেখানে অভ্যস্ত, সাধারণত সে সেখানেই গিয়ে থাকে।

অতএব পছন্দমতো দুটো বার-এর নাম বাছাই করলেন তিনি। একটা ছেলের আপিস এলাকায়, আর একটা তার বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে। দুটো বার-এ যদি দু'সপ্তাহে হানা দেন তিনি বিকেলের কয়েক ঘণ্টা করে তাহলেই বোঝা যাবে। সপ্তাহে দিন দুই অন্তত আসবে না এ-রকম পানাসক্তের সংখ্যা বিরল। তাদের তিনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেনও না।

প্রাণের অধিক আদরের মেয়ের জন্য এটুকু ধকল তাঁকে পোহাতেই হবে।

প্রথম ছেলের আপিস এলাকার বার-এ ঘণ্টা আডাই করে কাটালেন দিনছয়েক। বিকেল ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা। কোণের এক টেবিলে অল্প ড্রিংক আর কিছু খাবার নিয়ে বসেন। এমনিতে কে তাকে দু'আড়াই ঘণ্টা বসে থাকতে দেবে! সেখান থেকে শ্যেনদৃষ্টিতে খদ্দেরদের আসা-যাওয়া লক্ষ্য করেন। শেষে শুধু খাবারটুকু খেয়ে এবং গেলাসের জলীয় পদার্থ হাত ধোয়ার বউলে ঢেলে দিয়ে উঠে আসেন।

আধা-আধির বেশি নিশ্চিন্ত। কিন্তু গোটাগুটি নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এব পর সন্ধ্যার দিকে দিনছয়েক ছেলের বাডির এলাকার বাব-এ হানা দিলেন একই ভাবে। তারপব সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

তাবপর অনেক দিন আরামে ঘুমালেন বীরেশ্বব গাঙ্গুলি।

তার পরদিন সন্ধ্যায় সেই অঘটন!

ভদ্রলোক সেদিন খুশি মনে তাঁর নিজের ব্যবসা দেখছেন। বাড়িতে কি ঘটে গেল খবরও বাখেন না। হঠাৎ বাড়ি থেকে টেলিফোন। স্ত্রীর গলা। যেমন গম্ভীর তেমনি ঠাণ্ডা।—এক্ষুনি চলে এসো।

—কেন? কেন?

—এসে শুনো।

রিসিভার রাখার শব্দ। বীরেশ্বর গাঙ্গুলি অবাক। তারপরেই গাডি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বাডির দিকে ছুটলেন।

কঠিন মুখেই সুনয়নী দেবী তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলেন।

পাত্র এবং পাত্রী উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগ আছে এমন এক ভদ্রলোক মাঝখানে থেকে বিয়েটা পাকাপাকির দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। খানিক আগে এসে বিরস বদনে তিনি সুনয়নী দেবীকে জানিয়েছেন, পাত্রপক্ষ আজ তাঁকে ডেকে সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছেন, এ বিয়ে হবে না।

সুনয়নী দেবী আকাশ থেকে পড়েছেন।—কেন? কি হল হঠাৎ?

ভদ্রলোক সহজে বলতে চান নি কি হল। সুনয়নী দেবীর পীড়াপীড়িতে শেষে যে কথা বলেছেন তার সাবমর্ম, ছেলে আপিস থেকে বেরিয়ে তাদের সেখানকার এক বাব-এ স্বচক্ষে দু'দিন তার ভাবী শ্বশুরকে ঢুকতে দেখেছে, এবং আরো দু'দিন সেই বার-এর সামনে তাঁর গাড়ি দাঁড়ানো দেখেছে।

ওদিকে ছেলেব বাপের মাইল তিনেক করে হাঁটা অভ্যেস রোজ। তিনিও তিনদিন ভাবী বৈবাহিককে তাঁদের ওদিকের বারে ঢুকতে দেখেছেন, এবং আরো দু'দিন তাঁর গাড়িও দাঁড়ানো দেখেছেন। অতএব তাঁরা বুঝে নিয়েছেন, সুনাম খোয়ানোর ভয়ে মেয়ের বাপ নিজের বার ছেড়ে অন্য বার-এ নিয়মিত যাতায়াত করে থাকেন। বিয়ের পর ছেলে দেখবে তার শ্বশুর মদ খেয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, এটা চান না বলেই এ বিয়ে হবে না।

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে ঘাবড়েই গেলেন বীরেশ্বর গাঙ্গুলি।—কি হয়েছে?

সুনয়নীর দুই চোখে সাদা আগুন ঠিকরোচ্ছে। জবাব না দিয়ে চেয়ে রইলেন খানিক।

—ডাকলে কেন? কি হয়েছে বলো না?

—তুমি আজকাল অন্য বার-এ যাতায়াত করছ?

আচমকা আঘাত খেলেন যেন বীরেশ্বর গাঙ্গুলি।—তা —তার মানে— কোন বার-এ?

—অমিতার যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল সেই ছেলের আপিসের দিকের বার-এ, আব তার বাড়িব দিকেব বার-এ একদিন নয, কয়েকদিন তোমাকে সে-সব জায়গায় দেখা গেছে—ঠিক কিনা?

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে বীরেশ্বর গাঙ্গুলির।—না, মানে, আমি—

আগুনের ফুলকির মতো ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন সুনয়নী দেবী। তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে বলে উঠলেন, মানে টানে শুনতে চাওয়া হয়নি। তুমি গেছলে কিনা জানতে চাই। হ্যাঁ কি না— এক কথায় জবাব দাও।

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো—

শেষটুকু মুখেই থেকে গেল। জ্যা-মুক্ত শরের মতো সুনয়নী দেবী শোবার ঘরে ঢুকে গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এত জোরে যে বীরেশ্বর গাঙ্গুলির মনে হল কানের পর্দার ওপর মস্ত বোমা ফাটল একটা।

· বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে তিনি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

কনে

মস্ত বাড়িটার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা ফেটে পড়ছিল। শুধু এই বাড়িতে কেন, আশপাশের বাড়িগুলোতেও।

ওই বড় বাড়ির দোরগোড়ায় দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। তার পিছনে কোমরে রিভলবার গোঁজা সার্জেন্ট। সামনের ঝকঝকে বড় গাড়িটা ডি-এম অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের। পরের গাড়িটা তার অনুচর এবং বডি-গার্ডদের। যে দিন-কাল পড়েছে, যথেষ্ট সতর্কতা ভিন্ন সরকারী শাসনযন্ত্রের প্রধানরা নড়া-চড়া করতে পারেন না। অথচ আসল জায়গায় এসে কিনা ওই ডি-এম সকলকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে খোদ গোলমেলে লোকটার সঙ্গেই একেবারে অন্দরমহলে চলে গেল।

এই বাড়িটাকে কেন্দ্র করে একটা বড় রকমের অশান্তির কারণ ঘটে গেছে শহরে। এর মালিক সোমেন কত নামী লোক। নামী বলতে পয়সা-অলা পদস্থ কেউ নয়। স্থানীয় শত শত তরুণের কাছে সে নায়কসদৃশ একজন। বয়েস মাত্র একত্রিশ এখন। বাংলাদেশের নামজাদা ফুটবল আর হকি প্লেয়ার ছিল। শুধু এই এক লোকের জন্য কলকাতার অনেক বড় বড ক্লাবেব হোমরা-চোমরারা এসে মফঃস্বল শহরের বাড়িতে ধর্না দিত। খেলাব রাজ্যে এখনও সে একজন বিশিষ্ট পরামর্শদাতা।

কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এ পাস করেছিল। এখানকার ছাত্র, তাই এখানকার কলেজে মাস্টারিও পেয়েছিল। সেই সরকারী চাকরি পাকা হবার আগেই সেটা গেছল। তাব গায়ে কিছুটা রাজনীতির গন্ধ ছিল। চাকরি পাকা হবার আগে পুলিশের তৎপরতায় সেটা উৎকট হয়ে উঠল। চাকরি গেল। ফলে সোমেন কর প্রকাশ্যে এমন সব উক্তি করল আর এমন দলের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধল যে দু'দফায় প্রায় বছর দেড়েক জেল। ততদিনে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর সে বীতশ্রদ্ধ। আবার তার ঘোষণা শোনা গেল, এই সরকার অপদার্থ— যে যার নিজের বাগান করো, কেউ তোমাকে দেখবে না, কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না।

সেই থেকে নিজের বাগান করার দিকে মন দিয়েছে সোমেন কব। বাগান অর্থাৎ মস্ত পৈতৃক বাড়ির একতলাটায় টিউটোরিয়্যাল হোম বসিযেছে। কলেজের ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা। এটা ব্যবসা বটে, কিন্তু এ ব্যবসায় এতটুকু ফাকি ছিল না। তাই পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে টিউটোরিয়্যাল হোম জাঁকিয়ে উঠেছে।

এটাকে এখন ছোটখাট কলেজই বলা যেতে পারে একটা। তিন শিফট-এ কোচিং দেওয়া হয়। এখানকার এবং আশপাশ কলেজের নামী প্রোফেসাররা এখানকার শিক্ষক। এমন কি কলকাতা থেকে পর্যন্ত বে-সরকারী কলেজের কয়েকজন নামী প্রোফেসার ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে এখানে পড়াতে আসে।

প্রতি বছর য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষা হয়ে গেলে এই টিউটোরিয়্যাল হোমের ছেলেমেয়েদের ফল নিয়ে আলাদা করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেটাও দেখার মতোই, তাই ছাত্রছাত্রীদের ভিড় এখানে লেগেই আছে।

মাথা পিছু চল্লিশ টাকা হিসেবে মাস গেলে তিনশ' ষাটটি ছেলেমেয়ের কাছ

থেকে মাইনে সংগ্রহ হয় চোদ্দ হাজার চাবশ টাকা। সোমেন কর নিজেও সকাল-বিকেল তিন শিফটে এই ক্লাস নেন। প্রোফেসরদেব কারো পাঁচশ টাকার নীচে মাইনে নেই। সোমেন কর নিজে নেয় হাজার টাকা। তাব অর্ধেক নিজের গড়া ছেলেদের ক্লাবে ঢালে। তাই আগের মতই ছেলেদের প্রিয় সে। যাবতীয় খরচখরচা বাদ দিয়েও মাসে তার বাড়তি থাকে তিন হাজার টাকার মতো। সেটা সে ব্যাঙ্কে সরিয়ে রাখে। তার সুদও ছোঁয় না। তার পরিকল্পনা, একদিন ভাইদের অংশও কিনে নিয়ে আর বাড়িটাকে সংসার কবে তিনতলা তুলে সত্যিকাবের একটা খুব ছোট আকারের ভালো কলেজ করবে।

বাড়ির লাগোয়া এক পুরনো পুলিশ অফিসারের বাস। যে দিন-কাল, পুরনো আমলের পুলিস অফিসাবের চোখে কলেজেব ছাত্র মাত্রেই আধা-অপরাধী। সাহেবের এই কু-নজরেব খবব তার বাড়ির প্রহরাবত সিপাইবাও জানে। পাশেব বাড়ির সামনে ছেলেদেব জটলা দেখলে তারা মৃদু-গম্ভীব হুমকি ছাড়ে। সেদিন গালি-গালাজ কবে বসল। ফলে বচসা। ক্রুদ্ধ সেপাই দুটো কয়েকটা ছেলের পিঠে ডাণ্ডা হাঁকিয়ে বসল। হৈ-হৈ, চেঁচামিচি —ওপর থেকে পুলিশ অফিসাব নেমে এলো, এদিক থেকে সোমেন কর। সিপাইদের মিথ্যে অভিযোগ শুনে পুলিস অফিসারেব রক্তচক্ষু। থানায টেলিফোন কবে সে পুলিসেব গাড়ি আনালো, আব তাব নির্দেশে সোমেন কব আব গোটাকতক ছেলেকে গলা-ধাক্কা দিযে ভ্যানে তোলা হল।

লঘু ব্যাপাবটা যে এমন গুরু আকার নেবে পুলিশ অফিসাব ভদ্রলোক ভাবে নি। ছেলেদের ক্রুদ্ধ অসন্তোষে গোটা শহর সরগরম সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ। ছেলের দঙ্গল ডি-এম'এর কাছে অভিযোগ নিয়ে হাজির। গভীর মনোযোগে ডি-এম সব শুনে নিজে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিতে তারা সাময়িকভাবে ঠাণ্ডা।

প্রধান আসামী অর্থাৎ সোমেন করকে জামিনে খালাস দেওয়া হয়েছে। ডি-এম তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। বলাবাহুল্য তাব সবটাই আসামীব অনুকূলে। ডি-এম সেটাই আশা করেছিল। এই দিন সকালে নিজেই ঘটনাস্থলে এসে হাজির।

এই ডি-এম সম্পর্কেও শহবের সর্বজনের কৌতূহল এবং আগ্রহ। তার সব কারণের মধ্যে একটি হ'ল উনি এখানকাব মেয়ে।

তার নাম হেনা বোস। মহিলা। বয়স উনত্রিশ। বাংলা দেশের প্রথম মহিলা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সাত বছব আগে খববের কাগজে আই. এ. এস পরীক্ষার ফলে প্রথম সারিতে তাব নাম এবং ছবি দেখা গেছে। মাস কয়েক হল ডিস্ট্রিক্ট চার্জ নিয়ে এখানে এসেছে। অনেকেই তাকে এই শহরেই ফ্রক-পরা অবস্থায় দেখেছে, সাঁতারের কমপিটিশনে পুরুষেব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গঙ্গায ঝাঁপাঝাঁপি করতে দেখেছে। সাইকেল ছেড়ে খুব ভোরে ঘোড়ায় চড়তেও দেখেছে।

তার নামের আগে-পরে তখন এমন সব পুং-বাচক বিশেষণ জোড়া হত, শুনলে কান লাল হবার কথা। কিন্তু হেনা বোসের মুখ লাল হত না। তার প্রথম কারণ, গায়ের রং কালো, আব দ্বিতীয কারণ, পুরুষ-বাচক বিশেষণই তার সব থেকে বেশি কাম্য ছিল।

স্কুল থেকে শুরু করে কলেজের পাঠ পর্যন্ত এই শহরেই কেটেছে তার। মেয়েদের নিয়ে তখন কত দল পাকিয়েছে, পুরুষের সঙ্গে কতভাবে রেষারিষি করেছে ঠিক নেই।

ছেলেবেলা থেকেই পুরুষালি স্বভাব তার, পুরুষের মেজাজ, পুরুষের গোঁ। ব্যাধির মতো মানসিক একটা কারণও ছিল। চার বছরের বড় ওর এক অসুখে-ভোগা রুগ্ন দাদা ছিল। বেজায় খিটখিটে মেজাজ ছিল তার। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া-মারামারি বেধে যেত। স্কুলে একবার ওইরকম ঝগড়া-বিবাদের সময় কয়েকটা ছেলে তাকে ধরে মারে খুব, আর রাগের মাথায় একটা ছেলে এমন ধাক্কা দিয়ে বসে যে দাওয়া থেকে সে নিচের বাঁধানো চত্বরে পড়ে যায়। সেই থেকেই জ্বর আব মাথায় যন্ত্রণা, চৌদ্দ বছরের সেই রুগ্ন দাদাকে আর বাঁচানোই গেল না। সেই থেকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার নেশা। আর একটু বেশি বয়সে স্কুলে পড়াব সময় ইয়ারকি করতে গিয়ে অনেক ছেলে ওর হাতে মারধোর পর্যন্ত খেয়েছে।

আরো একটু বেশি বয়েস হতে সব থেকে বেশি রেষারেষির সূত্রপাত এই সোমেন করের সঙ্গে। বয়েসে দু'বছরের বড় হলেও সোমেন কর পড়ত মাত্র এক ক্লাস ওপরে। স্কুলের গণ্ডি পেরুবার পর একই কলেজে এক ক্লাস ওপর-নিচে পড়েছে দু'জনে।

সোমেন কর তখন ছেলেদের মাথার মণি। কলকাতার নামী ক্লাব তখন তাকে জামাই-আদরে ফুটবল আর হকি খেলতে নিয়ে যায়। গঙ্গা পারাপারেব সাঁতার কমপিটিশন হয় প্রতি বছর। শহর ভেঙে পড়ে সেই প্রতিযোগিতা দেখতে। কিন্তু প্রতিবারের মস্ত কাপটি সোমেন করের বরাদ্দ। হেনা বোস কোনোবার পরাস্ত কবতে পারল না, প্রত্যেক বারই দ্বিতীয় পুরস্কার মেডেলটি নিয়ে রাগে জ্বলতে জ্বলতে তাকে ঘরে ফিরতে হয়েছে। একজনকে বাদে আর সকলকে পরাস্ত করেও এতটুকু আনন্দ নেই।

হেসে হেসে সোমেন কর সেবারে ওকে বলেছিল, গোড়া থেকে ভালো কবে প্র্যাকটিস করো, সামনেব বাবে তুমি ঠিক প্রথম হবে।

ঠাট্টার জবাব দেবাব জন্য সে অনেক আগে থেকে অনুশীলন শুরু করেছিল বটে। পরের বারের প্রতিযোগিতায় স্টার্টিং পয়েন্টে এসে দেখে সোমেন কব জামা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। জলে নামছে না। শুনল সে তার নাম তুলে নিয়েছে, আর বলেছে নাকি, বার বার চার বাব প্রথম হয়েছে, এবারে অন্যাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

লোকটা ওর দিকে চেয়ে হেসেছিল। আর হেনার গা যেন জ্বলে গেছল তাতে। সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি জলে নামবেন কি নামবেন না?

সোমেন কর হেসেই মাথা নেড়েছিল, নামবো না।

—বেশ, আমিও উইথ-ড্র করলাম তাহলে, ভেবেছিলাম এবার গেলবারের ঠাট্টার জবাব দিতে পারব, আপনি ঘাবড়ে গেছেন যখন, থাক।

সোমেন কর ভুরু কুঁচকে খানিক নিরীক্ষণ করেছিল তাকে। তারপর তার

সাগরেদকে বলেছে সুইমিং কস্টিউম নিয়ে আসতে।

সেবারের প্রতিযোগিতায় অন্তত বিশ গজ আগে লক্ষ্যে পৌঁছেছিল সোমেন কর।

খেলার মাঠে হেনা বোস নিয়মিত হাজিরা দিত। খেলা দেখতে গিয়ে মনে মনে সর্বদাই ও সোমেন করের বিপক্ষ দলের সমর্থক। সোমেন করকে যখন কেউ রুখতে পারত না তখন ওরই হাত পা নিশপিশ করত।

কলেজের থিয়েটার নিয়েও একবার জোর রেষারেষি বেধেছিল। সোমেন করই ওব কাছে এসে ঠাট্টা করেছিল, মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েদের নামতে হবে। হেনা বোস সমুচিত জবাব দিল। সে রাজি। আরো দু'একটি মেয়েকেও সে রাজি করালো। কিন্তু বাদ সাধল কলেজের প্রিন্সিপাল আর মাস্টারমশাইরা। তারা রাজি নয়। হেনা বোস তখন বেগে গিযে সমস্ত মেয়েদের নিয়ে বযকট করল। আর সোমেন করকে বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করল, বাজি হবেন কি কবে, মস্ত মস্ত পুরুষমানুষ যে সব—যান এখন ছেলেদেব মেয়ে সাজিয়ে অভিনয় করুন গে।

ভালো মুখ কবে সোমেন কব জবাব দিয়েছিল, শুধু তোমার বেলায কেউ আপত্তি নাও কবতে পারে, তোমাকে তো মোটামুটি ছেলেই ভাবে সকলে।

হেনা বোস হেসে উঠেছিল।

বাবা মা ওর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। সময়-সময হেনা বোসেরও যে ফাঁকা-ফাঁকা লাগে না এমন নয়। রূপ তার অতি সাদামাটা, গায়ের রংও কালোব দিকে। স্বাস্থ্যটাই শুধু নিটোল। তাছাড়া বড় চাকরির তোয়াজে চেহারায় এখন বেশ একটু লালিত্য এসেছে। কিন্তু বিযেব কথা তার ভাবার অবকাশ কম। এই কড়া মেজাজেব ডি. এমকে দেখে অধস্তনেরা তটস্থ। মেয়ে বলে কেউ আর এখন এতটুকু সুবিধে পাবে আশা করে না। আড়ালে জাঁদরেল পুরুষ ডি. এম'এর দাদামশাই বলে তাকে।

সোমেন কব যোগ্য মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানালো তাকে। তার জন্য চাযের ব্যবস্থার উদ্যোগ হচ্ছে বুঝতে পেরে হাসি মুখেই জানিয়ে দিল, তদন্তে এলে সে বাড়িতে চা খাওয়া চলে না। মেয়েরা চুপ।

—আচ্ছা, এবারে কাজটা সেরে নিই, কেমন?

মেয়েবা ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। চেয়ার টেনে বসে হেনা বোস বলল, আপনার স্বভাব আজও বদলায নি তাহলে?

ওকে দেখে আব এত বড় হতে দেখে সোমেন কর মনে মনে কত যে খুশি হয়েছে সেই জানে। সেই আবেগে হাসি মুখেই জবাব দিয়ে বসল, তোমারও বদলেছে মনে হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ চাপা তীক্ষ্ণ গলায হেনা বোস বলল, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?

সোমেন কর থমকে গেল— আই অ্যাম সরি। বলুন—

হেনা বোস শোনা ব্যাপারটাই আর একবার তার মুখ থেকে শুনতে চাইল। সোমেন কর একটুও না বাড়িয়ে সত্যি কথাই বলে গেল। হেনা বোস চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে শুনল।

তারপর খানিক ভেবে বলল, আপনার ওই টিউটোরিয়াল হোম সম্পর্কে আমি

সমস্ত খোঁজখবব নিযেছি। অ্যাডভার্স কোনো বিপোর্ট নেই। যাক, আপনাব ছেলেদেব বলে দেবেন, পুলিশ অফিসাবেব জন্য শীগগিবই আলাদা কোযার্টার্স-এব ব্যবস্থা হচ্ছে। তাবাও যেন আব গণ্ডগোল না কবে, আব একটু ভদ্র হযে থাকে।

সোমেন কব জবাব দিল, তাবা ববাববই ভদ্র। কিন্তু আপনাব পুলিশ অফিসাব যে আমাদেব গলায হাত দিযেছেন তাব কি হবে?

এবাবেব 'আপনি' কথাটা নিজেবই কেমন যেন কানে লাগল হেনা বোসেব। জবাব দিল, সেই স্টেপই তো নেওযা হল।

—সেটা আমি যথেষ্ট মনে কবি না, আমি তাব নামে কেস কবব।

হেনা বোস সেই আগেব মতোই জোবালো হাব-ভাব দেখছে লোকটাব। হেসে বলল, নাহলে কিছুই হবে না, আপনি আপোস কবলে তাব ক্ষমা চাওযাব ব্যবস্থা কবতে পাবি।

—তাই করুন।

হেনা বোস উঠে দাড়াল। তাবপব হেনাই জিজ্ঞাসা কবল, আপনাব স্ত্রীকে দেখলাম না?

—স্ত্রী নেই।

ঈষৎ কৌতুকে মুখেব দিকে তাকালো, নেই বলতে?

—নেই বলতে কোনোদিনই নেই।

—ও! হাসল, কি একটু ঠাট্টা কবতে গিযেও কবল না—আচ্ছা চলি। আমি এখানে আসছি শুনে মা আপনাব কথা জিজ্ঞেস কবছিলেন। যাবেন একদিন।

এককালে এদেব বাড়ি গিযে এব মাযেব কাছ থেকে খাবাব চেযেও খেযেছে সোমেন কব। বিদ্রূপেব সুবে ফিবে জিজ্ঞাসা কবল, বলেন কি, ছা পোষা মাস্টাব, ডি. এম'এব বাড়ি যাব। আপনাব অসুবিধে হবে না?

'আপনি' কথাটা এবাবও কানে লাগল। নিজেই এ নিযে গোড়ায দুর্ব্যবহাব কবেছে, কি আব কবা যাবে। জবাব দিল, অসুবিধে হবাব কথা নয, কাবণ ডি এম-বাও সমাজেব বাইবেব জীব নয বোধ হয।

হাসি মুখেই বেবিযে এলো। হাসি মুখে গাড়িতে উঠল।

দিনকযেক বাদে হঠাৎ দেখা আবাব। বিকেলেব দিকে সোমেন কব গঙ্গাব ধাব ধবে হাটছিল। ঝকঝকে গাড়িটা পাশে দাড়িযে গেল। ভিতব থেকে হেনা বোস গলা বাড়ালো।—হাওযা খাচ্ছেন?

—হ্যা। আপনিও?

আজও 'আপনি' শব্দটা কানে লাগল। বলল, না, আমি কাজে বেবিযেছিলাম, আমাদেব হাওযা খাওযাব সময হয না।

সোমেন হেসেই বলল, সময আমাবও বেশি হয না, তবে সস্তাব জিনিসে লোভ বলে অভ্যেসটা ছাড়তে পাবি না।

হেনা বোসেব মনে হল, কথাবার্তাব ধবন-ধাবণ সেই আগেব মতোই আছে।

বলল, সেদিন আপনার ওখান থেকে ফেরার পরেও মা আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।—একদিন এলেন না তো?

জবাব দিল, খুব ইচ্ছে করে, কিন্তু আগের দিন তো আর নেই, তাই ভয় করে।

হেনা বোস গাড়ির দরজা খুলে দিল, চলে আসুন, ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি— হাতে সময় আছে তো?

বিব্রত মুখে সোমেন কর গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ছুটল আবার। গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করল, ইচ্ছে করে, অথচ ভয় করে কেন?

—পুরনো দিনের কথা মনে পড়লে যেতে ইচ্ছে করে, আর বর্তমানের কথা মনে হলে ভয় করে। পুরনো দিনের মনের আবেগে 'তুমি' বলে ফেলে যে দাবড়ানি খেলাম।

সুযোগ পেয়েই হেনা বোস সেই অপ্রিয় ব্যাপারটার সংস্কারে মন দিল। হেসে উঠে বলল, আচ্ছা অনুমতি দিলাম, আগের মতো তুমিই বলুন।

কিন্তু লক্ষ্য করল, সে তুমি না বলে আপনি করেই কথা বলে চলল।

হেনা বোসের মা আগের মতোই আছেন। শুধু বয়েস বেড়েছে আর আগের থেকেও বেশী স্নেহশীলা হয়েছেন। ওকে দেখে খুব খুশি। খানিক গল্প করার পর নিজের হাতে খাবার নিয়ে এলেন দু'জনারই। সোমেন কর গম্ভীর মুখে বলল, খেতে তো পারব না মাসিমা—।

—কেন? মহিলা অবাক একটু।

হেনাকে দেখিয়ে বলল, সেদিন আমার বাড়িতে ওনার এক পেয়ালা চা খেতেও অসুবিধে হয়েছিল।

হেনা বলল, আমি তদন্তে গেছলাম বলে অসুবিধে হয়েছিল, আপনার কি অসুবিধে?

—লোকে ভাবতে পারে, ডি এম'এর খুব আপনার জন, আমার থেকে আপনারই তাতে বেশি অসুবিধে।

হেনার মা বললেন, তুমি খাও তো, আপনার জন না তো কি, ওর ওই রকম স্বভাব, কাজে বেরুলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

ওঠার সময় হেনার মা বললেন, বড় ভালো লাগল, আবার এসো কিন্তু।

সোমেন আবারও হেসে বলল, তাতেও তো অসুবিধে মাসিমা, লোকে ভাববে ডি এম-কে তেল দেবার ফিকিরে ঘোরা-ফেরা করছি।

হেনা বোস টিপ্পনী কাটল, লোকে ডি এম-কে একটু-আধটু তেল দিয়েই থাকে।

—তাদের স্বার্থ থাকে, আমি আপনাকে তেল দিতে যাব কোন স্বার্থে।

জবাব না দিয়েই হেনা হাসছিল।

মুখে যা-ই বলুক সোমেন কর, এরপর মাঝে মাঝে আসা শুরু করল। আর একটা ব্যাপারও লক্ষ্য করেছে সোমেন, তাকে দেখলে হেনার সেই গম্ভীর মুখেও হাসির ফাটল ধরে একটু।

মেয়ের সামনেই মা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন সোমেনকে, চাকরি-বাকরি আর করলেই না, যা করছ তাতে বেশ ভালোই রোজগার হয় বুঝি?

সোমেন কর হাসি মুখে জবাব দিল, খুব একটা ভালো নয়, তবে আপনার হাকিম মেয়ের থেকে ঢের ভালো।

মহিলা সেকেলে মানুষ, অনেকটা সাদাসিধে গোছের। মেয়ের থেকেও বেশি রোজগার হতে পারে ভাবেন নি। জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তাই নাকি, কত পাও?

সোমেন জবাব দিল, মাস গেলে চাড়-সাড়ে চার হাজার টাকা নিজের থাকে—মাইনেই তো শুনতে হয় মাসে হাজার দশেকের ওপর।

এই গোছের অঙ্ক মহিলার কল্পনার বাইরে, তাই যথার্থই অবাক তিনি। মেয়ে সেদিকে চেয়ে টিপ্পনী কাটল, একেবারে হাঁ হয়ে গেলে যে, অনেক তেলওলাও তো এর থেকে ঢের বেশি রোজগার করে!

মা অপ্রস্তুত।—কি যে মুখ হয়েছে তোর, ও তো ছেলে পড়ায়।

মেয়ে জবাব দিল, তা না হলে এই রকম ছেলে-মেয়ে আজকালকার!

সোমেন কব হাসতে লাগল। মেয়ের কথায় কান না দিয়ে মহিলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তা এত ভালো রোজগারপাতি করো, একনও বিয়ে-থা করো নি কেন?

মেয়ে বিরক্ত এবং গম্ভীর। সোমেন কব জবাব দিল, মা বাবা কেউ নেই তো—কে আর মাথা ঘামিযে তোড়জোড় করে, আমি আমার তালে ছিলাম—সময় কেটেই গেল।

ভুরু কুঁচকে মায়ের উদ্দেশে ঝাঝিয়েই উঠল হেনা বোস।—তুমি এসব আলোচনা থামাবে?

মা বললেন, কিসে তোর রাগ হয় বুঝি না বাপু!

এরপর আবার একদিন গঙ্গার ধাবের রাস্তায় দেখা। হেনা বোস গাড়িতে, সোমেন কর হাঁটাপথে। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়াল না, পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ইচ্ছে কবেই হেনা বোস যে অন্য দিকে মুখ ফিবিয়ে থাকল তাও বোঝা গেল।

ব্যস, তারপর একটা মাস আর এ-পথ দিযে হাঁটলই না সোমেন কর। বিকেলে অন্য রাস্তায় বেড়াতে শুরু কবল। ওই এক মাসের মধ্যে আর তাদের বাড়িও গেল না।

দিনটা সেদিন মেঘলা ছিল। আকাশের কালো সাজ উপেক্ষা করেই সোমেন কর একমাস বাদে বিকেলে আবার গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরল। ওই একটা মাস ক্লান্তিকর দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।

সেদিনের আশা সফল। ঝকঝকে গাড়িটা গজ দশেক এগিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হেনা বোস মুখ বাড়ালো। দু'হাত জুড়ে বেশ ঘটা করে কপালে ঠেকিয়ে বিনীত নমস্কার জানালো সোমেন কর।

ঠিক না বুঝে হেনা বোস একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিল। অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বলে মনে হল না। হালকা গাম্ভীর্যে বলল, টাকা রোজগারের গরম তো খুব, একটা গাড়ি কিনতে পারেন না?

—পারি তবে আপনার থেকে এ দুটো পায়ের ওপর আস্থা বেশি।

—আকাশ ভেঙে জল আসছে, পা দুটো আপনাকে বাঁচাবে?

অমায়িক হেসে সোমেন কর জবাব দিল, মেয়েদের শরীর তো নয়, জল-ঝড়ে এই পোড়া শরীরের কিছুই হয় না।

হেনা বোসের স্বভাব একটুও বদলায়নি। মেয়ে বলে তাচ্ছিল্যের কথা শুনলে এখনো কান জ্বলে। আর কলেজে পড়া অবধি এই লোকের মুখে ওই খোঁটা সব থেকে বেশি শুনেছে। দরজা আগেই খুলে দিয়েছিল, রুক্ষ স্বরে হেনা বোস জিজ্ঞাসা করল, তাহলে আপনি গাড়িতে উঠবেন, না বীরপুরুষের মতো হাঁটবেন?

—আপনি বললে উঠব।

হাসি মুখেই উঠে বসে সোমেন কর দরজা বন্ধ করল। গাড়ি চলল।

—এক মাসের মধ্যে আসেন নি কেন?

বিব্রত মুখ করে সোমেন কর জবাব দিল, তেলের কারবারীর ঘন ঘন যাতায়াত করাটা আপনার খুব পছন্দ নয় মনে হল সেদিন—

'আপনি' 'আপনার' শব্দগুলো আজ আরো বেশি খটখট করে কানে লাগছে হেনা বোসের। লোকটা যে তাকে জব্দ করার জন্যেই সেই করে থেকে এই করে আসছে তাও বুঝতে পারে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল। বেশ প্রসন্ন মনেই আপিস থেকে ফিরছিল, হঠাৎ কেন যে মেজাজটা বিগড়ে গেল নিজেই জানে না।

ফেরা সম্ভব নয়। অবশ্য গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসা চলে, কিন্তু আন্দাজে কোন বাড়িতে গাড়ি পাঠানো হবে?

তাকে বসতে বলে হেনা বোস মুখে-চোখে জল দিয়ে এলো।

বসল সোমেনের মুখোমুখি—কি খাবেন?

—যা খাওয়াবেন।

মুখের ওপর দু'চোখ থমকালো এক মুহূর্ত। আয়াকে যা আছে আনতে বলে আবার তার দিকে তাকালো। হঠাৎ হেসেই জিজ্ঞাসা করল, গঙ্গায় সাতার কাটেন এখনো?

—না, যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন আমার সাতার আসে না। আপনি নামেন তো চেষ্টা করে দেখি।

আয়া চায়ের ট্রে আর জলখাবার রেখে গেল।

খাবারের ডিশ হাতে তুলে নিয়ে হেনা বোস আবারও হেসে বলল, প্রতিদ্বন্দ্বী তো কোনোদিন আপনার সঙ্গে পারে নি—যোগ্য হল কি করে?

—হারটা দেখেছেন, জিতটা আপনার চোখে পড়ে নি।

হঠাৎ অদ্ভুত রেগে গেল হেনা বোস।

—ক'দিন আপনি-আপনি করতে বারণ করেছি!

খাওয়ার ফাঁকে হাসি গোপন করার চেষ্টা সোমেন করের। জবাব দিল, হুকুম করে তুমি থেকে আপনিতে টেনে তোলা যায়, আপনি থেকে তুমিতে ফেরানো যায় কি?

খাওয়া ছেড়ে হেনা বোস আবার চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ রুষ্ট স্বরেই বলে উঠল, যদি হুকুম করি!

খাবাব ডিশ সামনে নামিযে বাখল সোমেন কব। ঠোঁটেব ডগায হাসি ভাঙছে সামান্য। জবাব দিল, হুকুম কবলে এই অধম তাব বদলে কিন্তু আব্দাব কববে। সে বলবে, ওই 'তুমি'টা দু'তবপেবই প্রযোগ শর্তসাপেক্ষ। তাবপব বলবে, দু'জনেবই যথেষ্ট বযেস হযেছে, কিশোব-কিশোবীব মতো আব বেশি সময নষ্ট না কবে মিস বোসকে মিসেস কব হযে এই অধমেব ঘবে আসতে হবে। তুমি বলাব হুকুম কবলে অনেক ঝামেলা।

হেনা বোস থমকে চেযে বইল খানিক। তাব বাগ হচ্ছে, দুঃসাহস দেখে অবাক লাগছে, আবাব তলায তলায কি যেন একটা হচ্ছে। শেষে হালকা ভ্রূকুটি কবে বলে বসল, এই আব্দাবেব কথা মুখে বলাব জন্যেই আপনাকে সোজা থানায চালান কবতে পাবি, জানেন?

—পাবি কেন, তাই কবতে হবে, এখনো বন্দি না কবলে আমি ফেবাবী হযে যাব।

প্রাণপণে রুষ্ট হতে চেষ্টা কবেও হেনা বোস পযন্ত হেসেই ফেলল।

অবশেষে বিযেটা হযেই গেল। হেনা বোস হ'ল হেনা কব। বিযেবাড়িব হৈ চৈ, নানা বকম আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানেব শেষ হতে মুক্তি পেল হেনা সোমেন। তখন বাত প্রায দুটো।

নিজেব তবপেব আত্মীযপবিজনদেব বাসব জাগাব ইচ্ছে এক ভ্রূকুটিতেই হেনা নাকচ কবে দিযেছে। এখন একটু ঘুমুতে পাবলে বাচে।

দবজা বন্ধ কবে বিছানায বসতেই লোকটা বেহাযাব মতো হাত ধবে টানল তাকে। সদ্য সদ্য হেনা কবেব ডি এম'এব মেজাজ এখন। ঝাকুনি দিযে হাত ছাডিযে নিযে বলল, ওদিকে সবে থাকো। সমস্ত দিন অনেক নাকাল কবেছ—যজ্ঞেব সময পিছনে দাডিযে শযতানী পর্যন্ত কবেছ, আমি টেব পাই নি, না?

—বা বে, আমি আবাব কি কবলাম, পুরুতঠাকুব পিছন থেকে জডিযে ধবতে বলল না

বাগত মুখে বমণী ওপাশ ফিবে শুযে পড়ল।

কিন্তু তাবপবেই যে দুঃসাহস দেখাল, সেটা যেমন অসহ্য তেমনি কল্পনাব বাইবে। দস্যুব মতোই অতর্কিতে ঝাপিযে পডল তাব ওপব। হেনাব গাযে শক্তি কম নয, কিন্তু কিছুতে ঠেলে সবাতে পাবল না দুবন্ত পুরুষটাকে। বুকেব হাড়পাজব গুডিযে দিতে চাইল, ঠোঁট দুটো ঝকাঝকিব ফলে প্রায ক্ষতবিক্ষত, দম বন্ধ হবাব উপক্রম। লোকটা দুদম দস্যুব মতোই ওব ওপব দখল বিস্তাব কবছে, আব পদ মর্যাদায় সচেতন এই উনত্রিশ বছবেব দেহটা ভেঙে দুমডে নতুন কবে গডছে। আব যোঝা সম্ভব হচ্ছে না, সর্বাঙ্গ অবশ হযে আসছে। শেষে আব পাবল না। হাল ছেডে দিল, হাল ছেডে নিঃশেষে হাবিযে যেতে লাগল।

পবদিন।

সকাল তখন ন'টা দশটা হবে। মফঃস্বল শহবে বিযেব মতোই বিযে একটা হযে গেল বটে। তাই পবদিনও ওই সময সোমেন কবেব কিছু বন্ধু-বান্ধব এসেছে খোস-গল্প

কবতে। এ-বাডিব বসিক অতিথিবাও ঘব জুডে বসে আছে বব-কনেকে ঘিবে।

অনেক বকম ঠাট্টা-ইযাবকিব পব সোমেনেব এক বন্ধু তবল গলায জিজ্ঞাসা কবল, তা হাকিম-বউকে কি বকম মনে হল হে?

সোমেন কব জবাব দিল, নতুন আব কি মনে হবে, হাকিম হোক আব যাই হোক—পা থেকে মাথা পর্যন্ত আস্ত একটা মেযেই তো।

অন্তস্তলেব প্রতিক্রিযা দেখে কনে নিজেই অবাক। ফোস কবে ওঠাব কথা, কিন্তু জ্বালা ধবা দূবে থাক, ওই কথা শুনে আজ এই প্রথম দু'কান যেন জুডিযে যাচ্ছে।

মৃত্যু

আমি দ্রষ্টা

দেখছি। শুধু দেখে যাচ্ছি। শুধু দেখা ছাডা আমাব আব কোনো ভূমিকা নেই।

নতুন যুগে নতন চেতনাব ঢেউ তাব উৎস-স্থল থেকে বিপুল উল্লাসে ছডাতে ছডাতে দব-দূবান্তেব মফঃস্বলতটেও এসে ভেঙে পডছে। এটা মফ.স্বল শহব হলেও ওই উৎস-স্থল থেকে দবে নয মোটেই। মাইল পাঁচিশ তিবিশ মাত্র। মফঃস্বল হলেও বেশ নামী শহব। রুজি-বোজগাবেব তাগিদে বোজ লক্ষ মানুষ এখান থেকে পশ্চিম বাংলাব ওই আজব শহবে যাতাযাত কবছে। তাই এখানকাব এই চেতনাব উল্লাস প্রায নিভেজাল।

ওবা বলে এটা নবচেতনা।

আমি কিছু বলি না। শুধু দেখি।

সেদিনও দেখলাম। বড বাস্তা ধবে চলছিলাম। আবো অনেকে যাচ্ছে, আসছে। হঠাৎ সচকিত সকলে। একটা দিশেহাবা ভাব। ভালো কবে কিছু বোঝাব আগেই যে যেদিকে পাবল ছুট লাগালো। প্রাণ বাচানোব তাগিদে একটা ছেলে তীবেব মত ছুটছে। আব প্রাণ নেবাব সঙ্কল্পে চাব-পাঁচটা ছেলে লাঠি ছোবা হাতে মাব-মাব কাট-কাট ববে তাব পিছনে ধাওযা কবেছে।

তাকে প্রায ধব-ধব যে ছেলেটা, তাব হাতে ঝকঝকে ধাবালো ছোবা। ধবে ফেলাব সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল প্রাণটা নেবে যাব সে-ও নিবস্ত্র নয, অথবা নিবস্ত্র থাকে না। ওই বকম ছুটতে ছুটতে সে-ও কোমব থেকে বাব কবেছে কিছু।

তাব পবেই কি যে হযে গেল সঠিক বোঝা গেল না। পিছনেব শিকাবীবাও পৌছে গেল। দমাদম লাঠি পডল কযেক ঘা।

অদূবে একটা পুলিসেব গাডি যেতে যেতে এই বাস্তায মোড ঘুবল। চোখেব পলকে বাস্তা ফাকা।

বাস্তাব মাঝখানে দুটো বক্তাক্ত কাচা দেহ। শিকাব এবং শিকাবীব। মাটি নেবাব আগে একটা ছোবল শিকাবীব কোমব ঘেযে সেও বসাতে পেবেছে।

ফাঁকা রাস্তায় গজ পনের দূরে স্থাণুর মতো আমি দাঁড়িয়ে। শিকার এবং শিকারী দু'জনকেই আমি চিনি। শিকারের নাম অমল। বয়েস একুশ। ওদেরই বাড়ির নিচের তলার একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আমি থাকি। ছুরির ঘায়ের ওপর অতগুলো লাঠির ঘা—তার অবস্থা মুমূর্ষু। ওর বাপ কলকাতার ডেলি প্যাসেঞ্জার—নিশ্চিন্ত মনে আপিস করছেন। আর মায়ের সম্ভবত সদ্য দিবানিদ্রা সাঙ্গ হয়েছে। মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরলে শয্যা থেকে নেমে আসবেন।

শিকারীর নাম জ্যোতিপ্রকাশ। বাপ-মা নেই, মামা-বাড়ির আদরে মানুষ। ধনেদী মামাদের কিছু পয়সা ছিল, আর বাপ-মা-মরা ভাগ্নের প্রতি কিছু স্নেহ ছিল। তাই তাকে মানুষ করার জন্য একজন মাস্টার দরকার হয়েছিল। আমি সেই মাস্টার। কোনোরকমে তাকে স্কুল ফাইন্যালের সমুদ্র পার করে দেবার পরে আমার ছুটি মিলেছে। ওর বয়েস বাইশ। এতদিনে বি-এ পাস করার কথা। যতদূর জানি করে নি। সদ্য-বর্তমান জ্যোতিপ্রকাশের জ্যোতির দাপটে তার মামারাও তটস্থ। কারণ সে-জ্যোতির একটা বৃহৎ অংশ এখন রাজনীতির বুকে তীক্ষ্ণভাবে প্রতিফলিত। যার আদরে ও মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াতে পেরেছে সেই দিদিমা বিগত। এখনো মাথা উঁচিয়ে আছে, কারণ মামাদের স্নেহ এখন শঙ্কার রূপ নিয়েছে।

আমাকে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন ইনসপেক্টর এগিয়ে এলো। ছেলে দুটোকে চিনি কিনা জিজ্ঞাসা করল।

আমি মাথা নাড়লাম, চিনি।

কে কোন দলের জিজ্ঞাসা করল। আমি মাথা নাড়লাম, জানি না।

সত্যিই জানি না। কম করে পাঁচ-সাতটা দলের সরব উদ্দীপনা আর উত্তেজনার দাপটে হাওয়া গরম এখানকার। এর মধ্যে কে কোন দলের, বা কার কি লক্ষ্য আমি কিছুই জানি না। এমন কি অতগুলো দলের নামও আমার মনে থাকে না। ভাবতে গেলে মাথা ঘুলিয়ে যায়। তাই ভাবিও না।

হাসপাতাল

মফঃস্বল শহরের বড় হাসপাতাল বলতে এই একটাই। বিশাল হলএর এ-মাথায় একজনের শয্যা, ও-মাথায় আর একজনের।

অমলের মা অর্থাৎ যাঁর বাড়ির একতলার একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আমি থাকি, আমাকে বাহন করে তিনি আধ-পাগলের মতো ছুটে এসেছেন। কারণ তাঁর স্বামী তখনো কলকাতার আপিসে। মহিলার নাম অরুণা ধর। বয়েস আটত্রিশ-ঊনচল্লিশ হবে। কিন্তু অত মনে হয় না। এ-বয়সেও শরীরের বাঁধুনি ভালো। গায়ের রং তেমন ফর্সা না হলেও কালো নয় মোটেই। মুখশ্রীটুকু ভারী মিষ্টি। আমার ভালো লাগে। মহিলা তা জানেন মনে হয়। একটা নিরীহ মানুষের এই নিরাপদ-গোছের ভালো-লাগাটুকু কোনো মহিলা অপ্রসন্ন চোখে দেখে কিনা জানি না। এই মহিলা আমার প্রতি প্রসন্ন সেটুকু অনুভব করতে পারি। আজ পাঁচ বছরের মধ্যেও আমার ঘরভাড়া এক পয়সাও বাড়ে নি। উল্টে তাঁর ঘরে ভালো কিছু রান্না হলেই একটা বাটি আমার ঘরে আসে। বিনিময়ে

স্বামীকে দিয়ে হয় না, এমন যে কোনো কাজে বা প্রয়োজনে তিনি আমাকে স্মরণ করেন। কাজ বা প্রয়োজনের কথা মিষ্টি করে বলেন। বলা বাহুল্য, আমিও তাঁকে খুশি করতেই চেষ্টা করি। মহিলা মোটামুটি শিক্ষিতা। আই-এ পাস করার পরেই বিয়ে হয়ে গেল।

বিপদের খবর শোনামাত্র অস্ফুট আর্তনাদ করে তিনি যেমন ছিলেন তেমনি অবস্থায় ছুটে রাস্তায় নেমে এলেন। একটা চলতি রিকশ থামিয়ে উঠে বসলেন এবং আমাকে ডাকলেন, আসুন।

দ্বিধা-সঙ্কোচের সময় নয় এটা। তবু সঙ্কোচেই উঠে বসলাম। তারপর অস্বস্তি বাড়তেই থাকল। অরুণা ধর কাঁদছেন, ব্যাকুল মুখে বললেন, আপনি ভালো করে কিছু বলছেন না কেন—আছে তো? গিয়ে দেখতে পাব তো?

যতটুকু সম্ভব অভয় দিলাম।

একনজর দেখেই বোঝা গেল অবস্থা সঙ্কটজনক অজ্ঞান নিস্পন্দ একটা কচি দেহ শয্যায় পড়ে আছে। সর্বাঙ্গ ব্যাণ্ডেজে মোড়া। দু'জন ডাক্তার আর দলের জনা-দশেক ছেলে অমলের বেডের সামনে দাঁড়িয়ে। অরুণা ধর মুখে আঁচল গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদছেন।

হলএর মাঝামাঝি দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে আমি আমার কাজ করছি। অর্থাৎ দেখছি।

হলএর ও-মাথার বেডে জ্যোতিপ্রকাশ শুয়ে আছে। তার আঘাত তেমন গুরুতর নয়। সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। কিন্তু ক্ষতর যাতনাও আছেই। কোমরের দিকে ছোরার পাল্টা আঘাত বেশ জোরেই পড়েছিল। ওকে দেখতে ওর তিন মামা এসেছিলেন। বিশ-পঁচিশ মিনিট থেকেই তারা চলে গেছেন। আমার মনে হল, ও-প্রান্তে অমল ধরের বেডের কাছে ওই ছেলেগুলোর ঘোরালো আর ধারালো জোড়া জোড়া চোখগুলোর সঙ্গে বারকয়েক চোখাচোখি হতেই তারা আর বেশিক্ষণ অবস্থান সমীচীন মনে করেন নি। আর সম্ভবত নিরাপত্তার অভাবের কারণেই জ্যোতিপ্রকাশের শয্যাপাশে তার দলের একটা ছেলেকেও দেখা গেল না। মামারা চলে যেতে ও ঘাড় ফিরিয়ে ও-প্রান্তের দৃশ্য দেখতে লাগল। বিশেষ করে অমলের মা-কে দেখছে।

ডাক্তার দু'জন চলে যেতে এদিকের কয়েকটা ছেলে অমলের মা-কে কি বলল। সঙ্গে সঙ্গে মাঝের অনেকগুলো বেড টপকে মহিলার দৃষ্টি এ-প্রান্তের একটা বেডের দিকে ঠিকরোল।

মিষ্টি মুখের এমন হিংস্র দৃষ্টি আমি আর বোধ হয় দেখি নি। জ্যোতিপ্রকাশও তাই দেখছে।

দিনকতক যমে-মানুষ টানা-হেঁচড়ার পর ডাক্তাররা ক্ষীণ আশা দিল, ছেলেটা অর্থাৎ অমল ধর বাঁচতেও পারে। আর ও-মাথার ছেলেটা তো ভালই আছে। বিছানায় ইদানীং উঠে বসছেও।

অমলের কাছে তার বাবা-মা রোজ আসেন, বোন আসে, তার দলের বন্ধুরাও আসে।

জ্যোতিপ্রকাশেব কাছে বিকেলেব দিকে দু'চাব মিনিটেব জন্য বাড়িব একটা চাকব আসে শুধু। সেও বোজ নয। জ্যোতিপ্রকাশ তাব শয্যায বসে ও-প্রান্তেব বোগীব দিকেই চেযে থাকে। কাবা আসছে যাচ্ছে লক্ষ্য কবে। বিশেষ কবে লক্ষ্য কবে অমলেব মা-কে। ওকে দেখলেই উঠে বসে। যতক্ষণ থাকেন, ও বসে-বসে তাকেই দেখে। আমাব কেমন মনে হয, মাযেব ওই আকুলতা আব ব্যাকুলতা যেন একটা নতুন দর্শনীয বস্তু ওব কাছে। একটা সমস্যাও যেন। যে বৃহৎ স্বার্থে ওবা এমন অনাযাসে মাবামাবি কাটাকাটি কবে, তাদেব পিছনে যে এমন একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনেব যোগ আছে, তা যেন ঠিক এতটা জানা ছিল না ওব।

বিশেষ অনুমতিক্রমে ছেলেব কাছে বহুক্ষণ থাকেন অরুণা ধব। ছেলেব শত্রুকে অনেকবাব লক্ষ্য কবেন তিনিও। চাউনি এখনো কঠিন। কিন্তু আগেব মতো হিংস্র নয।

আবো দিনকযেক বাদে ডাক্তাব অভয দিল তাকে। এখন সম্পূর্ণ আশা কবা যায ছেলে বাঁচবে।

ওদিকে জ্যোতিপ্রকাশ হাঁটতেও পাবে একটু একটু।

অরুণা ধব ওকে আগেব থেকে একটু বেশিই লক্ষ্য কবেন। তাব চাউনি আগেব মতো অত কঠিন না হলেও সদয নয একটুও।

আমি বোজই একবাব কবে অন্তত জ্যোতিপ্রকাশেব শয্যাব সামনে দাড়াই। কথা হযই না বলতে গেলে। সেদিন কাছে যেতে যেন দ্বিধা কাটিযে ছেলেটা জিজ্ঞাসা কবল, ও কেমন আছে?

মন বোঝাব জন্য আমি ডাইনে বাযে মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ খুব সুবিধেব নয। না, খুশি নয, উল্টে মুখ শুকিযে বিড়বিড় কবে বলল, নার্সকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম, সে বলল ভালো

ছেলেব শিযবেব কাছে বসে অরুণা ধব ফল ছাড়াচ্ছেন আব মাঝে মাঝে উষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ কবছেন এদিকে। অমল ঘুমুচ্ছে। ওদিক থেকে এদিকে এসে দাড়াতে মহিলা জিজ্ঞাসা কবলেন, ও কি বলছিল?

জানালাম, অমল কেমন আছে খোজ কবছিল।

সবোষে একবাব দূবেব ওই বেডেব দিকে তাকিযে উষ্ণ ঝাজে বললেন, ওঃ, দবদ কত!

ফল ছাড়াতে ছাড়াতে আবো দু'তিনবাব ওই ছেলেটাব দিকে দৃষ্টি প্রসাবিত কবলেন। বিছানায বসে জ্যোতিপ্রকাশ এদিকেই চেযে আছে। অরুণা ধবেব দিকে।

একটু বাদে মহিলা জিজ্ঞাসা কবলেন, কাউকে আসতে টাসতে দেখি না, ওই ছেলেটাব কেউ নেই? বাপ-মা নেই?

মাথা নাড়লাম। নেই।

ফল ছাড়াতে ছাড়াতে আব একবাব তাকালেন সেদিকে। তাবপব সামনেব ঘুমন্ত ছেলেব দিকে। একটা ডিশে কিছু ছাড়ানো ফল তুলে আমাব দিকে বাড়িযে দিলেন। —দিযে আসুন।

আমি ডিশ নিযে গেলাম এবং ডিশ হাতে কবে তক্ষুনি ফিবে এলাম।

ক্রুদ্ধমুখে মহিলা জিজ্ঞাসা কবলেন, নিল না?

জবাব নিষ্প্রয়োজন।

—দিন তো। উঠে হাত বাড়িয়ে ডিশটা নিয়ে হন-হন কবে ওই বেডেব দিকে চললেন।

আমি দেখছি। মহিলা বলছেন কিছু। ছেলেটা বিমূঢ় মুখে চেয়ে আছে। তাব সামনে একটা খববেব কাগজ পেতে ডিশটা বেখে তেমনি অসহিষ্ণু পদক্ষেপে ফিবে এসে আবাব ছেলেব শিযবেব কাছে বসলেন।

ও-প্রান্তেব ছেলে ফ্যালফ্যাল কবে তাকেই দেখছে। একটু বাদে অরুণা ধব আব একটা তির্যক দৃষ্টি হানলেন সেদিকে। ছেলেটাব সামনে ফলেব ডিশ তেমনি পড়ে আছে। অরুণা ধব সোজা ওব দিকে ঘুবে বসে সবোষে চেয়ে বইলেন।

ঈষৎ চকিত ছেলেটা এবাবে ফলেব ডিশ হাতে তুলে নিল।

আমাব দেখাব ভূমিকা। দেখছি।

এবপব থেকে বোজ একটা কবে ফলেব ডিশ এখান থেকে ওই বেডে চালান হতে লাগল। তাব সঙ্গে এক পেয়ালা হবলিকসও। কিন্তু নিজেব ছেলে জেগে থাকলে অরুণা ওই ছেলেব ধাবেকাছেও যান না। মা কে একদিন ওব সঙ্গে কথা বলতে দেখে অমল এত বেগে গেছল যে ওব একটা ক্ষতস্থান ফেটে বক্ত বেবিয়ে গেছল। সেই থেকে মা সাবধান। কিন্তু ওব কাছে আসাব অবকাশ বোজই পান। কাবণ যন্ত্রণায় ছটফট কবে বলে অমলকে বোজই দুপুবে এবং বাত্রে ঘুমেব ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাখা হয়।

জ্যোতিপ্রকাশ অবাক হবাব মতোই একটা প্রশ্ন কবল সেদিন। উৎসুক মুখে জিজ্ঞাসা কবল, আচ্ছা মাস্টাবমশাই, প্রার্থনায় কাজ হয় কিছু?

আমি জবাব দিয়েছিলাম, ভালো প্রার্থনা হলে হয় বোধ হয়। নইলে এত লোকে প্রার্থনা কবে কেন

কি প্রার্থনা, শোনাব লোভ ছিল। কিন্তু আব কিছু বলল না। ওব এই প্রশ্নটা আমি অরুণা ধবকে জানিয়েছিলাম। শুনে তিনি একবাব ওই ছেলে আব একবাব নিজেব ছেলেব দিকে তাকিয়ে অস্ফুট মন্তব্য কবেছিলেন, হতভাগা ছেলে যত সব।

জ্যোতিপ্রকাশেব হাসপাতাল ছাড়াব দিন এলো। সকালে যাবাব কথা ছিল, কিন্তু ও ঘোষণা কবল, বিকেলেব দিকে যাবে।

সাড়ে তিনটেব সময় ও যাবাব জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যেতে আব পাবছে না। বাব বাব ও-প্রান্তেব মহিলাটিব দিকে তাকাচ্ছে। আমি ওব কাছে দাঁড়িয়ে।

অরুণা ধব বুঝলেন মনে হয়। উঠে এলেন।

—যাচ্ছ?

জ্যোতিপ্রকাশ মাথা নেড়ে সায় দিল।

—ছোবা-ছুবি নিয়ে আবাব কবে বেরুচ্ছ?

জবাবে ছেলেটা চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে দবজাব দিকে এগোলো।

আরো মাস দেড়েক বাদে অমল ধর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। এখনো হাঁটতে চলতে কষ্ট। দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে একটু একটু হাঁটে। সকালে দুপুরে রাত্রিতে ওর বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা লেগেই আছে। অরুণা ধর ওদের তেমন প্রসন্ন চোখে দেখেন না।

সেদিন আমি খবর দিলাম, জ্যোতিপ্রকাশ একবার বাড়িতে আসতে চায়, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ব্যস্তমুখে উনি বাধা দিলেন, না-না, এখন না, ছেলেটা ভালো করে সেরে উঠুক।

এর ঠিক চার দিন বাদে একটা খবর শুনে অরুণা ধর স্তব্ধ পাথর একেবারে। দু'জন পুলিসসহ থানা অফিসার নিজেই এসে খবরটা দিয়েছে। থানা অফিসারকে আমিই সঙ্গে করে দোতলায় নিয়ে এসেছি।

তাঁর খবর, আজ খুব ভোরে একটা মাঠের ধারে জ্যোতিপ্রকাশ নামে ওমুক বাড়ির এক ছেলেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ছোরার আঘাত একটা দুটো নয়, অনেকগুলো। তবু দুপুর পর্যন্ত বেচে ছিল। অচেতন অবস্থায় বারকয়েক তার মুখে অরুণা ধরের নাম শোনা গেছে। অতএব থানা অফিসারের জিজ্ঞাস্য, এ দুর্ঘটনার ওপর উনি কিছু আলোকপাত করতে পারেন কিনা?

মহিলা নিরুত্তর, নির্বাক।

তারপর হঠাৎ যেন চমক ভাঙল। তীক্ষ্ণচোখে পাশের ঘরের দিকে তাকালেন।

আমার কানের পর্দা এক্ষুনি ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাবে কি?—আমার ওই রুগণ ছেলেটাকে থানায় নিয়ে যান, শুকনো ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরবে হয়ত, তবু দু'চারটে ঝাঁকুনি-টাকুনি দিয়ে দেখুন, হদিস মিললেও মিলতে পারে—এ কথাই কি উনি বলবেন এখন? এ কথাই কি শুনব আমি?

না। মুখের তীক্ষ্ণ ভাবটুকু মিলিয়ে গেল। শুকনো, বিবর্ণ আবার। মাথা নাড়লেন। কোনোরকম হদিস দিতে পারেন না।

থানা অফিসার চলে গেছে। অরুণা ধর তেমনি নির্বাক, তেমনি স্তব্ধ।

আমি দেখছি।

আমার কিছু বক্তব্য নেই। আমার চোখে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে পাশের ঘরের ওই অমল ধরের তফাত কিছু নেই। একজন একটা ধাক্কা খাবার ফলে তার ভেতর বোঝা গেছল। সে-রকম কোনো অনুভূতির ধাক্কা খেলে পাশের ঘরের ওই ছেলের ভিতরটা অমনি সুন্দর হতে পাবে বলে বিশ্বাস। কোনোদিন হবে কিনা জানি না।

...আমার চোখ আছে, দেখতে পাই। কান আছে, শুনতে পাই। মুখ আছে, কথা বলতে পারি। মনও আছে, মানব-চরিত্রের নানা মিছিল ভিড় করে সেখানে। তবু আমি শুধু দ্রষ্টা। দেখাটুকুই ভূমিকা আমার। শুধু দেখে যাই।

...কারণ, অত সব থাকা সত্ত্বেও আমি বেঁচে নেই।

আমি মৃত।

আত্মনিগড়

যখন বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ান বিশাখা বোস, ঘরে তখন আর কেউ থাকে না। আর কেউ বলতে বাপের আমলের প্রায় বুড়ো চাকর রতন, আর মাঝবয়সী ঝি বীণা আর বিশ বছরের ভাইপো অরবিন্দ। থাকে না কারণ ঘরের দরজা তখন বন্ধ থাকে। দরজা বন্ধ দেখলেই এরা ধরে নেয়, বাড়ির কর্ত্রী কাজে মগ্ন। অর্থাৎ লেখায় মগ্ন। নেহাত গণ্যমান্য কেউ হঠাৎ বাড়িতে এসে না গেলে এ তন্ময়তা ভঙ্গ করার সাহস কারো নেই। এই তো মাত্র দিন চারেক আগের কথা, বন্ধ দরজার ওধার থেকে টকটক শব্দ হয়েছিল। বিরক্ত গম্ভীর মুখে বিশাখা দরজা খুলেছিলেন। গণ্যমান্য ছাড়াও কেউ কেউ হুট করে এসে হাজির হয়।—অমুক নতুন কাগজে লেখা দিতে হবে, অমুক সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি ঝামেলা লেগেই থাকে। অরবিন্দ বাড়ি থাকলে এবং ঘরের দরজা বন্ধ দেখলে এ-সব আগন্তুককে পত্র-পাঠ বিদায় করে দেয়। এ-সবের জন্য দেখা করার নির্দিষ্ট একটা সময় আছে জানিয়ে সে-সময়ে আসতে বলে। কিন্তু ও বাড়ি না থাকলে রতন বা বীণা সব সময় সকলকে এঁটে উঠতে পারে না। অসময়ে বাজে লোকের উৎপাতের জন্য পরে অনেক সময় ওদের ধমক খেতে হয়।

অরবিন্দ বাড়ি নেই এবং না-ছোড় কোনো আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে ধরে নিয়েই সেদিন দরজা খুলেছিলেন বিশাখা বসু। তারপরেই অবাক। দরজার বাইরে বিষম উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে তার ড্রাইভার অনাদি ভঞ্জ। অদূরের দরজার আড়ালে অরুর ঈষৎ বিড়ম্বিত মুখখানা দেখা যাচ্ছে আর অন্য দিকে বীণার মুখও। ড্রাইভারের দোতলায় ওঠার নজির নেই বললেই চলে। সে বাড়িতে থাকে না। সকালে আসে, রাতে ছুটি মিললে ঘরে যায়। দু'বেলার খাওয়া আর টিফিন এখানেই মেলে। কিন্তু তার জন্য দোতলা মাড়ানোর দরকার হয় না। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে, আর কোথাও বেরুনোর সম্ভাবনা একেবারেই নেই বুঝলে কর্ত্রীই ড্রাইভারকে ছেড়ে দেন। সপ্তাহে কম করে দিনতিনেক অন্তত এমনি টানা ছুটি মেলে। কিন্তু হুকুম না হলে হাজিরা বা ছুটির ব্যাপারে কড়া মনিব তিনি। তবু আরামের চাকরি। আর পাঁচটা ড্রাইভারের মতোই ভালো মাইনে, তার ওপর বাড়তি দু'বেলা খাওয়া আর টিফিন আর মাঝে মাঝে এই গোছের ছুটি—ড্রাইভার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই ডিউটি হৃষ্টচিত্তেই মেনে নিয়েছে।

দরজায় টোকা দেবার সময়েই হাত প্রায় আড়ষ্ট অনাদি ভঞ্জের। কর্ত্রীর গুরুগম্ভীর চাউনি দেখে বিমর্ষ মুখ আরো চুপসে গেল।

—কি ব্যাপার?

কাতর মুখে অনাদি যা নিবেদন করল তার সারমর্ম, তার তৃতীয় ছেলেটার ক'দিন ধরে একশ' দুই তিন জ্বর চলছিল, আজ প্রায় চার হতে ডাক্তার আনা হয়। ডাক্তার বলেছে ভালো জ্বর না—আজ থেকেই দু'বেলা দুটো করে ইনজেকশন দিতে হবে, মাসের শেষ, গোটা-পচিশেক টাকা এক্ষুনি না পেলে বিপদ .।

বিশাখা থমকে চেয়ে রইলেন খানিক, মুখের অপ্রসন্ন ভাব তরল হল না একটুও।

ঘুরে একবার টেবিলের টাইম-পীস্‌টার দিকে তাকালেন। ন'টা বাজে সকাল। আটটায় ওর ডিউটি। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এক্ষুনি এলে নাকি?

শুকনো মুখে জিভে করে ঠোঁট ঘষল অনাদি ভঞ্জ। ওটুকুই জবাব।

বিশাখা বসু ভিতরে চলে গেলেন। হ্যাঁচকা টানে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুললেন। একটু বাদে সশব্দে আবার সেটা বন্ধ করলেন। তারপর তেমনি গম্ভীর মুখেই দু'টো দশ টাকার নোট আর একটা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে দিলেন।—তুমি তাহলে আজ আর আসছ না?

—আজ্ঞে আসব, ওষুধটা কিনে নিয়ে যাব আর আসব।

আপাতত পালিয়ে বাঁচল সে। বিশাখার দু'চোখ ওদিকেব দরজার আড়ালে ভাইপোর দিকে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখখানা ভিতরে সরে গেল। অর্থাৎ ড্রাইভারের বিপদটাকে ও (এবং হয়তো বীণাও) পিসিমণিব কাজের থেকে বড় করে দেখাব অপরাধে অপরাধী।

বিরক্তিতে বিশাখা নিজের মনেই অস্ফুট গলায় বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, সংসার করছে সব—সংসার!

ঠাস করে দরজা দুটো বন্ধ করলেন আবার।

কিন্তু লেখার কাজ ছাড়াও বিশাখা বসু মাঝে মাঝে ঘরের দবজা বন্ধ করেন। সে-খবর একমাত্র তিনি ছাড়া বোধহয় আর কেউ রাখে না।

বন্ধ করেন, যখন ঘরের ড্রেসিং টেবিলের অথবা ওই আলমাবির বড় আয়নার সামনে দাঁড়ান। সে-রকম পরিতুষ্ট নিবিষ্টতার ঝোঁক এলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন হুঁশ থাকে না। কোথা থেকে কোন রাজ্যে চলে যান সে সম্পর্কেও সচেতন নন সর্বদা।

কিন্তু নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে এমন নিবিষ্ট চিত্তে কি দেখেন বিশাখা বসু? আব অমনি দেখতে দেখতে তাঁর চোখে মুখে মাঝে মাঝে বেশ একটু পবিতৃপ্তির হাসির আভাসও স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেন?

নিজেকে দেখেন?

কিন্তু বিশাখা বসুর বয়েস তো এখন চুয়াল্লিশ, খুব সুপটু প্রসাধনেও যে-বয়েসটা এখন আব আদৌ ঢাকা যায় না। রূপসী কোনো কালে ছিলেন না, তবু নতুন বয়েসের শ্রীটুকুও এখন আর খুঁজেপেতে বার করা সম্ভব নয়। এককালে ভালো স্বাস্থ্য ছিল, তার বাঁধুনি এখন ঢিলে-ঢালা। লক্ষ্য করলে গলার চামড়ার দুই-একটা ভাঁজ দেখা যায়। আর লক্ষ্য না করলেও মাথাব চুলে রূপালি রেখাগুলো এখন আপনিই চোখে পড়ে। এককালে এক-পিঠ চুল ছিল বটে, ওই চুল আর সুঠাম স্বাস্থ্যের বেশ একটা আলগা শ্রীও ছিল বটে—যে শ্রী দেখে একটা ছেলে অন্তত মুগ্ধ হয়ে আর শেষে হতাশ হয়ে আর সবশেষে মরিয়া হয়ে দস্তুরমতো তাঁর ওপর হামলাই করেছিল এক রাতে। কিন্তু সে কোনো একদিনের কথা, বাইশ বছর আগের কথা।

সে হামলার ঝোঁকে নিজেও তিনি মুখথুবড়ে পড়লে কি হত দশাখানা, কি হতে পারত সেই সম্ভাব্য চিত্রটা মনে এলেও অনেক সময় শিউরে ওঠেন তিনি।

যাক, রূপের প্রতি তাঁর একটু লোভ ছিল। আর সে লোভের রেশ যে এখনো একটু-আধটু আছে, সেটা একেবারে মিথ্যে নয়। কিন্তু তা বলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে থাকার মতো সত্যিও নয়। চুলে পাক ধরতে তাঁর একটু দুঃখই হয়েছিল সত্যি কথা। ভালো কলপ লাগানোর কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিন্তাটা বাতিল করেছেন সে-ও সত্যি কথাই। কলপ লাগালে একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হয়—সে লজ্জার ঊর্ধ্বে ওঠার মানসিক বল তাঁর আছে।

তবু দরজা বন্ধ করে এক-একদিন বহুক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়ান বিশাখা বসু, তার একটাই বিশেষ কারণ। ওই ভাবে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে যান তিনি। ছাড়িয়ে গিয়ে কোন এক আনন্দ জগতে পদার্পণ করেন। সেখানে নিজের মধ্যেই আর একটি মেয়েকে আবিষ্কার করেন—যে মেয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বদিকে সম্পূর্ণ। যার দীপ্তি আর সত্তা আর রমণী-রীতি সর্বত্র পুরুষের চোখে বড় লোভনীয় রকমের ব্যতিক্রম। ভিন্ন ভিন্ন প্রহসনে তার বাইরের চেহারাটা স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু তেমনি লোভনীয়, তেমনি অপ্রতিহত, তেমনি বিচিত্ররূপিণী। চির-নায়িকার সেই সব রূপে নিজেকেই দেখতে পান। তারপর অক্ষরের বুনটে সেই সব চিত্রগুলো মূর্ত করে তোলেন।

সমালোচকরা বলেন তার লেখা বাস্তব নয়। লেখকরাও কেউ কেউ তাঁদের সুরে সুর মেলান। এ ব্যাপারে সব থেকে বেশি নাক উঁচু অবিনাশ বিশ্বাসের। বাস্তব সাহিত্যের রাস্তায় গড়িয়ে নিজের তো হা-ভাতে অবস্থা এখন। কোচা দিতে গেলে কাছার কাপড়ে টান পড়ে। অথচ দেমাকে ডগমগ। সাহিত্যের বলি ভাবে নিজেকে। ওরই মতো হা-ঘরে কতকগুলো মাসিক সাপ্তাহিক প্রশংসা করে করে মাথাখানা বিগড়ে দিয়েছে একেবারে। না, বিশাখা বসুর লেখা নিয়ে তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলেন না অবশ্য। বলেন না তার কারণ, বিশাখার ধারণা, তাঁর লেখা সমালোচনার যোগ্যও ভাবেন না তিনি।

ঈর্ষা—ঈর্ষা ছাড়া আর কি! বিশাখা বসুর বই বাজারে না বিকোলে প্রকাশকরা মুখ দেখে তার লেখা ছাপত না। এই লেখার দৌলতেই আজ তিনি অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত। অনেকের ঈর্ষার পাত্রী। বাজারে বেরুনো মাত্র তাঁর বই ঝটপট বিক্রি হয়ে যায় না বটে, তবু যাকে বলে 'স্টেডি সেল' সে-তালিকায় তাঁর নাম ওপরের দিকে। তাছাড়া বছরে একটা দুটো সিনেমা হয়ই তার গল্পের। সেখান থেকে মোটা টাকা আসে। বাড়িখানা পৈতৃক, কিন্তু নিজের টাকায় এ-বাড়ির তিনি আমূল সংস্কার করে নিয়েছেন, বাড়িতে টেলিফোন এনেছেন। গোটাচারেক ব্যাঙ্কে এ-যাবৎ নগদ টাকাও মন্দ জমে নি। বাংলাদেশের লেখিকা, এর বেশি আর তিনি কি আশা করতে পারেন?

তাই ওই আয়না, ওই আয়নাটাই তার দুনিয়ায় সব থেকে বেশি প্রিয়।

কিন্তু মাঝে মাঝে ইদানীং কেমন একটু ক্লান্তি অনুভব করছেন তিনি। আর মেজাজটাও যেন সব সময়ে তেমন ভালো থাকে না।...বাড়ি গাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা—তারপর কি? তারপর আরো যেন কিছু একটু থাকলে ভালো হত। না, সংসার নয়—সংসারের মায়া তাঁর নেই। এই মায়া তিনি সময়ে ছেঁটে দিতে পেরেছিলেন বলেই আজ এটুকু সার্থকতার মুখ দেখেছেন। নইলে ওই অবিনাশ বিশ্বাসের মতোই তাঁর সব স্বপ্ন যে ধূলিসাৎ হত তাতে একটুও সন্দেহ নেই।...তবে কি? হয়তো কিছুই

নয়। বয়েসের ক্লান্তি। অথবা শরীরটাই খারাপ হয়েছে। সময় করে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

বন্ধ দরজায় বেশ জোরেই শব্দ হল ঠকঠক করে। বাড়ির কেউ এত জোরে শব্দ করে না। ভুরু কুচকে চেয়ার ঠেলে উঠলেন বিশাখা বসু।

দরজা খুলে অবাক একটু। অবিনাশ বিশ্বাস।

বাংলাদেশের বাস্তব সাহিত্য-শহিদ অবিনাশ বিশ্বাস। শহিদমূর্তিই বটে। প্রায় মাস ছয় বাদে দেখলেন তাঁকে বিশাখা। এই ছ'মাসে কম করে ছ'বছর বয়েস বেড়ে গেছে। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে, চোখ দুটো গর্তে।

—কি ব্যাপার, এ সময়ে?

সামনের ইজিচেয়ারটায় গা ছেড়ে দিয়ে বসলেন অবিনাশ বিশ্বাস।—এলাম একবার। সামনের টেবিলের লেখা পত্রের দিকে চোখ গেল। লিখছিলে বুঝি ডিসটার্ব করলাম?

বিশাখা জবাব দিলেন না। প্রশ্নের মধ্যেও ব্যঙ্গের সুর বাজল কিনা ধরতে চেষ্টা করছেন।

—ভালো কথা, অসুখের মধ্যে তোমার নতুন বইখানা হাতে এল কি যেন নাম ফাগুনের আগুন পড়ে ফেললাম।

ভালো বিক্রির নতুন বই, মোটা বই। কেমন লাগল শোনার আগ্রহ বিশাখার। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে রাজি নন। হেসে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, বল কি, এতটা সময় বাজে খরচ করে ফেললে।

হাসলেন একটু অবিনাশ বিশ্বাসও।—না পড়তে মন্দ লাগে না, তবে কি জানো, তোমার লেখার বয়েসটা তোমার ওই রোমান্টিক নায়ক নায়িকার মধ্যেই আটকে রইল—

ভিতরে বড় রকমের একটা আচড় পড়ল বিশাখার। তবু হেসেই বললেন, বয়েস বাড়লে মূর্তিখানা কেমন হয় সে তো সামনেই দেখছি, ওরকম হলে ভালো হত?

অবিনাশ বিশ্বাসের কোটরাগত চোখে কৌতুকের আভাস ছড়াল একটু। জবাব দিলেন, ভালো হোক না হোক, ইচ্ছে করলেই ওরকম হওয়া যায় না গ্যাস্ট্রিক আলসার না কি বলে তাইতে ভুগছি, দু'দিন ভালো থাকি তো চারদিন বিছানায়। যাক, শ খানেক টাকা আমাকে দিতে পারো? খুব দরকার

বিশাখার দু'চোখ তার মুখের ওপর থমকাল একটু। তারপরেই কড়া জবাব দিতে ইচ্ছে করল, না, দিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল, না বালিকা লেখিকার টাকা হাত পেতে নেবে কি করে? নায়ক নায়িকার মধ্যে লেখিকার বয়েস আটকানোর খোচা দিয়ে প্রকারান্তরে এই কথাই তো বলা হয়েছে তাকে।

মুখের ওপর সহিষ্ণুতার আবরণটাই ধরে রাখলেন তবু। সহজ সুরেই বলে উঠলেন, হঠাৎ এমন টাকার দরকার পড়ল কেন?

রোগজীর্ণ মুখখানা আরো বিচ্ছিরি দেখাল মানুষটার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ভিক্ষা করতে বেরিয়েছি দেখেও বুঝতে পারছ না। অবিনাশ বিশ্বাস মরেছে,

—আবার জবাবদিহি করতে হবে? যাক, লেখ তুমি, চলি—

ভিতরে ভিতবে একটা নিষ্ঠুর আনন্দ হচ্ছে বিশাখার। বললেন, বোসো বোসো, দিচ্ছি—একটু চা খাবে?

—চা? দিতে পারো। তবে ডাক্তার ব্যাটারা বারণ করে—

—থাক, চা খেয়ে কাজ নেই তাহলে। আধা-আধি ঘুরে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ টেনে খুললেন। এক গোছা নোট বার করলেন ভিতর থেকে। তারপর গুনে দশ টাকার দশটা নোট রেখে বাকিগুলো তাচ্ছিল্যভরে দেরাজে ফেলে দিলেন।

—নাও!

টাকা নিয়ে বাংলাদেশের বাস্তব সাহিত্যের পুরোধা অবিনাশ বিশ্বাস চলে গেলেন।

দরজা খোলা। সেদিকে চেয়ে বিশাখা বসুর দু'চোখ জ্বলছে। আবার সেই সঙ্গে উৎকট রকমের একটা আনন্দও হচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

এই সেই একজন, তার বয়েসকালের শ্রী দেখে একদিন যে মুগ্ধ হয়েছিল। আর শেষে হতাশ হয়ে এবং সবশেষে মরিয়া হয়ে এক রাতে যে তার ওপর দস্তুরমতো হামলাই করেছিল।

দু'জনেরই সামান্য অবস্থা তখন। অবিনাশদের আরো খারাপ অবস্থা। বিশাখার বয়েস তখন বাইশ, অবিনাশের সাতাশ। উনি তখন বিদ্রোহীর মতোই সাহিত্যের আসরে ঢুকে পড়েছেন, আর বিশাখা সবে সাহিত্য-চর্চা শুরু করেছেন। অবিনাশ বিশ্বাস বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন আর বিশাখা সভয়ে সেটা নাকচ করেছেন। কারণ তিনি তখন সাহিত্য রচনার নয়া স্বপ্নে বিভোর। বলেছেন, বিয়ে করলে সব যাবে, তার থেকে দু'জনেরই অবিবাহিত থাকা ভালো, অভাবে কুঁকড়ে গেলে সাহিত্য চুলোয় যাবে। অবিনাশ বিশ্বাস বলেছেন, সিলি!

বিশাখার মত বদল হচ্ছে না দেখে তাঁর অসহিষ্ণুতা বেড়েছে। শেষে এক রাতে নিরিবিলিতে তাকে এই বাড়ির ছাদে পেয়ে আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা ধরাশায়ী। আঘাতের ব্যথায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। আরো করতেন, কিন্তু ওই নৃশংস মানুষ নিজের মুখ দিয়ে তার মুখ চেপে রেখে কণ্ঠরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে তার শরীরটা যেন দুমড়ে মুচড়ে ভাঙছিলেন। আর বলছিলেন, শুধু স্বপ্ন দেখে সাহিত্যিক হওয়া যায় না...

প্রাণপণ চেষ্টায় এক অন্তিম মুহূর্তেই বুঝি নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পেরেছিলেন বিশাখা বসু। হাত আর পায়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় বুকের ওপর থেকে লোকটাকে ছিটকে পড়তে হয়েছিল। তারপর চোখের পলকে আলুথালু বেশেই বিশাখা নিচে ছুটে পালিয়েছিলেন।

তারপর বাস্তবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অবিনাশ বিশ্বাস। খুব একটা সাধারণ মেয়েকে ঘরে এনেছেন। এখন তাঁর চার ছেলে দুই মেয়ে। বাস্তবে ঝাঁপ দেবার ফলে অবস্থা এখন কোন চরমে ঠেকেছে, সে তো নিজের চোখেই দেখলেন।

মাসখানেক পরের কথা।

টেলিফোনে এক সাহিত্যিকের মুখ থেকে শুনলেন, অবিনাশ বিশ্বাস আবার শয্যা

নিযেছেন। অবস্থা খুব ভালো না। তাব ওপব ছেলেমেযেব ভাবনায চোখে ঘুম নেই। বলছিলেন নাকি চোখ বুজলে ওদেব ভিক্ষে কবতে বেরুতে হবে।

বিকেল পর্যন্ত থমথমে মুখ বিশাখাব। কি ভাবছেন তিনিই জানেন। তাবপব গাডি নিযে বেবিযে পডলেন।

ঠিকই শুনেছিলেন। এমন দুববস্থা তিনি কল্পনা কবতে পাবেন নি। সর্বত্র যেন প্রেতছাযা পডে আছে একটা। চাদব-শূন্য ছেডা বিছানায উবুড হযে আছে এক কঙ্কাল-মূর্তি। অবিনাশ বিশ্বাস। লিখছেন তিনি।

তাকে দেখে কলম ফেলে সোজা হযে বসলেন। মুমূর্ষু মুখে খুশিব অভিব্যক্তি। —এসো, দু'দিন তোমাব কথাই ভাবছিলাম—তোমাব টাকাটা বোধহয আব এ জীবনে শোধ কবা গেল না।

হাত দশেক দূবে কঙ্কালসাব আব একটি নাবীমূর্তি। তাব স্ত্রী। এদিকেই চেযে আছেন। থতমত খেযে বিশাখা বললেন, অসুখ শুনে দেখতে এলাম, শবীব তো খুব খাবাপ দেখছি।

—হ্যা। ঘাড ফিবিযে অদূবেব বমণীব দিকে তাকালেন।—কই গো, বিশাখা এলো, একটু চা বানাও দেখি।

মহিলা উঠে গেলেন। বিশাখা বাধা দিতে চেষ্টা কবেও পাবলেন না।

অবিনাশ বিশ্বাস আবাব বললেন, এই লেখাটা যদি শেষ কবে যেতে পাবি তাহলে কিছু টাকা পাব—শেষ হবে কিনা কে জানে, এখনো অর্ধেক বাকি, হলে পাবলিশাবকে বলে দেব, তোমাব টাকাটা যেন আগে দিযে দেয।

বিশাখা এ-প্রসঙ্গ এডাতে চেষ্টা কবলেন। সমহ অসুখটাব কথাই উঠল আবাব। অবিনাশ বিশ্বাস সখেদে বললেন, নিজেব জন্যে তো ভাবি না, যা হয হবে,—ছেলেমেযে ক'টাব জন্যেই চিন্তা।

বিশাখাব ইচ্ছে হল ফস কবে বলে বসেন, কেন, বাস্তব সাহিত্য শহিদেব আবাব এই দুশ্চিন্তা কেন? কিন্তু আঘাত দিতে মন সবল না। তিনি আঘাত দিতে আসেন নি, ববং উদাব হতে এসেছেন। উদাব হযে লোকটাব চোখ খুলে দিতে চেযেছেন।

একটু চুপ কবে থেকে বললেন, এক কাজ কব, তোমাব বড দুই ছেলেকে আমাব কাছে পাঠিযে দাও, আমি তাদেব ভাব নিচ্ছি। আমাব কাছে থাকলে আমাব বা তাদেব কাবোবই অসুবিধা হবে না তুমিও কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পাববে।

একটা অবিশ্বাস্য প্রস্তাবই শুনলেন যেন অবিনাশ বিশ্বাস। কোটবাগত দু'চোখে কৃতজ্ঞতা উপচে উঠল। ঈষৎ আগ্রহে বললেন, তুমি তাহলে মেজ আব সেজ ছেলে দু'টোব ভাব নাও—তাদেবই একটু আবামে থাকাব দিকে ঝোঁক বেশি।—বড ছেলেটা একটু-আধটু লিখছে-টিকছে—ভালোই লিখছে—ও এখানেই থাক, জীবন দেখুক, নইলে লিখবে কি কবে—বল।

কতক্ষণ স্তব্ধ হযে বসেছিলেন বিশাখা বসু জানেন না। চাযেব কথা মনেও ছিল না। হঠাৎ উঠে হনহন কবে বেবিযে এসে গাডিতে উঠেছেন।

গাডিতে বসে সমস্ত পথ জ্বলছিলেন।

নিজেই ঘবে এসে সশব্দে দবজা বন্ধ কবলেন।

বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়ালেন।

সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল কেন তাঁর হঠাৎ? নিজের দিকে চেয়ে আজ কি দেখলেন তিনি? কি দেখছেন?

দেখছেন, তাঁরই মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বদিকে পরিপূর্ণ পুরুষের চোখের লোভনীয় সেই এক চির-নাযিকা মেয়েকে। তাঁরই দিকে চেয়ে আজ সে যেন আর্তনাদ করছে। —বিশাখা বসুর এই চুয়াল্লিশের কাঠামোয় সে চির-বন্দিনী। তার মুক্তি নেই।

রুপোলী সংকট

স্বয়ম্ভুবাবুব এমন গোপন ব্যবস্থাটাও ধরা পড়ে গেল। স্ত্রী মনোরমার মুখের দিকে আর তাকাতে পাবেন না। চোখোচোখি হলে নিজের মুখখানাই ভস্ম হবার ভয়।

মনোবমার কালো দু'চোখ দু'টুকবো কয়লাব মতোই ধক-ধক করে জ্বলছে। জবাব না পেযে আবার তিনি চিৎকার কবে উঠলেন, আমি জানতে চাই, ও লোকটা ডাক্তার কিনা?

ও-দিকের ঘরে মেয়ে মন দিযে হায়ার সেকেণ্ডারির পড়া তৈরি করছিল, আর ছেলে বং-পেন্সিল দিযে অস্ট্রেলিয়াব ম্যাপ আঁকছিল। দু'জনেরই মনোযোগে ছেদ পড়ল। দু'জনে দু'জনেব মুখের দিকে তাকালো একবার। দিদি ভাইকে ইশারা করল, অর্থাৎ উঠে দেখে আয না।

ভাই সভয়ে মাথা নাডল, তার দ্বারা হবে না। অগত্যা চেয়ার ছেড়ে সন্তর্পণে উঠে এসে মেয়ে অনু মায়ের ঘবের দরজার আড়াল থেকে ঝুঁকে মুখ বাড়ালো। ও-দিকে গৃহিণীর সন্ধানে ঠাকুর উঠে আসছিল সিঁডি ধরে। কর্ত্রীর তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠ কানে বিদ্ধ হতে সে-ও স্থাণুব মতো দাঁডিয়ে গেছল। তারপর কখন অগোচরে দিদিমণির পিছন থেকে গলা বাড়াতে চেষ্টা করছিল নিজেও জানে না।

—তুমি জবাব দেবে না তাহলে?

—আ-হা বলছি, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বোসো না।

—আমি ঠাণ্ডা হয়ে বসব। গলার স্বর আরো চডল।—নিজে তুমি ঘামছ আব ঠাণ্ডা হবার দরকার আমার? সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র চরণে পাখার রেগুলেটর হাতের এক থাপ্পড়ে ফুল-স্পিড করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দরজার আড়ালে মেয়ের সঙ্গে চোখোচোখি। আব সেই মুহূর্তে দিশেহারা ত্রাসে অনু ঘুরে ছুট দেবার উপক্রম করতেই ঠাকুরের সঙ্গে প্রচণ্ড কলিশন। আচমকা ধাক্কার চোটে ঠাকুর বেচারা মেঝেতে বসে পড়ল। মুখ লাল করে যোল বছরের মেয়ে অনু চোখের পলকে উধাও।

দু'হাত কোমরে তুলে মনোরমা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন। সেই মূর্তি দেখে আধবয়সী ঠাকুর কাঁপতে কাপতে উঠে দাঁড়াল।

মাথার কাপড়টা খসে যাচ্ছিল, অসহিষ্ণু হাতে মনোরমা সেটা টেনে দিয়ে থমথমে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

—আজ্ঞে জিগেস করতে এলাম...

—জিজ্ঞেস করতে এসে গা ঘেঁষে দিদিমণির পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলে কেন? কি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলে?

—আজ্ঞে রেতে বাবুর জন্য আর কিছু রান্না করতে হবে কি না...

—হবে। আমার মাথাটা কেটেকুটে বেশ করে বাবুকে রান্না করে দিতে হবে। বুঝেছ?

মাথা নেড়ে পুরনো ঠাকুর প্রাণের দায়ে নিচে ছুটল। জ্বলন্ত চোখে মনোরমা স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। আঁচলটা আবার মাথা থেকে খসে যাবার উপক্রম হতে তেমনি অসহিষ্ণু হাতে আবার টেনে দিলেন তিনি। আজকাল কপালের ওপরদিকটা ঘেঁষে মাথায় কাপড় দেবার বাইটাও লক্ষ্য করছেন স্বয়ম্ভু বিশ্বাস।...স্ত্রী যখনই কোমবের নিচ পর্যন্ত একপিঠ চুল খুলে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িযে তাতে চিরুনি চালাত—ওদিকের বাড়ির বছর চল্লিশেকের একটা লোক গুটি গুটি তার বাবান্দায় এসে দাড়াত এবং হা করে চেয়ে থাকত। স্বয়ম্ভুবাবু দিন দুই এ নিয়ে ঠাট্টা করার পরেই বারান্দায় দাঁড়িযে কেশ-বিন্যাস তো বন্ধ হলই, তার ওপর মাথায় কাপড উঠল। সেই ঠাট্টার দরুণ স্বয়ম্ভুবাবু মনে মনে অনুতপ্ত। চিরুনি হাতে চুলেব বোঝা বিন্যস্ত কবাব চেষ্টায মনোরমার শবীরটা পিছনদিকে একটু বেঁকে বেকে যেত।...শুধু ও-বাড়িব হ্যাংলা লোকটা নয, স্বয়ম্ভুবাবু নিজেও তখন মুগ্ধচোখেই চেয়ে দেখতেন।

...সেই দৃশ্য ছ'মাস হয়ে গেল আর দেখেন না। স্ত্রীটি তাঁর শৌখিন, প্রসাধন-পটু এবং প্রসাধনের সমজদার। এখন চুল আঁচড়ানো ছেড়ে আধঘণ্টার প্রসাধনপর্বও বাথরুমেই সেবে আসেন। অবশ্য আয়না-টায়না ফিট করা সেই রকমই আধুনিক বাথরুম তাঁর। কিছু বললে ঝঙ্কাব দিযে ওঠেন, ছেলে-মেয়ে বড হয়ে উঠেছে, যা করা উচিত তাই করছি —তুমিও আর কচি খোকাটি হযে না থেকে ওদেব বাপের মতোই চলাফেরা করো।

দুই চোখে সামনের মানুষটার মুখখানা ভস্ম করতে চেষ্টা করে মনোরমা আবাব ঝলসে উঠলেন, কি, তুমি জবাব দেবে না?

মুখ কাঁচু-মাচু কবে স্বযম্ভুবাবু বললেন, ডাক্তারই—ইয়ে ডাক্তার কি বন্ধু হতে নেই নাকি!

মনোরমা চেঁচিযে উঠলেন, আমি তোমাব একটাও বাড়তি কথা শুনতে চাই না, জিজ্ঞেস করছি জবাব দাও—কিসের ডাক্তার ওই লোকটা, পাগলের ডাক্তার?

স্বয়ম্ভুবাবু প্রমাদ গুনলেন। জবাব দিলেন, ও-ভাবে বলছ কেন—বিলেত-ফেরত মস্ত ডাক্তার, যে-কোনো কারণে মানসিক অশান্তি হলে ওঁরা সাহায্য করতে পারেন...

রাগে চোখে-মুখে আগুন ঠিকরোচ্ছে মনোরমার।—মানসিক অশান্তির জন্য তুমি পাগলের ডাক্তার এনে হাজির করেছ? তলায় তলায় পাগলের চিকিৎসা করাচ্ছ? এই জন্যেই রাত-দিন ঘুম পায় আমার!

—আহা মনো, তুমি বুঝছ না...

—আমি বুঝছি না? লোকের কাছে আমাকে তুমি পাগল বানাতে চাও, আমি

বুঝছি না? এত সাহস তোমার? সবাই তোমাকে কচি কচি বলে, স্ত্রীকে পাগল বানিয়ে বাতিল করতে পারলে আবার একটা বিয়ে-থাওয়া করার সুবিধে হবে, কেমন?

—আঃ মনো! ছেলে-মেয়ে শুনতে পাবে।

রাগে কাঁপছেন মনোরমা। চাপা স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন. শুনুক, তোমার স্বভাব-চরিত্র বিয়ের আগে থেকেই আমার জানা আছে।

স্বয়ম্ভুবাবু ক্রুদ্ধ স্ত্রীটির মুখের ওপর বলতে পারলেন না, বিয়ের আগে থেকে বা পরে থেকে তাঁর চরিত্র খারাপের যতটুকু নজির তাঁর স্ত্রীর হাতে আছে (অবশ্য অনেক আছে), তার সবটুকুর সঙ্গেই মনোরমা নামে একটি মেয়ে ভিন্ন দুনিয়ার আর কোনো রমণীই যুক্ত নয়। আর স্বভাব-চরিত্রের এখনো যে সঙ্গোপন বেচাল ধরা পড়ে তাও এই স্ত্রীটিকেই কেন্দ্র করে।

কিন্তু আপাতত এই রসিকতা করাব দুঃসাহস নেই স্বযম্ভুবাবুর। রণে ভঙ্গ দিযে তিনি সোজা নিচে পালিয়ে এলেন।

ছ'মাস হল বাড়ির হাওয়া একেবারে বদলে গেছে। যেখানে কারণে অকারণে খুশির ছড়াছড়ি, সেখানে দিন-রাত থমথমে গুমোট একটা। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন বাড়ির কর্ত্রীর মেজাজ চড়া। আর তার পর থেকেই সেই মেজাজ একটু একটু করে এমনই চড়তে লাগল যে বাড়ির সব-ক'টি প্রাণী সচিকত। ছেলে-মেয়ে সন্ত্রস্ত মা কখন তাদের ওপর ফেটে পড়ে ছোকবা চাকর শাম্‌টা হাড়। পাজী—কর্ত্রীর মুখের ওপব দিনকে রাত কবতে ওস্তাদ। সে এখন কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাতেও সাহস করে না। আর সব থেকে অবস্থা কাহিল বাড়ির কর্তাটির। মনোরমার সব রাগ যেন তাঁরই ওপর। তাঁকে দেখলে ঝলসে ওঠেন, না দেখলে আরো বেশি। স্বয়ম্ভু চৌধুরী আকাশ-পাতাল খুঁড়েও ভেবে পাচ্ছেন না কি হয়েছে বা কি হতে পাবে। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছেন, ফল বিপবীত হয়েছে। শেষে অবস্থা এমন দাড়াল যে, ভরসা করে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না তিনি। গোপনে এক মানসিক চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে বন্ধু পরিচয় দিয়ে তাকে বাড়ি এনে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সে-ভদ্রলোক এখনো ভাল করে চিকিৎসা শুরু করারই অবকাশ পান নি। সবে স্নায়ু ঠাণ্ডা রাখার কিছু ওষুধ দিয়েছিলেন। দু'বেলা চায়ের সঙ্গে আর কফি মেশানো দুধের সঙ্গে স্বয়ম্ভুবাবু সেইসব বড়ি গুলে নিজের হাতে স্ত্রীকে আদর করে খাওয়াচ্ছিলেন। তাও ধরা পড়ে গেল।

...প্রেসক্রপশনটা হাত-কাটা কোর্তার ভিতরের পকেটে রেখেছিলেন তিনি। খুচরো পয়সাব দরকার পড়তে সেই পকেটে হাত ঢুকিয়েছিলেন মনোরমা। পয়সার বদলে হাতে মানসিক চিকিৎসকের ছাপানো প্যাডের কাগজে লেখা মনোরমা দেবীর নামের প্রেসক্রপশন দেখে প্রথমে হতভম্ব তিনি। তারপর এই তাণ্ডব।

মনোরমার বয়েস এখন সাঁইতিরিশ। মেয়ে সামনে না থাকলে এখনো বত্রিশ-তেত্রিশ বলে চালানো যায়। মেয়েটা যে ষোল না হতেই ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে সেটা তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। কিন্তু মেয়ের বাড়ন্ত গড়ন। স্কুল থেকে এসে প্রায়ই

বলত, আর ফ্রক পরতে ভালো লাগে না, টিচাররা পর্যন্ত হাসে। টিচাররা হাসে শুনে মনোরমা চটেছেন। কিন্তু ফ্রক পরলে মেয়েকে যে আর মানায় না সেটা নিজেও স্বীকার করতে পারেন না।

শাড়ি ধরার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে যেন হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে গেল। সেও তার চোখে খুব ভালো লাগে নি। মেয়ে অনু বাপের মুখের ছাঁদ পেয়েছে, কিন্তু শরীরের গড়ন মায়ের মতো পরিপুষ্ট। ওদিকে ওর থেকে চার বছরের ছোট বিনুর মুখের ছাঁদ মায়ের মতো, কিন্তু শরীরের ধাঁচ বাপের মতো ছিপছিপে, পাতলা। ভাই-বোনের দেহ-সৌষ্ঠব উল্টো হলে মনোরমা খুব অখুশি হতেন না।

মা এবং মেয়ের পরিপাটি সাজ-সজ্জার ওপর বেশ একটা প্রীতি আছে। মনোরমার বরাবরই ছিল। সাজতে-গুজতে ভালবাসতেন। শুধু তাই নয়, দেহ-সৌষ্ঠব বেশ আঁটো-সাটো রাখার দিকেও গোপন প্রয়াস ছিল একটু। ছেলে-মেয়ে দুটো হবার পর শরীরের বাঁধুনি ঢিলে ঢালা হয়ে না যায় সেদিকেও প্রখর দৃষ্টি ছিল। বিনু হবার পর স্বামীকে স্পষ্ট নোটিস দিয়েছেন, আর নয়, এই দুটোই বেঁচেবর্তে থাক।

স্বয়ম্ভুবাবু গোবেচারার মতো বলেছিলেন, আমি তাহলে যাই কোথায়।

মনোরমা সুচারু মুখঝামটা দিয়েছেন, কোথাও আর গিয়ে কাজ নেই—কেন, আজকালকার দিনে ব্যবস্থার কিছু অভাব আছে নাকি।

সাজ-সজ্জা আর দেহ-চর্চার প্রতি মনোরমার স্বাভাবিক আকর্ষণ তো আছেই, তা ছাড়াও এর আরো একটু কারণ আছে। পুরুষমানুষগুলোকে তিনি খুব বিশ্বাস করেন না। তার ঘরের এই পুরুষটিকে তো আদৌ বিশ্বাস করেন না। তার অনেক লোলুপ অনাচারের সাক্ষী তিনি নিজেই। এর ওপর একজনের জীবনের একটা ঘটনা মনের ওপর বেশ ছাপ রেখে গেছে। স্কুল কলেজে মনোরমার একটি প্রিয় বান্ধবী ছিল—সম্ভব খুব ভালো ছাত্রী ছিল সুগতা, ম্যাট্রিকে মেয়েদের মধ্যে স্কলারশিপ পেয়েছিল। বি এ পড়তে পড়তে তার এক স্কলার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। মনোরমার ধারণা ছিল, দুই স্কলারে মিলে স্বর্গরাজ্য রচনা করবে। সুগতার চেহারা ভালো ছিল না, রোগা ছিল। তার ওপর প্রায়ই অসুখে ভুগত। পাঁচ বছর না যেতে দেখা গেল ওর বর অন্য বান্ধবী জুটিয়ে দিব্যি ফুর্তিতে আছে। আরো দু'বছর যেতে আত্মহত্যাই করে বসল মেয়েটা। সেই সুগতা একদিন মনোরমাকে বলেছিল, স্বাস্থ্য আর চেহারাপত্রের দিকে নজর দিস, পুরুষের চোখে ওটাই আসল জিনিস।

সুগতার বাক্য মনোরমার কাছে বেদবাক্য।

স্বয়ম্ভুবাবুর বয়েস এখন তেতাল্লিশ। কিন্তু সেটা বিশ্বাস করতে হলে ঠিকুজি-কুষ্টি বার করতে হবে। দেখলে টেনে-টুনে বড়জোর তেত্রিশ বলা যায়। তাঁর নামটাই যা ভারিক্কি, আর কোনো ব্যাপারে ভারি কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। শেভ-টেভ করলে একেবারে কচি চেহারা। বড় চাকরি করেন। কিন্তু তার অধস্তন অফিসারদের সকলেরই অনেক বেশি জাঁদরেল মূর্তি তার থেকে।

বয়েসকালে প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল তাদের। একই বাড়ির ওপর নিচের বাসিন্দা ছিলেন তারা। প্রেম নয়, প্রেমের বন্যা। স্বয়ম্ভুবাবু যাকে বলে একেবারে অন্ধের মতো

আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রেমের সেই দুর্বার বেগ মনোরমা ঠেকাতে পারেন নি। অবিশ্বাসের মানুষ হলে মনোরমাকে বিয়ের আগেই আত্মহত্যা করতে হত। কি যে ত্রাসে কেটেছিল কিছুদিন, তিনিই জানেন।

তারপর থেকে এই ছ'মাস আগে পর্যন্তও মনে করতে পারার মতো অশান্তি কিছু হয় নি।

এর মধ্যে স্ত্রীর হঠাৎ এই মানসিক অবস্থা। স্বয়ম্ভুবাবুর মাথা খুঁড়ে কারণ খোঁজারই কথা। উঠতে বসতে মনোরমার এমন রাগ, এই মেজাজ, আর শুকনো খরখরে মুখ দেখে তিনি বিষম বিচলিত।

মাসচারেক আগের কথা। তখনো মেজাজের এতটা বাড়াবাড়ি শুরু হয় নি। তবে বেশ ব্যতিক্রম বোঝা যাচ্ছিল। তিন-চার দিনের জন্য স্বয়ম্ভুবাবুর ছোট শালী কানপুর থেকে বেড়াতে এসেছিল। যাবার আগের রাত্রিতে সে কথায় কথায় ঠাট্টা করেছিল, জামাইবাবু চেহারাখানা যে রেখেছ, এখনো তো দিব্যি আর একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া যায়।

স্বয়ম্ভুবাবু ফিরে রসিকতা করেছিলেন, সবই তোমার দিদির হাতযশ, আমার কোনো কেরামতি নেই।

স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তে দেখেন থমথমে মুখ তার।

পরদিন বিকেলে বারান্দায় রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ম্ভুবাবু। কিছুই দেখছিলেন না। হঠাৎ পাশ থেকে মনোরমার হিসহিস চাপা ভর্ৎসনা কানে আসতে সচকিত।—শালী চেহারা কাঁচা বলে গেল বলে এখনো হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার মেয়ে দেখার বয়স আছে নাকি? ওদিকে নিজের মেয়ের বয়েস হয়েছে সে খেয়ালও নেই। লজ্জাও করে না।

স্বয়ম্ভুবাবু বিমূঢ়। রাস্তা দিয়ে তখন সত্যিই কয়েকটি অল্প-বয়সী মেয়ে যাচ্ছিল। সভয়ে চেয়ে দেখেন মনোরমার চোখ-মুখ যেন জ্বলছে।

ছ'মাস হয়ে গেল, কারণে-অকারণে এই জ্বলুনি বেড়েই চলেছে। এমন বাড়া বেড়েছে যে তাকে গোপনে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।

হঠাৎ দিন দশেকের একটা শক্ত জ্বরে পড়ে গেলেন স্বয়ম্ভুবাবু। জ্বর ছাড়ছেই না দেখে বড় ডাক্তার পর্যন্ত আনতে হয়েছিল। জ্বরটা ছাড়ার পরেও দুর্বল।

মনোরমা গম্ভীর মুখেই সেবা-শুশ্রূষা করে চলেছেন। সেদিনও বসে ক'দিনের তেল-না-পড়া লালচে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি। হঠাৎ কি দেখে দু'চোখ উদ্ভাসিত তার। বলে উঠলেন, ওমা, এ দেখি একটা পাকাচুল। নোড়ো না, নোড়ো না..

ঝুঁকে অস্বাভাবিক আগ্রহে স্বামীর মাথার পাকা চুলটা বেছে তুললেন তিনি। তারপর সেটা সামনে ধরলেন। স্বয়ম্ভুবাবু অবাক প্রথম। স্ত্রীর চোখে-মুখে চাপা আনন্দ যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

—দেখি আর আছে কিনা। তেমনি আগ্রহে আর উদ্দীপনায় আবার মাথার ওপর ঝুকলেন তিনি। একটু বাদেই আবার অস্ফুট আনন্দধ্বনি।—এই তো দেখি আর একটা।

বেছে তুললেন সেটাও।—তবে যে বড় রুচি সেজে বেড়াও! দাঁড়াও দেখি আরো আছে কিনা।

স্ত্রীর এমন হাস্যোদ্ভাসিত মুখ স্বয়ম্ভুবাবু ছ'মাসের মধ্যে আর দেখেন নি। তিনি আশা করতে লাগলেন আরো যেন অনেক পাকা চুল বেরোয় তাঁর মাথা থেকে।

আরো গোটাদুই বেরুলো। আর সেই সঙ্গে মনোরমার চেহারাই যেন বদলে যেতে লাগল। ছেলের স্কুল থেকে ফেরার সাড়া পেয়ে পাকা চুল খোঁজার আনন্দে ছেদ পড়ল।

সেই বিকেল সেই সন্ধ্যায় সেই রাত্রিতে ছেলে মেয়ে ঠাকুর চাকর পর্যন্ত অবাক। একটানা দীর্ঘদিনের একটা অনড় দুর্যোগ হঠাৎ জাদুমন্ত্রে কেটে গেছে যেন। একজনের আনন্দের ছোঁয়ায় বাড়ির এতদিনের গুমোট এক মুহূর্তে হালকা হয়ে গেছে।

স্ত্রী যা-ই ভাবুন, স্বয়ম্ভুবাবু বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি নতুন করে কিছু বিশ্লেষণ-মগ্ন হয়েছেন। যথা, তাঁর মাথায় পাকা চুল দেখার পর এ-রকম হাওয়া বদল হয়ে গেল কেন? স্ত্রী ছ'মাস ধরে মাথায় শাড়ির আঁচল চাপাচ্ছে কেন? প্রসাধন আর কেশ-বিন্যাস আজকাল বাথরুমে সম্পন্ন হয় কেন? ড্রেসিং টেবিলেব দেরাজ ছ'মাস ধরেই চাবি-বন্ধ থাকছে কেন?

সকালে বাজার এলে ঘণ্টা দুই নিচে থাকেন মনোরমা। গা-আলমারিব ওপরের তাকে তাঁর চাবি থাকে। সেই সময়ে চট করে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুললেন স্বযম্ভুবাবু। দেরাজে সারি সারি তেলের শিশি—সব ক'টার গায়ে চুল তাজা আর কাঁচা রাখার বিজ্ঞাপন।

...রাত্রি গভীর। স্বয়ম্ভুবাবু নিঃশব্দে উঠে ঘরের আলো জ্বাললেন। ঘুমন্ত মনোরমাব শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালেন। না, মাথায় এখন কাপড় নেই। স্বয়ম্ভুবাবু ঝুঁকে দেখলেন। চুলের ফাঁকে ফাকে রুপোলী রেখা।

পরদিন।

স্বয়ম্ভুবাবুর আরো দিনতিনেক ছুটি আছে। বেলা দুটো-আড়াইটে নাগাদ মনোরমা অনেকদিন বাদে পাশের বাড়ির দিদির ঘরে গল্প করতে গেছে। আগে রোজই আড্ডা বসত।

স্বয়ম্ভুবাবু সেই অবকাশে ছোকরা চাকর শামুকে ডাকলেন। বললেন, পাকা চুল বাছ—এক-একটা তুললে চার পয়সা।

ওকে হাড়ে হাড়ে চেনেন স্বয়ম্ভুবাবু। তিনি একটু বাদে ঘুমেব ভান করে পড়ে রইলেন, শামু পাকা চুল বাছতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আঁতি-পাতি করে খুঁজে দুটো পেল কিনা সন্দেহ।

এক ঘণ্টা বাদে ঘুম ভাঙার মতো করে হাই তুললেন স্বয়ম্ভুবাবু।—সেই থেকে তো পট পট করে তুলে চলেছিস, দেখি ক'টা হল?

সুযোগ পেয়ে চোখ-কান বুজে শামু বলল, সতেরোটা।

ওর গালে একটা চড় বসাতে ইচ্ছে করল স্বয়ম্ভুবাবুর। কিন্তু হাসি-মুখেই বললেন, তোর মা-কে ফিরতে দেখলে আমাকে খবর দিস তো, আর তখনই পয়সা নিয়ে যাস।

একটু বাদেই শামু এসে খবর দিল মা আসছেন। স্বয়ম্ভুবাবু ধীরেসুস্থে ব্যাগ খুলে পয়সা বার করতে লাগলেন। ইত্যবসরে মনোরমা ঘরে ঢুকলেন। আর তখনি স্বয়ম্ভুবাবু একটাকা এক আনা শামুর হাতে দিলেন।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের পয়সা?

মুখ কাঁচ-মাচু করে স্বয়ম্ভুবাবু জবাব দিলেন, ও সতেরটা পাকা চুল তুলেছে মাথা থেকে, প্রত্যেকটার জন্য এক আনা করে দেব বলেছিলাম।

—সতেরটা! বিস্ময় আর আনন্দে দু'চোখ কপালে তুলে ফেললেন মনোরমা। —কই দেখি দেখি!

শামু জবাব দিল, ফেলে দিয়েছি তো। কর্ত্রী এত খুশি হবে জানলে সে হয়তো চৌত্রিশটাই বলে বসত।

পরদিন বিকেলের দিকে চুপচাপ একটু বেরিয়ে পড়লেন স্বয়ম্ভুবাবু। তাঁর চেনা বড় একটা স্টেশনারি দোকানে ঢুকলেন। দোকানের মালিককে একপাশে ডেকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন, চুল একটু সাদা করার মতো লোশন-টোশন কিছু আছে?

মালিক অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

স্বয়ম্ভুবাবু আবার বললেন, মানে—পাকা চুল কালো করার যেমন কলপ আছে, তেমনি কাঁচা চুল একটু-আধটু পাকা দেখাবার মতো কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করছিলাম...

দোকানের মালিক তবু হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিলেন, ঠিক বুঝলাম না।

স্বয়ম্ভুবাবু প্রথমে বিরক্ত এবং পরে বিমর্ষ-মুখে দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।

জাল

ঘড়ি দেখলাম। রাত সবে সাড়ে এগারোটা। ঘড়িটা কানে ঠেকালাম একবার। ঠিকই চলেছে। অথচ এতক্ষণে মাত্র আধ-ঘন্টা কাটল? ঠিক এগারোটায় আমি ট্যাক্সিতে উঠেছি। এদিককার ট্যাক্সিগুলো সবই প্রায় ঝকঝকে নতুন। চওড়া বাঁধানো রাস্তা। শিখ ড্রাইভারটার হাতও ভালো। বেশ স্পীডে গাড়ি ছুটিয়েছে। অথচ কেবলই আমার মনে হচ্ছে যে পথটা—পথ কেন, যে বাড়ির যে মানুষটাকে পিছনে ফেলে আসতে চাই, তার দূরত্ব যেন খুব বেশি নয়। আমি এখনো যেন তার নাগালের মধ্যেই আছি।

...বুকের তলায় খচখচ করে উঠল কেমন। যত দূরেই যাই, ওই একজনের নাগালের বাইরে কোথাও এ জীবনে আর কোনো জায়গা খুঁজে পাব কি?

সন্ধ্যার পর ওই লোক এখানকার এক বিদেশী শিকারী বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছল। যাবার আগে আমাকে বলেছিল, লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরে বসে থেকো, আমি ঘন্টা-দু'য়েকের মধ্যে ঘুরে আসছি।

ফিরে এসে সে আমাকে লক্ষ্মীমেয়ের মতোই ঘরে বসে থাকতে দেখেছে। সামনে

এসে দাঁড়াতেই একটা চেনা গন্ধ নাকে এসেছে। মনের অবস্থা ভুলে একটু বিস্মিত চোখেই তাকিয়ে ছিলাম। তাইতেই বুঝেছে। ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে হেসেই বলেছে, ব্যাটা আমাকে কতগুলো ছাইভস্ম গিলিয়ে ছেড়েছে, অনেকদিন অভ্যেস নেই তাই অল্পেতেই ধরে গেল। তারপর আরো জোরেই হাসতে লাগল। বলল, দেখো এটাও তোমার কাছে একটা অস্ত্র বিশেষ, আমার বেনিফ্যাক্টরকে প্রমাণসহ যদি এই খবরটা জানিয়েও একটা তীর ছুঁড়তে পারো, জবাবে কলকাতা থেকে সেই বুড়ো আমার উদ্দেশে একটা কামান ছুঁড়বেন।

আমি চেয়েই ছিলাম। হাসি-মাখা দু'চোখ আমার মুখের ওপর থমকে রইল একটু। তারপর বলল, বেজায় ঘুম পাচ্ছে, শুয়ে পড়িগে, কাল কথা হবে, অনেক কথা...কেমন? ভালো কথা, তুমি খেয়ে নিয়েছ তো?

আমি মাথা নেড়েছি।

—আচ্ছা, গুড নাইট।

চলে গেল। পা দুটো সামান্য টলছিল মনে হল। আমি ঈশ্বরকে কোনোদিন ডাকি নি। মনে মনে কাকে ধন্যবাদ দিলাম জানি না। নিজের ভাগ্যকেও হতে পারে। এই রাত অন্তত লোকটা অঘোরে ঘুমোক এর থেকে বেশি কাম্য আব বোধহয় কিছু ছিল না। সেই ঘুমের ব্যবস্থা নিজেই করে এসেছে।—কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত বোধ করি নি খুব। আমার মুখ দেখে ওই লোকের মনের অগোচরেও যদি কোনো খটকা লেগে থাকে, গাঢ় ঘুমের মধ্যেও হয়তো সে সচকিত হয়ে উঠতে পারে।...তাব ষষ্ঠ চেতনা কত প্রখর এ যদি জানতাম, ত্যহলে ন'শো মাইল পথ ভেঙে এখানে আসতুম না।

সে জানে তার অনুপস্থিতিতে দু'ঘণ্টা আমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরেই বসেছিলাম। আমি তা ছিলাম না। ওই জিনিস খেয়ে না এলে তাও ধবে ফেলত কিনা কে জানে।

...ওই দু'ঘণ্টা সময আমার কাছে কি, সেটা এক আমি ছাড়া দুনিয়ায় কেউ কল্পনা করতে পারবে না। জীবন আর মৃত্যুব মাঝের ফারাকটুকুর মতো। কিন্তু আমি জীবনের পথে ছুটেছি কি মৃত্যুর আঁধারে ঝাপ দিতে?

আমি জানি না।

সে বেরিযে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি। চিমনলাল তখন কিচেনে আমার খাবার বানাতে ব্যস্ত। এ-বাড়ির সে চাকর খানসামা কেয়ার-টেকার সব কিছু। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে আবার ফিরে এসে লক্ষ্মীমেয়ের মতো ঘরে বসে থাকতে আমার চল্লিশ মিনিটও সময় লাগে নি।

...ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড বেশি দূবে নয়। প্রায় সবগুলো ট্যাক্সিরই শিখ-ড্রাইভার। তাই ভালো। দীর্ঘ পথ মুখ বুজে চলার পক্ষে সুবিধে। কোনো ট্যাক্সিতে না উঠে আমি শুধু ড্রাইভার পর্যবেক্ষণ করছি দেখে ওরা একটু অবাক হয়েছিল।

সকলকে দেখার পর এই বুড়ো ড্রাইভারকে বেছে নিয়েছিলাম। এটা একটা সহজাত অনুভূতির ফল। নইলে এ-যাবত বয়স্ক লোকের লুব্ধ কাণ্ডকারখানাও আমি কম দেখি নি। অল্পবয়সীরা বাসনায় হাবুডুবু খাওয়া সত্ত্বেও বয়েসের গুণেই হয়তো কিছুটা উদার হতে পারে। কিন্তু বয়স্কদের বিশীর্ণ লোভ দেখলে গা ঘিনঘিন করে। আর তারা সবদিক

হাতে রেখে হাত বাড়ায়। তবু আধ-বুড়ো লোক বাছার কারণ, অন্য নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। গয়নাপত্রের বেশির ভাগই সুটকেসে, তবু গায়ে যা আছে. এ-সব লোকের তারও লোভে পড়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া আমার এক পরিচিত বান্ধবী ইউ-পি-তে এসে তো হারিয়েই গেল। একলা বেরিয়েছিল, যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে পৌছয় নি। মাঝখানে কার পাল্লায় পড়ে কোথা থেকে কোথায় চালান হয়ে গেছে আজও কেউ জানে না।

ভেসে পড়তে বেরিয়ে এ-সব বিপদেব কথা চিন্তা করা হাস্যকর জানি। বিশেষ করে আমার মতো মেয়েব—বিপদ নিয়েই যার খেলা, বিপদ নিয়েই যার কাববার। তবু মনে যেমন এসেছে তেমনি ব্যবস্থা করেছি। মুখভাব বিপন্ন কবে তুলে ওই আধ-বুডো শিখ ড্রাইভারকে জানিয়েছি, আমার এক নিকট-আত্মীয়ের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, লাকসাবে থাকে, সেখানে জরুবী টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে। বাত সাড়ে ন'টা থেকে এগারোটার মধ্যে সেই টেলিগ্রামেব জবাব মিলবে আশা করছি। যদি ভালো খবর না আসে, তাহলে এই রাতেই আমাকে লাকসাব ছুটে যেতে হবে। কিন্তু তখন কোনো ট্রেন পাওয়ার আশা নেই। অতএব সে-বকম প্রয়োজন হলে সে আমাকে তাব ট্যাক্সিতে লাকসার পৌছে দিতে পাববে কিনা।

—একেলি জায়েঙ্গী?

প্রশ্নটা খট করে কানে লেগেছিল। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল এই ছোট শহবে আছি। এর মধ্যে এরা অনেকেই হয়তো আমাকে একজনেব সঙ্গে তার গাড়িতে বেড়াতে দেখেছে। কিন্তু লোকটার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা সরলই মনে হয়েছিল। ঠিক জানি না, দেরাদুন থেকে লাকসার ট্যাক্সিতে কম করে ছ' ঘণ্টার পথ হবে হয়তো। এই বয়সের মেয়েছেলে সমস্ত রাত একা যাব, প্রশ্ন কবা স্বাভাবিক।

মাথা নেড়েছি। একলাই যাব।

না, লোকটাব সন্দেহ হয নি, মুখের দিকে চেয়ে কি দর হাঁকবে ভেবে নিয়েছে। এদিকেব কোনো ট্যাক্সিতে মিটারের বালাই নেই, দূর বুঝে দর। বলল, বহুত দূবেব পথ, যাওয়া আসা দুটোরই ভাড়া দিলে আপত্তি নেই—অনেক টাকা লেগে যাবে।

এত দূরের পথ কখনো পাড়ি দেয নি হয়তো। তাই বেশ ভেবেই টাকাব অঙ্ক বলল। দুশো টাকা লাগবে।

দবদস্তুব করতে বসলে আরো কিছু কমত হয়তো। তাছাড়া যে অনির্দিষ্ট স্রোতে ভাসতে চলেছি, তাব মধ্যে এক ধাক্কায় অত টাকা খরচ করাটা সেও বিবেচনাব ব্যাপাব হয়তো। কিন্তু আমার মনে তখন এখান থেকে পালানো ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই।

বাক্যব্যয় না করে ব্যাগ থেকে দুটো দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিলাম। ও অবাক, যাব কি যাব না ঠিক নেই, অ্যাডভান্স কি!

যাব কি যাব না সেটা আমি ভালোই জানি। বললাম, না যদি যাই তো ওই কুড়িটা টাকা তোমার হবে, ভালো খবর পেলে ও টাকা কিছুই না।

রাতে খবর নেবার জন্য ও বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে আমি জবাব দিয়েছি,

টেলিগ্রাম যদি আসে আমিই ওই স্ট্যাণ্ডে আসব, তার খবর নেওয়ার দরকার নেই—সে যেন রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করে।

লোকটার আবারও কিছু সন্দেহ মাথায় আসতে পারে ভেবে আর না দাঁড়িয়ে আমি চলে এসেছি। যা-ই ভাবুক, কুড়ি টাকা হাতে পাওয়ার পব আমার যাত্রা যে অনেকখানি নিশ্চিত, সেটা ধরেই নিয়েছিল।

চিমনলাল তখনো কিচেনে ব্যস্ত। ওব অলক্ষ্যেই আবার ঘরে ফিরে এসে লক্ষ্মী মেয়ের মতো বাড়িব মালিকের অপেক্ষা করেছি।

বেরুবার সময় শুধু সুটকেসটা হাতে নিয়ে বেরিয়েছি। ঈশ্বব সহায। ঘুমন্তপুবী থেকেই আমি বেরুতে পেবেছি। ট্যাক্সিতে উঠেছি যখন রাত তখন ঠিক এগারোটা। আধ-বুড়ো শিখ ড্রাইভার একনজবে আমার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়েছে। সুটকেস নিজের হাতে বয়ে আনছি, ওর অবাক হবাবই কথা। তাও তো হোলড-অল বিছানাপত্র পড়েই থাকল। সে আব সঙ্গে আনি কি করে!

লোকটার দৃষ্টি এড়াবাব জন্য আমি ব্যস্তমুখে গাড়িতে উঠে বসতে কোথা থেকে ড্রাইভারেব পাশের এই দ্বিতীয় লোকটা এগিযে এল। এব বয়েস কম, জোযান মানুষ, ওই ড্রাইভাবেবই স্বজাতীয। সে-ও ড্রাইভাবেব পাশে উঠে বসল দেখে অস্বস্তি বোধ কবছিলাম। কিন্তু কিছু বলা-না-বলা বৃথা। সমস্ত বাতের পথ, সঙ্গী নেওযা অস্বাভাবিক নয় ধবে নিয়েই চলেছি।

—তাব মিলি বহিনজী?

বিমনা ছিলাম, তাই চমকে উঠেছিলাম। কি জিজ্ঞাসা করল লোকটা, হঠাৎ ঠাওর করতে পারি না। জবাব না পেয়ে ড্রাইভারের পাশেব লোক আমাকে ঘাড ফিবিয়ে দেখছে।

—কি বললে? ও হ্যাঁ, টেলিগ্রাম পেযেই বেরিযেছি।

শিখ ড্রাইভার পিছন দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করেছিল। জবাব পেয়ে ওর পাশেব লোকও সামনেব দিকে তাকাল।—আমাব মনে হচ্ছিল ওরা কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে ওদের সন্দেহ আবো বাডবে। কাবণ লাকসারে পৌঁছে আমি একটা নামী হোটেলে উঠব। সেই একটা হোটেলেব নামই আমাব জানা, অনেকদিন আগে একবাব দিনকতকেব জন্য সেখানে উঠেছিলাম। ওরা অবাক হযে ভাববে সঙ্কটাপন্ন রোগী হোটেলে থাকে কি কবে, তাব তো হাসপাতালে চালান হবার কথা।

সাগরপারের এক অতি সাধাবণ মেয়ের জন্য রাজাব দুলাল বাজমুকুট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই সাধারণ মেয়েব হাত ধবেছিল শুনেছিলাম। সেই মেয়ে ভাগ্যবতী। কিন্তু তার থেকেও ঢেব সাধাবণ কোনো নরক-দেখা মেয়ের মাথায ওই গোছের ভাগ্যের শিকে ছিঁড়তে দেখলে সে কি করে? কি করে আমি জানি না। আমি ভয়ে ত্রাসে পালাচ্ছি। ছোটার এমন তাড়না এই সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে আর কখনো অনুভব করি নি।

...আমার মুখের দিকে চেয়ে ওই লোক ভিতব দেখতে পেয়েছিল। পালাবার পথ

খুঁজেছি বুঝেছিল। দুই কাঁধে একটা স্পর্শ সিরসির করে উঠল। ঠোঁটেও।...কাছে এসে দুই কাঁধে দু'হাত রেখেছিল। গুরুগম্ভীর হুকুম করেছিল, মুখ তোল। দুটো টানা চোখের গভীরে আমি হারিয়ে যাচ্ছিলাম। নিজের দুই হাঁটুর ওপর জোর কমে আসছিল। কিন্তু ওই অকরুণ দ্রষ্টার দেখা আর শেষ হবে না বুঝি।... শেষ হল, চোখের তারায় হাসি চিকচিক করছে কি অকরুণ অন্তুষ্টি, সেই মানসিক বিপর্যয়ের মৃত্যুতে সেটা সুস্পষ্ট নয়। ঝুঁকে নিজের পুরু ঠোঁট দুটো আমার শুকনো বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর আলতো করে বুলিয়ে দিল একবার। তারপর আমার দণ্ডমুণ্ডের মালিকের মতোই ভারী গলায় বলল, শাস্তি পেতে যারা ডরায় তাদের আমি ঘৃণা করি—এখন থেকে পালাতে চেষ্টা কোরো না, তাতে কোনো লাভ হবে না, একটা ফোন করে দিলে কাছাকাছি কোনো স্টেশনেই ধরা পড়বে—ট্রেন থেকে তোমাকে নামিয়ে আমাকে তারা খবর দেবে।

...জানেও না, ও-ভাবে শাসিয়ে আমার কত উপকার করেছে। বোকার মতো আমি ট্রেনেই পালাবার মতলব এঁটেছিলাম।

...ঘর ছেড়ে যাবার আগে ওই লোক একটু আশ্বস্ত করার সুরে বলেছিল, দুটো দিন সবুর কর, আমার ভাবতে বেশি সময় লাগবে না।

অর্থাৎ দু'দিনের মধ্যে আমার বিচার হয়ে যাবে। নিজেকে বুদ্ধিমতী ভাবি, কিন্তু নিতান্ত বোকা বলেই বিচারের রায় কি হবে আমি ভাবতে পারি নি। ঠোঁটের ওই স্পর্শটুকুই আমাকে ভুল বিবেচনার পথে ঠেলে দিয়েছিল। পুরুষের লোভ আমার জানা আছে। ওই মানুষও সেই লোভের বলি হবে এমন সম্ভাবনা আমার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল। আর তারপর আমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে ওই লোভের দাগ মুছে ফেলতে চাইবে হয়তো। তাই দুটো দিন আমি অপেক্ষা করতে পেরেছিলাম। চূড়ান্ত কিছু ঘটার আগে ওই ভয়ঙ্কর মানুষকে সাময়িকভাবে অন্তত বশীভূত করার ফাঁকে বাঁচার রাস্তা করে নিতে পারি কিনা, সেই আশাটুকুই সম্বল আমার তখন।

কিন্তু আমি মানুষ চিনতে ভুল করেছিলাম।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি আবো জোরে ছুটেছে। নিজেদের মধ্যে ওরা এক-আধ সময় টুকটাক কথা বলছে। এক-একবার মনে হয়েছে সামনের ওই লোক দুটোর মতলব ভালো নাও হতে পারে। কিন্তু তা নিয়েও মাথা ঘামানোর মতো শান্তি অবশিষ্ট নেই আমার। একমাত্র লক্ষ্য, দূরে, অনেক দূরে চলে যাওয়া। বিপদে পড়ি আর না পড়ি, দূরেই চলেছি। শরীর ছেড়ে দিয়ে পিছনে মাথা এলিয়ে দিলাম।

...মাত্র তিন সপ্তাহ আগে কলকাতা ছেড়ে দেরাদুনে এসেছিলাম। নিজের ওপর আস্থা ছিল—জোড়েই ফিরব। ওই যাকে ছেড়ে চলেছি তাকে নিয়ে। সেই জোর অবশ্যই ছিঁড়বে একদিন, কিন্তু তার আগে ওই লোকের কলজে ছিঁড়বে। কতটা ছিঁড়ল আর কতটা রক্তাক্ত হল সেটা দেখতে আমি আর বসে থাকব না।

ট্রেন থেকে দেরাদুন স্টেশনে নেমে দেখি ঝমঝম বৃষ্টি। নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজের ওপরেই বিরক্ত হলাম প্রথম। আসছি দেরাদুনে, কিন্তু সঙ্গে না এনেছি একটা ছাতা, না একটা বর্ষাতি।

শেডের নিচ দিয়ে গেটের বাইরে আসার মধ্যেই অল্পস্বল্প ভিজে গেলাম। এ অবস্থায়

সঙ-এর মতো দাঁড়িয়ে থাকা বিড়ম্বনা। বয়েসকালের সুশ্রী সুশ্রী মেয়েকে জলে ভিজতে দেখলে প্রায় পুরুষের চোখেই যেন দৃষ্টিভোজের উৎসব লাগে। হঠাৎ মনে হল, যেখানে যাচ্ছি তার চোখ কতটা উৎসুক হতে পারে?

একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম। তার মধ্যে আরো একটু ভিজতে হল। ঠিকানার নির্দেশমতো যে বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল, দেখামাত্র আমার কেন যে ধাক্কা লাগল একটু, জানি না। ছবির মত ছোট্ট বাড়ি, দুধের মতো সাদা। দুদিকে চোখ-জুড়ানো ফুলের বাগান, মাঝখান দিয়ে ছোট রাস্তাটা সিঁড়ির মুখে ঠেকেছে। গেট খোলাই ছিল।

দোতলার দিকে মুখ তুলতে গিয়েও তুললাম না। কেউ একজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এ-সব ব্যাপারে আমারও ষষ্ঠ চেতনা অতিমাত্র প্রখর।...ওই একজনই দাঁড়িয়ে আছে। না তাকিয়েও বলে দিতে পারি, তার পরণে ট্রাউজাব, গায়ে হাফশার্ট। না তাকিয়ে এর বেশি আর কতটুকু বলতে পারি? ·

সুটকেস আর বেডিং নিয়ে আসতে বলে আমি একছুটে গেট দিয়ে ঢুকে বারান্দায় এসে উঠলাম। ড্রাইভার আমার পিছনে এসে সুটকেস আর বেডিংটা বারান্দায় রাখল। তার ভাড়া মিটিয়ে আমি শাড়ির আঁচলে মুখ মুছছি।

মুখ থেকে আধ-ভেজা শাড়ির আঁচল সরাতে হল। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। শাড়ীর আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়াতে জড়াতে আমার ভিতরটা দ্বিতীয় দফা হোঁচট খেল কিনা জানি না। কলকাতায় থাকি, অভিজাত মহলের সংস্রবেও কম আসি নি, সুপুরুষ দু'দশজন দেখেছি, কিন্তু আমার ভিতরটা হোঁচট খেল সামনে যে দাঁড়িয়ে সে সুপুরুষ বলে নয়, তার টানা আয়ত দুটো চোখ আর সেই দুটো চোখের দৃষ্টি দেখে। অমন ঘন কালো আয়তপক্ষ্ম শিশুর মতো সরল অথচ স্বচ্ছ একজোড়া চোখ আর বোধহয় দেখি নি। ভাবুকরা হরিণ-চোখের সঙ্গে মেয়েদের ডাগর চোখের তুলনা দেয়, কিন্তু এই চোখ দেখলে তারা কি বলবে জানি না। কলকাতায় এর যে ছবি দেখেছিলাম, তার সঙ্গে সব মেলে, এই চোখ দুটো মেলে না। অবশ্য ছবির চোখের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ছিল।

হঠাৎ আমিই কেমন বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলাম। ওই দুটো চোখ আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নেমে এল, তারপর আবার উঠতে লাগল। এত কাছ থেকে এমন নিঃসঙ্কোচে অপরিচিত দর্শনপর্বও সম্ভব, ধারণা ছিল না। অগত্যা আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি মিঃ রজত গুপ্ত?

মাথা নাড়ল। পাশের সুটকেস আর বেডিংটা একবার দেখে নিল। তারপর দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে হাঁক দিল, চিমন—!

গলার আওয়াজখানা আবার পরিপুষ্ট গম্ভীর। ডাকের রেশ মিলাবার আগেই একটা লোক ছুটে এল। আঙুল দিয়ে তাকে সুটকেস বেডিং দেখিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরল।—এঁর সঙ্গে ওপরে চলে যান, বাথরুমে গরম-ঠাণ্ডা দু'রকম জলই আছে, ডোন্ট ইয়ুজ কোল্ড—গা হাত মাথা বেশ করে মুছে ভেজা শাড়িটা বদলে আসুন, এখানে এসময় জলে ভিজলে চট করে ঠাণ্ডা লেগে যায়।

আমি তবু কিছু বলতে চেষ্টা করতে আবার থামিয়ে দিল।—যা বললাম আগে করে আসুন। চিমনকে বলল, চা—চা না, কফি বানিয়ে রাখ।

অগত্যা চিমনের পিছু পিছু অন্দরে পা বাড়ালাম। একটু হকচকিয়েই গেছি সন্দেহ নেই। এমনও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যেন তারই নির্দেশমতো কোনো মেয়েকে পাঠানো হয়েছে, জলে-ভেজা সেই মেয়ের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে মোটামুটি পছন্দ হবার পর নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে সে অন্দরে ঢোকার নির্দেশ দিয়েছে। তবে সত্যিই এ-রকম মনে হয়নি বা হবে না ওই দুটো চোখের জন্য। বয়েসকালে বোকা মেয়েরাও পুরুষের চোখের ভাষা মোটামুটি পড়তে পারে। ওই দুটো চোখ যেন সভ্য দুনিয়ার কলাকৌশল জানে না, যা দেখার দেখে নেয়, আব তারপর যা করণীয় সেটা নির্দেশ দেয়।

খটখটে শুকনো হয়ে আব তাজা হয়ে দোতলার বাবান্দায় বাড়ির মালিকের সামনে এসে বসতে আধ-ঘণ্টার ওপর সময় লেগে গেল। দু'দিন দু'বাত ট্রেনের ধকলের পর সত্যিই ভালো লাগছিল।

কফি-পট, এগ-পোচ, টোস্ট-বাটার ফ্রুটস সামনে সাজিয়ে গৃহস্বামী আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। হাতে বডসড় বিলিতি জার্নাল একটা। মনে হল ওতে পাঠাব থেকে বঙিন ছবিই বেশি। আমি খুব নিঃশব্দেই এসে দাঁড়িযেছিলাম, তবু টের পেল। জার্নাল থেকে মুখ তুলে তাকাল, এই মূর্তি দেখে দু'চোখ একটু প্রসন্ন যেন।

—বসুন। চিমন, কফিটা আবার নতুন করে বানা, জুড়িয়ে গেছে।

আমি কিছু বলার আগে চিমন যান্ত্রিক তৎপরতায় কফির ট্রে তুলে নিয়ে চলে গেল।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে হেসে বললাম, এসেই উৎপাত শুরু করেছি, আমি কে, কোত্থেকে এলাম, তা বলারও ফুরসত হল না।

নাঃ, ওই দুটো চোখই আমাকে ভোগাবে দেখছি। এত স্বচ্ছ আবাব একই সঙ্গে এত সরলও কাবো চোখ হয়? পুরুষ, অথচ সেই সঙ্গে একটা শিশুর হাসিমাখা চাউনি যেন দিব্যি সোজাসুজি আমাব মুখের ওপব নডে-চডে একটা স্পর্শ বুলিযে দিচ্ছে। পরিতুষ্ট জবাব দিল, আগের কাজ আগে সেবে নিন। খাবারও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—জলের মধ্যে সুটকেস বেডিং নিয়ে ট্যাক্সি থেকে সোজা এখানেই নামলেন যখন, যোগাযোগের ব্যাপার কিছু আছে ধরেই নেওয়া গেছে।

বেলা তখন সাড়ে দশটা হবে, একজনেব প্রাতঃবাশ আসাটাই স্বাভাবিক। সেদিকে মন দিয়ে বললাম, আমাব নাম মীনা দত্ত, কলকাতা থেকে আসছি, আপনার বন্ধু বীরেন গাঙ্গুলী আপনার নামে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, স্টেশন থেকে নেমে সোজা ওখানে চলে যাবে, সব ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। তারপর হেসে যোগ করলাম, এই জলের হিসেবটা তাঁর বা আমার কারো মাথাতেই ছিল না।

ওই মানুষও যে রসিক বেশ, এক কথাতেই বোঝা গেল। হাতের জার্নাল টেবিলে ফেলে সকৌতুকে বলল, জলে পড়েছেন সেটা বুঝে ফেলেছেন তাহলে?

বীরেন গাঙ্গুলীর নাম শুনেই ভদ্রলোকের আগ্রহ বাড়বে ভেবেছিলাম। কারণ বীরেন

গাঙ্গুলী এর অন্তরঙ্গ নয় শুধু, এদের ভাগ্যের আসল চাবিটি এখনো বীরেন গাঙ্গুলীর বৃদ্ধ বাবার হাতে। এদের বলতে এদের দু'ভাইয়ের—রজত গুপ্ত আব কমল গুপ্তর। ভাই বলতে বৈমাত্রেয় ভাই। শুনেছি রজত গুপ্তর এক বছর বয়সে তার বাবা সনৎ গুপ্তর বৈভবের সংসার গৃহিণীশূন্য হয়েছিল। তখন দ্বিতীয় গৃহিণীর আবির্ভাব। কিন্তু ভদ্রলোকের কপাল, দ্বিতীয়াও বছর দশেকের বেশি টেঁকে নি। কিন্তু তারপর আর তৃতীয়ার পদার্পণ ঘটে নি। দু'ভায়ের বয়সের তফাত তিন বছর। রজত গুপ্তর বয়েস একত্রিশ।—বছরের মধ্যে আট-ন'মাসই কলকাতার বাইরে কাটায়, আর তার মধ্যে বেশির ভাগ সময় দেরাদুনে এই নিজের বাড়িতে থাকে। শিকারের মৌসুমে কখন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারবে না। তার দুটো নেশা। এক শিকার, দুই ফুল আর গাছগাছড়া। শুনে বিপরীত-ধর্মী নেশা মনে হয়েছিল আমার।

কমল গুপ্ত কলকাতাতেই থাকে বেশির ভাগ সময়। তার বয়েস আঠাশ। সেখানকার কয়েকটা নামী সেবা-প্রতিষ্ঠান আর উঁচুমহলের বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগ। এককথায় কলকাতার অভিজাত সমাজের সে জনপ্রিয় সদা-ব্যস্তসমস্ত মিষ্টি মানুষ একজন। দু'ভায়ের কারোরই ব্যবসা দেখার মতি নয়, অতএব তাদের বাবা নিজের জীবদ্দশাতেই তাঁর মস্ত এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা মোটা টাকার বিনিময়ে পরের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। কাঁচা টাকা আর নানা জায়গায় বাড়ি-ঘর সমেত মোট যে বিত্ত তিনি রেখে গেছেন, দু'ভায়ের তিন পুরুষ বসে খেলেও সেটা ফুরোবার কথা নয়। কিন্তু সেই ভাণ্ডারের মূল চাবিটি এখনো সনৎ গুপ্তর আবাল্য-বন্ধু অ্যাটর্নি সুরেশ গাঙ্গুলীর হাতে। ভদ্রলোক কড়া সাত্ত্বিক মানুষ। এই দিনেও জপ-তপ না করে জলস্পর্শ করেন না। তাঁর বয়েস এখন সত্তরের কাছাকাছি। বন্ধুর ভাণ্ডারের ট্রাস্টী হয়ে বসার ফলে বয়েস যত বাড়ছে, ভদ্রলোকের অশান্তিও তত বাড়ছে। প্রয়োজনে দুই ভাইকে উদার হাতে টাকা দেন তিনি। কিন্তু ট্রাস্টিশিপের মূল নির্দেশ থেকে এখনো একচুল বিচ্যুত হতে পারেন নি, আবার এ-যাবৎ ফয়সালাও কিছু করতে পারেন নি। এদিকে বয়েস হচ্ছে, শরীর ভাঙছে। তাঁর অশান্তি এই জন্য।

...আর পরিচিতবর্গেব মধ্যে সকলেই জানে, নিজের সঞ্চিত বিত্তভাণ্ডারের ব্যাপারে সনৎ গুপ্তর এই গোছের এক অস্বাভাবিক ব্যবস্থার মূল কারণ তাঁর বড় ছেলেটি—এই রজত গুপ্ত।

বীরেন গাঙ্গুলী এদের সেই বিত্তের ভাণ্ডারী এবং সনৎ গুপ্তর কড়া সাত্ত্বিক বন্ধু সুরেশ গাঙ্গুলীর ছোট ছেলে।

রজত গুপ্ত জিজ্ঞাসা করল, বীরেন আপনার বিশেষ পরিচিত বুঝি?

—তা বিশেষই বলতে পারেন, তাঁর স্ত্রীটি আমার বাল্য-সহচরী, তাই সুযোগ পেলেই শালী-সম্ভাষণ করেন, আর একটু-আধটু হামলা-টামলাও করে থাকেন।

হাসছে। শুনতে ভালো লাগছে বোঝাই যায়। জিজ্ঞাসা করল, এখানে বেড়াতে এসেছেন?

—হ্যাঁ। ওয়েলফেয়ারে চাকরি করি তো, তাই নিজের ওয়েলফেয়ারটা আগে বুঝে নিই—ছুটি-ছাটা পেলেই বেরিয়ে পড়ি। এবারে লম্বা ছুটি, এখানে যতদিন ভালো লাগে

থাকব, ভালো না লাগলে আবার কোথাও পালাব।

হাসিমুখে মন্তব্য করল, তাহলে ভাল যাতে লাগে সে-চেষ্টায় তো আমাকে উঠে-পড়ে লাগতে হবে!

অর্থাৎ আমি এখানেই ছুটি কাটিয়ে গেলে তার আবার ভালো লাগবে। কি-রকম মনে হল, এই গোছের সরলতা এই মুখেই মানায়। লজ্জা পেয়ে উঠে পড়লাম। ঘরে ঢুকে সুটকেস খুলে বীরেন গাঙ্গুলীর চিঠিটা বার করে ঘুরে দেখি বারান্দার চেয়ারে বসে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকেই দেখছে। কিন্তু আশ্চর্য, চোখের ওই স্তুতির মধ্যে চুরির মিশেল নেই!

চিঠির খামটা হাতে দিলাম। পড়ে চিঠিটা টেবিলে রেখে বলল, এ বেলা বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন, বিকেলের দিকে হোটেলেব খোজে বেরুনো যাবে।...কিন্তু হোটেলে কি আপনার বেশিদিন ভালো লাগবে, আমাব তো দু'দিন না যেতেই একঘেযে লাগে—

দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মাপ কববেন, আপনার স্ত্রী এখানে নেই?

মৃদু হেসে জবাব দিল, স্ত্রী কোথাও নেই।

—ও। কিন্তু আপনার ছোট ভাইয়ের তো...যাক, বীরেনদা হোটেল ঠিক করে দেওয়ার কথা লিখেছেন বুঝি?

অবাক একটু।—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

অপ্রতিভ মুখেই হাসতে হল। বললাম, ওই ভদ্রলোক কি দুষ্টু দেখুন, আপনার সম্পর্কে এত বলেছেন, শুধু এইটুকু বাদে। যাক, বীরেনদা আর কি লিখেছেন?

—আপনাব পবিচয় দিযে আর ঢালা প্রশংসা করে লিখেছেন, শ্রীমতী সুরসিকা কিন্তু ভিতরে কড়া, কিছুদিন আমার ভালো কাটার সম্ভাবনা। ভালো মতো দেখাশুনা আর যত্ন-আত্তি কবি যেন। আপনি বেডাতে খুব ভালোবাসেন, তাই এ-ক'দিন আমার গাড়িব অনেক তেল খাওযার সম্ভাবনা।...কিন্তু আপনি কি এখানে থাকবেন ধরে নিয়ে এসেছিলেন নাকি?

—না না, ঠিক আছে। অপ্রস্তুত মুখেই হেসে ফেললাম।—বীরেনদা সুবসিকা লিখেছেন, কিন্তু ঠোঁট-কাটা কতখানি লেখেন নি।...উনি বলেছিলেন আপনার এই ঠিকানায় পৌঁছতে পাবলেই আমার ভাবনা শেষ। এতক্ষণ ভাবছিলাম আপনাব স্ত্রী বোধহয় সকালে কোথাও বেরিয়েছেন, তাই এমন সুন্দর বাড়ি অথচ আপনি হোটেলের কথা বলছেন শুনে অবাক হযেছিলাম, তখন কি জানি আপনার কি অসুবিধে!

রজত গুপ্তর চাউনিটা আমার মুখের ওপর যেন উৎসুক হয়ে উঠল একটু।—আমার অসুবিধে কি, অসুবিধে তো আপনার।

হেসে ফেলে একটা সত্যি জবাব না দিয়ে পারা গেল না। বলে ফেললাম, আরো দশ বছর আগে থেকে অনেক ঘা-পোড়-খাওয়া মেয়ে আমি, তাছাড়া বেড়াবার নেশায়ও কত জায়গায কত পরিস্থিতিতে কাটিয়েছি ঠিক নেই—ভালো আর ভদ্র জায়গা হবে ও-রকম অসুবিধে-টসুবিধের তেমন পবোযা করি না—যাকগে, ধারে-কাছে ভালো হোটেল আছে তো?

জবাব না দিয়ে চেয়ে রইল একটু। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হঠাৎ হাঁক দিল, চিমনলাল—!

তক্ষুনি হাজির। আমি কোনোরকম বাধা দেবার সুযোগ পাবার আগেই হুকুম হয়ে গেল, বারান্দার কোণের ঘর দুটো যেন এক্ষুনি আমার জন্য রেডি করা হয়।

মাথা নেড়ে লোকটা হুকুম পালন করতে ছুটল। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ। বলে উঠলাম, ছি-ছি, আপনি কি ভাবছেন ঠিক নেই, আমার সত্যিই হোটেলেও কোনো অসুবিধে হবে না।

লোকটার মুখে খুশির আমেজ। জবাব দিল, এরপর আপনাকে হোটেলে পাঠানোর কথা ভাবতেও আমার অসুবিধে হচ্ছে।

হাসতে লাগল। অগত্যা আমিও।

ব্যবস্থা সতি৷ সুন্দব। পরিপাটি সাজানো ঘব। অ্যাটাচড বাথ। জানলায় দাড়ালে চারদিকে পাহাড়ের দেয়াল। নিচে তাকালে চোখ-জুড়ানো ফুলের বাগান।

দিনগুলি সত্যিই অদ্ভুত আনন্দের মধ্যে কাটতে লাগল। ভদ্রলোকেব নিজেরও তুমুল স্পীডে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ানোর নেশা। আমাব স্বভাবের সঙ্গে মিলল ভালো। সকালে বিকালে রোজই দূরে দূরে চলে যাই—পাহাডেব দিকে, নয়তো দূরের জঙ্গলের দিকে। ভদ্রলোকের জঙ্গলের দিকটাই পছন্দ বেশি। সঙ্গে বন্দুক থাকে। পাকা শিকারী, জঙ্গল দেখলেই হাত নিশপিশ করে বোধহয়।

সহজ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে দু'দিনও লাগেনি। লোকটাব মধ্যে সত্যিই একটা শিশু-প্রকৃতি আছে। অতএব সঙ্কোচ গিয়ে আমারও হৈ-হুল্লোড় হম্বি-তম্বি বাড়ছে। দিন দশ বা বারো না যেতে এই অন্তরঙ্গতা যে লোকটার ভালো লাগার দিকে ঘেঁষেছে, তাও অনুভব্ করতে পারি। অস্বাভাবিক কিছু নয়। চেহারাপত্রে স্বাস্থ্যে বিধাতার কিছুটা অনুকম্পা আমার ওপর আছে। আর প্রাণপ্রাচুর্যে নিজেকে ভরাট করে তুলতেও সময় লাগে না। দুইই পুরুষের লোভনীয় বস্তু। একদিন কোনো কাবণে না বেরুলে ভদ্রলোকের বেড়ানোর আনন্দ মাটি যেন।

সেদিন দূরের একটা পাহাড় লক্ষ্য করে গাড়ি ছুটিয়েছে। আমি পাশে বসে। স্পীড বাড়ছেই। হাওয়ায় আমার খোলা চুল উড়ছে। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। আবার ছোট ছেলের মতোই মিটিমিটি হাসছে। আরো ছোট ছেলের মতো মনে হয় চোখ দুটোর জন্য।

ছদ্মকোপে অগত্যা আমি চোখ পাকালাম।—অ্যাকসিডেন্ট করবেন?

—কেন, ভয় করছে?

—সামনের দিকে চোখ রেখে আপনার গাড়ির দৌড় দেখান দেখি, একটুও ভয় করবে না।

তেমনি হাসতে লাগল। আর আরো বেশি ফিরে ফিরে দেখতে লাগল।

—কি দেখছেন?

—আপনাকে। খুব ভালো লাগছে।

অগত্যা হেসেই ফেললাম।—দেখুন মশাই, আপনারা মস্ত লোক, আপনাদের ভালো লাগালাগি অত ধাতে সয় না—বেশি ভালো লাগতে শুরু করলে কেটে পড়ব কিন্তু।

ছেলেমানুষের মতোই জিজ্ঞাসা করল, ভালো লাগলে কি করব?

—পস্তাবেন। হেসে উঠলাম।

পড়াশুনার মধ্যে পশু-পাখি ফুল আর শিকারের জার্নাল পড়ে। দুই একদিন অন্তর বন্দুক পরিষ্কার করতে বসে মেঝেতে পা ছড়িয়ে। নিচের ফুলের বাগান তদারক করে। আবার দোতলার ঘোরানো বারান্দার শেডের নিচেও গোটাকতক ফুলের টবে সুন্দর ফুল ফুটিয়েছে। তার মধ্যে একটা টবের মাটি বেশ করে নিড়িয়ে দিতে দিতে আর মাঝে মাঝে সাদা কি গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, এটা কি গাছ জানেন?

ছোট গাছ, তাতে খুব ছোট ছোট নীল ফুল। নীল আভা যেন জ্বলজ্বল করছে।

চিনলাম না। রজত গুপ্ত বলল, বিষবৃক্ষ।

—কি রকম?

—এর একটি ফুল বা পাতার রস উদরস্থ হলেই সব শেষ।...পাহাড়ের একটা আদিবাসী লোক আমাকে চিনিয়েছিল, বাচাই করতে গিয়ে অনেক প্রাণী-হত্যাও করেছি।

—এ রেখেছেন কেন?

—শখ। এমন বিষ, কিন্তু কি সুন্দর ফুল দেখুন!

হাসতে লাগল।

আমি থমকে সভয়ে গাছটার দিকে চেয়ে রইলাম।

লোকটা মারাত্মক বিষ ঘাটাঘাঁটি করে মজা পায় কিনা জানি না। আর একদিন দেখলাম বড় তুলিতে করে একটা আধ-কাঁচা চামড়ার উল্টোদিকে শিশি থেকে আরক ঢেলে ঘষছে—সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার খসখসে দিকটা একেবারে মসৃণ হয়ে যাচ্ছে। কেমন মসৃণ হল দেখার লোভে আমি একবার হাত বোলালাম। হাতটা চিড়বিড় করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে তুলি ফেলে আমার ওই হাতখানা শক্ত মুঠোয় ধরে হিড়হিড় করে বাথরুমে টেনে নিয়ে গেল।

আমি হতভম্ব।

অনেকবার করে ডেটল আর সাবানজলে হাত ধোয়ার পর তবে নিষ্কৃতি। বলল, ওই হাত একবার জিভে লাগলেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত!

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, এ-সব আপনি ঘরে রাখেন কেন?

হাসতে লাগল।

বেড়ানো ছাড়া আমার আর এক নেশা ছবি তোলা। একটা দামী ক্যামেরা সঙ্গে আছে। বাড়িতে বাইরে অনেক ছবি তুলেছি। রজত গুপ্তর ছবিও কয়েকটা তুলে ছেড়েছি—আবার স্পীড আর টাইমিং দিয়ে ছুটে এসে তার পাশে দাড়িয়ে বা বসে পড়ে দু'জনের একসঙ্গে ছবিও তুলেছি। সেদিন তো পাহাড়ের দিকে বেরিয়ে এই করতে গিয়ে একটা কাণ্ডই ঘটে গেল। টাইম দিয়ে ক্যামেরা প্লেস করে ছুটে এসে পাশে বসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে গায়ের ওপরই পড়ে গেলাম প্রায়। লজ্জার একশেষ তারপর। সেই ছবিই উঠে গেছে। পরে মিটিমিটি হেসে রজত গুপ্ত বলল,

এই শটটা আর একবার হয় না?

তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ায় যাবার কথা তুলতে সে আর এক সপ্তাহ থাকার জন্য জুলুম করতে লাগল। শেষে আমি বললাম, আপত্তি নেই, যদি আপনিও সঙ্গে যান, আপনার এখানে বসে বসে কি কাজ?

রাজী হয়ে গেল। ডবল আনন্দ যেন।

অতএব আমার বেড়ানো আর হৈ-চৈ আগের থেকেও বাড়ল।

সেদিন আচমকা বিভ্রাট একটা। বুকে হঠাৎ অসহ্য ব্যথা উঠল ভদ্রলোকের। দেখতে দেখতে ফর্সা মুখ বিবর্ণপ্রায়, ঘাম হচ্ছে। শুনলাম আগেও এক-আধবার এমন হয়েছে। ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। টেলিফোন করে তাড়াতাড়ি তার চেনা ডাক্তার ডাকলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার এসে গেল। সেই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই বজত গুপ্ত পড়ার ঘর থেকে কাগজেব প্যাড আর কলম এনে রাখতে বলল। আমি ছুটে গিয়ে নিয়ে এলাম।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে শেষে রায় দিল, যা ভেবেছিলাম তা নয়, তবে ব্যথাটার জন্য এক্ষুনি ঘুমের ব্যবস্থা করা দরকার বটে। গোটাকতক ওষুধ লিখে দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিল।

ওষুধ আনিয়ে নির্দেশমত দিতে থাকলাম। কিন্তু কড়া ঘুমেব ওষুধ পড়া সত্ত্বেও সুস্থিরভাবে ঘুমোতে পারছে না লক্ষ্য করছি। আধো-ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে ছটফট করছে আর আমাকে দেখছে।

লোকটার মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত মায়া হচ্ছে আমার। এ-বকম কখনো হয় নি। শিয়রের কাছে বসে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

দু'দিনের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে উঠতে নিশ্চিন্ত। আবার তেমনি হৈ-চৈ বেড়ানো শুরু হল। নিষেধ করলেও শোনে'না। উল্টে হেসে বলে, কিছু হলে লোকসান নেই দেখলাম।

চতুর্থ সপ্তাহ এসে গেল। এই চার-পাঁচটা দিন কাটলে দু'জনের একসঙ্গে কলকাতা রওনা হওয়ার কথা।

গাড়ি পথে রেখে সেদিন আমাকে নিয়ে বন্দুক হাতে ডিপ-ফরেস্টে ঢুকল। ডিপ-ফরেস্ট বাড়ি থেকে মাইল কুড়ি-বাইশের পথ। আগেও এসেছি, কিন্তু ভিতরে ঢুকি নি।

রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম। খানিক ঘোরাঘুরি করার পর একটা বড় গাছেব নিচে বসলাম দু'জনে। লক্ষ্য করলাম, সামনে বা দূব দিয়ে হরিণ ছোটাছুটি করলেও বন্দুক তুলল না।

এ-কথা সে-কথার ফাঁকে ফাঁকে শিকারের বদলে আমাকেই যেন একটু বেশি লক্ষ্য করছে। ছোট ছেলের মতো সেই রকম দুষ্টু-দুষ্টু অথচ স্বচ্ছ চোখ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আপনি আমাদের পারিবারিক ব্যাপার কিছু জানেন?

ঈষৎ বিস্ময়ে তাকালাম। —কি ব্যাপার?

মুখের হাসি আরো কাঁচা আর মিষ্টি লাগছে।—যেমন ধরুন আমাদের অঢেল সম্পত্তি আর টাকা, অথচ সবকিছুর ট্রাস্টী বীরেন গাঙ্গুলীর বাবা সুরেশ গাঙ্গুলী...যেমন

কড়া তেমনি সাত্ত্বিক মানুষ।

বললাম, একটু-আধটু শুনেছিলাম। এ-ব্যবস্থা কেন বলুন তো?

—আমার জন্যে। এক বছর বয়েসে আমার নিজের মা বাবাকে ছেড়ে এই দেশ ছেড়েই চলে গেছল। সেই মায়ের ছেলে আমার স্বভাব-চরিত্র কেমন হবে গোড়া থেকেই বাবার সন্দেহ ছিল। তারপর বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্দেহ আরো পাকা হয়েছে। দুই-একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে মেশার খবর তার কানে এসেছিল। আমার শিকারের নেশাও তার চক্ষুশূল। শেষে যখন টের পেল আমি ড্রিংক করা শুরু করেছি, তখন ক্ষেপেই গেল। ততদিনে দ্বিতীয় মা মারা গেছে, আর নিজেরও একবার স্ট্রোক হয়েছে। ব্যস, উইলে কড়া নির্দেশ দিয়ে গেল—যদি আমার চরিত্র সংশোধন না হয়, এমন কি যদি বে-জাতে বিয়ে করি, তাহলেও সম্পত্তির কানাকড়িও পাব না। সব কমল পাবে। সুরেশ গাঙ্গুলী যেদিন ভালো বুঝবেন সমস্ত টাকা আর সম্পত্তি হয় দু'ভাইকে ভাগ করে দেবেন, নয়তো শুধু কমলকে। এতদিনে কমলেরই সব পাওয়ার কথা, কারণ আমার স্বভাব মোটামুটি একরকমই আছে। কিন্তু কে জানে কেন, সুরেশ গাঙ্গুলীর একটু দুর্বলতা আছে আমার ওপর। আমি অনেক শুধরে গেছি, আরো শুধরে যাব এই আশাই করছেন তিনি। কিন্তু নিজের শরীরটাই তার হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে বলে আমাদের সম্পত্তির জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমি মুখের দিকে চেয়ে আছি। তেমনি কাচা মিষ্টি মিষ্টি হাসি দেখছি। আমাকে স্বজাতি ভাববেন কিনা সুরেশ গাঙ্গুলী এই কথাটাই সকৌতুক জিজ্ঞাসা করে বসবে নাকি।

চারদিকে তাকাল একবার। জঙ্গলের মধ্যে আলো এত কমে এসেছে খেয়াল করি নি। মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে এল

—এ জঙ্গলে হায়েনা নেকড়ে আর ভালুক আছে অনেক।

চমকে উঠলাম একটু। তবু হেসেই বললাম, ভয় দেখানো হচ্ছে?

—না, সত্যিই আছে।

—তাহলে আর বসে না থেকে উঠে পড়ুন চটপট

চোখে চোখ রেখে হাসছে মিটি-মিটি।—ভাবছি তোমাকে যদি এখানে ফেলে রেখে আমি গাড়ি নিয়ে চলে যাই?

আমি হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। এই প্রথম 'তুমি' বলল। হেসেই বললাম, কেন, হায়না নেকড়ে ভালুক দিয়ে খাওয়ানোর জন্য? উঠে দাঁড়াতে গেলাম।

চোখের পলকে একটা হ্যাঁচকা টানে বসিয়ে দিল আমাকে, তারপর বুকের কাছে টেনে এনে আসুরিক ঝাকুনি গোটাকতক। মুহূর্তের মধ্যে অমন একখানা মুখ এমন নৃশংস কঠিন হয়ে উঠতে পারে কি করে, ছোট্ট ছেলের মতো দুটো চোখ এমন ঝলসে ওঠে কি করে, কল্পনারও অতীত। এই আচমকা আঘাতে শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হিম আমার।

রুক্ষ হাতেই একটু ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে। তারপর হাসতে লাগল দাঁত চেপে। এই হাসি একেবারে অন্যরকম। বলল, কলকাতায় গেলে আমাদের ভাব-সাব

আরো বাড়বে—দুই-একটা গোপন অ্যাপয়েন্টমেন্টও হবে—কেউ জানবে না, শুধু কমল জানবে আর তার মারফত সুবেশ গাঙ্গুলী জানবে—এই তো?

আমি নিস্পন্দ কাঠ।

—এখানে দু'জনের একসঙ্গে তোলা ছবিগুলোও—বিশেষ করে যে ছবিতে তুমি আমার গায়ের ওপর পড়ে গেছলে—সেই সব ছবিও কমলের হাত দিয়ে সুবেশ গাঙ্গুলীর হাতে পড়বে আর চার সপ্তাহ ধরে তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়িতে আছ সে-প্রমাণ তো ইচ্ছে করলেই যে-কেউ হাতের মুঠোয় পেতে পারে—কেমন?

আমি পাথর হয়ে গেছি।

হাসতে লাগল। সেই রকম কঠিন হাসি।—আমার এই মুখ দেখে মাঝে মাঝে হিংস্র জানোয়ারও ভুল করে, তুমি ভুল করবে সে আর বেশি কি। যে মহূর্তে তমি হোটেলে না গিয়ে একলা একটা মানুষের সঙ্গে বাড়িতে থাকতে চাইলে তক্ষুনি আমি বুঝে নিয়েছি তুমি কে, কে তোমাকে পাঠিয়েছে। সেই দিন বীরেনকে লিখেছিলাম, কমলের মক্ষীরাণী তোমার চিঠি নিয়ে পৌঁছেছে। এটা ঠিক কি ধরনের রসিকতা বিস্তারিত জানাও, নয়তো আমাকে না খুনী আসামী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। চার দিনের মধ্যেই জবাব এসেছে, তোমার পরিচয়টা খোলাখুলি জানিয়েছে। কমল ভেবেছে একলাখ-দেড়লাখের লোভ দেখালেই আমার বন্ধুকে হাত করা যায়, কিন্তু সে রকম বন্ধুত্ব আমি করি না। কমলের টোপ গেলার ভান করে আমার উপকারই করতে চেয়েছে সে—পরে নিজেই সব লিখত, তার আগে আমাকেই সত্যি একটু যাচাই করে নেওয়ার লোভ হয়েছিল ওর।

না, সত্যিই আমাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে যায় নি। আমার উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না, টেনে দাঁড় করিয়েছে। রুক্ষ হাতে ঠেলে গাড়িতে তুলেছে। তারপর থমথমে মুখে গাড়ি চালিয়েছে।

রাত্রিতে আমার ঘরে এল। আমি কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু এখন অন্যমুখ চোখের তারায় অন্তর্ভেদী চিকচিক করছে। দুই কাঁধে হাত রেখে আমার ভিতরসুদ্ধ দেখে নিয়েছে। তারপর আমার শুকনো বিবর্ণ দুই ঠোঁটের ওপর আলতো করে নিজের পুরু ঠোঁট দুটো একবার বুলিয়ে নিয়েছে। তারপর দণ্ডমুণ্ডের মালিকের মতোই আমাকে পালাতে নিষেধ করে তার ভাবার জন্য দুটো দিন অপেক্ষা করতে বলেছে।

আর সেই দুটো দিন আমার কি-ভাবে কেটেছে? মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা ঘুম আমার চোখে আসে না।

হ্যাঁ, আমি মেয়েটা বুদ্ধিমতী ছিলাম, আর সরল ছিলাম। জীবনের প্রথম পুরুষের বঞ্চনায় সেই সরলতা পুড়ে ছাই হয়েছে। কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম, আর দেহের একটু বাড়তি শ্রী ছিল। ওইটুকু পুঁজি খাটিয়ে জীবনের এক মোহনা থেকে আর এক মোহনায় ভেসে চলেছিলাম। নরক নরক নরক—পুরুষের সমস্ত প্রতিশ্রুতির আড়ালে কেবল নরক দেখে দেখে আমার বুকের তলায়ও নরক জ্বলে উঠেছিল। পুরুষ আমার শত্রু। সেই শত্রুবিনাশ আমার একমাত্র লক্ষ্য। এই শত্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য পুরুষই আমাকে টাকা যুগিয়ে আসছে। শত্রু ধরাশায়ী হলে আমি জীবনের সেই প্রথম

বিশ্বাসঘাতকের সত্তা-ছেঁড়া আর্ত মুখ দেখতে পাই যেন। দেখে দেখে আমার আশা মেটে না।

আজ সবকিছুর জবাবদিহির দিন এসেছে। আজ আমার পায়ের তলায় মাটি নেই।

দ্বিতীয় দিন সকালের দিকে রজত গুপ্ত সামনে এসে দাড়াল। সেই হাসি হাসি দুষ্টু দুষ্টু চোখ। বলল, ভাবা হয়েছে, আমিও তোমার থেকে কম বেপরোয়া নই—তুমি মক্ষীরাণী ছিলে, এবারে শুধু রাণী হতে পারো কিনা আদা-জল খেয়ে চেষ্টা করে দেখি।

আমি চুপচাপ চেয়ে আছি। ওই হাসির আড়ালে হিংস্র মূর্তিটা আঁচ করতে চেষ্টা করছি।

হাসতে লাগল।—সব জেনেও তোমাকে আমি একটু পরীক্ষা করেছিলাম। নিরাপদে আমাকে যমের বাড়ি পাঠাতে পারলেও কমল তোমাকে ডবল টাকা দিত জেনেও তুমি সে সুযোগ নিলে না দেখলাম। তোমাকে বিষ ফলের গাছ দেখিয়েছিলাম, চামড়া পালিশ করার অছিলায় বিষের আরকের শিশি দেখিয়েছিলাম, আর তারপর শেষ সুযোগ দেবার জন্য বুকের ব্যথা তুলে আধা অজ্ঞান হয়ে মটকা মেরে পড়েছিলাম। অবশ্য ওগুলোর একটাও বিষ নয়, কিন্তু তুমি তো বিষই জানতে। অমন সুযোগ পেয়েও উতলা হয়ে সেবাই করে গেলে দেখলাম। আর তারপর থেকে যত দেখেছি, মক্ষীরাণীকে রাণী বানাবার ঝোঁক আমার তত বেড়েছে। ওই ধাক্কাটা দিয়ে এই দুটো দিনও পরখ করলাম তোমাকে। যাক শোন, কালই আমি বীরেনকে আর তার বাবাকে লিখে দিচ্ছি, আমি নিজে মন্দ তাই বেশি ভালোর ধার ধারি না—একটা মন্দ মেয়েকেই নিলাম, সম্পত্তি চুলোয় যাক, আপাতত যে সম্পত্তিটি হাতে পেয়েছি তাকেই একটু নেড়ে চেড়ে দেখি কোথায় পৌঁছুই

কাছে এল। দুই হাত কাঁধে রাখল। পুরু অধর আবার আলতো করে আমার ঠোঁট দুটো ছুঁয়ে গেল।

আমি কাঁপছি থরথর করে। মাটি কাঁপছে। পৃথিবী কাঁপছে। সৃষ্টি কাঁপছে।

ভয়ে-ত্রাসে আমি পালাচ্ছি। ছোটার এমন তাড়না এই সাতাশ বছর বয়েসের মধ্যে আর কখনো অনুভব করি নি। শিখ ড্রাইভারটার পাশের লোকটা ঘুমুচ্ছে। অন্ধকার ভেদ করে ট্যাক্সি ছুটেছে।

কিন্তু অন্ধকারের গহ্বরে আমি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারব কি?

মিথ্যা

পুজোর আসনে বসেও প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন মন্মথবাবু। খানিকক্ষণ চেষ্টা করেও বালগোপালের চরণে মন সঁপে দিতে পারলেন না। ডাইনের জলচৌকির

সিংহাসনে গুরুদেবের ছবি। সেদিকে ফিরলেন। তার মুখে প্রসন্ন হাসি লেগেই আছে। কিন্তু সেই হাসি থেকেও খুব যেন একটা আশ্বাস পেলেন না। তবু গুরুদেবের মূর্তির দিকে চেয়ে তাঁর কথাগুলো কানে টেনে আনতে চেষ্টা করলেন মন্মথবাবু। তাঁর বাণী, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে শেখো বাবা, তাহলেই আলো—সত্যের দিক থেকে মুখ ফেরালেই অন্ধকার। সমস্ত ভাবনা-চিন্তা সত্যের কাঠগড়ায় বিসর্জন দিয়ে ফেল, তাহলেই সমস্ত অন্ধকারের অবসান।

গত তিন বছর হল আপোসশূন্য সত্যের উপাসনা করে চলেছেন তিনি। সেই বিষম আঘাতের পর গুরু এই পথ দেখিয়েছেন। তিনি উপলক্ষ্য মাত্র, এই পথের হদিস নিজের অন্তর থেকেই পাচ্ছিলেন। একটা সামান্য মিথ্যের কারণে মর্মান্তিক খেসারত দিতে হয়েছে তাকে। আজও সেই ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছে। বুকের তলায় যন্ত্রণা শুরু হলেই ওই এক প্রার্থনায় আকুল হয়ে ওঠেন তিনি। বালগোপালের দিকে আর গুরুর দিকে চেয়ে অনুক্ষণ বলে চলেন, অন্ধকার থেকে আমায় আলোয় নিয়ে যাও, অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও।

মাত্র তিন বছরের কথা, সেই সামান্য মিথ্যাকে কেন্দ্র করে জীবনের সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল, অথচ নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক মিথ্যা, ও-রকম পরিস্থিতিতে ওটুকু মিথ্যার আশ্রয় বোধ করি সমস্ত বাবা-মাই নিতে চাইবে।

ছোট ছেলে বাবুল কলেজে পড়ত। মারামারি কাটাকাটির মৌসুম চলছে তখন। রাজনীতির আবর্ত তাজা রক্তে আবিল। বাবুল কোনো দলাদলির মধ্যে নেই সেটাই অনেক ছেলে-ছোকরার রোষের কারণ। রাত সেদিন দশটা সাড়ে দশটার সময় এক মাস্টারের কাছে পড়া সেরে বাবুল বাড়ি ফিরছিল। নির্জন রাস্তা। বাবা মা এ সময়ে বাড়ির বাইরে থাকতে অনেকবার নিষেধ করেছে। কিন্তু ছেলে কথা কানে তোলে নি তার কে কি ক্ষতি করবে?

কোথা থেকে আবছা অন্ধকার ফুড়ে চারটে ছেলে আর একটা ছেলেকে টেনে নিয়ে এল। বাবুল একেবারে সামনা-সামনি পড়ে গেল তাদের। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওই ছেলেগুলো এলোপাতাড়ি ছোরার আঘাতে ওই ছেলেটাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে দেড় মিনিটের মধ্যে তাদের কাজ শেষ।

পালাবার মুখে তারা বাবুলকে দেখে গেল। ওই ছেলেদের মধ্যে দু'জনকে অন্তত বাবুল চেনে।

একেবারে মুখ বন্ধ হবার আগে ছেলেটা মাত্র বার-দুই আর্তনাদ করে উঠতে পেরেছিল। রাস্তার এ-মোড়ে ও-মোড়ে দু'চারজন লোক দাঁড়িয়ে গেছল, একতলা দোতলার বারান্দায়ও কিছু মুখ উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছিল, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে নি। আততায়ীরা পালিয়েছিল আর বিষম ত্রাসে বাবুলও ছুটেছিল।

বাড়ি ফিরে ঘটনাটা বাবাকে চুপি চুপি বলেছে। আর কাউকে না। শুনে মন্মথবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। তিনি কাউকে একটি কথাও না বলে পরদিন খুব ভোরে বাবুলকে এক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু পরদিন সকাল ন'টা নাগাদ পুলিস এসে বাড়িতে হানা দিল। থানা-অফিসারটি

মন্মথবাবুর পরিচিত। কিন্তু তাকে তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন না। বাবুলের খোঁজ করতে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ছেলে কলকাতায় নেই, বাইরে বেড়াতে গেছে। বন্ধুভাবাপন্ন থানা-অফিসার জেরা করেও কোনো কথা বার করতে পারল না।

...মন্মথবাবু নিঃসংশয়, পথে বা কোনো বাড়ি থেকে কেউ বাবুলকে ছুটতে দেখেছে, এবং যে-ভাবেই হোক পুলিস খবরটা সংগ্রহ করেছে। আর একবার তাকে হাতে পেলে দস্তুরমতো ঝামেলা হবে।

...ঠিক দু'দিন বাদে বাড়ির কাছাকাছি বাবুলকে মৃত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। দিনে-দুপুরে। হয়তো চুপিচুপি বাড়ি আসছিল, আর অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুতও ছিল না।

সেই থানা-অফিসার আবার এসেছিল। নির্দয় কঠিন গলায় মন্মথবাবুকে বলে গেছে, পাড়ার কোন ছেলেটা কেমন সে-খবর তারা রাখে, বাবুলকে পেলে হয়তো তারা থানায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখত, জেরা করে অপরাধীদের নাম বার করত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নির্দোষ প্রমাণিত হতই। এই নির্বোধ মিথ্যাচারের ফলেই ছেলের প্রাণটা গেল।

সেই থেকে মন্মথবাবু নিজেকে ধিক্কার দিয়ে আসছেন। প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ ভাবে ধিক্কার আর গঞ্জনা স্ত্রী আর বড় ছেলের কাছ থেকেও আসছে।

সেই থেকে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়ে চলেছেন মন্মথবাবু। ভিতরে বাইরে আমূল পরিবর্তন এসেছে তাঁর। বহু তীর্থস্থানে ঘুরেছেন। সৎগুরুর সন্ধান পেয়েছেন। গুরু তাঁকে বলেছেন মিথ্যের আশ্রয় নিতে গিয়ে ছেলে পর্যন্ত খোয়াতে হয়েছে যখন, মিথ্যে বর্জনই তোর প্রথম কাজ।

মন্মথবাবু প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করছেন।

কাজকর্ম বা ব্যবসা দেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। তাঁর পাথরের ব্যবসা। পাকুড়ে নিজের পাহাড় আছে একটা। সেই পাহাড় খুঁড়ে পাথর তোলা হয়। কলকাতায় চালান আসে। তার থেকেই এত টাকা। পাকুড়ে নিজের বাংলো, কলকাতায়ও নিজের বাড়ি। বছরের মধ্যে ছ'মাস ঘুরে-ফিরে কলকাতায় থাকতেন, বাকি ছ'মাস পাকুড়ে। সেখানে তাঁর সমবয়সী বিশ্বস্ত ম্যানেজার আছেন, নাম নন্দগোপাল। তাকে সাহায্য করে মন্মথবাবুর ছোট শালা মানিক। এম-এ পাস করার পর বড় ছেলে অনন্তও বাপের ব্যবসা দেখাশুনার কাজে লেগে গেছল। ছোট শালা মানিকও ছেলের মতোই। অনন্তর থেকে মাত্র বছর-চার-পাঁচের বড়। বড় ছেলের বয়েস এখন আটাশ। মানিকের বত্রিশ-তেত্রিশ হবে। মামা-ভাগ্নের গলায় গলায় ভাব।

মন্মথবাবুর ভিতরের পরিবর্তনের ফলে মামা-ভাগ্নে দু'জনেই প্রমাদ গুনেছে। মন্মথবাবুর শিক্ষিতা স্ত্রীও অন্ধের মতোই ছেলে আর ভাইয়ের কথায় বিশ্বাস করে স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ওরকম সত্যের ভক্ত হয়ে উঠলে ব্যবসা ডুবতে বাধ্য। লাভ-লোকসানের আলাদা খাতা বাতিল করা হয়েছে, মজুরদের রেকর্ড থেকে ভুঁইফোঁড় সংখ্যাগুলো মুছে ফেলা হয়েছে, ব্যবসার লেনদেনে লাভের অঙ্ক কমছে আর ইনকাম ট্যাক্সের খাতায়ও কারচুপি নেই—দু'বছর আগেও নিজে সেধে

বাষট্টি হাজাব টাকা বাড়তি ট্যাক্স গুনে দেওয়া হয়েছে। এব পব আব ব্যবসা থাকে কি কবে?

স্বামীব সঙ্গে ঝকাঝকি কবে স্ত্রীই সমস্ত ব্যবসাটাই এখন ছেলে আব ভাইয়েব হাতে তুলে দিয়েছেন। তাবাই সর্বেসর্বা। মন্মথবাবু মুক্তি পেয়ে বেঁচেছেন। ব্যবসাটা এখন শুধু নামেই তাব।

স্ত্রী অপর্ণা কোনোদিনই তেমন শ্রদ্ধা বা প্রীতিব চোখে দেখেন নি স্বামীটিকে। তাব কাবণও আছে। মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘবেব শিক্ষিতা মেয়ে তিনি। বিয়েব সময় বি-এ পড়ছিলেন। তাব ধাবণা, রূপেব অভাবেব দরুন এই লোকেব হাতে পড়তে হয়েছে। খুব টেনেটুনেও সুশ্রী বলা চলে কিনা সন্দেহ। মন্মথ ঘোষাল ম্যাট্রিক পাস। কিন্তু বাবা তাব ব্যবসা আব টাকাব জোব দেখেই কাবও আপত্তি না শুনে এখানে মেয়ে গছিয়েছেন।

কিন্তু বিয়েব পবে স্ত্রীব মনোভাব আবও বিরূপ হয়েছে। স্বামীটি অত্যন্ত গোঁয়াব আব বেপবোয়া। ফাক পেলে মদ খেতেন। আব তাব চালচলনও সন্দেহেব চোখে দেখতেন অপর্ণা। সোমত্ত বয়সেব মেয়েবাও খাদে কাজ কবত। তাদেব সঙ্গে একটু-আধটু ফষ্টিনষ্টিব আভাসও পেতেন।

বয়েসকালে এই সব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল কলহ বেধে যেত এক একদিন।

কিন্তু সে-সব পিছনেব অধ্যায়। ছেলেবা বড় হয়ে উঠতে অপর্ণা অনেক ব্যাপাবেই কঠিন হয়ে নিজেব বিবেচনামতো কাজ কবতেন। স্বামীকে কোনো দিনই খুব বুদ্ধিমান ভাবতেন না তিনি। বাবুল মাবা যাবাব ফলে স্বামীব নির্বুদ্ধিতাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাব ধর্মকর্মে মন দেওয়াটা দুর্বলেব আশ্রয় ছাড়া আব বেশি কিছু ভাবেন না।

মোটামুটি সুস্থিবভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল মন্মথবাবুব। গোপালেব পায়ে আব সত্যেব পায়ে তাব সমর্পণ গভীব হয়ে উঠছিল। এমন দিনে ম্যানেজাব নন্দগোপালেব কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন তিনি। খুব ছোট চিঠি। লিখেছে, একটা বড় বকমেব গণ্ডগোল দানা বেধে উঠছে, আপনাব একবাব আসা বিশেষ দবকাব।

চিঠিটা পেয়ে ভিতবে ভিতবে বিলক্ষণ উতলা বোধ কবলেন মন্মথবাবু। কাবণ নন্দগোপাল ভিন্ন জাতেব মানুষ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত খাটি। বিশেষ কাবণ না থাকলে এভাবে লিখত না। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কবলেন, পাকুড়েব খবব কি, অনন্ত অনেকদিন আসে-টাসে না যে?

অপর্ণা বললেন, কি জানি, সেখানেও তো মজুবদেব ক্ষেপিয়ে তুলেছে বাবা খবব পেয়েছিলাম, এটা চাই ওটা চাই কবে তাবা নিত্য বায়না তুলছে—আমাবও কেমন ভাবনা হচ্ছে। তুমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবছ কেন, কোনো খবব-টবব এসেছে নাকি?

—না, এমনি মনে হল।

পবদিনই পাকুড় যাওয়া ঠিক কবলেন মন্মথবাবু। অপর্ণা বাধা দিতে চেষ্টা কবলেন, তুমি গিয়ে কি কববে, অনন্ত আব মানিক তো দেখাশুনা কবছেই—

—যাই একবাব, মন টানছে, একটু দেখেশুনে আসি।

যাবেন ভেবেছেন যখন আর বাধা দিয়ে লাভ নেই অপর্ণা জানেন। সে চেষ্টা না করে তিনি নিজেও সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বিনা নোটিসে মা-বাবাকে হুট করে চলে আসতে দেখে অনন্ত অবাক, তার মামাও। বাবার আসাটা অন্তত ছেলের একটুও পছন্দ হয় নি। মাকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার ?

মা জবাব দিলেন, কি করে বলব, আসবে মনে হল চলে এল, তাই আমিও চলে এলাম।...এখানকার খবর কি, কারা সব ঝামেলা শুরু করেছিল শুনেছিলাম—

ছেলে গম্ভীর প্রত্যয়ে জবাব দিল, তাদের টিট করতে বেশি সময় লাগবে না, এজন্যে তোমাদের ছুটে আসার দরকার ছিল না।

মন্মথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি চায় সব ?

—চাওয়ার কি শেষ আছে, একের পর এক ফিরিস্তি—তিনপাতা দাবি-দাওয়া।

—কি দাবি-দাওয়া আমাকে দেখাস তো একবার।

সমর্থনের আশায় ছেলে মামার দিকে তাকাল। মানিক বলল, একটু নরম হলেই ওরা কিন্তু পেয়ে বসবে জামাইবাবু।

—তবু কি চায় না চায় আমাকে একবার দেখাতে অসুবিধে আছে তোদের ?

এবারে মামা-ভাগ্নে দু'জনেই নিরুত্তর।

নিরিবিলি অবকাশে নন্দগোপালকে নিয়ে বসলেন মন্মথবাবু। কি ব্যাপার বল?

নন্দগোপাল স্বল্পভাষী। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, কাঞ্চিকে মনে আছে আপনার ?

—কে কাঞ্চি ?

—সেই পাগলা লখিয়ার বউ যমুনা, তার মেয়ে...

শোনামাত্র থমকে গেলেন মন্মথবাবু।—মেয়ে নিয়ে যমুনা তো সেই কুড়ি-একুশ বছর আগে চলে গেছল এখান থেকে, আবার এসেছে ?

—যমুনা আসে নি, তার মেয়ে কাঞ্চি এসেছে বছরতিনেক হল।

মন্মথবাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, কত বড়টি হয়েছে ?

—বছর চব্বিশ হবে...আপনি দেখলে ভাবতেও পারবেন না সেই মেয়ে।...অত সুন্দর মেয়ে ওদের সমাজে আর নেই, আর কোনো কোয়ারি ফার্মেও নেই।

মন্মথবাবু সচকিত হলেন একটু, মুখের দিকে চেয়ে আসল প্রসঙ্গটা আঁচ করতে চেষ্টা করলেন।—তা কি হয়েছে ? তার কোনো বিপদ ?

—না, তার মরদটার বিপদ মনে হয়। কাঞ্চি এখন সুবলের বউ, ওরা দু'জনেই আমাদের ফার্মে কাজ করে।

—কিছুই তো বুঝতে পারছি না, কি হয়েছে খুলে বল?

নন্দগোপাল যা জানালো তার সার কথা, বাইরের লোকেরা প্রায় সব ফার্মেরই মেহনতি মানুষগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারা সব দল পাকিয়েছে। সেই দলের পাণ্ডাগিরি করছে সুবল আর কাঞ্চি। কাঞ্চিকে অনেক লোভ দেখিয়ে সুবলের বিপক্ষে টেনে আনার চেষ্টা হয়েছিল। তার ফল আরও খারাপ হয়েছে। সব ক'টা কোয়ারি

ফার্মের মালিকরাও এখন জোট বেঁধেছে—অনন্ত আর মানিকের চেষ্টাতেই সেটা হয়েছে। এখন নানা কারণে নন্দগোপালের মনে হচ্ছে, সুবলের বড় রকমের একটা অঘটন ঘটতে পারে।...মনিব যমুনা আর তাব মেয়েকে খুব স্নেহ করতেন এককালে, সেই জনাই নন্দগোপাল তাঁকে বিস্তারিত জানানো দবকার বোধ করেছে।

মন্মথবাবু এদিক থেকে নন্দগোপালকে আর জেরা করলেন না কিছু। আশঙ্কাব যথেষ্ট কারণ না থাকলে সে এভাবে লিখত না বা একথা বলত না।

মন্মথবাবু চিন্তাচ্ছন্ন একটু।—তুমি বলতে চাও, ওই সুবলকে একেবারে সরিয়ে ফেলার কিছু একটা চক্রান্ত চলেছে, এই তো?

নন্দগোপাল নিরুত্তর।

মন্মথবাবু সোজাসুজি চেয়ে আছেন তাব দিকে।—এত বড় কাণ্ড শুধু দাবিব জন্যে ক্ষেপে উঠলেই ঘটে না...ওই কাঞ্চি মেয়েটাব দিকে কার চোখ আছে...এ-বাড়ির বাবুদের কারো?

নন্দগোলাপ আবাবও নিরুত্তব।

—খোলাখুলি বল? কার?

—শালাবাবুর।

—আর অনন্তব?

—সে-ও তাব মামার পক্ষেই।...লোভ দেখানোব ফলে শালাবাবুকে কাঞ্চি আব সুবল যাচ্ছেতাই অপমান করেছিল, সেই বাগ দু'জনারই।

—রাগটা শুধু সুবলেব ওপর?

নন্দগোপাল চুপ।

—ঠিক আছে। মন্মথবাবু তাকে বিদায় দিলেন।

বেলা তখন তিনটে। টাঙ্গায় চেপে কোয়ারি ফার্মে এলেন। ঘুবে ঘুরে কাজ দেখতে লাগলেন। তিন বছর বাদে বড কর্তাকে দেখে পুরনো সকলেই খুশি।

কিন্তু মন্মথবাবুর চোখ বিশেষ করে কাঞ্চির দিকেই। মেয়েটাকে দেখামাত্র চিনলেন তিনি। অবশ্য শোনা ছিল বলেই চিনেছেন।... তিন বছর বয়সে যখন ওকে দেখতেন তখনো সেই কচি মুখে বিমল দত্তব মুখের স্পষ্ট আদল চোখে পডত। আব এখন মনে হল বিমল দত্তব মুখখানাই যেন স্পষ্ট বসানো। মেয়ের মুখ—এই যা তফাত। সার বেঁধে অনেক মেয়ে কাজ করছে, তাব মধ্যে ওই মেয়েটা যেন একেবারে স্বতন্ত্র। ওব চাউনি, নড়াচড়া, সবই যেন একটা বিশেষ ঠমকে ভরাট।

মন্মথবাবু অনেকবার দূব থেকে ওকেই দেখলেন, ঘুরে-ফিরে বারকয়েক কাছেও এলেন। অন্য মেয়েগুলো ঠারেঠোরে তাকাচ্ছে, খুব চাপা সুরে কাঞ্চির সঙ্গে হয়তো মস্করাও করছে। কাঞ্চিও চোখের কোণ দিয়ে বড় কর্তাটিকে দেখে নিয়েছে, ওকেই লক্ষ্য করা হচ্ছে সেটা বেশ ভালো করেই টের পেয়েছে।

মন্মথবাবুর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা। আর একবার মুখ তুলে তাকাতে আঙুল তুলে কাছে ডাকলেন ওকে। মেয়েটা থমকালো একটু, তারপর মাথার ঝুপড়ি ফেলে দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

মন্মথবাবু দেখছেন।...ওর মা যমুনারও এমনি হাঁটা-চলার ঠাট ছিল। আশেপাশের জনদের চঞ্চল করে তোলার মতোই যৌবন উপচে উঠত যেন।

কাছে এসে দাঁড়ানোর পরেও ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন মন্মথবাবু।

কাছের দূরের অনেকে ফিরে ফিরে দেখছে। অদূরে দাঁড়িয়ে দেখছে ছেলে অনন্ত আর শ্যালক মানিকও।

মানিক গম্ভীর। অনন্তর বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি।

মন্মথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোর মা কোথায়?

প্রশ্ন শুনে মেয়েটা অবাক একটু।

—নেই।

—ও। তোর মা এখানে কাজ কবত, জানিস?

মাথা দোলালো। জানে।

—তুই কত বড হয়ে গেছিস রে! তোকে শেষ দেখেছি যখন, এইটুকু পুঁচকে ছিলি তুই, বছরতিনেক মাত্র বয়েস। আমাকে তোব মনে আছে একটুও? নেই তো?

কাঞ্চি আবার মাথা নাডল। মনে নেই।

কিন্তু বড কর্তার হাসিটা এখন আর কেন যেন তেমন খারাপ লাগল না। ওভাবে লক্ষ্য কবা আব হাসাব একটাই কারণ জানে ওবা। বড কর্তার বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে, কিন্তু দিব্বি শক্ত-সমর্থ। না, বযসটাকে ওবা অত বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই দু'চারটে কথা শুনেই কাঞ্চির অন্য রকম লাগছে। তবু সংশয ঘোচে নি একেবারে।

—আচ্ছা কাজ কবগে যা, পরে আবার দেখা হবে।

খাদের একদিক থেকে সুবলকেও খুঁজে বার করলেন তিনি। নন্দগোপালই চিনিয়ে দিল। তাকেও কাছে ডাকলেন, হেসেই বললেন, তুই তো খাসা মরদ দেখি রে! ...তোর বউযের সঙ্গেও গপ্প-সপ্প কবে এলাম, ওকে এইটুকু বাচ্চা দেখেছিলাম জানিস?

সুবল কোনো কথাই বলল না। খোদ মনিবকে দেখল শুধু। তার সংশয় এই খুশিব আচবণেব পিছনে মালিকি-প্যাঁচ কিছু থাকা অসম্ভব নয।

অনন্ত আব মানিককে নিযে বাডি ফিবলেন। তাবা গম্ভীব। ছেলে মাকে আড়ালে ডেকে বাবাব কাণ্ড বলল। ভয়ানক বিবক্ত। —ওদেব সঙ্গে বিশেষ করে কাঞ্চি মেযেটার সঙ্গে বাবার অত হেসে হেসে কথা বলার কেনো মানে হয! ওটা বজ্জাতেব শিবোমণি একটা, অন্য মজুবগুলোকে ও-ই বিগড়ে দিয়ে দলে টেনেছে, আব বাবা কিনা—যাক গে, তুমি বাবাকে বারণ করে দিও, আর যেন ওদিকে না যায়।

অপর্ণা বলেছেন। মন্মথবাবু কান দেন নি। পাহাড়ে গেছেন। আর অনন্তর বা তার মামার ভাষায় ওই নচ্ছাব মেয়েটার সঙ্গে আর সুবলেব সঙ্গে মাখামাখি করেছেন।

অপর্ণার মুখ একটু একটু করে ঘোরালো আর ধারালো হযে উঠছে। কিন্তু মন্মথবাবুর সেদিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই।

...কটা দিন কেবলই বিমল দত্তর কথা মনে পড়েছে তাঁব। আর যমুনার কথা। আব তার নেশাখোর স্বামী লখিয়ার কথা। পাহাড়ে গিয়ে ওই মেয়েটাকে দেখলেই ওদের আরো বেশি মনে পড়ে।

বিমল দত্ত মন্মথবাবুব একাত্ম বন্ধু ছিলেন। দু'জনে মিলে এই ব্যবসায নেমেছিলেন। সুদিন সবে আসছে তখন। ওই যমুনাকে নিযে মজে গেল। ব্যবসায বিঘ্ন না ঘটলে মন্মথবাবুব তাতে আপত্তিব কাবণ নেই। যমুনাকে দেখলে নিজেব ভিতবটাই চঞ্চল হযে উঠত, বন্ধু বিযে-থা কবেন নি, তাব আব দোষ দেবেন কি।

যমুনাব একটা মেযে হল। ওই কাঞ্চি। ওই নেশাখোব পাগলা লখিযাব মেযে এটা কেউ বিশ্বাস কবল না। এদিকে বিমল দত্ত বন্ধুব কাছে স্বীকাবই কবেছে মেযে কাব। কিন্তু তিন বছবেব মধ্যে এ নিযে কোনোবকম গণ্ডগোল হয নি। বিমল দত্ত ওই পাগলাকে দবাজ হাতে নেশাব টাকা যোগাত।

তাবপবেই হঠাৎ অঘটন একদিন। খুব ভোবে দেখা গেল খাদেব মধ্যে বিমল দত্তব ভাঙাচোবা মৃতদেহ পড়ে আছে। কেউ তাকে ওপব থেকে ঠেলে ফেলে দিযেছে।

যমুনা আতনাদ কবে উঠেছিল, ওই লখিযাব কাজ, ওকে জেলে দে, ওকে ফাসি দে বাবু—

এব দিনকযেকেব মধ্যেই মেযে নিযে যমুনা পালিযে গেল। ওই নেশাখোব পাগলেব ভয ওকে পেযে বসেছিল।

বিমল দত্তব ওযাবিশন কে ডেকে তাব অংশেব টাকা বুঝিযে দিযে গোটা ব্যবসাটাই নিজেব কবে নিযেছিলেন মন্মথবাবু।

ভোবে বেবিযেছিলেন। মিটিং বসেছিল কাঞ্চিদেব ডেবাব সামনেব দাওযায। সুবল আবো সব মাতব্বব শ্রমিকদেব ডেকে এনেছিল। সকলেব সামনে খুশিমুখে তাদেব সব দাবি মেনে নিযেছেন মন্মথবাবু। ভবিষ্যতেব লোভও দেখিযেছেন। লাভ বাড়লে তাদেব প্রাপ্য আবো বাড়বে। কিন্তু একটিমাত্র শর্ত। শ্রমিকবা এই ব্যবসা নিজেদেব ভাববে, বাইবেব কোনো লোককে এব মধ্যে নাক গলাতে দেবে না। দবকাব হলে তাবা কলকাতায গিযে সবাসবি তাব সঙ্গে দেখা কবতে পাবে—সেই খবচাও তিনি দেবেন।

মন্মথবাবু বাড়ি ফিবেই টেব পেলেন খববটা এবই মধ্যেই বাষ্ট্র হযে গেছে। ছেলেব মুখ কঠিন, স্ত্রীব মুখও। শ্যালকেব মুখ থমথমে

মন্মথবাবু স্নান সেবেই বেবিযেছিলেন, হাত মুখ ধুযে সোজা এসে ঠাকুবঘবে ঢুকলেন। গোপাল আব গুরুদেবেব ছবি তাব সঙ্গে ঘোবে।

কিন্তু পুজোয মন দিতে পাবাই গেল না শেষ পর্যন্ত। ওদিকে বাড়িব সকলেব ক্রুদ্ধ প্রতীক্ষা টেব পাচ্ছেন।

আসন ছেড়ে উঠে এলেন। শ্যালকেব কথা কানে এল, দিদিকে বলছে, অন্য ফার্মেব মালিকদেব মুখ দেখানো দায হবে এখন কত বড় পাজী আব সেযানা ওই মেযেটা বোঝ, নিজেব বাপেব ঠিক নেই, জামাইবাবুব মতো মানুষকেও বশ কবে ফেললে।

ছেলেব ক্রুদ্ধ চাপা গলাও শুনলেন, সকলে হাসাহাসি কবছে আব কি বলছে জান মা, ওই মেযেটাব মুখ চেযেই বাবা এতটা—

মন্মথবাবু ঘরে পা দিলেন।

—এত উত্তেজনা কিসের?

অপর্ণা ঝলসে উঠলেন, কিসের তুমি জান না? এভাবে সকলের মুখে চুন-কালি দিলে!

মন্মথবাবু গম্ভীর।—ব্যবসাটা এখনও আমারই সেটা তোমরা ভুলে যাও নি বোধ হয়?

অপর্ণা আবার ফুসে উঠলেন, তা বলে তুমি যা খুশি তাই করবে—বাপের ঠিক নেই ওই একটা বজ্জাত পাজী মেয়েকে নিয়ে লোকে এখনই পাঁচরকম বলাবলি শুরু করেছে!

রাগের মাথায় ছেলে আর ছোট ভাই সামনে তাও ভুলে গেলেন অপর্ণা।

—রুক্ষ হঠাৎ কঠিন দৃষ্টিতে প্রথম ছেলের দিকে, তারপর শ্যালকের দিকে তাকালেন মন্মথবাবু—ওই মেয়েটার এতটুকু ক্ষতি আমি বরদাস্ত করব না এ যেন মনে থাকে তোমাদের। যাও—

বিমূঢ় মুখে ছেলে আর তার মামা ঘর ছেড়ে চলে গেল। অপর্ণা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।—কেন? ও রকম একটা মেয়ের জন্যে তোমার এত দরদ কিসের?

মন্মথবাবু নিঃসংশয়। ছেলে আর শ্যালক পাশের ঘরে কান পেতে আছে। তাদের কানে যায় এ রকম করেই জবাব দিলেন, দরদের কারণ আছে। ওই মেয়েটার বাপের খবর আমি অন্তত রাখি— মেয়েটা আমারই মেয়ে।

ঘরের মধ্যে একটা বাজ পড়লেও অপর্ণা এতটা স্তম্ভিত হতেন কিনা সন্দেহ।

মন্মথবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সোজা আবার পুজোর ঘরে ঢুকে আসনে বসলেন।

একটা মিথ্যের দরুন ছেলে হারিয়েছিলেন। এই মিথ্যেটার ফলে মেয়েটা বেঁচে যাবে। কোন মিথ্যের কতটা পাপ তিনি জানেন না। এ নিয়ে আর মাথাও ঘামালেন না।

গোপালের দিকে চেয়ে মনে হল গোপাল অখুশি নয়। ছবিতে গুরুদেবের সেই রকমই করুণামাখা হাসি।

মধু ওস্তাদের ছুটি

ওস্তাদের হুকুম শুনে দলের ছোট-বড় সকলে হতভম্ব। বারমাস বুকের ব্যামো লেগেই আছে, এর ওপর আবার মাথার গণ্ডগোল দেখা দিল কিনা বুঝছে না। মুখে বলবে, কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করবে এমন বুকের পাটা নেই কারো। সকলের জোড়া জোড়া চোখ দাওয়ার ওধারে মণ্ডলার দিকে ছুটল। কিন্তু সে-ও হাঁ করে ওস্তাদের দিকে চেয়ে আছে আর অবাক হয়ে বিস্ময়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

নির্দেশ দিয়ে ওস্তাদ ঘরে ঢুকে গেল। ওদের পরস্পরের দৃষ্টি আবার নিঃশব্দে ঠোকাঠুকি খেল খানিক। তারপর দাওয়া ছেড়ে কানা গলি পেরিয়ে একে একে রাস্তার

সামনে বাদ্যকুটিরে এসে জটলায় বসল। মঙলাকেও ধরে আনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সকলের বিস্ময়ের ফাকে সে ইত্যবসরে গা-ঢাকা দিয়েছে।

বাদ্যকুঠিরের খাতা লেখে, হিসেব দেখে আব সাজ-পোশাক বাদ্য-সরঞ্জামের তদারক করে জামান বুড়ো। সে-ই সব থেকে পুরনো লোক এখানকার, ওস্তাদের প্রিয়পাত্র। ভয়ানক ধর্মভীরু লোকটা। কারো ভালো বা মন্দ কিছু হলেই কোন পুণ্যবলে বা পাপের ফলে হল, তাই নিয়ে গবেষণা করতে বসে। বাজনার কারিগরেরা তার কথা অবিশ্বাসও করে না। সকলের ধারণা ওস্তাদের নাড়ীর খবর রাখে সে। জামান বুড়োর নিজেরও তাই বিশ্বাস। কিন্তু মালিকের সঙ্কল্প শুনে সেও হতভম্ব হাঁ।

উত্তেজনা চাপতে না পেবে ওরা তিন-চারজনে একসঙ্গে বলে উঠল, ওস্তাদের হুকুম শুনেছ খাঁ সাহেব। মঙলার বিয়েতে আমাদেব ফুল ব্যাণ্ডপার্টি বেরুবে, ব্যাগপাইপ বাজনা হবে, আর ওস্তাদ নিজে ফ্লুট বাজাবে।

তাজ্জব খবরই বটে। মস্ত বড বড় লোকের বিয়ে বা উৎসবে ফুল ব্যাণ্ডপার্টি বেরোয়। এক-একটা চুক্তিতে বাদ্যকুটিবের মোটা টাকা লাভ হয়। কারিগরেরা প্রত্যেকে দিন-হারের দেড়াও পায এক-এক সময়। সেই ফুল ব্যাণ্ডপার্টি কিনা মঙলাব বিয়েব বাজনা বাজাবে। যে মঙলা তাদেরই মতো সামান্য কারিগর মাত্র। তাদের মতো কেন, ওর হাঁড়ির অবস্থা তাদের থেকেও অনেক খারাপ। অবসর সময ওরা তবু অন্য কাজ করে দু' পয়সা ঘরে আনে—কেউ জমি চষে, কেউ ছুটকো মজুরি খাটে, কেউবা এটা-সেটা ফেরি করে। শুধু চার টাকা মজুরের বাজনার আয়ে কি কবে আর সংসাব চলে—অকাল বর্ষায় চোত মাসে এই রোজগার তো প্রায় বন্ধ। কিন্তু মঙলা শুধুই কারিগর, তার বাড়তি আয় কিছু নেই। অন্য সকলে ভাবে, চেহারাটা ভালো বলে ছোট কাজ করতে তার মান খোয়া যায়। সব সময়ই একটা আর্টিস্ট ভাব, কালে দিনে একজন গুণী লোক বলবে সকলে, এই আশা পুষছে। সোনার কাজ কবা তকতকে পোশাক পরে, মাথায় সোনালী পাগড়ি আর কোটে ঝকমকে ব্যাচ এঁটে সে বাজনা নিয়ে বেরোয় যখন, সঙ্গীরা তার দিকে চেয়ে ঠাট্টা-ইসারা কবে, নিজেদেব মধ্যে হাসাহাসি করে। তারাও তো তাই পরে, কিন্তু এই নকল সাজটাকে তাবা নকল বলেই জানে। আব এই সাজের ওপরেই মঙলাব বিষম মাযা। সর্বদা ঝকঝকে তকতকে করে বাখে সব, সকলের আগে পোশাক পরে, সকলেব পরে ছাড়ে। যেন এইটেই আসল সাজ তার, অন্য সাজে তাকে মানায় না। বাদ্যকুটিরে সে নিজের পোশাক ছেড়ে এই পোশাক পরেই এক-একদিন চুপি চুপি কোথায বেরিয়ে যায়। জানতে পেলে ওস্তাদ হাড় গুঁড়িয়ে দেবে জেনেও। জামান সাহেবের হাতেপাযে ধরে পোশাক নেয়, সকলের কাছে হাত জোড় করে, যেন ওস্তাদের কানে না যায়। অবশ্য তখন বাজনা নিয়ে যায় না, তাই অন্য জায়গায় বাজিয়ে সে যে পয়সা বোজগার করে না, এও সকলেই জানে।

এই পোশাকের লোভ কেন সেটা অবশ্য সম্প্রতি জানা গেছে। ওই পোশাক পরে একটি মেয়ের মন ভোলায়। ভোলায় কেন, ভুলিয়েছেই। নয়তো বিয়ে হয় কেমন করে?

কিন্তু বিয়ের ব্যাপারটা অবাক হবার মতো কিছু নয়। অবাক কাণ্ড সর্দারের মতিগতি আচরণ। তার খেয়ালে মঙলার বিয়েতে পুরো ব্যাণ্ডপার্টি বেরুবে এও না-হয় বোঝা গেল, কিন্তু সে নিজে দল চালাবে সেদিন, আর ফ্লুট বাজাবে, এমন মারাত্মক কথা কে কবে শুনেছে। কোনোদিন তো কেউ তাকে দলের সঙ্গে বেরুতে দেখে নি।

ওস্তাদ যে উঁচুদরের শিল্পী, তা অবশ্য সকলেই বিশ্বাস করে। জামান সাহেব বলে, ওস্তাদের গুরু তাকে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীও শিখিয়ে গেছে। তা ছাড়া ওস্তাদ পাকা গাইয়ে-বাজিয়ে না হলে তাদের ব্যাণ্ডপার্টির এত সুনাম হত না বাজারে। সে মাস্টারও কড়া, সক্কলকে ধরে শেখায়, বেশী ভুল করলে তিরিক্ষি হয়ে ওঠে, কিন্তু বুকের ব্যামোর দরুন এই শেখানোর সময়েই তো কতবার হাঁপ ধরে, বুক ধড়ফড় করে— সে কিনা মেয়ের বাড়ি থেকে চার মাইল পথ হেঁটে এ-পর্যন্ত আসবে, ফ্লুট বাজাবে। পথে একটা বিপদআপদ হওয়া ও তো বিচিত্র নয়। লাট-বেলাটের বিয়েতেও যাকে নড়তে দেখি নি, মঙলার বিয়েতে তার এ কি তাজ্জব খেয়াল।

ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে জামান সাহেব বলে, সব নসিব ভাই, নইলে যার রাজার হালে থাকবার কথা তাকে এমন ভূতে কিলোবে কেন।

জামান সাহেবের এ ধরনের খেদ দলের লোকেরা আগে অনেক শুনেছে। খাঁ সাহেবের মতে ওস্তাদের বুকের ব্যামো বল, আর নাগাড়ে এই দেড়কুড়ি বছরের বে-খুশ হাল বল—সবই তার নিজের কর্মফল। পাপ-পুণ্যি বিচারে খাঁ সাহেবের রাখা-ঢাকা নেই। বয়েসকালে সে কম দেখে নি আর কম অবাক হয় নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস- ওস্তাদের নসিবের ওপর গুরুর নিঃশ্বাস লেগেছে। অমন দিলদরাজ গুরু জামান সাহেব আর দেখেনি, খাস রাজস্থানের খানদানী বংশের লোক ছিল, অবস্থার ফেরে দু'পুরুষ বাংলাদেশে থেকে বাঙালী বনে গেলেও রাজপুতের দিল ছিল। গান-বাজনায় সকলের থেকে বেশী মন ছিল বলে কি ভালোই না বাসত ওস্তাদকে। প্রাণ ঢেলে শেখাত। আর এই ভালোবাসার বদলে কিনা গুরুর কলজের কালিয়া বানিয়ে খেতে চেয়েছে ওস্তাদ, গঞ্জনা দিয়েছে, গুরুর মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে, এমনকি ওকেই সব দিয়ে থুয়ে চোখ বোজার সময়েও একটু সদয় ব্যবহার পায় নি।

কারিগরেরা এই গুরু-নিগ্রহের গল্প আগেও শুনেছে। তাদের ধারণা, এই জন্যেই ওস্তাদ কাউকে বুকের কাছে টানে না। পাছে তার শিষ্যরাও তাকে অমনি গঞ্জনা দেয় আর নিগ্রহ করে, সেই ভয়েই হয়তো শিষ্যদের ওপর এমন নির্মম কঠিন সে।

ওস্তাদের সেই বয়েসকালের কারিগর দলে আর একজনও নেই। থাকবে কি করে, তার গুরু চোখ বুজেছে তাও তো প্রায় তিন যুগ হতে চলল, কিন্তু সেই সাগরেদরা থাকলে তারাও হলপ করে বলতে পারত, গুরুর আশকারায় সেদিনও এই ওস্তাদকে দলের সঙ্গে বাজাতে দেখি নি বড় কেউ। বড় বড় কত বায়না হয়েছে, বুড়ো নিজে ফ্লুট বা সানাই নিয়ে দল চালিয়েছে—কিন্তু তার শিষ্য ঘরে অকর্মার মতো বসে কাটিয়েছে। সাধতে গেলে এমন চোখ করে তাকিয়েছে যে গুরু নির্বিবাদে সরে গেছে। অথচ রাতদুপুরে এই শিষ্যকেই কতদিন গান-বাজনায় তালিম দিতে শোনা গেছে, মনে হয়েছে, বুড়োর ভাণ্ডারে যা-কিছু আছে সব উজাড় করে ঢেলে দিয়ে তবে নিবৃত্ত হবে।

না, সেই একদিনেব পবে এতকাল এত বছবেব মধ্যে কেউ আব এই ওস্তাদকে বাজনায বেরুতে দেখে নি। সেই একদিনেব কথা জামান সাহেব ভোলে নি, আজও যাবা বেঁচে-মবে আছে তাবাও কোনোদিন ভুলবে না। শাগবেদবাও হা করে সেই একদিনেব কথা শুনল। শুনল সেই একদিন গুরুব বিযেতে বাজনায বেবিযেছিল ওস্তাদ, আব তাবপব মঙলাব বিযেতে এই একদিন বেরুবে—মাঝে তিন-তিনটে যুগ কেটে গেছে।

বলতে গেলে প্রায বুড়ো বযসেই বিযেব ঝোঁক চেপেছিল ওস্তাদেব গুরুব। একটা কচি মেযেকে বিযে কবে ঘবে এনে তবে ঠাণ্ডা হযেছিল। আব তাবপব দিনে দিনে এত ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিল যে সকলে অবাক। অথচ বিযেব দিন গুরুব সে-মূর্তি দেখে দলেব লোক আতকে উঠেছিল। বুড়োব শিবায শিবায বাজপুত বক্ত টগবগিযে ফুটতে দেখেছিল সবাই। তাব কদিন আগে থেকেই এই ওস্তাদেব মুখে আষাঢেব মেঘ থমথমিযে উঠেছিল এই বযসে গুরু বিযে কববে তাতে ভযানক আপত্তি ছিল বোধ হয। তা ছাড়া আখেবে নিজেব স্বার্থহানিব সম্ভাবনা ভেবেও হযতো মেজাজ বিগড়ে ছিল। বিযেব দিন সকাল থেকে দেখা গেল গুরুও গম্ভীব। বিকেলে সবাই ব্যাণ্ডপার্টি নিযে প্রস্তুত, ওস্তাদ শুধু চুপচাপ দাওযায বসে। তাব নড়াচড়াব নাম নেই।

সেই মূর্তি দেখে গুরুব হঠাৎ মাথায আগুন জ্বলল যেন। কাছে এসে বলল, তোকে বাজাতে হবে, ওঠ।

ওস্তাদ আগুন চোখে তাকাল তাব দিকে। গুরু আবাব বজ্রকণ্ঠে হুকুম কবল, ওঠ—!

ওস্তাদ নড়ল না।

বাঁশী হবে বলে তেলমাখানো বাঁশ শুকোচ্ছিল দাওযায। তাব একটা তুলে নিযে গুরু বেদম পিটতে লাগল তাকে। গাযেব চামড়া ফেটে ফেটে যেতে লাগল, পিটুনিব চোটে তাকে তুলে তবে ক্ষান্ত হল।

ওস্তাদ উঠে দম নিল খানিকক্ষণ। তাবপব ঘবে ঢুকে গেল। একটু বাদে বাজনাব পোশাক পবে বেবিযে এল। বাজনা বাজাল। সেই অদ্ভুত প্রাণমাতানো বাজনা যাবা শুনেছে তাদেব আজও কানে লেগে আছে। সাবাক্ষণ বাজিযেছে বউ ঘবেব দাওযায পা দেওযা পর্যন্ত। তাবপব বাতে মুখ বুজে নিজেব ঘবে গিযে শুযেছে। সর্বাঙ্গ দাগড়া দাগড়া ফোলা, বেদম জ্বব।

ওদিকে আব এক ঘবে গুরু মাটিতে লুটিযে পড়ে কাঁদছে।

আব একদিকে একটা ঘবে নতুন বউ পুতুলেব মতো বসে।

তাবপব থেকে গুরুব সঙ্গে ওস্তাদেব একটা দিনেব জন্যেও বনিবনা হয নি। গুরু প্রাণ ঢেলে গান-বাজনা শিখিযেছে তাকে, তবু না ওদিকে শিষ্যেব ভযেই হযতো বউটাব সঙ্গেও ভালো ব্যবহাব কবত না বুড়ো, বছব দেড়েকেব মধ্যে বউটা একবাব বাপেব বাড়ি গিযে আব ফিবল না। অন্য লোকেব সঙ্গে পালিযে গেল কোথায, কেউ আব তাব হদিশ পেল না। বুড়ো অসহায কচি ছেলেব মতো তাব পব থেকে এই শিষ্যকেই একমাত্র আপনাব জন বলে সর্বদা আঁকড়ে থাকতে চেযেছে। ওস্তাদ তাব প্রতি কর্তব্য কবেছে, কিন্তু তাব প্রতি কেউ তাকে কোমল হতে দেখে নি কোনোদিন।

এমন কি বুড়ো তার হাতে এই ব্যবসা তুলে দিয়ে চোখ বোজার পরেও না।

জামান সাহেব আজও বলল, অমন গুরুর এত হেনস্থা করে শান্তি মিলতে পারে কারো? ওস্তাদ জীবনে শান্তি পাবে কেমন করে?

মিথ্যে বলে নি। ওস্তাদ শান্তিতে আছে এ কথা কেউ বলবে না। কিন্তু কদিন ধরে দলের লোকেরা ভারি বিচিত্র পরিবর্তন দেখছে লোকটার। মঙলা ইদানীং তার ভালোবাসার মেয়েকে নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। প্রায়ই সাজ-পোশাক পরে কার্তিকটি সেজে চলে যাচ্ছিল। নতুন বাজনার মহড়ায় তার দেখা নেই, এমন কি সেদিন বাজনার চুক্তিমতো দল বেরিয়ে গেল অথচ সে নিপাত্তা। ফলে ওস্তাদের কানে কথাটা উঠল। ওস্তাদ সরাসরি অন্য কারিগরদের জিজ্ঞাসা করল যখন, তার মুখের দিকে চেয়ে মিছে কথা বলবে কে? সব শুনে বিশেষ করে এখানকার পোশাকে সেজেগুজে ভালোবাসার মেয়ের কাছে যায় শুনে ওস্তাদ গুম হয়ে রইল। তার পর আদেশ দিল, মঙলা কোথায় যায়, কার মেয়ের কাছে যায় সব খবর নিতে।

বাজনাদারের মধ্যে অত্যুৎসাহী লোকের অভাব নেই। পরদিনই অনেক মজার খবর নিয়ে এসে ওস্তাদকে যেন উপহার দিল সিরাজ আর শ্যামলাল। সমস্ত দিন তারা তাকে তাকে ছিল, যা দেখার স্বচক্ষে দেখেছে। মেয়েটা সরকারী অফিসের এক পিওনের মেয়ে। বেহালার দিকে থাকে। মঙলাকে বাজপুত্তুর সেজে সেদিনও তাদের ঘরে যেতে দেখেছে ওরা। ঘন্টাখানেক বাদে দু'টিকে পুকুরধারে এসে বসতে দেখেছে। গল্পে মশগুল। মেয়েটার বাপ রাতের আগে বাড়ি ফেরে না, ওদিকে মা'টাও আশকারা দেয় মনে হল।

ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা দেখতে কেমন?

শ্যামলাল মাথা চুলকে জবাব দিল, তা ওস্তাদ দেখতে দিব্বি বেশ! হিন্দুর ঘরের গরীবের মেয়ের বিয়ে তো চট করে হয় না—বয়সও এক কুড়িটাক হবে মনে হল, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে—

ওস্তাদ হাসছিল অতি অল্প। তাকে হাসতে বড় দেখে না কেউ। মুখখানা ক্রমশ খুশিতে যেন জবজবিয়ে উঠছে, অথচ কেমন হিংস্র ধারালো লাগছিল দেখতে। জবা-ছোপ চোখ দুটোও আনন্দে জ্বলছিল যেন। আবার জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা খুব ভালো দেখতে, বলছিস?

উসকানি পেয়ে শ্যামলাল আরো রসিয়ে জবাব দিল, মাইরি বলছি ওস্তাদ, মেয়েটাকে দেখে লোভ লাগছিল। কথায় কথায় যখন হেসে উঠছিল, তখন আরো ভালো লাগছিল।

ওস্তাদ আপনমনে হাসছিল, আর কি এক খুশির চিন্তায় যেন বিভোর হয়ে উঠছিল। কিন্তু সে খুব বেশিক্ষণ নয়। তার পরেই চোখ-মুখ ক্রুদ্ধ কঠোর হয়ে উঠেছিল। এই ভাবান্তর দেখেও আবার ঘাবড়ে গেছে সকলে। ওস্তাদ শ্যামলাল আর সিরাজকে হুকুম করেছে, বাইরের ঘরে গিয়ে বোস, মঙলা ফিরলে এখানে ধরে নিয়ে আসবি।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ওরা মঙলাকে ধরে নিয়ে এসেছে। পরনে এখানকার ঝকমকে পোশাক। হাতেনাতে ধরা পড়ে ফাঁসির মুখ। ওস্তাদের চাউনিটা তার হাড়ের

মধ্যে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল।

কাল বাজনায় আসিস নি কেন?

মঙলা শুকনো জিবে করে শুকনো ঠোঁট ঘষতে লাগল।

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় ওস্তাদ আবার জিজ্ঞাসা করল, এ পোশাক পরে কোথায় গেছলি?

এক জায়গায় একটু কাজ ছিল...

সঙ্গে সঙ্গে চোখে লাল-কালো অন্ধকার দেখল মঙলা। তিন হাত দূরে মাথা ঘুরে বসে পড়ল, গালের একটা দিকের চামড়া বুঝি ওই শুকনো লোহার মতো হাতের সঙ্গে উঠে গেছে। ওস্তাদের হাতের চড়চাপড় একটু-আধটু সকলেই খেয়েছে। কিন্তু ওই হাতের চড়ের এমন ওজন কেউ কল্পনা করে নি।

অস্ফুট কটূক্তি করতে কবতে ওস্তাদ ভিতরে চলে গেল।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ সকলেই দাওয়ায় হাজির। মহড়া হবার কথা। মঙলাও এসেছে। আজ তাকে বিদায় কবা হবে সেটা ধরে নিয়েই এসেছে। মঙলা ঠিক করেছে, ওস্তাদের পা-দুটো একবাব জড়িয়ে ধরে দেখবে—তার পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে দেবে।

ভিতর থেকে ওস্তাদ এল। মুখ দেখে সকলে অবাক। অসুস্থ লোক সমস্ত বাত না ঘুমুলে যে মূর্তি, রুক্ষ শুকনো বিবর্ণ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মঙলাকে দেখল খানিক। ভয়ে মঙলার পা জড়িয়ে ধবাব সঙ্কল্প উবে গেছে। কিন্তু ওস্তাদের গলার স্বর শুনে সচকিত সকলে। মিষ্টি কবে ডাকল, এই মঙলা, এদিকে আয়—

মঙলা উঠে এসে অধোবদনে দাঁড়াল।

ওই মেয়েটাকে বিয়ে করবি?

সকলে রুদ্ধশ্বাস। মঙলা নিরুত্তর।

বিয়ে করবি? এবারে গলাব স্বর ঈষৎ রুক্ষ।

মঙলা মাথা নাড়ল। করবে।

কবে?

জবাব নেই।

বিয়ে করছিস না কেন?

মঙলা কুঁই কুঁই করে জবাব দিল, থাকার জায়গা নেই।

ওস্তাদ চুপচাপ ভাবল খানিক। তারপর বলল, ওধারেব ওই পূবের ঘরটা বড় আছে, ও-ঘরটায় বৌ নিয়ে থাকতে পাবিস। মেয়ের বাপকে বলে আয়, এই হপ্তার মধ্যেই বিয়ে হবে। যা—

মঙলা অতি কষ্টে এই দাওয়াটুকু পার হচ্ছিল, তার আগেই আবার বাধা পড়ল—শোন, ওভাবে যাস নে, জামানের কাছ থেকে পোশাক চেয়ে নিয়ে যা।

কাল ওই পর্যন্তই ছিল। আজ সকলের বড়ো বিস্ময়। আজ আবার ওস্তাদের এই হুকুম—পুরো ব্যাণ্ডপার্টি বেরুবে, আর সে নিজে দল চালাবে, ফ্লুট বাজাবে।

বাজনাদারেরা বিস্ময়ে হাবুডুবু খাবে, সেটা বেশি কিছু নয়।

সেদিন সকাল থেকে ওস্তাদের ব্যস্ততা দেখে সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে। এটা কর ওটা কর, এটা হল না ওটা হল না। যেন তারই ব্যাটার বিয়ে। গত দু'দিনে ওই পুবের ঘরটার চেহারা বদলে ফেলেছে। মেরামত করিয়েছে, জানলা দরজা পুরনো খাটে রঙ করিয়েছে।

বেলা চারটে থেকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। যেন কত বায়না করা কাজ করতে চলেছে সকলে। দলপতির মতোই সেজেছে ওস্তাদ, ঝকমকে পোশাকে একরাশ মেডেল ঝুলিয়েছে। তারপর গাড়িভাড়া করে সকলকে নিয়ে বেহালায় এসেছে। বউ নিয়ে ফেরার সময় ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে আসা হবে।

তাই এসেছে। চার মাইল পথ। ওস্তাদ যেন ভিন্ন মানুষ। কে বলে সে হাসতে জানে না, আনন্দ করতে জানে না? আর বাজনা? পথের লোক দাঁড়িয়ে গেছে। শুনেছে আর হাঁ করে দেখেছে। বাজনায় বাজনায় সমস্ত পথ মাতিয়ে ফিরেছে। ওস্তাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই যেন নেশা ধরে গেছে।

ওস্তাদের অনেকবার হাঁপ ধরেছে, গলার শিরা ফুলে ফুলে উঠেছে, মুখ লাল হয়েছে, বুকভরে যেন বাতাস নিতে কষ্ট হয়েছে। কিন্তু ওস্তাদ সর্বাক্ষণ খুশিতে মাতোয়ারা। তার বুকের ব্যামো নিয়ে কেউ দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলে হেসে বলেছে, ব্যামো ছেড়ে গেছে—অনভ্যাসে দম পাচ্ছে না, এই যা।

পরের ঘরে একেবারে বউ এনে তোলার পর তবে বসেছে। বসে হাঁপিয়েছে আর হেসেছে।

মঙ্গলা তার পায়ের ওপর একেবারে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করেছে। ওস্তাদ হেসেছে। তারপর বউ প্রণাম করেছে। ওস্তাদ দু'হাতে তাকে টেনে তুলেছে। বউয়ের মুখখানা তুলে ভালো করে দেখেছে। তারপর বলেছে, তুই আমার বেটি, আমি তোর ছেলে, ছেলেকে দেখবি তো?

ওস্তাদ হাসছিল, কিন্তু তার চোখদুটো অস্বাভাবিক চকচক করতে দেখেছে সকলে।

রাত গভীর। সকলে চলে গেছে। ওস্তাদ একটা মালা হাতে নিজের ঘরে ঢুকল। হাঁপ ধরেছে। বাতাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। এত জল খেল তবু বুকটা শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ও কিছু নয়, শুয়ে পড়লেই সেরে যাবে। ওস্তাদ হাসছে। হাসছে মিটিমিটি। ওরা সকলে খুব আবাক হয়েছে। কিন্তু অত অবাক হবার কি আছে, ওস্তাদ যেন আর মানুষ নয়। সেই সেকালের দলের লোকেরা ওকে মধু ওস্তাদ বলে ডাকত। এরা শুধু ওস্তাদ বলে। বলে বলেই যেন তার ভিতরের মধু মরে গেছে। সেদিনের মধুকে যদি ওরা দেখত, তাহলে অত অবাক হত না।

মধু মরে নি। কিন্তু কমলা কোথায়? বেচে আছে না মরে গেছে? কে জানে কি হয়েছে, আজকের দিনে ও-সব ভাববে না, ভাবতে নেই। আজ তার গুরুর মুক্তির দিন, তারও মুক্তির দিন। আজ ওসব ভাবতে নেই।

ঘরে এল। পা দুটো কাঁপছে। মালাটা রেখে দেয়ালের কোণ থেকে একটা ফটো পেড়ে আনল। অবজ্ঞায় অবহেলায় বিবর্ণ হয়ে আছে, একরাশ ধুলো জমেছে। যত্ন করে মুছে পরিষ্কার করল সেটা। দেখল চেয়ে চেয়ে। তারপর আবার যত্ন করে টাঙিয়ে

মালাটা গলায় পরিয়ে দিল।

না, মধুর আজ আর কোনো রাগ নেই। লোভে পড়ে গুরু একটা ভুল করে ফেলেছিল। ভাঙানি দিয়ে শেষে নিজেই কমলাকে ঘরে এনেছিল। তা কমলার মতো মেয়ের জন্য পৃথিবীতে অনেক ছলচাতুরীর নজির আছে। কিন্তু তা হলেও সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে। আজ সে-ই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। গুরুর মুক্তি, তারও মুক্তি। সে-ই ওই গুরু হয়ে আজ মঙলার বিয়ে দিয়েছে—মঙলাটাও আজ নতুন বয়সের সেই এক মধুর মতোই দেখাচ্ছিল।

নিঃশ্বাস নিতে, ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। ঘরের বাতাস কমে গেছে বোধ হয়। কিন্তু এরই মধ্যে এত গরম পড়ে গেল কি করে? তবু এমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না, শান্তিতে চোখ দুটো বুজে আসছে। একটু জল পেলে হত। থাকগে—। বেশ লাগছে, কিছুই কষ্ট হচ্ছে না। একটু বেশী ধকল গেছে আজ। ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আলোটা নিবিয়ে পা দুটো টেনে দেহটা খাটিয়ার কাছে নিয়ে এল মধু।

বসল, শুয়ে পড়ল। বড় ভালো লাগছে। কতকাল এত ভালো লাগে নি। হাসি মুখে চোখ টান করে অন্ধকার ঘরটা দেখল একবার। ঘরটা নয়, ওই খাটের দিকটা। মনে হল, হাসি মুখে গুরু ওখান থেকে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ঘুমে তার চোখ দুটো বুজে আসছে।

চোখ বুজল মধু। ওস্তাদ এবারে ঘুমুবে।

সমান্তরাল

যাব যাব করেও পাঁচ ছ'দিন কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত ও একরকম জোর করেই পাঠালো আমাকে। নিজে ও এর মধ্যে দু'দিন ঘুরে এসেছে। বলেছে, দু'জনেই ওরা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি তোমার শরীরের দোহাই দিয়ে এটা ওটা বলছি, ছি ছি, এরপরে আর কবে যাবে, সবকিছুরই একটা সময় অসময় আছে।

পরে নিজেই আবার বলেছে, ওদের কারো মুখের দিকে আর তাকানো যায় না, ভিতরটা এমন মোচড়াতে থাকে যে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলেন ওরা?

—কি আর বলবেন। একটু চুপ করে থেকে স্ত্রী মনের কথাটা ব্যক্ত করেই ফেলল। —ডক্টর রক্ষিত ঘর ছেড়ে যেতে মিসেস রক্ষিত বললেন, আমার কথা ভাববেন না ভাই, আমি তো একখানা পাথর, সব সহ্য করতে পারি। কিন্তু মুশকিল হয়েছে ওকে নিয়ে, বাইরে যত শক্ত হয়ে সহ্য করতে চেষ্টা করছে ভিতরটা ততো জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, এর থেকে যদি মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদত, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর ডক্টর রক্ষিত কি বললেন তোমাকে?

স্ত্রী সচকিত একটু।—কিছু বলেছেন তুমি জানলে কি করে?

—তুমি বলো না।

—ডক্টর রক্ষিত নিচে ছিলেন, দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এলেন। প্রথমে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যাচ্ছ না কেন, তারপর সিঁড়ির দিকে একবার দেখে নিয়ে গলা খাটো করে তোমার নাম করে বললেন, সময় পেলে ওকে এসে আমার স্ত্রীর কাছে একটু বসতে-টসতে বলবেন ওকে পছন্দ করে যে-ভাবে সামলাতে চেষ্টা করছে, মাথার কিছু একটা গণ্ডগোল না দেখা দেয়। একটু থেমে আবার বললেন, আমার চাকরি আছে, বই আছে ওর কি আছে বলুন।

বড় একটা নিশ্বাস ফেলে স্ত্রী মন্তব্য করল, ব্যাপার কি জানো আগেও ওদের দু'জনকেই কেমন যেন লাগত আমার, এখন আরো বেশি লাগছে।

পরদিনই গেলাম।

এতদিন যাই নি, কারণ গিয়ে কি দেখব, কোন সান্ত্বনার কথাটা বলব। শোকের উপর— এত বড় শোকের উপর সান্ত্বনার প্রলেপ কি করে দিতে হয় আমি জানি না।

একতলার প্রায় সব কটা দোকানঘর, দোতলার ফ্ল্যাটে ওরা থাকেন। ডক্টর পান্নালাল রক্ষিত আর সুষমা রক্ষিত। সিঁড়ি ধরে পায়ে পায়ে উপরে উঠতে লাগলাম। ঘরের স্তব্ধতা যেন বুকের উপর চেপে বসতে লাগল। আগেও অনেকটা এই রকমই লাগত, এই শোকের আগেও কিন্তু এতটা লাগত না।

সামনে বারান্দা, জুতোর একটু শব্দ করেই বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম না, তেরো বছরের একটা রোগা ছোট মেয়ে সামনের ঘর থেকে গলা বাড়ালো না। খুশির ছটা চেপে ডাগর চোখে একবার বাবার ঘরের দিকে আর একবার মায়ের ঘরের দিকে তাকালো না। বাঁদিকের ঘরটা বাবার, ডান দিকের ঘরটা মায়ের—মায়ের ঘরখানা ওর নিজের।

মাঝের এই ঘরটাই বরাবরকার মতো শূন্য হয়ে গেছে। মায়াভরা ওই দুটো ডাগর চোখের নীরব কৌতুক নরম বিস্ময় বা নীরব বেদনা আর কোনোদিন দেখব না। তেরো বছরের ওই রোগা-রোগা ধীর-শান্ত মেয়েটাকে আর কোনোদিনই দেখব না।

মিনু চলে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, এই চলে যাওয়াটা আমার কাছে আঘাত বটে, কিন্তু বিস্ময়কর আঘাত নয় কেন। আমি কি জানতাম এই মেয়ে থাকবে না? নাকি, বড় বেশি রোগা আর বড় বেশি শান্ত বলে আমার মনে ওই গোছের ছায়া পড়ত? ঠিক তাও নয় বোধহয়। সমস্ত শরীরের মধ্যে ওই দুটো বড় বড় চোখ দেখে আমার ভিতরে কি রকম একটা অনুভূতি খচখচ করত, মনে হত এই মেয়ে বেশিদিন থাকতে আসে নি। মেয়েটা হাসলেই আমার মনে হত সেই দুটো ডাগর চোখের গভীরে ব্যথা ছোঁয়া দাগের ছায়া পড়ে আছে একটা।

আস্তে করে দরজার কলিং বেল টিপলাম। এই স্তব্ধতার মধ্যে ভিতরের সেই আওয়াজটুকুও নিজের কানে কর্কশ ঠেকল। এদিকের ঘর থেকে চুরুট-মুখে ডক্টর রক্ষিত এগিয়ে এলেন, ও-দিকের ঘর থেকে সুষমা রক্ষিত উঁকি দিলেন।

হালকা অন্তরঙ্গ সুরে ডক্টর রক্ষিত বললেন, হ্যালো সাহিত্যিক, এ কদিন কতবার যে তোমার কথা মনে হয়েছে—

মিসেস বক্ষিত জিজ্ঞাসা কবলেন, শবীব খাবাপ শুনেছিলাম, এখন ভালো তো?

ভদ্রলোকেব দিক থেকে ভদ্রমহিলাব দিকে তাকালাম আমি। সাত দিনে দু'জনেবই সাত বছব কবে বযেস বেড়ে গেছে মনে হল। মাথা নাড়লাম, ভালো।

ডকটব বক্ষিত বললেন, এসো, আজ শিগগিব ছাড়ছি না তোমাকে। স্ত্রীব দিকে তাকালেন, তোমাব ঘবেই বসা যাক, কি বলো?

মিসেস বক্ষিত জবাব দিলেন, যে-ঘবে খুশি, উনি তো ঘবেব লোক—ইচ্ছে কবলে তোমাব ঘবেও বসতে পাবো।

হঠাৎ নির্বোধেব মতো আমি এমন একটা কথা বলে ফেললাম যাব দরুন পাঁচ মিনিটেব মধ্যেই নিজে আমি দ্বিগুণ বিড়ম্বিত। বললাম, না, আজ মিলুব ঘবেই বসা যাক, চলুন—।

শোনামাত্র দু'জনেই হকচকিযে গেলেন কেমন। সেই হোচট খাওয়া চোখে দু'জনে দু'জনাব দিকে তাকালেন একবাব। মিসেস বক্ষিত বলে উঠলেন, বেশ তো, বেশ তো .আমি ওদিক থেকে খুলে দিচ্ছি।

ভিতবে চলে গেলেন। সেই ফাকে হাসি-চোখে ডকটব বক্ষিত আমাব দিকে চেযে কাছে সবে এলেন। মৃদু মন্তব্য কবলেন, ইউ আব এ ড্যাম ডিযাব ফেলো, এই জন্যেই তো তোমাকে খুঁজছিলাম।

শুনে আমিও ভাবলাম, ভালো কাজই কবেছি। কিন্তু ওই ঘবে গিযে বসাব পাচ মিনিটেব মধ্যেই অস্বস্তি। আমাদেব সকলেব সব কথা যেন তাব মধ্যেই ফুবিযে গেল। তাবপব ভিতব থেকে ঠেলে ঠেলে যেন কেউ এক-এক দফা কথা বাব কবছেন বা আমি কবছি। আবাব এক মিনিট না যেতে সেই কথা ফুবিযে যাচ্ছে। তক্ষুনি আবাব নতুন কবে কথা হাতড়ে বেড়ানোব ধকল। সেই এক মিনিট দেড় মিনিটেব নীববতাব ফাকগুলোও যেন ভবাট কবা কঠিন হযে উঠছে।

খানিকবাদে মিসেস বক্ষিত চাযেব কথা বলাব জন্যে উঠে গেলেন। উদগ্রীব মুখে চুরুট নামিযে ডকটব বক্ষিত কাছে সবে এলেন। অস্ফুট স্ববে জিজ্ঞাসা কবলেন, কেমন বুঝছ? মানে মাথাব কিছু ইযে-টিযে

—একজ্যাকটলি। ব্যাকুল মুখ তাঁব এত বড় শোক বলে মানতে চেষ্টা না কবে, তাহলে ভযেব কথা না।

আমাব দুটো হাত ধবে ফেললেন, এই জন্যেই তো তোমাকে এত কবে চাইছিলাম . তুমি আস না কেন, বোজ আস না কেন ওব কাছে?

পবমুহূর্তে সবে গেলেন। হাসি-হাসি মুখ। কি কবে টেব পেলেন স্ত্রী ফিবে আসছে ভেবে পেলাম না। উনি জাযগায গিযে বসাব সঙ্গে সঙ্গে মহিলাব ঘবে পদার্পণ আবাব।

ডকটব বক্ষিত হেসে বললেন, সাহিত্যিককে আজ একটু বিমনা দেখছি, বোধহয লেখাব নতুন প্লট ভাবছে কিছু।

সুষমা বক্ষিত উৎসুক তক্ষুণি।—তাই নাকি? আপনাব লেখাব নামেই তো ওঁব জিভে জল—বলুন না শুনি?

আবহাওয়াটা হঠাৎ এত বেশি বেখাপ্পা লাগল আমার যে হাসাও দায়। কেবল মনে হতে লাগল, অদৃশ্য থেকে একটা রোগা শীর্ণ মেয়ে ডাগর চোখে দেখছে আমাদের, আর তার সেই চোখে খুব একটু চাপা কৌতুক চিকচিক করছে।

আমি বললাম, না, গল্প ভাবছি না।

মিসেস রক্ষিত বললেন, আপনার লেখা ওঁর যখন এত পছন্দ, আমাদের সামনেই ভাবুন না একটা, দেখি—।

হাসিমুখে ডকটর রক্ষিত বললেন, কথাটা কিন্তু ঠিক বললে না। আমার ওর লেখা থেকে ওকে বেশি পছন্দ, আর তোমার ওর থেকে ওর লেখা বেশি পছন্দ। আমার দিকে ফিরলেন, তোমাকে আমার সময় সময় হিংসে হয়, বুঝলে...যখনি দেখি তোমাকে, আই মিন তোমার বই বুকে নিয়ে পড়ে আছে।

নিজের রসিকতায় বেশ জোরেই হেসে উঠলেন ডকটর রক্ষিত।

মুখ একটু লাল করে সুষমা রক্ষিত বললেন, বেশ, যাও।

আমার কেবলই মনে হচ্ছে, কৃত্রিমতা ঠেসে ঠেসে আমরা তিনজনই এই ঘরের শুচিতা নষ্ট করছি। অদৃশ্য সেই তের বছরের রোগা মেয়েটা তার জন্যে যেন একটুও রাগ করছে না, কিন্তু না-বলা কৌতুকে আমাকে যেন বোঝাতে চাইছে, তুমিও শেষে এই দলে ভিড়লে?

দম এক-একবার বন্ধ হয়ে আসছিল। ঘণ্টা দুই বাদে উঠে পড়লাম এক রকম জোর করেই। শিগগিরই আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিতে ওঁরা ছাড়লেন।

সুষমা রক্ষিত স্বামীর উদ্দেশে বললেন, তোমাকে আর ওঠা-নামা করতে হবে না, আমিই ওঁকে এগিয়ে দিচ্ছি।

পাশাপাশি নিচে নেমে এলাম। মনে মনে হয়ত একটু প্রস্তুত ছিলাম। নিচে পা দিয়েই মিসেস রক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন, উনি তখন কি বলছিলেন?

—কখন?

—আমি যখন চা দেবার কথা বলতে গেলাম?

—ও। আপনার জন্য উনি খুব চিন্তিত মনে হল।

—আমার জন্য, না? হুঁঃ। এদিকে নিজে ক'রাত ধরে ঘুমোয় না আপনি জানেন?

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু থমকালাম আমি। সব ছাপিয়ে একটা অব্যক্ত হতাশাই চোখে পড়ল আমার। নরম সুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, উনি ঘুমোন না, আপনি টের পান?

—টের না পাবার কি আছে। রাতে তো আর দরজা বন্ধ করেন না। সমস্ত রাতই প্রায় ঘরে আলো জ্বলে। দরজার কাছে এলেই চুরুটের গন্ধ পাই।

বললাম, তার মানে আপনিও রাতে বিশেষ ঘুমোন না।

এই সামান্য কথাতেই মিসেস রক্ষিত বেশ হকচকিয়ে গেলেন যেন। তারপর ঈষৎ অসহিষ্ণু জবাব দিলেন, ঘুমোই, আমার যেটুকু দরকার বেশ ঘুমোই— আসলে আপনি আমার থেকে ওঁর কথাই বেশি বিশ্বাস করছেন। শুনুন, আপনি শুভার্থী বলেই বলছি, সত্যিই ভালো চান তো ওঁর দিকে একটু লক্ষ্য রাখুন।

সাত আট বছর হল ডক্টর পান্নালাল রক্ষিতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় আমার। আমি জয়পুরে গেছলাম বেড়াতে, উনি বিজ্ঞান কনফারেন্সে যোগ দিতে। সেখানে প্রথম আলাপ। কনফারেন্স শেষ হবার পরেও তিনি আরো সাত আট দিন আমার সঙ্গেই ছিলেন সেখানে। সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই ক'বছরে আত্মীয়তার দিকে গড়িয়েছে।

ফিজিকস-এর নামী প্রোফেসার। বছর চারেকের বড় আমার থেকে—বছর ছাপ্পান্ন হবে বয়েস। সুষমা রক্ষিতের বয়েস এখন সাতচল্লিশ। নিজেই গল্প করেছেন, বুড়ো বয়সের বিয়ে তাদের। বিয়ের সময় ডক্টর রক্ষিতের বয়েস চল্লিশে পড়ো পড়ো আর সুষমার তেত্রিশ। প্রায় আট বছর আগে সুষমা রক্ষিতকে প্রথমে দেখার পর আমার মনে একটা স্থূল কৌতূহল উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল। তখনো মহিলা রীতিমতো সুশ্রী দেখতে আর স্বাস্থ্যেরও আঁটবাঁধন। তখন অর্থাৎ একচল্লিশের এই চেহারা আর স্বাস্থ্য ত্রিশে কেমন ছিল? বাংলাদেশে ভালো ছেলের বাজার যতই চড়া হোক, তা এত [illegible] সুশ্রী মেয়ের তেত্রিশ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার কথা নয়। কৌতূহল আরো একটু বেড়েছিল যখন শুনলাম মোটামুটি অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েই ছিলেন মহিলা, আর বিয়ের সময় নিজেও মেয়ে কলেজের বাংলার লেকচারার ছিলেন। মেয়ে হবার আগে লম্বা ছুটি নিয়েছিলেন, পরে আর মাস্টারি করতে যাননি।

স্বভাবতই আমার মনে হয়েছিল, একটি সুশ্রী, বিদুষী আর সচ্ছল ঘরের মেয়ে তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করে কাটালেন কেন। হাসিমুখেই দু'জনের সামনে একদিন এই প্রশ্নটা করে বসেছিলাম। দু'জনকে একসঙ্গে এমন সচকিত হতে দেখেছিলাম যে এই কৌতূহল আর দ্বিতীয়বার প্রকাশ করি নি। সামলে নিয়ে সুষমা রক্ষিত হেসে বুদ্ধিমতীর মতোই জবাব দিয়েছিলেন, জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক, সময়ে দেখা না হলে দেরি তো হবেই।

মোট কথা, সেই তখন থেকেই ওদের আচরণ স্বাভাবিক মনে হয় নি। পরস্পরকে সঙ্গ করা আর পরস্পরের ভালো দেখা ছাড়া দুনিয়ায় যেন আর কোনো চিন্তা নেই ওদের। আর বাইরের লোকের সামনেও সেটা এমনি স্পষ্ট যে চোখে প্রায় অস্বাভাবিক ঠেকে।

ওদের বাড়ি যাতায়াতে আমার বাঁধা ধরা সময় কিছু নেই। বিশেষ করে মেয়েটার টানেই যখন তখন যেতাম। অবশ্য দু'জনারই বাড়ি থাকার সম্ভাবনা আছে জেনেই যেতাম। আর ছুটির দিনের দুপুরেও গিয়ে হাজির হতাম অনেক সময়।

বাড়িতে কেউ আসুক, ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা সর্বদা যেন সেই প্রতীক্ষায় থাকেন। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ কানে গেলেই প্রথমে দরজার সামনে এসে দাঁড়াত ওই শীর্ণ মেয়েটা। তারপর দু'পাশের দু'ঘরের দরজায় তার বাবা আর মা। দু'জনেরই টান ধরা মুখে হাসি ছড়াতো। আর প্রায় একসঙ্গেই হৃষ্ট অভ্যর্থনা জানাতেন।

শীর্ণ মেয়েটা তখন গম্ভীর কৌতুকে একবার এ-দিকে তাকাতো একবার ও-দিকে। একবার বাবার দিকে, একবার মায়ের দিকে। এই একই অবধারিত চিত্র যে কতদিন দেখেছি ঠিক নেই।

আমাব ধাবণা আমি ছাড়া আব যাবা আসত এখানে ঠিক একই দৃশ্য দেখত।

একদিনেব ঘটনা আমাব চোখে ভাসছে। দুপুবে এসেছিলাম ইচ্ছে কবেই শব্দ না কবে ওপবে উঠেছি। মিলু তাব ঘব থেকেই আমাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে দবজাব কাছে এগিয়ে এলো। একবাব ডাইনে তাকালো একবাব বাঁয়ে। অর্থাৎ বাবা-মা দু'দিক থেকে এসে দাঁড়ায় কিনা দেখছে। আমি নিজেব ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকালাম, অর্থাৎ কাউকে ডাকতে হবে না।

মিলুব সঙ্গে তাব ঘবে ঢুকলাম। মেঝেতে মাদুবেব ওপব তাব আঁকাব সবঞ্জাম ছড়িয়ে বসেছিল সে। আমিও মাদুবে আসন নিয়ে ওকে কোলেব কাছে টেনে বসালাম। বললাম, তোমাব ছবি দেখি আব তোমাব সঙ্গে গল্প কবি, ওদেব বিবক্ত কবে কাজ নেই।

মিলু বলল, বিবক্ত কেন, কেউ এলে বাবা মা তো খুব খুশি হয়।

—তাই বুঝি?

মিলু মাথা নেড়ে জবাব দিল, হ্যাঁ। কেউ এলে তবেই তো বাবা মা হাসে আব খুব কথা বলে—নইলে তো সমস্ত দিনবাতেব মধ্যে কেউ কাবো সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

আমি সন্ত্রস্ত। আবো অপ্রস্তুত মেয়েটাব পবেব কথা শুনে। বড় বড় দু'টো চোখ আমাব মুখেব ওপব তুলে ও বলল, তোমাকে যে এ কথা বললাম কাউকে বোলো না যেন।

আমাব ভিতবটা কেমন খচখচ কবে উঠল। মেয়েটাব ওই চোখ দেখলেই মনে হয়, ও যেন কোনো দূবেব মায়ায় জড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি ওব ছবিব দিকে মন দিলাম, আব ছবিব প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলাম।

খানিকবাদে সিঁড়িতে একাধিক পায়েব শব্দ। সেই সঙ্গে নাবী পুরুষেব মিলিত গলা। মিলু মুখ তুলে সেদিকে তাকালো, তাবপব উঠে দবজাব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাবপব একবাব ডাইনে তাকালো একবাব বাঁয়ে। একবাব বাবাব ঘবেব দবজাব দিকে একবাব মায়েব।

পবক্ষণে সুষমা বক্ষিতেব খুশি আব বিস্ময় ভবা গলা কানে এলো, বমা তুই! কী কাণ্ড, আয় আয়—

অন্যদিক থেকে ভদ্রলোক বক্ষিতেবও তেমনি সবস আব সবব বিস্ময়, একেবাবে ভায়াকে সঙ্গে কবে যে, অ্যাঁ! নিশ্চয় বিশেষ কোনো ঘটনা আছে—বুঝলে?

শেষেবটুক স্ত্রীব উদ্দেশে। স্ত্রীব জবাবও কানে এলো, সে আব তোমাকে বলতে হবে না, নইলে টিকিব দেখা মেলে ওদেব।—এলি কোথা থেকে, আসানসোল থেকে মেয়েব বিয়ে বুঝি?

নবাগত এবং নবাগতাকে এবাব বোঝা গেল। শুনেছিলাম সুষমা বক্ষিতেব বোন সুবমা থাকেন আসানসোলে—তাব স্বামী বিনয় দত্ত সেখানে কলিয়াবিব পদস্থ কর্মচাবী।

খুশির হাওয়া দ্বিগুণ মুখরিত হয় উঠল মিলুর ঘরে আমাকে দেখে। তার মেসো আর মাসিকে নিয়ে কর্তা এবং গৃহিণী এ-ঘরেই ঢুকে পড়লেন। ডকটর রক্ষিতের নিখাদ বিস্ময়।—তুমি! চুপি চুপি এসে তুমি কখন এখানে বসে আছ, অ্যাঁ?

সুষমা রক্ষিত হাসিমুখেই মেয়ের উদ্দেশে ভুরু কোঁচকালেন।— কাকুর সঙ্গে একা গল্প করছিস, আমাদের একটা খবরও দিস নি মিলু?

আমি দেখছি। দূরেব মিলু গম্ভীর কৌতুকে একবার মা-কে দেখছে একবার বাবাকে।

আমাব সঙ্গেও পবিচয়-পর্ব সমাধা হল। সুরমা আর বিনয দত্ত আমাকেও আসানসোলে তাঁদেব মেয়েব বিয়েতে উপস্থিত থাকাব জন্য সাদব আমন্ত্রণ জানালেন।

বোনেব উদ্দেশে সুষমা বললেন, মেযেব স্কুল, ওঁব কলেজ, আমি যাই কি করে?

ডকটর রক্ষিত বললেন, দু'দিনে মেয়ের এমন কি ক্ষতি হবে, তুমি চলে যেও।

ছদ্ম কোপে সুষমা রক্ষিত ফোঁস করে উঠলেন, বলছ তো, নিজের নাওয়া-খাওযাব জ্ঞান আছে?

ডকটর রক্ষিত হাসতে লাগলেন। মিলু বাবাকে দেখছে আর মা-কে দেখছে।

সুবমা দত্ত ঝাঁঝ দেখালেন, থাক, তোমাদেব কাবো গিযে কাজ নেই—জীবনভব একজন আর একজনকে আগলে বাখো।

অভিযুক্ত দু'জন অপ্রস্তুত মুখে হাসতে লাগলেন।

আমি বললাম, আমাব মর্তে ডকটব রক্ষিতও কলেজেব ছেলেদেব কাছে দাসখত লিখে দিয়ে বসে নেই— ইচ্ছে করলে দু'দিনের জন্য উনিও যেতে পাবেন।

শুনে মিস্টাব আব মিসেস দত্ত ভারী খুশি। দু'চোখ কপালে তুলে ডকটব স্ত্রীব দিকে ফিবলেন, দেখেছ, ঘবেব শত্রু বিভীষণ দেখেছ।

সুষমা রক্ষিত পলকা ঝাঁঝে আমাকে বললেন, তাহলে মশাই আপনাকেও যেতে হবে আমাদেব সঙ্গে—এই বমা, উনি গেলে আমবা সককলে যাব। বল ভালো করে—

কেন যেন মেয়েটার মুখ চেযেই যা করি না কখনো তাই কবলাম। যেতে রাজি হলাম।

মিলু এবারে বাবা-মার সঙ্গে আমাকেও এক-একবাব দেখে নিচ্ছে।

ফেরাব সময় মিলু আমাকে এগিয়ে দেবার জন্য নিচে নেমে এলো। ওর ওই দূরের চোখের নীরব কৌতুক এবারে যেন একটু বেশি উপচে উঠেছে। ও মুখে কিছু বলে নি, কিন্তু আমার মনে হযেছিল, ও-যেন শুধোচ্ছে, বাবা-মায়ের খেলাখানা কেমন দেখছ?

খেলা! খেলাঘর। সেই প্রথম আমার মনে হয়েছে—খেলাই বটে, যা-কে বলে হোম-গেম!

সেই ছোট থেকে দেখেছি মেয়েটা ভোগে খুব। একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। চিকিৎসার অবশ্য ত্রুটি নেই। আমার সামনে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ নিয়ে দুশ্চিন্তাও কম দেখি নি। পরে আমার মনে হত, এ-ও স্বাভাবিক নয়, এ-ও হোম-গেম।

হঠাৎ এই বাড়াবাড়ি রকমের অসুখে পড়ে গেল মিলু। অল্পেতেই ঠাণ্ডা লাগার ধাত। একেবারে ডবল নিমোনিয়া হয়ে বসল, সঙ্গে আরো কি-সব উপসর্গ।

হ্যাঁ, ঘটা করেই চিকিৎসা শুরু হয়েছে। বড় ডাক্তার আসছে। আমি আমার বিশেষ পরিচিত একটি রাতের নার্স ঠিক করে দিয়েছি। রোজ দেখতে যাই। আর মেয়েটার দিকে চেয়ে রোজই মনে হয়, এ-যাত্রা রক্ষা নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় একটু আগে ওই বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম। পথে নার্সের সঙ্গে দেখা। সেও ওখানেই যাচ্ছে। দু'এক কথার পরেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মেয়েটির বাবা-মায়ের মধ্যে ব্যাপারখানা কি বলুন তো...কি রকম যেন স্বাভাবিক মনে হয় না, আর আমার অসুবিধেও হয়।

আমি সচকিত।—কেন, কি হয়েছে?

না, দু'জনেই মেয়ের জন্য খুব উতলা ঠিকই, কিন্তু ঘরে একসঙ্গে হলেই মেয়েকে ছেড়ে দু'জনে যেন দু'জনের জন্যেই বেশি ব্যস্ত। রাতে দু'জনেই আমার সঙ্গে মেয়ের কাছে থাকতে চান রোজ—আর শরীর খারাপ হবে বলে একজন আর একজনকে ঘুমুতে পাঠাতে চান। আমি কাউকেই থাকতে দিই না, কিন্তু রাতের মধ্যে এক-একজন তিনবার করে উঠে আসেন—আর তখন একজন আর একজনকে দেখলেই অনুযোগ করেন। তার ঠেলায় প্রায়ই মেয়েটার ঘুম ভেঙে যায়।

...মেয়েটার ঘুম একদিন আর ভাঙল না। বরাবরকার মতোই সে চোখ বুজেছে। আমি তার একদিন আগে থেকেই ও-বাড়ি যাওয়া ছেড়েছিলাম।

স্ত্রীর তাগিদে একবার ও-বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর পাঁচ-ছ'দিন কেটে গেছে। সকালের দিকে একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

—ভায়া আছ নাকি? বলতে বলতে ডকটর রক্ষিত আমার ঘরে ঢুকলেন। পিছনে আমার স্ত্রী। আমি খুশিমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে চেষ্টা করলাম।

তিনি বসলেন। হাসি হাসি মুখ। কিন্তু দুচোখ কোটরে। উস্কখুস্ক চুল। বয়েস যেন এরই মধ্যে আরো বেড়ে গেছে। বললেন, ভালো লাগছিল না, চলে এলাম, তুমি তো আর গেলেই না।...বউমা বেশ কড়া করে এক কাপ চা খাওয়াও দেখি।

স্ত্রী তাড়াতাড়ি চলে গেল। দুই একটা সাধারণ কথার ফাঁকে চা নিয়ে এলো। আমি ওকে থাকতে ইশারা করেছিলাম, কিন্তু খেয়াল না করে চলে গেল।

চায়ের পেয়ালায় গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে ডকটর রক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন, লিখছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কি লিখছিলে, গল্প?

মাথা নাড়লাম। তাই।

একটু বাদে হঠাৎ উৎসুক তিনি।—আচ্ছা আমাদের নিয়ে একটা গল্প লিখবে? মানে আমাকে আর সুষমাকে নিয়ে। বেশ ভালো গল্পই হয় বোধ হয়, লিখবে?

ভিতরটা কি-রকম যেন উষ্ণ হয়ে উঠছিল। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল, আপনাদের প্রেম-প্রেম নিয়ে? বলা গেল না। ইন্ধন যোগালাম, বলুন শুনি—

খানিক চুপ করে থেকে অল্প দু'চার কথায় যে-চিত্রটা আঁকলেন সেটা এমন কিছু বিচিত্র নয়। তবু আমার মনে দাগ কাটতে থাকল। বিয়ের পরে দু'জনেই ওরা খুশি হয়েছিলেন এবং একজন অন্যজনকে খুশি করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দু'জনার মনেই কাঁটার মতো একই প্রশ্ন খচখচ করতে থাকল। ডক্টর রক্ষিতের প্রশ্ন, তেত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত সুষমা বিয়ে করে নি কেন। আর সুষমার মনেও সেই একই প্রশ্ন, ভদ্রলোক চল্লিশের দরজায় এসে বিয়ে করলেন কেন।

তাদের এই বিয়েটা হয়েছিল কোনো এক আত্মীয়ের মারফৎ যোগাযোগে। বিয়ের আগে ডক্টর রক্ষিত শুনেছিলেন, বিয়ের প্রতি সুষমার এক ধরনের বীতরাগ ছিল বলে এতটা সময় কেটে গেছে আর সুষমা শুনেছিলেন, ভদ্রলোক পড়াশুনার কাজে এমন তন্ময় হয়ে ছিলেন যে, এক সময় মুখ তুলে দেখেন বয়েস চল্লিশের দিকে গড়িয়েছে।

কিন্তু বিয়ের আগে দু'জনের কেউ এই শোনা কথা যাচাইয়ের দরকার আছে ভাবেন নি—বা কেউ কাউকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি বিয়ের কিছুদিনের পরো এই প্রশ্নটাই যেন সমস্ত আনন্দ টেনে নিতে লাগল তাদের শেষে ডক্টর রক্ষিত একদিন খোলাখুলিই মনের কথাটা জিজ্ঞাসা করে বসলেন সুষমাকে। সুষমা জবাব দিলেন, জিজ্ঞেস করে ভালোই করলে, আমারও তোমার সম্পর্কে এই এক কথাই বার বার মনে হয়।

অকপটে দু'জনার কথা দু'জনে বললেন সেদিন নতুন চাকরিতে ঢুকে ডক্টর রক্ষিত তার এক ছাত্রীকেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে একবার দু'তিনদিনের জন্য তাকে নিয়ে বাইরেও চলে গেছিলেন তারপর যে ঝড় এলো, মেয়েটা তার ওপর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল না, দাঁড়াতে পারল না ডক্টর রক্ষিত দু'হাত বাড়িয়ে অকৃবস্থ ডেকেছিলেন তাকে, সে আসে নি।

সুষমারও প্রায় একই ব্যাপার। তাদের বাড়িতে একটি গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে থেকে পড়াশুনা করত। সুষমার এগারো থেকে একুশ বছর বয়েস পর্যন্ত ছেলেটি ছিল সে-বাড়িতে। ব্যাপারটা জানাজানি হতে যে অপমান আর নির্যাতনের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে হল তাকে, দেখে সুষমা স্তব্ধ। সুষমা ছুটে গেছলেন তার কাছে, তার একটু সম্মতির ওপর ওর যেন জীবন-মরণ নির্ভর। কিন্তু সেই

তাকে মানুষ সবেই নাড়াল. হাজার চেষ্টা করেও সরমা আর তাকে বিয়েতে রাজি করাতে পারে[illegible]

[illegible] কথা [illegible] পর একটা বড় রকমের ফয়সালা হয়ে গেল যেন। [illegible]

[illegible] না কেউ। [illegible] সেই [illegible] দু'জনের মাঝে একটা [illegible] ভাবই পরিণাম [illegible]

[illegible] আমরা ভাবতে পারি [illegible] সমস্যা [illegible] একটা ইলেকট্রিক [illegible] আছে [illegible]

[illegible] নাম [illegible]

[illegible] এটুকুও [illegible] বলেছি [illegible] পারেননি [illegible] একটা [illegible] আড়াল করতে পারেন না [illegible] আপনাদের [illegible]

[illegible] করছে। [illegible] আপনাদের [illegible] আমরা [illegible] তাঁদের [illegible] সন্তান, [illegible]

[illegible]

কালাহীরা

আ[illegible] যামিনীবাবুর [illegible] একদিক ওদিক তাকালেন। আশপাশের [illegible] কিনা নিরীক্ষণ করে দেখলেন

উল্টে বেশি স্থির, নিস্পন্দ মনে হল সেগুলোকে।

তবু যোগানন্দবাবু যেন নিঃসংশয়ে অনুভব করলেন, পাহাড়ী জঙ্গলের এই নির্জনতার মধ্যে তিনি একা বিচরণ করছেন না। কাছাকাছির কোনো একটা ঝোপ বা কোনো একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে আজও কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছে। অনুসরণ করছে।

কাউকে দেখছেন না। তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি তাঁর। নিজের দুটো চোখের ওপর প্রগাঢ় আস্থা। দেখার যদি কিছু থাকে, প্রকৃতির হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে দেখতে পাবেন। দেখেও থাকেন। সহস্রলোচন ইন্দ্রের সহস্র-কোটি দেখার আর এক নাম সৃষ্টি। যোগানন্দবাবুও সেই গোছের স্রষ্টা। দু'চোখ ভরে দেখেন। গাছপালা ঝোপঝাড় নুড়ি-পাথর-কীট-পতঙ্গ পাখি সব-কিছুর মধ্যেই দেখার রসদ আর রহস্য মস্তিষ্কে চালান দেন। তারপব এক অপ্রকাশ্য সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন।

কিন্তু এখন তিনি কিছুই দেখছেন না। গাছপালা ঝোপঝাড় নুড়ি-পাথর কীট-পতঙ্গ পশু-পাখি—মোট কথা যা তিনি দেখতে আসেন, তাব কিছুই না। এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু দেখার জন্য উন্মুখ তিনি, ভিন্ন কিছু দেখার জন্য প্রস্তুত।

একটি মেয়ে। একটি মেয়েকে দেখার জন্য।

ভযলেশশূন্য যে মেয়ে ওই যে-কোনো একটা ঝোপেব মধ্যে নিশ্চল মিশে থাকতে পারে, ওই যে-কোনো একটা কালো পাথরের আধা-আড়ালে পাথরেব মূর্তিব মতোই যার অনড় আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে।

পর পর দু'দিন সে এখানে এসে হানা দিয়েছে। যোগানন্দবাবুব স্থিরবিশ্বাস, সে আজও এসেছে।

গত পরশু তাকে দেখেছিলেন ওদিকেব ওই ঝোপটাব মধ্যে। বিষম চমকেই উঠেছিলেন তিনি। বস্তুটা কি হঠাৎ ঠাওর কবে উঠতে পাবেন নি। অবশ্য বেশ দূব থেকে চোখে পড়েছিল, ঝোপের মধ্যে কালো মতো কি একটা উঁচিয়ে আছে। এই পাহাড়ী জঙ্গলে হিংস্র জানোয়াব আছে বলে শোনেন নি। গত এক মাসের মধ্যে চোখেও পড়ে নি কিছু।

একাগ্র বিস্ময়ে দেখলেন। ঝোপেব মধ্যে উঁচিযে আছে একখানা মাথা। নাকেব ওপর থেকে মাথাটাই দেখা যাচ্ছে শুধু। ঝাঁকড়া চুল। মুখেব বেশিব ভাগ ওই চুলেব আড়ালে। আড়াল নেবাব জন্যেই সম্ভবত চুলেব গোছা সামনেব দিকে ছড়িযে দেওয়া হয়েছে।

তবু দৃষ্টি সংবদ্ধ হতে যোগানন্দবাবু দেখলেন একখানি বমণীব মুখ। খুব ধীরে পকেটে হাত ঢুকিযে বাযনাকুলাবটা বার কবে চোখে লাগালেন। এবাবে বেশ ভালো করেই মুখখানা দেখতে পেলেন। আর চুলের ফাঁকে একজোড়া চোখ। ভয নয়, হিংসা নয়, শুধু বিস্ময়-ভরা নিষ্পলক একজোড়া চোখ।

বিমূঢ়ের মতো খানিক দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়েছিলেন। তক্ষুনি ঝোপটা নড়ে উঠেছিল। তারপর আর কিছু দেখা যায় নি।

যতদূর জানেন, পাহাড়ী গ্রামগুলো এখান থেকে তিন সাড়ে তিন মাইল দূরে।

হয়তো গাঁয়েরই মেয়ে, শুকনো কাঠের খোঁজে এ-পর্যন্ত এসে গেছল।

জঙ্গল ছাড়িয়ে ও-দিকের গাঁয়ের দিকে কোনোদিন পা বাড়ান নি যোগানন্দবাবু। শুনেছিলেন গাঁয়ের লোকেরা সুসভ্য নয় তেমন। এক গাঁয়ের সঙ্গে আর এক গাঁয়ের মারামারি কাটাকাঠি লেগেই আছে। জোয়ানেরা বেশির ভাগই নৃশংস।

তবু এক মাস ধরে যোগাননন্দবাবু প্রায় রোজই এখানে আসছেন। এই জঙ্গলটা তাঁকে টানে। এখানে দেখার মতো আর বিশ্লেষণ করার মতো অনেক রসদ মেলে। তাছাড়া তাঁর ভয়েরই বা কি আছে! বিনা লাভে বিনা লোভে মিছিমিছি কেউ এসে তাঁর ওপর হামলা করতে যাবে কেন?

...গতকাল আবার ওই রমণীব মুখখানা দেখেছেন ওদিকের বড় একটা পাথরের আড়ালে। গলা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা গেছে। পাথরের মূর্তির মতোই নিশ্চল, নিষ্পলক।

কাল আর সামনের দিকে পা বাড়ান নি যোগানন্দবাবু। এগোলে পালাবে বুঝে চুপচাপ দাঁড়িয়েই ছিলেন। ওর দিকে চেয়ে ঠোঁটের ডগায় একটু হাসি ফুটিয়েছিলেন। তারপর সাহসে ভর করে তাকে কাছে ডেকেছিলেন।

কিন্তু তেমনি নিশ্চল পাথর মেয়েটা। নিষ্পলক একজোড়া টানা টানা কালো চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে ছিল। বেশ খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে মুখখানা মিলিয়ে গেছে।

...প্রকৃতি-দ্রষ্টা যোগানন্দবাবুব কৌতূহল বাড়ছিল। আজ আবার এখানে পা দিয়েই একজনের অদৃশ্য অস্তিত্ব অনুভব করেছেন তিনি।

একটা অগোচরের অস্বস্তি ছাপিয়ে কৌতূহল বড় হয়ে উঠছিল। পায়ে-চলা পাথুরে রাস্তা খুঁজে খুঁজে নিচের দিকে নামতে লাগলেন তিনি। ওদিক থেকেই জলে পাথর ছোঁড়ার মতো একটা শব্দ এসেছিল কানে।

ঘোরাঘুরির পর রোজ নিচের ওই পাহাড়ী নদীর ধারেই বসেন তিনি। নদী বলা হাস্যকর। পাথরের হাড়গোড় বার করা ঝর্ণা-নামা একটা নালার মতো। আধ-হাতও জল নেই। তার মধ্যে অসংখ্য ছোট মাছ কিলবিল করে। দেখতে বেশ লাগে। পাথরের ঠোক্কর খাওয়া ঝর্ণা-স্রোতের আকুলি-বিকুলি দেখতেও ভালো লাগে।

এখানে এসে যে প্রশস্ত বিশাল পাথরটায় রোজ বসেন তিনি, সেখানে এসে পা দুটো স্থাণুর মতো মাটির সঙ্গে আটকে গেল। নালার ওপারে সেই মেয়ে দাঁড়িয়ে। এখানে বিশ গজও চওড়া নয় নালাটা—তারই ওধারে।

বিমূঢ় মুখে যোগানন্দবাবু দেখছেন তাকে। আজ অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে ওখানটায় দাঁড়িয়েছে মনে হল। পরনে কোমর থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত বাদামী রঙের ভেড়ার চামড়ার ঘাগরা। ওপরের দিকে শুধু বুকটুকু ঢাকা মোটা লাল কাপড়ের আচ্ছাদনে। তার শাসন থেকে বাঁধ-ভাঙা যৌবনের উপচে ওঠার তাগিদ। গলায় বড়-বড় পাঁচমিশেলি পুঁতির মালা। দু'খানা নিটোল বাহুতে পুঁথির তাগা, হাতে পুঁতির বালা।

আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় প্রকৃতি-বিজ্ঞানী যোগানন্দ চাটুজ্যে রমণীর এমন মূর্তি আর দেখেন নি।

তেমনি নিশ্চল, তেমনি নিষ্পলক, মেয়েটিও চেয়ে আছে তার দিকে। আজও ওই টানা গভীর দুটো কালো চোখে শুধু নির্বাক বিস্ময় ছাড়া আর কিছুর আঁচ পেলেন না তিনি।

ঠোঁটের হাসি আজ আরো একটু অমায়িক, আরো একটু বিস্তৃত করতে চেষ্টা করলেন যোগানন্দবাবু। তারপর গতকালের মতোই হাত তুলে আঙুলের ইশারায় ডাকলেন তাকে।

মেয়েটি তেমনি স্থির, নিস্পন্দ।

বার তিনেক অমনি ডাকার পর পাথরের মূর্তিতে প্রাণের সাড়া জাগল। সামান্য একটু নড়ে-চড়ে মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে নালার জলে পা ফেলল। জল ভেঙে পাথরে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসতে লাগল। দু'চোখ যোগানন্দবাবুর মুখের ওপর স্থির অনড়।

আটচল্লিশ বছরের যোগানন্দবাবু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শহরের সভ্য পরিচিত জনেরা প্রায় জিতেন্দ্রিয় গোছের পুরুষ ভাবেন তাঁকে। তিরিশ বছর বয়সে তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। একটিমাত্র ছেলে, বছর চৌদ্দ বয়েস। আজ পাচ বছর হল, সেই একটি মাত্র ছেলের কাছ থেকেও প্রায় বিচ্ছিন্ন তিনি। ন'বছর বয়েস থেকে ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে। কলেজের নামকরা মাস্টার ছিলেন তিনি। কলেজের আর য়ুনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের ওপর দু'খানা বই লিখেছেন। সে-বই এখন ভারতের প্রায় সমস্ত কলেজে আর য়ুনিভার্সিটিতে চালু। গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মিটতে আজ দু'বছর হল কলেজের চাকরিও ছেড়ে দিয়েছেন। পরিচিত শুভার্থীদের ভাষায় এখন তিনি সর্ব-রকমে মুক্ত-পুরুষ।

তবু অস্বস্তি। জল ভেঙে আর পাথর ভেঙে বিলম্বিত লয়ে একখানি প্রায় অনাবৃত যৌবন এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রায় অনাবৃত বটে, কিন্তু তবু যেন আশ্চর্য রকম শালীনতায় বাঁধা। পা ফেলে ফেলে আসার ছাঁদে দেহের বাঁধ ছাপিয়ে সে যৌবন উছলে উঠেছে, উপচে উঠেছে বটে, তবু সে যেন এক আশ্চর্য গম্ভীর অনুশাসনে বাঁধা।

এপারে এসে দাঁড়াল। সামনে, হাত পাঁচেকের মধ্যে। বড় পাথরটার ওধারে। পায়ের গোড়ালির একটু ওপর পর্যন্ত ভেজা। তার ওপর রোদ চিকচিক করছে। গায়ের তামাটে রঙ কালোর দিক ঘেঁষা। কাঁধ অবধি মাথার ঝাঁকড়া চুলেও লালের আভাস। ওই চুলের বোঝা আজ পিছন থেকে ফেরানো। টিকলো নাক, আয়ত গভীর দুটো কালো চোখের আলো যোগানন্দবাবুর মুখের ওপর ঠিকরে পড়ছে। তাঁর বাইরেটা দেখছে, ভেতরটা দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে।

যোগানন্দবাবুও নির্বাক খানিক। তারপরেই আত্মস্থ হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে একসঙ্গে অভিবাদন এবং অভ্যর্থনা জানালেন।

জবাবে মেয়েটার পরিপুষ্ট হাত দু'টি আস্তে আস্তে কোমরের ওপর উঠল। যেন এই গোটা এলাকাটা তার বশ। তেমনি চেয়ে আছে। পাতা পড়ছে না, দৃষ্টি নড়ছে না।

একাগ্রগম্ভীর চাউনিটা তবু অপ্রসন্ন বা ক্রুর মনে হল না যোগানন্দবাবুর। কালো চোখের গভীরে অচপল কৌতূহল স্থির হয়ে আছে। প্রাকৃতিক রহস্যের রসদ পেলে যেমন উৎসুক উন্মুখ হয়ে ওঠেন তিনি, এই মেয়েটার মধ্যেও সেই গোছের রহস্যের সন্ধান পেলেন যেন। সমস্ত মুখে খুশির অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি স্পষ্ট করে তুললেন আরো। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম তোমার? জিজ্ঞাসা করলেন, থাকো কোথায়?

একটিরও জবাব পেলেন না। স্থানীয় মানুষেরা বেশির ভাগই হিন্দীতে কথা বলে, তাই বাক্যালাপ হিন্দীতেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু এক বর্ণও বুঝেছে কিনা বোঝা গেল না। তেমনি চেয়ে আছে, দেখছে।

এবারে সহজ ইংরেজিতে ওই প্রশ্নগুলিরই পুনরাবৃত্তি করলেন আবার। শেষে বাংলাতেও চেষ্টা করে দেখলেন।

নির্বাক, নিরুত্তর সামনে যেন একখানা পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে। কোনো অঙ্গ এতটুকু নড়ল না, একটিবারও চোখের পলক পড়ল না।

যোগানন্দবাবু মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন যেন। অগত্যা হাতের ইশারায় প্রশস্ত পাথরটা দেখিয়ে বসতে বললেন তাকে।

দাঁড়িয়েই রইল। কালো তাজা সজীব দেহের এই গোছের নিশ্চলতাও এক দেখার বস্তু। কি করবেন ভেবে না পেয়ে যোগানন্দবাবু নিজেই বড় পাথরটায় বসে পড়লেন, তারপর কাঁধের ঝোলা নামিয়ে তার ভেতর থেকে খাবারের কৌটো বার করলেন। সেটা খুলে তার সামনে ধরলেন। গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবেন।

কিন্তু এবারেও মেয়েটা কৃতার্থ করল না। এমন কি কৌটোর লোভনীয় কি আছে একবার চেয়েও দেখল না। কোনো অঙ্গ নড়ল না। চোখের পাতা পড়ল না।

সর্ব চেষ্টা বিসর্জন দিয়ে হতাশ মুখে হাল ছেড়ে যোগানন্দবাবু এবারে শুধু চেয়ে রইলেন তার দিকে।

এইটুকুই ফলপ্রসূ হল। মনে মনে খুশির শিহরণ অনুভব করলেন যোগানন্দবাবু। পাথর মূর্তিতে যেন সামান্য একটু করুণা সঞ্চার করতে পেরেছেন তিনি। মেয়েটার ঠোঁটের ডগায় অতি সূক্ষ্ম হাসির ফাটল ধরেছে মনে হল। চোখের নিবিড়-কালো গভীরেও। তার দুরবস্থা উপলব্ধি করেই এই ব্যতিক্রম।

মুখখানা আরো বেজার করে যোগানন্দবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে।

—তুম কওন?

পরিষ্কার হিন্দীতে প্রশ্ন। নিটোল মিষ্টি গলার স্বর। হিন্দী মোটামুটি ভালোই জানেন যোগানন্দবাবু। তবু জবাব দেবার আগে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ প্রায় কেউ না গোছের একজন। তারপর বললেন, পরদেশী।

পরদেশীর সমস্ত মুখখানা আয়ত-পক্ষ্ম দুটো কালো চোখের দখলে।—ইধর রোজ কিউ আতে?

যোগানন্দ জবাব দিলেন, দেখার জন্যে।

—কেয়া দেখনেকে লিয়ে?

বোঝাবার জন্যে ব্যস্ত মুখে যোগানন্দবাবু চারপাশের গাছপালা নুড়ি-পাথরের দিকে তাকালেন একবার। তারপর জবাব দিলেন, এখানকার সব কিছু।

বোধগম্য হল না। ইন্ সব্‌মে কেয়া দেখনে কা হ্যায় ?

এই মেয়ে যেন সাম্রাজ্ঞী এখানকার। বিনা অনুমতিতে তার এলাকায় পরদেশীর পদার্পণ ঘটেছে। এখন মানুষটা করুণা লাভের পাত্র কিনা সেটা যেন তার বিশ্বাসযোগ্য সদুত্তরের ওপর নির্ভর করছে।

কি বলবেন বা কি বোঝাবেন ভেবে না পেয়ে যোগানন্দবাবু তাড়াতাড়ি তার ঝোলায় হাত ঢোকালেন। দামী বায়নাকুলারটা বার করে একবার নিজের চোখে লাগিয়ে জিনিসটার তাৎপর্য দেখালেন, তারপর সেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

হাত বাড়িয়ে মেয়েটা বায়নাকুলার নিল। চোখে লাগাল। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখল।

যোগানন্দবাবু তাকেই দেখছেন। উৎসুক প্রতীক্ষা।

বায়নাকুলার নামাল। একটা তাজ্জব বস্তুই হাতে পেয়েছে বটে। কিন্তু তবু পরদেশীর মতি-গতি সম্পর্কে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া গেল না যেন। বিস্ময়-মেশানো কালো চোখ আবার তাঁর মুখের ওপর চড়াও হল।—ছোটেকো বড়া দেখনেমে কেয়া ফায়দা ?

এবারে দ্বিতীয় দফা হাল ছাড়লেন যোগানন্দবাবু। জবাব দিলেন, এই দেখে বেড়ানোটাই তাঁর শখ। সেরফ 'হওশ্'।

গম্ভীর মুখে কৌতুকের রেখা পড়তে লাগল এতক্ষণে। সে-কৌতুক চোখের দিকেও ছড়াল। লোকটা পাগল কিনা তাই দেখছে যেন। তারপর বিনা আমন্ত্রণে অনায়াসে এবারে পাথরটার ওপরে বসে পড়ল। মাঝে আধ-হাতটাক ফারাক। বসে বায়নাকুলারটা আবার চোখে লাগাল। ফিরে ফিরে চারদিক দেখতে লাগল।

ফলে দুই বাহু ঊর্ধ্বে স্থির। আঁট বক্ষবাস বিদীর্ণ করে একখানি তাজা যৌবন তাঁর চোখে এসে আঘাত করল। প্রৌঢ় শিক্ষিত মার্জিতরুচি যোগানন্দ চাটুজ্যে অস্বস্তি বোধ করলেন, দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারা গেল না। মন্ত্রমুগ্ধ যেন তিনি। এ-যাবৎ প্রকৃতির অনেক শোভা দেখেছেন। এই শোভার বুঝি তুলনা নেই।

বায়নাকুলার নামাল। কিন্তু সেটা তাকে ফিরিয়ে দিল না মেয়েটা। ওটা সুদ্ধ হাতখানা নিজের কোলের ওপর রাখল। প্রসন্ন মুখ। তার চোখে চোখ রেখে হাসল একটু। ঝকঝকে দাঁতের আভাস চিকিয়ে উঠল একবার। তারপর বলল, বুঝছি, আসলে তুমি একজন নিষ্কর্মা মুসাফির।

যোগানন্দবাবু কৃতার্থ হয়ে মাথা ঝাঁকালেন, তাই। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি ?

—কালাহীরা।

নাম শোনার পর আরো বিস্ময়াবিষ্টের মতো চেয়ে আছেন যোগানন্দবাবু। এই নামেই মানায় বটে।

এই মুখ দেখে হোক বা যে কারণেই হোক মেয়েটার কালো চোখে খুশির আমেজ জমাট বাঁধছে।—কি দেখছ?

যোগানন্দবাবু অস্ফুট একটু শব্দ করে হেসে উঠল। দাঁতগুলো আরো একটু বেশি ঝকমকিয়ে উঠল। বলল, এ-রকম দেখলে আমার লোকেরা তোমার ওই চোখদুটো খুবলে বার করে নেবে।

স্বচ্ছ নিটোল গলার স্বরও কানের পর্দা দিয়ে ভিতরে ছড়াবার মতো। পরিষ্কার হিন্দী বলছে বটে, তবু ঠিক এই মাটির মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। জবাব দিলেন, তাতে আর এমন কি ক্ষতি হবে, তিন দিন আগে তোমাকে দেখার পর থেকেই তো আমার এ চোখদুটো গেছে।

উৎসুক দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর নতুন করে থমকালো একপ্রস্থ। বুঝতে চেষ্টা করল। বুঝল। কালো চোখে সরল সহজ খুশির আলো ঠিকরলো। কথার সুরেও। বলল, তুমি তো আমাকে মাত্র তিন দিন দেখলে, আমি তোমাকে প্রায় একমাস ধরে দেখছি—সেদিন ধরা পড়ে গেলাম। হেসে উঠল। অবশ্য ধরা পড়ার জন্যেই সেদিন ঝোপটা নাড়া দিয়েছিলাম।

যোগানন্দবাবু অবাক, একমাস ধরে তুমি এখানে আসছ?

হেসে মাথা ঝাঁকালো। বলল, তার আগেও প্রায় রোজ দুপুরে আমি এখানে আসতুম। এ জায়াগাটা আমার খুব ভালো লাগে। তাই প্রথম প্রথম তোমাকে এখানে দেখে আমার রাগ হত। আমার লোকেদের কাছে তোমার কথা বলেছি। সব শুনে-টুনে তারা বলল, কে জানে কেমন লোক, তার থেকে একদিন গিয়ে খতম করে দিয়ে আসি। আমি বারণ করলাম—

যোগানন্দবাবু হতভম্ব। এমন সহজে বলল যেন খতম করে দেওয়াটা ডাল-ভাত গেলার সামিল। জিজ্ঞাসা করলেন, বারণ করলে কেন?

—বাঃ, বারণ করব না! তোমাকে তো আমি একটা পাগল ভাবলাম।...ঘুরে ঘুরে গাছ দেখ, লতা-পাতা দেখ, শেকড়-বাকড় দেখ, পাথর কুড়িয়ে-কুড়িয়ে দেখ, আর চোখে এই কালো যন্ত্রটা লাগিয়ে কি সব দেখ—শুনে ওরাও খুব হাসল, বলল, পরদেশী তব পরমেশ্বরকী ইন অনোখীদেন কী তারিফ করতা ফিরতা হ্যায়। (পরদেশী তাহলে পরমেশ্বরের এই সব অদ্ভুত সৃষ্টির তারিফ করে বেড়ায়।)

কৌতূহল গোপন করে যোগানন্দবাবু মাথা নেড়ে সায় দিলেন।— ওরা ঠিকই বলেছে। জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কোথায় থাকে?

বাহু প্রসারিত করে জঙ্গলের ওধারে একটা দূরের দিক দেখিয়ে দিল।

—তুমি কোথায় থাক?

—ওদের সঙ্গেই।

—ওরা কেমন লোক?

—খুব ভালো লোক।

—ওরা কি করে?

—দিনের বেলা জমি চাষ করে আর রাতে দল বেঁধে ডাকাতি করতে বেরোয়।

ভিতবে ভিতবে বড়-বকমব একটা হোঁচট খেযে উঠলেন যোগানন্দবাবু। বলেই ফেললেন, ডাকাতি কবে তবু ভালো লোক?

—হ্যাঁ, আমাকে খুব ভালোবাসে, ভক্তি কবে।

—তোমাব কথা শোনে?

—হবওযক্ত। শুনবে না? আমি ওদেব কালাহীবা কালীমাযী।

যোগানন্দবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, তাহলে সে ওদেব নিষেধ কবে না কেন। বললেন না। বিশ্বাসে ফাটল ধবাব সম্ভাবনা তাতে।

বাযনাকুলাবটা আব এক দফা চোখে লাগিযে চাবদিক দেখল কালাহীবা। তাবপব সে হাতে কবেই উঠে দাড়াল। তাব কালো চোখে সদয প্রীতি। বলল, কাল আবাব দেখা হবে।

লঘু পাযে জঙ্গলেব মধ্যে মিলিযে যেতে লাগল। সাম্রাজ্ঞীব মতোই চলাব ঠমক। ডাকি-ডাকি কবেও ডাকতে পাবলেন না যোগানন্দবাবু। বাযনাকুলাবটা নিযেই চলে যাচ্ছে। যেন ওবই সামগ্রী ওটা। দামী লেন্স, দামী জিনিস।

পবদিন। নিজেব অগোচবেই উন্মুখ প্রতীক্ষায বসে ছিলেন যোগানন্দবাবু।

এল। হাতে বাযনাকুলাব। মুখখানা হাসি-হাসি। মাথায আজ কৃষ্ণচূড়া গুজেছে। গা ঘেষে পাথবটায বসে পড়ল। মাঝেব ফাবাক কালকেব থেকেও কম। অন্তবঙ্গ সহজতায সভ্যতাব চিহ্নিত দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা সঙ্কোচেব লেশমাত্র নেই। চোখে-মুখে খুশি ঝবছে। হাতেব বাযনাকুলাব দেখিযে বলল, তোমাব এই মজাব জিনিসটা দেখে ওবা সব তাজ্জব বনে গেছে। জিজ্ঞেস কবেছে, পবদেশীব কাছে আব কি জাদুব জিনিস আছে? তুমি কত ভালো লোক ওদেব বলেছি। আব কিচ্ছু ভয নেই তোমাব।

অর্থাৎ বন্ধুত্ব পাকা তাদেব। যোগানন্দবাবুব মুখে কৃতজ্ঞতাব হাসিটুকু কৃত্রিম নয খুব। খুশি তিনিও বটে। মেযেটা বেশ কথা বলতে পাবে। কান পেতে শোনাব মতোই মিষ্টি কথা। যোগানন্দবাবু আজও খাবাবেব বাক্স বাব কবলেন। আজ আব খেতে আপত্তি কবল না। আব ভদ্রলোকদেব খাবাবেব তাবিফও কবল।

সেই ফাকে আবো অনেক কথা জেনে নিলেন তিনি। ঠিকই ধবেছিলেন, কালাহীবা এখানকাব মাটিব মেযে নয। এটা তাব আসল দেশ নয। খুব বাচ্চা বেলায এখানকাব বুড়ো সর্দাব তাকে অনেক দূবেব কোনো এক জাযগা থেকে ধবে এনেছিল। সে-জাযগাব নাম মনে নেই, কিছুই প্রায মনে নেই। শুধু মনে আছে, সেখানকাব চাবদিকে যতদূব চোখ যায শুধু জল ছিল। জল ছাড়া আব কিছু ছিল না। ওই সর্দাবই তাকে কালাহীবা বলে ডাকত, এখন সব্বাই তাই ডাকে। ওকে আনাব পব থেকে সর্দাবেব আয-পয খুব বেড়ে গেছল, তাই সে তাকে ভাবী ভালোবাসত, আদব কবত,—কেউ ওব সঙ্গে লাগতে এলে তাব আব বক্ষে থাকত না। সর্দাব তাকে আধ-মবা কবে ছাড়ত। তিন বছব হল বুড়ো সর্দাব মাবা গেছে। মাবা যাবাব আগে গোটা দলটাকে ডেকে বলে গেছে, কালাহীবা তোদেব কালীমাযী, ওকে মান্য কববি, ওব কোপ লাগলে তোদেব সর্বনাশ হবে। আগেও মান্য কবত, সেই থেকে আবো বেশি মান্য কবে, বেশি

ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। হেসে বলল, আমাকে নিয়ে ওরা কি কবে একদিন তোমাকে দেখাব'খন।

এই গল্পের শেষের দিকে কেমন যেন একটা তন্ময়তা নেমে এল কালো-ঘেঁষা বাদামী মুখে। খানিকক্ষণের জন্য দু'চোখ গাছপালা ছাড়িয়ে দূরের শূন্য নীলিমার দিকে আটকে রইল। তারপর বলল, ওরা আমাকে এত ভালোবাসে, আমিও ওদের এত ভালোবাসি, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে, এখানকার সব কিছু ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাই—অনেক দূবে।

একটু বাদেই আত্মস্থ হল। হাসি-হাসি বিড়ম্বিত মুখ। ওর যেন এই গোছের দুর্বলতা সাজে না। উঠল। জঙ্গলের ফাঁক ধবে ফিবে চলল। বাযনাকুলাবটা আজও তার হাতে। যোগানন্দবাবু সেটা ফেরত চাইতে পারলেন না। চেয়ে আছেন। চলাব অলস মন্তব সবল ভঙ্গিটুকুও যেন দু'চোখ ভবে দেখাব মতো।

এই নির্জনে মধ্যাহ্ন-যাপনের একটা নতুন স্বাদ পেলেন প্রৌঢ় যোগানন্দ চাটুজ্যে। তাঁর অনেক সঞ্চযেব মধ্যে এও যেন ভারি লোভনীয় সঞ্চয় কিছু। এক-একদিন এসে দেখেন মেয়েটা আগে এসে ওই পাথবটায় বসে আছে। তাঁকে দেখে ভ্রূকুটি কবে, দেবি কেন?

যোগানন্দবাবু তক্ষুনি স্বীকাব কবেন, অন্যায় হযেছে। আর তক্ষুনি ভ্রূকুটি গিযে তামাটে কালো মুখে হাসি ঝবে। সেই হাসি ওই নিটোল দেহেব আনাচে-কানাচে ছড়ায়। যোগানন্দাবাবু চেয়ে চেয়ে দেখেন। দামী বায়নাকুলাবটা এখনো ওই মেয়ের দখলেই আছে। রোজ নিয়ে যায়, রোজ নিয়ে আসে। এখন আর ওটাকে খুব দামী মনে হয় না যোগানন্দবাবুর, চাইবাব কথা মনেও হয় না।

গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উৎসুক আগ্রহে তাঁর কথাও শুনতে চায় মেয়েটা। বউ মরে গেছে শুনে মুখখানা বেজার কবেছে। যোগানন্দবাবুর মজবুত দেহে আটচল্লিশের দাগ পড়ে নি বটে, তবু মেয়েটা যেন প্রায় সমবয়সীই ভাবে তাঁকে। তাই বউ নেই শুনে বিমর্ষ। আবার একটা ছেলে আছে শুনে তেমনি খুশি। বলেছিল, তুমি বড় দুষ্টু, একা ঘুরে বেড়াও—তাকে নিয়ে এলে না কেন? এরপর ফের যখন বাড়ি ছেড়ে আসবে, তাকে নিয়ে আসবে, আমি তাকে খুব আদর করব।

শুনে যোগানন্দবাবু হেসেছিলেন শুধু। মাথাও নেড়েছিলেন, আনবেন। ছেলে সঙ্গে থাকলে এই নির্জনে এ-বকম অন্তবঙ্গ অবকাশযাপন যে সম্ভব নয়—এ-কথা বললেন না। নিষ্পাপ সরল মেয়েটাব মনে সভ্য দুনিয়ার জটিল বিষ ঢুকিয়ে লাভ কি।

বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কি দেখেন তিনি সে-ব্যাপারেও গভীর আগ্রহ মেয়েটার। আর এই নিরক্ষরা মেয়েকে তা বোঝাবার ব্যাপারেও কম আগ্রহ নয় যোগানন্দবাবুর। কোন চারা থেকে কিভাবে শেকড় গজায়, কতদিনে কেমন করে বাড়ে, কেমন করে বাঁচে, কোন কুঁড়ি কিভাবে স্তরে স্তরে ফুলে-ফলে বিকশিত হয়—কাগজে এঁকে-এঁকে দেখান তিনি। কাগজে সেই ফুল-ফল দেখে মেয়েটা অবাক হয়। ওদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা

আছে শুনে তাজ্জব বনে যায়। মনোযোগী ছাত্রীকে বোঝাবার মতো করেই আরো অনেক গল্প করেন তিনি। প্রকৃতি কখন কি জন্যে তার ঝাঁপি বন্ধ করে দেয়, কোন পাখি দল বেঁধে কখন প্রবাস-যাত্রা করে, কখন ফেরে, প্রাকৃতিক গঠন অনুযায়ী কোন পশুর কি কি আচরণ, নদীর ধারের সব নুড়িপাথরেই গোল ছাঁদ কেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কালাহীরা হাঁ করে শোনে, আর অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তাঁর দিকে। ওর কাছে এই মানুষটাই যেন এক দর্শনীয় সামগ্রী।

সেদিন ঢাল ধরে বসার পাথরটার দিকে এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। অবাক কাণ্ড। সেখানে মেয়েটা একলা নয়, তার সঙ্গে আরো জনা-চারেক জোয়ান লোক। পাথরটার চারদিকে চারটে খুঁটি পুতে তার ওপর শুকনো খেজুরপাতার ছাউনি রচনায় মগ্ন তারা। প্রায় শেষ করে এনেছে।

যোগানন্দবাবু এগিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে কালাহীরা মিটিমিটি হাসতে লাগল। অবাক করে দিতে পেরেছে সেই তুষ্টি। অন্য লোক চারটেও দেখল তাঁকে। তারা ভাবলেশশূন্য, নির্বিকার।

যোগানন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

কালাহীরা জবাব দিল, বেলা চড়লেই এখানে রোদ আসে আর রোজ তোমার মুখ তেতে ওঠে...তাই ছাউনি লাগিয়ে দিতে বললাম ওদের। ভালো হয় নি?

হেসে ফেলে যোগানন্দবাবু মাথা নাড়লেন।

ছাউনি লাগানো শেষ হতে হাতের ইশারায় কালাহীরা তাদের চলে যেতে বলল। একান্ত বাধ্যের মতোই নীরবে জঙ্গলে মিশে গেল তারা। ঝোলা নামিয়ে যোগানন্দবাবু পাথরটায় বসলেন।

খুশিমুখে কালাহীরাও বসল। রোজ যেমন নিঃসঙ্কোচে গা ঘেঁষে বসে, তেমনি। তারপর ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা তাঁর বুক ঘেঁষে কাঁধের ওপর রেখে আধ-শোয়ার মতো করে পাথরের ওপর শিথিল অঙ্গ ছড়িয়ে দিল। শেষে বায়নাকুলারটা চোখে লাগিয়ে প্রকৃতি-দর্শনে মন দিল।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন যোগানন্দবাবু। আগেও দুই-একদিন নিঃসঙ্কোচে এই কাণ্ড করেছে। তবু আজকের অস্বস্তিটা আরো বেশি। অথচ ওকে সচেতন করার চেষ্টাটা আরো বিসদৃশ যেন।

চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে জলের ওধারে বাদামগাছের মস্ত খোড়লটা দেখছে কালাহীরা। বাইরে থেকে উড়ে এসে লম্বা ঠোঁটঅলা একটা ছোট পাখি ওটার মধ্যে ঢুকে গেল। ভিতরে আরো একটা পাখি আছে। ক'দিন ধরে ওই দুটো পাখিই ব্যস্ত-সমস্ত। কতবার করে যাচ্ছে আসছে ঠিক নেই। গতকাল এই নিয়ে কালাহীরার সঙ্গে কথা হয়েছিল। যোগানন্দবাবু বলেছিলেন ওই খোড়লের মধ্যে ওদের বাচ্চা হয়েছে, তাই এত ব্যস্ত ওরা। শুনে কালাহীরার ভারী মজা লেগেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি জানলে কি করে? আর কতবার যে বায়নাকুলার লাগিয়ে উৎসুক দৃষ্টিটা ওদিকে ফেলেছে ঠিক নেই।

একটু বাদে যে-পাখিটা ভিতরে ঢুকেছিল সেটা আবার বেরিয়ে গেল। যোগানন্দবাবু

জানেন ওটা পুরুষ-পাখি। পরক্ষণে কি দেখে কালাহীরা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল বায়নাকুলার নামিয়ে তাড়াতাড়ি। একটা বনবেড়াল ওই খোড়লটার মুখে এসে থমকালো। গলা বাড়িয়ে ভেতরটা একবার দেখল। তাব অভিসন্ধি সুস্পষ্ট।

পাথর ছুঁড়ে ওটাকে তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল কালাহীরা। তার আগেই যোগানন্দবাবু তার হাতটা ধরে ফেললেন। বললেন, দেখো না কি হয়।

কালাহীরা সন্ত্রাসে বলে উঠল, বাচ্চাগুলোকে খেয়ে ফেলবে যে!

—খাবে না, ভিতরে মা-পাখিটা আছে, উল্টে জব্দ হবে, দেখো না—

সশঙ্ক প্রতীক্ষা। খুব নিঃশব্দে বেড়ালটা খোড়লেব মধ্যে প্রায় আধা-আধি ঢুকেছে। তারপরেই মেয়াঁও-মেয়াঁও আর্তনাদ করে ছিটকে বেরিয়ে এল। কি একটা যাতনা সামলাতে না পেরে গাছ থেকে মাটিতে ঝাপিয়ে পড়ে তেমনি আর্তনাদ করতে করতে জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

কালাহীবা বিমূঢ়।—কি হল?

যোগানন্দবাবু হেসে জবাব দিলেন, ভিতরের মা-পাখিটা ওর চোখে ঠোঁট বিঁধিয়ে দিয়েছে।

এবারে তাঁর মুখখানাই যেন মেযেটার কাছে দর্শনীয় বস্তু। আবো কাছে মুখোমুখি ঘন হয়ে বসে নিবিড়-কালো দু'চোখ তাঁর চোখেব ওপর রাখল, তুমি এত জান কি কবে?

যোগানন্দবাবুর অস্বস্তি বাড়ছে আরো। ঝাঁকড়া চুলের দুই-এক গোছা উড়ে তাঁর মুখে এসে লাগছে। তপ্ত নিঃশ্বাসও। এত কাছের ওই চাউনির মধ্যেও যেন এক-ধরনের স্পর্শ আছে। তবু হেসেই জবাব দিলেন, ভগবান একেবারে দুর্বলেরও আত্মরক্ষার কিছু না কিছু উপায় রেখে দেন, বুঝলে?

কি বুঝল সে-ই জানে। আরো কয়েক নিমেষ তেমনই চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে খপ করে তাঁর নাক ধরে মাথাটা সামনে টেনে এনে নিজের কপালের সঙ্গে বেশ জোরেই একটা ঠোক্কর বসিয়ে দিল। তারপর আরো একটু জোরে হেসে বলল, তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ।

অমাবস্যার রাত। জঙ্গলের পাশ ঘেঁষে এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে দূরের একটা গাঁয়ের উদ্দেশে চলেছেন যোগানন্দবাবু। চারদিক অন্ধকার। মাঝে মাঝে হাতের টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছেন।

না গিয়ে উপায় নেই। কালাহীরা আজ ওদের গাঁয়ে আসার জন্য বার বার করে বলে দিয়েছে। বলেছে, আজ এলে ভারী একটা মজার জিনিস দেখতে পাবে। মজার জিনিসটা কি, তাঁর কোনো ধারণা নেই। কথা দিয়েছেন যাবেন, চলেছেন।...শুধু আমন্ত্রণ রক্ষার দায়ে নয়, ভিতরের অদৃশ্য তাগিদটুকুও অনস্বীকার্য।

পৌঁছলেন। দূর থেকে মনে হল কিছু একটা উৎসব চলেছে। দূরের একটা চত্বরে অনেকগুলো লোক জমা হয়েছে। তাদের হাতে হাতে বহু মশাল জ্বলছে। ওদের সামনে

পাতাব ছাউনি দেওয়া আঙিনা একটা। সেখানে কি হচ্ছে দূব থেকে ঠাওব কবা গেল না।

পবদেশী অতিথিব পদার্পণ ঘটবে সেটা অনেকেই জানত বোধহয। দু'জন আধবযসী লোক গম্ভীব মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানাল, তাবপব সঙ্গে কবে ওই চত্বরেব দিকে নিযে চলল।

এবাবে মশাল হাতে লোকগুলোব কলবব থেমে গেল। ফিবে ফিবে দেখতে লাগল তাকে। তাবপব গম্ভীব মুখেই আঙিনাব দিকে এগিযে যাবাব পথ কবে দিতে লাগল। একখানা মুখও খুব সদয বলে মনে হল না যোগানন্দবাবুব। অনুবোধে ঢেকি গেলাব মুখ। এ-ক্ষেত্রে সম্ভবত এক বমণীব নির্দেশে।

ছাউনি-ঘেবা আঙিনাব সামনে এসে থমকে দাড়ালেন যোগানন্দবাবু। যে দৃশ্য দেখলেন, স্থান কাল ভুলে যাবাব দাখিল। এমন দৃশ্য কল্পনাব বাইবে। ওই আঙিনাব মাঝখানে দাঁডিযে এক কালী মূর্তি। সজীব কালী। কালাহীবা। কিন্তু সজীব যে বোঝাব উপায নেই। পাথবেব মূর্তিই যেন একখানা। তাব বক্ত-বাঙা বামচবণ সাদা-বঙেব মহাদেব আকা মোটা একটা কলাগাছেব গুডিব ওপব। গাঢ লালে ছোপানো আধখানা জিভ বেবিযে আছে। কটিতে স্বল্পতম আচ্ছাদন একটু। উর্ধ্ব অঙ্গ সম্পূর্ণ নগ্ন। গলায পাথবে আকা নৃ-মুণ্ডমালা। সেগুলো থেকে লাল বঙ অর্থাৎ বক্ত চুযে পডছে যেন। বাম-কবে উঁচিযে আছে বক্তাক্ত অসি। লালে বাঙানো ডান-কবে ববাভয আশ্বাস। চোখেব কালোব ওপব লালেব বেখা।

বিমূঢ বিস্মযে চেযে আছেন যোগানন্দবাবু। কালাহীবাব কোনো অঙ্গ এতটুকু নডছে না, কাঁপছে না, একটিবাব চোখেব পলক পডছে না। সৃষ্টিনাশিনী আব ববাভযদাযিনী পাষাণী মহাকালী মূর্তি যেন। স্থিব নিস্পন্দ।

যোগানন্দবাবু আজ বুঝতে পাবলেন আগে দুটো দিন ওই মেযে অমন নিশ্চল নিষ্পলক পাথবেব মূর্তিব মতো দাডিযে থাকত কি কবে। এই গোছেব বিশেষ অভ্যেস ছাড়া ও-বকমটা সম্ভব নয।

হঠাৎ কালী-মাযীর উদ্দেশে বহু গলাব সমবেত জযধ্বনি উঠল। তাবপব মুহুর্মুহু সেই জযধ্বনি চলতে লাগল। লোকগুলো মাটিতে লুটিযে পডে প্রণাম কবতে লাগল। কেউ কেউ দেবীব কৃপাব আশায মাটিতে মাথাও ঠুকতে লাগল।

সামনেব ওই মূর্তিব দিকে দৃষ্টি ফেবালেন আবাব। সঙ্গে সঙ্গে ভিতবটা সিবসিব কবে উঠল কেমন। কোনো পবিবর্তন হয নি শুধু ওই বিচিত্র-রূপিণীব দু'চোখ এবাবে তাঁব মুখেব ওপব প্রসাবিত। তেমনি স্থিব, তেমনি অপলক। পাথব-প্রতিমাব জীবন্ত দু'টো চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকবোচ্ছে।

দৃশ্যটা ভোলবাব নয। সমস্ত বাত ঘুমোতে পাবেন নি যোগানন্দবাবু। ওই দৃশ্যটাই শুধু মাথাব মধ্যে ঠেসে আছে, আনাগোনা কবছে। কিন্তু আশ্চর্য, ওই বিচিত্র দৃশ্যেব মধ্যে অনাবৃত-বক্ষ প্রায-নগ্ন বিচিত্ররূপিণীব পবিপূর্ণ যৌবনেব কিছুমাত্র ভূমিকা নেই। অশিক্ষিত মানুষগুলোব চোখে তো নযই, শিক্ষিত মার্জিতরুচি যোগানন্দবাবুব

দৃষ্টিতেও সেই নগ্নতার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা তাঁর।

না, সেই অনুষ্ঠানের পর গতরাতে আর কালাহীরার সঙ্গে দেখা হয় নি। লোকগুলোর আত্মহারা ভক্তি-নিবেদনের পর চোখের সামনে আস্তে আস্তে একটা কালো চটের পর্দা নেমে এসেছে। অতিথির সম্মান এবং দূরত্ব বজায় রেখে কয়েকজন লোক গম্ভীর মুখে তাঁকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়েছে। ওদের কাছ থেকেই যোগানন্দ শুনেছেন, কালো পর্দা নেমে আসার একটু পরেই কালাহীরা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, মূর্ছা যাবে। গোটা রাতটাই আচ্ছন্নের ঘোরে কাটবে তার। সকালের আগে তার তবিয়ৎ ঠিক হবে না।

পরদিন। দুপুরের নির্জনে যোগানন্দবাবু নতুন ছাউনির তলায় সেই পাথরটার ওপর বসে আছে। একলা, তাই আরো বেশি নির্জন ঠেকছে। কালাহীরা আজ আর নাও আসতে পারে। অথচ মন বলছে আসবে।

এল। প্রতিদিনের মতোই বেশবাস। দূর থেকে তাঁকে দেখে হাসছে মিটিমিটি। অন্যদিনের থেকেও মন্থর ছাঁদে পা ফেলে ফেলে আসছে। শরীরটা দুলছে একটু একটু। সে যেন জানে এই দুনিয়াব অনেকখানি তাব বশ।

পাথরটার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে বায়নাকুলার। সেটা সুদ্ধ কোমরে দু'হাত তুলে দিল। সামনের মুখখানা পর্যবেক্ষণের বস্তু যেন। ঠোঁটে হাসি. চোখে ছদ্ম ভ্রূভঙ্গি।— কি দেখছ?

—কালাহীরা।

খিলখিল শব্দে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে পাথরে বসল, তারপর কোলের ওপর মাথা রেখে সটান শুয়েই পড়ল আজ। হাসি মুখেব ওপব ছদ্ম-কোপের প্রলেপ ছড়াল।

—বিপদে পড়ার ইচ্ছে বুঝি?

—কেন?

এই সামান্য প্রশ্নে মেয়েটার মুখের ভাব বদলাতে লাগল কেমন। ঠোঁটেব হাসি মুখের উচ্ছলতা দুই মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। বিমনা খানিকক্ষণ, চোখের দৃষ্টিও তার মুখ ছেড়ে দূরের দিকে নিবিষ্ট। বলল, একজন বিপদে পড়েছিল।

সেই বিপদের কথা স্মরণ করেই সম্ভবত ওর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল একবার। তারপর আস্তে আস্তে অল্প কথায় একজনের বিপদের যে সমাচার শোনাল, যোগানন্দবাবুও স্তব্ধ খানিকক্ষণ। বছর পাঁচেক আগের ঘটনা। সেই একজন ওদের গাঁয়ের ছেলে। তখন যে সর্দার ছিল তার ছেলে।...ছেলেটার সাহস ছিল খুব। সর্দারের ছেলে বলে আরো বেশী সাহস।...সেই ছেলে কালাহীরা দেখত, কালীমায়ী দেখত না। দেখতে চাইত না। তাই ওর সম্পর্কে অনেকের মনে একটু করে সন্দেহ জমা হচ্ছিল।

...প্রতি অমাবস্যায় ওই লোকেরা ওকে কালী বানিয়ে পূজো করে। আর দল বেঁধে বড়-রকমের ডাকাতি-টাকাতি করতে বেরুনোর আগেও ওই-রকম কালীমায়ীর

পুজো করে থাকে। সেবারে তাই করেছিল। পুজো শেষ করে জোয়ানেরা সব দল বেঁধে গাঁ ছেড়ে গেছল।

ওই চত্বরে অন্ধকারে ভূমিশয্যায় লুটিয়ে পড়ে ছিল কালীমায়ী কালাহীরা। যেমন পড়ে থাকে। চোখে ঘুম নেমে আসছিল। হঠাৎ বিষম চমকে উঠেছিল। তারপর আর্তনাদ করে উঠেছিল। একটা পশু তাকে গ্রাস করছে। ওর অনাবৃত দেহের হাড়-গোড় গুঁড়িয়ে গ্রাসের আওতায় টেনে নিয়ে আসছে। অন্ধকারের ওই পশুটা কে কে হতে পারে, কালাহীরা জানত।

সর্দারের ছেলে। তার মতি-গতি লক্ষ্য করেই হয়তো জোয়ানদের কেউ কেউ থেকে গেছল। আধ ধুড়োবা তো ছিলই। আর্তনাদ শুনে মশাল হাতে ছুটে এল তারা। নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের ওপর থেকে ওকে টেনে তুললো। মেরে সেখানেই আধ-মরা করল ওকে, সমস্ত গায়ে মশালের ছেকা লাগিয়ে দিল।

কিন্তু অপরাধের তুলনায় এ শাস্তি কিছুই নয়। এতবড় অনাচার গাঁয়ে আর ঘটে নি কখনো। পাপ-স্পর্শে কালীমায়ী কালাহীরার অঙ্গ বিষোতে চেয়েছে। ছেলের দোষে পরদিনই সর্দারের সর্দারী গেল। নতুন সর্দার ঠিক করা হল। তারপর বিচার বসল।

বিচারে ফল কি হবে সকলেই জানে। পাপীকে মরতে হবে। কি ভাবে কতটা নির্যাতন করে মারা হবে সেটাই ফয়সালার ব্যাপার। হ্যা, রাগ কালাহীরারও হয়েছিল বই কি। অত রাগ আর জীবনে হয় নি। সেই রাগে শাস্তির চূড়ান্ত ঘোষণাটা সে ই করে বসল। মেরে ফেললে কি আর এমন সাজা হল, মরে গেলেই তো সব কিছু ফুরিয়ে গেল। তার থেকেও কঠিন সাজা ওকে দিতে হবে। পরের অমাবস্যায় ওর পাপ চোখ দুটো খুবলে তুলে ফেলতে হবে। তারপর যত কাল বাঁচে বাঁচুক, পাপের সাজা বয়ে বেড়াক।

সকলে সানন্দে সায় দিল। কালীমায়ীর নির্দেশ অমান্য করবে কে?

এ-পর্যন্ত বলে কালাহীরা অন্যমনস্ক হয়ে গেল কেমন। যোগানন্দবাবু উদগ্রীব।

—তাই করা হল?

কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। কোলে মাথা রেখে শিথিল অঙ্গ পাথরে বিছিয়ে তেমনি শুয়ে রইল। কালো-ঘেষা বাদামী মুখে একটা বিষাদের ছায়া ঘন হয়ে উঠতে লাগল। তারপর সামান্য মাথা নাড়ল। বলল, না, তার আগেই ওই পাপী জন্মের মতো পালাল, একেবারে পৃথিবী ছেড়ে পালিয়ে গেল। একটা কুড়েঘরে হাত-পা বেধে রাখা হয়েছিল তাকে। দাঁতে কেটে হোক বা যে করে হোক, এক রাতে বাধন ছিঁড়ে পালাল। পরদিন দেখা গেল শিকড়ের ফাস গলায় লাগিয়ে একটা গাছে ঝুলছে।

সেই বীভৎস দৃশ্য স্মরণ করেই হয়তো গায়ে কাটা দিয়ে উঠল আবার, শিথিল অঙ্গ কুঁকড়ে গেল বার-দুই। যোগানন্দবাবুও স্তব্ধ।

পরের ক'টা দিন একটা চাপা অস্বস্তি বেড়েই চলল তার। কালাহীরার আচরণ আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। সরল, নিষ্পাপ, সুন্দর। বেশির ভাগ দিনই আগে এসে

বসে থাকে। তাঁর আসতে দেরি হলে ছদ্মকোপে ভুরু কোঁচকায়, কৈফিয়ত তলব করে। তাঁর কোলে মাথা রেখে শোয়াটায যেন একচেটে অধিকাব ওব। অনর্গল কথা বলে, হাসে, টানা চোখের গভীর থেকেও সেই হাসি তাঁব মুখের ওপব ঠিকবে পড়ে, সাদা দাঁতেব আভাস ঝকমকিয়ে ওঠে, বাযনাকুলাব লাগনো দৃষ্টিটা দরেব চক্কব ঘুরে তাঁর মুখের ওপর এসে থামে। তারপব খিলখিল করে জোরেই হেসে ওঠে। বলে, তোমার এই তাজ্জব জিনিসটা শুধু দূবকেই কাছে টেনে আনে।

কথায কথায় সেদিন যোগানন্দবাবু বললেন, এবাবে যাবাব কথা ভাবছেন তিনি।

চোখ থেকে বাযনাকুলার নেমে এল। চুপচাপ মুখেব দিকে চেয বইল খানিক মেয়েটা। তারপর কোল থেকে মাথা তুলে আস্তে আস্তে তাঁব মুখোমুখি ঘুরে বসল।

—কোথায় যাবে?

—দেশে। অনেক দিন হযে গেল..

—তোমাব দেশ এখান থেকে কত দব?

হেসে জবাব দিলেন, অনেক দূব।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মেযেটা কি দেখছে বা কি ভাবছে ঠাওব কবা গেল না। একটু বাদে বলল, তাহলে আমাকেও তোমার সঙ্গে নিযে চল—

যোগানন্দবাবু এবারে জোবেই হেসে উঠলেন।— আমাদেব ওই সভ্য দেশ তোমাব একটুও ভালো লাগবে না।

—ভালো না লাগলে চলে আসব।

কৌতুক বোধ করছেন যোগানন্দবাবু। সেই সঙ্গে অগোচবেব অস্বস্তিটাও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। মেযেটার চোখে-মুখে হাসি বা চপলতার লেশমাত্র নেই বলেই বোধহয়। গলার স্বরে বিস্মষ ঝবল।— কোথায় চলে আসবে— এখানে? তোমার লোকেরা তখন বলবে কি?

কালো দুটো চোখ তাঁব মুখের ওপব পড়ে আছে তেমনি, কিন্তু এবাবে দৃষ্টিটা বিমনা একটু। ভাবছে কিছু। বলল, না, এখানে আব আসা যাবে না। অন্য কোথায চলে যাব—

—দূর পাগল! আবাবও হেসেই উঠলেন যোগানন্দবাবু।— আমিই না হয় আবার আসব'খন। মেযেটা তাতেও খুশি হল না মনে হতে আর না হেসে গম্ভীর অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, তোমাকে আমাব কত যে ভালো লেগেছে তুমি জান না। এতকাল ধরে আমি প্রকৃতির কত না সুন্দব জিনিস দেখে বেড়িযেছি। নতুন নতুন গাছপালা, ফুল-ফল, নুড়ি-পাথর, পোকা-মাকড়, পশু-পাখি আবো কত কি। কিন্তু এবারে যা দেখলাম, আমার দু'চোখ ভরে গেছে। প্রকৃতির সব থেকে সেরা আব সব থেকে সুন্দর জিনিসটি তুমি—জীবনের গাছে সবল-সুন্দর একখানা ফুলেব মতো ফুটে আছ, এখান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে গেলে সব কানা হয়ে যাবে।

এই স্তুতির মধ্যে সত্যিকাবের একটু আবেগের ছোঁয়া ছিল। এবারের প্রকৃতি-দর্শনের মধ্যে তাঁর চোখে এই মেয়ে যথার্থই এক বিচিত্র আবিষ্কার, এখানকাব

প্রকৃতির ভাণ্ডারের একখানি দর্লভ রত্ন। কিন্তু এত কথার জবাবে মেয়েটার শান্ত নির্বাক আচরণ দেখে একটু অবাক তিনি। পাথর ছেড়ে কালাহীরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। গভীর কালো চোখজোড়া তাঁর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। সজীব দেহটা একটু একটু করে যেন পাথর হয়ে যেতে গেল। গোড়ায় যেমন দেখেছিলেন অনেকটা তেমনি। আবার তার মধ্যেও কি যেন ব্যতিক্রম। চেয়ে আছে। দেখছে। দেখছে। কি দেখছে যোগানন্দবাবু জানেন না।

পাথরমূর্তি নড়ল একসময়। ঘুরল। বাযনাকুলার হাতে জংলা সরু পথ ধরে চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে বটে, কিন্তু তাতেও যেন প্রাণের সাড়া নেই।

যোগানন্দবাবু বিমূঢ়। ঘরে ফিরে রাতের অনেকটা সময় ভেবে কাটিয়েছেন তিনি। কি যে হয়ে গেল ঠাওর করতে পারছেন না। জানতে কোনোরকম আঘাত দিয়ে ফেলেছেন কিনা তাও বুঝছেন না। না, ওই পাথরমূর্তিতে কোনো আঘাতের চিহ্ন বা প্রতিক্রিয়াও দেখেন নি তিনি।

পবদিন। অজ্ঞাত অস্বস্তি নিয়ে খানিক আগেই বেরিয়ে পড়লেন। জংলা পথ ভেঙে নিচের দিকে পা বাড়িয়েই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। বিশ্বাসযোগ্য কিছু দেখছেন কিনা মুখে সেই সংশয়। নিচের ওই পাথটার সামনে বায়নাকুলার হাতে কালাহীরা দাঁড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে আরো চারটে জোয়ান লোক। পাথরের ওপরের ছাউনিটা তারা টেনে নামিয়ে ভেঙে তছনছ করেছে। এখন শাবল আর গাঁইতি দিয়ে অতবড় পাথরটাও উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করছে। কার আদেশে তারা এ-কাজ করছে তাও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কালাহীরার কালো-ঘেঁষা তামাটে মুখে এখন শুধু তামাটে আভাই ঠিকরে বেরুচ্ছে।

হতভম্বের মতো যোগানন্দবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। তারপর কালাহীরার চোখে চোখ পড়তে থমকালেন আবার। সেই চোখজোড়া তাঁর মুখের ওপর বাঘিনীর মতো জ্বলছে ধকধক করে।

তার লোকগুলোর চাউনিও নির্মম, ক্রূর।

অস্ফুট স্বরে যোগানন্দাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

জবাবে কালাহীরার সমস্ত মুখ আরো নির্মম আরো নিষ্ঠুব হয়ে উঠল। চোখেব আগুন আরো নৃশংস হয়ে উঠতে চাইল। অব্যক্ত বোষে হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে বায়নাকুলারটা ওই পাথরেব ওপর আছড়ে ভাঙল। দামী জিনিসটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পরক্ষণে হিস হিস শব্দে ওর লোকদের হুকুম করল, ওকে যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসো।

বাঘিনীর মতোই চকিতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যোগানন্দবাবু নির্বাক, চিত্রার্পিত। লোকগুলোর নির্দয় চাউনি। একজন বলল, হুকুম মিলল না বলে এবারের মতো বেঁচে গেলে। ফের আবার এদিকে পা বাড়ালে আর জান নিয়ে ফিরতে পাবে না।

ওরাও চলে গেল। যোগানন্দবাবু তখনো মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

এই রাতেও ঘুম গেছে। চোখের সামনে থেকে অস্পষ্টতার পর্দাটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যোগানন্দবাবু এখন সবই বুঝতে পারছেন, সবই দেখতে পাচ্ছেন। মেয়েটা কেন ছুটে ছুটে আসত তাঁর কাছে, এখন তিনি তা জানেন। পুরনো সর্দারের সেই কামনাশক্ত বেপরোয়া ছেলেটার আত্মহত্যার প্রসঙ্গে কালাহীরার মুখে কেন বিমনা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল, এখন তিনি তা বলে দিতে পারেন। তার সেদিনের স্তুতিতে কোনো অপমান শেলের মতো ওই রমণীর বুকে বিঁধেছিল, এখন তিনি তাও অনুভব করতে পারেন।

হ্যাঁ, যোগানন্দবাবু এখন সবই বুঝতে পারছেন, সবই দেখতে পাচ্ছেন।

যোগানন্দবাবু দেখতে পাচ্ছেন, ওদের কালীমায়ী কালাহীরার যৌবন কাঁদছে।

তাজমহল

লোকটার কথা অনেক ভেবেছি—।

ভেবেছি বললে ঠিক হবে না, মন থেকে কিছুতে তাড়াতে পারা যায়নি ওকে। সুখ-নিদ্রায় একটুখানি দুঃস্বপ্নের মত এত আনন্দের মধ্যেও একটা অস্বস্তিকর স্মৃতির তাড়না ভোগ করতে হয়েছে। শমির অবস্থাও আমারই মত। নিজের সঙ্গে খানিক যোঝাযুঝি করে শেষে বলেই ফেলল, আগ্রা আর ভালো লাগছে না, চলো পালাই এখান থেকে।

অথচ এ-রকম কথা ছিল না। বন্ধুদের হাসি-টিটকিরি উপেক্ষা করেও আমরা এখানে থেকেই গেছি দিনকতকের জন্য। আমাদের আনন্দে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বুদ্ধিমানের মতই বন্ধুরা সরে পড়েছিলেন। যাবার আগে ঠাট্টা করেছেন, আগ্রায় বড় ধুলো, কিন্তু এ ধুলোয় প্রেমের ছড়াছড়ি—সেও আবার যে-সে প্রেম নয়, খানদানি প্রেম, রাজা-বাদশার প্রেম। এই প্রেম-ধূলি কষে টানো তোমরা, আমরা পালাই।

যে ভাবেই বলুন তারা, জায়গাটা আমায় টানে মিথ্যে নয়। ভাবতে বসলে এখানকার ধূলিকণা বাতাসেও কালের কারুকারখানার স্পর্শ মেলে। চারদিকে স্মৃতির ঢালা আড়ম্বর সত্ত্বেও আতিশয্যের দম্ভ চোখে পড়ে না। বরং পাষাণ-বন্দী এক প্রাণ-স্রোতের মূক আবেদনে ভিতরটা ভরে ওঠে সেই ভরে ওঠাটা সুখেরও, ব্যথারও। এবারে আরো ভালো লাগার কারণ, সঙ্গে শমি আছে। তার বিস্ময় সবটাই নতুন।

যাবার আগে বন্ধুরা শর্মিলাকেও ছেড়ে কথা কননি। বলেছেন, তাজমহলের চাতালে বসে যত খুশি শাজাহানের দীর্ঘনিঃশ্বাস গোনো, তেমন অবস্থা হলে নিরুপদ্রবে এবারে শুকনো যমুনায় দু'ফোটা চোখের জলও ফেলতে পারো—কিন্তু যাই করো, এই ভরা শীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওখানে বসে থেকে ঠাণ্ডাটি লাগিয়ে বোসো না।

এ পরিহাসের তাৎপর্য আছে একটুখানি। শীতকাল তাজমহল দেখার মরশুম

নয়। প্রাকৃতিক নিঃস্বতায় এ-হেন দ্রষ্টব্যটিকেও তখন বিক্ত মনে হয় কিছুটা। এ-সময়ে যাঁরা দেখতে আসেন, সন্ধ্যে না হতেই তাঁদের চোখের নেশা কাটে। তাছাড়া এমনিতেও বছরের মধ্যে শুধু শরৎ আর বসন্তের চাঁদ-ধোয়া রাতগুলো ছাড়া তাজমহলের পিছনেব বিশাল মার্বেল-বাঁধানো এলাকায় সন্ধ্যার পরে বেশি জনমানব দেখা যায় না। ও-দিকের নৈঃশব্দ তখন প্রায় গা-ছমছম করাব মতই। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর সদ্য-কাল থেকে নিজেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন মনে হয়। বিকেলেব দিকের যত ভিড়ও বেশির ভাগই তাজমহলেব সামনেব দিকে, অথবা ডাইনে-বায়ে।

কিন্তু প্রথম বিস্ময় কাটবার পব শর্মিলা ওই পিছনেব দিকটাই বেছে নিয়েছিল। দলের ওজন তখন ভাবি। একবারে শেষ মাথায় কোমর-উঁচু কার্নিসেব ধারে শ্বেত পাথরেব বেঞ্চটাতে বসে থাকত ঘণ্টাব পর ঘণ্টা। কখনো বা উঠে কার্নিসে ঝুঁকে নিচের যমুনা দেখত নিবিষ্ট মনে।

অনেক নিচে যমুনা। এত নিচে যে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকলে মাথা ঝিমঝিম করে—ওই কার্নিসটুকু যথেষ্ট মনে হয না। কিন্তু এ-ক'দিনে শর্মিলা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঠায় নিচেব দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পাবে যতক্ষণ খুশি। শীতেব শুকনো যমুনা একটা শীর্ণ বেখার মত এঁকে-বেঁকে দবে মিলিয়েছে। যতদূর চোখ যায় ধু-ধু করছে শুকনো পাথুরে গহ্বব। দলে দলে সেখানে কচ্ছপ চড়ে বেড়ায় টুকটুক কবে। ওপব থেকে পোকা-মাকড়ের মত দেখায়। জলেব ওপরেও গলাগুলো ভাসতে দেখা যায বিন্দুর মত। শর্মিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে তাই দেখে, ভালো না লাগলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই রেলিংএ ঠেস দিযেই তাজমহল দেখে হাঁ করে। দিনেব আলো কমে এলে বেঞ্চটায় বসে থাকে। পাঁচবার তাগিদ দিযেও তোলা যায না। বলে, এখনই ফেরাব তাড়া কেন, আর একটু বসি না।

এই নিরিবিলিতেই আলাপ সেই লোকটির সঙ্গে।

বঙ্কুরাই আবিষ্কাব করেছিলেন তাকে। এক কালে বেজায় ঢেঙা ছিল বোঝা যায, বয়সের ভারে বেতেব মত দুমড়নো মূর্তি এখন। হাড়েব ওপব শুধু চামড়া বসানো। ফর্সা রঙ তাম্রবর্ণ। নিস্প্রভ ক্ষীণদ্যুতি চাউনি। আধময়লা পা-জামা আর হাঁটু-ঢাকা চিকনের কাজকরা পাঞ্জাবির ওপর একটা ম্যাটমেটে কালো হাতকাটা কোর্তা।

এক কথায় ডেকে আলাপ কবার মতও নয, ভালো লাগাব মতও নয়। এই পিছনের দিকটাতেই বার্ধক্য-মন্থর পায়ে ঘুরে বেড়ায সেও, দর্শকেবা চেযে চেয়ে দেখে দূব থেকে। মাঝে মাঝে দুই একজনেব সঙ্গে কথাবার্তাও কইতে দেখা যায়, শীর্ণ হাত বাড়াতেও দেখা যায। দু'তিন দিন লক্ষ্য কবে আমাদের কাছেও এসে দাড়াল একদিন। নবাবী কুর্নিশ করে বলল, বাবুজী, এক আনা পয়সা দেবে?

ঠিক ভিক্ষের আবেদন নয়, দরকার বলেই চেয়েছে যেন।

বঙ্কুরা পয়সা দিয়েছেন। আলাপের সে-ই সূত্রপাত। নাম চাচা বক্স। এ ধবনের উদ্ভট নাম কখনো শুনিনি। বয়েস কত জিজ্ঞাসা করতে জবাব দিয়েছে, বয়েসের আর সঠিক হিসেব নেই এখন—চার কুড়ি দশ পার হয়েছে। লোকটার কথাবার্তা স্পষ্ট এবং

পরিচ্ছন্ন—বার্ধক্যের দরুন গলার স্বর একটু কাঁপে, ধরন-ধারণে নবাবী সৌজন্য। ঘোলাটে দুই চোখে জীবনের দ্যুতি নেই বললেই হয়।

কতকাল আছে এখানে?—সারী জিন্দগী এহী বিতাদী! জীবনভোর আছে। এহী জিয়াহুঁ, এহী মওত হোগী—এখানেই প্রথম আকাশ দেখেছে, এখানেই মাটি নেবার জন্যে অপেক্ষা করছে এখনো।

লোকটার কথা বলার ভঙ্গীই আমাদের আকর্ষণ করেছিল বোধহয়। আমাদের দেখলেই দুমড়নো শরীরটা টেনে টেনে কাছে এসে দাঁড়াত। পয়সা চাইত না, অমনিতেই পেত। ভিক্ষে নয়, ভিক্ষে শুধু প্রথম দিন চেয়েছিল। তারপর যা নিয়েছে সবই যেন তার প্রাপ্য মর্যাদা।

বাদশাহী আমলের রাজনীতি কূটনীতি ছেড়ে তাদের হারেমের সব গোপন খবরও লোকটার অজ্ঞাত নয়। যে-প্রসঙ্গেই কথা উঠুক তার বলবার কিছু আছে। আর সেই বলার মধ্যে মৌলিকতার প্রত্যয়ও তেমনি স্পষ্ট। বাদশাহী শিল্প-রুচি খানা-পিনা জাঁকজমক শাসনবৈচিত্র্য প্রণয়-জটিলতা—লোকটাব বাকপটুতায় সবই ইতিহাসের কবর ভেঙে তরতাজা হয়ে উঠতে চায়। আর তাজমহল প্রসঙ্গে তো কথাই নেই, যাবতীয় রহস্য আর যাবতীয় বিস্ময়-বৈচিত্র্য তার জিভের ডগায়।

শর্মিলাও বসে শুনেছে প্রথম দুই-একদিন তারপর আর ভালো লাগেনি বোধহয়। কিন্তু ভালো না লাগার আর একটা হেতু আছে মনে হয়। প্রথম দিন গল্প ফেঁদে বসে অতিবৃদ্ধ চাচা বক্স-এর ঘোলাটে দুই চোখ হঠাৎ এক সময় শমির মুখের ওপর আটকে যেতে দেখেছি। মুখের ওপর থেকে সেই ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি গলার নিচে বুকের কাছাকাছি বড় হীরে-বসানো নেকলেসটার ওপর এসে থেমেছে। নতুন দেখলে ওই হীরেটার ওপরে অবশ্য চোখ পড়ারই কথা। কিন্তু এ-চাউনি অন্য রকম। নিস্প্রভতা কেটে গিয়ে একটু একটু করে যেন দ্যুতি সঞ্চার হচ্ছিল, তার সেই বিসদৃশ দেখাটা যে সকলেই লক্ষ্য করছিল, তাও খেয়াল নেই।

বন্ধুদেব একজন টিপ্পনী কেটেছিলেন, বুড়োব রস আছে—

শমি লাল হয়ে উঠেছিল।

খানিক বাদে আবার তেমনি জরা নেমে এসেছিল চাচা বক্স-এব চোখে-মুখে। টেনে টেনে জিজ্ঞাসা করেছে, নতুন সাদী হয়েছে?

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শমি অস্ফুট স্বরে ঝাঝিযে উঠেছে, সে-খোঁজে কাজ কী—

বাংলা কথাগুলো বুড়ো বোঝেনি। বন্ধুরা মজা পেয়ে বলেছেন, একেবারে আনকোরা নতুন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছেন, মমতাজ ওর থেকেও সুন্দরী ছিল কি না।

গল্পের ফাঁকে ফাকে এই ব্যাপারটা আরো দুই একদিন দেখা গেছে। বুড়োর দু'চোখ হঠাৎ এক-একবার থেমে গেছে শর্মিলার মুখের ওপর গলার কাছে, বুকের কাছে। তবে প্রথম দিনের মত অমন বিসদৃশভাবে নয়। তবু শমির অস্বস্তি। এই কারণেই সম্ভবত তার গল্প শোনার আগ্রহ গেছে। লোকটাকে আসতে দেখলে উঠে রেলিংয়ের

দিকে গিয়ে শুকনো যমুনা দেখে, নয়তো এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে আর তাজমহল দেখে। বন্ধুরা ডাকলে বলে, আজগুবী গল্প আপনারাই শুনুন, কোনদিন হয়ত বলবে শাজাহান ওর সঙ্গে পরামর্শ করেই তাজমহল বানিয়েছে।

বন্ধুরা যাবাব পর দিন-দুই আর আসা হয়নি। সেদিন শীতটা যেন একটু চেপে এসেছে। আর কোথাও যেতে ভালো লাগেনি বলেই তাজমহলে আসা। বিকেল পড়ে আসতে পিছনের দিকটা যে একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে খেয়াল নেই। যমুনার দিকের রেলিংএ ঝুঁকে আমরা কচ্ছপের মেলা দেখছিলাম। বেশ লাগছিলো। এগুলো যেন কি এক গুরুগম্ভীর কাজে ব্যস্ত। আলো কমে আসতে ক্রমশ অস্পষ্ট হতে লাগলো, তারপর এক সময় আব দেখাই গেল না। তবু আবো খানিক দাঁড়িয়ে আমরা যে যাব চোখের ধার পরীক্ষা করছি।

—ও মা, এ কি।

শমির অস্ফুট ত্রাসে চমকে ফিবে তাকালাম। তাব পব হতভম্ব আমিও। শমির ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে চাচা বক্স। এখন পিছনে নয়, সামনে। শমি রেলিংয়ের সঙ্গে মিশে ব্যবধান বাড়াবার চেষ্টা কবছে। নিজের অগোচরেই আমিও আঁতকেই উঠেছিলাম বোধহয়। লোকটার কোমরভাঙ্গা দুমড়নো দেহ একেবারে সোজা টান হয়ে উঠেছে। এত ঢ্যাঙা আগে কল্পনা কবিনি। আত্মবিস্মৃত দুই চোখ শমির বুকের কাছে সেই হীবে-বসানো নেকলেসের ওপব। জরার লেশমাত্র নেই সে-চোখে, ছুরির ফলার মত চকচক করছে। সে চোখে যেন গোটা শবীরটার প্রাণশক্তি অসাড় কবে দেবাব মত যাদু আছে।

আমিও যে ঘুরে দাঁড়িয়েছি লোকটাব সে খেয়ালও নেই।

একটু বাদে সচেতন হল সে। কোমবেব ওপব উধর্বাংশ ভেঙে পড়ল আবার। চোখেব দৃষ্টি বদলাল। নিস্প্রভ ঘোলাটে দেখালো আগেব মতই। আমাব দিকে চেয়ে জবাজীর্ণ হাত তুলে সেলামও কবল একটা।

বিমূঢ় বোবা ভাবটা কাটল এতক্ষণে। রীতিমত ধমকেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই?

জবাবে লোকটা নোয়ানো ধাড়টা তুলে মুখেব দিকে চেয়ে হাসতে চেষ্টা কবল একটু। তারপব বলল, বাবুজী, সাঁঝের পব বহু নিয়ে এভাবে একা একা এদিকে ঘুরো না, হদিস পেয়ে খারাপ লোক যদি আসে, চিৎকার কবে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না।

মৌন সন্ধ্যাব আবছা অন্ধকারে বিশাল চত্বরের চারদিকে দু'চোখ ঘুরে এলো একবার। কোনদিকে জনপ্রাণী নেই। এই প্রথম মনে হল সমাধিব ওপর দাঁড়িয়ে আমরা। শমির দিকে চেয়ে দেখি সে সামলে উঠতে পারেনি তখনো। লোকটার কথায় গা ছমছম করে উঠেছিল বলেই কড়া সুবে বলতে হল, ঠিক আছে, তুমি সরো এখান থেকে—।

তেমন পরোয়া করল বলে মনে হল না। প্রচ্ছন্ন হাসির আভাসও দেখলাম যেন। জিজ্ঞাসা করল, কাহানী সুননী হ্যায়? গল্প শুনবে না?

আরো রূঢ়কণ্ঠে জবাব দিলাম, না—।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা রেলিংয়ের ধার ঘেঁষা পাথরের বেঞ্চটার ওপর বসল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

পাছে আমাদের অস্বস্তি ও টের পায়, তাই আরো দু'চার মুহূর্ত অন্ধকারে যমুনা দেখে শেষে শমির হাত ধরে অন্য দিকে পা বাড়ালাম। মনে মনে ফেরার মতলব।

বাধা পড়ল, বাবুজী শোনো—

অনুনয়ের সুর কিছুটা।

শমির হাত ধরেই কাছে এসে দাঁড়াতে জানালো, আজ সকাল থেকে খানা জোটেনি—চেষ্টাও করেনি জোটাতে। এখানে হুজুর আর হুজুরানকে দেখে ভেবেছিল কিছু পাবে।

পাবার আশায় যে-ভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল মনে পড়লে হয়ত আর একটা দাবড়ানীই ওর প্রাপ্য হত। কিন্তু কি জানি কেন মনে পড়ল না। পকেটে হাত ঢোকাতেই ও আবার বাধা দিল, এখন থাক বাবুজী, পবে দিও—আগে একটা গল্প শোনো। পাথরের বেঞ্চের একেবারে ধারে সরে গেল সে, তারপর বলল, বোসো না বাবুজী, ভয় কি, আমি তো আছি—চাচা বক্সকে এখানে কে না চেনে।

ভয়ের কথা বলতে এখন উল্টে যেন রাগ হল একটু। এই লোকটাকে দেখেই একটু আগে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম অমন, ভাবতেও সঙ্কোচ। আমারই হাতের সামান্য একটা ধাক্কা খেলেও বোধহয় নব্বুই বছরের ওই জবাকুব্জ দেহের ধুকপুকুনিটুকু থেমে যাবে। ভয় না হোক, শমি এখন গল্প শুনতে চাইবে বলে মনে হয় না। শমির দিকে তাকাতে ওদিক থেকে চাচা বক্সও সেটা অনুমান কবে নিল বোধহয়। কাবণ শমি অনিচ্ছা প্রকাশ করাব আগেই ও সবিনয়ে আবজি পেশ করল, বান্দার গল্প শুনতে হুজুরানের ভলো লাগে না সে জানে। কিন্তু এ খানদানী 'কাহানী' কিছু নয়, ভালো লাগবে এমন একটা কিছুই সে শোনাবে আজ। শুধু হুজুরানের জন্যেই বলবে, নইলে আর কেউ কখনো এ গল্প শোনেনি।—আগর মেরি দাস্তান দিলচসপ না হো তো বন্দেকে মু পর দো তামাচে লাগানা—বুঢ়েকো ফাকা মরণাহী বেহতর হোগা।

ভালো যদি না লাগে নফরের দু'গালে চড় কশিয়ে আমবা যেন প্রস্থান করি—বুড়োর উপোস করে মরাই ভালো।

আমি লেখক। লোকটার প্রতি আগেও কৌতূহল ছিল। আর আজ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তাব আমাদের পিছনে ওভাবে এসে দাঁড়ানো থেকে এই পর্যন্ত একটা অনুভূতি-বৈচিত্র্য আমাকে বশ করেছে। আমি স্বেচ্ছায় শুনতে বসে গেছি, শর্মিলা নিরুপায় হয়ে, আমার গা ঘেঁষে—হীরের নেকলেসটা গরম চাদরে ঢেকেঢুকে নিয়ে।

তারপর গল্প শুনেছি। গোড়ার দিকে শমির উসখুসানি টের পেয়েছি। তারপব কেমন করে শুনেছি, কতক্ষণ শুনেছি মনে নেই। বোধহয় শমিরও না। আর সেই গল্প শোনার পরদিনই, অর্থাৎ আজই আগ্রা ছেড়ে যাব কিনা দু'জনে বসে তাই ভাবছি।

খানদানী গল্প নয় ঠিকই। রাজা-বদশারও নয়, আমীর-ওমরাহেরও নয়। এমন কি এমন কিছু দূর অতীতেরও নয়। মাত্র ষাট বছর আগের কথা। এই তাজমহলেরই

একজন গাইডের গল্প। নাম আব্বাস আলী। যেমন মরদ আর তেমনি হিম্মত ছিল। রাজা মহারাজা বা হোমরাচোমরা সাহেবসুবোকেও অনায়াসে কথার ধাঁধায় বশ করে মোটা টাকা রোজগার করত। অন্য গাইডেদের ঈর্ষার পাত্র ছিল সে।

কিন্তু তাকে সব থেকে বেশি হিংসা করত আর ঘৃণা করত আব্দুল। তারই এক আত্মীয়। সেও গাইড। মানুষের দেহে মূর্তিমান দুশমন। কিন্তু আব্বাসের সঙ্গে সামনাসামনি দুশমনি করতে সাহস করেনি কখনো। উল্টে হৃদ্যতা দেখাতো, আত্মীয়তার মুখোস পরে বরং বেশি মিশত আরো। বহু রকমের বহু দর্শক আসে তাজমহল দেখতে—এই বিরাট এলাকায় সুযোগেরও অন্ত নেই— আরো অনেক বেশি লাভের ইঙ্গিত করত সে। আব্বাস আলী কখনো শাসিয়েছে তাকে, কখনো উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু কখনো শত্রুতা করেনি। কেন করবে ? কাকে পরোয়া করে সে ? নিজের আনন্দে নিজেই সদা ভরপুর। সম্প্রতি সে আনন্দ আরো বেড়েছে। আমিনাকে ঘরে এনেছে। আব্দুলকে ঘর থেকে বিদায় দিয়েছে।

আমিনা ? সে কি মেয়ে ? মেয়ে না হালকা প্রজাপতি তাই ভাবত আব্বাস আলী। ওর বিশ্বাস, মুঘল হারেমের কোনো শাপভ্রষ্টা নবাবনন্দিনী আমিনা হয়ে এসেছে একালে। আর ও নিজেও সম্ভবত রাজা-বাদশার ঘরেরই কেউ ছিল। নইলে এমন যোগাযোগ হবে কেন ? আমিনা বাকমুখরা, কৌতুকে ঝলমল, রহস্যময়ী। তার চোখের গভীরে কালো যমুনার ছায়া, কটাক্ষে বিদ্যুৎ, চাপা অঙ্গে তাজমহলের লাবণ্য, আর দেহে যৌবনীর জোয়ার।

না, কোনো বাদশার থেকেই নিজেকে কম ভাবত না আব্বাস আলী।

আর ঠিক এই কারণেই একবারে যেন শেলবিদ্ধ হয়েছিল আব্দুল। আমিনাকে লাভের চেষ্টা সেও কম করেনি। বরং আব্বাসের থেকে বেশিই করেছে। মত্ত পতঙ্গের মত অগ্নিশিখার পিছনে ছোটাছুটি করে নিজের অনেক উপার্জন নষ্ট করেছে। লালসায় বিভ্রান্ত হয়েছে। তারপর ওদের আনন্দ দেখে তিলে তিলে পুড়েছে।

কিন্তু আব্বাস আলী বিজয়ী বীরের মতই ক্ষমা করেছে আব্দুলকে। ক্ষমা করেছে আর করুণা করেছে। বামনের আসমানের চাঁদের লোভ নিয়ে হাসাহাসি করেছে আব্বাস আর আমিনা। ওর সঙ্গে শত্রুতার চিন্তাও তুচ্ছ।

শুধু বেহেস্তের অপ্সরাই আসেনি আব্বাসের ঘরে, দেখতে দেখতে সেই সঙ্গে ভাগ্যও ফিরেছে আরো। রোজগার বেড়েছে দ্বিগুণ। কেন ফিরবে না, মগজের জোর কম নাকি আব্বাস আলীর ? দেশবিদেশ থেকে তাজমহল দেখতে আসে কত মেয়ে, কত পুরুষ। গল্পের যাদুতে পুরুষদের একাই জমিয়ে রাখতে পারে আব্বাস, কিন্তু নিছক মেয়ের দল হলেই একটু মুশকিল। সেই মুশকিল আসান করল আমিনা। পর্দানসীন মেয়ে নয় আমিনা। হাস্যে লাস্যে গল্পের জাল বুনতে সেও কম যায় না। দেখা গেল শুধুই মেয়ে দর্শক নয়, মেয়ে-পুরুষের যুগ্ম দলেও তার কদর প্রায় তাজমহলের মতই। অবশ্য সরকারী নিয়ম নয় এটা, কিন্তু বে-সরকারী ভাবে সবই চলে। আর এ নিয়ে লাগাতে যাচ্ছে কে—কার কত গর্দান ? তা ছাড়া লাগালেও পরোয়া করে না ওরা, গাইডের বিবি কি তাজমহলে আসতে পারে নাকি ? রোজই যদি আসে,

বলাব কি আছে ? আলাপ যদি কবেই পাঁচজনেব সঙ্গে, বলাব কি আছে ? আর পাওনা গণ্ডা ? সেটা নির্বিঘ্নে আদায় কবে নেওযাব বীতি ভালই জানে আমিনা আব আব্বাস আলী।

কিন্তু এত সুখ কাল হল।

দর্শক-মনোবঞ্জনে প্রগলভা কৌতুক-মুখবা আমিনাকে দেখে আব্বাস আলীব মনে হত, ও যেন তাজমহলেব জীবন্ত ছন্দ।

সেই ছন্দ কাল হল।

প্রতিদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায কত দর্শক আসছে যাচ্ছে কেই বা লক্ষ্য কবে, কেই বা হিসেব বাখে। দেখে শুনে একটা দলকে পাকড়াও কবো, ঘণ্টা দু-ঘণ্টা তাদেব তোযাজ কবো, কাহিনী শোনাও, তাজমহল দেখাও—তাবপব স্বার্থ বুঝে নিযে তাদেব বিদায দিযে আবাব নতুন দলেব সন্ধান কবো। এব মধ্যে মনে কবে বাখাব মত কেউ নয, কিছুই নয।

একবাব এমনি একটা দল এসেছিল তাজমহল দেখতে। জনাকতক পুরুষ এবং একজন আধবযসী সুশ্রী বমণী। দেখলেই বোঝা যায শাসালো পার্টি। প্রথম দিন আব্বাস আব আমিনা দু'জনেই গিযে জুটেছিল তাদেব কাছে। দবাজ হাতে যে বকশিশ দিযেছে তাবা একবাবে অতটা আব কেউ কখনো দিযেছে বলে মনে পড়ে না। পব পব আবো দিনকতক এসেছে সকলে মিলে। খুঁটিযে দেখানোব জন্যে আব গাইডেব প্রযোজন নেই। তবু বমণীটি হাতছানি দিযে ডেকেছে আমিনাকে। গল্পগুজব কবেছে, ছড়া পাঁচালি শুনেছে, তাবপব মোটা পাবিশ্রমিক দিযেছে।

একদিন আমিনা আব্বাসকে জানালো, বমণীটি নিশ্চয কোনো নামকবা বাইজী—সেদিন সন্ধ্যায তাজমহলেব পিছনেব চাতালে বসেই সকলকে গান শোনাচ্ছিল। গানেব সময তাব হাতনাড়া আব ভাবভঙ্গি দেখে আমিনাব সেই বকমই মনে হযেছে। আমিনাও লযলা-মজনুব দুই-একটা পাঁচালি গান শুনিযে দিযেছে তাদেব। সকলেই ওবা তাব গলাব তাবিফ কবেছে। সবথেকে বেশি প্রশংসা কবেছে সেই বাইজী-বমণী। তাদেব সকলেব ব্যবহাবেই আমিনা মুগ্ধ।

আগেও নিজেদেব সম্বন্ধে দর্শকদেব অনেক প্রশংসাব কথা শুনিযেছে আমিনা। শুনলে আব্বাস খুশিই হয। সেদিনও হযেছিল। বকশিশেব অঙ্ক শুনে আবো খুশি হযেছিল।

পবদিন সেই দলে বমীটিকে এবং আব একজনকে শুধু দেখা যাযনি। তাবা চলে গেছে শুনেছে। বাকি ক'জন দু'চাব দিন বাদে যাবে। তাজমহলে এসে তাবা অন্যদিনেব মতই আমিনাকে ডেকেছে, কথাবার্তা বলেছে, গল্প শুনেছে, টাকা দিযেছে। এমনিতেই ফালতু লজ্জাসবমেব বালাই নেই আমিনাব, তাব ওপব বিগত ক'টা দিনেব পবিচয এবং প্রাপ্তিযোগেব ফলে সঙ্কোচ আবো নেই।

সেদিন দুপুব গড়বাব আগে আমিনা জানালো তবিযৎ ভালো নেই—তাজমহলে যাবে না। বিযেব দু'বছরেব মধ্যে গত বছব শুধু মাসকতকের জন্যে আমিনা তাজমহলে আসেনি। তাবও কাবণ সন্তানবতী হযেছিল আমিনা—আসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ছেলে

হবার কিছুদিন পরেই এক পরিচারিকার হেপাজতে ছেলে রেখে নিয়মিত তাজমহলে এসেছে আবার। তাজমহলে যাবে না এমন কথা আব্বাস আলী কমই শুনেছে ওর মুখে। তাই তার তবিয়তের জন্যে চিন্তিত হয়েই কাজে বেরিয়েছিল আব্বাস। মরসুমের সময় একদিন কামাই হলেই অনেক লোকসান। বসন্তের চাঁদনী রাতে অনেক রাত পর্যন্ত দর্শক আসে দলে দলে।

সেও ছিল এক সর্বনাশা চাঁদনী রাত।

ফিরতে একটু দেরিই হয়েছিল আব্বাস আলীর। কিন্তু ঘরের দরজায় এসে একেবারে হতভম্ব। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। আমিনাও নেই, ছেলেও নেই।

মাইল দেড়েক দূরে আমিনার বাপের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখে ছেলে আছে, কিন্তু আমিনা নেই। আমিনার খোঁজে এসেছে শুনে উল্টে তারাই অবাক। কারণ তারা জানে, পরিচারিকা অসুস্থ বলে ছেলে এখানে রেখে আমিনা তাজমহলে গেছে। আরো শুনল বাপের বাড়িতে বলে গেছে, ছেলে নিয়ে ছেলের বাপের সঙ্গে নাকি আমিনার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে আজ, তাকে জব্দ না করে ছাড়বে না, অতএব আমিনা ছাড়া আর কেউ ছেলে চাইতে এলে খবরদার যেন তার হাতে ছেলেকে না দেওয়া হয়।

বোবা বিস্ময় কাটতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল আব্বাস আলী। তারপর দিকবিদিক-জ্ঞানশূন্যের মত ছুটল একদিকে। থমকে দাঁড়াল খানিক গিয়েই। না, আব্দুল নয়—আব্দুল তো রাত পর্যন্ত তাজমহলেই ছিল তার সঙ্গে। চকিতে এবার আর এক সম্ভাবনার কথা মনে হতেই পা দুটো পাথর হয়ে গেল আব্বাস আলীর। চাঁদনী রাত যেন খলখলিয়ে ব্যঙ্গ করে উঠল তাকে। এবারে বুঝেছে আব্বাস আলী, এবারে আর বুঝতে ভুল হয়নি।

পায়ে পায়ে আর একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল সে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ।

শহরের নামজাদা হোটেল একটা। আমিনার মুখে এই হোটেলের নামটাই শুনেছিল আব্বাস আলী। সঙ্গীদের সঙ্গে এই অভিজাত হোটেলেই এসে উঠেছিল সেই বাইজী রমণী। এত রাতেও কর্মচারী জেগে আছে দু'চারজন। আব্বাস খবর পাবে।

আব্বাস খবর পেল। এই খবরই পাবে জানত। বাবুরা সেই বিকেলেই আগ্রা ছেড়ে চলে গেছে।

সেখান থেকে সোজা ঘরে ফিরেছে আব্বাস আলী। ঘরে ফিরে ঘুমিয়েছে। শুধু সে রাত নয়—পর পর ক'টা দিন, ক'টা রাত। এমনিতে ঘুমিয়েছে, দাওয়াই খেয়েও ঘুমিয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা অবসাদ-ভরা নিষ্ক্রিয়তা কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। বিকেলের দিকে একবার করে তাজমহলে গেছে শুধু। গাইডের কাজে নয়, এমনি। গিয়ে দর্শকদের চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তাদের তাজমহল দেখার আনন্দ দেখেছে, বিস্ময় দেখেছে।

তারপর আব্বাস আলী গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে একদিন। নিষ্ক্রিয়তা গেছে, অবসাদ কেটেছে।

প্রথমেই শ্বশুরবাড়ি এসেছে ছেলের খোঁজে। কিন্তু এতদিনে আসল খবরটা জানতে বাকি নেই কারো। কোন ভয়ে আমিনা বাপের বাড়ি ছেলে রেখে গেছে তা স্পষ্ট।

তাই বাপের হাত থেকে ছেলেকে রক্ষা করার জন্য তৎপর হয়েছে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। দিল্লীতে থাকে আমিনার নিঃসন্তান বড় বোন। সেখানে কোন এক আপিসের দপ্তরীর বিবি সে। এ ক'দিনের অবকাশে ছেলেকে সেইখানে চালান করে দিয়েছে তারা। বার বার সাবধান করে দিয়েছে, বাপের সঙ্গে ছেলের সাক্ষাৎ পর্যন্ত যেন না হয়। আর এদিকে বুড়ী শাশুড়ী জামাইয়ের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে, মাসিকে পেয়ে ছেলে তার বেইমান মাকে ভুলতে পারবে—সেখানে বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে।

একটিও কথা বলেনি আব্বাস আলী, চুপচাপ ঘরে ফিরেছে। দিল্লীতে তারও দু'চারজন অন্তরঙ্গ গাইড-বন্ধু আছে। শাশুড়ী সত্যি বলেছে কিনা জানার জন্যে গোপনে একজনকে খবর করতে লিখল। শাশুড়ী সত্যি কথাই বলেছে। আব্বাস আলী নিশ্চিন্ত হল, যে-কোনদিন গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। যে লোকটা খবর দিয়েছে তাকে, সে আমিনার দিদির বাড়ির কাছেই থাকে।

কিন্তু ছেলেকে ছিনিয়ে আনার চিন্তাটা শেষ পর্যন্ত বাতিল করে দিল আব্বাস আলী। কারণ আমিনা ছেলেকে রক্ষা করতে চেয়েছে বলেই বোধহয় দু'তিন রাত এক শিশু-হত্যাকারীকে স্বপ্ন দেখল সে। মৃত শিশুর সামনে বীভৎস একটা লোক দাঁড়িয়ে। সেই লোকটা ও নিজে। তাই ছেলে নিয়ে আসার চিন্তাও ছাড়ল আব্বাস আলী।

এর পর আব্দুলের সঙ্গে হাত মিলাল সে।

একটি দুটি করে বহিরাগত দম্পতি নিখোঁজ হতে লাগল আগ্রা থেকে।

তবে চাঁদনী রাতে নয়, তাজমহল দেখা মরসুমের রাতে নয়— অন্ধকার রাতে, অসময়ের রাতে, শীতের রাতে। আমার আর শর্মিলার মত নিঃশঙ্ক বোকা দর্শক তো হামেসাই আসত, বারমাসই আসত। অসময়ের নিরিবিলি নির্জনে ওই কার্নিসে ঝুঁকে যমুনা দেখত আর তাজমহল দেখত আর শাজাহানের প্রেমের কথা ভাবত। দিনের আলোয় সব থেকে আত্মবিহ্বল প্রেমিক-যুগলকেই বেছে নিত আব্বাস আলী। রাতের অন্ধকারে তাদের সুবিধামত না পেলে যেচে গিয়ে আলাপ পর্যন্ত করেছে কারো কারো সঙ্গে, বলেছে, বিবিকে নিয়ে আঁধার রাতে এসে ওই যমুনার ধারে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনো বাবুজী—বাদশা শাজাহানের বুকফাটা কলজের নিঃশ্বাস শুনতে পাবে।

তারপর ক'টা মুহূর্ত আর লাগত প্রথমে পুরুষটাকে ওইটুকু কার্নিসের ওপর দিয়ে ওই অতল যমুনায় ঠেলে ফেলে দিতে? ষাট সত্তর বছর আগে যমুনা কি অত দূরে ছিল, নাকি অমন শুকনো ছিল? তাছাড়া দেহটা তো ভেঙে ফেটে চৌচির হয়ে যেত, তারপর ভরা জোয়ারে কোথা থেকে কোথায় ভেসে যেত ঠিক নেই। নয়তো হাঙর কুমীরে খেত।

আর মেয়েটা?

না, তার ইজ্জত নষ্ট করা হয়নি কখনো। ভালো করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার গায়ের গয়না সব খুলে নেওয়া হত। মুখে চাপা দেবারও দরকার হত না সব সময়, ভয়ে তো শব্দই বেরুতো না গলা দিয়ে—আর চিৎকার করলেই বা শুনছে

কে? দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে-ও স্বামীর কাছে যেতে পেত।

বছরের মধ্যে এমন সাত আট জোড়া মেয়ে-পুরুষেরও পাত্তা মেলেনি আর।

প্রেমের এই স্মৃতিসমাধির ওপর দাঁড়িয়েই দুনিয়ার প্রেম নির্মূল করে দিতে চেয়েছিল আব্বাস আলী।

এ নিয়ে বিপদে কখনো পড়েনি তারা। খোঁজখবর হত। বেশি যখন হত, কিছুকাল চুপচাপ থাকত। কেউ কিছু সন্দেহ করার অবকাশ পায়নি। তবে পরে বছরে দু'তিন বারের বেশি এ-কাজ করত না। বড় রকমের লাভ হবে বুঝলেই শুধু করত।

পাঁচ-ছ'বছর কেটে গেল। আব্বাস আলীর অবস্থা ফিরেছে, কিন্তু বিয়ে আর করেনি। মাঝে গোপনে একবার দিল্লী গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছিল। দিল্লীর সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুর চিঠিতেও ছেলের খবর-বার্তা পেত। সেবার তার কাছ থেকেই একটা সংবাদ পেয়ে ছেলের সঙ্গে মনের যোগটাও একেবারে ছিঁড়ে ফেলল আব্বাস আলী। শুনেছে, আমিনার ভগিনীপতি দপ্তরীগিরি করলেও অবস্থা যেন কি করে ফিরে গেছে তাদের। বড়লোকের মত খরচপত্র করে, আব্বাসের ছেলেকে ভদ্রলোকের ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। মাস-ভাড়া একায় যাওয়া আসা করে, সঙ্গে নোকর থাকে, ইত্যাদি।

আব্বাস আলী অনুমান করে নিয়েছে, টাকা আসছে আমিনার কাছ থেকে। এতদিনে সেও বোধহয় কোনো জায়গার নামকরা বাইজী হয়েছে।

সেই বছর নিখোজ দম্পতির সংখ্যা বেড়েছিল।

একটানা তের-চৌদ্দ বছর কেটেছে আরো। আব্বাস আলীর রক্ত অনেকটাই ঠাণ্ডা হয়েছে। পঞ্চাশের দিকে বয়েস এগোচ্ছে বলে নয়, দেহ তেমনিই মজবুত আছে ওর। তবু প্রেম নির্মূল করার বাসনা অতটা আর নেই। যেটুকু করে আব্দুলের বিশেষ প্ররোচনাতেই করে, আর কিছুটা অভ্যাসের তাড়নায় করে।

কিছুদিন আগে দিল্লী থেকে এসেছে। হ্যাঁ, দীর্ঘকালের মধ্যে এই একবারই গিয়েছিল। ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। না গিয়ে পারেনি আব্বাস। কেউ চেনেনি তাকে আমিনার দিদি ছাড়া। শুধু তার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। আমিনার দিদি আঁতকে উঠেছিল তাকে দেখে। কারো সঙ্গেই দেখা করতে দেয়নি ওকে। ছেলে মস্ত শিক্ষিত গণ্যমান্য হয়েছে এখন। আমিনার দিদিকেই মা বলে, তার স্বামীকেই বাবা বলে জানে।

ছেলের বিয়েতে বহুকে দেবে বলে খুব দামী উপহার নিয়ে গিয়েছিল আব্বাস আলী হীরে বসানো একছড়া কণ্ঠাভরণ—পিছনে খোদাই করা ছিল 'আব্বাজান'। তার কলঙ্কিত-পথের সঞ্চয় সামগ্রী নয় কিছু, উপার্জনের টাকা দিয়েই গড়িয়েছিল। আমিনা চলে যাবার পর থেকে নিয়মিত-উপার্জনের টাকায় হাত পড়েনি— যেমন পেয়েছে তেমনি জমেছে।

আমিনার দিদির হাতে সেই উপহার দিয়ে চোরের মতই পালিয়ে এসেছিল আব্বাস আলী। আসার পর যাতনা বেড়েছে জ্বালা বেড়েছে। নির্মম আক্রোশে সবকিছুই যেন সংহার করতে চেয়েছে সে।

একটানা কেটেছে আরো আঠার-উনিশ বছর। ছেলে মস্ত হোমরাচোমরা চাকুরে

হয়েছে শুনেছ। কিছুকাল আগে ছেলের বউটাও মরে গেছে শুনেছে। আমিনার দিদি আর তার স্বামীও মরেছে। কিন্তু আব্বাস আলীর আর কোনো কিছুতে তাপ-উত্তাপ দেখা যায়নি। বয়েস সত্তর ছুঁতে চলল। তখনো তাজা জোয়ানের মতই তাগদ তার। সেটা বোঝা যেত যখন ক্বচিৎ কখনো কোনো দম্পতির বিশেষ কোনো হাবভাবে অজ্ঞাত কারণেই ধমনীর রক্তে আগুন লাগত তার। সেই দম্পতি নিখোজ হতই। বয়েসের তুলনায় বরং তখন অনেক বুড়ো, অনেক স্থবির হয়ে গিয়েছিল তার পাপের সাথী আব্দুল। একটা মেয়েরও ভালোমত মুখ চাপা দেবার শক্তি ছিল না তার।

আব্বাস আলীর দেহের সমস্ত রক্তে আগুন লেগেছিল আর একবার।

সেই শেষবারের মত নিখোজ হয়েছিল আর একটি দম্পতি। মেয়েটার লীলা-চাঞ্চল্য দেখে আব্বাস আলীর হঠাৎ যেন ধাঁধা লেগে গিয়েছিল পুরুষটাকে যমুনার গহ্বরে ছুড়ে ফেলার পর সেই মেয়েটার বুক থেকে ঝকমকে নেকলেসটা ছিনিয়ে নেবার সময়ও আবছা অন্ধকারে মনে হয়েছে আমিনাই যেন বোবা ত্রাসে চেয়ে আছে তার দিকে। হঠাৎ ভুল করে প্রায় বুকেই টেনে নিতে গিয়েছিল তাকে আব্বাস আলী। তারপর আগুন জ্বলে উঠেছিল। সেই আগুনে এতকালের জমাট-বাধা দাহ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠারও সময় পায়নি মেয়েটা।

কিন্তু আর্তনাদ করে উঠেছিল আব্বাস আলী নিজে। অন্ধকারে হাতের মুঠোর নেকলেসটা দেখতে গিয়ে। সহসা হাতটা যেন ঝলসে গেছে তার। নেকলেসটা মাটিতে পড়ে গেছে হাত থেকে। আব্দুল সেটা কুড়োতে গিয়ে তার হাতের ধাক্কায় মুখথুবড়ে পড়েছে তিন হাত দূরে। নেকলেস আবার আব্বাস আলীই কুড়িয়েছে। সেটা জেবে ফেলে টলতে টলতে ঘরে এসেছে

ঘরের আলো জ্বেলেছে। থর-থর হাতে জেব থেকে নেকলেস বার করেছে। হীরে বসানো নেকলেস। পিছনে সোনার পাতে খোদাই করা— 'আব্বাজান'। আহত নেকড়ের মত অতীতের জাল ছিন্নভিন্ন করে কি দেখছিল আব্বাস আলী? কি খুঁজছিল? তার ছেলের প্রথম সন্তান মেয়েই বটে। শুনেছিল। আব্বাস আলী শুনেছিল।

ঠিক দশ দিন বাদে দিনের আলোয় তাজমহলে এসেছিল যে স্থবির বৃদ্ধ, তাকে দেখে অবাক হয়েছিল অতি পরিচিত জনেরাও। দিল্লীর এক মস্ত অফিসারের তলব পেয়ে এসেছিল আব্বাস আলী। সেই অফিসারের সামনে কুর্নিশ করে দাড়িয়েছিল। তাকে দেখেই আব্বাস আলী চিনেছিল। কেমন করে চিনেছিল জানে না। খোদার মারে চিনেছিল বোধহয়। তিন বছরের একখানি শিশুমুখ কল্পনাও করা যাচ্ছিল না, তবু দেখেই চিনেছিল আব্বাস আলী। অফিসার বলছিল, তার মেয়ে-জামাইয়ের পাত্তা নেই ক'দিন ধরে। আগ্রায় আসার কথা ছিল তাদের—এখানে কেউ তাদের দেখেছে কি না। মেয়ের ফোটো বার করে দেখিয়েছিল সে।

আব্বাস আলী কোনো জবাব দিয়েছিল কিনা মনে নেই, ছবিটা দেখেছিল কি না তাও মনে নেই। আব্বাস আলীর চেঁচিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছিল, কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল। কিছুই করেনি। কন্যাহারা

অফিসাবেব মুখেব দিকে ফ্যালফ্যাল কবে চেযে ছিল শুধু।

সেই এক বাতে কিছুক্ষণেব জন্য শুধু দেহেব শক্তি ফিবে পেযেছিল আব্বাস আলী। কোনো দম্পতি নয়, একটি মাত্র লোককে ওই কার্নিসেব ধাবে ভুলিযে এনে যমুনায আছড়ে ফেলেছিল। তাব পাপেব সাথী আব্দুলকে।

তাবপব ওই কার্নিসেব ওপব নিজে উঠে দাড়িযেছিল নিজেকে বিনাশ কবাব জন্য।

কিন্তু নেমে এসেছে আবাব। আব্দুল মবেছে, তাব পাপ ওব মত অত নয বলে খোদাতালা দযা কবেছে তাকে। কিন্তু আব্বাস আলী আত্মহত্যা কবলে সবই তো শেষ হযে গেল। একদিনে মবলে তো সবই শেষ হযে গেল।

বেচে থেকে প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে মবাব জন্য যমুনাব কার্নিস থেকে আবাব নেমে এসেছিল আব্বাস আলী

বাত কত হুস নেই। আমবা নিস্পন্দ। হঠাৎ সমস্ত শবীবে যেন ঝাকুনি লাগল একটা। সামনে দাড়িযে চাচা বক্স। লোলচর্মে বলীবেখাব হিজিবিজি, কোটবাগত দুই চোখ শর্মিলাব বুকেব নেকলেসটাব ওপব। গবম চাদবটা সবে গেছে শর্মিলাব খেযাল নেই। আচ্ছন্নেব মত বসে আছে সে।

আমি নড়েচড়ে উঠতে চাচা বক্স ঘুবে তাকালো। তাবপব পযসাব জন্য শীর্ণ একখানা হাত বাড়িযে দিল আমাব দিকে।

কত দিলুম, কি দিলুম জানিনে। পযসা নিযে সে প্রস্থানোদ্যত হতে প্রায চেচিযেই জিজ্ঞাসা কবলাম, কিন্তু তেমাব নাম কী?

বুড়ো ঘুবে দাড়াল। ঘোলাটে চোখ মেলে দেখল একবাব। জবাব না দিযে এগিযে গেল একটু। তাবপব আবাবও ঘুবে দাড়াল। বলল, আমাব নাম চাচা বক্স।

খুক খুক কবে কাশতে কাশতে এগিযে চলল সে। কাশি কি চাপা হাসি সঠিক বোঝা গেল না। কোমব-ভাঙা শ্লথগতি কুব্জ দেহটা আবছা অন্ধকাবেব সঙ্গে মিশে যেতে লাগল।

কান্না

সমযমত অঞ্জলি একটুখানি কাদতে পাবল না বলে নিখিলেশেব সমস্ত জীবনটাই যেন বিষিযে গেল। এতদিনেব এত তোড়জোড়, এত পবিশ্রম, এত সাধ্যসাধনা সব ব্যর্থ। অঞ্জলি একটুখানি কাদতে পাবল না মনেব মত কবে। এমন ঢালা সুযোগ পেযেও পাবল না। এটুকুব আড়ালে অজস্র হাসিব সম্ভাবনা ঝলমল কবে উঠেছিল নিখিলেশেব চোখেব সামনে। আব তাব চিহ্নমাত্রও থাকল না। কালোয কালো হযে গেল সব কিছু।

একমাত্র সম্বল দেড়শ টাকা মাইনেব আপিস কামাই কবেছে দিনেব পব দিন। গলিব মোড়েব দোকানে এ-পর্যন্ত কম কবে পনেব টিন দামী সিগাবেটেব ধাব জমেছে। দিনেব পব দিন গিযে ধবণা দিযেছে সাত মাইল দূবে টালিগঞ্জেব স্টুডিওতে। সহপাঠী

সহকারী পরিচালককে শেষে একদিন ট্যাক্সি করে বাড়িতে এনে আপ্যায়ন করেছে পর্যন্ত। তারপর স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু লঙ্কা ভাগই সার হল কালনেমির।

উদ্দেশ্যটা নিখিলেশ স্ত্রীব কাছে ব্যক্ত করেনি প্রথম। স্টুডিও থেকে এক-একদিন ঘুরে এসে দশখানা করে গল্প করেছে শুধু। অঞ্জলি ছেলেমানুষ। মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছে সেখানকার কাণ্ডকারখানা। কখনো আবার খুব হেসে উঠেছে। সেদিন বলল, অত ঘন ঘন যাও যে, তোমার দিকে নজর টজর দেয় না তো ওই মেয়েগুলো?

ইচ্ছে করেই প্রশ্রয় দেয় নিখিলেশ, দিলেই বা—।

—ওমা! আমি তাহলে কোথায় যাব গো?

—তুমিও আর কারো দিকে নজব দেবে।

—ধেৎ! নাসিকা কুঞ্চিত করে ফেলে অঞ্জলি।

—তোমাকেও নিয়ে যাব একদিন, দেখো'খন কি ব্যাপাব। নজর আব ওদেব দিতে হয় না, রাজা-মহারাজা পায়ের তলায় গড়াগড়ি গেলেও ফিরে তাকায় না পর্যন্ত। অতঃপর নায়িকা-জীবনের সার্থকতার প্রসঙ্গে বঙ চড়ানো শুরু হয়ে যায়।

স্টুডিও দেখতে যাবে এই আনন্দে আটখানা হয়ে উঠল অঞ্জলি। খবরটা অন্যান্য ভাড়াটে দিদিদেব কাছে বলতে না পারা পর্যন্ত ছটফটানি যাবে না। দিদিবা সবাই ভালোবাসেন তাকে। কিন্তু ছেলেমানুষ বলে আবাব একটুখানি মুরুব্বিয়ানার ভাবও আছে। ক'দিন ধরে দুপুরের মজলিশে স্টুডিওর গল্প ফেঁদে অঞ্জলি তাঁদের বিস্ময় ও কৌতূহলের ফাঁক দিয়ে অনেকটাই যেন সমপর্যায়ে উঠেছে।

নিরিবিলি অবকাশে সহকাবী-পরিচালক বন্ধুব কাছে নিখিলেশ সসঙ্কোচে প্রস্তাবটা উত্থাপন করল একদিন। বন্ধু চুপচাপ বসে নিখিলেশেব কেনা টিনের সিগারেট টানল খানিকক্ষণ। তাবপর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, তোব বউ দেখতে কেমন?

বিনয়েব ব্যাপার নয়। গম্ভীর মুখে নিখিলেশ সংক্ষিপ্ততব উত্তর দিল, ভালো—।

—কি করে জানলি?

—রাস্তায় নিয়ে বেরুলে লোকে ঘন ঘন তাকায়।

—সে আজকাল অভ্যেসেও তাকায়।

—তা একবার এসো না আমার বাড়ি—লোকে তো বন্ধুব বউয়ের সঙ্গে একটু-আধটু আলাপ-পবিচয় করে. কিন্তু তুমি একেবাবে বর্জন করেছ।

আবাব একটা সিগারেট ধরিয়ে বন্ধু নিস্পৃহ জবাব দিল, একদিন এসে নিয়ে যাস, যাব'খন।

কিন্তু এমনটি দেখবে বন্ধু ভাবেনি। পঙ্কজপদ্ম। পাড়াগাঁয়ে জামরুল গাছে পেয়ারা গাছে উঠে, পুকুরে সাঁতার কেটে আর পড়ার সময় হাই তুলে যে-মেয়ে বড় হয়েছে তার মধ্যে প্রাণের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য কিছু থাকবেই। দেহ-সৌষ্ঠবের সঙ্গে সেটুকুর যোগাযোগ বিশেষ নয়নাভিরাম।

বন্ধু খুঁটিয়ে দেখতে লাগল অঞ্জলিকে। নিখিলেশ ভাবল, চলবে কিনা দেখছে। অঞ্জলি প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল একটু। দুরন্ত শিশু অপরিচিতের সান্নিধ্যে এলে হঠাৎ

যেমন বোবা হয়ে যায় প্রায় তেমনি। কিন্তু কতক্ষণ আর সঙ্কোচ! হেসে উঠল এক সময়।—দেখছেন কি, আমাকেই ধরে সিনেমায় নামিয়ে দেবেন নাকি?

বন্ধু খানিক চেয়ে থেকে হেসে জবাব দিল, দিতে পারি, আপত্তি আছে?

চোখ বড় বড় করে অঞ্জলি সোজাসুজি তাকালো তার দিকে। —নায়িকা হব? রাজা-মহারাজা পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাবে? তাহলে তোমার অবস্থা কি হবে গো? শেষেরটুকু নিখিলেশের উদ্দেশে। তাবপর বেদম হাসি।

নিখিলেশ লজ্জা পেয়ে গেল। কিন্তু বন্ধুর মুখেব দিকে চেয়ে খুশিই হল।

বাইরে এসে বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, তোব বউ লেখাপড়া কদ্দূব করেছে?

নিখিলেশ আমতা আমতা করে জবাব দিল, লেখাপড়াটা তেমন—বাড়িতে যা একটু-আধটু—

বন্ধু মনে মনে বলল, এর ওপর আবার লেখাপড়াব জোর থাকলে তোমার মত ইয়ের গলায়ই বা ঝুলবে কেন? কিন্তু বাজাবের হাল জানে বন্ধু। তাব এবাবের আগ্রহটা মিথ্যে নয়। বলল, এই বইটার তো শুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে, পার্ট-টার্টও সবই প্রায় সিলেকটেড, এত দেরিতে বললি...। বন্ধু চিন্তিত।—পার্ট একটা অবশ্য আছে এখনো...কিন্তু তোর বউ পারবে না, বেজায় হাসে—।

নিখিলেশ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি রকম পার্ট?

—ছোট্ট এক সিনের একটা রোল। ছোট হোক, বড হোক নেমে পড়া ভালো, দশজনের চোখে পড়লেই পাচজনে ডাকাডাকি কবে। আমি ডিরেক্টাবকে বলে দেখতে পারি—কিন্তু রোলটা ভয়ানক কান্নার, তোর বউ কাঁদতে পারবে?

ভিতরে ভিতরে রোমাঞ্চ অনুভব করেছে নিখিলেশ। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, তা আব পারবে না কেন, যেমন বলবে তেমনি কাঁদবে, কান্নারই তো জীবন মেয়েদের—। আর কথা খুঁজে পেল না।

বন্ধু বলে গেল, অমুকদিন স্টুডিওতে নিয়ে আসিস, ডিরেক্টাবেব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

যে ধরনের পার্ট অবশিষ্ট আছে, পবিচালকরা সাধারণত যাকে-তাকে ধরে সেটুকু করিয়ে নেন। কাজেই বন্ধু জানত বেগ পেতে হবে না। এটুকু কাজের জন্য এবকম একটি মেয়ে বাড়তি আকর্ষণ।

অঞ্জলিকে দেখেই পরিচালক ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ অনুমোদন করলেন। সহকারী-পরিচালক বন্ধু নিখিলেশের সিগাবেটের টিনটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, এখন বাড়ি যা, তাবিখ পরে জানাবো আর পার্টও বুঝিয়ে দিয়ে আসব'খন।

অঞ্জলির ধারণা স্টুডিও আব শুটিং দেখতে এসেছে। কথাবার্তা শুনে একেবারে হকচকিয়ে গেল। ট্রামে জিজ্ঞাসাবাদের সুবিধে হল না। আড়চোখে এক-একবার চেয়ে দেখে, মানুষটা আনন্দে যেন বিভোর হয়ে আছে।

বাড়ি ফিরেই শুনল সব। বুঝলও। কিন্তু তবু দুর্বোধ্য বিস্ময়ে হাঁ করেই রইল খানিকক্ষণ। হঠাৎ তারপর হাসতে হাসতে বসে পড়ল একেবারে।—আমি সিনেমায় নাববো কি গো!

নিখিলেশ গম্ভীব মুখে বলল, ওই হাসি বেখে এখন কান্না প্র্যাকটিস কবো।

অঞ্জলি ঘাবড়ে গেল, তুমি সত্যি বলছ নাকি?

—না, এতদিন ধবে এতসব কবলাম ইয়াবকি কবতে।

সহকাবী-পবিচালক বন্ধু এসে পার্ট বুঝিয়ে গেল। আদর্শবাদী নাযকেব মিথ্যে মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে স্তব্ধ তাব সাহায্য-মুখাপেক্ষী অন্তবঙ্গজনেবা। সেই নিদারুণ স্তব্ধতা খান খান হয়ে যাবে নাযকেব একমাত্র অনাথা ভগ্নীব আর্ত হাহাকাবে। অঞ্জলি সেই অনাথা ভগ্নী। তাকে আছড়ে পড়ে কাঁদতে হবে।

অঞ্জলি ক'টা দিন ধবে অনেক হাসল, অনেক বাগ কবল, অনেক অনুনয় কবল আব সবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বাজিও হল। দিনবাত নিখিলেশ এক মন্ত্র কানে দিচ্ছে তাব, সত্যিকাবেব কান্না কাকে বলে একবাব দেখিয়ে দাও। সকলেব বুকেব ভিতবে একেবাবে যেন কেটে কেটে বসে যায়। কান্না অভ্যাস কবাব জন্য দেয়ালে একটা বড় আয়না ফিট কবে দিল সে। কিন্তু কাঁদতে গিয়ে বেশিব ভাগ হেসেই ফেলে অঞ্জলি, ঠিকমত কাঁদতে পাবে না বলেই কান্না পেয়ে যায়।

শুটিংএব দিন এগিয়ে আসে। অঞ্জলিব অস্বস্তি বাড়ে। নিখিলেশ তাকে চুপ কবে থাকতে দেখলে বকে, নার্ভাস হচ্ছ কেন? হাসতে দেখলে বকে, হাসি বেখে শোকেব কথা ভাব, কান্নায় কি কবে পাথব ভেজে তাই চিন্তা কবো।

কিন্তু অঞ্জলিব ভালো লাগে না কিছু। নিখিলেশ ভবিষ্যতেব আশায় বিভোব। সেও যেন পবপুরুষেব দৃষ্টি নিয়েই অষ্টপ্রহব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তাকে।

সেই দিন।

শ্যেন দৃষ্টিতে নিখিলেশ স্ত্রীব বেশবিন্যাস পবীক্ষা কবে নিল। জোব কবে মুখে সহজ হাসি ফুটিয়ে অঞ্জলি স্বামীব সঙ্গে বেবিয়ে পড়ল। কিন্তু স্টুডিও ফটকেব এধাবে এসে পা আব চলে না। বুকেব ভেতবটা কাঁপছে কেমন। লোক আসছে, যাচ্ছে। সকলেই এক নজব দেখে নিচ্ছে তাকে। আব অঞ্জলিব গায়ে যেন একটা ক'বে হুল বিঁধছে।

সহকাবী পবিচালক বন্ধু মুগ্ধ চোখে তাব সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। —গ্র্যাণ্ড। চলুন একেবাবে সোজা মেকআপএ। কাঁধে হাত দিয়ে সে আব একদিকে নিয়ে চলল তাকে। অঞ্জলিব মনে হল কাঁধটা যেন দেহ থেকে আলগা হয়ে গেছে।

অভিনয়েব বেশবাস পবা হতে এলো মেকআপ ম্যান। পান খাওয়া মুখ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় বাবড়ি চুল। পবনে আধময়লা পা'জামা। গায়ে গেঞ্জি। ঢ্যাঙা, বোগা। বঙ এবং প্রসাধনেব সামগ্রী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই অঞ্জলিব মুখ শুকালো আবাব। অবস্থাটা উপলব্ধি কবেই হয়ত মুচকি হেসে তাব কাজ কবে গেল মেকআপ-ম্যান। সাবাক্ষণ অঞ্জলি একেবাবে কাঠ।

তাবপব শুকনো আড়ষ্ট একখানি জড়পদার্থেব মত ফ্লোবে এসে দাঁড়াল সে। আব একদফা দেখা শুরু হল তাকে। যাবা শুটিং দেখতে এসেছে তাবা দেখল। কর্মকর্তাবা দেখল। আব যাবা অভিনয় কবতে এসেছে তাবা দেখল। এমন কি নিখিলেশও তাদেব চোখ দিয়েই দেখতে লাগল ওকে। নিজেব অজ্ঞাতে বাব বাব পবনেব

শাড়িটা হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিচ্ছে অঞ্জলি। বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করছে।

পরিচালক বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে কাঁদতে হবে। সেট্‌এ দাঁড় করানো হল তাকে। জোরালো আলোর বন্যায় সহসা যেন দিশেহারা হয়ে গেল অঞ্জলি। চিত্রশিল্পী ক্যামেরায় মুখ লাগালেন। পরিচালক হাঁক দিলেন, সাইলেন্স! মনিটার! নিন কাঁদুন—।

মনিটার অর্থাৎ একবার মহড়া দেওয়া। অঞ্জলি চমকে উঠল প্রথম। অত আলোর বাইরে কাউকে সঠিক দেখতে পাচ্ছে না। পা দু'টো কাঁপছে ঠক ঠক করে। বসে পড়ার কথা—বসেই পড়ল। শুকনো জিবে করে রঙকরা ঠোঁট ঘষে নিল বার দুই, কিন্তু তারপর আর কিছুই করে উঠতে পারছে না।

—লাইটস অফ! খট করে আলো নিভতে লাগল। পরিচালক এগিয়ে এলেন। —ভয় কি, আপনি কোনোদিকে তাকাবেন না, কাঁদতে বললেই একেবারে দাদা গো বলে আছড়ে পড়বেন।

অঞ্জলি একটুখানি হাসতে চেষ্টা করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, একটু জল—

জল এলো। মেকআপ-ম্যান আবার ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে দিয়ে গেল। গালে গ্লিসারিনের অশ্রুধারাও।

—সাইলেন্স। লাইটস অন। কাঁদুন—!

অঞ্জলি এবারে ধুপ করে বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢাকল, কিন্তু কান্না আর বেরোয় না। যাও বেরুল তাকে কান্না বলে না।

—লাইটস অফ! পরিচালক ঈষৎ বিরক্ত হয়েই এগিয়ে এলেন আবার।—আপনি মরা-কান্না দেখেন নি কখনো? ঠিক সেই রকম কাঁদতে হবে। ডাক ছেড়ে কান্না। তারপর উবুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদবেন।

অদূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে নিখিলেশ। তার বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।

—কাঁদুন এবার।

এক ধরনের আর্তনাদ করেই মাটিতে লুটালো অঞ্জলি। প্রাণপণে কাঁদতেও চেষ্টা করল তারপর। কিন্তু সে কান্না দেখে আর শুনে হাসির গুঞ্জন উঠল এদিক ওদিক থেকে।

শুধু নিখিলেশেরই কান্না পাচ্ছে।

—কাঁদুন! আবার হাঁক দিলেন পরিচালক।

এবার ব্যাঘাত ঘটালো শাড়ির আঁচল। মরিয়া হয়েই শুরু করেছিল অঞ্জলি। কিন্তু বুক থেকে ওটা খসে পড়তেই তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেল। আর্তনাদে এবং ভূ-লুণ্ঠনে বেখাপ্পা ছেদ পড়ে গেল ত্রস্ত বসন-সংবরণের প্রয়াসে। মর্মান্তিক দৃশ্য। স্পষ্টতর হল সুটিং-দর্শকদের হাস্যগুঞ্জন।

নিখিলেশের বুকের ভিতরে মরুভূমির শুকনো টান ধরেছে।

পরিচালকের মেজাজ বিগড়োতে শুরু করেছে। কান্নার আবেদন কেমন হবে বুঝতেই পারছেন। ক্যামেরার আবেদনটুকুই ভরসা। ধমকে উঠলেন, অত লজ্জা করতে হলে সিনেমায় নামা হয় না। ভাই মরে গেলে শাড়ির আঁচল টাইট করে বেঁধে নিয়ে কেউ কাঁদতে বসে না—ওটা ওভাবে খসেই পড়বে।

আবো পাঁচ-সাতবাব মহড়া দেবাব পব পবিচালক হাল ছাড়লেন। দূব থেকে নিখিলেশ যেন প্রাণেব দায়েই ভাবে-ভঙ্গিতে নিঃশব্দে কান্নাটা প্রম্পট কবে দিতে চায়। কিন্তু বসন বিস্রস্ত হবাব সম্ভাবনায আবো আড়ষ্ট এবং কাঠ হয়ে অঞ্জলি হাসিব উদ্রেকই কবল বাব বাব।

পবিচালক ঘড়ি দেখলেন। অনেক সময নষ্ট হযেছে। বললেন, আচ্ছা, আব একদিন চেষ্টা কবা যাবে. আজ থাক, আপনি যান—।

ওটা যে মুখেব কথা সকলেই জানে। অঞ্জলি প্রস্থান কবে বাচল। পবিচালক তাব সহকাবীব দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন এবাব, অর্থাৎ খুব অ্যাকট্রেস এনেছ—। নিখিলেশকে সামনে পেয়ে রুক্ষকণ্ঠে বললেন, ভাই মবলে কি কবে কাদতে হয এটুকু ঠিক কবে আনতে পাবেন নি,

সব থেকে বড ঝড়টা সকলেব অজ্ঞাতে নিখিলেশেব ওপব দিযেই বযে গেছে। তবু আশা মবীচিকা। ঢোক গিলে বলল, ওব বোন ভা—ভাই নেই মানে আমাব শ্বশুব মহাশযেব সব ক'টিই মেযে কিনা সেই জন্যই বোধ হয ফিলিংটা ঠিক

পবিচালক ঝাঁঝিয়ে উঠলেন. ছেলেও গোটাকতক থাকা উচিত ছিল একটি দু'টি ভাইযেব শোকে আপনাব স্ত্রীকে কাদানো সহজ নয।

বাড়িব পথ।

ট্রামেব ভিন্ন সীটএ অন্যদিকে মুখ ঘুবিযে বসে আছে নিখিলেশ। অঞ্জলিব মুখে এব পবেও যে হাসিব মত দেখা যাচ্ছে সেটাই সব থেকে বেশি অসহ্য লাগছে এখন। বাড়িব গলিতে এসে থমথমে মুখে মোড়েব দোকান থেকে সিগাবেট কেনাব জন্য দাড়াল সে। সঙ্গে দূবেব কথা. এই দুনিযাতেই যেন তাব কাছাকাছি আপন বলতে কেউ নেই। অঞ্জলিও থামল একটু। তাবপব পাযে পাযে বাড়িব দিকে চলে গেল।

নিখিলেশ সেখানেই দাড়িযে দাড়িযে সিগাবেট টানল একটা। আব একটাও ধবাল। কিন্তু ভালো লাগল না। এ জগতে ভালো লাগাব মত আব কিছু নেইও তাব। সিগাবেট ফেলে দিযে ধীব গম্ভীব মুখে বাড়ি ঢুকল।

ঘবেব দবজা ভেজানো। ঠেলতে খুলে গেল। তাবপবেই একেবাবে স্তব্ধ, নির্বাক সে। মেঝেতে উবুড হযে পড়ে অঞ্জলি কাদছে। মর্মবিদাবী কান্না। সমস্ত দেহ ফুলেফুলে উঠছে মুহুর্মুহু। ওই পোষাকি শাড়িব আচল মুখে একবাশ গুজে দেওযা সত্ত্বেও অব্যক্ত কান্নাব শব্দ গুমবে গুমবে উঠছে। পাথব গলানো কান্না। এ কান্না যেন আব শেষ হবে না।

হা কবে দেখছিল নিখিলেশ।

হঠাৎ বুকেব ভেতবটা চড়চড় কবে উঠল তাব। নিবিড যাতনায যেন মোচড দিযে উঠল, হু হু কবে উঠল।

অঞ্জলিব কান্না দেখে নয।

অঞ্জলি অমন কাদতে পাবে দেখে।

পার্বত্য

দড়ির ফাঁস লাগানো বাইরের দরজাটা ঠাস করে ফেলে দিয়ে আবারও শয্যায় গিয়ে বসল মায়লী। দরজা ফেলে দিয়ে গোটা দুনিয়া থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন কবে নিতে চাইল একেবারে। কিন্তু পারা গেল না। অসহিষ্ণু ক্ষোভে থমথমে মুখ।...লোকটার আসার সময় উৎরে গেছে। এরপর কখন ফিরবে ঠিক নেই। দরজা কতক্ষণ খুলে রাখবে? কোথাও এতটুকু ফাঁক পেলেই শীত একেবারে হাড়ের ভিতরে সেঁধোয়। তাছাড়া চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব। শুধু চুরি করতেই আসে না, ফাঁক পেলে অন্য লোভেও গৃহস্থঘরে হানা দেয়।

মায়লীর ভয়ডর নেই বড়, তবু মেয়েমানুষ তো। মেয়েদের ইজ্জতের বালাই নেই এই পাথুরে দেশে। তারা বহুস্বামিক, বহুবল্লভা। মায়লীও এ দেশেরই মেয়ে। ইজ্জতের মর্ম তার চোখেও সারমর্ম নয় জীবনের। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মোহ আছে। সুবাসক্ত পুরুষগুলোর পিচ্ছিল আকর্ষণ থেকে নিজেকে আগলে রাখার মধ্যে ভারী একটা আনন্দ আছে। তুষার-ছাওয়া বৃষ্টিঝরা ছোট্ট এই পার্বত্য নগরের অনেক মরদের বুকেই মরু-দাহ উপলব্ধি করেছে সে। করে অন্তর্তুষ্টিতে ভরে উঠেছে। এই স্বাতন্ত্র্যেব মূলে ছেলেবেলায় এক বুড়ো পাদ্রীর সাহচর্য। বুড়ো বড ভালবাসত ওকে। তাব কথা আর উপদেশ মায়লীয় একবর্ণও মনে নেই এখন। কিন্তু তাব প্রচ্ছন্ন প্রভাবটুকু আছে। তাব আত্মবোধের অনুভূতি নিজের অগোচরেই বড় হয়ে উঠেছে। আর কোনো কাবণে না হোক, শুধু এই ব্যতিক্রমের দরুনই বোধহয় ঘাসার সমস্ত মেয়ে-পুরুষ চেনে মায়লীকে।

চেনে সাম সিংও। চিনেও বার বার ভুল করে...আগে করত না, এখন কবে। করছে। এখানকার সমাজ-রীতিতে সেটা অস্বাভাবিক নয় কিছুমাত্র। বরং খুব স্বাভাবিক ব্যাপার—জুয়া মদ আব পরনারীতে আসক্তি। জুয়া অল্প-বিস্তর সব পুরুষেই খেলে। মদও মেয়ে-পুরুষ সবাই খায়। বরফ-ঢাকা পাহাড়েব দেশে মদ ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। এ দুটোর জন্যে মায়লীর আপত্তি নেই ততো। শুধু বাড়াবাড়ি করে বলেই আপত্তি। কিন্তু তৃতীয় ব্যাপারটাই মায়লী বরদাস্ত করে উঠতে পারে না কিছুতেই। আব সব পুরুষ যেমনই হোক, তাদের তো ঘবে বউ নেই মায়লীব মত। আর যে যায যাক, সবাই যাক, সাম সিং যাবে কেন?...রাত বাড়ছে, এখনো দেখা নেই যখন, নিশ্চয় সেই বজ্জাত মেয়েটার কাছেই গেছে।...বল্লার কাছে গেছে।

আজানু মোষের চামড়ার ঢোলা বসনের ভিতরে পা গুটিয়ে পাশের কম্বলটা টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে বসল মায়লী। রাগের জ্বালায় শীতও মনে থাকে না সবসময। একটু তফাতে অসাড়ে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা। দুখানা কম্বলের নিচেও কুঁকড়ে আছে। কান-ঢাকা টুপির বাইরে শুধু মুখের চাব আঙুল চোখে পড়ল মায়লীর। এই কিছুক্ষণ আগে মেরেধরে একরকম জোর করেই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে ওটাকে।...বাপকে জব্দ করার জন্যেই শুধু। ঘরে ফিরে ছেলে জেগে আছে দেখলে ভারী খুশি হয় সাম সিং। লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপিতে ঘর কাঁপে। বাপ ঘরে না ফেরা পর্যন্ত বাপ-সোহাগী ছেলেকে শোয়ানো দায়।

ঘাড় ফিরিয়ে অদূরে মেঝেরে দিকে তাকালো মায়লী। বাপ ছেলের হৈ-হুল্লোড়ের সঙ্গীটিও ঘরেই আছে। নধর-কান্তি মাঝারি একটা ভেড়া। ধপধপে শাদা আর কুচকুচে কালোয় মেশানো। সর্বাঙ্গে শাদা আর কালোর কারুকার্য। ছেলের প্রাণের সহচর ওটা। ফলে বাপেরও প্রায় তাই। গোড়ায় গোড়ায় মায়লী ঠাট্টাও করত, ছেলে কোনটা বোঝা দায়।

কম্বলের নিচেও হঠাৎ গায়ে কাঁটা দিল মায়লীর। শীত করছে। ছেলেটাও শীতে কুঁকড়ে গেছে আরো। ঘরের কোণের দিকে চোখ পড়তে দেখল হাঁড়ির আগুন কমে এসেছে। উঠল। আগুনের কাছে যেতে গিয়ে বাধা পড়ল। পায়ের কাছেই ভেড়াটা শুয়ে। বেশ জোরেই একটা লাথি বসিয়ে দিল মায়লী। এরকম ব্যবহারের জন্য ভেড়াটা প্রস্তুত ছিল না। ধড়ফড়িয়ে উঠে সবে গেল ওটা। মায়লী আগুন ঠিক করল। উঠে দাঁড়াতেই দেখে ভেড়াটা পায়ের কাছে সরে এসেছে আবারও। দ্বিতীয় বারের পদাঘাতে জীবটি যেন কর্ত্রীর মেজাজ বুঝেই ঘরের এক কোণে সরে গেল।

মায়লী কম্বল মুড়ি দিয়ে বসল আবার। মোষ ছাগল ভেড়ার পাল আর মুরগীর দঙ্গল যথাস্থানে আটক করে ভোজী বিদায় নিয়ে গেছে, সেও কম ক্ষণ হল না। মায়লীর অন্তত মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ। ভোজী ঠিক চাকর নয়, সাম সিংয়ের সহকর্মী বলা যেতে পারে। এ তল্লাটে সাম সিং নামকবা পশু-ব্যবসায়ী। ভোজী তার ডান হাত। আড়তের প্রতিটি পশু-বৃত্তান্ত তার নখদর্পণে। প্রৌঢ় হলেও যেমন স্বাস্থ্য তেমনি কর্মঠ লোকটা। সাম সিংয়ের তো কথাই নেই, মায়লীও পছন্দই করে লোকটাকে। তবে বোকা ভাবে ওকে। জ্ঞান-গম্যি কম, একমাত্র টাকা ছাড়া কিছু জানেও না বোঝেও না। চেনে শুধু টাকা। একটা ভেড়া একটা ছাগল বা একটা মুরগী বিক্রির পাইপয়সা পাওনাগণ্ডা নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে হাতাহাতি মারামাবি পর্যন্ত করতে দেখেছে ওকে।

মায়লীর হাসি পায়, সাম সিংকে একটু ঈর্ষাতুর করে তোলার জন্য এই ভোজীর প্রতিই কত সময় না প্রীতিবর্ষণ করেছে সে। সাম সিং রগড় ভেবে হেসেছে, তাব সঙ্গে সঙ্গে হেসেছে ওই বুদ্ধিহীন লোকটাও। আব রাগের মাথায় মায়লীর ইচ্ছে হয়েছে, কতগুলো টাকা গলিয়ে ওকে গেলায়।

যাবার আগে এই ভোজীই খবর দিয়ে গেছে, কাজের শেষে সাম সিং গেছে সরাইখানার দিকে। খবরটা এমন কিছু নয়, আগেও যেত। কিন্তু আগে রাগ করত না মায়লী—ঘরে অত যোগাবে কে? মরুয়া তো সবাই খায়, কিন্তু এত খায় কি করে, তাই বরং ভাবত মায়লী। কিন্তু বাগ যে করত না, বরং খুশি হত, তার আর একটা কারণ, মরুয়ার তৃষ্ণা মেটার পরেই আর এক তৃষ্ণায় সরাসরি ঘরে চলে আসত সাম সিং। লোকটার সব কিছুতেই যেন একটা বেপরোয়া ব্যাপার।

কিন্তু ইদানীং সরাইখানা থেকে উঠে সরাসরি সে আর ঘরে আসে না বড়। ওই পাজী বেইমান মেয়েটার কাছেই যায় নিশ্চয়। হতচ্ছাড়ী বল্লার কাছে। মায়লী শুনেছে সেকথা। শুনে প্রথম প্রথম অবাক হয়েছে, বিশ্বাসও কবেনি। নিজের সম্বন্ধে এখনো কম সচেতন নয় মায়লী। এখনো তার যা আছে, সে আর কার আছে? আর সাম সিং শুধু ভালোবাসে না ওকে, শ্রদ্ধাও করে। ওর মত অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানে

এ-তল্লাটে আর একটি মেয়েও আছে এমন! ওর রুচিবোধ প্রায় তো গর্বের বিষয় ছিল সাম সিংয়ের কাছে। তবে ওই পাজী মেয়েটা ওকে গুণ করল কি দিয়ে? কেমন করে?

মায়লী রেগে আগুন হয়েছে এক-একদিন। ঝগড়া করেছে। পরে বিক্ষোভের জ্বালায় ভেবেছে, আসলে মানুষটার ধাতই নিচুস্তরের—এত ভালো সইবে কেন! মুখের ওপর এক-একদিন বলেও বসে সে-কথা। কিন্তু এ-বেলায়ও আবার তেমনি বেপরোয়া ভাব সাম সিংয়ের। ভ্রূক্ষেপও করে না। কখনও হাসে, কখনও বা দাবড়ানি দেয় উল্টে। তারপর ছেলে আর ওই শাদাকালো ভেড়া নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে।

অথচ সাম সিংয়ের এই দুরন্ত বেপরোয়া স্বভাবই ছিল মায়লীর সব থেকে বড় আকর্ষণ। ও এই রকম বলেই নাতিশীতোষ্ণ পুনখা থেকে তুষারাবৃত ঘাসায় এসেছে ঘর করতে। এক নগর থেকে অন্য নগর দৃষ্টির নাগালেব মধ্যে হলেও উচ্চতার তারতম্য হেতু আবহাওয়ায় রাতদিন তফাত। অবশ্য সাম সিংযের ঘরে না এলে এই ঘাসারই আর একজনের ঘব করতে হত মায়লীকে। কিন্তু তাহলে ঘাসায় আসতে হত না—সেই লোকটাকেই স্বচ্ছন্দে টেনে নিয়ে যাওযা যেত পুনখায়।...মোয়াংদি। সোনাম মোয়াংদি। ঘাসার এক ঠিকাদারেব ছেলে মোয়াংদি। সাম সিংএর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তারও পশুর ব্যবসা। কিন্তু অতবড় নয় সাম সিংএর মত। তবু ঠিকাদারের ছেলে বলে তার দাপট কম নয়। অন্তত কম ছিল না। ঠিকাদার মানেই বাজপুরুষেব লোক। যে-কোনো অছিলায় যাকে খুশি সর্বস্বান্ত কবাব ক্ষমতা ঠিকাদাবেব, আর সেই ক্ষমতাব অপচয় হামেশাই হয়। পরস্ব-অপহরণ এ রাজ্যে রাজনীতিরই অন্তর্গত। ঠিকাদার বিরূপ হলে রেহাই নেই বড় কারো। কিন্তু এ-হেন ঠিকাদাবের ছেলেব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিয়ের আগেও সদর্পেই টিকে ছিল সাম সিং। অবশ্য তখনো ওই নিরাপত্তার পিছনে মায়লীর বাবার প্রসন্নতা একটা বড় কারণ। মায়লীর বাবা পেনলো বা রাজপুরুষ-সংশ্লিষ্ট সর্দারদের একজন। তার কাছে আবার ঠিকাদাবের হম্বিতম্বি অচল।

কিন্তু বাবাই বা কেন সুনজরে দেখত সাম সিংকে?

তার কারণ সত্যিকাবের মবদ বড় পছন্দ ওর বাবাব। বিয়ের আগে নিজের জোরেই ঠিকাদারের গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে সাম সিং, একদিনের জন্যেও ওর বাবার সাহায্য চায়নি। মায়লী গল্প শুনেছে, ঝড়েব মত অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজেব জারিজুরি বার বার ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল যারা, সেই পূর্বপুরুষের বাচ্চা সাম সিং—সেই দুর্ধর্ষ একজনের রক্ত ওর ধমনীতে। সপ্তাহে একদিন অন্তত চামড়ী মুবগী ভেড়া ছাগল অথবা কিছু না কিছু ভেট নিয়ে টঙ্গান হাকিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে আসত সাম সিং। টঙ্গান সেখানকার বল ও সৌন্দর্যখ্যাত ক্ষুদে ঘোড়া। দৃশ্যটা বড় ভালো লাগত মায়লীর। ওই দুরন্ত ঘোড়ায় অমনি দুরন্ত আরোহীই যেন মানায়। ক্রমশ সপুলকে অনুভব করেছে মায়লী, বাবার কাছে ভেট নিয়ে আসাটা একটা উপলক্ষ শুধু। তার আসার আসল হেতু ও নিজে।

ঠিকাদারের ছেলে মোয়াংদিকে অনায়াসে বাতিল করে দিয়েছিল মায়লী। বাতিল যে করেছে সে সর্দারের মেয়ে, কাজেই মোয়াংদির হিংসা যত প্রবলই হোক, শত্রুতা

সম্ভব নয়। মায়লীর সঙ্গেও নয়, সাম কিংএর সঙ্গেও নয়।

বিয়ের আগে একটা সর্ত করে নিয়েছিল মায়লী। আর কারো দখল চলবে না তার ওপর। এই পার্বত্য দেশে নারী প্রায়শই বহুভোগ্যা। এক নারীর ওপর অনেক সগোত্র অথবা স্ব-গৃহবাসীর অধিকার। মায়লীর এই স্বতন্ত্র সত্তাবোধও সেই পাদ্রীর প্রভাবেরই ফল। সাম সিং সানন্দে রাজী হয়েছিল। নিজের তিনটি সহোদর ভাইকে বর্জন করে তবে মায়লীকে ঘরে এনেছে। এখনও এমন এক মেয়ের একচ্ছত্র সমর্পণের ফলে মনে মনে প্রচ্ছন্ন একটু গর্ব আছে সাম সিংএর। রাগে ক্ষোভে দাঁতে করে নিজেরই অধর দংশন করল মায়লী।...এতটা পেয়েও বেইমান হয়ে উঠেছে এখন। সে জ্বালা দুঃসহ।

কান পাতল। বাইরে দরজা ঠেলার শব্দই বটে। এত শিগগীর ফিরবে ভাবেনি। মায়লী উঠে দড়ি টেনে দরজা খুলে দিল। তারপবেই হকচকিয়ে গেল বেশ। অন্ধকার সত্ত্বেও বুঝতে দেরি হল না, সামনে দাঁড়িয়ে যে লোকটা সে সাম সিং নয়।

হালকা অন্তরঙ্গতার সুরে লোকটি বলল, আমি মোয়াংদি, একেবারে অচেনা নই...

দরজার দড়িটা তখনো মায়লীর হাতে ধরা, সেটা ছেড়ে দিলেই দরজাটা গড়গড়িয়ে নাকের ডগায় নেমে আসবে আবার। সেরকম একটা সম্ভাবনা অনুমান করেই সোনাম মোয়াংদি টুক করে দেউড়ি টপকে ভিতরে এসে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই দবজাটা পড়ল দড়াম করে।

মোয়াংদি হি হি শব্দে হাসল একটু, তারপর বলল, বাইরে বড় ঠাণ্ডা, জমে যাওয়ার দাখিল—

লোকটা ঢুকেই পড়ল দেখে মায়লী নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, এ সময়ে কি মনে করে?

—যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে, ভাবলাম একবার খবর নিয়ে যাই। আর যে শীত, তোমার হাতের তৈরি একপাত্র মরুয়া যদি জোটে—

শীতের তাড়নাতেই যেন চামড়ার জামাটা দুহাতে করে বুকে সাপটে হি হি করতে করতে ঘরে এসে বসল সে।

অগত্যা তার পিছনে পিছনে মায়লীও এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। সর্বাঙ্গ ঢাকা মানুষটার মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে এ সময়ে আসার হেতু বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর ঘরের কোণে শিকেয় ঝোলানো একটা হাঁড়ি থেকে একপাত্র মরুয়া ঢেলে তার হাতে দিল।

পাত্রটা হাতে নিয়ে মোয়াংদি হাসল একটু। তার গোল-গোল চোখ দুটো শীত-বস্ত্র ভেদ করে মায়লীর সর্বাঙ্গে বিচরণ করে নিল একপ্রস্থ। তারপর হেসে বলল, বোসো, খবরটবর বলো, অনেকদিন দেখিনি তোমাকে—

মায়লী ঘরের কোণে গিয়ে একটা লম্বা কাঠ দিয়ে আগুনের পাত্রটা বেশ করে খুঁচিয়ে দিল একবার। কাঠের ডগাটা ডগডগে লাল হয়ে উঠল। হাত থেকে ফেলল না সেটা, অন্য হাতে শাদাকালো ভেড়াটার কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলো চৌকির কাছে। বসে পায়ে করে ভেড়াটাকে শুইয়ে দিয়ে দুটো পা-ই ওর ওপর

চাপিয়ে দিল। বলল, খবর কিছু নেই, খেয়ে চটপট সরে পড়ো, আমার ঘুম পাচ্ছে।

মোয়াংদি ওর হাতের আগুন-খোঁচানো গনগনে কাঠটা দেখিয়ে বলল, ওটা আবার কেন?

চোখে চোখ রেখে মায়লী এই প্রথম হাসল। একটা পায়ে করে ভেড়াটাকে মৃদু ঠোক্কর দিয়ে বলল, বেজায় পাজী এটা, বেয়াদপি করলে পিটব।

ভেড়ার উদ্দেশ্যে বললেও স্পষ্ট ইঙ্গিতটা বুঝবে না এমন নিরেট নয় মোয়াংদি। একটা উদগ্র বাসনা মনে চেপে বোকার মত হাসতে হল তাকেও। বয়েসয়ে এবং বসিয়ে মহুয়ার পাত্রে চুমুক দিতে দিতে মায়লীর কথাবার্তার ধরন ধারণের প্রশংসা করতে লাগল। বিরক্তি সামলে চুপচাপ বসে রইল মায়লী। পায়ের নিচে ভেড়াটা থেকে থেকে উসখুস করে উঠছে।

পাত্রটা এক সময় খালি করে ঢোলা জামার কনুইয়ে মুখ মুছতে মুছতে মোয়াংদি টেনে টেনে বলল, ঘরে এমন খাসা মহুয়া থাকতে কি সুখে যে সরাইখানায় পিপে নিয়ে পড়ে থাকে লোকটা কে জানে—

লোকটা অর্থাৎ সাম সিং। অসহিষ্ণু চোখে তাকালো মায়লী। কিন্তু মোয়াংদির তখন সহানুভূতি প্রকাশের ঝোঁকটাই প্রবল। বলে গেল, বিকেলে দেখেছিলাম বেহুস হয়ে টানছে সন্ধ্যের পর আবার সেই বজ্জাত ছুঁড়িটার ঘরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দেখি সেখানে একেবারে নরকের হাট বসিয়েছে তোমার মরদ, ডাবলান অত করে, এলো না—তোমাকে নিয়েও খুব ঠাট্টা-তামাসা চলছে দেখলাম।

মায়লীর সর্বাংগ যেন পাথর হয়ে গেল। তার সব থেকে দুর্বল জায়গায় ঘা পড়েছে। আর এই ঘা-টা দেবার জন্যেই এসেছে এই লোকটা। ঘা দিয়ে মজা দেখতে এসেছে।

মোয়াংদি বলে গেল, তোমার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়, তুমি তো আর সকলের মত—

সুরাসক্ত দুই চোখে দুঃখের অভিব্যক্তিটুকু প্রকাশ করতে গিয়ে থমকে গেল। আর বেশি দুঃখ জানাতে সাহস করল না, ওর হাতের কাঠের টুকরোটা কোলের কাছে উঠে এসেছে।

বিদায় নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে কাঠটা ফেলে দিয়ে মায়লীও উঠে এলো চুপচাপ। থমথমে মুখ।

দরজা টেনে তুলেই হঠাৎ যেন ভূত দেখল মোয়াংদি। বাইরে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে যে লোকটা এক নজর তাকিয়েই চিনল তাকে।

সাম সিং।

কিন্তু ঠিকাদারের ছেলের সামলে নিতে সময় লাগল না। বরং হেসে সে-ই প্রথম জিজ্ঞাসা করল, এরই মধ্যে ফুর্তি হয়ে গেল?

দুই হাত কোমরে তুলে সুরাক্লিষ্ট দেহটা যতটা সম্ভব টান করে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সাম সিং। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, তোমাকে সরে পড়তে দেখেই মনে হয়েছিল এখানে আসছ .

মোয়াংদি তরলকণ্ঠে জবাব দিল, হ্যাঁ, ভাবলাম তোমার খবরটা দিয়ে যাই আর এক পাত্র মরুয়া খেয়ে যাই।—খাসা মরুয়া বানায় মায়লী।

হাসতে হাসতেই তার পাশ কাটিয়ে প্রস্থান করল সে। সাম সিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। মায়লী ঘরে ঢুকে গেছে। ভিতরে এসে দরজা ফেলে দিল সাম সিং। আবারও চৌকিতে এসে বসেছিল মায়লী। সাম সিং ঈষৎ স্খলিত পায়ে ঘরে ঢুকল। মোয়াংদিব বদলে আর কাউক দেখলে কিছু মনেও করত না হয়ত। এ রাজ্যে এমন কিছু বিসদৃশ ব্যাপার নয় এটা। আর কেউ হলে এই সুরা-রঞ্জিত অবস্থায় হয়ত ঠাট্টা মস্করাই করত সাম সিং। কিন্তু আবাল্য প্রতিদ্বন্দ্বী মোয়াংদিকে দেখেই জঠরের সব সুরা যেন আগুন হয়ে মাথায় উঠল।

তাব সাড়া পেয়েই আদব পাওয়ার লোভে ভেড়াটা গুটিগুটি এগিয়ে এলো পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ কবে একেবাবে আগুনের কাছাকাছি মুখথুবড়ে পড়ল ওটা।

সাম সিং মায়লীর সামনে এসে দাড়াল। দুই চোখে যেন চিরে চিরে দেখল খানিক, অসংগতির চিহ্ন কিছু চোখে পডে কিনা।

—ও কেন এসেছিল?

অত আদরের ভেডাটার দর্গতি দেখেই মায়লী বুঝে নিয়েছে ঈর্ষার ছুরিটা কোথায় বিঁধেছে। উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক নির্মম উল্লাসে সমস্ত মুখ ঝকমকিয়ে উঠল মায়লীর। বেশ খুশিমুখেই জবাব দিল, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, মরুয়াব লোভে ঢুকে পড়ল—

সাম সিং দেখছে।—এটা সরাইখানা ভেবেছে, কেমন?

—তা ভাববে কেন, তাহলে তো সেইখানেই যেত, আমার হাতের মরুয়া খুব পছন্দ ওর। মায়লী টেনে টেনে বলল, তা ছাড়া যে ঠাণ্ডা বাইরে, বেচারী একেবারে জমে যাচ্ছিল।

—ও, বাইরে ঠাণ্ডা তাই এখানে এসেছে গরম হতে?

মায়লীর দুচোখ যেন খলখলিয়ে উঠল আবারও।—কোথায় আর যাবে, আর যেখানে যেতে পারতো সন্ধ্যে থেকে তো তুমিই সে-জায়গা দখল করে বসে ছিলে শুনলাম!

বলতে বলতে ছদ্ম হাসিব মুখোস খসে পড়ল। দুর্বার ক্রোধে মায়লী আচমকা জ্বলে উঠল যেন। এক ঝটকায় তীব্র কটু কণ্ঠে বলে উঠল, আমার সামনে এসে কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার, ছোটলোক পাজী ইতর বেইমান—

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপর প্রচণ্ড আঘাতে মায়লী মাটির ওপর উল্টে পড়ল ধুপ করে। চোখে অন্ধকার দেখল। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন দুলতে লাগল চোখের সামনে। আঘাত সামলে মেঝের ওপর উঠে বসতে সময় লাগল একটু। ঠোঁট কেটে গেছে, নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। কিন্তু আঘাত ভুলে বোবা বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ। তার গায়ে কেউ হাত তুলতে পারে এর থেকে অবিশ্বাস্য আর কিছু ছিল না বোধহয়। রক্তাক্ত মুখে সে স্তম্ভিত নেত্রে চেয়ে রইল শুধু।

পা একটু কাঁপছে বলে সাম সিং চৌকিতে বসে পড়েছিল। একবার আঘাত

দিয়ে ফেলার ফলে তপ্ত মস্তিষ্কে একটা বিশেষ ধরনের ক্রিয়া শুরু হল। যেমন, মায়লী তার ঘরের জেনানা হয়েও তারই চির-প্রতিদ্বন্দ্বী সোনাম মোয়াংদিকে আদর-আপ্যায়ন করেছে। শুধু তাই নয়, নিজের মরদকে এর ওপর আবার বিষম অপমান করেছে, ছোটলোক বলেছে, পাজী বলেছে, ইতর বলেছে, বেইমান বলেছে। একটু-আধটু ফুর্তির জন্য সাম সিং যেখানেই যাক, মায়লীকে ভালবাসে সে। ভালবাসে বলেই এত সাহস ওর। অতএব ভালোমতই শাসন করা দরকার...

হঠাৎ ঝুঁকে দুহাত বাড়িয়ে চুলের মুঠি ধরে মায়লীক হিড়হিড কবে একেবারে পায়ের কাছে টেনে নিয়ে এলো সাম সিং। এবারেব এলোপাথারি কিল চর ঘুসিতে মাযলীর দেহ নিস্পন্দের মত মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। শাসন সমাধা করে সাম সিং উঠে এসে সিকে থেকে মরুয়ার হাঁড়ি নামিয়ে চোঁ-চোঁ করে প্রায় অর্ধেকটা সাবাড় করে দিল। তাবপব কোনপ্রকারে শয্যায় এসে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে নাক-ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল।

পরদিন। ঘুম ভাঙল যখন বেলা কত ঠাওর পেল না। সর্বাঙ্গ অবসাদে ভেঙে পড়েছে তখনো। মাথা ভার। শুয়ে শুয়েই এদিক ওদিক তাকালো সাম সিং, মেঝের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ছেলে বা ছেলের মা কাউকে দেখল না। আরো খানিক গড়াগড়ি করে উঠল এক সময়। বাইরে এসে টের পেল সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলেছে। কিন্তু এরা সব গেল কোথায়? মায়লী বা ছেলে ভুট্টি কাউকেই দেখছে না। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গতরাতের শাসনের কথা মনে পড়েছে। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি যেমনই হোক, বাইবে বেশ একটা গাম্ভীর্য বজায় রেখেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সাম সিং।

বাইবেব দবজা খোলা।...বোধহয় পশুঘবের দিকে গেছে। শ্লথ পায়ে সেদিকে এগুলো সাম সিং।

সেখানেও নেই। মা ছেলে কেউ না। শুধু ভোজী আছে। আব সেই শাদা-কালো ভেড়াটা আছে। ভেড়াটাকে কোলে তুলে নিযে সাম সিং ফিবে এলো। ক্রমে দুপুরও গড়াতে চলল। আশেপাশে কোথাও খুঁজতে বাকি নেই আব। সাম সিংএর মুখখানা ধারালো হয়ে উঠল ক্রমশ।

ভোজী খবর নিয়ে এলো, ভোর না হতে ছেলে নিয়ে মায়লী গিয়েছিল সোনাম মোয়াংদিব বাড়ি। সেখান থেকে তাকে সঙ্গে করে চলে গেছে পুনখায়—বাপের কাছে।

শোনামাত্র দুর্বার ক্রোধে টঙ্গানে চেপে পুনখায় যাবার জন্য প্রস্তুত হল সাম সিং। কিন্তু ভোজী অনেক করে নিরস্ত কবল তাকে। বলল, এখন পুনখায় যাওয়া মানেই মায়লীর বাবাব, অর্থাৎ সর্দারের কোপে পড়া। এমনিতেই হযত আর রেহাই নেই তাদের, সর্দাব আর ঠিকাদারের ছেলে এবারে একযোগে তাদের সর্বনাশ করে ছাড়বে।

বিপদের সম্বন্ধে একটু একটু করে সচেতন হল সাম সিং। এবারে বোধহয় ধ্বংস হবারই পালা।

কঠিন স্তব্ধতায় অবধারিত বিপদের জন্যেই প্রস্তুত হতে লাগল সে। শিকারের

বন্দুকটা ঠিক করে রাখল, কুকরিতে শান দিল। দু'পাঁচজন লোকও সংগ্রহ করল তলায় তলায়। প্রাণ যায় যাক, সে নেবেও কিছু। প্রাণ দেবার জন্য এবং কিছু নেবার জন্য একটা রূঢ় প্রতীক্ষা উদগ্র হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু একে একে দিন কাটে, অন্য দিকের এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। উল্টে লোকমুখে সোনাম মোয়াংদির আক্ষেপ কানে এলো একদিন। সে নাকি বলে বেড়াচ্ছে, মায়লীর অবুঝপনার জন্যেই এ-যাত্রা বেঁচে গেল সাম সিং—তার কড়া নিষেধের জন্যেই সায়েস্তা করা গেল না ওকে।

শুনে ভোজী হাঁপ ফেলে বাঁচল। অনেকদিন ছাগল-ভেড়াগুলোর ওজন পরীক্ষা করা হয় নি। ওজন বাড়া মানেই তো টাকা বাড়া। সুস্থ চিত্তে ভোজী কাজে মন দিল।

কিন্তু সাম সিং খুশি হল না একটুও, বরং স্তব্ধতা বাড়ল আরো।

এরপর মায়লীর কাছ থেকে লোক এলো একদিন। ভুট্টির শাদা-কালো ভেড়াটা চেয়ে পাঠিয়েছে মায়লী।

ভোজীর কাছে ও-রকম একটা ভেড়া অমনি দিয়ে দেওয়া আর কলজের খানিকটা ছিঁড়ে দেওয়া প্রায় একই ব্যাপার। গায়েগতরে এখন যা হয়েছে ওটা, অনেক টাকার মাল। তবু ঝামেলা এড়ানোর জন্যে ওটা দিয়ে দেওয়ারই পক্ষপাতী ছিল সে। কিন্তু সাম সিং সাফ জবাব দিল, ওই ভেড়াটাকে কেটেকুটে কাবাব বানিয়ে খাওয়া হবে শিগগীরই।

লোকটা চলে গেল।

রাত্রি। এ-পাশ ও-পাশ করছে সাম সিং। ঘুম আসছে না কিছুতে। ভুট্টির শূন্য শয্যাটা আজ যেন আরো বেশি করে তার বুকের হাওয়া টেনে নিচ্ছে। যে দেশের স্ত্রীলোক বহুস্বামিক, সেখানে ছেলের ওপর মায়েরই সম্পূর্ণ অধিকার। সাম সিং ছটফট করতে লাগল। এতদিনের উত্তেজনায় ভুট্টির ভেড়াটার কথাও মনে ছিল না তেমন। ওরা যাবার পর থেকেই ভোজীর তদারকে আছে ওটা।

...রাত বাড়ছে। সাম সিং উঠল এক সময়। হ্যারিকেন জ্বালল। চাবির গোছা নিয়ে দরজা খুলে বাইরে এলো। পাঁজর দুমড়ানো শীত বাইরে, গায়ে যথেষ্ট আচ্ছাদন নেই। তবু ঠাণ্ডার সম্বন্ধে তেমন সচেতন নয় সাম সিং। অদূরে পশু-ঘর। প্রতিটি খুপরি চেনা। ঘর খুলল সাম সিং। একপাল ভেড়া নড়েচড়ে উঠল। তার মধ্যে থেকে সেই শাদা-কালো ভেড়াটাকে খুজে পেতে সময় লাগল না। ভেড়াটাকে বুকে তুলে খুপরি বন্ধ করে ঘরে ফিরে এলো।

শয্যায় ভেড়াটাকে জড়িয়ে ধরে অনেক রাত পরে আজ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল সাম সিং। স্বপ্ন দেখল, ছেলেকে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গেই খুনসুটি করছে সে।

এর পর একেবারে যেন স্থির হয়ে গেল সাম সিং।

মায়লীকে বিয়ে করে এনেছে সোনাম মোয়াংদি। ছেলেসুদ্ধু ঘরে নিয়ে এসেছে তাকে।

দু'চার দিন কাটলো আরো। ভোজীকে সব তদারকের ভার দিয়ে সাম সিং শিকারে বেরিয়ে পড়ল। শিকার-শেষে দু'পাঁচ জায়গায় যাবে। কবে ফিরবে ঠিক নেই।

. কিন্তু ভালো লাগল না বেশিদিন। সামনে পৌষ উৎসব। একঘেয়ে দিনযাপনের

মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের এই উৎসববৈচিত্রের আকর্ষণ লোভনীয়। অঢেল মদ-মাংস আর জুয়ার আয়োজন অনেক বর্ধিষ্ণু ঘরে। আসার আগে কৃষীব্যবসায়ী নববাহাদুর তো রীতিমত দুঃখ করেছিল। পৌষের প্রথম দিনেই তার চাতালে উৎসবটা উৎকট রকমের জমে ওঠে। ভিতরে ভিতরে পৌষের ওই প্রথম দিনেই প্রত্যাবর্তনের একটা তাগিদ অনুভব করতে লাগল সাম সিং। তাছাড়া এ সময়টায় ব্যবসায়ও বেশ মোটা টাকাই ঘরে আসে।

প্রথম দিনেই ফিরল বটে, কিন্তু ফিরতে সন্ধ্যা উতরে গেল। ঘরের মধ্যে পাঁচ মিনিটও টিকতে পারল না। একটা বোবা চাপে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। পশু-ঘর বন্ধ দেখেই বুঝল ভোজী নববাহাদুরের চাতালে গিয়ে জমেছে। পায়ে পায়ে সেদিকেই চলল সাম সিং।

তাকে দেখে আনন্দে হৈ চৈ করে উঠল অনেকেই। পারিবারিক ক্ষেত্রে যত হেনস্থাই হোক, সামনাসামনি এখনো তাকে সমীহ করে সকলেই। তার টাকার জোর আর মেজাজের দাপট তো কমেনি ফূর্তির আসরে বেশ জাকিয়ে বসল সাম সিং। অদূরে সোনাম মোয়াদিংকে দেখে ভিতরটা চিড়বিড় করে উঠলেও তার উপস্থিতি একেবারে উপেক্ষা করতে চেষ্টা করল। মোয়াংদি জুয়া খেলছে আর মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে হাসছে। ভোজী আর একদিকে বসে নিবিষ্ট চিত্তে জুয়াখেলা দেখছে।

মাঝে খাওয়ার আসর আরো জমে উঠল। কড়া মরুয়ার আমেজে আনন্দের হুল্লোড় শুরু হয়েছে। মুহুর্মুহু ভাঁড় খালি হয়ে যাচ্ছে সকলেরই। মাংসটাও জোর পাকিয়েছে নববাহাদুর। মরুয়া আর মাংসের তারিফে পঞ্চমুখ সকলে। সাম সিংকে খুশি করার জন্যেই বোধাহয় একজন প্রশ্ন করল, এমন মাংস কোত্থেকে সরবরাহ করা হল?

নববাহাদুর জবাব দিল, সাম সিং ছাড়া কার ঘরে এমন মাল মজুত থাকে।

বেশ আয়েস করে মাংস চিবুচ্ছিল সাম সিং আর মাঝে মাঝে মরুয়া টানছিল। কথাটা কানে যেতেই হঠাৎ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। নববাহাদুরের জবাবের জন্য নয়, প্রতি বছরেই উৎসবের ছাগল ভেড়া বেশিরভাগ সে-ই সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু তবু কথা ক'টা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু যেন অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল সাম সিংএর চোখের সামনে। মরুয়ার ভাড় মাটিতে পড়ে ভাঙল। মাটি দুলে উঠল, গা ঘুলোতে লাগল।

আয়েস করে ভেড়ার মাংস চিবুচ্ছিল এতক্ষণ সাম সিং।

কোন প্রকারে টলতে টলতে উঠে দাড়াল সে। সকলের বিস্ময়ের ক্ষুদ্র জবাব দিল, এ ক'দিনের ঘোরাঘুরিতেই সম্ভবত শরীরটা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছে তার। ভোজীকে ইশারায় কাছে ডেকে বলল, তাকে ঘরে পৌছে দিয়ে আসতে।

নেশাটা সবে জমে এসেছে ভোজীর। হঠাৎ এমন অসুস্থতার হেতু নিয়ে অত মাথা ঘামাবার অবকাশ নেই তার, তাড়াতাড়ি তাকে পৌছে দিতে চলল সে। পৌছে দিয়েই আবার ফিরে আসবে।

অন্ধকার রাত। পাহাড়ী চড়াই। পাশাপাশি চলেছে। সাম সিংএর মুখে একটি কথা নেই। ভোজী বকবক করে চলেছে। চড়াই পেরিয়ে ঘরের কাছাকাছি এসে খুব শান্ত

মৃদু গলায় সাম সিং জিজ্ঞাসা কবল, ভুট্রিব ওই ভেড়াটাও বেচে দাওনি তো?

গলাব স্ববে একটু যেন থমকে গেল ভোজী। কিন্তু সুবাব তবল প্রভাবে হেসে উঠল তাব পবেই। বলল, ভেড়াটা এখন আব ভুট্রিব হতে যাবে কেন! আজই তো ওটা বেচা হল। চাব-চাবটে ভেড়া নিলে নববাহাদুবেব লোক, ওটাই সব থেকে সেবা মাল, ছাড়তে চাইলে না—দাও বুঝে ভোজীও ডবল দাম আদায় কবে ছাড়লে।

হি হি কবে আবাব হেসে ওঠাব মুখেই আচমকা প্রচণ্ড আঘাতে একেবাবে ধবাশায়ী হল ভোজী। কিন্তু সাম সিংএব বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত তখন। উপর্যুপবি আঘাতে ভোজীব দেহটা পাহাড়ী ভূমিতে থেতলে দিতে লাগল সে।

উঠে দাড়াল। বড় দুটো দম নিয়ে দু'হাতে কবে পেটটা চেপে ধবে টলতে টলতে নিজেব ঘবে এসে ঢুকল। দাড়াতে পাবছে না। উঠে কোনবকমে দোবগোড়ায় এসে উগবে দিল যা খেয়েছিল সব। একেবাবে নিঃশেষে। নিস্পন্দ অবসন্ন দেহ শয্যায় এলিয়ে দিল তাবপব।

কিন্তু মাথায় আগুন জ্বলছে। মস্তিষ্ক কাজ কবে চলেছে। ছেলেকে তাব চাই। ভুট্রিকে চাই কিন্তু কি কবে ফিবে পাবে তাকে? কি কবে?

একটা পথ আছে। একটি মাত্র।

চকিতে উঠে বসল সাম সিং। মোয়াংদি মাঝবাতেব আগে নববাহাদুবেব আসব ছেড়ে নড়বে না। তাব ঘবে আছে মায়লী আব ভুট্রি। ভুট্রি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। মায়লী কি কবছে? যা-ই করুক, কতক্ষণ লাগবে কাজ চুকিয়ে আসতে? সাম সিংএব দুই চোখে শাদা আগুন।

উঠে দেয়ালে ঝোলানো কুকবিটা টেনে নিয়ে কোমবে গুজল সাম সিং।

ধবা পড়াব ভয় আছে। ধবা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু। আবাব ধবা নাও পড়তে পাবে। পার্বত্য ঘাসায় এমন খুন-খাবাপী অনেক হয়। চুবিব লোভে অথবা দেহেব লোভে বাধা দিতে গিয়েও অনেক বউ ঝি খুন হয়। মায়লীব ওপব লোভ এ জায়গাব অনেকেবই। সেটাই ধবে নেবে সকলে। তাছাড়া সবাই জেনেছে সাম সিং অসুস্থ। তাই ধবা নাও পড়তে পাবে। ধবা না পড়লে ভুট্রিকে ফিবে পাবে। ক'দিন আব শুধু শুধু পবেব ছেলে আগলাবে মোয়াংদি? তখন টাকায় বশীভূত কবাও কঠিন হবে না তাকে।

শ্বাপদেব মত নিঃশব্দে অন্ধকাব পেবিয়ে মোয়াংদিব ঘবেব কাছাকাছি এসে থমকে দাড়াল সাম সিং। অবাকও হল একটু। বাইবেব দবজাটা আধা খোলা তখনো, ভিতবে আলো জ্বলছে। বাত বেশি হয়নি, সাম সিংএব খেয়াল ছিল না।

তা হোক। এটাই চবম মুহূত। এ দিনটা গেলে আব সুযোগ পাবে না। কোমবে গোঁজা কুকবিটা হাত দিয়ে একবাব স্পর্শ কবে নিল সাম সিং। তাব পব দবজা ঠেলে ভিতবে ঢুকল।

স্তব্ধ, বিমূঢ় পবমুহূর্তে।

দাওয়াব ওপব মায়লী বসে আছে পিছন ফিবে। ভুট্রি কলহাস্যে খেলায় মেতে

আছে তার সেই শাদা-কালো ভেড়াটার সঙ্গে। ওটাকে দু'হাতে সাপটে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে।

মায়লীই সচকিতে ফিরে তাকালো প্রথম। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়।

আগন্তুকের আভাস পেয়ে ভুট্টিও উঠে বসেছে। দুহাতে ভেড়াটাকে জড়িয়ে আছে তখনো। বাপকে দেখে দৌড়ে উঠে আসার কথা। তার বদলে চেয়ে আছে ফ্যালফ্যাল করে।

মায়লী এগিয়ে ছেলের কাছ থেকে দু'হাতে ভেড়াটাকে বুকে তুলে নিয়ে এলো। তারপর শান্ত মুখে বলল, তুমি এখানে থাকলে এটা বিক্রি করতে না জানি—ভোজীই টাকার লোভে বেচেছে বোধহয়। নবাবাহাদুরের লোক ভেড়াগুলোকে নিয়ে এ পথ দিয়েই যাচ্ছিল, আমি দেখতে পেয়ে তিনগুণ দাম দিয়ে এটা তাদের থেকে আবার কিনে রেখেছি।

ভেড়াটা তাকে দিয়ে দেবার জন্য আরো একটু এগিয়ে এলো মায়লী।

সাম সিং নির্বাক, বিমূঢ়।

হতভম্বের মত ছেলের দিকে তাকালো সে। ছেলেও চেয়ে আছে তার দিকে। দস্যুর মত বাপ শুধু ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে কিছু—তার কচি মুখে সেই শঙ্কা। ডাগর দুই চোখে শুধু আশা আর ভয়, আশা আর সংশয়।

নিজের অজ্ঞাতে ছেলের কাছে এগিয়ে এলো সাম সিং। তার মাথার কান-ঢাকা টুপিটা খুলে ফেলে ঝাঁকড়া চুলে নিজের মোটা আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করল একটু। টুপিটা পরিয়ে দিল আবার। মায়লীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর এক-পা দু-পা করে দাওয়া ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

নিজের অগোচরে মায়লীও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আনন্দ-বিহ্বল ভুট্টিও। অন্ধকার চিরে মানুষটাকে দেখতে চেষ্টা করছে মায়লী। অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে একটু একটু করে।

মায়লীর বুকে শাদা কালো ভেড়াটা তেমনি ধরা তখনো। তার চোখে জল। মুখে হাসির আভাস।

উত্তরবসন্তে

তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় প্রস্তাব শুনে নন্দদুলালবাবুর বছরখানেক আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল। কথায় কথায় এই শর্মাচার্যই সেদিন কি-সব হিসেবপত্র আঁকিবুকি করে ঘোষণা করেছিলেন, পঞ্চান্ন পেরুলেই তার, অর্থাৎ নন্দদুলালবাবুর বৃহস্পতির দশা শুরু আর তার পর থেকেই এ জীবনের মত সকল দুর্দশার অবসান।

নন্দদুলালবাবু যে-জীবনে এতকাল অভ্যস্ত তাতে এমন কিছু দুর্দশায় ছিলেন না সেদিনও, তবু তাঁর ওই প্রৌঢ়োত্তর জীবনে নতুন করে কোনো পরিবর্তন সম্ভাবনা প্রায় হাসিরই ব্যাপার। আর শর্মাচার্যও সেটা ভালই জানতেন। নন্দদুলালবাবু সহাস্যে

টিপ্পনী কেটেছিলেন, আপনার হিসেবে বোধহয় একটু ভুল হল, পঞ্চান্ন পেরুলে নয়, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হলে।

আজ প্রস্তাবটা শুনে শর্মাচার্যের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে হাল্কা হেসে নন্দদুলালবাবু বললেন, বৃহস্পতির দশায় টানলে নাকি?

শর্মাচার্য পূর্ব প্রসঙ্গ বিস্মৃত হয়েছিলেন। মনে পড়ে গেল তাঁরও। উৎফুল্ল মুখে বলে উঠলেন, তাই তো! তা না হলে এমন হয়? পঞ্চান্ন পেরিয়েছেন তো?...দাঁড়ান, নিশ্চয় পেরিয়েছেন, ছ'মাস আগেই পেরিয়েছেন—বাস, আর কোনো কথা নয়, তল্পিতল্পা গুটিয়ে আপনি দু'চার দিনের মধ্যেই আসছেন।

নন্দদুলালবাবু ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন, দাঁড়ান, ভেবে-চিন্তে দেখি একটু, কোথায় দু'টো পরামর্শ দেবেন, না নিজেই লাফিয়ে উঠলেন।

শর্মাচার্য বললেন, ওই বৃহস্পতির কথাটা মনে পড়িয়ে দিযে সব ভাবনা-চিন্তার পথ নিজেই মেরে দিযেছেন, আপনার তিবিশ বছবেব মেসেব ভাত এবাবে ঘুচল।

ঘুচল ক'দিনের জন্য?

বরাবরকার জন্য। আরে মশাই, আর কিছু না হোক, ওই ছোট মেয়েটার বি.এ. পাশ করতেও তো এখনো বছব পাঁচেক বাকি।

নন্দদুলালবাবু ছদ্মগাম্ভীর্যে সায় দিলেন, তা বটে, পাঁচ বছর বাদে না-হয় ভদ্রলোকের গোলাপের চাষেই ঢুকে পড়া যাবে'খন।

দরকার হলে তাও যাবে। শর্মাচার্যও হেসে সায দিলেন। কিন্তু আসলে সে-জন্যে আপনি একটুও ভাবছেন না, দ্বিধাটা কোথায় খুলেই বলুন না?

কেমন অস্বস্তি লাগছে আর কি, না পোষালে শেষে মুস্কিল।

পোষাবে না ভাবছেন কেন, মেয়েগুলো জ্বালায় খুব?

না, মেয়ে ক'টি চঞ্চল হলেও ভালই।...কিন্তু তাদেব মায়ের মেজাজ সুবিধের নয়।

শর্মাচার্য হেসে ফেললেন।—তা অবশ্য নয, মেজাজ একবার বিগডলে রক্ষা নেই।

তবু গিয়ে উঠতে বলছেন?

শর্মাচার্য মজা পেয়ে গেলেন যেন, বললেন, এরপব আপনি না এলেও তো মেজাজ বিগডবে, এতবার সাধাসাধি করছেন মহিলা—দুর্গা বলে তাব থেকে চলেই আসুন। তাঁব মেজাজেব সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি মশাই। ভদ্রমহিলা মেয়ে-অন্ত-প্রাণ, মেয়েদের স্বার্থটা ষোল আনা দেখেই আপনাকে অত করে ডাকছেন—আপনার তো প্রিভিলেজড পোজিশান!

এবারে একটু বিবৃতি প্রয়োজন।

আজ পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে নন্দদুলালবাবুর একমাত্র পেশা প্রাইভেট টিউশন। অবাক লাগারই কথা। ভদ্রলোক দু'দুটো বিষয়ে এম.এ। প্রথমবার এম.এ পাস করে এক বিলিতি ফার্ম-এ ভালো চাকরিতেই ঢুকেছিলেন। সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়ার যাতনা হৃদয়ের নিভৃতে আজও বোধহয় বাজে। আপাতত সে-কথা থাক। চাকরি খুইয়ে চাকরির চেষ্টা আবারও যে না করেছিলেন এমন নয়। কিন্তু সে চেষ্টার সঙ্গে আর

নিষ্ঠার যোগ ছিল না তেমন। প্রথমে হাত-খরচা চালাবার জন্য যে প্রাইভেট টিউশন ছিল, তাই আর একটা বাড়ল। তারপর একটা একটা করে দু'বেলায় আরো দু'তিনটে। চাকরির প্রথম ঘা'টা শুকোয় নি বলেই হয়ত চাকরি খোঁজার উদ্যম আস্তে আস্তে একেবারেই গেল। কিন্তু সেটা এলো নিশ্চিন্ত নিভৃতে এই ছেলে পড়ানোয়। আর আশ্চর্য, এইতেই প্রশংসাও অর্জন করলেন কম নয়। ইস্কুল ছেড়ে কলেজের ছাত্র ধরলেন। এক ছাত্রের বিদায়কালে তার গণ্ডির আর তিনজন এসে ধর্ণা দেয়।

ছাত্র-সংগ্রহ এবং পড়ানোর সুবিধের জন্যই দ্বিতীয় দফা এম.এ. পাসের প্রয়োজন হয়েছিল। শর্মাচার্যের সঙ্গে সেই থেকে যোগাযোগ এবং হৃদ্যতা। তিনিও বেশি বয়সেই এম.এ. পাসের তাগিদটা অনুভব করেছিলেন। বলতেন, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গুরুগিরির পাসপোর্টটা এ-যুগে তেমন কাজে লাগছে না, পায়ে পায়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে। বর্তমানে তিনি কোনো বে-সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিন্তু পৈতৃক পেশাটাও বর্জন করেন নি, বরং অধ্যাপনা করেন বলেই এদিকেও পসার বেড়েছে। কেতাদুরস্ত অভিজাত হোমরাচোমরাদেরও জন্মরাশিচক্রাদি রচনা ও গণনার প্রতি এতটা গোপন দুর্বলতা আছে, আগে জানতেন না।

নন্দদুলালবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বেড়েছে। কিন্তু সেটা অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে এই বছরতিনেক। পর পর দু'বার আই.এ. ফেল করে ও-পাট চুকিয়ে ফেলার মতলব ভাঁজছিল শর্মাচার্য-তনয়। ভবিষ্যতের ব্যাকুলতায় শর্মাচার্যের তখন ছেলের ঠিকুজিকুষ্টির কথা মনে হয়নি একবারও। নন্দদুলালবাবুর হাতে পড়ে সেই ছেলে আজ এম.এ পড়ার তোড়জোড় করছে। মাঝে মাঝে বাড়িতে ধরে এনে নেমন্তন্ন খাওয়ানো ছাড়া নন্দদুলালবাবুকে আর প্রতিদান কিছুই গ্রহণ করানো যায়নি।

এবারে বাসন্তী দেবীর প্রসঙ্গটুকু বাকি। তাঁর বাপের বাড়িতে একদা যে আধিপত্য ছিল শর্মাচার্যের পিতৃদেবের, সেটা মনে আছে বাসন্তী দেবীর, মনে আছে শর্মাচর্যেরও। কিন্তু আধিপত্যের দিন গেছে। শর্মাচার্য হৃদ্যতাটুকু পেয়েই খুশি। অবশ্য ভিতরে ভিতরে বাসন্তী দেবীর সংস্কারগত সম্ভ্রমও পুরোমাত্রায় আছে। বিয়ের পর থেকেই প্রায় প্রবাসিনী তিনি। স্বামীর মস্ত কারবার গাজিপুরে। গোলাপের চাষ, পারফিউমারি ম্যানুফ্যাকচারার। চার মেয়ে, ছেলে নেই। এক-একটি মেয়ে হয়েছে আর স্বামীর ব্যবসায়েরও নাকি ধাপে ধাপে উন্নতি হয়েছে। উন্নতি হয়েছে বাসন্তী দেবীর মেজাজেরও। স্বামী এবং মেয়েরাও সেই মেজাজের ভয়ে তটস্থ। মেয়েরা বড় হতে একটা কারণে স্বামী বেচারাকে কথা শুনতে হত প্রায়ই।—এই সৃষ্টিছাড়া জায়গায় থেকে মেয়েগুলো পর্যন্ত তাঁর হিন্দুস্থানী হয়ে যেতে বসেছে, অথচ সে-জন্য যদি একটু চিন্তা-ভাবনা থাকত, খালি ব্যবসা আর ব্যবসা!

স্বামী কখনো হয়ত জবাব দিয়েছেন, তোমার জন্য সব করতে পারি কিন্তু গাজিপুরটাকে তো আর বাংলা দেশ বানাতে পারিনে!

থাক খুব হয়েছে, আর রসিকতা করতে হবে না। ঝাঁঝিয়ে ওঠেন বাসন্তী দেবী, এরপর এক-একটা খোট্টা ধরে ধরে বিয়ে দিতে হবে মেয়েদের!

বছরে হোক, দু'বছরে হোক শর্মাচার্য গাজিপুর বেড়াতে আসেন। কখনো একা, কখনো সপরিবারে। স্বামী বেচারী হাঁপ ফেলে বাঁচেন তখন। মেয়েরাও খুশি হয়।

মেয়েদেব জন্য মাযেব দুর্ভাবনাব কথা শুনে শর্মাচার্য হাসেন। বাসন্তী দেবী রেগে গিযে বলেন, আপনি হাসবেনই তো—বাডিতে নিজেদেব মধ্যেও মেযেগুলো হিন্দি চালাতে পাবলে সুখ পায।

মেযেদেব তবফ থেকেও অবশ্য প্রতিবাদ আসে।—মা তুমি বাডিযে বলছ, একটা হিন্দিব বদলে দশটা বাংলা বকুনি শুনতে হয আমাদেব।

ওই ভযেই তো পাবিস না, নইলে তোদেব আমি চিনি না, আমি চোখ বুজলে আব দেখতে হবে না।

শর্মাচার্য মৃদু হেসে বলেন, চোখ বোজাব সম্ভাবনাটা সমহ যখন নেই তখন আব ভাবনাব কি?

বাসন্তী দেবী হঠাৎ বোধহয লজ্জা পান একটু। দেখলে আটচল্লিশ পেরুতে চলল কেউ বলবে না।

মেযেদেব জন্য বাডিতে দু'টি প্রফেসাব বাধা। দু'জনেই অনেক দিনেব প্রবাসী বাঙ্গালী। বাসন্তী দেবীব মতে তাদেবও বাঙ্গালীত্ব আব কিছু নেই। আব আছে গানেব মাস্টাব। মেযেদেব বিশ্বাস, তাদেব মা পছন্দমত একজন বাংলাব মাস্টাবও সংগ্রহেব চেষ্টায আছে। কলেজে বাংলা না-ই পডানো হোক, বাডিতে পডতে আপত্তি কি?

কিন্তু এই বাডিতেই বিপযয ঘটে গেল একটা।

বড মেযে সুনীতিব বিযে। টেলিগ্রাম পেযে শমাচার্য ছুটি নিযে চলে এলেন বিযে দিতে। কিন্তু এসে অবাক। বিযেবাডি যেন শোকেব বাডি। বাসন্তী দেবী পাথব-মূর্তি। মেযেবা পাংশুমূর্তি। বাডিব কর্তাটিও পালিযে বেডাচ্ছেন।

খববটা বাসন্তী দেবীব মুখেই শুনলেন শমাচার্য। যে দু'জন প্রফেসাব বাডিতে পডান মেযেদেব, বিযে তাদেবই একজনেব সঙ্গে। বাসন্তী দেবীব দু'চোখেব আগুনে শমাচার্য ভডকে গেলেন।

বিযে হযে গেল। শমাচার্য ফেবাব ব্যবস্থা কবছেন। বাসন্তী দেবী দ্বিতীযবাব মুখ খুললেন।—কলকাতায ভাল দেখে একটা বাডি ঠিক করুন আচার্যমশাই, মেযেদেব পবীক্ষা শেস হলেই আমি যেতে চাই

আচাযমশাই মাথা চুলকে বললেন, তাব তো এখনো পাচ-ছ'মাস দেবি আছে।

তা হোক, আপনি এখন থেকেই খোজ বাখুন। নযতো দেখেশুনে একটা কিনে ফেলুন, পছন্দ হলেই লিখবেন, আমি গিযে দেখে আসব।

শর্মাচায পালিযে বাচলেন। কিন্তু ছ'মাসেব মধ্যে সত্যিই আহাব নিদ্রা ছেডে তাকে পছন্দমত একটা বাডিভাডা কবতে হল।

এই ছ'মাসে দুনিযাব গৃহ-শিক্ষকেব ওপবেই বিরূপ হযেছেন বাসন্তী দেবী। মেযে জামাইকে পর্যন্ত এ-যাবত ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলেন নি। স্বামীকে ঠেস দিযেছেন, এ তাদেব বংশেবই ধাবা। অর্থাৎ ওদিক থেকে দবসম্পর্কীযা আবো কে একজন নাকি বাডিব মাস্টাবকে বিযে কবেছিল। জামাইযেব ওপব আবো চটেছেন চাকবি ছেডে শ্বশুবেব ব্যবসাযে যোগ দেওযাতে। এতবড ব্যবসা নিযে হিমসিম

খাচ্ছিলেন বলে শ্বশুরই চেষ্টা-চরিত্র করে জামাইকে চাকরি ছাড়িয়ে এনেছেন, সেটা একবারও বিশ্বাস করলেন না। একজন জামাই হওয়ার ফলে দ্বিতীয় যে ভদ্রলোকটি পড়াতেন, তাঁকে পত্রপাঠ বিদায় নিতে হয়েছে। গানের মাস্টারকেও।

যথাসময়ে বাসন্তী দেবী তিন মেয়েসহ কলকাতায় পদার্পণ করলেন। স্বামীই অবশ্য পৌঁছে দিলেন তাঁদের। দু'দিনের মধ্যে প্রকাণ্ড ঝকঝকে গাড়িটা হাঁকিয়ে নিয়ে এলো শম্ভুচরণ। কোম্পানীব গাড়ি আছে আরো গোটাকতক। একটা মেয়েদের খাস দখলে, আর তার একচ্ছত্র চালক শম্ভুচরণ। ড্রাইভার হলেও বাড়িরই একজন প্রায়। চৌকস ছেলে। পনের বছর বয়সে এ-সংসারে এসে পড়েছিল। অন্য কাজ পছন্দ হয়নি, দু'চার বছর না যেতেই ড্রাইভিং শিখেছে। বছর তিরিশ বয়স এখন। বাসন্তী দেবী সুনজবে দেখেন তাকে।

স্বামীর বিদায়ের আগে বোধহয় বাসন্তী দেবীব মেজাজ একটু নরম হল। বললেন, আচার্যমশাই বইলেন, শম্ভু রইল, ভাববাব কি আছে, তা ছাডা দরকাব হলে প্লেনে যাতাযাত তো তিন ঘণ্টার মামলা।

ওটুকুতেই বিগলিত হয়ে কর্মস্থলে ফিরে গেলেন ভদ্রলোক। যাবাব আগে শর্মাচার্যকে বিশেষ কবে অনুরোধ করে গেলেন, অচিরে যেন একটা টেলিফোন আনাব ব্যবস্থা করা হয। গৃহিনীব সুবিধের জন্যেও হতে পারে, নিজে যখন-তখন খোঁজখবব নিতে পারবেন বলেও হতে পারে।

মেয়েরা ইস্কুল-কলেজে ভর্তি হল। একজন ম্যাট্রিক, একজন আই-এ, একজন বি-এ। সমস্যা তারপর। বাংলা দেশের ধারায় এই প্রথম পড়াশুনা। শর্মাচার্য বুদ্ধি করে নন্দদুলালবাবুকে আগে থাকতেই বগলদাবা করে রেখেছিলেন। নতুন বছরে নতুন করে রাত্রিতে আর কোথাও টিউশন নিতে দেন নি তাঁকে। কিন্তু বাসন্তী দেবীর মনোভাব বোঝবার জন্যই আগে ব্যক্ত কবেননি কিছু।

মনোভাব বুঝে ফাপরে পড়লেন শর্মাচার্য।

অন্তত দু'জন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ প্রফেসর চাই। রোজ পড়াতে হবে। একজন সকালে, একজন রাত্রিতে।

শর্মাচার্য জিজ্ঞাসা কবলেন, দু'জনকে মাইনে কত দেবেন, হাজাব টাকা?

বাসন্তী দেবী অবাক। হাজার টাকা!

শর্মাচার্য বললেন, এটা কলকাতা শহর। প্রফেসবরা এখানে সপ্তাহে দু'তিন দিনের বেশি পড়ান না। তাও একজনকে। তাইতেই একশ'-দেড়শ' টাকা করে নেন। তিন ক্লাসের তিনজনের জন্য অন্তত তিনশ' টাকা নেবেন—সপ্তাহে ছ'দিনে কম করে হলেও পাঁচশ টাকা। দু'বেলায় দু'জনের তাহলে হাজার টাকাই পড়ল।

টাকার অভাব নেই, কিন্তু তা বলে টিউশন খরচ হাজার টাকা কে কবে শুনেছে! বাসন্তী দেবী দমে গেলেন।

শর্মাচার্য বললেন, আমি একজনকে এনে দিচ্ছি, ডবল এম-এ, সপ্তাহে দু'দিন এক বেলা পড়াবেন—রাত্রিতে—শ'দুই টাকা করে দেবেন তাঁকে। মনে হয় আর মাস্টার দরকার হবে না।

বাসন্তী দেবীর মনঃপূত হল না। কিন্তু জেরার মুখেই শর্মাচার্য থামিয়ে দিলেন তাঁকে। বললেন, আগে দেখুন তিনি আসেন কিনা— এলে আপনার মেয়েদের ভাগ্য ভালো বলব।

নন্দদুলালবাবুকে আসতে হয়েছে। কথা ছিল প্রথম দিন শর্মাচার্য নিয়ে আসবেন তাঁকে, কিন্তু ইচ্ছে করেই বোধহয় সঙ্গে এলেন না।

একসঙ্গেই এলো মেয়েরা।

নন্দদুলালবাবু আহ্বান জানালেন, এসো মেয়েরা এসো। দেখলেন এক-একজন করে।—বাঃ, খাসা মেয়ে দেখি সব। তোমার নাম? সুরুচি? বি.এ পড়বে? কিন্তু রুচি তো খুব ভাল নয়, তুমি কাপড় দাতে কাটছ।

থতমত খেয়ে মেজো মেয়ে সুরুচি মুখ থেকে শাড়ির আঁচল ফেলে দিল। ছোট মেয়ে সুমতি হেসে উঠল খিলখিল করে।

তুমি তো খুব হাসো দেখছি। তুমি হলে? ছোট—সুমতি? নামটা ঠিক হয় নি। আর তুমি তৃতীয়? সুপ্রীতি? বেশ—।

মেয়েদের ভালো লাগল। টুপটুপ করে নত হয়ে পায়ের ধুলো নিল তারা।

আড়াল থেকে ভালো লাগল বোধ করি বাসন্তী দেবীরও।

পড়াশুনা চলল। কিন্তু বাসন্তী দেবীর দুর্ভাবনা গেল না। এক সন্ধ্যায় তিনজনকে একসঙ্গে পড়ানোয় ফাঁকি না থাকুক, ফাঁক থাকাই সম্ভব। বাংলাদেশের পড়শুনার ধারায় মেয়েরাও চট করে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। বিশেষ করে ইস্কুলে-পড়া ছোট মেয়ে তো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। যাবতীয় বিষয় বাংলায় পড়তে হবে তাকে। প্রশ্নের জবাবও বাংলায় লিখতে হবে শুনে গোড়া থেকেই সে মাকে নোটিস দিয়ে রেখেছে, এ জীবনে তার দ্বারা আর ম্যাট্রিক পাস করা-টরা হবে না।

সকালে তোকে একলা পড়াবার জন্য মাস্টার মশাইকে বলে দেখ না একবার। মায়ের পরামর্শ।

সুমতি বলে দেখল। কিন্তু তাকে বলে দেখা বলে না।—মাস্টারমশাই, মা বললেন, সকালে আমাকে একলা একবেলা পড়াতে হবে।

শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন নন্দদুলালবাবু। সুরুচি তাড়াতাড়ি সামলে নিল।—না মাস্টার-মশাই, মা আপনাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন আপনার অসুবিধে হবে কিনা।

সুমি! তুমি কথা বলতে শেখোনি, দাড়াও মাকে বলছি আজ—

এই মায়ের কথা শর্মাচার্যের মুখে শুনেছেন নন্দদুলালবাবু। আর মেয়েদের কথাবার্তায় নিজেও তাঁর প্রচ্ছন্ন অনুশাসন উপলব্ধি করেছেন। মেযেদের পড়াশুনা নিয়ে মহিলাটির সঙ্গে তারও দু'একদিন সামান্য আলোচনা হয়েছে। মর্যাদার অভিব্যক্তিটুকুই তখন যেন বড় বেশি চোখে পড়েছে নন্দদুলালবাবুর।

মায়ের নামে সুমতি বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেলেও বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল, আহা, অমনি মা'কে বলছি দাঁড়াও, যেন মাস্টারমশাই কতই না রেগে গেছেন আমার ওপর। কি বলবি কি শুনি?—হ্যাঁ মাস্টারমশাই, আমার কথায় আপনি রাগ করেছেন?

নন্দদুলালবাবু হেসে ফেললেন। একটু-আধটু অনুরোধ-উপরোধও আসতে লাগল

সেই থেকেই। আজী[illegible] কাটিয়ে আসছেন জেনে বাসন্তী দেবী একদিন শর্মাচার্যকে বললেন, ভদ্রলোক এখানেই তো থাকতে পারেন, নিচের ক'টা ঘর তো খালিই পড়ে আছে।

কথাপ্রসঙ্গে বললেও বাসন্তী দেবী অনেক কিছু ভেবেই বলেছিলেন। শুধু পড়াশুনা নয়, বাড়িতে শক্ত-সমর্থ অথচ প্রবীণ একজন লোক থাকলে অনেক দিকে সুবিধে। মায়ের কথা শুনে মেয়েরাই ধরেছিল এসে নন্দদুলালবাবুকে। একথা সে-কথা বলে তিনি পাশ কাটিয়েছেন। কিন্তু সোজাসুজি শর্মাচার্যেব মারফৎ এবারের প্রস্তাব উপেক্ষা করা গেল না।

এত দিনের অভ্যস্ততা ছেড়ে এসেও কিন্তু খারাপ লাগল না খুব। মেয়েগুলোর জন্যই। তাদের চঞ্চলতা, তাদের আব্দার, তাদের আদরযত্ন, সব কিছুতে যেন নতুন কিছুর আস্বাদন আছে। দিনের মধ্যে দুই একবার অন্তত তিন বোনের কারো না কারো নালিশ শুনতে হয়, বিচার করতে হয়। ওদিকে শর্মাচার্যও তাদের গোপনে পবামর্শ দিয়েছেন, মাস্টাবমশাই না বলে কাকাবাবু বলে ডেকো।

কিন্তু এখানে এসে নিজের অজ্ঞাতে একটি লোকের সঙ্গে শত্রুতা করে বসলেন নন্দদুলালবাবু। সে ড্রাইভাব শম্ভুচরণ। মেয়েদের এখানে সেখানে নিয়ে যাওযা, তাদেব ওপর কর্তৃত্ব করা সবই যেন শম্ভুচবণের ঘুচল। বিশেষ করে বড় মেয়ের ওরকম বিয়ের পরে বাসন্তী দেবীর ইঙ্গিতে বাড়ির বাইরে সে-ই প্রায় গার্জিযান হয়ে উঠেছিল তাদের। মেয়েরাও বেশ সমীহ করত তাকে। মায়ের অগোচরে কোথাও বেড়াতে হলে বা বেশিক্ষণ কাটাতে হলে অনুরোধ-উপরোধে শম্ভুদার মন না ভেজালে চলত না। শম্ভুচবণের মনে হল, এই লোকটা আসায় স্বয়ং বাসন্তী দেবীর চোখেও যেন দাম কমে গেছে তার। সে এখন শুধুই ড্রাইভার। এক দিনের ঘটনায় বিশেষ করেই স্পষ্ট হয়ে গেল সেটা।

বেডাতে বেরিয়ে মেয়েরা ধরেছে, চলুন কাকাবাবু, একবাব দক্ষিণেশ্বরে ঘুরে আসি।

মেয়েদের নিয়ে বিকেলে বেড়ানোটা প্রায় নিয়মে দাঁডিযে গেছে। নন্দদুলালবাবু সায় দিলেন, আচ্ছা চলো।

ছোট মেয়ে সুমতি আনন্দে কলকল করে উঠল, শম্ভুদা, দক্ষিণেশ্বর—

অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরের দিকে গাড়ি হাঁকাও। শম্ভুচরণ গম্ভীর মুখে ফিরে তাকালো একবার। পরে বলল, এখন দক্ষিণেশ্বর গেলে ফিরতে দেরি হবে।

নন্দদুলালবাবু কিছু না ভেবেই বললেন, কত আর দেরি হবে, আমি তো আছি—ওদর ইচ্ছে হয়েছে যখন, চলো।

শম্ভুচরণ তেমনি জবাব দিল, মা অসন্তুষ্ট হবেন।

মায়ের নাম শুনেই নন্দদুলালবাবুও মুষড়ে গেলেন।—না না, থাক তাহলে। আর একদিন হবে, তোমরা মাকে জিজ্ঞাসা করে নিও।

বড় দুই মেয়ে গুম হয়ে রইল, সুমতি রাগের চোটে পিছন থেকে সারাক্ষণ শম্ভুচরণকে মুখ ভেঙচালো।

বাড়ি ফিরেই সুরুচি আর সুপ্রীতি নালিশ করল মায়ের কাছে। শম্ভুচরণের ডাক

পড়ল। বাসন্তী দেবী সরোষে বললেন, মাস্টারমশাই সঙ্গে ছিলেন, তোকে ফোপরদালালি করতে কে বলেছে! ফের যদি শুনি তো দেব দূর করে তাড়িয়ে।

অপমান এবং মনোবেদনায় কালো হয়ে গেল শম্ভুচরণ। অবশ্য বাসন্তী দেবীর বকুনিটাই ও-রকম, আর তাতে সে অনভ্যস্ত নয় খুব। কিন্তু ইদানীং সে-ই ছিল বাসন্তী দেবীর একমাত্র বিশ্বস্ত লোক। তা-ও সইত, কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অবসান হতে চলেছে, সেটাই প্রায় অসহ্য।

আনন্দেই কাটছে দিনগুলো। মেয়েরা সেদিন বায়না ধরল সিনেমায় যাবে। বাসন্তী দেবী নন্দদুলালবাবুকে বললেন, মেয়েরা ধরেছে, আপনি সঙ্গে গেলে ভালো হয়।

সিনেমা দেখা হল। মেয়েরা সানন্দে বাড়ি ফিরল। নন্দদুলালবাবু চুপ। কিছুদিন বাদে আবার একটা ইংরেজী ভালো ছবি এসেছে। বাসন্তী দেবী আগ মেয়েদের বকলেন একপ্রস্থ, অত সিনেমা দেখলেই পড়াশুনা হয়েছে। পরে আগের মতই নন্দদুলালবাবুকে অনুরোধ করলেন সঙ্গে যেতে।

দ্বিধান্বিত নন্দদুলালবাবু বললে, আমার একটু অসুবিধে হয়, ওরা নিজেরাই যাক না।

বাসন্তী দেবীর অনুরোধ আদেশের মতই চলে এসেছে এত কাল। কিছু না বলে গম্ভীর মুখে চলে গেলেন তিনি। দুপুরে দেখা গেল, মেয়েদের নিয়ে নিজেই তিনি গাড়িতে উঠছেন। শম্ভুচরণ এতদিন বাদে একটু খুশি।

কিন্তু মেয়েরা সিনেমা দেখে ফিরল না, যেন শ্মশানঘাট থেকে ফিরল। বাসন্তীদেবী গুম হয়ে আছেন। মেয়েরা আড়ে আড়ে মায়ের দিকে তাকায় আর নিজেদের মধ্যে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে।

গাড়ি থেকে নেমেই বাসন্তী দেবী আদেশ দিলেন, হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার করোগে যাও। নিজে সরাসরি নন্দদুলালবাবুর ঘরে এলেন। শম্ভুচরণ শাদা মুখে পাশের ঘরে বসে কান খাড়া করল।

বাসন্তী দেবী বললেন, আপনি আমাকে আগে খুলে বললেই পারতেন। এ-সব ছবি দেখতে যায় ওরা, আর আপনি জেনেশুনেও কিছু বললেন না?

নন্দদুলালবাবু প্রায় অপরাধীর মতই দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাসন্তী দেবী বললেন, আমি যা বলবার ওদের বলছি, কিন্তু আর কখনো যাতে ওরা এ-সব দেখতে না চায়, আপনি সেই শিক্ষাই দেবেন।

নন্দদুলালবাবু আমতা আমতা করে বললেন, সেটা বোধহয় ভুল হবে।

ভুল হবে! এসব ছাই-পাঁশ ওরা দেখবে?

নন্দদুলালবাবু আরো ভয়ে ভয়ে বললেন, একটু-আধটু দেখলে আর কি—ওতে পড়াশুনা বরং ভালো হবে, যখনকার যা—আমাদের সঙ্গে থাকাটাই মানে—এরপর যখন ওরা যাবে আমিই না হয় ওদের পৌঁছে দিয়ে আসব আর শেষ হলে নিয়ে আসব।

ওপাশের ঘরের দেওয়ালের আড়াল থেকে তিন মেয়ে ছুটছাট সরে পড়ল। ওদিকের ঘরে শম্ভুচরণ দাঁতে করে নিজের অধর পীড়ন করল বারকতক। বাসন্তী দেবী কিছু না বলে চলে গেলেন। মেয়েদেরও বললেন না কিছু। রাত্তিতে মেয়েরা যখন

পড়তে এলো মুখে হাসি ধরে না তাদের। এতবড় ফাড়া কাটিয়ে উল্টে তাদের জন্য সুপারিশ করলেন যে-মানুষটি, তাঁর প্রতি আকর্ষণ চতুর্গুণ বেড়ে গেল ওদের।

একটানা মাস-কতক কেটে গেল এরপর। নন্দদুলালবাবুর জীবনে আবারও অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ঘটল একটা। মেয়েদের নিয়ে কি একটা দরকারে সেদিন মার্কেটে আসতে হয়েছে তাঁকে। গাড়ি থেকে নেমেই মেয়েরা মার্কেটের উদ্দেশে চলল। ধীরে-সুস্থে অবতরণ করে তিনিও অনুসরণ করতে গিয়ে দাড়িয়ে পড়লেন।

শুধু তিনি নন, সামনের ভদ্রলোকটিও দাড়িয়ে গেছেন আর চেয়ে আছেন তার দিকে। ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে চঞ্চলগামিনী মেয়ে ক'টিকে দেখলেন একবার। ঝকঝকে মস্ত গাড়িটার ওপরেও দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর সামনাসামনি তাকালেন আবার। কিছুটা সঙ্কুচিত, কিছুটা বা বিস্ময়ে বিহ্বল।

আপনি নন্দ নন্দদুলালবাবু না?

নন্দদুলালবাবুর ভেতরটাও নাড়াচাড়া খেয়েছে একটা। —হ্যা কি আশ্চর্য, আপনি দত্ত সাহেব না।?

ভদ্রলোক চকিতে একবার আপাদমস্তক দেখে নিলেন তাকে। তারপর মার্কেটের প্রবেশপথে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন মেয়েক'টি ভেতরে চলে গেছে। আড়চোখে গাড়িটাও দেখলেন আর একবার, হাসলেন তারপরে। নিষ্প্রভ হাসি।—বহুকাল পরে দেখা, আপনি চিনতে পেরেছেন তাহলে?

পারলেও নন্দদুলালবাবুর মুখে হাসি ফোটেনি তখনো। দেখেছেন। দত্ত সাহেবই বটে। শাদা ট্রাউজার শাদা হাফশার্ট একটু মলিন, মাথার চুলও বেশির ভাগই শাদা, মুখে সুস্পষ্ট বার্ধক্যের ছাপ। তারপর উৎফুল্ল মুখে হেসে উঠলেন নন্দদুলালবাবুও। — চিনতে নিশ্চয় পেরেছি, কিন্তু নিজের চোখকেই যেন একদিন দু'দিন তো নয়, প্রায় দু'যুগ হয়ে গেল, আপনার চোখও তো কম নয়।

ভদ্রলোক সসঙ্কোচেই একটু হাসলেন আবার।—আমি আপনাকে আর একদিনও দেখেছিলাম বোধহয়, মেট্রো না কোনো এক সিনেমার পাশে গাড়িতে বসেছিলেন, সিনেমা ভাঙতে ওই মেয়ে ক'টি এসে উঠল, তখন অবশ্য ঠিক চিনতে পারি নি, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন চিনি—আপনি খুব বদলান নি।

হঠাৎই যেন ভারী খুশি হয়ে উঠলেন নন্দদুলালবাবু। হাসলেন সশব্দে। বললেন, আপনিই কি আর এমন বদলেছেন দত্ত সাহেব, চুলগুলোই একটু বেশি শাদা হয়ে গেছে—

দত্তসাহেব চকিতে একবার তাকালেন তার দিকে। গাড়িটাও চোখ দুটোকে টানছে থেকে থেকে। মার্কেটের প্রবেশ-পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন একবার। একটা বড় নিঃশ্বাস গোপন করে বললেন, এদিকে মার্কেটিং-এ এসেছিলেন বুঝি? মেয়ে তিনটি আপনার?

এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে নন্দদুলালবাবু উপচে উঠছেন যেন। অভূতপূর্ব খুশির আলোড়ন চলছে ভিতরে ভিতরে। প্রশ্নটা শুনে মুহূর্তের জন্য থমকালেন একবার। তারপর সহাস্যে জবাব দিলেন, হ্যা, সময় পেলে ওদের নিয়ে একটু-আধটু বেরুই আর কি।

চট করে পিছন ফিরে দেখে নিলেন। স্টিয়ারিং-এ থুতনি রেখে বসে আছে শম্ভুচরণ। ব্যাটা আবার এদিকেই চেয়ে আছে। দত্ত সাহেবের হাত ধরে দু'চার পা এগোলেন। পরে সানন্দে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আপনি—আপনি আছেন কোথায়, আছেন কেমন?

ভদ্রলোক খানিকটা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছেন মনে হয়।—আছি অনেক দূরে, শিবপুরের দিকে, একদিটায় আসতে হয় প্রায়ই...গত বছর রিটায়ার করেছি...এখন আর থাকাথাকির কি? আপনি তো বেশ ভালো আছেন দেখছি...কোন দিকে থাকেন?

একেবারে দক্ষিণে। বার দুই গলাখাঁকারি দিয়ে সহজ হলেন নন্দদুলালবাবু। দরাজ গলায হাসলেন, সবই আপনার অনুগ্রহে...। কিন্তু আব কিছু বলার অবকাশ হল না। মেয়েরা ফিরে আসছে। তাড়াতাড়ি বললেন, আপনাব ঠিকনাটা বলুন, যাব'খন আপনার ওখানে একদিন—

মেয়েরা কাছে আসতেই সাহস্যে বলে উঠলেন, কিগো মাযেরা, এরই মধ্যে পেয়ে গেলে? আমি জানতুম এখানেই পাবে—এই দেখ আমার এক বহুকালেব পুবানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হযে গেল—খুব বিশিষ্ট বন্ধু, যাও গাড়িতে ওঠো তোমবা, আমি আসছি।

মেয়েরা হাত তুলে বিশিষ্ট পুরানো বন্ধুব উদ্দেশে নমস্কাব জ্ঞাপন কবে গাড়িতে উঠল। সেদিকে চেয়ে আবাবও একটা বড় নিঃশ্বাস চাপলেন ভদ্রলোক। নন্দদুলালবাবু তাঁব হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে তেমনি উৎফুল্ল মুখে বললেন, আচ্ছা চলি দত্ত সাহেব, আজ তাড়া আছে একটু—ঠিক একদিন গিয়ে হাজির হব আপনাব বাড়ি—আব এদিকে আসেন যখন প্রাযই আবারও দেখা হযে যেতে পারে।

হাসতে হাসতে মেটিরে গিযে উঠলেন তিনি। শম্ভুচবণ স্টার্ট দিল। নন্দদুলালবাবু বক্র দৃষ্টিতে দেখে নিলেন, ভদ্রলোক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন।

মেয়েদের কলগুঞ্জন সুরু হযেছে পিছনে। পাশে স্তব্ধ মুখে গাড়ি চালাচ্ছে শম্ভুচরণ। নন্দদুলালবাবুর কোনদিকে চোখ নেই, কোনদিকে কান নেই। খুশিতে আনন্দে নিজের মধ্যেই ডুবে আছেন তিনি। আর হাসছেন একটু একটু।

চার-পাঁচ দিন বাদে নন্দদুলালবাবু সুরুচিকে বললেন, তোমার মাযেব কাছ থেকে একটা আরজি মঞ্জুর করে নিয়ে এসো দেখি। ঘণ্টা তিন-চারেকের জন্য গাড়িটা একটু ছেড়ে দিতে হবে আমাকে।

সুরুচি বলল, আপনি নিয়ে যান না গাড়ি, আমি মাকে বলে দেব'খন।

না না না—তুমি বলে এসো, বোলো বিশেষ দরকার।

আধ ঘণ্টা বাদে। পিছনের সীটে হেলান দিয়ে বসে আছেন নন্দদুলালবাবু। বেশ ধোপদুরস্ত হয়েই বেরিয়েছেন। নির্বিকার মুখে শিবপুরের দিকে গাড়ি ছুটিয়েছে শম্ভুচরণ।

শিবপুর এলো। ঘুরেফিরে নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে গাড়ি দাঁড়াল। নন্দদুলালবাবু বললেন, হর্ন বাজাও।

দ্বিতীয়বার জমজমে হর্ন বেজে উঠতেই প্রত্যাশিত ভদ্রলোকটি নিজেই বেবিয়ে এলেন। তারপর ত্রস্তে এগিয়ে এলেন গাড়ির কাছে। সহাস্যে দরজা খুলে নামলেন

নন্দদুলালবাবু। আগ্রহে এবং সঙ্কোচে প্রায় জড়িয়ে ধরে তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন গৃহস্বামী।

বেরুলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে। নন্দদুলালবাবুর চোখে হাসিখুশি উপচে পড়ছে তেমনি। ভদ্রলোকটিও এলেন সঙ্গে সঙ্গে। গাড়িতে উঠেই নন্দদুলালবাবু তাড়াতাড়ি নির্দেশ দিলেন, চলো।

এরপরে দিনকতক গাড়িটা একটু-আধটু বিগড়োতে শুরু করল মাঝে মাঝে। চার-পাঁচ ঘণ্টার জন্য গাড়ি নিয়ে ডুব দেয় শম্ভুচরণ, গাড়ি মেরামত করে নিয়ে ফেরে। তিন-চার দিন হল এ-রকম। তারপর আর দরকার হল না। শেষবার গাড়ি ঠিক করে নিয়ে খুশিতে যেন আটখানা হয়ে ফিরল শম্ভুচরণ।

সেই দিনই দুপুরে দেখা গেল ঘরের দরজা বন্ধ করে স্তব্ধ মুখে বসে আছে তিন মেয়ে। ছুটির দিন। বাসন্তী দেবী দোতলায় নন্দদুলালবাবু কি কাজে বেরিয়েছেন।

সুনীতির বিয়ের পর বিশেষ কথা কিছু থাকলে সুরুচিকেই আগে বলত শম্ভুচরণ। কিন্তু কলকাতায় আসার পর থেকে একেবারে যেন নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল এই মেয়েটাও। এতদিনে সুযোগ পেয়েছে শম্ভুচরণ। সুযোগের মত সুযোগ। নিরিবিলিতে সুরুচিকে বলেছে কিছু। এমন কিছু যে ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে সে। বোনেরা তার কাছ থেকে শুনেছে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত তারাও। ভয়ে কণ্টকিত।

সুরুচি মুখ খুলল প্রথম, শম্ভুদাকে বলেছি, এবার থেকে বেশির ভাগ তার সঙ্গে বেরুবে—কথা দিয়েছে, আমাদের না জানিয়ে মাকে কিছু বলবে না।

সুমতি ঠোঁট উল্টে বলল, হু। বলবে না। শম্ভুদা হাড়বজ্জাত—তার ওপরে কাকাবাবুকে দেখতে পারে না দু'চোখে, ঠিক বলবে দেখিস।

সুপ্রীতি একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ভেবেচিন্তে বলল, শম্ভুদাকে ধমকে দিয়ে বললি না কেন, তাতে কি হয়েছে, মেয়ের মতই তো উনি দেখেন আমাদের।

সুমতি সকলের ছোট হলেও মাথায় পাকা। বলল, সেজদি'টার কি বুদ্ধি, আমাদের মেয়ের মত দেখলে মা'কে কার মত দেখতে হয়? আর মেয়ের মত তো বলেন নি, মেয়েই বলেছেন।

সুরুচি হেসে ফেলেছিল। বলল, থাম মুখপুড়ি। কিন্তু ভাবনার অবসান হল না তাদের। আরো বলেছে শম্ভুচরণ। মাস্টারমশাই গাড়িপুরে ব্যবসা করেন মাসে দু'মাসে এক আধ বার কলকাতায় আসেন সকলকে দেখতে বাবার নামটাই যা শুধু নিজের বলে চালান নি। কিন্তু তাদের এত ভালমানুষ কাকাবাবু। আর ভেবে উঠতে পারছে না তারা।

এরপর ক'দিন পড়াশুনাও জমল না। নন্দদুলালবাবু অনুযোগ করেন কিগো, পড়াশুনা সব সিকেয় তুললে নাকি তোমরা?

যে-যার বই-খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে তারা। এই চকিত মনোযোগ দেখে নন্দদুলালবাবু মৃদু হাসেন।

পুজো এসে গেল। পড়াশুনায় এমনিতেই ছেদ পড়ল দিনকতক। পুজোর আনন্দেও মেয়েরা শঙ্কিত সর্বদা। মায়ের ডাক শুনলে তিনজনেরই মুখ শুকোয়। পুজোর ক'টা দিনও শম্ভুচরণকে খুশি করতে পারে নি। মায়ের জন্যই কাকাবাবুকে বাদ দিয়ে একদিনও ওর সঙ্গে বেরুতে পারেনি তারা। বলতে গিয়ে উল্টে শম্ভুচরণের সামনেই মায়ের কাছে ধমক খেয়েছে একদিন।

পুজো কেটে গেল। তার পরে আরও দু'চার দিন। সেদিন সকালে মেয়েরা যথারীতি পড়তে আসতেই শম্ভুচরণ চুপি চুপি ওপরে উঠে গেল। দিন দুই তিন হল বাসন্তী দেবী অল্প অল্প জ্বরে ভুগছেন। নিচে নামেন নি তিনি।

প্রথমে বুঝে উঠছিলেন না কিছুই। পরে শুষ্ক, কঠিন হল সমস্ত মুখ। কর্ত্রীর সে-মূর্তি শম্ভুচরণ চেনে। এবারে আস্তে আস্তে একটা পোস্টকার্ড এগিয়ে দিল সে বলল, এটা আজ সকালে এসেছে, সেই ভদ্রলোকেরই চিঠি

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বাসন্তী দেবী তাকালেন তার দিকে। শম্ভুচরণ কুঁকড়ে গেল যেন। চিঠিখানা একবার উল্টেপাল্টে দেখলেন তিনি

এ বাড়ির ঠিকানাও দিয়ে এসেছেন?

শম্ভুচরণ সবিনয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে না, সেদিন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হতে ঠিকানাটা আমার কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন—।

চিঠিখানা সামনে পড়ে আছে। বাসন্তী দেবী আড় চোখে পড়ে নিলেন সবটা। সাধারণ চিঠি। বিজয়ার সম্ভাষণ জানিয়েছেন নন্দদুলালবাবুকে মেয়েদেরও প্রীতি-শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। লিখেছেন, গাজিপুরের ঠিকানাটা তার জানা নেই বলে কলিকাতার এই ঠিকানায় চিঠি দিলেন, যথাস্থানে রিডাইরেক্টেড হবে এই আশায়। কবে পর্যন্ত কলকাতা আসার সম্ভাবনা, তাও জানতে চেয়েছেন।

পাথরের মত বসে আছেন বাসন্তী দেবী। রক্তবর্ণ দেখাচ্ছে মুখ। কিন্তু ভাবছেন কি বোঝা যায়। মুখ না তুলেই এক একবার তাকাচ্ছেন শম্ভুচরণের দিকে। শম্ভুচরণের ভিতরটা শুকিয়ে আসছে তাতেই।

মার্কেটে যে-দিন প্রথম শুনলি আমায় বলিস নি কেন

ভালো করে না জেনেশুনে আপনাকে বলা—শিবপুরে গাড়ি নিয়ে যেতে আর সন্দেহ থাকল না। তারপর ফাকমত সেদিন দেখাও হয়ে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে

দেখা হয়ে গেল না তুই দেখা করলি?

এত শান্ত প্রশ্ন যে শম্ভুচরণ বিব্রত বোধ করতে লাগল। ভালো করেছে কি মন্দ করেছে, বুঝে উঠছে না। শম্ভুচরণ নিরুত্তর।

সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল যখন, তুই মিছে কথা বলতে গেলি কেন? সত্যি কথাটা বলে দিলি নে কেন?

ভদ্রলোক অর্থাৎ দত্তসাহেবের জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে শম্ভুচরণ বলেছিল, এ-বাড়িতে নতুন কাজে লেগেছে সে, কিছুই জানে না। ঢোক গিলে জবাব দিল, আপনাকে না জানিয়ে আমার বলাটা কি ঠিক হত?

কিছুক্ষণ মুখ না তুলে বাসন্তী দেবী আরো দু'চারবার তাকালেন তার দিকে। মনে মনে তার বুদ্ধির প্রশংসাই করলেন হয়ত।

আচ্ছা তুই যা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রস্থানোদ্যত হল শম্ভুচরণ।

শোন, দাঁড়া—

সশঙ্কে ফিরে দাঁড়াল।

মেয়েদের কাছে মুখ খুলবিনে, সাবধান— !

প্রস্থান করে বাঁচল শম্ভুচরণ। মেয়েদের জন্য একটুও ভাবনা নেই তার। এতবড় ব্যাপারটা তারা জেনেও চুপ করে আছে যখন, চুপ করেই থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত।

অব্যক্ত ক্রোধে বাসন্তী দেবী মূর্তির মত বসে আছেন সেই থেকে। অতি বড় বিশ্বাসের মূলে ততো বড় আঘাতই লেগেছে। সর্বাঙ্গে বিঁধছে যেন। মেয়েদের ডেকে পাঠাতে গিয়েও ডাকলেন না। তাঁর আচরণ ওদের বিস্ময়ের কারণ হবে বলেই বোধহয়।

কিন্তু মায়ের সে থমথমে মূর্তি দেখেই রক্ত জল মেয়েদের। পাশের ঘরে এসে বোবার মত বসে রইল তারা। পরদিন সকালে পড়তে আসতে নন্দদুলালবাবু প্রথমেই সহাস্যে জিজ্ঞাসা কবলেন, অমন শুকনো মুখ কেন সব, সকাল না হতেই মায়ের বকুনি খেয়ে এলে নাকি ?

জবাব না দিযে তাড়াতাড়ি তারা বই-খাতা নিয়ে বসল। কোনরকমে পড়াশুনার পাট চুকিয়ে প্রস্থানও করল যাব যার।

নন্দদুলালবাবু অবাক হলেন একটু।...ভাবছেন। কিছুদিন ধরেই মেয়েগুলোর সেই হাসিখুশি নেই যেন।

বাইরে এসে দেখেন, শম্ভুচরণ দরজার কাছে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কে বেরুবে শম্ভু ?

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল শম্ভুচরণ, মা—

ক'দিন ধরে তাঁর প্রতি সুস্পষ্ট একটা অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করে আসছেন নন্দদুলালবাবু। বললেন, উনি অসুস্থ শুনেছিলাম, এই রোদ্দুরে বেরুচ্ছেন ?

পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন। বাসন্তী দেবী। নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় দু'পা সবে দাঁড়ালেন নন্দদুলালবাবু। শম্ভুচরণ তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিল। বন্ধও করল। নিজের আসনে বসে গাড়ি চালিয়ে দিল সে। দাঁড়িয়েই ছিলেন নন্দদুলালবাবু। হাসলেন হঠাৎ। মহিলাটির মেজাজের ঠিক-ঠিকানা পেলেন না আজও। মনে হচ্ছিল, একখানা জমাট-বাঁধা ঝড় মোটরে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শর্মাচার্যের কালো মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে একপ্রস্থ। অদূরে বাসন্তী দেবী বসে। স্থির কঠিন।

হাতের পোস্টকার্ডখানা সেই থেকে নাড়াচাড়া করছেন শর্মাচার্য। অনেকক্ষণ বাদে

আস্তে আস্তে বললেন, একটা অনুরোধ, যা হোক কিছু বলে সসম্মানে যেতে দিন তাঁকে, এ-সব কিছু বলবেন না।

বাসন্তী দেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিলেন তাকে। অনুচ্চ কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন, আপনার কি সব কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। এই চিঠি যিনি লিখেছেন তাকে ঠিক না চিনলেও অনেকটাই জানি।

তা হলে?

তা হলেও। জীবনের গোড়ায় এই লোকটির কাছেই বোধ করি সব থেকে বড় ঘা খেয়েছিলেন উনি। চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বাধা দিয়ে উঠলেন বাসন্তী দেবী, আমি এ-সব ফিরিস্তি শুনতে চাইনে আচার্য মশাই, বরখাস্ত অমন অনেকেই হয়, তা বলে এ রকম—

কথাটা শেষ করলেন না আর। একটু নীরব থেকে শান্ত কণ্ঠেই শর্মাচার্য বললেন, আমি তার হয়ে আপনার কাছে সপারিশ কিছু করছিনে। কারণ আমার চোখে উনি ছোট হয়ে যাননি এরপরেও। চাকরি গিয়েছিল ওই বয়সে আর ওই বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে ওপরঅলার ধামাধরা এই লোকটার কাছে হাত কচলে চলতে পারেন নি বলে। কিন্তু আঘাতটা সেজন্যেও নয়—পনের দিন বাদে তার বিয়ে স্থির ছিল, সেকথা জানিয়ে এই দত্ত-সাহেবের কাছে ছেলের হয়ে জোড় হাত করে ক্ষমা চেয়েছিলেন এর বুড়ো বাবা। জবাবে সশ্লেষে ইংরেজীতে ব্যঙ্গ করেছিলেন দত্ত সাহেব, এ গাল হ্যাজ বিন সেভড দেন একটি মেয়েকে তা' হলে রক্ষা করা গেছে।

এরকম কিছু শোনার জন্য বাসন্তী দেবী প্রস্তুত ছিলেন না। স্তব্ধ গাম্ভীর্যের মাঝেও থতমত খেয়ে গেলেন কেমন।

শর্মাচার্য বললেন, সেই থেকে শুধু ওই মেয়ে কেন, সব মেয়েই রক্ষা পেয়েছে তার জীবন থেকে। ছেলেমেয়ে মানষ করে অন্যের সংসারের শ্রী ফেরানো ছাড়া আর কিছু তিনি করেন নি। কিন্তু এই সত্যটা গোপন করে ওই একটি মাত্র লোকের চোখে নিজেকে যদি উনি সুখ-সম্পদে-ভরা ঈর্ষার পাত্র করে তুলেই থাকেন, অতি বড় জ্বালার থেকেই করেছেন। রক্ত-মাংসের মানুষ তো, পাথর নয়

সাড়াশব্দ নেই কিছুক্ষণ। বাসন্তী দেবী বসে আছেন গুম হয়ে। ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠেই বললেন শেষে, কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি এরপর?

কিছু করতে বলছি না। নিজের সম্মানটুকু নিয়ে শুধু যেতে দিন তাকে—সেটুকু গেলে তার সবই যাবে।

গাড়ি থেকে নেমে হন-হন করে পড়ার ঘরের পাশ কাটাতে গিয়েও থমকে দাড়ালেন বাসন্তী দেবী। মেয়েরা ওপরে। ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবলেন কি। এগোলেন ঘরের দিকে। কিন্তু দরজার কাছেই দাড়িয়ে পড়লেন আবার।

বুকে একটা বই, চেয়ারের কাধে মাথা, নন্দদুলালবাবু তন্দ্রাচ্ছন্ন।

কিছুক্ষণ দাড়িয়ে বাসন্তী দেবী নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। সে-দিনটা গেল। তার পরের দিনও। বাড়ির আবহাওয়াই যেন বদলে গেছে আরও। থমথমে গুমোট একটা।

মেযেবা ভযে জডসড। মাযেব মুখেব দিকে সাহস কবে চাইতে পাবে না। মুখ অত লাল কেন সর্বক্ষণ? আবাব জ্বব হচ্ছে? কিন্তু গাযে হাত দেবে কে? শম্ভুচবণকে এক নজব দেখেই সব বুঝে নিযেছে তাবা।

দু'বাত্রি চোখে-পাতায এক কবতে পাবেন নি বাসন্তী দেবী। তৃতীয দিন সন্ধ্যাব পবে ডাক পডল শম্ভুচবণেব। ডাক পডবে জানত। কেন, তাই শুধু জানত না।

আবাম-কেদাবায মাথা বেখে বাসন্তী দেবী অর্ধশযান। সামনেব তেপাযায কতগুলো নোটেব উপব একটা মুখ-বন্ধ খাম।

শম্ভুচবণ এলো।

ইজিচেযাব থেকে মাথা না তুললেই বাসন্তী দেবী জিজ্ঞাসা কবলেন, খাওযা হযেছে?

আজ্ঞে হ্যা।

তোব জিনিসপত্র যা আছে সব গুছিযে নে। বাতেব গাডিতেই গাজিপুব যেতে হবে।

হা কবে চেযে বইল শম্ভুচবণ। কি শুনছে বুঝছে না।

ওই টাকা নিযে যা, তোব এ মাসেব মাইনে ছাডাও একশ' টাকা বেশি আছে। চিঠিখানা ওব হাতে দিবি, কোম্পানীব কোন গাডিতে তোকে কাজে লাগিযে দিতে বলেছি।

কাঠেব পুতুলেব মত দাডিযে বইল শম্ভুচবণ, আচমকা প্রচণ্ড শক খেলে যেমন হয। বিমূঢ।

বাসন্তী দেবী আবাব বললেন, উনি কলকাতায এলে যা বলাব আমি বলব, কিন্তু একটা কথাও তোব মুখে শুনেছেন জানলে সেখানেও তোব চাকবি থাকবে না আব। যা।

বোধশক্তি-বোহিতেব মত দাডিযে বইল শম্ভুচবণ। নির্বাক, পাণ্ডুব।

যা—টাকা তুলে নে। এক ঘণ্টাব মধ্যে বেরুতে হবে। নডচড হবাব মত কণ্ঠস্বব নয। শম্ভুচবণেব সম্বিত ফেবে যেন। টাকা তুলে নিযে যন্ত্রচালিতেব মত চলে যায।

চোখ বুজে চেযাবে মাথা বেখে নিশ্চল শুযে আছেন বাসন্তী দেবী। উঠলেন। ভিতবেব বাবান্দায এসে দেযালে-ঝোলানো টেলিফোন গাইড খুলে নম্বব দেখতে লাগলেন।

পবদিন। শিথিল অবসাদে বাসন্তী দেবী আবাম-কেদাবায শুযে আছেন চুপচাপ। জ্বব-ভাবটা একেবাবে ছাডে নি। মুখভাব নির্লিপ্ত। বাগ-বিবাগেব চিহ্ন নেই। কোলেব ওপব বাংলা খববেব কাগজটা পডেই আছে, পডা হয নি। বেলা দশটা নাগাদ চাকব এসে খবব দিল, নিচে চাব-পাঁচজন লোক এসেছে মোটব কাবখানা থেকে।

আসবে জানাই ছিল। আলস্য ভেঙ্গে বাসন্তী দেবী উঠতে গিযেও উঠলেন না। দুই এক মুহূর্ত ভাবলেন কি। আদেশ দিলেন, দিদিমণিদেব কাউকে বল, মাস্টাবমশাইকে নিযে একবাব উপবে আসতে।

সুমতিকে অঙ্ক বোঝাচ্ছিলেন নন্দদুলালবাবু। অন্য দুই টেবিলেব দু'জন সামনে বই খুলে বেখেছে এই পর্যন্ত। আব আধ ঘণ্টা কাটাতে পাবলে সকালেব পাট চোকে। চাকব এসে সুরুচিকে জানালো, মাস্টাববাবুকে মা ওপবে নিযে যেতে বললেন।

একসঙ্গে বিষম চমকে উঠল তিন মেয়েই।

নন্দদুলালবাবুরও হাতের পেন্সিল থেমে গেছে।— আমাকে ?

হ্যাঁ, মা ওপরে ডাকছেন। জবাব দিয়ে চাকর চলে গেল।

বিস্মিত নেত্রে মেয়েদের দিকে তাকালেন নন্দদুলালবাবু। শুকনো, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তাদের মুখ। ভয় জিনিসটাই ছোঁয়াচে বোধ হয়। সহসা সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেলেন নন্দদুলালবাবু। মুহূর্তে দেহের সমস্ত রক্ত যেন শিরশির করে নেমে আসতে লাগল।

ক'দিন ধরে মেয়েদের মুখ অমন শুকনো কেন ?

অসময়ে অমন মর্তিতে বাসন্তী দেবী কোথায় বেরুলেন কাল ?

মুখের ওপর ক'দিন ধরে অমন ব্যবহার করছে কেন শম্ভুচরণ ?

শম্ভুচরণ। কোনদিন ভালো করে চেয়ে দেখেন নি তো। না, কি করে সম্ভব। কিন্তু পৃথিবী, দ্বিধা হও।

এই কিন্তুর সম্ভাবনায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন তিনি।

সুরুচি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। নিজের অজ্ঞাতেই উঠলেন নন্দদুলালবাবুও।

বাসন্তী দেবী খবরের কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, টেলিফোনে মোটর কারখানা থেকে কয়েকজন ড্রাইভার পাঠাতে বলেছিলাম—নিচে জনাকতক এসেছে শুনলাম। আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই, আপনি দেখেশুনে একজনকে রাখুন তো।

একেবারে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল নন্দদুলালবাবুর। এঃ সোয়াস্তি আর জীবনে পাননি বোধহয়, কিন্তু বিস্ময় বাড়ল চতুর্গুণ। অদূরে সুরুচিরও মুখখানা হয়ে উঠল বোবা পুতুলের মত।

শম্ভু মানে শম্ভুচরণের কি হল?

কাগজের বড় বড় হরপগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন বাসন্তী দেবী।—চলে গেছে। কতকাল থাকবে, তারও ঘর সংসার করা আছে।

ভয় গিয়ে নন্দদুলালবাবুর এবার দুর্ভাবনা দেখা দিল। —কিন্তু আমি ড্রাইভার ঠিক করব আপনার ঠিক

পছন্দ যাতে হয় দেখেশুনে সে-রকমই একজন রাখুন। শম্ভুকে খাওয়া-পরা ছাড়া পচাত্তর দিতুম।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলেন না নন্দদুলালবাবু। বিস্ময়ের ঘোরেই পায়ে পায়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

কিন্তু সুরুচির স্থান কাল ভুল হয়ে গেছে। ফ্যালফাল করে চেয়েই আছে মায়ের দিকে।

হাঁ করে দেখছিস কি, পড়শুনা হয়ে গেছে? ঘড়ির দিকে তাকালেন বাসন্তী দেবী।

এই—না— যাই। থতমত খেয়ে সুরুচি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোলো।

যেতে হবে না, দাঁড়া। কাগজের ওপর চোখ রেখেই ভাবলেন একটু।. জামাইকে

আমার নাম করে একটা চিঠি লিখে দে। তোর দিদিকে নিয়ে এসে বেড়িয়ে যাক দিন-কতক।

সুরুচি এবারে সত্যিই হাঁ করেই দেখতে লাগল তার মাকে। এমন সুন্দর আর এমন মিষ্টি জীবনে দেখেনি যেন। দৌড়ে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরার মত। ধমক খাবার ভয়ে ধড়মড়িয়ে ছুটল কাগজ-কলমেব সন্ধানে।

পুরুষকার

বড় মেয়ে ইন্দিরা নিবীহ মুখে যেন মায়ের দিক টেনেই বলল, না মা, এখনকার যত কিছু সব তোমার ওই নাবায়ণবাবুর কল্যাণে।

শুনে বমানাথবাবু হাসতে লাগলেন মুখ টিপে। দাদা আর ছোট বোন মন্দিবাও। মনোবমা দেবী বাগে গজগজ কবে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, দ্যাখ ইন্দি, বাড বেড়েছে খুব, না? ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ঠাট্টা করতে আর আটকায় না মুখে, লেখাপড়া শিখে মস্ত পণ্ডিত ভাবিস নিজেদের, কেমন?

এটুকুর জন্যেই বলা। ইন্দিরা মুখখানি করুণ করে তুলতে গিয়ে পিছন থেকে মন্দিরার চিমটি খেয়ে হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলেও। মনোরমা দেবীব সব রাগ গিয়ে পড়ল স্বামীব ওপর।— তোমার আসকারা পেয়ে পেয়েই ওরা অমন হয়েছে, নিজে তো দু'হাত এক করে কপালে ঠেকালে না কোনদিন. এখন এদেব সুদ্ধু দলে টানো আর হাসো খুব করে, যেন কত বাহাদুরির কথা।

বড় ছেলে প্রভাত প্রতিবাদ কবল তৎক্ষণাৎ।— আমাদেব তুমি মিথ্যে বাবাব দলে ফেলছ মা. রোজ ওই নারায়ণেব সাত বকমের প্রসাদ আর চন্নামৃত খেয়েই তো বেচে আছি. ভাত আর কটা খাই?

থাম, আর ফস ফস করতে হবে না। আছিসই তো বেচে. ঠাকুব-দেবতা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ারকি না করলে কাবও আর ঘুম হয় না। রাগ কবে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন তিনি।

রমানাথবাবু ছেলে-মেযের উদ্দেশে অনুযোগ করেন এবার, কেন যে তোরা এভাবে জ্বালাতন করিস যখন-তখন, একটা বিশ্বাস নিয়ে আছে. থাকতে দে না।

কিন্তু এ ধরনের বাক-বিতণ্ডায় খুশি যে সব থেকে বেশি তিনিই হন, সেটা তাঁর মুখে এখনও স্পষ্ট লেখা। ছেলেমেয়েরা নিজের থেকে কিছু না বললে অনেক সময় তিনিই উসকে দেন। তারপর মজা দেখেন চুপচাপ আর হাসেন।

এ-রকম প্রায়ই ঘটে। যেমন আজ। ছেলে বলেছিল, দু'টাকা দিয়ে লটারির টিকিট গছিযেছে এবারে একজন, কাল ড্রয়িং. যদি লেগে যায়—

রমানাথবাবু নিরীহ মুখে বলে ফেলেন, তোর মাকে ভাল করে ধরলেই তো লেগে যেতে পারে!

এর বেশি আভাসের দরকার নেই। ছেলে তৎক্ষণাৎ মাকে চড়াও করল. তোমার

নারায়ণকে ভালো করে একটু ভোগটোগ দিয়ে বলে-কয়ে দেখ না মা, যদি লটারিটা পাইয়ে দেন।

মা বললেন, অত ঠাট্টার কী আছে, ঠাকুর সদয় হলে সবই হতে পারে। কী ছিল এই সংসার আর কি হয়েছে, সে-শুধু আমিই জানি।

জবাবে বড় মেয়ে ইন্দিরার ওই টিপ্পনী এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের রাগ আর বাবার সকৌতুক নিস্পৃহতা।

এই হাসি-ঠাট্টা এবং রাগ-বিরাগের পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। বি.এ. পাস করেও চাকরির দুর্দিনে রমানাথবাবু সাপ্তাহিক বেতনে রাবার ফ্যাক্টরির কর্মক্ষেত্রে একদা ঢুকেছিলেন ট্রলি ঠেলার কাজ নিয়ে। শক্তি-সামর্থ্য ছিল ভদ্রলোকের। তার থেকেও বেশি ছিল উদ্যম। ট্রলি ঠেলা থেকে প্রোডাকশনে এসেছেন। সাপ্তাহিক বেতনেই নাইট ডিউটি করেছেন বছরের পর বছর। সর্বোচ্চ কাজের রেকর্ড বজায় রেখেছেন সর্বত্র। কোম্পানির প্রচারপত্রে তাঁর ছবি পর্যন্ত ছাপা হয়েছে একাধিকবাব। সাপ্তাহিক ছেড়ে মাসিক বেতন হয়েছে দু বছরের মধ্যে। শেষের দিকে প্রমোশন পেয়েছেন গড়ে প্রায় বছরান্তে একটা করে। নাইট ডিউটিব পালা অনেক আগেই শেষ হয়েছে। বর্তমানে বারোশো টাকা মাইনের মস্ত অফিসার তিনি। বিলিতি খেতাব বা ডিগ্রী থাকলে আরও কোথায় উঠতেন ঠিক নেই। বমানাথবাবু বলেন, এ সবই হল পুরুষকার, সে যার আছে তাকে ধাপার মাঠে ফেলে দিলেও দাঁড়াবে।

কিন্তু এই পঁচিশ বছরের ইতিহাস আবার মনোরমা দেবীর মুখে শুনলে অন্যরকম লাগবে। সকাল-বিকেল চার দফায় ছেলে পড়িয়েও পঁচিশ টাকা হত না মাসে। আর চাকরিও ন-টাকায় শুরু। কোলে ছেলে এসেছে তখন। ওই টাকায় সংসার চালাও, আবার ওই থেকে বাঁচিয়ে দেশে পাঠাও শ্বশুরের কাছে। চলে নাকি? দেনায় দেনায় হাড় কালি। শাশুড়ী অনেক আগেই গত হয়েছিলেন, চাকরির বছরখানেকের মধ্যে শ্বশুরও চোখ বুজলেন। কিন্তু আরও ছেলে থাকা সত্ত্বেও যাবার আগে নারায়ণ সেবার ভার দিয়ে গেলেন এইখানেই। নারায়ণের দয়া। নারায়ণ এলেন। নিজেদের হোক না হোক, নারায়ণ সেবার ব্যবস্থায় কোনদিন কোন ত্রুটি রাখেন নি মনোরমা দেবী। অভাবের সংসারে বাড়াবাড়ি দেখে স্বামী কতদিন বিরক্ত হয়েছেন, চোখ রাঙিয়েছেন। কিন্তু মনোরমা দেবী কান দেন নি মোটে, যা করার করে গেছেন। আর এখন? দেখছিস না কী থেকে কী হয়েছে? ঠাট্টা যে করিস, কোথায থাকতিস সব নারায়ণের অনুগ্রহ না হলে?

এই এক দুঃখ মনোরমা দেবীর। তেমন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই কাবও। ছেলেমেয়েদের যদিবা বকে-ঝকে বাগ মানানো গেল, ওই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে পেরে উঠলেন না কোনদিন। ঠাকুরের পায়ে মাথা নোয়ানো যেন মস্ত হাসির ব্যাপার। যতটা উঠেছে তাতে তো মন ওঠে না দেখি। বারোশো টাকা মাইনেতেও মাসের শেষে টানাটানি। তার ওপর আবার চিন্তা, পরে কি হবে, এতবড় সংসারের খরচ বজায় থাকবে কী করে? মনোরমা দেবীর বিশ্বাস, পরের কথা না ভেবে এখনও ঠাকুরেব পায়ে একটু ভক্তি করে নির্ভর করতে পারলেই আর ভাবনা-চিন্তার কারণ থাকে না। পুরুষকার

আছে তো আছে, কিন্তু তার সঙ্গে একটু ভক্তি-টক্তি থাকতে ক্ষতি কী?

কিন্তু বলেন কাকে? সুখের থেকে সোয়াস্তি ভাল, বলে কাজ নেই। অনেক বলেছেন আর হাড়ে হাড়ে চিনেছেন। বারো মাস নারায়ণের ভোগের ব্যাপার লেগেই আছে। ভোগ শেষ হতে না হতে মনোরমা দেবী ছেলেমেয়েদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসেন আশীর্বাদী নিতে। কিন্তু কর্তাকে?

বাড়িতে থাকলে ডাকলেই আসবেন, আশীবাদী নেবেন। কিন্তু মনোরমা দেবী ভুল করেও ডাকেন না তাকে। ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত হেসে ওঠে, যেন একটা মজার কিছু ঘটেছে। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এরকম হাসাহাসিতে মনোরমা দেবীর বিষম ভয়। ওভাবে আশীর্বাদী নিলে ঠাকুর তুষ্ট না হয়ে রুষ্ট হতে পারেন ভেবেই কন্টকিত তিনি। পুরুতকে বলেন, ওর আশীর্বাদী আগে সংকল্পে উৎসর্গ করে নিন ঠাকুরমশাই।

বড় সংসার। তিন ছেলে, তিন মেয়ে। বড় ছেলে এম-এসসি পাস করে সবে একটা প্রাইভেট কলেজে মাস্টারিতে ঢুকেছে। সামান্য মাইনে। রমানাথবাবু খুশি নন একটুও। মাস্টারিতে একবার মন বসলে আর দেখতে হবে না, ভবিষ্যৎ কালো। ভবিষ্যতের কথা মনে হলেই অসহিষ্ণুতায় গরগর করে ওঠেন তিনি। ছেলেটার যদি একটু উদ্যম থাকত। কটা বছরই বা আর আছে নিজের চাকরির। তারপর? তারপরের কথা মনে হলেই ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠেন রমানাথবাবু।

বারোশো টাকার সংসার থেকেও অনটন গেল না। কেমন করে যাবে? ইন্দিরা এম-এ পড়ছে, মন্দিরা এবারে এম-এ'র, পড়া শুরু করবে। তার পরের কটি পর পর ইস্কুলে পড়ছে। ইনকাম ট্যাক্স, লাইফ ইন্সিওরেন্স, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাদ দিয়ে ঘরে আসে ন'সো টাকা। দু'শো টাকা বাড়িভাড়া দেন, মেয়েদের গানের মাস্টার আর বাচ্চাদের দুটি পড়ার মাস্টার এই তিন মাস্টারকে গুনে দিতে হয় দু'শো টাকা। বাকি থাকল পাচ-শো। এতবড় সংসারে মাস গেলে পাচশো টাকার পাচ পয়সাও থাকে না।

মনে মনে অনেক হিসেব করেছেন রমানাথবাবু। হিসেব করে মাথা গরম করেছেন। চাকরিতে পেনসন নামমাত্র। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ভরসা। কিন্তু সে ভরসা আর কতটুকু? অথচ ইস্কুলের গণ্ডি পেরুতেই তিনটি বাকি এখনও। এসব চিন্তার মধ্যে স্ত্রীর নিশ্চিন্ততা দেখলে মেজাজ মাঝে মাঝে বিগড়েই যায় রমানাথবাবুর। যেন সত্যিই ওর নারায়ণ ঠাকুর এসে সব ভাবনা-চিন্তার অবসান করে দিয়ে যাবে।

যতক্ষণ কাজ নিয়ে থাকেন ভদ্রলোক, ভালো থাকেন। অবকাশ মাত্রেই একটা বিষণ্ণতার ছায়া এসে পড়ে কেমন। এমন দিনে বড় ছেলে একটা খবর নিয়ে এলো। খবর ঠিক নয়, কথায় কথায় বলল, তার এক সহপাঠী বিলেত যাচ্ছে কিসের ট্রেনিং নিতে, দু-তিন বছর বাদে ফিরে এসে মোটা গদিতে বসে যাবে সুযোগ সুবিধা থাকলে সেও যেতে পারত, ইত্যাদি।

আর কারও কানে ঢুকলো না তেমন, কিন্তু রমানাথবাবুর কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মর্মে গিয়ে পৌঁছুল। বাইরে থেকে বোঝা গেল না কিছু। নিস্পৃহ মুখে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কিসের ট্রেনিং, ক'বছরের ট্রেনিং, কত টাকা লাগবে মাসে, ফিরে এলে কী হতে পারে ইত্যাদি।

সে রাতে আর ঘুম হল না রমানাথবাবুর। তন্দ্রার মধ্যেও মগজে একটা হিসেব-নিকেশ চলতে লাগল। অফিসের কাজেও মন বসল না পরদিন। বেশ অসুস্থ দেখালো তাঁকে। তবু ভাবনা ছাড়তে পাবলেন না। মনোরমা দেবী লক্ষ্য করছিলেন। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে তোমার বলো তো?

কিছু না।—তিনি পাশ কাটালেন।

কিন্তু রাত্রিতে একান্তে ডাকলেন স্ত্রীকে। বললেন, একটা কথা ভাবছি—

সে তো কদিনই দেখছি, কী ভাবছ এত?

ছেলেকে বিলেত পাঠালে কেমন হয়?

জবাবে মনোরমা দেবী হাঁ করে চেয়ে রইলেন খানিক। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, বিলেত পাঠাবে, টাকা কোথায়?

এরই মধ্যে ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

ব্যবস্থাটা কী করে সম্ভব মনোরমা দেবী ভেবে পেলেন না। বললেন, তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি, মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে না— তাই বরং ভাব বসে, কাজ হবে।

কিন্তু রমানাথবাবু অতশত ভাবতে রাজী নন এখন। মেয়েদের বিয়ের ভাবনা পরে ভাববেন। ভবিষ্যতের অনটন-সম্ভাবনার সঙ্গে কোনও আপস নেই তার। সেটাই বোঝাতে বসলেন স্ত্রীকে।—এর পরে চলবে কী করে ভেবে দেখেছ? কটা বছর আছে আর চাকরির, তারপর? তোমার নারায়ণঠাকুর তো সত্যিই আর হাতে করে দিয়ে যাবেন না কিছু। কিছু করলে তবেই কিছু হওয়া সম্ভব।

ভাবনার বোঝা খানিকটা স্ত্রীর কাঁধে চাপিয়ে একটু হালকা হলেন তিনি। শলা-পরামর্শ চলল। মনোরমা দেবী বললেন, যা ভালো বোঝ কর, কি দিয়ে কি হবে আমি তো বুঝছি না।

মন স্থির করে ফেলেছেন রমানাথবাবু। ছেলের ডাক পড়ল। বললেন, ওই যে ট্রেনিংয়ের কথা বলেছিলি, কালই একটা টেলিগ্রাম করে দে, সীট পাওয়া যাবে কি না, পেলে তোর জন্যে রিজার্ভ করা হয় যেন, তাদের জবাব এলেই টাকা পাঠানো হবে। আর এদিকে তোর সেই বন্ধুর কাছে খোঁজখবর নে সব।

ছেলের বিস্ময় কাটতে না কাটতে টেলিগ্রাম চলে গেল। যথাসময়ে জবাবও এলো। এবারে যাত্রার উদ্যোগ।

এ কদিনে বাড়ির হাওয়া পর্যন্ত বদলে গেছে। কখনো আনন্দ, কখনো অস্বস্তি। রমানাথবাবু চিন্তিত, কিন্তু বিচলিত নন। মনে মনে বরং গর্বিত একটু। এরই নাম পুরুষকার, যেমন করে হোক ব্যবস্থা একটা হবে, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে আর কী হবে! ঘাবড়াবার মানুষ নন তিনি।

তবু পাকাপাকি হিসেবনিকেশ একটা করাই চাই। চারশো টাকা করে লাগবে মাসে। কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করতে বসলেন। বললেন, এদিকে তো দেখছি গানের মাস্টার আর পড়ার মাস্টার তুলে দিলে দু-শো টাকা বাঁচে মাসে—তোমার দিকের কতটা কী করতে পার?

মনোরমা দেবী প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, দুধ আর বাজার খরচ কমিয়ে টেনেটুনে পঞ্চাশ টাকা বাঁচাতে পারি।

আরও পঁচিশ টাকা বাঁচলে খুসি হতেন রমানাথবাবু আর সেটা বাঁচাবার জায়গাও আছে। কিন্তু উল্লেখমাত্রে একটা গোলযোগ ঘটার সম্ভাবনা, স্ত্রীর মুখের দিকে এক নজব় চেয়েই সেটা আঁচ করে নিলেন। আপিস থেকে মাসে একশো টাকার মত সংগ্রহ করতে পারবেন, বছরের বোনাসে সেটা শোধ হয়ে যাবে। যাই হোক, আর ঘাঁটাঘাঁটি না করে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

হিসেবের দিকটা মিটে যেতে বাড়ির সকলেই উৎসাহিত। রমানাথবাবুর উদ্যম যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ইন্দিরা মন্দিরা সানন্দে ছোটদের পড়ানোর ভার নিয়ে ফেলল। নিজেদের গানেব মাস্টার বাদ পড়ে যাওয়ায় ভিতরটা একটু খচখচ করলেও দাদার বিলেত যাওয়ার আনন্দটাই বড় হয়ে উঠল তাদের।

বিকেলের দিকে চুপিচুপি বেরিয়ে ইন্দিরা নির্দিষ্ট একটি স্থানে গিয়ে নির্দিষ্ট একজন মানুষকে নিরালায় ডেকে এনে জানাল, সব হয়ে গেল, এখন তিনটি বছব চুপচাপ হাওয়া খাও বসে বসে।

খবর শুনে সে বেচারী হাওয়ার বদলে আপাতত খাবি খেতে লাগল।

মন্দিরাও তাই করল। এ ছেলেটি সদ্য য়ুনিভার্সিটিব পাট শেষ করেছে। এখন মনের মত একটা চাকরির অপেক্ষা শুধু। পরের শুভসম্ভাবনার আসায় চাকবিব চেষ্টাও করছে কোমর বেঁধে। মুখের সামনে হাত নেড়ে মন্দিরা স্পষ্ট জানিয়ে দিল, দাদা বিলেত যাচ্ছে, এখন তিনটি বছর নো বিয়ে, নট কিচ্ছু। বাবা এখন কোনদিকে এক পয়সা খরচ করতে পাববে না।

যথাদিনে বিদেশযাত্রা সম্পন্ন হল। ভবিষ্যতেব আশায় রমানাথবাবু বুকেব একখানা হাড় কিছুকালের জন্য দূরে সরিয়ে দিলেন যেন।

এর পরের দু-বছরের সমাচাব সংক্ষিপ্ত। ছেলে ঠিক ঠিক পাস করে যাচ্ছে। বমানাথবাবুব পুরুষকারের গর্ব দ্বিগুণ বেড়েছে। মনের দিক থেকে আরো অনেক বেশি তাজা হয়ে উঠেছেন তিনি। মনোরমা দেবীর নারায়ণের বাজেটে যে হাত দেওয়া হয়নি, ঠাট্টাব ছলে সে-কথাও শোনান আব মুখ টিপে হাসেন। মেয়েবা জোরেই হাসে, বলে, মায়েব নাবাযণ পূজো কিন্তু আবো বেড়ে গেছে বাবা, ফিরে এসে দাদা নিশ্চয হাজার টাকায় শুরু কববে!

শুধু মেয়েদেব নয, মনোরমা দেবীবও মনে মনে তাই আশা। সে আশা পবোক্ষে বমানাথবাবুই সঞ্চার করেছেন সকলেব মনে।

তৃতীয় বছরে খবর এলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে চাকবিও করছে, টাকা আর পাঠাবার দরকাব নেই। শুনে সকলেই খুশি। কেবল রমানাথবাবু মনে মনে খুঁতখুঁত করতে লাগলেন একটু। পরীক্ষাব বছর, চাকরি নেবার দরকার ছিল কি?

পবীক্ষা হয়ে গেল। পাসের খবব এলো। কিন্তু ছেলে ফিববে কবে সে খবরটাই শুধু আসছে না।

চিঠির পর চিঠি যেতে লাগল এখান থেকে। ছেলের এক জবাব, ভাল চাকরি সংগ্রহ না করে হাতে যা আছে সেটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা ঠিক নয়।

রমানাথবাবু গোপনে সন্ধান নিয়ে জানলেন, হাতে যা আছে মোটামুটি বেশ ভালই সেটা। আর শুধু হাতে নয়, ছেলে সেখানে পাকাপাকি ঘরেও এনেছে আর একজনকে। অতএব অদূর ভবিষ্যতে তার ফেরার সম্ভাবনাও নেই।

বাড়িতে স্তব্ধ শোকের ছায়া নামল।

রমানাথবাবুর মনে হল, তাঁর মেরুদণ্ডটা কে বুঝি দুমড়ে ভেঙে ফেলল।

মনোরমা দেবী ঠাকুরঘরে হত্যা দিলেন।

ইন্দিরা মন্দিরা মুখ কালো করে বসে রইল পাশের ঘরে। ছোটরাও নির্বাক, বিভ্রান্ত।

সাত দিন কেটে গেল। বাড়িতে টুঁশব্দটি নেই। তারপর রমানাথবাবুই সমস্ত স্তব্ধতা খানখান করে ভেঙে দিলেন একদিন। হাঁকডাক করে ছেলেমেয়েদের ডাকলেন। তদবির-তদারক করলেন। ছেটিরা হাপ ছেড়ে বাঁচল। ইন্দিরা মন্দিরা আশায় আশায় বাবার মুখের দিকে তাকালো। এমন কি মনোরমা দেবীও যেন সুস্থ হলেন একটু।

আরও দু-তিন দিনে বাড়ির আবহাওয়া সহজ হয়ে এলো অনেকটা।

রাত্রি। মনোরমা দেবী মেঝেতে শোন। ছোটো ছেলেটি এবং রামানাথবাবু খাটে। ঘুম আসছে না, রাজ্যের ভাবনা ভাবছেন মনোরমা দেবী। খাটের ওপর মানুষটিও এপাশ-ওপাশ করছেন টের পাচ্ছেন। নিঃশব্দে রাত বাড়ছে। খাটের নড়াচড়া বন্ধ হয়েছে। ঘুমিয়েছেন বোধহয়। উঠে মশারি সরিয়ে মনোরমা দেবী বাইরের সরু বারান্দার অন্ধকারে এসে বসলেন চুপচাপ।

রাত বাড়তে লাগল।

হঠাৎ কান খাড়া করে ঘরের দিকে তাকালেন মনোরমা দেবী। খাট থেকে নেমে মানুষটা পা টিপে তাঁর মশারির পাশ দিয়ে পাশের ঘরের দিকে চলেছেন। খুট করে শব্দ হল একটু। পাশের ঘরের শেকল খোলার শব্দ।

পাশের ঘর ঠাকুরঘর।

অন্ধকার। এগিয়ে এসে দোরগোড়া থেকে মনোরমা দেবী অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেখলেন, নারায়ণের সিংহাসনের সামনে উবুড় হয়ে স্থাণুর মত পড়ে আছেন মানুষটা নিথর নিশ্চল, আর উঠবেন না যেন।

কতক্ষণ ঠিক নেই। সচকিত হয়ে বারান্দার অন্ধকারে ফিরে এসে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মনোরমা দেবী।

দরজায় শেকল তোলার শব্দ হল আবার একটু। পা টিপে খাটের কাছে এসে দাড়ালেন ভদ্রলোক। মশারি সরিয়ে সন্তর্পণে শয্যায় উঠে গেলেন।

এই প্রথম মনে হল মনোরমা দেবীর, তার পায়ের নিচে মাটি নেই।

ছায়া

গোড়ায় একটু ভূমিকা দরকার।

শ্মশানে এলে অনেক সময় শ্মশান-বৈরাগ্য দেখা দেয় এ-রকম কথা শোনা ছিল। স্থূল স্মৃতিভস্মের এই শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে কত লোকের জীবন-ধারায় আমূল পরিবর্তন

ঘটে গেছে, তেমন দু-পাঁচটা নজির বোধ করি অনেকেই দেখাতে পারেন। মর-দেহ, মর-চিহ্নগ্রাসী আগুনের শিখায় নির্বাণের জাদুস্পর্শ লেগেছে নাকি কতজনের জ্বলন্ত বাসনায়। জীবনের তাৎপর্য বদলে গেছে। এর পরে নিরাসক্তুতার নামাবলী পরে তাঁরা নাকি বিচরণ করেছেন বা করছেন এই মায়াময় সংসারপথে। আর, সাময়িক মোহমুক্তি বা সাময়িক উদাসীনতার প্রলেপ মেখে ফিরেছেন পুণ্য দাহস্থান থেকে, তেমন সংখ্যাব তো শুনি লেখাজোখা নেই।

আমি শ্মশানে গেছি অনেক। কিন্তু শ্মশান-বৈরাগ্যের এ কারিগরি আমার জানা নেই। দাহস্থানে দেহ নামিয়ে প্রথম অনুভূতিতে ঘাড়কাঁধের ব্যাথাটাই চাড়িয়ে উঠতে চায়। সেটা দমন করে প্রথমে ছুটতে হয় রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে দাহ-কার্যের পরোগানা নিয়ে আসতে। সেটা হতে না হতে ছুটতে হয় কাঠের গুদামে।। শুধু স্পেশাল কাঠ নিলেই হবে না, তার সঙ্গে ভিজে কাঠ যাতে খুব বেশি চালান না হয়ে আসে তার জন্য সবিনয়ে সুপারিশ করতে হবে। চোখের ইঙ্গিতে বা গলা খাটো করে কিছু বাড়তি প্রাপ্তির আশ্বাস দিতে হবে শ্মশানচারী কাষ্ঠবাহককে। এদিকে দাহ-পূর্ব ক্রিয়ানুষ্ঠানের সরঞ্জাম এলো কিনা সে চিন্তাব অস্বস্তিও কম নয়। মৃতের সঙ্গে বিরোধ নেই কারো, শেষ কাজটুকু ঠিক ঠিক না হলে আত্মীয়-পবিজন ছেড়ে পুরোহিতের পর্যন্ত ভিতরটা খচখচ করবেই। ঘৃত, আতপ-তণ্ডুল, মধুপর্ক, চন্দনকাঠের গুঁড়ো, পঞ্চ-ধাতু প্রভৃতি সময়মত কাছে মজুত না থাকলে তিনি গবগব করে খানিকটা শাস্ত্রোপদেশ দিয়ে ফেলবেন।

এসব ব্যবস্থা হতে না হতে গঙ্গা থেকে ঘড়া ঘড়া জল এনে মৃতদেহকে স্নান করানোর তোড়জোড় করতে হবে। তোড়জোড় বলছি, কারণ শুনতে যত সহজ কাজে ততো নয়। কোথায় কোন তলায় পড়ে আছে গঙ্গা প্রায় খুঁজে বার করতে হয়। বড় বড় সিঁড়িগুলোর চার ভাগের তিন ভাগ ভেঙে উড়ে গেছে কোথায় ঠিক নেই। সে জায়গায় চিতার ছাই হাড় আধপোড়া কাঠ ভাঙা-কাচ আব ভাঙা-হাঁড়ির ছড়াছড়ি। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ওই জঞ্জাল ছড়ানো ভাঙা সিঁড়ি ধরেই নামতে হবে উঠতে হবে। এত পিছল এবং বিঘ্নসঙ্কুল প্রতিটি ধাপ যে একবার গড়ালে আরও চিতা বায়না করতে হবে। আমার একশ'বছরের দিদিমার আরজি ছিল, মরলে পরে তাঁকে নাভি-গঙ্গা করাতে হবে। অর্থাৎ গঙ্গা থেকে ঘড়ায় করে জল এনে স্নান কবানো চলবে না। দেহ গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে অর্ধেকটা ডুবিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে আসতে হবে। আমরা তাঁর ছেলেব ঘরের আর মেয়ের ঘরের ছত্রিশ জন নাতি মিলে সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলাম। পরে অবাক হয়ে ভেবেছি, ছত্রিশ জন নাতিব মধ্যে দিদিমা অন্তত ছ'জনকে সঙ্গে নিয়ে যান নি যে সেটা নিতান্তই দৈবের ব্যাপার।

তাই শ্মশান-দর্শনে অভিভূত হওয়া দূরের কথা, প্রতিবারই এখানে এসে এই জল নেবার সময় ভেবেছি, ফিরে গিয়ে প্রথম কাজ হবে ঘাটের দুরবস্থার জন্য লেখালেখি করে ঘাটকর্তাদের নাজেহাল করে তোলা। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে নি। প্রধান কারণ, ফিরে এসে কষ্টটা নির্বিবাদে ভুলে যাই। নিজের অজ্ঞাতে আর একটা অন্তর্নিহিত কারণও থাকতে পারে। তোড়জোড়ের ফলে শ্মশানের সুবন্দোবস্ত হলে

দৈবের পুরস্কারস্বরূপ আমারই চিতায় ওঠার সম্ভাবনাটা অসময়ে কাছে এগিয়ে আসবে কিনা কে বলতে পারে? যা আছে থাক। আর যে কখনও যেতে হতে পারে সেখানে সেটা একবারও ভাবতে ইচ্ছে করে না।

যাক, জল এনে স্নান করিয়ে শব চিতায় তুলেও বৈরাগ্য-চিন্তার অবকাশ নেই। দেহ তোলার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানচারীরা ঘিরে দাঁড়াবে খাটিয়া বিছানা এবং অন্যান্য যা কিছু সঙ্গে আছে তুলে নেবাব জন্য। নিয়মনিষ্ঠ এবং শুভার্থী পরিজনেরা (সাধারণত দূর-সম্পর্কের) তখন প্রতিরোধ করবেন তাদের। কি কি তাদের ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে আর কি কি চিতার সঙ্গে যাবে—সেও তুচ্ছ ব্যাপার নয়।

চোখের জলে চিতা ধরানোর পর খানিকটা হাঁপ ফেলে বসা। কিন্তু সংসারের অনিত্যতার রূপ চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠে না আরও দু-চারটে চিতা জ্বলতে দেখেও। কারণ সেখানেও শ্মশান-বন্ধুরা কর্মসমাপনে নিবিষ্টচিও। বলা বাহুল্য, সে-কাজের সঙ্গেও দার্শনিক চিন্তাব কোন যোগ নেই। দাহকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আগুনের তাতে আধপোড়া হয়ে লম্বা বাশ হাতে ঘন ঘন চিতা প্রদক্ষিণ করতে হয় চারদিক থেকে। দাহ-কাজে যে যত পাকা তার ততো বিশ্রাম কম। আর শেষের মাথায় তো একেবারে ঝুঁকে আসতে হবে ওই জ্বলন্ত চুল্লির সামনে। কড়া নজর রাখতে হবে শেষ অস্থিটুকু পর্যন্ত যেন পুড়ে ছাই না হয়ে যায়। সেটুকু গঙ্গাদেবীর প্রাপ্য। ব্যতিক্রম ঘটলে দাহকার্যই অসমাপ্ত মনে হবে। শুধু এটুকুর জন্যই কিরকম গলদঘর্ম হতে হয়, যাঁরা জানেন—তাঁরাই শুধু জানেন।

এই সব শেষ করেও বৈরাগ্য-চিন্তা নিয়ে তন্ময় হবার সুযোগ কোথায়? শ্মশান-নিযুক্ত কর্মচারীরা ছেঁকে ধরবে এবার বখশিশের জন্য। একজন দুজন নয়, কম করে আট-দশজন। দু টাকা বাড়তি পারিশ্রমিক দেওয়া এবং না-দেওয়ার টানা-হেঁচড়ায় রীতিমত বচসা হয়ে যেতে দেখেছি। সব থেকে রূঢ় ছন্দপতন যেন এটাই। দেখলে কে বলবে, অনিত্য অসার এই সংসার?

তাই বলছিলাম, শ্মশান-বৈরাগ্য কথাটা শুধু শোনাই ছিল, অনুভব করিনি কখনো। কিন্তু একবার এখানে এসে বিচিত্র রকমের ব্যতিক্রম ঘটল একটা। বিচিত্র কিছু যেন উপলব্ধি করতে হল। না, সেও শ্মশান-বৈরাগ্য নয়, শ্মশান-সঙ্গীত। সেটুকুই কাহিনী। শুনে আপনারা হয়ত অবাক হচ্ছেন। অবাক আমিও হয়েছিলাম। অবাক ঠিক নয়, আমার সামনের বাহ্য জগৎ আর দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল। আর সেই নিঃসীম ছুটির মধ্যে আস্তে আস্তে চোখ মেলছিল অন্তস্তলের আর কেউ।

ঘটনাটা বলি।

যে লোকান্তরিত দেহটি নিয়ে এসেছি আমরা, তিনি বিশেষ প্রিয়জন আমাদের। তাই মন একটু বেশি ভারাক্রান্ত ছিল। সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার পর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে কিছুক্ষণ হল। চিতাটি ধরেছেও বেশ। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলে অদূরে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে বসেছি। এতক্ষণ আর কোনদিকে চোখ যায় নি তেমন। আরও তিনটে চিতা জ্বলছে, একটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেই দিকের কর্মতৎপরতা দেখতে লাগলাম। আসন্ন সন্ধ্যার একটা ঘোলাটে ছায়া পড়ছে।

শ্মশান-গাম্ভীর্যে হঠাৎ ছেদ পড়ল একটু। যাঁবা দাঁড়িয়েছিলেন নিঃশব্দ আগ্রহে অনেকই তাঁবা ফিবে ফিবে তাকাতে লাগলেন শ্মশান-আঙ্গিনাব প্রবেশপথেব দিকে। ভাবলাম, আবাব কোনো শব এলো বোধহয। কিন্তু কৌতূহলটা ঠিক সে-বকমেব নয। কাবণ অদূবেব ছাত দেওযা বাঁধানো দাওযাব সন্ন্যাসী, আধা সন্ন্যাসী এবং গেরুযাবসন পবা পুরুষ-বমণীবাও সাগ্রহে উঠে এলেন (এঁদেব সব সময়েই ওখানে দেখা যায)।

পাযে পাযে এগিযে এলাম আমিও। কিছুই বোধগম্য হল না, বিস্মযটুকুই বাড়ল শুধু। শ্মশান-আঙ্গিনাব দিকে শান্ত পদক্ষেপে আসছেন একটি মহিলা। মহিলা বলছি বটে, পঁচিশ-ছাব্বিশেব বেশি হবে না। কিন্তু বযসেব থেকেও মুখেব সুশ্রী গাম্ভীর্যটুকুই আগে চোখে পড়ে। প্রিযদর্শনা, সুডৌল স্বাস্থ্য, পবনে চাবআঙুল কালো পেড়ে আটপৌবে শাড়ি, শাদা ব্লাউজ। এই পবিবেশে অমন শুচিশুভ্র নিবাসক্ত সৌন্দয মানায বটে, কিন্তু দেখাব সঙ্গে সঙ্গে এক অজ্ঞাত বেদনায ভেতবটা টনটনিযে ওঠে।

একজন সৌম্যদর্শন পুরুষ তাকে আগলে নিযে আসছেন। আগলে নিযে আসছেন, কাবণ তাঁদেব পিছনে এবং পাশে পাশে নানা শ্রেণীব এবং নানা বযসেব বিশ-পচিশ জন লোক আসছে। তাদেবও চোখে মুখে বিশেষ কৌতূহল এবং আগ্রহ। অথচ এবা যে ওই মহিলা বা আগন্তুকেব পবিচিত কেউ নয, সেটা একনজবেই স্পষ্ট বোঝা যায।

ভদ্রলোক এবং মহিলা শ্মশান আঙ্গিনায এসে দাড়ালেন। মহিলা একে একে চিতাকটিকে দেখলেন নিবীক্ষণ কবে। কোনো অভিব্যক্তি নেই মুখে। শান্ত উদাসীন। তাবপব পাযে পাযে এগোলেন শ্মশান সংলগ্ন বাধানো দাওযাব দিকে। তাব সঙ্গী ভদ্রলোকেব হাতে কিছু ছিল কিনা এতক্ষণ লক্ষ্য কবি নি। এবাবে দেখলাম, তাডাতাডি এগিযে গিযে সেই দাওযায সুন্দব একখানি আসন পেতে দিলেন। মহিলা আসনে গিযে বসলেন চুপচাপ। ভদ্রলোক বিনীত অনুবোধে সেই ক্ষুদ্র জনতাকে দু পাশে সবিযে দিলেন, যাতে চিতাগুলো আডাল না হয। আসনে বসে মহিলা শান্ত দু চোখ মেলে আবাবও সেই জ্বলন্ত চিতাগুলাব দিকে চেযে বইলেন খানিক।

এতক্ষণে অবকাশ পেযে পাশেব এক আধবযসী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কবলাম, কি ব্যাপাব বলুন তো?

নিবিড শ্রদ্ধাসহকাবে তিনি জবাব দিলেন, শুনুন না দাডিযে।

কিন্তু কি শুনব?

তিনি বললেন, গান। এমন আব শোনেন নি কখনও, সব জ্বালা জুডিযে যাবে।

আমাকে হতভম্ব হতে দেখে লোকটি জানালেন, মাসেব মধ্যে তিন-চাব দিন মহিলা এখানে মোটবে কবে আসেন তাঁব সঙ্গী ওই ভদ্রলোকটিব সঙ্গে। এসে ঠিক ওই জাযগাটিতে বসেন, তাব পব একে একে গোটাতিনেক গান কবেন। ভদ্রলোক অপেক্ষা কবেন ততক্ষণ। গান শেষ হলে আবাব গাডিতে তুলে নিযে চলে যান। ভদ্রলোক বোধ কবি মহিলাটিব স্বামীই হবেন।

উন্মুখ আগ্রহে সকলে প্রতীক্ষারত।

আমিও।

গান শুনলাম। একে একে তিনখানি। একটা শেষ হলে সামনের জ্বলন্ত চিতাগুলোর দিকে খানিক চেয়ে থাকেন মহিলা। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন সম্পূর্ণ। যেন নিজের মধ্যে নিজে হারিয়ে গেছেন। তার পর গানের মধ্যে দিয়ে নিজেকেই অন্বেষণ করছেন আবার।

শ্মশান-ভূমি স্তব্ধ। নিটোল মিষ্টি কণ্ঠস্বর। আকুতিভরা। হঠাৎ মনে হল, মায়াময় একটা শূন্য আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমার যেন অর্থ আছে কিছু, কিন্তু সে অর্থ ওই শূন্য মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন। কোথায় কার সঙ্গে আছে আমার একটা পরম মিল, কিন্তু কেমন করে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি তার কাছ থেকে। সেই বিরহেব হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। সে ডাকছে আমাকে, আয়, আমার কাছে ফিরে আয়, আয় আয় আয়—

আকাশে সন্ধ্যাব তারা দেখা দিচ্ছে একটা দুটো করে। মূক বিস্ময়ে যেন আমাদেরই দেখছে চেয়ে চেয়ে। হঠাৎ বোধহয় বাতাস দিয়েছে একটু। চিতাব আগুন বাড়ছে। তার আভা মহিলাব মুখের ওপর নড়াচড়া করছে।

গান শেষ হয়েছে। সঙ্গের ভদ্রলোক এগিয়ে এসে মহিলার কাঁধে হাত রাখতে চোখ মেলে তাকালেন তিনি। ঈষৎ ব্যস্ততায় উঠে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক দামী আসনখানা গুটিয়ে নিয়ে তাঁর হাত ধরে এগিয়ে চললেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানও ফাঁকা হয়ে গেল অনেক।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল, সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। ওই তারা-ভরা আকাশের নিচে, চারদিকের চারটে জ্বলন্ত চিতার মাঝখানে দাঁড়িয়েই আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। যত হারিয়ে যাচ্ছিলাম ততো বুঝি ভরেও উঠছিলাম।

ছেদ পড়ল। চিতাভস্ম-পথে বিলীন হবার জন্য আর একটি দেহ হাজির।

কখন আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, কখন বাড়ি ফিরেছি, শুচিশুদ্ধ হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি সঠিক করে কিছুই বলতে পারব না। কিন্তু পরদিন থেকে মনে হল একটা গুমোট কান্না যেন আমার মধ্যে পাথর হয়ে জমে আছে। সেটা তরল না হওয়া পর্যন্ত কিছু ভাল লাগছে না, কিছু ভাল লাগবে না।

বিকেল না হতে একটা চেনা পথে পা টেনেছে বাব বার। না গিয়ে পারি নি শেষ পর্যন্ত। সময় ধরে শ্মশানে হাজিরা দিয়েছি। প্রায় দু-মাস—রোজ। এর মধ্যে মাত্র তিনটি দিন তাঁকে দেখেছি। গান শুনেছি। সেই একই গান, একই সুর, একই পরিবেশ। অবশ্য প্রথম দিনের সেই মানসিক স্তব্ধতার রকম-ফের হয়েছে। অন্যের মত আমার মধ্যেও মহিলাটির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার আঁচড় পড়েছে। অনেকের অনেক মতামত শুনেছি। কেউ বলেন ছেলে হারিয়ে এমন হয়েছে, কেউ বলেন মা বাবা ভাই বোন। এ যে এক বিষম শোকের পরিণাম, সে-সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই।

আমাবও না।

দ্বিতীয মাসেব শেষেব দিকে আব তাঁকে দেখলাম না। তৃতীয মাসে মাঝে মাঝে এসেছি, খবব নিযেছি। না, মহিলা আব আসেন নি।

আব তিনি এলেনও না।

সময অনেক ভোলায। এই মহিলাব কথাও প্রায ভুলে গেছি। কখনো মনে পডলেও চেষ্টা কবেছি ভুলে যেতে। তবু একান্ত নিবিবিলিতে বুকেব ভেতবটা কেমন যেন কবে উঠত এক-এক সময, তাডাতাডি যা হোক কিছু একটা কাজে মন দিতে হত।

আট-ন'মাস কেটে গেছে বোধ কবি।

সকালে খববেব কাগজ পডছিলাম। পডতে পডতে শেষ পৃষ্ঠায একটি নাবী-আলেখ্যব ওপব হঠাৎ দুচোখ আটকে গেল। পূর্ণাঙ্গ নাবীচিত্র। যৌবনশ্রীমণ্ডিত। দেখামাত্র ভিতবে ভিতবে ভযানক একটা নাডাচাডা খেলাম

এই নাবীমূর্তি আমি কোথায দেখেছি। যৌবনপ্রাচুর্যভবা ওই নাবী-তনিমা নয, ওই দেহাবযবে আব কাউকে। রুদ্ধশ্বাসে পডতে লাগলাম বিবৃতি যেটুকু ছিল।

একখানি মর্মচ্ছেদী বিযোগান্ত ছবিতে নবাগত নাযিকাব অনির্বচনীয তিনখানি শ্মশান সঙ্গীত এবং তাব অপরূপ বাস্তব অভিব্যক্তি ও অভিনযেব ঢালা প্রশংসা কবেছেন খববেব কাগজেব চিত্র-সমালোচক

কালনেমি

যাব যেমন ভাবনা তাব তেমন সিদ্ধি। বসন্ত ঘোষালেব গোটা-জীবনে কথাটা ঠিক ঠিক ফলল না একবাবও। জীবন ভোব অনেক ভেবেছেন। শুধু মাথা ঘামিযেই অনেক জটিলতাব জট ছাডিযে দুযে দুযে চাব কযে ফেলেছেন। কিন্তু তাব মগজেব সহজ হিসেবটাব সঙ্গে ফলাফল মেলেনি কখনো

জীবনে তাই ছোট বড অনেকগুলি ধাক্কা খেযেছেন বসন্তবাবু। এব মধ্যে প্রায সবগুলি বাতিল কবলেও তিনটি ধাক্কা স্মবণীয।

প্রথম ধাক্কাটা নতুন বযসেব সমযেব। যে বযসে বসন্তবাবু শুধু ছিলেন ঘোষাল বাডিব দজ্জাল বাসু। যে বযসে ইস্কুলেব পথেও এক পকেটে থাকত গুলতি আব অন্য পকেটে তাব বসদ, অর্থাৎ নিজেব হাতে তৈবি মাটি-পোডানো গুলি। দু'মাইল দূবেব মফঃস্বল শহবেব ইস্কুলেব পথে যেতে যেতে যখন একটা ফল-বাগানেবও ফল-ফুল চোখ এডাতো না, কডা হেডমাস্টাবেব কডা বেতেব ভয সত্ত্বেও যখন মাসেব মধ্যে দুই একদিন ইস্কুল থেকে গা-ঢাকা না দিযে পাবা যেত না।

আব যে বযসে অনুপমা দেবী শুধু ছিলেন পাডাব ভটচায-বাডিব মেযে অনু।

দুজনেব একই বযেস সেটা। তেব গিযে চোদ্দ।

কিন্তু অনেক তফাত। একজনেব তখন স্বাধীনতা বাডছে, আব একজনেব কমছে।

একজনের পা বাড়ছে, আর একজনের সেই পায়ে অনুশাসনেব বেড়ি পড়ছে। ফলে গুলতি দিয়ে ফল বা পাখি টিপ করতে করতে সে-দিনের বসন্তবাবুর চোখের সামনে থেকে ফল-পাখি সবই মুছে যেতে শুরু করেছিল। মুছে গিয়ে সেখানে প্রায়ই ভেসে উঠত ভটচায-বাড়ির ভটচায-মশায়ের চকচকে টাক-মাথাটা।

ইস্কুল পালানো বেড়েছিল সেই সময় থেকেই। কোঁচড়-ভরতি কুল কামরাঙা আম জাম জামরুল শসা পেয়ারা যা-হোক কিছু নিয়ে এসে দুপুরের নিরিবিলিতে এই ভটচায-বাড়ির দরজা ঠেলতে হত সন্তর্পণে। বুদ্ধি থাকলে অনুপমা দেবীর বিরক্তির তৎপরতা থেকেই তাঁর প্রতীক্ষাটাও ধরা পড়ার কথা। কিন্তু চৌদ্দ বছরের বসন্তবাবুর বুদ্ধি তখনো অতটা পাকেনি। প্রথমেই ভুরু কুচকে কোঁচড়েব দ্রব্য লক্ষ্য কবে নিয়ে দরজায় হুড়কো লাগাতেন অনুপমা। তারপর কোঁচড়ে হাত ঢুকিয়ে ভেট পরখ করতেন। পছন্দ না হলে দুই এক কামড় বসিয়ে ছুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। পছন্দ হলেও মুখ বেঁকিযে পা ছড়িয়ে বসতেন সেগুলিব সদগতি কবতে। তাবপর ভাবে-আভাসে বোঝাতে চেষ্টা কবতেন, দিনেব কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এক-একদিন বলতেন, ইস্কুল পালিযে দুপুরের সময় চুপি চুপি আসিস, তোব লজ্জা কবে না?

কি পরিবর্তন বা কিসের লজ্জা সে-দিনেব বসন্তবাবু সেটা ঠিক বুঝে উঠতেন না। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সঙ্গিনীব সাবা অঙ্গে চোখ বুলিযে অস্পষ্ট ইশাবার মত কিছু যেন অনুভব কবতেন। জবাবে ফলগুলো তুলে নিযে আস্তাকুঁড়ে ফেলে আসতে, নয়তো পকেটের গুলতিব কাঠ দিযে ঠক করে মাথায় এক ঘা বসিযে দিতে ইচ্ছে যেত। কিন্তু আগের মত কেন জানি তাও আব পেবে উঠতেন না। মনে হত, কোথায় যেন অনুপমার জোর বেড়েছে আর কি করে যেন তার সামনে নিজেব দাপট কমে আসছে।

সেই থেকে ভাবনা শুরু। ভাবতে ভাবতে গুলতি ভুল হয়ে গেল, পাখির বাসা নজব এড়ালো, ফল-বাগানের আকর্ষণ কমে আসতে লাগল। কিন্তু সে বেশি দিনের জন্যে নয়। হঠাৎ এক আবিষ্কাবের আনন্দে একেবারে বিহ্বল হযে গেলেন চোদ্দ বছরের বসন্তবাবু। বিস্ময়কর এক বহস্যোদঘাটনেব শিহবণ লাগল ভোরের শিশিব-ভেজা মাঠে জোড়া-শালিখ দেখে। যা দেখাব সঙ্গে সঙ্গে আগে গুলতি বেরুতো পকেট থেকে। দুপুবে ফল-বাগানে ঢুকে ফলের বদলে গাছের সবুজের মধ্যেও কি যেন চোখে পড়ল।

হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করেছিলেন বসন্তবাবু। একেবারে ভটচায-বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত। কিন্তু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকা হল না। কি করে ঢোকেন? দুপুবে চুপি চুপি আসার জন্য যে-লজ্জার কথা অনু বলত, সে-বকম লজ্জাই যে করছে এখন। পরিবর্তনের ইশারা যে বুঝতে পারছেন!

দেখা না হওয়ার দরুন সেদিন খাবাপ লাগেনি। উল্টে যেন ভালো লেগেছে। পুকুরঘাটে বসে কেটেছে অনেকক্ষণ। কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু করার মত কিছু মনে আসছে না। পকেটের গুলতিটাই শেষ পর্যন্ত সজোরে নিক্ষেপ কবেছেন পুকুরের জলে। করে আত্মত্যাগেব আনন্দ উপভোগ করেছেন।

পরে পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে দাদার নাম করে চুপি চুপি দুই একখানা নভেল

আমদানি করেছেন। আরো চুপি চুপি সেগুলো পড়ে ফেলেছেন। পড়ে আবছা একটা প্রস্তুতির সপুলক আভাস পেতে শুরু করেছেন।

কিন্তু নির্বিঘ্ন জল্পনা-কল্পনার গোড়াতেই মুখথুবড়ে পড়তে হল একেবারে। অনুপমা দেবী বউ হয়ে এলেন এই ঘোষাল-বাড়িতেই। বসন্তবাবুর ন-বছরের বড় দাদার বউ। যে-দাদাকে দেখলেই কম করে নব্বই হাত তফাত দিয়ে চলতে চেষ্টা করেন বসন্তবাবু। চটপট দুই একখানা ডিটেকটিভ বা অ্যাডভেঞ্চারেব বই পড়ে ফেলে, অথবা মনে মনে কীচক বধ করেও দুর্দৈব প্রতিরোধ করা গেল না। কিন্তু সেটাই জীবনের প্রথম ধাক্কা নয় বসন্তবাবুর। আরো একটু বাকী ছিল। বিয়ের পরদিন ভ্রাতৃ-বধূকে নিরিবিলিতে পেয়ে বিরাট গাম্ভীর্য বেদনা বহন করেই এক ফাঁকে কাছে এসেছিলেন চোদ্দ বছরের বসন্তবাবু। সেই সময়ে অনুপমা দেবী এক কাণ্ড করে বসেছিলেন।

একেবারে হৃদয়শূন্য কাণ্ড। এই বিবাহের থেকেও বড় ধাক্কা সেটা।

ঘোমটার ফাঁক দিযেই দেখে নিয়েছেন অনুপমা দেবী ধারেকাছে আর কেউ আছে কিনা। তাবপর কম করে চার আঙ্গুল জিব বাব করে মুখ ভেঙচেছেন ওঁকে।

দ্বিতীয ধাক্কা দশ বছব পরে।

এই দশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক কিছু ঘটেও গেছে। চোদ্দ বছরের বাসু তখন চব্বিশ বছরের নির্ভেজাল বসন্তবাবু হয়েছেন। অনুপমা দেবী পাকাপোক্ত বৌ-ঠান হয়েছেন। বিযের পব থেকেই দাদার রবার-ফ্যাক্টরীর চাকরিতে একাধিক প্রমোশানেব ফলে শহবে নতুন বাসা নেওয়া হয়েছে। বাবা-মা বিগত হয়েছেন। বসন্তবাবু কোনরকমে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে দাদার সুপারিশে চাব বছর ধবে রবার-ফ্যাক্টরীব সহকাবী স্টোর-কীপারের পদে বহাল হয়ে বৌদির মেজাজী তত্ত্বাবধানে বসবাস করছেন। মেজাজের অনেক কাবণ। বিয়ের পর শুধু চাকরির উন্নতি নয়, অনুপমা দেবীর নামে দু'টাকার লটারীর টিকিট কিনে প্রায় বিশ হাজার টাকা ঘরে এনেছেন দাদা। কড়কড়ে টাকাগুলো যেন আকাশ ফুঁড়ে এসে পড়েছে। ব্যাঙ্কে সে-টাকা অনুপমা দেবীর নামেই গচ্ছিত আছে। পরের বছর তাঁর যমজ সন্তান হয়েছে। কিন্তু একটিও টেকেনি। বছর তিনেক বাদে একটি মেয়ে হয়েছে আবার। সেটিও আঁতুড়েই বিদায নিয়েছে। তারপর একটি বছর অসুখে ভুগেছেন অনুপমা দেবী। আরো দুটি বছর লেগেছে পুবনো স্বাস্থ্য পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করে তর-তাজা হয়ে উঠতে। ঠিক সেই সময়েই আবার দাদার সময ঘনিয়েছে। পাট-কলের লরী চাপা পড়েছেন, চোখ মেলে তাকানোর অবকাশও হয়নি তাঁর। কিন্তু পরপার থেকে তাকিয়েছিলেন বোধহয। ফ্যাক্টরীর ওপরওলা সাহেব ভালবাসতেন তাঁকে। পাট-কলের বিরুদ্ধে কেস লড়ে তিনি মোটা টাকা খেসারত পাইয়ে দিয়েছেন অনুপমা দেবীকে। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা দ্বিগুণ হয়েছে। তাছাড়া রবার-ফ্যক্টরী থেকে তাঁর আজীবন ভরণ-পোষণও বরাদ্দ করে দিয়েছেন সাহেব।

মনে মনে অনেক কেঁদেছেন বসন্তবাবু। দাদার দুঃখে ততো নয় যত বৌ-ঠানের দুঃখে। সকল দিক অর্থাৎ বৈষয়িক দিকটা একটু সামলে ওঠার পর মনে মনে এক বিষম সঙ্কল্প করেছেন বসন্তবাবু। বৌ-ঠানের দুঃখ লাঘবের জন্য দাদাকে স্বর্গ থেকে

ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় আর। হলে তাই করতেন। কিন্তু নিজে তো পারেন আত্মোৎসর্গ করতে। ছেলেবেলার অর্থাৎ সেই গুলতির বয়সের অনুকে নতুন করে মনে পড়তে লাগল তাঁর। বৌ-ঠান হোন আর যাই হোন—সেই অনুই তো। অতএব নিজের আহার নিদ্রা ঘুচিয়ে এমন কি কাজ-কর্মে অবহেলা কবেও অনুপমা দেবীর একটু সুখ, একটু স্বাচ্ছন্দ্য, একটু তৃপ্তি, একটুখানি শান্তির প্রতি তৎপর হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি। এই করতে গিয়ে বসন্তবাবুর ক্রমশ মনে হতে লাগল, পবার্থে এত আনন্দ এর আগে আর কখনো অনুভব করেন নি তিনি।

দ্বিতীয় ধাক্কাটি খেলেন এই সঙ্কল্প-সাধন-চর্চাব মধ্যপথে এসে।

সেদিন মিহি একজোড়া কালোপেড়ে শাড়ি কিনে এনেছেন বসন্তবাবু। তর্ক করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এনেছেন। বললেন, আজকাল এমন সবাই পবে, তাছাড়া আমি পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা কবেই এনেছি, তিনিও মত দিয়েছেন।

ভ্রাতৃবধূ শুনলেন। তাবপর শাড়িব দিকে তাকালেন। তাবপব দেওবেব মুখেব দিকে। বসন্তবাবুর তর্ক কবাব জোরটা নিজেব অগোচবে কমে আসতে লাগল। শাড়ি রেখে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

শোনো—।

পা থেমে গেল। ঘুরে দাঁড়ালেন। ভাতৃবধূর এই ভাবলেশহীন চাউনিটা অস্বস্তিকব।

চারু আচার্যকে চেন? এই পাড়াতেই থাকেন...

চেনেন কি চেনেন না ঠিক বোঝা গেল না, বসন্তবাবু নীরবে প্রতীক্ষা কবতে লাগলেন।

অনুপমা দেবী বললেন, তাঁব একটি মেয়ে আছে—মালতি, এখানে এসে অবধি ছোট থেকে দেখছি। ভালো মেয়ে। তারা বিয়ের জন্যে ধবেছে, আমি কথা দিযে পাঠাচ্ছি।

বিযে! বসন্তবাবু অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন প্রায়।—আমি, ইয়ে—বিয়ে কবব বলছ?

না তো কি বৈরেগী বসন্ত হয়ে থাকবে?

কিন্তু এখন বিয়ে কবব কি!...এই সেদিন দাদা গেলেন—

এই সেদিন নয, একবছর হযে গেছে।

বসন্তবাবু হাঁ কবে চেয়ে রইলেন খানিক। নারীর এমন নির্মমতা আর যেন দেখেন নি। কান্নার মত শোনালো প্রায় কণ্ঠস্বর। বললেন, বিয়ে, মানে—এসব কথাবার্তা এখন থাক।

মুখের দিকে চেয়ে খানিক অপেক্ষা করলেন অনুপমা। তাবপর বললেন, থাক। তুমি অফিস থেকে ছুটি নিতে পারবে দিনকতক?

হাঁপ ফেলে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন বসন্তবাবু। অর্থাৎ সেটা স্বচ্ছন্দে পারা যাবে। তারপর জিজ্ঞাসা কবলেন, কেন, কোথাও যাবে?

হ্যাঁ। আমাকে মাদ্রাজে রেখে আসবে। আমি দিদির কাছেই থাকব ভাবছি...।

অনুপমাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বসন্তবাবু চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে। বিগত বড় অসুখটার পরে মাদ্রাজে এই মাসতুতো বোনের কাছেই ছ'মাস কাটিয়ে এসেছিলেন অনুপমা। স্বামী জীবিত তখন, খরচপত্রে কার্পণ্য হয়নি—দিদি সমাদরেই রেখেছিলেন

বোনকে। সেই থেকে হৃদ্যতা। এই গেল বছরেও, অনুপমার জীবনের চরম দুর্ঘটনা ঘটার কিছুদিন পরে—সেই দিদি এসে ছেলেপুলে নিয়ে বোনের কাছে মাসকতক থেকে গেছেন। যাওয়ার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যেতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে অনুপমার তখন যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বসন্তবাবু জানেন চিঠিতে এখনো মাদ্রাজ যাওয়ার তাগিদ আসে মাঝে মাঝে। অনুপমার এই প্রবাসী দিদি অথবা ভগ্নীপতিটিকে আগে অন্তত অপছন্দ করতেন না বসন্তবাবু। অসুখের পরে অনুপমাকে মাদ্রাজ রেখে আসা এবং স্বাস্থ্য-ফেরার পর মাদ্রাজ থেকে তাকে নিয়ে আসার কাজটি তাকেই করতে হয়েছিল। সেই উপলক্ষে পরিবারটির সঙ্গে তারও তখন হৃদ্যতা মন্দ হয়নি। কিন্তু এখন আর বসন্তবাবু খুব সুনজরে দেখেন না এদের। তার মনে মনে কেমন একটা ধারণা, বৌ-ঠানের অনেক টাকা, এ অন্তরঙ্গতার পিছনে সেটাই বড় কারণ।

সেই সমস্ত রাতটাই বিনিদ্র কেটেছিল বসন্তবাবুর। ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাসে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। আত্মত্যাগের জন্য নিজেই তো প্রস্তুত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা বলে এমন নিষ্ঠুর আত্মত্যাগ দাবী করে বসতে পারেন অনুপমা, সে কথা একবারও ভাবেন নি। সমস্ত রাত ধরে এই ধাক্কাটা সামলেছেন তিনি। তারপর সকালে বিবাহে স্বীকৃতি জানিয়ে ফ্যাক্টরীতে চলে গেছেন। স্টোর-ঘরে গুম হয়ে বসে ভাবতে চেষ্টা করেছেন, পাড়ার কোন বাড়ির কোন মেয়েটা মালতী। সেই অনাগতার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবেও কম ব্যথিত হন নি বসন্তবাবু।

এর পরের ধাক্কার সূচনা দুই যুগ পরে। এই চব্বিশ বছরে মানসিক শারীরিক এবং সাংসারিক পরিবর্তন যেমন হওয়া সম্ভব তেমনি হয়েছে। অনেক সমস্যার অবসান হয়েছে, আবার অনেক সমস্যার উদ্ভবও হয়েছে। সংসার বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে আয় বাড়েনি বসন্তবাবুর। চারটি ছেলে-মেয়ে। তাদের পড়াশুনার পর্ব শেষ হতেই অনেক বাকী। বিশেষ করে ছোট দুটির। এদিকে বাইশ বছরে চাকরিতে ঢুকেছিলেন বলে কোম্পানার নতুন নীতি অনুযায়ী সাতচল্লিশ বছরেই চাকরির মেয়াদ ফুরিয়েছিল। ধরে-পড়ে আরো দু'বছর বাড়াতে পেরেছিলেন সেই মেয়াদ। তারপর উনপঞ্চাশের মুখে অবসর গ্রহণ। পেনসান নেই—গ্র্যাচুইটি প্রভিডেণ্ড ফণ্ড আছে। প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের তবিল ধাপে ধাপে আগেই ঝাঁজরা হয়েছিল। শেষের কিছুকাল পুরোপুরি স্টোর-কীপার হয়েছিলেন অবশ্য। কিন্তু তারই বা আর কত মাইনে।

অতএব সর্বসাকুল্যে মাত্র হাজার কতক টাকা হাতে নিয়ে অবসর গ্রহণ। অবশ্য মনে এই জন্যে খুব যে দুর্ভাবনায় ছিলেন তিনি, তা নয়। অনুপমা দেবীর গচ্ছিত ধনে হাত পড়েনি বড়, চব্বিশ বছর ধরে সুদে আসলে বরং বেড়েছে অনেক। বসন্তবাবুর রোজগার আর অনুপমা দেবীর ভরণপোষণ-লব্ধ টাকা দিয়ে সংসার চলেছে। অনুপমা দেবীর ব্যাঙ্কের জমানো টাকা আরো অনেক বাড়ত যদি না তীর্থের ভূত চাপত তার মাথায়। তার তীর্থ করার ঝোঁকে এই চব্বিশ বছরের প্রতিটি বছর সপরিবারে নাজেহাল হতে হয়েছে বসন্ত ঘোষালকে। যেখানেই যাবেন, সকলকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাবেন। এর ওপর পুজোআর্চার ঝামেলা তো আছেই।

কিন্তু যাই হোক, ভিতরে ভিতরে খানিকটা ভরসা ছিল বসন্তবাবুর, মেজাজ বিগড়ালে মালতী বা ছেলেমেয়েদের যত বকাঝকাই করুন অনুপমা, তলায় তলায় ভালও বাসেন। মালতীকে তিনিই এনেছেন এ সংসারে। এনে ঠকেননি। মালতী এমন শান্ত আর নিরীহ বলেই শুধু অনুপমা কেন, তার ওপর বসন্তবাবু নিজেও মেজাজ বড় কম খাটান না। কিন্তু মালতীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখেনি কেউ। আর ছেলেমেয়েরা ভয় যেমন করে অনুপমাকে, তেমনি বড়-মা বলতে অজ্ঞানও আবার।

কিন্তু ক্রমশ নিরাশ হতে লাগলেন বসন্তবাবু। চার মাস হতে চলল বাড়িতে বসে আছেন। এর মধ্যে কত প্ল্যান ফেঁদেছেন ঠিক নেই। কাপড়ের দোকান, বইয়ের দোকান, চায়ের দোকান, সাইকেল মেরামতের দোকান ইত্যাদি। শেষে মুদীর দোকানে এসে থেমেছেন। টাকা পেলে এটাই করবেন। হাতে যে পাঁচ সাত হাজার টাকা আছে তাই দিয়ে শুরু করতে পারেন, কিন্তু সে কথা ভাবতেও বুক শুকোয়। সংসার চালালেও ছেলে মেয়েগুলোর পড়াশুনা আর জামাকাপড়ের খরচাই বা আসবে কোত্থেকে? গোড়ায় অনেকবার পরামর্শ করতে গেছেন বৌ-ঠানের সঙ্গে। জপতপের ফাঁকে অনুপমার শোনার অবকাশ তেমন হয়নি। শুনলেও নিরুত্তাপ জবাব দিয়েছেন, যা ভালো বোঝো করো, এতবড় সংসার তোমার—বসে থাকবে কেন।

ব্যস, ওই পর্যন্তই। ব্যবসা করা দূরে থাক, এই চারমাস ধরেও আগের মতই খরচ চালাতে হচ্ছে বসন্তবাবুকে। অনুপমা দেবীর কাছ থেকে ফ্যাক্টরীর মাসলব্ধ টাকা ছাড়া বাড়তি কিছুই আসছে না। সংসার কিভাবে চলছে বা কিভাবে চলবে সে নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই যেন।

অতএব বসন্তবাবুর মাথাব্যথা বাড়তেই থাকল। এ দুর্ভাবনা ছাড়া আর এক দুর্ভাবনাও ক্রমশ অস্থির করে তুলতে লাগল তাকে। গত দু'বছর ধরে আবার মাদ্রাজের সেই দিদিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চলেছে। মাদ্রাজের স্থায়ী প্রবাসী তারা। কিন্তু আট-শ মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও বসন্তবাবু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। কারণ পর পর দু'বছরই ছেলেপুলে নাতি-নাতনীসহ দিদিটির শুভাবির্ভাব হয়েছে এখানে। এবারেও হবে কিনা কে জানে। হৃদ্যতা দেখে গা জ্বলেছে বসন্তবাবুর। স্বার্থ বুঝতে বাকী নেই তার। গোড়ায় যা সন্দেহ করেছিলেন এখন সেটা বদ্ধমূল হয়েছে। বৌ-ঠানটিও কম নয় তলায় তলায়। দিদি এলে আনন্দে আটখানা। তার ছেলেপুলে নাতি-নাতনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের জন্য খরচাপাতিতেও মুক্তহস্ত তখন। বসন্তবাবুর বিশ্বাস এ শুধু তাকে, মালতীকে এবং বাড়ির ছেলেমেয়েদের জব্দ করার জন্য।

ভাবনাচিন্তায় আধখানা হতে বসলেন বসন্তবাবু। আহারে রুচি নেই, রাতে ঘুম নেই। কেবল এক দুশ্চিন্তা ছেলেমেয়েগুলোর কি হবে। ওদের ভবিষ্যৎ ভেবে দিনরাত চোখে অন্ধকার দেখেন তিনি।

মালতী বলে, এত ভেবে কি করবে, তাছাড়া দিদি আছেন, তোমার এত চিন্তা কিসের?

রাগে দাঁত কড়মড়িয়ে ওঠেন বসন্তবাবু, তবে আর কি, তুমিও দিদির পাশে নাক টিপে বসে থাকগে যাও—তাহলেই সব উদ্ধার হবে!

কখনো বলেন, ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হওয়ার দাখিল, উনি এলেন ভক্তি দেখাতে! কেন, বুঝিয়ে বলতে পারো না দু'কথা—কি দিয়ে কি হবে, এভাবে কি করে চলবে!

মালতী নিরীহ মুখে জবাব দেয়, বলে কি হবে, দেখছেনই তো...।

বিরক্তিতে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন বসন্তবাবু, যাও যাও যাও এখন আমার সমুখ থেকে—যত সব নির্বোধের পাল্লায় পড়া গেছে!

বেশ গলা ছেড়েই ধমকে ওঠেন বসন্তবাবু। অনুপমার কানে যাবার ভয় নেই। কারণ গত ক'বছর ধরেই ওপরে ওঠেন না তিনি। হার্টের ব্যামো। ডাক্তারের নিষেধ। তা বলে একেবারে না-ওঠাটা বেশি বেশি মনে করেন বসন্তবাবু। তীর্থ করার সময় তো অত মনে থাকে না, অত ওপর-নিচ জ্ঞান থাকে না!

সামনাসামনি তা বলে কোনদিনও কটাক্ষ করেননি এ নিয়ে। বরং তোষামোদের সুরে বলেছেন, তোমার আবার হার্টের ব্যামো হতে গেল কেন, বেরিবেরি আর বাতে ভুগে উঠলাম আমি—এ রোগ তো আমার হবার কথা!

অনুপমার মেজাজ ভালো ছিল বোধহয়। জবাব দিয়েছেন, তোমার হয়নি কে বললে? ছেলেবেলা থেকেই তো দেখে আসছি হয়েছে।

কিন্তু উপরের এই চেঁচামেচি একবারেই কানে যায়নি অনুপমার, তা নয়। একদিন শুনেছিলেন। কি নিয়ে কথা-কাটাকাটি সেটা অবশ্য বোঝেন নি। জপের মালা নিয়ে বসেছিলেন, মালতী সেদিক দিয়ে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, রাগারাগি কিসের?

মালতী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হয়েছে?

আবার জিজ্ঞাসা করতে মালতী না বলে পারে নি। ছলছল চোখে মুখ তুলে তাকিয়েছে।—কি আর বলব দিদি, মন-মেজাজ ওই রকমই হয়েছে আজকাল। কি করে চলবে, ছেলেমেয়েগুলোর কি হবে—দিন-রাত কেবল এই এক ভাবনা—ভাবতে ভাবতে পাগল হবার যোগাড়।

মালা হাতে অনুপমা চুপচাপ মালতীর মুখখানাই দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর ফিরে বসে চোখ বুজে জপে মন দিলেন আবার।

এমনি মানসিক অবস্থার মধ্যেই মাদ্রাজের দিদির বিশেষ আমন্ত্রণের খবর শুনলেন বসন্তবাবু। অনুপমাকে লিখেছেন, এত জায়গায় এত তীর্থ করা হয়েছে কিন্তু মাদ্রাজের কথা মনে পরে না কেন? সেখানে যে কত মন্দির, কত বিগ্রহ, কত কিছু—এবারে আসা চাই-ই চাই।

অনুপমা স্থির করেছেন যাবেন। সেই কোন যুগে মাদ্রাজে একবার গেছেন বটে, কিন্তু তীর্থ করা তো হয় নি। মালতীকে বলেছেন সব গোছগাছ করে নিতে।

শুনে প্রমাদ গুনেছেন বসন্তবাবু। রাগও হল, ছেলেমেয়েগুলোর পড়াশুনার ক্ষতিটা পর্যন্ত ওঁর কাছে বড় নয়। ইস্কুল কলেজ অবশ্য ছুটি এখন, তবু ক্ষতি তো। সে-কথা না বলে বসন্তবাবু আসল মনোভাবটুকুই ব্যক্ত করেছিলেন অনুপমার কাছে। বলেছেন, এ সময়ে যাবে ঠিক করলে ওদিকে দোকান-ঘর নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল একটা, পেলে যাহোক কিছু আরম্ভ করা যেত।

খানিক চুপ করে থেকে অনুপমা দোকান প্রসঙ্গের গুরুত্বটা একরকম স্বীকারই করে নিলেন যেন। ঘরে মালতী আর বসন্তবাবুর বড় মেয়ে ছিল। একটু ভেবে নিয়ে অনুপমা মেয়েকে বললেন, এক কাজ কর মণি, আমার নাম করে মাদ্রাজে একটা চিঠি লিখে দে তাহলে, ওরাই কেউ এসে নিয়ে যাক আমাকে।

চিঠি লিখতে হয়নি। এক সপ্তাহের মধ্যে সদলবলে মাদ্রাজ রওনা হয়েছেন বসন্তবাবু।

দিদি কথা রেখেছেন। ঘটা করে বোনকে তীর্থ করাচ্ছেন। রোজ সকালে কোনো না কোনো মন্দির দর্শনে যান অনুপমা দেবী তাছাড়া প্রায়ই বাড়িতে আসেন একজন প্রায়-বৃদ্ধ প্রবাসী বাঙালী পুরোহিত। তিনি তীর্থমাহাত্ম্য শোনান, পুণ্যসঞ্চয় বা পাপ নিবারণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

মালতী যতটা সম্ভব অনুপমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ছেলেমেয়েরা নিজেদের মত ঘোরাফেরা করে। বসন্তবাবু দিনের বেশির ভাগই শুয়ে বসে কাটান। দূরের কোনো মন্দিরে-টন্দিরে যেতে হলেই শুধু ডাক পড়ে তার। তিনি অথবা তার সংসারটি যে এখানে সুবাঞ্ছিত নয় খুব? সেটা মনে মনে উপলব্ধি করেন। যদিও অনাদর হয় না কোনরকম, বরং যত্নআত্তিই করেন সকলে, কিন্তু সেও যে অনুপমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই, সেটুকু জলের মত বুঝতে পারেন বসন্তবাবু। ফলে স্থান পরিবর্তনে এসে দিন দিন শীর্ণ হতে লাগলেন তিনি। দিনরাত বসে ভাবেন কি। বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে চুপচাপ বসে থাকেন। বেশ রাত করেই ফেরেন।

দর্শন এবং পুণ্যাজনের ব্যস্ততার মধ্যেও অনুপমা লক্ষ্য করেন সব। নিজের বাড়িতে করতেন না। এখানে করেন। দেওরের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দিদিকে যেটুকু নির্দেশ দেবার দেন। কিন্তু নিজে সামনাসামনি খোজখবর করেন না বড় একটা।

সেদিনও সেই বাঙালী পুরোহিতটি এসেছেন। প্রায়ই আসেন, তত্ত্বকথা শোনান। শীর্ণকায় দুমড়ানো মূর্তি। এখন এ বাড়িতে তার যেমন কদর, এতকাল তেমন ছিল না। কালেভদ্রে একটু-আধটু পূজোআচার ব্যাপারে ডাক পড়ত। অভাবী মানুষ। অনেকগুলো ছেলেপুলে। অনুপমা মাদ্রাজে আসার পর পুরোহিত প্রয়োজন হতে তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই এই লোকটির অনেক সুখ্যাতি করেছেন তার দিদি। দারিদ্র্যের কথাও বলেছেন, পাণ্ডিত্যের কথাও বলেছেন।

ফলে লোকটির প্রতি অনুপমার বিশ্বাস বা দরদ কোনটাই কম নয় এখন। রোজই নগদ দক্ষিণাসহ বড়সড় একটা করে ভুজ্যি পাঠানো হচ্ছে তার বাড়িতে। এ ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানের প্রাপ্তি তো আছেই। কাছেপিঠের মন্দিরে তাকে নিয়েই দর্শনে যান অনুপমা।

দিদিব মুখে শুনেছিলেন, গণনাও ভালো কবেন পুবোহিতটি। কথায কথায সেদিন তাই জিজ্ঞাসা কবলেন, আব কতকাল কিভাবে কাটবে বলুন দেখি ঠাকুবমশাই—কবে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হব?

ঠাকুবমশাই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবলেন, কোষ্ঠি আছে?

বাক্সয ছিল। বেকলো। কাগজ পেন্সিল নিযে দুর্বোধ্য নক্সা কাটলেন আব হিসেব কবতে লাগলেন। ক্রমশ মুখ গম্ভীব হতে লাগল তাব। মাঝে মাঝে অনুপমাব হাতও দেখলেন।

সামনে দিদি বসেছিলেন। মালতীও। পুরুতেব হাবভাবে দিদি ঈষৎ রুষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবলেন, কি দেখছেন অত, ভালো থাকবে তো?

অনুপমা সশঙ্কে প্রতীক্ষা কবতে লাগলেন।

থাকবেন। ঠাকুবমশাই ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকালেন অনুপমাব দিকে, কিন্তু তাব যে এখনো মুক্তি হযনি মা, তিনি যে এখনো কাঁদছেন। এবাবে তাব জন্যেই ভগবান এখানে টেনেছেন আপনাকে।

বুকেব ভিতবটা ছ্যাত কবে উঠল অনপমাব।

মুখেব থেকে যেন বক্ত সবে যেতে লাগল। মালতী অবাক। দিদি ধমকে উঠলেন প্রায, কি সব বলছেন আপনি।

দুঃখেব কথাই তো বলতে হচ্ছে মা। অনুপমাব পাণ্ডুব মুখেব দিকে চেযেই পুবোহিত বলে গেলেন, আপনাব স্বামীব অপঘাতে দেহত্যাগ হযেছিল শুনেছি তাব আত্মাব সদগতি হযনি বলেই আপনি ভিতবে ভিতবে শান্তি পাচ্ছেন না এখনো।

অনুপমা পাংশুমুখে চেযে বইলেন খানিক। অস্ফুট স্ববে জিজ্ঞাসা কবলেন, কি কবতে হবে?

চোখ বুজে একটু ভেবে নিযে যে বিধান দিলেন ঠাকুবমশাই তাব সাব মর্ম এখানকাব সব থেকে বডতীর্থ এবং জাগ্রত স্থান তিরু কলিকুণ্ড্রম পাহাডেব পক্ষীতীর্থ। স্মবণাতীত কাল থেকে সেখানে ভোগ গ্রহণ কবতে আসেন শ্বেত-ঈগলরূপী দুই অভিশপ্ত মুনি। বাবাণসীতে স্নান, বামেশ্ববে দর্শন, পক্ষীতীর্থে ভোজন এবং চিত্রকূটে শযন—সমস্ত কলিযুগ ধবে এই কবে আসছেন তাবা এবং তাই কববেন। কলিযুগ অন্তে শাপমোচন। শুদ্ধচিত্তে এবং নিজেব হাতে ওই শাপভ্রষ্ট ঈগলরূপী মুনিদেব উদ্দেশে ভোগ নিবেদন কবতে হবে অনুপমাকে। তাদেব তুষ্টিতে সব তুষ্ট।

অনুপমাব দিদি স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেললেন একটা। পক্ষীতীর্থেব সব সমাচাব জানাই আছে তাব। বললেন, সে আব বেশি কথা কি, পাখি বোজই আসে—ভোগ দিলেই হবে।

বসন্তবাবু বাত্রিতে মালতীব মুখে শুনলেন কথাটা। পবদিন অনুপমা নিজেই বলতে এলেন। কাল সমস্তক্ষণই মনটা খাবাপ ছিল, বাতেও ঘুম হযনি। প্রায পযতাল্লিশ মাইল দূবে মহাবলীপুবমেব সেই পক্ষীতীর্থ—মোটবে যেতে হবে, তাই লোক দবকাব।

অনুপমা বললেন, সামনেব বেস্পাতিবাবই যাতে হয সেই ব্যবস্থা কবো।

মাঝে তিন দিন। বসন্তবাবু বললেন, সে আর অসুবিধে কি। কিন্তু তুমি নিজের হাতে ভোগ নিয়ে পৌঁছুবে কি করে সেখানে

কেন?

ব্যাপার তো সেই পাহাড়ের ডগায়। পাঁচশ সত্তরটা না ক'টা সিঁড়ি শুনেছি, সুস্থ লোকের পক্ষেই ওঠা মুশকিল, তোমার হার্টের যা অবস্থা

হা করে চেয়ে রইলেন অনুপমা।—পাঁচশ সত্তরটা ! দেখতে দেখতে সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার।

বসন্তবাবু বেরুচ্ছিলেন কোথায়। বলে গেলেন শরীরের কথা বলে ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আর কেউ পৌঁছে দিলে হয় কিনা। তোমাদের এ-সব বুঝিটুঝি না—

না বুঝলেও চিন্তিত মুখেই বেরিয়ে গেলেন তিনি। অনুপমা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে। দিদি বললেন, তাই তো রে, আমার তো মনেই ছিল না—ঠাকুরমশাইকে ডেকে পাঠাই তাহলে?

অনুপমা শুকনো মুখে বললেন, এখন থাক এরপর একটা করে দিন গেল আর সমস্ত বাড়িটার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা নেমে আসতে লাগল। অনুপমা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গেলেন। সকালে একাই মন্দিরে যান, জপে বসেন। একটি কথাও বলেন না কারো সঙ্গে। তার সঙ্কটের কারণ অনুমান করে দিদি বলেন, এত ভয়ের কি আছে, নিজে না উঠলেই তো হয়—সত্যিই তো আর কম নয়, সেই ছেলেবেলায় একবার উঠেছিলাম, তাও দশবার জিরিয়ে—

অনুপমার চেখে চোখ পড়তেই দিদি থেমে গেলেন। আর বলা হল না। মালতী সর্দিজ্বরে ভুগছে ক'দিন ধরে, শরীর ভালো না। মন আরো খারাপ। চুপ করে থাকতে পারেনি সেও, কাদো কাদো মুখে এসে বলেছে, অন্য ব্যবস্থা করো দিদি, আমার কেমন ভয় করছে—

কিন্তু অনুপমার মুখের দিকে চেয়ে তার মুখে কথা সরেনি আর। মনে কেমন অশুভ ডাক দিচ্ছে মালতীর। বসন্তবাবুকে এসে বলেছে, দিদির যাওয়াটা বন্ধ করো না, আমার ভালো লাগছে না। এত চিন্তাভাবনা নিয়ে তোমরা যাচ্ছ কেন? কোথাকার কে একটা বামুন—

বসন্তবাবুরও মেজাজ ভালো না। সারাক্ষণই ভাবেন। উগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, না গেলেই তো হয়, কে বলেছে যেতে।

বৃহস্পতিবার এলো। মালতী অনেক অনুনয় করলো আর দুটো দিন সবুর করতে। একটু সুস্থ হয়ে সেও যাবে সঙ্গে। কিন্তু এই দিনটাই যেন অনুপমা দেবীর স্বামীর আত্মার মুক্তির শেষ দিন। ভোগের মালসা কোলে নিয়ে থমথমে মুখে গাড়িতে উঠে বসলেন। বসন্তবাবুও উঠলেন। দিদির অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আর কাউকে সঙ্গে নিতে রাজি হন নি অনুপমা। তাঁর পাগলামি দেখে ভগ্নিপতিও বিরক্ত হয়েছেন একটু। আড়ালে বসন্তবাবুকে বলে দিয়েছেন, ওখানে গিয়ে একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে তুমি নিজেই

ওপরে পৌঁছে দিও—পুরুতের মুখে কি সব আবোলতাবোল শুনে ঘাবড়ে গেছে বুঝতেই তো পারছ।

নিজের অগোচরে মাথা নেড়েছেন বসন্তবাবু।

মোটর ছুটেছে। অনুপমা বসে আছেন মূর্তির মত। ভাবলেশহীন, নিষ্পলক।

মোটরের হাওয়া সত্ত্বেও একধার থেকে ঘামছেন বসন্তবাবু। কাপড়ের খুঁটে ক্রমাগত মুখ ঘষছেন। জিবে করে শুকনো ঠোঁট ঘষে নিচ্ছেন বার বার।

পাহাড়ের গায়ে মোটব দাঁড়াল। ভোগের মালসা হাতে অনুপমা নামলেন। বসন্তবাবুও। সামনে উত্তুঙ্গ পাহাড়। ঋজু, কঠিন। একদিকে পাহাড়-কাটা বিশাল পাথুরে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি এঁকেবেঁকে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে ঠাওর হয় না। সিঁড়ির পব সিঁড়ি, দুস্তর, আকাশছোঁয়া।

ওপরের দিকে তাকালেন বসন্তবাবু। কাছে মাঝখানে দূবে—বহু পুণ্যার্থী বিশ্রাম করছে হাত পা ছড়িয়ে, ধুঁকছে কেউ কেউ। ক্লান্ত শ্রান্ত পায়ে টেনেহিঁচড়ে উঠছেও অনেকে। চোখ নেমে এলো। অনুপমাব চোখে চোখ পডতে সহসা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলেন বসন্তবাবু। প্রত্যেকটা সিঁড়িতে মৃত্যুব হাতছানি দেখলেন। সমস্ত মুখ ঘামে ভিজে গেল আবার।

ঢোক গিলে কোনরকমে বললেন, বৌ-ঠান, এ ঠিক হবে না, থাক—

নিষ্পলক নেত্রে তাঁব দিকে চেয়েছিলেন অনুপমা। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, তুমি কাঁপছ কেন? তোমাব ভয় হলে উঠো না—

সিঁড়ির দিকে এগোলেন অনুপমা। শুকনো কাঁপা গলায় আবাব বাধা দিলেন বসন্তবাবু, বৌ-ঠান, শোনো—

ফিবে দাঁড়ালেন। দেখলেন পাথরেব আডালে সরে দাঁড়িযেছে মানুষটা। পায়ে পাযে কাছে এলেন।

সত্যিই দুই ঠোঁট কাঁপছে বসন্তবাবুর। জ্বরগ্রস্ত বোগীর মত বললেন, আমাকে দাও, আমি দিযে আসি।

সমস্ত মুখ এই রুক্ষ পাহাড়েব থেকেও যেন কঠিন হয়ে উঠল অনুপমাব। তীব্র, তীক্ষ্ণ নেত্রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। যাবাব জন্য ফিরলেন আবার।

দুই হাত বাড়িযে বসন্তবাবু ধবে ফেললেন তাঁকে। অনুপমা ঘুবে দাঁড়ালেন। তাঁর দুই চোখে আগুন।

দু'চার মুহূর্ত।

আচমকা অনুপমাব দুই পাযের ওপর একেবারে ভেঙে পড়লেন বসন্তবাবু। দুই পা জড়িয়ে ধবে ছোট ছেলের মতই ডুকবে কেঁদে উঠলেন তিনি। এ কান্না যেন আর থামবে না।

অনুপমা নিষ্প্রাণ, স্তব্ধ।

অনেকক্ষণ বাদে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, এতটা দরকার হযেছিল কেন ...ছেলেমেয়ের ভাবনা এতই বড় তোমাব?

জবাবে আকুল কান্নায় সমস্ত মাথাটা ওই দুই পায়ে গুঁজে দিতে লাগলেন বসন্তবাবু।

কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ যেন।

পা ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ির দিকে এগোলেন অনুপমা। একটা লোককে ধরে গোটাকয়েক টাকা দিয়ে ভোগের মালসা ওপরে পাঠালেন। তারপর গাড়িতে এসে বসলেন চুপচাপ।

মোটর ছুটল। অনুপমা নির্বাক, গম্ভীর। অন্য কোণঘেঁষে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন বসন্তবাবু।

হ্যাঁ, সব জেনেই এসেছিলেন অনুপমা ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছেন, চোখ এড়াবে কেমন করে? মুখের দিকে তাকালেই যে বুঝতে পারেন। পাঁচশ সত্তরটা সিঁড়ি শুনেই কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম। তারপর স্নায়ুতে কেমন যেন লেগেছিল। একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির ছায়াপাত হচ্ছিল থেকে থেকে। তারপর সমস্ত রাত ভেবেছেন। যত ভেবেছেন, দুই যুগ আগের মত স্বামীর মুক্তির প্রসঙ্গে পুরোহিতের কথাগুলি ততো অস্বাভাবিক লেগেছে। এত তীর্থ থাকতে একমাত্র ওই পাহাড়ের ডগার তীর্থটিতেই নিজে হাতে ভোগ পৌঁছে দেওয়ার বিধানটিও স্বাভাবিক মনে হয়নি। আর পরদিন দেওরের মুখের দিকে তাকাতেই একটা অস্পষ্ট স্বার্থের উদ্দীপনা চোখে পড়েছে গিল্টি করা গয়নার মত।

পুরোহিতের বাড়ি গিয়ে সরাসরিই তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অনুপমা, কত টাকার বিনিময়ে স্বামীর আত্মার মুক্তির ওই বিধান দিয়েছেন তিনি? চোর ধরা পড়ার অবস্থা পুরোহিতের। স্বীকার করেছেন, কোনো কারণ না জেনে মাত্র পচিশটি টাকার লোভেই ওই মিছে কথা ক'টি বলেছেন ।

ধীর শান্ত নেত্রে অনুপমা ফিরে তাকালেন। গাড়ির এক কোণে তেমনি মাথা গুঁজে পড়ে আছেন বসন্তবাবু। কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছেন এক-একবার।

অনুপমা বাধা দিচ্ছেন না। দেখছেন। চেয়েই আছেন। মুখের কঠিন রেখাগুলো মিলিয়েছে। চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে একখানা হাত রাখলেন তার গায়ে। মৃদুস্বরে বললেন, ওঠো, আর কাঁদে না।

এবারে তার কোলের মধ্যেই মুখ গুঁজে দিলেন বসন্তবাবু। কান্না আরো বাড়ল বই কমল না।

চোখের জল নিয়েই হাসতে চেষ্টা করলেন অনুপমা। দুটো হাতই তার মাথায় রেখে বললেন, তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য ভাবনা নেই, ওরা আমারই—। তারপর একটু ঠেলে দিয়ে সেই ছেলেবেলার অনুশাসনের সুরেই বললেন আবার, ওঠো বলছি, ঠিক হয়ে বোসো—সামনের লোকটা ভাবছে কি সেই থেকে।

ক্ষতিপূরণ

—থামো তো বাপু, তুমি আর বকিও না, তোমার বুদ্ধি-পরামর্শের দরকার নেই আমার, ঢের দেখেছি। কাজ থাকে তো করোগে, নয়তো ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে বোসো

দু'দণ্ড। গেলবারে টেনেটুনে পাস করেছে, এবারে আর দেখতে হবে না।

—এই তোরা থামবি না বকর-বকর করবি? দিনরাত খালি কথা কথা আর কথা। কিসের এত কথা তোমাদের শুনি? এত যে বলি চুপ করে থাকতে শেখো দু'দণ্ড, কানে যায় না? মুখ চলছেই, চলছেই!

—দ্যাখ বিন্দি, তোর বড় বাড় বেড়েছে, থামবি তো থাম, নয়তো দেব দূর করে! এই করে ঘর ঝাঁট দিস তো একবার ছেড়ে তিনবার করে দিবি। কাজের এই ছিরি, আবার মুখের ওপর কথা কচকচিয়ে!

—দেখো বুড়ী, তোমার ও বোষ্টুমি বিনয় থামাও। তুমি আমাকে দুধ চেনাবে কেমন? পেয়ালায় মুখ ঠেকিয়ে অমন যে রা কাটে না লোকটা সে পর্যন্ত বলল, দুধে জল নয় জলে দুধ মিশিয়েছে। এখন তুমি এসেছ সাফাই গাইতে—তিনকাল যেতে বসেছে অধম্মের ভয় নেই একটুও? আপদে বিপদে আগাম টাকা নেবার সময় এ বাড়ির কথা সবার আগে মনে পড়ে, কেমন? এসো আবার, দেবো খাইয়ে।

—থামো বাপু বুঝেছি, ফি মাসেই তো দিচ্ছি, এ আর নতুন কি— দিচ্ছি এনে। কিন্তু একটা কথা বলি, রাগ করো না, এক বাড়িতে পাশাপাশি ভাড়াটে, আপদে বিপদে দু'দশ টাকা দেওয়া নেওয়া কিছু নয়। কিন্তু সেজেগুজে তোমার কর্তার সঙ্গে মাসে তিনটে করে যে সিনেমা দেখার নিয়ম করে ফেলেছ, সেটা একটু কমালেও তো এই ক'টা টাকা বাঁচে। আমার টাকা দিয়ে দেবে জানি, দিচ্ছও—তবু তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, নইলে আমার আর কি!

—আপিসের কথামৃত এবার থামা দেখি তোরা। আমি বাপু না বলে পারিনে, মেয়ে হয়ে চাকরি ক'চ্ছিস কর, নিন্দের কিছু নয়, দরকার পড়লে করতেই হয়। তা বলে দিনরাত অত ফড়ফড় করে ঘেড়াস কেন ফড়িংয়ের মত। অত সাজগোজ ভড়ং-চড়ং না করে সেই টাকা দিয়ে খেলেও তো পারিস ভালোমন্দ, গায়েগতরে মাংস লাগে একটু, যা হচ্ছিস দিন কে দিন ভেজা কাকও ফিরে তাকাবে না এরপরে।

সতের থেকে একত্রিশ—এই চৌদ্দবছর সকলকে থামিয়ে সুনীলমাধবের সংসারে বিপুল বিক্রমে সচল হয়ে আছেন মহিলা। অর্থাৎ ক্ষণপ্রভা। স্বামী ছেলেমেয়ে দাসদাসী ধোপা গয়লা আত্মীয় পরিজন এমন কি স্বামীর বন্ধু এবং নিজের বান্ধবীদেরও থামিয়ে রেখেছেন তিনি। ওঠা-বসা, নাওয়া-খাওয়া, চলন-বলন সকলের সবেতেই তাঁর সজাগ দৃষ্টি এবং রসনাবর্ষণ।

স্বজন পরিজন সকলেই ওঁর এদিকটা মেনে নিয়েছেন। আড়ালে আবডালে ঠাট্টা করেন না এমন নয়। বান্ধবীদের অনেকে স্বামী বেচারার প্রতি অনুকম্পাশীল। কেউ বা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, দেশে এত প্ল্যান-ফ্ল্যান চলছে, ক্ষণপ্রভার চাক এখনও যোগ্যস্থানে গিয়ে পৌঁছলো না কেন—ধরে নিয়ে গিয়ে কোন একটা উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান—না কি চেয়ার য়ুরোম্যান হবে—করে দিলেই তো হয়!

সামনে? এত বুকের পাটা কারো নেই। এসব কথা কম করে শত হাত দূরে গিয়ে।

কিন্তু কেন মেনে নিয়েছে সেটা অনুমান করার জন্য সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। স্বামী মেনেছেন, কিছুটা প্রাণের দায়ে, কিছুটা গো-বেচারী স্বভারের দোষে। আর সব থেকে বেশি মেনেছেন তাঁর কর্মক্ষেত্রে ভাগ্যোন্নতির সূচনার সবটাই ওই নারীর দাপটে ঘটেছে বলে। ঝি গঞ্জনা বরদাস্ত করে, অন্য পাঁচ বাড়িতে কাজের অভিজ্ঞতা আছে তাই। গয়লা-বুড়ী দুধে জল না মিশিয়েও অপবাদ হজম করে, কারণ ফি মাসেই প্রায় দুধ খাওয়ার আগেই তাকে টাকা দিতে হয়। পাশের ফ্ল্যাটের প্রায় সমবয়সী গিন্নি নির্বিবাদে কথা শোনেন, কারণ কথা শুনেও টাকা পান। আর ভেজা কাক ফিরে তাকায় না শুনেও বন্ধুস্থানীয়ারা প্রতিবাদ করেন না, কারণ ছুটিছাটার দিনে এসে পড়লে বাড়ির তৈরি থালাভরা খাবার এ বাড়িতেই মেলে।

একটি মেয়ে, একটি ছেলে এবং স্বামী সুনীলমাধব—সংসার বলতে এই। মেয়ের বয়েস সম্প্রতি তেরো, ছেলের এগারো, স্বামীর সাইত্রিশ। মহিলার নিজের একত্রিশ চলছে, চলনবলনে মনে হবে একান্ন। সাহস করে দেখে নিতে পারলে গঠনে সবল একুশের মাধুর্যও চোখে পড়তে পারে। সবল, অর্থাৎ একটু মোটার দিক ঘেঁষেছেন। ফর্সা, নিটোল আঁটসাঁট গড়ন। কিন্তু সে দেখাব কাজটা খুব সহজ নয়, এমন কি সুনীলমাধবের পক্ষেও নয়।

বিয়ে হয়েছিল সতেরোয়। এর আগে বাপের বাড়ির সকলকে যে একটু আধটু না থামিয়ে চলেছেন তিনি, এমন নয়। কিন্তু শেষের দিকে, অর্থাৎ বিয়েব আগের শেষের দিকটায় অনেকটা ছাইচাপা আগুনেব মত কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। পিতৃবিয়োগেব ফলে মায়েব অনুরোধ উপরোধে ভাইদের সংসারে তেমন করে আব জাহির করেন নি নিজেকে। দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহযোগ। সুনীলমাধব সবে তখন এম. এ পাস কবে অ্যাকাউন্টস অফিসে আপার ডিভিশনে বহাল হয়েছেন। বিয়ের আগে একটু নীরব রোমান্সের সুযোগ এসেছিল সুনীলমাধবের জীবনে, ক্ষণপ্রভার দাদার সহপাঠী হিসেবে বাড়িতে আনাগোনা ছিল তার। সংগোপনে কোনো বাসনা লালন করছিলেন তিনি সেটা জানা দূরে থাক, সেই সতের বছরের মেয়েটিকে ভালো করে চোখ চেয়ে দেখেছেন কখনো এও জানতেন না কেউ। ক্ষণপ্রভা নিজে তো নয়ই। প্রকাশ পেল এম.এ পাস করে এবং চাকরিতে বহাল হয়ে। আভাসে ইঙ্গিতে সহপাঠীর কাছে বাসনাটুকু ব্যক্ত করেছিলেন কোনপ্রকারে।

পিতৃহীন নতুন অভিভাবক দাদাটি সাগ্রহে মায়ের কাছে দৌড়েছিলেন তৎক্ষণাৎ। এত সহজে অপ্রিয়-ভাষিনী সহোদরার গুরুভাব লাঘব করার সুযোগ আসবে ভাবতে পারেননি। সাত পাঁচ ভেবে মা সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু খুব সন্তুষ্টচিত্তে নয়। শেষ পর্যন্ত কেরানী জামাই আসবে একবারও ভাবেননি। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে, মেয়ের বাপ বেঁচে থাকলে অন্যরকম হত। এই মেয়ের গর্ব মস্ত গর্ব ছিল তাঁর। ছেলেটা লেখাপড়ায় ভালো এই যা সান্ত্বনা। ভবিষ্যতে হয়ত উন্নতি করবে, বিশেষ করে এই মেয়ের মত মেয়ের হাতে পড়লে—এটুকুই আশা। মেয়ের উপর মায়েরও অগাধ আস্থা।

যাই হোক প্রস্তাবটা ক্ষণপ্রভারও কানে এসেছিল। সতের বছরের মধ্যে সেই বোধহয় একবার থমকে গিয়েছিলেন তিনি। দাদার সঙ্গে পড়ত আর মাঝে-মধ্যে

আসত...মুখ তুলে তাকাত না কোনদিকে—সেই ছেলেটা বিয়ে করতে চায়। ক্ষণপ্রভা ভালো করে চেয়েও দেখেননি কোনদিন, এমন জানলে দেখতেন।

দেখলেন। একেবারে শুভদৃষ্টির সময়। ভালো করেই দেখলেন। পরের চৌদ্দ বছরে আর দেখার তেমন দরকার হয়নি।

বিয়েব পর সতের থেকে একুশ পর্যন্ত শ্বশুর-শাশুড়ীব আমলে সকলকে থামিয়ে তাঁর নিজের চলার ঝোঁকটুকু কিছুটা প্রচ্ছন্ন ছিল। অর্থাৎ মুখের উপর প্রকাশ্যে থামতে বলতেন না কাউকে, হাবভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ততদিনে একটি মেয়ে এবং একটি ছেলের শুভাগমন হয়েছে। থামার স্পষ্ট হুমকি সর্বপ্রথম নিক্ষেপ করিলেন স্বামীর ওপর, আর ছেলেপুলে নয়—

তাবপর শ্বশুব-শাশুডী গেছেন। দেওববাও প্রবাসী চাকুবে। কিন্তু সংসারেব একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী হয়েও মনে সুখ কই? সংসাবে অনটনেব ছায়া। তাই ক্ষণপ্রভাব থামানোব ভ্রূকুটি আবো কঠিন। স্বামী বেচাবী থামতে থামতে প্রায় নিস্তেজ হযে এলেন। ঝোঁকেব মধ্যে তাঁর সিনেমা দেখাব ঝোক ছিল একটু-আধটু, কিন্তু এই অপচয়ই আবাব সব থেকে বেশি চক্ষুশূল ক্ষণপ্রভাব। অতএব সেসব আকর্ষণ বিসর্জন দিয়ে নিজের ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে আরো একটি পাকাপোক্ত ভালো ছেলে হয়ে বসলেন সুনীলমাধব।

এই কবে একুশ থেকে পচিশে পৌছুলেন ক্ষণপ্রভা। সুনীলমাধবের তখন একত্রিশ।

ঠিক এই সময়টি থেকে সংসারের স্রোত পবিবর্তনমুখী হল আবাব। সুনীলমাধব তখন কর্মকুশলতায় একটা বিভাগেব অস্থায়ী ইনচার্জ। ইনচার্জ অর্থাৎ কেবানীব মাইনের ওপর পচিশ টাকা বেশি। কিন্তু সেটুকুও গিয়ে পুনর্মূষিক হবাব সম্ভাবনা দেখা দিল একদিন। কথায় কথায় ক্ষণপ্রভার সামনেই খেদ প্রকাশ করে ফেললেন, ঘষেমেজে এতদিনে এস এস পরীক্ষাটা যদি পাস করে ফেলতে পারতেন কোন রকমে, আর ভাবনাচিন্তা থাকত না...এ আবার যে-কে সেই।

কিছু একটা করছিলেন ক্ষণপ্রভা। কানে যেতে সোজাসুজি ঘুবে দাঁড়ালেন।—কি করতে পারলে ভাবনাচিন্তা থাকত না?

সুনীলমাধব আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, ওই আপিসের একটা পরীক্ষার কথা বলছিলাম...খুব শক্ত পরীক্ষা।

—পাস করলে কি হয়?

—এই, মানে—দু পার্ট পাস কবলে সুপারিনটেনডেন্ট থেকে শুরু হয়...

—তারপর?

প্রমাদ গুনলেন সুনীলমাধব।—তারপরও অনেকটা ওঠা যায়, কিন্তু পাস করাই—

—থামো! ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ক্ষণপ্রভা, তুমি এ-কথা আমাকে আগে বলোনি কেন?

যেন বললে বাদবাকি ব্যবস্থা ওনারই হাতে। কিছু একটা দুর্যোগ আসন্ন বুঝে সুনীলমাধব প্রায় মরিয়া হয়ে চেষ্টা করলেন রক্ষা পেতে।—তুমি বুঝছ না, ভারতবর্ষের সব অ্যাকাউন্টস আপিস মিলিয়ে এই পরীক্ষা, খুব শক্ত—একটা পার্ট পাস করতেই

এক-একজনের পাঁচ সাত বছর লেগে যায়, তাও পারে না—শতকরা পাঁচ-ছ'জনের বেশি পাসই করে না কোনবার—

—আর বকবক করতে হবে না, থামো—লজ্জাও করে না বলতে! ওই পাঁচ-ছ'জন যারা পাস করে তারা গাছে থাকে না ঘাস খায়?

রাগের মাথায় ক্ষণপ্রভা নিজেই আবোলতাবোল বকে উঠলেন। আর বিপদ ডেকে এনে সুনীলমাধব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলেন।

কিন্তু রেহাই নেই। বিপদ নিজেই খুঁড়েছেন। ঠিক সাত দিনের মধ্যে কিছু বইপত্র সংগ্রহ করে এবং কিছু কিনে সুবোধ বালকের মত পরীক্ষার পড়া শুরু করতে হল তাঁকে। এক ঘরেই মেয়ে দ্বিতীয় ভাগ পড়ে, মেয়ের বাবা অ্যাকাউন্টস পড়েন। দু'জনকেই ভোর না হতে ঠেলে তোলেন ক্ষণপ্রভা। মাঝে মাঝে এসে দেখেও যান আবার। প্রথম প্রথম সুনীলমাধবের তেমন মন বসে না পড়ায়। ফাঁক পেলে মেয়ের সঙ্গে গল্পও করেন একটু-আধটু। ধরা পড়লে স্ত্রী ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, তোমরা থামবে না গল্পই করবে সকাল থেকে?

তবে ধরা বিশেষ পড়েন না। কারণ বাবা মেয়ে দুজনেই সজাগ। সাড়া পেলেই সচকিত মনোযোগ। মোট কথা সেবারে উৎরানো গেল না প্রথম পার্ট। কিন্তু পরের বারে গেল।

পনের দিন না যেতে আবার দ্বিতীয় পার্টের জন্য প্রস্তুতির তাগিদ। এবারে ছাত্র-সংখ্যা আর একটি বেড়েছে। ছেলেটিও প্রথম ভাগ ধরেছে। কাজেই পড়াশুনার ব্যবস্থা এবার বদলেছে একটু। সুনীলমাধব একঘরে পড়তে বসেন, ছেলেমেয়ে অন্য ঘরে। ক্ষণপ্রভা দু'ঘরেই তদারক করে যান আগের মতই। খর প্রহরা। এবারে কড়াকড়ি আরো বেশি। একটু অনিময় হলে মেয়ে পর্যন্ত হন্তদন্ত হয়ে এসে ফিস ফিস করে বাবাকে সতর্ক করে দিয়ে যায়, বাবা পড়ছ না! মায়ের মাছকোটা হয়ে এসেছে, এক্ষুণি আসবে—

এমন প্রাণান্তকর পড়া সুনীলমাধব জীবনে আর পড়েননি কখনো। রাত থাকতে উঠে পড়া শুরু। কোনরকমে নাকেমুখে চারটি গুঁজে আপিসে যাওয়া। আপিসে একঘণ্টা টিফিন। ক্ষণপ্রভা জানেন সেটা, বলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অন্তত বসে পড়তে পারো। আপিস থেকে ফিরে বড়জোর একঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর রাত বারোটা পর্যন্ত আবার পড়া। হাটবাজার ঘরসংসার? আমি আছি আর বিন্দি আছে। তুমি বসে পড়ো শুধু।

কিন্তু এত পড়েও একবারে দ্বিতীয় পার্ট পাস করতে পারলেন না সুনীলমাধব। কেন পারলেন না, মুখ কালি করে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে ধমক খেলেন একটা।—থামো, আমি এসব ফিরিস্তি শুনলে তো আর তোমার পাশ করা এগোবে না—আসছে বারে যাতে হয় সে চেষ্টা দেখো।

আসছে বারে হল। সুনীলমাধবের মনে হল বুকের ওপর থেকে হিমালয় নেমে গেল। পনের দিনের মধ্যে অস্থায়ী সুপারিনটেনডেন্ট-এর পদে বহাল হয়ে গেলেন তিনি। সহকর্মীদের সখেদ প্রশংসায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েন সুনীলমাধব। যেন আর কারো পাওনা-গণ্ডা তাঁর পকেটে এসে পড়ছে।

মাসখানেক না যেতে ক্ষণপ্রভা আবার জিজ্ঞাসা করেছেন, আর কোনো পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই তোমাদের?

সুনীলমাধবের বোধ করি পরীক্ষা-ত্রাস এসে গেছে একটা। শুনেই চমকে উঠেছিলেন, আবার কিসের পরীক্ষা?

—আরো উন্নতি-টুন্নতি হতে পারে এমন কিছু?

—না, যা হবার এখান থেকেই হয়।

মনঃপূত হয়নি। বলেছেন, তুমি তো সবই জানো, ভলো করে একটু খোঁজখবব করে দেখো!

তারপর দু'বছর কেটেছে। অর্থাৎ সদ্য বর্তমান। অর্থাৎ ক্ষণপ্রভা একত্রিশ এবং সুনীল-মাধব সাঁইত্রিশ। সংসারেব চেহারা বদলে গেছে। স্থায়ী সুপাবিনটেনডেন্ট হয়েছেন সুনীলমাধব গতবছরেই। এবই মধ্যে আবার অ্যাকাউন্ট অফিসার হবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে নাকি।

এদিকে স্বামীকে দিয়ে নতুন করে কিছু করাবাব সম্ভাবনা যখন নেই, নিজেই কিছু করার জন্য লেগে গেছেন ক্ষণপ্রভা। স্বামীকে আপিসে পাঠিয়ে, ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাঠিয়ে, ধীরে সুস্থে নিজের কাজেব পাট চুকিয়ে বিন্দির হাতে বাড়ি ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন দেড মাইল দূরে সেলাইয়ের ইস্কুলে সেলাই শিখতে। বসে থেকে লাভ কী? সবই কাজে লাগতে পাবে। সেলাইটাও ফেলনা নয়, বীতিমত পবীক্ষা হয়, ডিপ্লোমা দেয়।

পরিবর্তনের মধ্যে মহিলার থামানোব দাপট আব একটু বেড়েছে। যার দরুন ছেলেমেয়ে পবীক্ষায ফার্স্ট হয়েও টেনেটুনে পাস কবেছে বলে গাল খায, স্বামী সচ্ছল রোজগারের এক কডিও অযথা খরচ কবতে গেলে নাজেহাল হন, আর আত্মীয়পবিজন পায়ে পায়ে 'থামো'র ভ্রূকুটিতে হোচট খান।

কিন্তু মহিলা অন্যায় কাবো উপব কবেন, একথা মুখ ফুটে কেউ বলতে পারবে না। প্রথমত ভয়ে, দ্বিতীয় যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে অন্যায তিনি কমই কবে থাকেন। তবু এরই মধ্যে ভুল-ত্রুটি বা অন্যায় যদি কিছু কবে ফেলেন, সেটা সামলে বা শুধবে না নেওয়া পর্যন্ত আহারনিদ্রা ঘুচে যায় তার।

এর মূর্তিমতি নজির বিন্দি। অনেকদিনেব পুরানো ঝি। আর অনেকদিনের পুরানো কথা। সংসাবের অবস্থা তখন সচ্ছল নয় মোটেই। আচলেব খুটে টাকার নোট বাধা ছিল একটা, মনে ছিল না। মনে যখন পড়ল তখন বাবান্দার বেলিংএ ভিজে শাড়ি শুকোচ্ছে, দশ টাকার নোটের চিহ্নও নেই কোথাও।

বিন্দি ছাড়া এ আব কাব কাজ? বিন্দি যত প্রতিবাদ করে, ক্ষণপ্রভা সগর্জনে তাকে থামিয়ে দেন ততবার। বিন্দি কান্নাকাটি করতে লাগল। ক্ষণপ্রভা তাকে পুলিসে না দিয়ে দূর করে তাড়িয়ে দিলেন শুধু।

নতুন ঝি এলো। ঠিক সাতদিন গেছে। ধোপা এলো কাপড় নিতে। ময়লা কাপড়ের বাস্কেট থেকে কাপড় বাব করে দিতে গিয়ে ক্ষণপ্রভা একেবারে হাঁ। শাড়ির আঁচলে সেই দশ টাকার নোট বাঁধা। কি ব্যাপাব! ব্যাপার মনে পড়তেই হতভম্ব। কি হয়েছিল সেই দিনের সেই সকালে, কাকে থামানোর তাড়নায় এত ভুল সেদিন—সেটা আর

মনে নেই। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট মনে আছে, পরনের শাড়িটা বেশিরকম ময়লা দেখে সেটা বদলে সেই জোড়ারই আর একখানা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার শাড়ি বদলে পরেছিলেন। ময়লা শাড়িটা বাস্কেটে পুরেছিলেন। সকালের নোট সেই ময়লা শাড়ির আঁচলে ছিল।

সকাল-দুপুর গুম হয়ে কাটালেন তিনি, বিকেলের দিকে নতুন ঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, বিন্দি কোথায় থাকে জানো?

সে জবাব দিল, ঠিক জানে না, তবে অমুক একটা বস্তিতে থাকে শুনেছিল।

—ডেকে নিয়ে এসো একবার, এক্ষুনি, বলবে আমি ডেকেছি।

নতুন ঝি ফিরে এসে খবর দিল, সে এলো না, উল্টে পাচ কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

বিকেলে সুনীলমাধব আসতে তাকে জলখাবার খাইয়ে বললেন, মেয়েকে নিয়ে ঝিয়েব সঙ্গে ওই কোন বস্তিতে বিন্দি থাকে সেখানে যাও তো—ওকে ডেকে নিয়ে আসবে, ভালো চায তো এক্ষুনি আসতে বোলো।

এবারে বিন্দি এলো।

নতুন ঝিকে ক্ষণপ্রভা বললেন, এই নাও বাছা তোমার সাতদিনের মাইনে, আর এই এক টাকা বেশি নাও—কাজ দেখে নাওগে আর কোথাও।

বিন্দি বেঁকে বসল, সে কাজ করবে না। চুরি করেনি, তবু তাকে চোর বলে দর করে তাড়ানো হয়েছে যেখান থেকে সেখানে আবার, ইত্যাদি—।

এই অভিমানের উপরেও ধমকে উঠলেন ক্ষণপ্রভা, থাম থাম, চুরি করিসনি তো করিসনি, তার জন্য চেচিয়ে বাড়ি মাথায় করার কি আছে—যা কাজ করগে যা, ওই সাতদিনের মাইনে পাবি আব মাসে এক টাকা করে বেশি পাবি এবার থেকে।

দশ টাকার জের।

যাই হোক, সকলকে বেশ ভালো করে থামিয়ে মেজাজ সম্প্রতি ভালই ছিল ক্ষণপ্রভার। আরো ভালো হয়েছে, সেদিন মেয়ে মাথা থেকে দুটো পাকা চুল তুলতে। যে করেই হোক মেয়ে বুঝেছে, মা এত খুশি আর শিগগীর হননি। তেরো বছরেও মায়ের মেজাজ বুঝবে না এমন বোকা নয় মেয়ে।

এর পরে সামান্য কি কথায় ক্ষণপ্রভা সুনীলমাধবকে শুনিয়ে দিলেন। তুমি না হয় বুড়ো খোকাটি হয়েই কাটিয়ে দিলে, কিন্তু আমার তো বয়েস বাড়ছে, মাথার চুল ওদিকে শাদা হয়ে গেল—জিজ্ঞেস করে দেখো মেয়েকে।

মেয়ে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করল, মোটে দুটো তো মা—

—তুই থাম, দু'টো দু'শো হতে ক'দিন লাগে!

কি প্রসঙ্গে এই উষ্ণতা সুনীলমাধব তখনো বুঝে ওঠেননি। ভেবেচিন্তে বললেন, ভালো একটা তেল-টেল তাহলে—

—বাজে বোকো না, বয়েস হলে চুল পাকবে না তো কি কাঁচা হবে?

ক্ষণপ্রভা বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন সেদিনই। তার মা এখনো বেঁচে। মা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, অর্থাৎ ক্ষণপ্রভার দিদির সাংসারিক প্রসঙ্গে একসময় বলেছিলেন, ছোট

মেয়ের মত তার যদি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকতো, তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন তিনি।

ক্ষণপ্রভা তৎক্ষণাৎ একষট্টি বছরের মত মুখখানি করে জবাব দিয়েছেন, আর বোলো না মা, আমিও আর পারিনে, দিদি বরং ভালো। চব্বিশ ঘণ্টা বকে বকে—বয়েস তো হচ্ছে, চুলেও পাক ধরেছে, কাঁহাতক পারা যায়!

একত্রিশ বছরের মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মা অবাক। কিন্তু না-পারার কোনো লক্ষণ বা ক্লান্তি না দেখে আশ্বস্ত হলেন।

সকলকে থামানোব এই একচ্ছত্র দাপটের মধ্যে ক্ষণপ্রভা দেবী নিজেই হঠাৎ একদিন থেমে গেলেন।

একেবার হঠাৎ নয়, একটু একটু কবে হঠাৎ।

সেটুকুই কাহিনী।

একটি কথা নেই কারো সঙ্গে। থামতে বলা নেই। থমথমে গম্ভীর।

এদিকে বাবা, মেয়ে এবং ছেলে তিনজনেই বিস্মিত, শঙ্কিত, বিভ্রান্ত। শুকনো মুখে সুনীলমাধব ইশাবায় জিজ্ঞাসা করেন মেয়েকে, কি হয়েছে রে?

মেয়ে ফিস ফিস করে জবাব দেয়, জানি নে তো বাবা, ক'দিনই এমনি দেখছি।

নিরাপদ ব্যবধানে বসে তিনজনেই চিন্তাজর্জর। শুধু চিন্তায় নয়, ভয়েও। সুনীলমাধব আপিসে যাওয়াব সময় কথা নেই, ছেলে-মেযে ইস্কুলে যাওয়াব সময় কথা নেই, এমন কি খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারপরে বিন্দিব সঙ্গেও কথা নেই। একদিন নয়, দু'দিন নয়, চার পাঁচ দিন হয়ে গেল।

ভীতত্রস্ত সকলেই। দুঃসহ গুমোট, কি হল? কি হতে পারে?

কেউ জানে না। কাবো জানা সম্ভবও নয়। একমাত্র ক্ষণপ্রভা জানেন। তাই ব্যাপারটা শুধু তার চোখ দিয়েই দেখা যেতে পারে।

দিনকতক আগের কথা। ছুটির দিন ছিল। বিকেলে দোতলার বারান্দায় রেলিংএ ভর করে রাস্তা দেখছিলেন সুনীলমাধব। অর্থাৎ লোক চলাচল বা গাড়ি চলাচল দেখছিলেন।

ক্ষণপ্রভা এদিকে আসছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, স্বামীর আনমনা দু'চোখ যেন উৎসুক হয়ে উঠেছে। রাস্তায় চলমান দ্রষ্টব্য কিছুর দিকে চোখ আটকে গেছে তাঁর এবং ক্রমশ ঘাড় ঘুরিয়ে কি দেখছেন তিনি। পিছনেব দিক থেকে ক্ষণপ্রভাও দেখলেন। রাস্তা দিযে হেটে চলে যাচ্ছিল একটি সুশ্রী বিবাহিতা তরুণী। তার স্বাস্থ্যোচ্ছল নারীপ্রাচুর্য রমণীয়। সুনীলমাধব তন্ময় হয়ে দেখছেন, ঘাড় সম্পূর্ণ ঘুবে গেছে, বেলিংয়ের উপর ঝুঁকে পড়েছেন—অর্থাৎ যতক্ষণ দেখা যায় দেখবেন।

ক্ষণপ্রভা বর্ষণোন্মুখ হয়েও থমকে গেলেন। ঘরে মেয়ে আছে। কিছু না বলে স্বামীর অগোচরে সরে এলেন। সময়মত বলবেন। সে বলাটা কেমন হবে মুখ দেখলে অনুমান করতে পারত সকলেই। বিকেলের গা-ধোয়া সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে অনেককাল বাদে হঠাৎই যেন নিজের দিকে চোখ গেল তাঁর।

চিরুনি চালাতে চালাতে অন্যমনস্কতায় বারকতক এমন হল, অর্থাৎ নিজের দিকে চোখ গেল।

ছেলেমেয়ে এক ঘরে শোয়। তাঁরা দু'জন অন্য ঘরে। বিয়ের মস্ত খাট। স্বামী একদিকে থাকেন, স্ত্রী অন্যদিকে। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা। ক্ষণপ্রভা রাত্রিতে বোঝাপড়া করবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু বলি বলি করেও বলা হল না। কেবলই মনে হল, বলার আগে কিছু যেন একটা চিন্তা করার আছে। যথাযোগ্য বিচারের আগে কিছু যেন ভাবা দরকার।

ওপাশ থেকে ততক্ষণে নিশ্চিন্ত ঘুমের নিঃশ্বাস শোনা গেল।

কি জানি কেন, এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না তিনি। কিন্তু এও এই মৌন স্তব্ধতার কারণ নয় ঠিক। তবে অঙ্কুর বটে।

পাঁচ সাত দিন কেটে গেল এরপর। যেমন চলছিল তেমনি চলেছে প্রায়। ক্ষণপ্রভা কথা বলা বা থামতে বলা একটু কমিয়েছেন এইমাত্র।

সেদিন সেলাইয়ের ইস্কুল থেকে ট্রামে উঠতেই দ্বিতীয় যোগাযোগ।

সামনেব দিকের একটা সীটএ পাশাপাশি বসে আছেন দুজন...একজন তাঁর স্বামী, অন্যজন এক মহিলা। সুশ্রী নয় খুব, তবে বয়েস তিরিশের অনর্ধ্ব। পিছনের লেডিজ সীটএ বসে ভালো করে লক্ষ্য কবতেই ক্ষণপ্রভা চিনলেন মহিলাটিকে। একদিন এসেছিলেন তাঁদের বাড়িতে। স্বামী অসুস্থ ছিলেন, কয়েকটা ফাইল বাড়িতে দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। তখন পরিচয় হয়েছিল। সুনীলমাধবের অধীনস্থ একটা বিভাগের ইনচার্জ ওই মহিলা।

ক্ষণপ্রভা দু'চোখ গোল করে দেখলেন। বেশ জমিয়ে গল্প করছেন দু'জনে, হাসছেন। পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। বাড়িতে অমন গো-বেচারী ভালোমানুষ স্বামীটি এ-রকম হাসতে পারেন আর চোখেমুখে কথা কইতে পারেন তাই যেন জানতেন না ক্ষণপ্রভা। পিছনে বসে নির্নিমেষে দেখলেন শুধু। কি ভেবে নিঃশব্দে বাড়ির এক স্টপ আগেই নেমে পড়লেন তিনি।

গাম্ভীর্যের মাত্রা বাড়ল। বাড়িতে বাবকতক স্বামীকে নিরীক্ষণ করলেন থেকে থেকে। চোখোচোখিও হল। সেই নিরীহ ভালোমানুষ। মুখে কথাটি নেই, সঙ্কোচবিনম্র।

রাত্রির প্রতীক্ষা আবার।

কিন্তু মনের তলায় সেই ভেবে দেখার বিষয়টা এবারেও সঠিক স্পষ্ট হল না ক্ষণপ্রভার কাছে। না হওয়ার দরুন অস্বস্তি বরং বাড়ল। ভাবতে ভাবতে ঘুমন্ত নাসিকার গুঞ্জন শোনা গেল ওদিক থেকে।

পরদিন সকালে স্নানের পর চুল আচড়াতে গিয়ে নিজের দিকে আবার চোখ পড়ল বারকতক।

পর পর চার পাঁচ দিন এরপরে কোনো বিশেষ ট্রামের নিষ্ফল প্রতীক্ষা। তারপর আবার যোগাযোগ। সেই একই দৃশ্য, স্বামীর পাশে অফিসের সেই মেয়েটি, সেই এক স্টপ আগে নামা ক্ষণপ্রভার।

ব্যস, একেবারে থামলেন ক্ষণপ্রভা।

একবার মুখ খুললে হেস্তনেস্ত হয়ে যায় এক্ষুনি, বিচার এক্ষুনি করতে পারেন, মনে মনে প্রস্তুতও হন। কিন্তু আবার দ্বিধা। কোথায় যেন বিবেকের কাঁটা বেঁধে একটা। অবিচার করে ফেলার আশঙ্কাটাই বড় হয়ে ওঠে। সেই ভেবে দেখার বস্তুটা যেন পরিষ্কার হচ্ছে একটু একটু করে।

আর অস্বস্তি বাড়ছে। থমথমে ভাবটাও বাড়ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ানো দায় হয়ে উঠছে। চোখের আনমনা বিশ্লেষণ ধরে ফেলে নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছেন মনে মনে। রাত্রিতে ঘুম নেই চোখে। ওপাশে ঘুম। মাঝখানে অনেকটা ফাঁক। আবছা অন্ধকারে ফাঁকটুকু চেয়ে চেয়ে দেখেন ক্ষণপ্রভা। নিতান্ত কখনোসখনো তাঁর হালকা খেয়ালে ওই ফাঁক একটু-আধটু কমেছে। সেও ওই লোকটার সেই প্রথম পরীক্ষায় বসার আগে। নিজেরই দীর্ঘকালের নিস্পৃহতার অপবাধ। বিচার করতে প্রস্তুত, কিন্তু অবিচার করেন কি করে?

অস্বস্তিব একশেষ, এ তো আর বিন্দির একটাকা মাইনে বাড়িয়ে দেওযা নয়।

পরদিন রবিবার। ঠিক সাতদিন হয়ে গেল ক্ষণপ্রভা থেমেছেন। এ গুমোট আব যেন সহ্য হচ্ছে না বাকি তিনটি প্রাণীর। এমন কি বিন্দিরও না। দুপুবে খাওযা-দাওয়ার পর পায়ে পায়ে মেয়ে এসে দাঁড়াল মায়ের ঘরে। শুযে আছেন তেমনি। থমথমে অবস্থা মুখের। খেয়েদেযে বাবা আর সাহস করে ঘবেই আসেন নি। পাশেব ঘরে আছেন।

মেয়ের মনে পডল কি। মায়েব সেবারের সেই মনে মনে খুশি হওয়াব ব্যাপারটা মনে পড়ল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, আর চুল পেকেছে কিনা দেখব মা?

সাতদিনে এই প্রথম কথা নিঃসবণ হল ক্ষণপ্রভা দেবীর। শুয়ে শুয়েই ঘাড ফিরিয়ে দেখলেন। পরে একেবারে ফেটে পড়লেন যেন।—যা দূর হ' এখান থেকে পোড়ার-মুখী, বেরো—!

মেয়ে পাশেব ঘবে পালিয়ে বাঁচল। বাবা এবং ছোট ভাইয়ের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বসে হাঁপাতে হাপাতে ঘাড নাডল শুধু।

পবদিন।

সুনীলমাধব বিনম্রবদনে আপিস-যাত্রার উদ্যোগ কবতে স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন সামনে। সশঙ্কে তাকালেন সুনীলমাধব।

—গল্পটল্পগুলো আপিসেই শেষ করে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চেষ্টা কোরো একটু।

চলে গেলেন। সুনীলমাধব বিমূঢ়-নেত্রে খানিক চেয়ে থেকে আপিসের উদ্দেশে পা বাড়ালেন। পাঁচটায় আপিস ছুটি। সাডে চাবটে বাজতে না বাজতে উঠে পড়লেন। বাড়ি ফিরতে পাঁচটা।

ছেলেমেয়ে চারটের মধ্যে ইস্কুল থেকে ফেরে। কিন্তু কাউকে দেখলেন না। আড়চোখে তাকিয়ে স্ত্রীর মুখাবয়বেরও পরিবর্তন দেখলেন না খুব। কাজেই জিজ্ঞাসা করা হল না। হাতমুখ ধুয়ে আসতেই জলখাবার এলো। এবারে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, ওদের দু'জনকে দেখছিনে?

—বিন্দির সঙ্গে মামাবাড়ি গেছে। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে যেতে যেতে ক্ষণপ্রভা

দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়ালেন আবার।—খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।

চলে গেলেন। শুকনো মুখে দ্বিগুণ জলসহযোগে খাবারটা কোনরকমে তল করলেন সুনীলমাধব। জামাকাপড বদলে নিলেন তারপর।

প্রায় আধঘন্টা। ওপাশের ঘব থেকে নিজে প্রস্তুত হযে এলেন ক্ষণপ্রভা। পরনে দামী শাড়ি, গায়ে গয়না—মুখে প্রসাধন-মাধুর্য। সুনীলমাধব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বইলেন।

ভুরু কুঁচকে তাকালেন ক্ষণপ্রভা। ওতেই হল। ব্যস্তসমস্ত হয়ে সুনীলমাধব অনুসবণ করলেন তাঁকে।

পাশেব ফ্ল্যাটেব মেয়েটিকে ডেকে ক্ষণপ্রভা বললেন, আমবা বেরুচ্ছি একটু, বিন্দি আসা পর্যন্ত নজব বেখো। কিছু প্রশ্ন হবাব আগেই সিঁড়ি দিযে তব-তরিযে নিচে নেমে গেলেন।

ট্রাম। পাশাপাশি বসলেন দুজনে। ক্ষণপ্রভা পাচ পযসা কবে টিকিট কাটলেন দু'খানা। সুনীলমাধব আড়ে আডে দেখছেন আব ঘাবড়ে যাচ্ছেন।

দশ মিনিট। স্ত্রীব পিছনে পিছনে নামলেন আবাব। সামনেই মস্ত সিনেমা হল। বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন সুনীলমাধব, গটগট কবে সেই দিকেই চলেছেন তাঁব স্ত্রী।

সবেমাত্র প্রেক্ষাগৃহেব দবজা বন্ধ হযেছে। কোনদিকে না চেয়ে প্রবেশপথের গেট-কিপারের হাতে দুখানা টিকিট দিলেন ক্ষণপ্রভা। সুনীলমাধব পিছন থেকে প্রায় ঘাড় কাত করেই চেষ্টা কবলেন স্ত্রীর মুখ দেখতে। গম্ভীর...গম্ভীর ঠিক নয, গাম্ভীর্য বজায় রাখার বিড়ম্বনার মত।

গেটকিপাব দরজা খুলে দিলেন। ভিতবে অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকাব বিদীর্ণ করেই দেখতে চেষ্টা করছেন সুনীলমাধব। টর্চ জ্বেলে শো-ম্যান সিট দেখাবার জন্য এগিয়ে আসতে সেই আলোয় সুনীলমাধব দেখেন, স্ত্রী মুখোমুখি ঘুবে চেয়ে আছেন তাঁব দিকেই।

মুখভরা হাসি।

উত্তরাধিকার

পাকা বাঁধানো রাস্তাগুলোর মেরুদণ্ডের ওপর যেন একেব পর এক ঘা পডে আর তার ঠাস ঠাস শব্দগুলো কানের পরদায় এসে লাগে। অত বাতে ঐ শব্দ ভালো লাগার কথা নয় কারোই। একেবারে ঘুমিয়ে না পড়লে নিদ্রালস তন্ময়তায় রূঢ় একটা ছেদ পড়বেই। যার পাতলা ঘুম, রাতের মধ্যে অনেকবার তার ঘুম ভেঙে যাবেই। কিন্তু ভালো লাগুক বা না লাগুক, ঘুম ভাঙুক আর যাই হোক, রামবাহাদুরের পাকা লাঠি বেপরোয়া।

ঘরে যার ঘড়ি নেই, ওই লাঠির শব্দ কানে এলে সেও জানবে, রাত ঠিক বারোটা

বাজলো। তারপর ক্রমাগত সেই লাঠি ঠুকে ঠুকে গোটা এলাকা টহল দিয়ে বেড়াবে রামবাহাদুর। লাঠি ঠুকে ঠুকে আধ-ঘুমন্ত রাস্তাগুলোকে জাগিয়ে রাখবে। যত রাত বাড়ে, শব্দও বাড়ে। নিরাপত্তার কথা মনে থাকে না, বিরক্তি আর অস্বস্তিতে মেজাজ বিগড়ে যায় এক একদিন। ভাবি পরদিনই ওকে আচ্ছা করে ধমকে দেব, বলব, অমন বিচ্ছিরিভাবে লাঠি ঠুকে লোকের ঘুম ভাঙানোর অর্থ কি!

কিন্তু সকাল হলে আর রাতের কথা মনে থাকে না। তাছাড়া সকালে ওর দেখাই বা পাই কোথায়! এক মাস-কাবারে দেখা মেলে। কিন্তু তখন কিছু বলতে গেলে সব ক'টা উঁচু-নিচু দাঁত বার করে ও এমন হাসবে যে রাতের ওই অসুবিধেটুকুর কথা বলতে নিজেদেরই লজ্জা হয়। সামান্য ক'টা টাকার বিনিময়ে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন যে লোক সমস্ত রাত পাড়া আগলে বেড়ায়, তাকে বলব তোমার লাঠিটা আর একটু আস্তে ঠুকো রামবাহাদুর? বললেও ওপরঅলাই ওকে সমুচিত জবাব দিতে শিখিয়েছে। ও শুধু হাসবে, তারপর টাকা নিয়ে সেলাম করে চলে যাবে।

আমার বিশ্বাস, ওর রাতের ওই লাঠি ঠোকার আওয়াজে সব বাড়ির লোকই ভিতরে ভিতরে তেতে ওঠে, বিরক্ত হয়, অস্বস্তি ভোগ করে। অথচ কেউ কিছু বলে না ওই এক কারণে।

...দু'পাঁচ পা হাটে, আর হাতের বাধানো পাকা লাঠিটা এক-একবার আছড়ে মারে রাস্তার ওপর। সেই শব্দটা শোনা যায় অনেক দূর থেকে, আর কাছে এলে সেই সঙ্গে তার ভারী জুতোর শব্দ। সব বাড়ির লোকেরাই ভাবে, শুধু তাদের বাড়ির কাছে এসেই সব থেকে জোরে জোরে লাঠি আছড়ায় লোকটা। সবারই তখন মনে মনে ইচ্ছে—দূরে গিয়ে যত জোরে খুশি লাঠি বাজাক, নাকের ডগায় কেন!

মাঝরাতে অনেকদিন উঠে এসে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছি চুপচাপ। এক-একদিন মনে হয়েছে, সমস্ত পাড়া রাস্তা গাছ বাড়িগুলো পর্যন্ত গাঢ় সুপ্তির ঘোরে আচ্ছন্ন—তখন একা ওকে জেগে থাকতে হয় বলেই যেন ভিতরে ভিতরে একটা রূঢ় আক্রোশ ওর। পথের কুণ্ডলী পাকানো কুকুরগুলি লাঠির আওয়াজ শুনলেই সত্রাসে ছুটে পালায়। লাঠি ঠুকতে ঠুকতে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায় রামবাহদুর। মাঝে মাঝে চার রাস্তার মোড়ে বসে দু'চার মিনিট। চেয়ে চেয়ে দেখে চারদিকে। তারপর আবার ওঠে, আবার টহল দেয়।

সহজ কথাটা মনে হতে লজ্জা পেয়ে শয্যায় ফিরে আসতে হয়। নিঝুম রাতের স্তব্ধতার দরুনই লাঠির আওয়াজটা হিংস্র রূঢ় শোনায় এমন—নইলে আক্রোশ তার কারো ওপরেই নেই। নিজের বিধিলিপিতে বেশ পরিতুষ্ট সে।

সরকারী পাহারাদার নয় রামবাহাদুর। বে-সরকারী চৌকিদার। পাড়াটা সুবিধের নয় খুব। প্রায়ই চুরি হত। রাতে রাহাজানিও হত। বেশি রাতে পথ-চলাচল নিরাপদ ছিল না মোটে। পাড়ার দশজন মাতব্বর মিলে দু'বছর হল রামবাহাদুরকে রাতের পাহারায় নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেক বাড়ি পিছু দু'টাকা করে পায় সে। এই ব্যবস্থায়

কোনো গৃহস্থই আপত্তি করেন নি। গোটা এলাকায় কম করে গুটিপঞ্চাশ বাড়ি আগলায় রামবাহাদুর।

সে আসার পর থেকে, অর্থাৎ এই দু'বছর চুরি বন্ধ হয়েছে। রাহাজানিও হয় নি বললেই চলে। অবশ্য চুরি বা রাহাজানির চেষ্টাও হয নি তা নয। কিন্তু রামবাহাদুরের লাঠির ঘা ইতিমধ্যে একাধিকজনের পিঠে পড়েছে। তারা দীর্ঘদিন হাসপাতাল ভোগ করার পর এখন সম্ভবত জেল খাটছে। কাজেই বলতে গেলে গত দু'বছর ধরেই পাড়া মোটামুটি শান্ত।

রাতেব নির্জনে তার লাঠি ঠক-ঠকানি যেমনই লাগুক, দিনের আলোয় তাকে যতটুকু জেনেছি, ভালো লেগেছে। মাস-কাবারের প্রাপ্য দু'টাকা আদায়ের জন্যে ছাড়াও নিজের ব্যক্তিগত কাজে এই দু'বছরের মধ্যে সে বারকতক এসেছে আমার কাছে। আমাব কাছেই আসার কারণ, গোড়ায় গোডায় সে যখন টাকা নিতে আসত, হাতে সময থাকলে একটু-আধটু আলাপ-সালাপ কবতাম। তাবপব দু'তিনবার এসেছে মানি-অর্ডার ফর্ম লিখিয়ে নিতে। হাতে কিছু জমলে দেশে বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। বউয়ের নাম রুকমিণী (রুক্মিণী) —ছেলেও আছে, ছেলের নাম বীরবাহাদুর। ছেলের বযস তখন বছর ষোল হবে, কিন্তু ওই বযসেই নাকি সেয়ানা খুব। প্রাথমিক সঙ্কোচ কাটতে ছেলে-বউয়ের অনেক গল্প করেছে রামবাহাদুব। আব বলেছে, এ-দেশটা তার ভালো লাগে। সেই ছেলেবেলা থেকেই বাপের সঙ্গে এ-দেশে আছে। তার বাপ নাকি কোন রাজবাড়িব সিপাই ছিল। এ-দেশটা কেন ভালো লাগে জিজ্ঞাসা করতে জবাব দিয়েছে, কেন ভালো লাগে ঠিক বলতে পারবে না...ছেলেবেলা থেকে এ-দেশের নিমক খেয়েছে বলেই বোধহয় ভালো লাগে। গত বছব থেকে বউ-ছেলে নিয়ে এসেও খুব হাসি-খুশি মুখে খবরটা জানিযে গেছে।

এরপর ছেলে নিয়ে সমস্যায় পড়তে দেখা গেছে তাকে। ছেলের কাজকর্ম জুটছে না। ছেলের জন্য দু'বার দু'জায়গায় দুটো দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়ে গেছে আমাকে দিয়ে। কিন্তু চাকরি হয় নি। প্রধান বাধা ছেলের আঠেরো বছবও বযেস হয় নি তখন পর্যন্ত। কিন্তু এই বাধাটা ঠিক মানতে বাজি নয় বামবাহাদুর। প্রায তো হযে এলো আঠেবো বছর, কতই বা আর বাকি! তা ছাড়া আঠেরো বছর হযনি তাতে কি হয়েছে—ছেলে তার মরদ কম নাকি। সেটা চাক্ষুষ দেখিয়ে দেবার জন্যে ছেলেকে সঙ্গে কবেই নিয়ে এসেছিল একদিন। যেন আমিই নিয়োগকর্তা, আমাব চোখ দিয়েই ছেলেব যোগ্যতা যাচাই কবে নিতে চায়। ছেলেটা সত্যিই বেশ দেখতে। বাপের মতই বেঁটে-খাটো। মজবুত গড়ন। নাকের নিচে গোঁফের রেখা সবে দেখা দিয়েছে। কাঁচা বয়েসের দরুন হাবভাব একটু চঞ্চল। মুখে বেমানান গাম্ভীর্য। আমাকে মুরুব্বি ঠাউরে বাপেব মতই ভারী জুতো ঠুকে সেলাম জানিয়েছে সেও। আমি যেটুকু করতে পারি তাই করেছি। বাপের কাছে ছেলের প্রশংসা করেছি, আর আশ্বাস দিয়েছি, তাদের চাকরির ভাবনা কি, আঠেরো বছর পুরলেই ঠিক চাকরি হয়ে যাবে।

গত সাত-আট মাসের মধ্যে আর কোনো খবর রাখিনে। ইতিমধ্যে ছেলের চাকরি হয়েছে কিনা তাও জানিনে। মাসের টাকা নেবার সময়েও আমার সঙ্গে সব বার দেখা

হয়নি। দেখা হলেও ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করার ফুরসত হয়নি। আর রাতে যখন মনে হয়েছে, তখন ওর লাঠির ঠক-ঠকানিতে মেজাজ অপ্রসন্ন।

সে-দিন সকালের ঘুম ভাঙলো বাড়িতে একটা উত্তেজিত কলরব শুনে। রাস্তা থেকেও উত্তেজিত কথাবার্তা কানে আসছে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই সাতসকালে যে খবর শুনলাম, হাড়-পাঁজর কেঁপে ওঠার মত। শুনে আমি নির্বাক, স্তম্ভিত। চারমাথার ওধারে একটা কানা-গলির মুখে রক্তাক্ত মৃত-অবস্থায় পাওয়া গেছে রামবাহাদুরকে। মৃতদেহ এতক্ষণে পুলিসের হেপাজতে।

বুঝলাম, দু'বছর ধরে যাদের অসুবিধে ঘটিয়ে আসছিল রামবাহাদুর—তাদেরই প্রতিশোধ। অন্ধকারে কারা এই বীভৎস কাজ করে গেল কোনো হদিস মেলে নি। নিশ্চিন্ত মনে রাতের অন্ধকারে আবাব তৎপর হয়ে উঠবে তারা। রামবাহাদুরের বউ রুক্মিণীর কথা মনে হচ্ছে, ছেলে বীরবাহাদুবের কথা মনে হচ্ছে। কি করছে তারা এখন ? কি ভাবছে ? আমি ভাবছি, লোকটা এদেশের নুনের দেনা শোধ কবে গেল...।

তিন-চারদিন কেটে গেল। এই ক'রাত্রি পুলিস একটু-আধটু টহল দেবার ফলে কোনো দুঃসংবাদ কানে আসে নি। অন্ধকারের মানুষেরা হয়ত সময় আর সুযোগের প্রতীক্ষারত...।

তন্দ্রা লেগে এসেছিল। রাস্তায় হঠাৎ সেই ঠক-ঠক লাঠির শব্দে চমকে উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাশেব বাড়িব দেয়াল-ঘড়িতে ঠং-ঠং শব্দে বাবোটা বাজল। বাধানো রাস্তায় বাঁধানো লাঠির শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সেই রকমই চেনা শব্দ প্রায়। একেবারে সেই রকম নয়, পাকা রাস্তায় এই লাঠি ঠোকার শব্দ যেন আরো প্রাণবন্ত, আরো বেপরোয়া, আরো দর্পোদ্ধত। উঠে এসে তাড়াতাড়ি বারান্দার রেলিং ধরে ঝুকে পড়লাম। আব তারপরেই এক দৌড়ে নিচে নেমে এসে রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

আমার স্তব্ধ বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে কর্তব্যবত গাম্ভীর্যে সেলাম জানিয়ে বাঁধানো-লাঠির আঘাতে বাতের রাস্তা কাঁপিয়ে এগিয়ে চলল রামবাহাদুরেব আঠেরো বছরের ছেলে নতুন চৌকিদাব বীববাহাদুর।

স্বপ্নোত্থিতা

বিশু চক্রবর্তী আর নমিতা হালদারের উপাখ্যান শেষ হয়ে এলো।

ব্যর্থতার সবটুকুই ব্যর্থ নয়, পৌরুষের মর্যাদা আছেই। ভক্ত একলব্য গুরুপায়ে দক্ষিণ অণামিকা বিসর্জন দিয়েও রিক্ত কী ? ভক্ত বিশু চক্রবর্তী দেবীর পাঁদমূলে তার কলমসহ গোটা দক্ষিণ হাতটি বিসর্জন দিয়েই বা নিঃস্ব হবে কেন ? রোমাণ্টিক পাঠকবর্গ দাম দেবে তার।

তিন-পেয়ে নড়বড়ে টেবিলের উপর লেখা কাগজগুলো ছড়িয়ে আছে। হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে লেখক চিন্তামগ্ন। নমিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে বিশু চক্রবর্তীর পরাজিত

পৌরুষ কতটা খাড়া রাখা চলে ভাবছে। শিকারীর সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে মনের সর্বত্র বিচরণ করেও বিস্ময়কব মাল-মশলা কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। মেজাজ চড়ছে ক্রমশ।

ভাবছ কি ছাই অত, সত্যি কথাটা সহজ কথাতেই লিখে ফেল না বাপু!

চোখ বড়-বড় করে লেখক তাকালো।

কলম কথা বলছে।

লেখক সশ্লেষে জবাব দিল, লেখা জিনিসটা এত সহজ হলে রামা-শ্যামা সবাই লিখত, যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না।

থামো, থামো—। কলম ঝাঝিয়ে উঠল, বামা-শ্যামা লিখলে তো বাঁচতুম। মিথ্যে কথার জাহাজ নয় তারা এমন, সাত কথা বলতে আমাকে সতেরো পাক ঘোড়দৌড় করিয়ে আনত না তোমাব মত। তোমাব নমিতা হালদাবের দেখা মেলে পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে—অথচ কবছ এমন যেন কোন নন্দনকাননেব দূর্লভ উর্বশীটি।

লেখক হাসতে লাগল মৃদু মৃদু। বলল, নিতান্ত তোমার পবিশ্রমেব কথাটা তুললে বলে রাগ করলাম না। কিন্তু নমিতা হালদাব সম্বন্ধে আব একটু সমঝে কথা বোলো। ট্রামে-বাসে সে চড়ে না।

চড়ত। নিজের পয়সায় চড়ত। তোমাদেব মত হা-ঘবে গৌরী সেনেব দল থাকতে এখন আব চড়বে কেন? তোমবাই মেয়েটাকে বিগড়ে দিলে।

দেখো মেয়েটা মেয়েটা কোবো না বলছি, সম্ভ্রান্ত মহিলা তিনি।

কলম হেসে উঠল হা-হা কবে। সম্ভ্রান্ত নয়, ভ্রান্ত মহিলা। উদভ্রান্তও বলতে পারো। সেদিন তোমাদের ক্লাবে বণু বোস নমিতা হালদাবেব কর্মোন্নতির রহস্যটা যখন ফাঁস কবে দিলে সকলেব কাছে, মুখখানা তার দেখবাব মতোই হয়েছিল।

মুখে তোমাব কালি, ভালো দেখতে জানবে কি করে। কি রকম দেখতে হয়েছিল শুনি?

চটো কেন? হাই-হিল-পবা তরুণী মেয়েকে শুকনো ফুটপাতে পা পিছলে আছাড় খেতে দেখেছ কখনো?

না।

চলতি ট্রামে উঠতে গিয়ে আধুনিক মেয়েকে অচেনা পুরুষের বক্ষলগ্না হয়ে ঝুলতে দেখেছ নেক্সট স্টপ পর্যন্ত?

না।

তোমাকে তাহলে বোঝাতে পাবলুম না কেমন দেখতে হয়েছিল।

লেখক গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। সে জানে কি বকম দেখতে হয়েছিল নমিতা হালদাবের মুখখানি সেদিন। হালকা গুঞ্জনে পবিবেশটা দিব্বি জমে উঠেছিল। ...সভ্যরা সবাই ছেঁকে ধরেছে নমিতা হালদারকে—খাওয়াতে হবে। এতবড় একটা প্রমোশান হল, জুনিয়র অফিসার এখন, চালাকি নাকি! নমিতা স্মিত হাস্যে ভ্রুকুটি করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বাইরে ছিল তিন দিন, সে জানত নাকি কিছু! ট্রেন থেকে নেমেই তো একেবারে সরাসবি এখানে। সুখবরের সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রেডি করে রাখা উচিত ছিল উল্টে তারই জন্যে। ছেলেরা হাসছিল ভূঁইফোড় হাসি। মেয়েরা হাসছিল

বেদনা-করুণ হাসি। কোণের দিকে একমাত্র বিশু চক্রবর্তী অবশ্য বসেছিল চুপচাপ। এমন সময় কোথা থেকে মূর্তিমান রাহুর মত এসে উদয় হল রণু বোস। মাথা ঝাঁকিয়ে তড়বড় করে বললে, কংগ্রাচুলেশানস, নমিতা দেবী, কংগ্রাচুলেশানস!

জবাবে নমিতা হালদার অনাবিল হাস্যে মাথা নোয়ালে একটু। কিন্তু তার পরেই বজ্রপাত। রণু বোস বলে বসল, কিন্তু আপনি একটু সাবধানে থাকুন নমিতা দেবী। বড় সাহেবের বউ মিসেস পাণ্ডে আপনাকে পাকড়াও করতে পারেন। মাথায় ছিট আছে মহিলার—জানেন তো?

সকলেই অবাক। নমিতা আরো বেশি।—আমাকে! আমি তো তাঁকে চিনিনে!

তিনি আপনাক চেনেন। ইদানীং মিঃ পাণ্ডের সঙ্গে আপনার একসকারসানগুলোর খবর পাচ্ছেন কেমন করে যেন। তিনজনকে টপকে আপনাকে প্রমোশান দেবার খবরও রাখেন দেখলাম। বুড়োকে ঘরে লক আপ করে শাসিয়েছেন, ডাইভোর্স করবেন। কিন্তু তারও আগে আপনাকে একবার তিনি দেখে নেবেন বলেছেন। আমিও মনে মনে বলতে ছাড়িনি, তোমার মত বুড়ীকে থোড়াই কেয়ার করেন আমাদের নমিতা দেবী!

ব্যস! একেবারে বাসনমাজা জল পড়ল একপ্রস্থ। রণু বোস যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। এক ফুঁয়ে যেন ঘরের আলোটাকেসুদ্ধু নিবিয়ে দিয়ে গেল। এরপর আর আসর জমানোর প্রয়াস বৃথা। দুই-একজন চেষ্টা করল তবু। কিন্তু নমিতা হালদারের ভ্রূকুটি দেখে সভয়ে থেমে গেল। অতএব একে একে বিদায়ের পালা। সেন কাছে এসে চুপি-চুপি স্মরণ করিয়ে দিল, আজ আমার গাড়িতে আপনার বাড়ি ফেরবার কথা ছিল...।

নমিতা মাথা নাড়ল, না—।

সেন চলে গেল। বায় বলল, মেট্রোর দু'খানা ভালো টিকিট কেটেছিলাম, আসবেন?

নমিতা বলল, না—

রায় চলে গেল। মিত্র বলল, মিউজিক হলএ আজ ড্যান্স-প্রোগ্রাম, মন ভাল হত, চলুন না...।

নমিতা জবাব দেয়, না।

মিত্র চলে গেল, শেষ চেষ্টা দেখলে গুপ্ত, ডিলাইট কাফেতে আজও বোহেমিয়ান ডিনার মেনু শুনেছিলাম—

নমিতা ঝাঁঝিয়ে উঠল, না।

খাওয়ার প্রস্তাব করে প্রায় চড় খেয়ে প্রস্থান করল গুপ্তও। নমিতা হালদার এদিক-ওদিক তাকাতে চোখ পড়ল কোণে বিশু চক্রবর্তীর ওপর। এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে ক্লাব-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল গটমট করে।

পথে এসে বিশু চক্রবর্তী মন্তব্য করল, রণু বোস স্কাউণ্ডেল!

কী?

নমিতাব কর্কশ কণ্ঠস্বব শুনে চমকে উঠল বিশু চক্রবর্তী। আমতা আমতা কবে বলল, এই বলছিলাম, ড্যাম ব্লাডি সোযাইন—

গরু, ছাগল, গাধা, মোষ, পাঁঠা, উল্লুক, ভাল্লুক—বাগে নমিতা আবো জন্তুব নাম হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

সাহস পেযে সোৎসাহে বিশু চক্রবর্তী যোগ কবে দিল, হা—ক্যাঙ্গারু, সজারু, ইঁদুব, ছুচো—এক কথায লোকটা আস্ত জানোযাব।

লোকটা নয তুমি।

ঘাবড়ে গিযে বিশু চক্রবর্তীব কথা আটকে গেল। —আমি! স-স-সবগুলো?

সবগুলো, আবো অনেকগুলো। নমিতা আগুন, এতক্ষণে বুক ফুলিযে বলছেন, বণু বোস স্কাউন্ড্রেল—তখন বলতে পাবনি?

ও-তখন বলব লোকটা যে বক্সিং জানে।

কাপুরুষ। লোকটা তিন বছব ধবে আমাব পিছনে ঘুবে-ঘুবেও সুবিধে কবতে না পেবে আজ ঝাল ঝেড়ে গেল, জানো না?

জানে। বছবেব পব বছব ধবে তো নিজেবাও ঘুবছে। তাদেব বক্ত বণু বোসেব মত এমন অভদ্রোচিত গবম নয বলেই বক্ষা। আগেব সাহেবও প্রমোশান দিযে গেছে, পাণ্ডে তো একেবাবে অফিসাব বানিযে ছেড়ে দিলে। তাবপব সেনেব গাড়ি চড়ানো, বাযেব সিনেমা দেখানো, মিত্রব নাচেব প্রোগ্রাম, গুপ্তব ডিনাব খাওযানো। বিশু চক্রবর্তীব বুকেব ভেতবটা মোচড়াতে লাগল কেমন।

নমিতা হালদাব আলটিমেটাম দিলে, বণু বোসকে শিক্ষা দেবে কিনা জানতে চাই।

বিশু চক্রবর্তী অকূলপাথাবে পড়ল। বণু বোসেব মূর্তিটা চোখে ভাসছে। ফুটবল খেলা পা, বক্সিং শেখা হাত, শো-দেখানো বুক, আব হুইস্কি খাওযা মাথা। বিশু চক্রবর্তীব জলতেষ্টা পাচ্ছে। কিন্তু সহসা যেন একটু আলোক-বশ্মি দেখতে পেল। ক্রমশ সেটা বড় হযে দেখা দিল চোখে। গম্ভীব মুখে জবাব দিল, দেব শিক্ষা। এমন শিক্ষা দেব যে সে আব জীবনে ভুলবে না।

নমিতা হালদাব ঠিক বিশ্বাস কবল না। কিন্তু বিস্মিত হল—কি কববে শুনি?

আমি কবব না, লেখক কববে। তাব কলমেব একটি ব্লো পযেন্টমত পড়লেই বণু বোসকে আব উঠতে হবে না, একেবাবে ক্লীন নক আউট।

ননসেন্স।

পাববে না বলছ?

নমিতা চিড়বিড়িযে উঠল, লেখকেব ওই বেযাড়া কলমকে তুমি চেন না? তাব কোন কথা শোনে ওটা? উল্টে আমাকেই দেবে'খন খতম কবে।

বিশু চক্রবর্তী রুখে উঠল প্রায। জোব দিযে বলল, হতভাগা কলমেব চৌদ্দ পুরুষ শুনবে এবাব কথা। লেখক তাব মুখ ভোঁতা কবে দিযে শোনাবে। তুমি দেখে নিও।

কোন বকমে বাগ সামলে নমিতা বলল, তা হলে সত্যিকাবেব বণু বোস তো আব নক আউট হচ্ছে না। সশবীবে সে যখন লেখকেব কাছে এসে হাজিব হবে কৈফিযত নিতে। তখন?

বিশু চক্রবর্তীর মুখ শুকিয়ে গেল আবার। কথাটা ভাববার কথা বটে। খানিক চিন্তা করে বলল, তা হলে এক কাজ করা যাক, কলমের ব্লোটা প্রেস থেকে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসার আগেই লেখক না হয় চেঞ্জের নাম করে মাসকতক অন্য কোথাও গিয়ে থাকবে। ততদিনে রণু বোস নিশ্চয় অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কি বলো?

কিন্তু জবাবে নমিতা যা বলে গেল শুনে বিশু চক্রবর্তী স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে রইল। এক পশলা আগুন ছড়িয়ে নমিতা হালদার চলে গেল। স্ট্যাচুর গায়ে রক্ত চলাচল সুরু হল একটু একটু করে। সমস্ত পুরুষকার গুমরে গুমরে চাড়িয়ে উঠতে লাগল যেন। ভেনজেনস! মার্ডার! রণু বোস, হার্ক দাই ডেথ নেল! মনে মনে চিৎকার কবে লেখককে ডাকতে ডাকতে বিশু চক্রবর্তী বাড়ি ফিরল। দিনকতক জল্পনা-কল্পনা করে লেখক বসল কলম নিয়ে।

রণু বোসের নাক থ্যাবড়া করে দিয়েছে, তিল তিল করে গড়েছে নমিতা-তিলোত্তমা। বিশু চক্রবর্তীব বিদায়-বিষণ্ণ মুহূর্তটি ফুটিয়ে তুলতে পাবলেই সব শেষ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া কলম এই শেষ বেলায় যত ফষ্টি-নষ্টি সুরু করেছে।

চোখ পাকিয়ে লেখক কলমের দিকে তাকালো। কলম নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল ভাবছ কী?

ভাবছ কী! সমস্ত মুডটা নষ্ট করে দিলে, এখন লিখি কি করে বলো তো? তোমার বেয়াড়াপনা অসহ্য—নমিতাকে বলা হয়েছে দরকার হলে তোমার মুখ ভোঁতা করে দেওয়া হবে, সে কথা জানো?

জানি। কিন্তু তোমাকে আর চেষ্টা করতে হবে না, তোমার মত হাঁদারামের পাল্লায় পড়েছি যখন, দু'দিন বাদে মুখ আপনি ভোঁতা হয়ে যাবে আমার। ঘরে বসে যত বীরত্ব, সেদিন রাস্তায় যখন আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দিলে নমিতা হালদার, তখন তো দিব্বি ঠাণ্ডা পাথরখানার মত সহ্য করলে?

আমি! আমি কে? বিশু চক্রবর্তী সহ্য করেছে, আমি লেখক।

তুমি বিশু চক্রবর্তী। আমার দৌলতে কিছুকাল লেখকগিরি করেছ। এ মুখ ভোঁতা হলে দেখবে পা থেকে মাথা পর্যন্ত তুমি আস্ত একখানা বিশু চক্রবর্তী। সে কথা যাক, শেষ বিদায়েব পালাটা কি বকম লিখতে চাও, শুনি?

লেখক আপসের সুরে বলল, এই তো ভালো কথা, কোথায় এ বিপদে দু'টো পরামর্শ দেবে, না শুধু চিমটি কাটা! আচ্ছা শোনো, যদি বলি, নমিতা, তোমার চিরশত্রু রণু বোসকে খতম করেছি, ফলে আমাকেও সে আর আস্ত রাখবে না হয়ত—কিন্তু সেজন্যে আর এতটুকু ভয় করিনে। বিশু চক্রবর্তী বিদায় নিল। তার স্মৃতির সমাধির ওপর ফুটে উঠুক তোমার সফল জীবনের ভরা আনন্দগুচ্ছ। —কেমন হয়?

তোমার মাথা হয়। ওর ভরা আনন্দগুচ্ছের গন্ধ পেলে সমাধির মধ্য থেকেও তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফুঁড়ে বেরুবে। কলম মুখিয়ে উঠল, বিদায়ের প্রশ্ন ওঠে কেন, নমিতা হালদার সেদিন আর কী বলেছে শুনি?

লেখকের মুখ ভার, সেটা কি ভালো কথা যে শুনবে?

তবু শুনিই না?

বলেছে, ইডিয়েট।

তারপর?

তারপর, বাস্কেল।

তারপর?

তারপর অনেক কিছু বলেছে, অত আমার মনে নেই।

শেষে?

শেষে বলেছে, জীবনে আর আমার মুখ দেখবে না, আর সবশেষে বলেছে, আমি স্বচ্ছন্দে এবার জাহান্নমে যেতে পারি।

কলম বলল, ঠিকই বলেছে।

লেখক গরম হয়ে উঠল, ঠিক কেন?

নয় কেন? তুমি তার সর্বনাশটি করে এখন দ'লাইন কাব্য করে সরে পড়তে চাইছ, বলবে না?

লেখক অবাক, আমি তার কি সবনাশ করলাম?

তুমিই তো করলে। কি ছিল সে, আর কেন আজ এমন হয়েছে, বেশ করে ভেবে দেখ দেখি।

লেখক ভাবতে লাগল দশ বছর আগের সেই কিশোরী মেয়েটি। চোখে লজ্জা, ঠোঁটে হাসি, মনে ভয়, চলনে সঙ্কোচ, বলনে দ্বিধা। দারিদ্র্যের অন্তঃপুর থেকে তাকে টেনে এনে ছেড়ে দেওয়া হল জাকজমকের রাজপথে। আগে একজনের জন্য গোপনে সাজত, এখন দশজনের জন্য প্রকাশ্যে সেজে বেড়াচ্ছে। আগে একজনকে দেখলে বুক দুলে উঠত, দশজনের বুকে এখন ক্রমাগত দোলা লাগিয়েও তার আশ মেটে না। ফোস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল লেখক। বলল, সবই তো তার ভালোর জন্যে করেছিলাম—কিন্তু সবার আগে এখন আমাকেই সে ভুলে বসল কেন?

তার কারণ আজকের নমিতা হালদারের কাছে তুমি অচল। তোমার গাড়ি নেই, মেট্রোর টিকিট কাটতে পার না, মিউজিক হল চেন না, বোহেমিয়ান ডিনার খাওয়াবারও টাকা নেই তোমার—তুমি তার কোন কাজে লাগবে? তোমার আশা দেখিনে, কিন্তু তোমার নমিতা হালদারের কপালেও দুঃখ অনেক আছে।

লেখক বললে, তুমি দেখছি মাস্টারমশাই হয়ে উঠলে। তার কপালে দুঃখ থাকবে কেন, কত লোক তো তাকে লুফে নেবার জন্যে হা করে আছে।

কলম বললে, যেমন তোমার বুদ্ধি! লুফে নেবার জন্যে হা করে নেই কেউ—তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলবার জন্যে অনেকে হা করে আছে বটে। তার সতের থেকে সাতাশ বছরের পরিবর্তনটা তো দেখলে, সাইত্রিশের কথা ভাবতে পারো? শুধু কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে হবে তখন।

লেখক সচকিত হয়ে উঠল, সে কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। চুলে পাক ধরবে, রক্ত ঠাণ্ডা হবে। দেখবে ঘরে-বাইরে এত লোক কিন্তু সে কারো ঘরণী নয়, পথে-ঘাটে এত ছেলে কিন্তু সে কারো মা নয়। একখানি

আস্ত একাব কবব। কাদবে না? সাবাবাত কাদবে। তাবপব সকালে উঠে ওই কান্নাব ওপব স্নো-পাউডাব ঘষে আব বং চডিযে বেরুবে সঙ্গী খুঁজতে। কিন্তু পাবত পক্ষে কেউ আব তখন কাছেও ঘেঁষবে না।

কেউ না?

না। সেন না, বায না, মিত্র না— কেউ না।

কিন্তু আমি! আমি তো থাকব!

তোমাবও তখন আব ভালো লাগবে না তাকে।

সর্বনাশ! নমিতা তা হলে বাচবে কেমন কবে?

তিলে তিলে আত্মহত্যা কবে।

লেখক আতকে উঠল প্রথম, পবে কলমটাকে মাথাব ওপব তুলে আছড়ে ভাঙতে উদ্যত হল।

থামো, থামো, এখনো বাস্তা আছে।

লেখক কলম নামাল, বলো শীগগিব, নইলে তোমাকে আস্ত বাখব না আজ। নমিতাকে যেমন কবে হোক বাচাতে হবে।

তাহলে নিজে আগে বাচো।

নিজে বাচব! কেন, আমি কি বেচে নেই?

না। লেখা ছেড়ে আপাতত আমাকে বিশ্রাম দাও, বোদে পোড়ো, জলে ভেজো, শক্ত দুটো হাত দিযে টাকা বোজগাব কবো মাথাব ঘাম পাযে ফেলে। তাব পব যাও নমিতাব বোগ ছাড়াতে।

বোগ ছাড়াতে!

হ্যা! গত দশ বছবে একটা কাচেব খোলেব মধ্যে আটকে গেছে মেযেটা, মাথা খুঁড়েও নিজে আব বেরুতে পাববে না ওটাব মধ্য থেকে। ওই খোলস তোমাকে ভাঙতে হবে।

লেখক আশান্বিত হযে প্রশ্ন কবল, কেমন কবে ভাঙব?

কলম জবাব দিলে, বলছি একে একে শোনো। প্রথমে সোজা গিযে উপস্থিত হবে তাব ঘবে, বুঝলে?

বুঝলাম।

তাবপব তাব চিবুকখানা ধবে মুখটি নিজেব মুখেব দিকে তুলে ধববে একটু।

বেশ কথা।

তাবপব তুমি পিছনেব দিকে সবে আসবে এক পা।

সবে আসতে হবে আবাব?

হ্যাঁ। সবে এসে দুই গালে দুই থাপ্পড় বসাবে। মাযাদযা কবে নয়, বেশ কষিযে থাপ্পড়—ডান গালে একটি, বা গালে একটি।

শুনেই লেখকেব আত্মাবাম খাচা ছাড়া। আর্তনাদ কবে উঠল প্রায। থাপ্পড়! আমি! নমিতাকে—!

তারপর তার চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসবে নিজের বাড়িতে।

কিন্তু তারও যে হাত আছে, আর আমার মাথায়ও ঝাঁকড়া চুল!

তা হোক, না হয় একটু হাতাহাতি আর চুলোচুলি হল। কিন্তু ও ছাড়া আর গতি নেই।

আর সাড়াশব্দ নেই। দু'জনেই নীরব। লঘু পায়ের শব্দে মুখ ফেরাতেই লেখকের দেহের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। নমিতা ঘরে প্রবেশ করল। থমথমে মুখ, খরখরে চোখ। দু'চার মুহূর্ত নিঃশব্দে চেয়ে রইল লেখকের দিকে। পরে লেখা পাতা ক'টা চোখে পড়তে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল সেগুলো।

লেখক সকরুণ আবেদন জানাল, নমিতা, আমি কোন দোষ করিনি, এই হতচ্ছাড়া বয়াটে কলম এই কাণ্ড করেছে। ওকে আজ আমি ভেঙে গুড়িয়ে একাকার করে ফেলব—ও তুমি পড়ো না নমিতা!

নিষ্ফল। নমিতা পড়ছে। শুধু তাই নয়, মুখখানি লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ, নিঃশ্বাস ঘন হয়ে আসছে। শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট ঘষতে লাগল লেখক। পড়া শেষ করে নমিতা তাকালো তার দিকে। লেখকের গায়ে গরম ছ্যাকা লাগল যেন। মেয়ে নয়ত, একখানি জ্বলন্ত ভিসুভিয়াস! নমিতা কাছে সরে আসছে।

মরিয়া হয়ে লেখক হাত বাড়াল কলমের দিকে। দ্যাখো ওর কি হাল করি আজ—

এক ঝটকায় তার হাত সরিয়ে দিল নমিতা। চুলেব মুঠি ধরে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল গালে। পরে ভাঙা টেবিলে বসে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল সে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে হতভম্ব লেখক দু'চোখ গোল করে কিছুক্ষণ দেখল সেই দৃশ্য। পরে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়াল কখন। ভাঙা গলায় বলল, আমি—মা-মানে—তুমি কেঁদ না নমিতা। তোমার—মানে—আমার একটুও লাগেনি। আর কখনো এমন হবে না, কলমটাকে আজ ভালো হাতে শায়েস্তা করছি দেখো—

মাথা তুলে নমিতা গর্জে উঠল প্রায়।—কী? তার আগে আমি তোমাকে করব ভালো হাতে শায়েস্তা। একদিন নয়, রোজ। এখান থেকে আর এক পা'ও নড়ছি না আমি।

লেখক হতভম্ব।—তা... তার মানে এ বাড়িতে তুমি থাকবে, আর কোথাও যাবে না?

না।

বড়সাহেবের সঙ্গে একসকারসানেও না?

না।

সেনের গাড়িতে হাওয়া খেতে?

না।

রায়ের সঙ্গে সিনেমায়?

না।

মিত্রের সঙ্গে নাচের প্রোগ্রামে?

না।

আর গুপ্তর সঙ্গে বোহেমিয়ান ডিনারে?

না না না—!

লেখক হাঁ করে ভাবতে লাগল। শেষে বলল, কলম তো তাহলে ঠিক কথাই বলেছিল। কিন্তু আমাকে তুমি মারলে কেন, তোমাকে তো আমার মারবার কথা।

সুবোধ মেয়ের মত নমিতা চোখ বুজে গাল পেতে দিল। লেখক হাত তুলল। কিন্তু হাত তোলাই থাকল।... ধেৎ, কলমটা আস্ত বর্বর। অমন গালে কখনো চড় মারা যায়, ভাবতেও বুকটা চড়-চড় করে উঠছে লেখকের। তার থেকে বরং...

সামনের দিকে ঝুকতে গিয়ে লেখক চমকে উঠল। হাতের ঠেলা লেগে খর-খর করে হাসতে হাসতে কলমটা টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়বার মতলব করছে। তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। কাছে এনে দেখল। আদর করে ঝাকুনি দিল দু'টো। কলম হাসছেই।

মুখে আর এক বিন্দুও কালি লেগে নেই।